স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য

স্বর্ণকুমারী দেবী

স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য

পশুপতি শাশমল, এম. এ., ডি. ফিল.
অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
বিশ্বভারতী

বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন

সূচীপত্র

স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রতিকৃতি

বিশ্বভারতী রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত শ্রীপুলিনবিহারী সেনের
সংগ্রহ থেকে বিশ্বভারতীর অনুমোদনক্রমে ব্যবহৃত হল।

ভূমিকা

ভাতে যথা সত্য-হেম, মাতে যথা বীর,
গুণ-জ্যোতি হরে যথা মনের তিমির,
নব শোভা ধরে যথা সোম আর রবি,
সেই দেব-নিকেতন আলো করে কবি।

কবি সেদিন যে দেব-নিকেতনটি আলো করেছিলেন তার পরিচয়টি নিতান্ত সাময়িক। সাময়িক বলতে বাং ১২৭৯-৮২ সাল (ইং ১৮৭২-৭৫)-এর কাছাকাছি বুঝতে হবে। অবশ্য এই কালসীমার অগ্রভাগকে আরও অনেক দূর এগিয়ে এবং পশ্চাৎ প্রান্তকেও বেশ কিছুটা পিছিয়ে নেওয়া যায়। বর্ণনার সাময়িকতায় আপত্তি করি না, সে ত্রুটি সংশোধন করবে ইতিহাস। কিন্তু বর্ণনা অসম্পূর্ণ কেন? সেদিনকার দেব-নিকেতনে দেবকুমারদের সঙ্গে সঙ্গে দেবকুমারীও তো দু-একজন ছিলেন কবি তাঁদের নাম উল্লেখ করেন নি। বাস্তভবন-পরিচায়ক এই চার ছত্রের কবিতায় যাঁদের নাম দেওয়া হয়েছে তাঁরা সকলেই যে কীর্তিমান এমন নয়। তখন কেবল 'সত্য' ও 'জ্যোতি'র দীপ্তি প্রকাশ পেয়েছে, 'মনের তিমির' তাঁরা যে একদিন হরণ করবেন সে সম্ভাবনা হয়তো লক্ষ্য করা যাচ্ছে। 'সোম আর রবি' সম্পর্কে বলা হয়েছে 'নব শোভা ধরে'—এই পর্যন্ত, তার বেশি কিছু বলবার মত উপলক্ষ্য তখনও ঘটে নি। সুতরাং এটা দেখছি যে গুণাগুণ বিচার করে এই আর্যাটি রচিত হয় নি, কবি তৎকালে বর্তমান সব কটি ভাইয়ের নাম দিয়েছেন। কিন্তু ভগ্নীদের মধ্যে একজনেরও নাম উল্লেখ করেন নি। মহর্ষির কন্যারাও দেব-নিকেতনেরই অধিবাসী ছিলেন। বিবাহের পরও জামাতারা মহর্ষির ভবনেই বাস করতেন। কেবল স্বর্ণকুমারীর স্বামীই এর ব্যতিক্রম। স্বর্ণকুমারী বিবাহের পর পিত্রালয় পরিত্যাগ করে স্বামীর সঙ্গে অন্যত্র বাস করলেও এ বাড়ির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ কখনো শিথিল হয় নি। এমন দিন যায় নি যেদিন তাঁরা জোড়াসাঁকোয় আসেন নি অথবা জোড়াসাঁকোর বাড়ি থেকে কেউ তাঁদের বাড়িতে যান নি। স্বামী জানকীনাথ ব্যারিস্টারি পড়বার জন্যে যখন বিলাত গেলেন তখন স্বর্ণকুমারী পিত্রালয়েই ছিলেন। বিবাহের পরেও মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ এবং কনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ যোগ ছিল। বিবাহের বছর দুয়েক পরে ইংরেজী শেখার জন্যে স্বর্ণকুমারী বোম্বাই গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথের কাছে এক বছর থাকেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দার্জিলিং যাত্রার প্রসঙ্গ 'ছিন্নপত্রে'র পাঠকরা নিশ্চয় বিস্মৃত হন নি, কিন্তু সে আরও অনেক পরের কথা। তাই দ্বিজেন্দ্রনাথ যখন 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' লেখেন তখনকার দেব-নিকেতন বর্ণনায় স্বর্ণকুমারীর নামটা অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় বিস্ময় বোধ করি

আধুনিক বাংলা দেশ ঠাকুরবাড়ির কাছে যে কত ভাবে এবং কি পরিমাণে ঋণী তার পরিমাণ নির্ণয় করা শক্ত, কিন্তু নির্ণয় করার প্রয়োজন আছে। বাংলা দেশের সাহিত্য সংস্কৃতি সংগীতাদির উপর রবীন্দ্রনাথের আত্যন্তিক প্রভাব সর্বজনস্বীকৃত। আধুনিক বাংলার সুরুচি ও সৌন্দর্যবোধের অনেকখানিই রবীন্দ্রনাথের কাছে পাওয়া। চিত্রকলার উপর তাঁর প্রভাব কতখানি পড়েছে শিল্পী ও সমালোচকরা তার বিচার করবেন, কিন্তু নাট্যকলা এবং অভিনয়ে তিনি যে নবযুগের প্রবর্তন করেছেন তাতে তো মতান্তর থাকতে পারে না। তিনি রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামেন নি। কিন্তু দেশকে যাঁরা স্বাদেশিকতার মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদের পুরোবর্তী। দয়া দিয়ে নয় ভালবাসা দিয়ে দেশের মানুষের অন্তরকে স্পর্শ করেছিলেন তিনি। মহাত্মা গান্ধী অপাত্রে ভক্তি ন্যস্ত করেন নি। সেই সহস্রশীর্ষ সহস্রাক্ষ পুরুষটির সর্বতোমুখী প্রতিভার উৎস কোথায় তা জানতে হলে ঠাকুরবাড়ির অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হবে। কবি তো স্বয়ম্ভূ নন, পরিবেশ পরিজনের মধ্য দিয়েই তাঁর প্রতিভা বিকশিত হয়েছে, তাঁর ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঠাকুরবাড়িরই সৃষ্টি। সেখানে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এই ঘটনাটাকেই ইতিহাস বড় করে দেখে। কিন্তু সেই দেখাটাই আসল দেখা নয়। ঠাকুরবাড়ি তাঁকে লালনপালন করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হবার পথে অগ্রসর করে দিয়েছিল। এই কথাটাই বিশেষ করে মনে রাখার। পিতামাতা ভ্রাতা-ভগ্নী আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব অতিথি-অভ্যাগত কেউ প্রত্যক্ষে কেউ বা পরোক্ষে তাঁর ব্যক্তিত্ব গঠনে অংশ গ্রহণ করেছেন। আবার এ কথাও মনে রাখতে হবে কবির পক্ষে নির্বিকল্প গ্রাহক হয়ে থাকাও সম্ভব ছিল না। ঠাকুরবাড়ি থেকে তিনি যেমন গ্রহণ করেছেন তেমনি তাঁর দানে ঠাকুরবাড়িরও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এই মার্জিতরুচি সুশিক্ষিত অনুশীলনতৎপর পরিবারটি একদিন বাংলা দেশে চিৎপ্রকর্ষের মানমন্দিররূপে গণ্য হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে। দেওয়া নেওয়া হয়েছিল পারস্পরিক। কে কতটা পেলেন কে কতটা দিলেন তা বলা কঠিন তবু ঐতিহাসিক তার হিসেব নেবার জন্যে কৌতূহলী হবেন।

শ্রীচৈতন্য-পরিকরদের সম্পর্কে ভক্ত বৈষ্ণবের কৌতূহলে অধ্যাত্মসাধনার পথ প্রশস্ত হয়ে থাকতে পারে কিন্তু জিজ্ঞাসু ঐতিহাসিকের জ্ঞানোন্নতির পক্ষেও যে অনেকখানি সহায়ক হয়েছে তাতে তো আর সন্দেহ নেই। যে-ভক্তি সম্প্রদায়ের, তার প্রবাহে জোয়ারের সঙ্গে সঙ্গে ভাটাও আসে। যে-জ্ঞান সর্বজনের, তার দীপ্তি অম্লান। পরিকরগণের জীবন ও কর্মসাধনার মধ্য দিয়ে যখন মহাপ্রভুকে জানতে চেয়েছি তখনই তাঁকে স্বরূপে জেনেছি। শুধু তাঁকেই জেনেছি তা নয়, তিনি যে যুগের প্রতীক সেই যুগের ভাবনাকে এবং সেই যুগের সূচনা থেকে অবসান পর্যন্ত ব্যাপ্ত সমগ্র কালটাকে জানবার সুযোগ হয়েছে।

রবীন্দ্র-পরিকরগুলিকেও অনুরূপ কারণেই জানা দরকার। তাঁদের জীবন ও কর্মসাধনার সকল বিবরণ, তাঁদের চিন্তা অধ্যয়ন অন্বেষণের খুঁটিনাটি সকল সংবাদ এখনও সংগৃহীত সংকলিত হয় নি। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনী' গ্রন্থে অবশ্য একাই এক-শ জনের কাজ করেছেন। কিন্তু স্বভাবতই রবীন্দ্রজীবনকথাই তাঁর মূল লক্ষ্য বলে পরিকরগণের প্রত্যেকটির উপর সমান এবং সর্বাঙ্গীণ দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয় নি। কিন্তু তিনি তাঁর গ্রন্থে যে অজস্র সূত্র নির্দেশ করে গেছেন সেই সূত্রগুলি ধরে রবীন্দ্রনাথের নিকট-সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছিলেন সেইসব মানুষগুলির, কেবল আত্মীয়-স্বজন নয় অনাত্মীয় সঙ্গীসহচরদেরও, জীবন এবং সাধনার ইতিহাস লেখার এই প্রশস্ত সময়। সৌভাগ্যক্রমে আগ্রহশীল গবেষণাব্রতী ছাত্র এবং তরুণ অধ্যাপক সম্প্রদায়ের এ দিকে দৃষ্টি পড়েছে। তাঁদের প্রত্যেকটি প্রয়াসের সকল সম্পন্নতা কেবল যে রবীন্দ্রজীবনীর পরিপূরকরূপে স্বীকৃতি লাভ করবে তাই নয়, বাংলা সাহিত্যকে অধিকতর সমৃদ্ধ এবং রবীন্দ্রচর্চার পথ অধিকতর সুগম করে তুলবে।

রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতা-ভগিনীদের মধ্যে সাহিত্যজগতে স্বীয় কীর্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তিনজন—দ্বিজেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং স্বর্ণকুমারী। 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস' রচয়িতা মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের সৃষ্টির পরিমাণ অধিক না হলেও সাহিত্য-সমাজে তাঁর নামও অপরিচিত নয়। এই চারটি ভাই-ভগিনীর মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ এখনও জিজ্ঞাসু গবেষকের দৃষ্টি তেমন করে আকর্ষণ করতে পারলেন না কেন তাই ভাবছি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ যতটা ঘনিষ্ঠ এবং অন্তরঙ্গ ছিল আর কোনো ভাইবোনের সঙ্গে ততটা ছিল না এবং রবীন্দ্রনাথের মনঃসংগঠন ও চিত্তবিকাশের ব্যাপারে তাঁর সান্নিধ্যই সর্বাধিক ক্রিয়া করেছিল এ কথা সত্য। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে গবেষণাত্মক আলোচনায় প্রণোদিত হবার ওইটাই কি একমাত্র কারণ? যদি হয় সেটা পরিতাপের কথা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দান বাংলা সাহিত্যের একটি মূল্যবান সম্পদ্—নিরপেক্ষ সমালোচক মাত্রই সেকথা স্বীকার করবেন। রবীন্দ্রনাথের ভাই বলে নয়, বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, সংগীত সংস্কৃতি সাহিত্যের জানা-অজানা সকল পথেরই পর্যটনে উৎসুক, জীবনচঞ্চল আনন্দময় এই মানুষটির রচনা নিজগুণেই সাহিত্যরসিকের শ্রদ্ধা অর্জন করেছে। সুখের বিষয় স্বর্ণকুমারীর সাহিত্যসাধনা সম্পর্কেও গবেষকের কৌতূহল উদ্বুদ্ধ হয়েছে, বর্তমান গ্রন্থটি তার প্রশংসনীয় প্রমাণ।

স্বর্ণকুমারীর দীপনির্বাণ উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ সালে। গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে গ্রন্থকর্ত্রীর নাম ছিল না। সত্যেন্দ্রনাথ বিদেশে বইখানি হাতে পেয়ে ভেবেছিলেন এটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনা। "জ্যোতির জ্যোতি কি প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে?"—এই বলে তিনি ভগ্নীর প্রাপ্য অভিনন্দন পাঠিয়েছিলেন ভাইকে। হিরণ্ময়ী দেবীর প্রদত্ত এই তথ্যটিও

রহস্যজনক মনে হয়। সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে স্বর্ণকুমারীর এতখানি যোগাযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি ভগ্নীর রচনা-রীতির বৈশিষ্ট্য ধরতে পারলেন না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের তিনটি বই তার আগে বেরিয়ে গেছে—কিঞ্চিৎ জলযোগ (১৮৭২), পুরুবিক্রম নাটক (১৮৭৪) ও সরোজিনী নাটক (১৮৭৫)। সত্যেন্দ্রনাথ এই নাটকগুলি পড়েছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভাষার সঙ্গে দীপনির্বাণের ভাষার কিছু মিল আছে বলে সত্যেন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল। তা ছাড়া গ্রন্থ-কর্তৃত্ব সম্বন্ধে তাঁর ধারণাটা নিঃসংশয় ছিল বলে তুলনা বা বিচার করার কথাই মনে ওঠে নি। কিন্তু স্বর্ণকুমারী যে একটা উপন্যাসে হাত দিয়েছেন এ সংবাদটা গ্রন্থ প্রকাশের আগে কখনো তাঁর কানে গেল না কেন? একটা বইয়ের রচনারম্ভ থেকে প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত যে কালপরিধি সেটা তো নিতান্ত কম নয়? 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে বলা হয়েছে, দীপনির্বাণ রচিত হবার দুবৎসর পরে প্রকাশিত হয়েছিল। এই মন্তব্যের ভিত্তি কিছু আছে কিনা জানি না। কিন্তু এ মন্তব্য যথার্থ হলে আমার কৌতূহলের গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। সত্যেন্দ্রনাথ সে সময় বিদেশে ছিলেন সত্য কিন্তু বিদেশে ভ্রাতা-ভগ্নীদের উল্লেখযোগ্য মুখ্য সাহিত্যপ্রয়াসের সংবাদ তিনি রাখবেন না বা পাবেন না এটাই বা কেমন করে হয়? 'স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্যে'র গ্রন্থকারও যে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত নন তার প্রমাণ আছে। তিনি সত্যেন্দ্রনাথের ভ্রান্ত অনুমানের কারণ নির্ণয় করবার চেষ্টা করেছেন। বলেছেন, যে সাহিত্যবোধ ও সংস্কার নিয়ে তিনি সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হন তা অনেকটা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাবসঞ্জাত। সেই কারণে তাঁর রচনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মানসিকতার সাধর্ম্য লক্ষিত হয়েছে। কিন্তু নাম গোপন কেন? গ্রন্থকার সে সম্বন্ধে কিছু বলেন নি। আমার একটি অনুমান তাঁর বিবেচনার জন্যে উপস্থাপিত করি। আমি বলি এটার মধ্যে একটা ষড়্‌যন্ত্র ছিল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথও সে যন্ত্রের একজন যন্ত্রী ছিলেন। উভয়ে মিলে মেজদাদাকে একটা pleasant surprise দিতে চেয়েছিলেন। এবং রহস্যাভিনয়ে তাঁরা সম্পূর্ণ সিদ্ধকাম হয়েছিলেন।

যা হোক লেখকের অনামিকতা নিয়ে আন্দোলনটা একটু বেশি হয়েছিল। Hindu Patriot পত্রিকায় বলা হয়েছিল,— "As the book which possessed great merits did not disclose the name of its writer, speculation was naturally rife as to its authorship." লেখকের নাম না থাকায় পাঠক সম্প্রদায়ের কৌতূহল উদ্রিক্ত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সে কৌতূহলের পরিধি যে নিতান্তই সংকীর্ণ সেটাও মনে রাখা দরকার। গ্রন্থ উপহার দেওয়া হয়েছে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এবং তাঁকে মেজদাদা বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এ রকম একটি উপন্যাস লেখার মত বুদ্ধি ও বয়স সত্যেন্দ্রনাথের কোন্ কোন্ ভাই বোনের হতে পারে? সব দিক বিচার করলে সমস্যা দাঁড়ায় দুটিকে ঘিরে, প্রথম জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আর দ্বিতীয় স্বর্ণকুমারী।

দীপনির্বাণ প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্যসমাজে বিপুল সমাদর লাভ করেছিল। অজ্ঞাতনাম্নী লেখিকার প্রশংসায় পত্রপত্রিকা মুখর হয়ে উঠেছিল। জনরব রটে গিয়েছিল উপন্যাসটি কোনো মহিলার লেখা। কোন্ মহিলার তাও প্রায় সকলেই বুঝেছিলেন। An Unfinished Song-এর E M. Lang-কৃত Introduction-এ বলা হয়েছে,—"...she had published an anonymous novel which became an immediate success and the revelation of its authorship caused a great sensation, as it was the first time an Indian woman had attempted such a feat." মহিলার লেখা বলে সমালোচকদের মনে একটু দুর্বলতা একটু সহানুভূতি একটু প্রশ্রয় প্রদানের ইচ্ছা জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সমালোচনা ও মন্তব্যের ভাষা দেখে বোঝা যায় লেখিকা যে প্রশস্তি লাভ করেছেন তার মধ্যে অত্যুক্তি নেই।

স্বর্ণকুমারীর পূর্বে মহিলা সাহিত্যকার হিসাবে যে কয়জনের নাম পাই তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নামের সংখ্যা নিতান্তই বিরল। ১৮৭৬-এর পূর্বে প্রকাশিত মহিলাদের লেখা যে কয়খানি বইয়ের নাম আজ দেখতে পাচ্ছি সেগুলি নামেই আছে, তাও ইতিহাসের পাতায়। তার মধ্যেও বেশির ভাগ কাব্য কবিতা নাটক। কিছু কিছু প্রবন্ধও দেখা যায়। কিন্তু সেই সঙ্গে দেখতে পাই আখ্যানধর্মী রচনার প্রবর্তনা, উপন্যাসের প্রাথমিক প্রয়াস। বর্তমান গ্রন্থকার সেটা লক্ষ্য করেছেন এবং মহিলারচিত ইতিহাসাশ্রয়ী আখ্যায়িকা, বিশেষত রাজস্থানের ঐতিহাসিক কাহিনী অনুসরণে রচিত কয়েকটি গদ্য গ্রন্থ ও উপন্যাস, যে দীপনির্বাণের পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে সে বিষয়ে তিনি আদৌ অনবহিত নন। কিন্তু পূর্ববর্তী উপন্যাস জাতীয় রচনার সঙ্গে দীপনির্বাণের পার্থক্য কোথায় সেই কথাটাই তিনি পাঠককে বোঝাতে চেয়েছেন, এবং আমি তাঁকে এই বলে ভরসা দিতে পারি আমরা অর্থাৎ পাঠকরা তাঁর বক্তব্য বুঝেছি। উপন্যাস কথাটির সংজ্ঞার্থ নিয়ে আলোচনা করে লাভ নেই। শতাব্দীর অধিককাল ধরে ব্যবহৃত হতে হতে আজ উপন্যাস কথাটা একটা রূঢ়ার্থ লাভ করেছে। আজকের লেখকরা আখ্যান পরিবেশনে নিত্য নূতন পরীক্ষা করছেন, নিত্য নূতন রীতি জন্ম নিচ্ছে, কেউ বা স্থিতিলাভ করছে আবার কেউ বা দুদিন পরেই বর্জিত হচ্ছে। এক উপন্যাস সকল রীতির নামের ভার কদিন বইতে পারবে? আজও কষ্টেসৃষ্টে বইছে সত্য, কিন্তু কাল যে আর কারও সঙ্গে দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নেবে না এমন কথা কে বলবে? স্বর্ণকুমারীর বই যখন বেরোয় বঙ্কিমচন্দ্র তার আগেই ঔপন্যাসিক হিসেবে খ্যাতি পেয়েছেন। সুতরাং উপন্যাসের কাছে পাঠকের প্রত্যাশা কি থাকতে পারে তার একটা মোটামুটি ধারণা পাঠক সমাজে প্রায় স্বীকৃত হয়েছিল। বঙ্কিম-পূর্ববর্তী কোনো আখ্যানমূলক রচনাই, সে রচনা পুরুষেরই হোক আর মহিলারই হোক, সে প্রত্যাশা পূরণ করতে সমর্থ ছিল না। স্বর্ণকুমারীর উপন্যাসে বঙ্কিমের আদর্শ অনুসৃত হয়েছিল।

উপন্যাস সম্বন্ধে স্বর্ণকুমারীর মতামতগুলি বিশ্লেষণ করে দেখলে একটি তত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নীতিশিক্ষা দান ঔপন্যাসিকের অন্যতম মুখ্য কর্তব্য। বঙ্কিমও সাহিত্যিককে শিক্ষকের আসনে উপবিষ্ট দেখতে চেয়েছেন এবং স্বয়ং সেই আসন নিয়েছেন। তবে শিক্ষাব্যবসায়ী এবং সাহিত্যব্যবসায়ীর মধ্যে পার্থক্য তো থাকবেই। কি সে পার্থক্য? তার উত্তর গ্রন্থকর্ত্রী তাঁরই একটি উপন্যাসের নায়কের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য নভেলিস্টও নীতি শিক্ষা দেন বটে তবে নীতিশিক্ষকের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য শিক্ষাদানের প্রণালীতে। গ্রন্থকর্ত্রীর মতে নভেলিস্ট চিত্রকর। "বিশ্বের অভঙ্গ অব্যর্থ নিয়মের মধ্যে, সমাজের ভঙ্গপ্রবণ ক্ষণিক নিয়মের মধ্যে নিয়তির এবং স্বভাবচক্রের গতিতে চরিত্রভেদে মানুষ কিরূপ বিচিত্র মূর্তিতে ফুটে ওঠে তাই ছবির মত এঁকে দেখানই নভেলিস্টের কাজ।" (পৃ ১৪১)। ছবির মত আঁকাটা হল উদ্দেশ্য সাধনের উপায় কিন্তু আসল উদ্দেশ্যটা হল শিক্ষাদান। 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়ির স্বাদেশিকতা সম্বন্ধে যা বলেছিলেন সে কথা এখানে স্মরণ করছি,—"বাহির হইতে দেখিলে আমাদের পরিবারে অনেক বিদেশীপ্রথার চলন ছিল কিন্তু আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকল প্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল।" স্বাদেশিক উদ্‌যোগে জ্যোতিদাদাই অগ্রণী ছিলেন। সেই যে সঞ্জীবনী সভা, যার সাংকেতিক নাম হামচুপামুহাফ এবং রাজনারায়ণবাবু যার সভাপতি, সেই স্বাদেশিকের সভা এই জ্যোতিদাদারই সৃষ্টি। এই জ্যোতিদাদার কাছেই স্বর্ণকুমারীর দীক্ষা, সাহিত্যেই নয় স্বাদেশিকতাতেও। তাঁর প্রথম উপন্যাসে এই স্বাদেশিকতার মন্ত্রই তিনি প্রচার করতে চেয়েছেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর পূর্বে নাটকের মধ্য দিয়ে যা প্রচার করেছেন। আগেই দেখেছি শিক্ষাদানকেই লেখিকা সাহিত্য রচনার প্রধান উদ্দেশ্য বলে মনে করেন। দীপনির্বাণের মধ্য দিয়ে স্বাদেশিকতার শিক্ষাদান করেই তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চেয়েছেন।

'স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্যে'র গ্রন্থকার একটি বিষয়ে আমাদের কৌতূহল উদ্রিক্ত করেছেন কিন্তু নিরসন করেছেন বলে মনে হচ্ছে না। নিরসন যে করতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। পাঠকের কৌতূহল জাগ্রত করার শক্তি যে-লেখকের আছে তিনি পাঠকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। তিনি যেন পাঠককে ডেকে বলেন, এস দুজনে মিলে প্রশ্নটার উত্তর খুঁজি। তিনি বলেছেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রধান বাহন নাটক এবং তার মধ্য দিয়েই তিনি স্বদেশের কথা পরিবেশন করেছেন। কিন্তু "সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় ব্যাপার হল স্বর্ণকুমারীর কোনো নাটক সরাসরিভাবে স্বদেশপ্রেমকে অবলম্বন করে রচিত হয়নি;

সেখানে পারিবারিক জীবনের ক্ষয়-ক্ষতি আশা-আনন্দ কিংবা সামাজিক জগতের জীবন-চাঞ্চল্য সহৃদয়তার সঙ্গে অনুভূত হয়েছে সত্য কিন্তু তাদের রচনার পশ্চাতে স্বদেশচিন্তা বা স্বাদেশিকতা প্রত্যক্ষভাবে মোটেই সক্রিয় ছিল না।" কেন ছিল না তার উত্তর গ্রন্থকার স্পষ্ট না হলেও আভাসে, সম্ভবত নিজের অজ্ঞাতসারেই দিয়েছেন। নাট্যকার হিসাবে স্বর্ণকুমারীকে তিনি উচ্চ স্থান দিতে পারেন নি। তিনি বলেছেন, প্রহসনগুলির মধ্যেই লেখিকার নাট্যপ্রতিভা প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু "অন্যান্য রচনার নাট্য-গতি মন্থর, চারিত্রিক অন্তর্দ্বন্দ্ব শূন্যপ্রায় এবং সংলাপ কথকতাধর্মী।" (পৃ ৩০১)। লেখিকা আপন শক্তি ও দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। হয়তো গভীর হৃদয়ভাব প্রকাশের পক্ষে উপন্যাসকেই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন বলে মনে করেছিলেন।

উপন্যাসে বঙ্কিমের যুগেই তিনি খ্যাতি পেয়েছিলেন এবং তৎকালীন সমালোচকদের মধ্যে অনেকেই ঔপন্যাসিক হিসাবে বঙ্কিমের পরেই তাঁর স্থান নির্দেশ করেছিলেন। ছোট-গল্পেও স্বর্ণকুমারীর দান উল্লেখযোগ্য। গল্প রচনায় তিনি যে সচেতনভাবে উৎকর্ষ সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন তার পরিচয় পাওয়া যায়। বিষয়ের পরিধিও বিস্তারিত। তাঁর অনেকগুলি গল্পই সুখপাঠ্য এবং শিল্পোত্তীর্ণ। সামাজিক চিত্র এবং বিয়োগান্ত কাহিনী রচনায় তাঁর কৃতিত্ব সমধিক। স্বর্ণকুমারীর ছোটগল্পের বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য তাঁর জীবনীকার একটি সুবৃহৎ পরিচ্ছেদে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করেছেন, কিভাবে করেছেন কৌতূহলী পাঠক তা নিজেই দেখতে পাবেন। তবু একটি কথা মনে করিয়ে দেওয়া ভাল। সেটা এই যে রবীন্দ্রনাথ এবং স্বর্ণকুমারী প্রায় একই সময়ে ছোটগল্প লিখছিলেন। রবীন্দ্রনাথের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারেন, তা নিয়ে তর্ক তোলার প্রয়োজন নেই। কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা এই যে আজ পর্যন্ত আমাদের সাহিত্যে যে ছোটগল্পের জুড়ী মেলা ভার সেই রবীন্দ্রলিখিত গল্পের সঙ্গে সেদিনকার পাঠক স্বর্ণকুমারীর গল্পকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন।

স্বর্ণকুমারী দেবী সচেতন লেখিকা। তার বহুতর প্রমাণ আলোচ্য গ্রন্থে পরিবেশিত হয়েছে। প্রায় শতাব্দীকাল আগেও সাহিত্যিক ভাষার গুণাগুণ ও উৎকর্ষ-অপকর্ষ সম্বন্ধে তিনি চিন্তা করেছেন এবং স্বাধীনভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করেছেন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা আবশ্যক যে তাঁর সমকালে সাহিত্যে প্রযোক্তব্য ভাষার রীতি সম্বন্ধে বঙ্গীয় বিদগ্ধ সমাজের আরও কেউ কেউ চিন্তা করতে শুরু করেছেন। বঙ্কিমের 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধ প্রকাশের কাল বাং ১২৮৫ সাল।

স্বর্ণকুমারীর জীবনীকার তাঁর ভাষা-ব্যবহার সম্বন্ধে যে তথ্যগুলি সংকলন করে দিয়েছেন সেগুলি বিশেষ মূল্য বহন করে। এই তথ্যগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলেই লেখিকার

চিন্তার পথটি সহজেই অনুসরণ করতে পারি। নবকাহিনীর অধিকাংশ গল্প বিশ্লেষণ করে জীবনীকার তাঁর ভাষারীতির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য (পৃ ২৯৭-৯৯) লক্ষ্য করেছেন। "প্রত্যেক গল্পের বর্ণনাংশ একান্তভাবে সাধুরীতির উপর নির্ভরশীল। চলিতরীতি কেবলমাত্র কোনো কোনো গল্পের সংলাপের প্রায় সর্বত্র ব্যবহৃত। ঐতিহাসিক বা ইতিহাসাশ্রয়ী গল্পগুলিতে বিশেষভাবে সাধুরীতি প্রযুক্ত। প্রধানত গৌণচরিত্র, অন্তঃপুরিকা, ঝি-দাসী প্রভৃতি সাধারণ পাত্রপাত্রীর সংলাপের চলিতরীতি বিশিষ্ট আঞ্চলিক উচ্চারণভঙ্গি এবং উপভাষার সংস্পর্শ লাভ করেছে।" জীবনীকার এই মন্তব্যের উপসংহারে বলেছেন, "তাঁর কয়েকটি প্রহসন এবং সামাজিক নাটকও এই বৈশিষ্ট্যযুক্ত।" ঠাকুরবাড়ির তরফ থেকেই আধুনিক বাংলায় চলিত ভাষার প্রবর্তন আজ প্রায় সম্পূর্ণ হতে চলেছে। প্রমথ চৌধুরী ঠাকুরবাড়ির জামাতা এই কথা মনে রেখেই বলছি। কিন্তু ঠাকুরবাড়িতে চলিত ভাষার অনুশীলন এবং মুখের বাইরেও কালি-কলমে তার প্রয়োগযোগ্যতা সম্বন্ধে পরীক্ষা—কখনো দৃশ্যত এবং কখনো বা অলক্ষিতে—দ্বিজেন্দ্রনাথের কাল থেকেই চলে আসছিল সেটা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। গদ্যরীতির প্রবর্তনের ইতিহাসে এবং চলিতরীতির প্রতি-স্থাপনে রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ চারজন—দ্বিজেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং ভগিনী স্বর্ণকুমারী, এঁদের দানের পরিমাণ কম নয়। সাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গে জীবনীকার স্বর্ণকুমারীর রচনারীতি সম্পর্কে আলোচনা করে বিষয়টির গুরুত্ব সম্পর্কে বঙ্গীয় পাঠককে অবহিত করেছেন।

কবি স্বর্ণকুমারী স্বভাবতই এই সমালোচনা-গ্রন্থের অনেকখানি স্থান গ্রহণ করেছেন। বাংলা সাহিত্যে গাথা-জাতীয় কাব্যের প্রবর্তক বলে তাঁর প্রসিদ্ধি আছে। আক্ষরিকভাবে ইতিহাসসম্মত না হলেও এ প্রসিদ্ধি যে নিতান্ত অমূলক নয় গ্রন্থকার যুক্তিসহকারে সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন। অক্ষয় চৌধুরীর প্রভাব মেনে নিয়েও 'গাথা' কাব্যে স্বর্ণকুমারী যে স্বকীয়তা দেখিয়েছেন সমালোচকের ভাষায় সেটি এই রকম,—"ভারতবর্ষীয় ইতিহাস অবলম্বনে রচিত অক্ষয়চন্দ্রের 'ভারতগাথা' একান্তভাবে বর্ণনাত্মক, সম্ভবত পাঠ্যগ্রন্থরূপে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে রচিত বলে গ্রন্থটির কবিতাগুলি বর্ণনাময়; কিন্তু ইতিহাসের অবলম্বনে স্বর্ণকুমারীর যে সকল গাথাকবিতা রচিত হয় তার মধ্যে সরল সাধারণ বর্ণনা অপেক্ষা কাহিনীবিন্যাসগত জটিলতা, চরিত্রচিত্রণকালে মনোবিশ্লেষণের প্রাধান্য, সুবিপুল ঔৎসুক্য এবং নাটকীয় গতির তীব্রতা উপলব্ধ হয়ে থাকে। এভাবে গাথাকবিতার ক্ষুদ্র পরিসরে আখ্যায়িকা-লেখক অক্ষয়চন্দ্র থেকে ঔপন্যাসিক স্বর্ণকুমারীর স্বাতন্ত্র্য সহজেই নির্ণীত হতে পারে।" (পৃ ৩২৯)।

আজকের বাংলা সাহিত্যের পাঠক স্মরণ রাখবেন 'গাথা' কাব্যের গাঁথা-হার দিয়েই 'ছোট ভাইটি'কে কবি আশীর্বাদ করেছিলেন এই বলে,—

যতনের গাথা-হার কাহারে পরাব আর ?
স্নেহের রবিটি, তোরে আয় রে পরাই,
যেন রে খেলার ভুলে ছিঁড়িয়ে ফেলো না খুলে,
দুরন্ত ভাইটি তুই—তাইতে ডরাই।

'গাথা-হার' এই শব্দযুগ্মের অন্তর্গত 'গাথা' শব্দটির শ্লেষ লক্ষণীয়। 'ছোট ভাইটি' এই 'গাথা-হার' কিছুদিন নিজকণ্ঠে স্থান দিয়েছিলেন। বস্তুত সেজন্যে তাঁর প্রস্তুতি চলছিল প্রায় বার বছর বয়স থেকে। ন-দিদির দীপনির্বাণ প্রকাশিত হবার পূর্বেই তিনি 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' লিখতে শুরু করেন। 'রুদ্রচণ্ড'কে তারই সম্প্রসারিত রূপান্তর বলে মনে করা হয়। তা সে রূপান্তর হোক বা না হোক এ তথ্য আখ্যানকাব্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অনুরাগের সাক্ষ্য বহন করে। আবার ন-দিদির প্রথম উপন্যাসের বিষয়বস্তুর সঙ্গে 'ভাইটি'র সেই 'বীররসাত্মক' প্রথম কাব্যের বিষয়বস্তুর মিলটিও লক্ষণীয়। এমন কথাও বলা যায় দিদি ও ভাই কিছুদিন যাবৎ প্রায় একই কালসীমার মধ্যে 'গাথা'র গ্রন্থনে নিরত ছিলেন। 'শৈশব সঙ্গীতে'র অন্তর্গত প্রতিশোধ, লীলা, অপ্সরা-প্রেম প্রভৃতি কয়েকটি কবিতার প্রকাশকাল লক্ষ্য করলে সেটা বোঝা যায়।.

স্বর্ণকুমারীর জীবদ্দশায় বসুমতী থেকে তাঁর গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়েছিল। জাতীয় সংগীত, ধর্ম-সংগীত, প্রেম-পারিজাত, প্রভাত-সংগীত, মধ্যাহ্ন-সংগীত, সন্ধ্যা-সংগীত, নিশীথ-সংগীত প্রভৃতির মধ্যে তাঁর গান ও কবিতা একত্র সংকলিত হয়েছে। সাহিত্যের অন্যান্য শাখায়, বিশেষত উপন্যাসে, স্বর্ণকুমারী যে খ্যাতি লাভ করেছিলেন কবিতার ক্ষেত্রে ততটা পান নি। কাব্য ও কবিতা সম্পর্কে তাঁর মৌলিক চিন্তার প্রকাশ দেখতে পাই অনেকগুলি সুলিখিত প্রবন্ধে। কাব্যের দেহনির্মিতির চেয়ে ভাবপ্রকাশের উপরই তিনি বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেন,—"ছন্দোবন্ধে যিনি পুস্তক লিখিতে পারেন তিনিই কবি নহেন, যিনি যতই ভাবুক তিনি ততই কবি।" (পৃ ৩৬২)।

লেখিকার মন্তব্য অংশত সত্য। কবিতার মূল্য ভাবের দিক থেকেই প্রধানত বিচার্য। মুখ্য লক্ষ্য যে ভাব সে সম্বন্ধে কোনো তর্কের অবকাশ নেই। কিন্তু সেই ভাবের আশ্রয় যে কথা সে তো একেবারেই উপেক্ষণীয় নয়। এ বিষয়ে কনিষ্ঠ ভ্রাতার মতামতটা আমাদের কাজে লাগতে পারে। তিনি বলেন,—"জ্ঞানের কথাকে প্রমাণ করিতে হয়, আর ভাবের কথাকে সঞ্চার করিয়া দিতে হয়। তাহার জন্য নানাপ্রকার আভাস-ইঙ্গিত, নানাপ্রকার ছলাকলার দরকার হয়। তাহাকে কেবল বুঝাইয়া বলিলেই হয় না, তাহাকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতে হয়। / এই কলাকৌশলপূর্ণ রচনা ভাবের দেহের মতো। এই দেহের মধ্যে ভাবের প্রতিষ্ঠায় সাহিত্যকারের পরিচয়। এই দেহের প্রকৃতি ও

গঠন অনুসারেই তাহার আশ্রিত ভাব মানুষের কাছে আদর পায়, ইহার শক্তি-অনুসারেই তাহা হৃদয়ে ও কালে ব্যাপ্তিলাভ করিতে পারে।…রচনা বলিতে গেলে ভাবের সহিত ভাবপ্রকাশের উপায় দুই সম্মিলিতভাবে বুঝায়; কিন্তু বিশেষ করিয়া উপায়টাই লেখকের।" —সাহিত্যের সামগ্রী: সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ। স্বর্ণকুমারীর কবিতায় যে ভাব প্রকাশ করার চেষ্টা হয়েছে তার প্রকাশের উপায়টি সর্বতোভাবে উপযোগী হয়েছে, কি হয় নি? পরিবেশিত ভাবগুলি যে দেহকে আশ্রয় করেছে তার ওই সব ভাবকে ধারণ করবার মত যথেষ্ট শক্তি আছে, কি নেই? যে ছন্দ যে সুর যে রঙ্ যে ইঙ্গিতের স্পর্শ পেয়ে প্রয়োজনের ভাষা ভাবের ভাষায় পরিণত হয় স্বর্ণকুমারীর কাব্যবাণীতে কি সেই সোনার কাঠির স্পর্শ লেগেছে? জীবনীকার কুণ্ঠার সঙ্গে জবাব দিয়েছেন,—"অবশ্য এইজাতীয় বিশিষ্ট আঙ্গিক পারিপাট্য তাঁর কাব্যে লক্ষিত হয় না সত্য, তথাপি কবিতা আস্বাদনকালে সেই ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রবল অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি; কোথাও কোথাও শব্দচয়নে কিংবা শব্দনির্বাচনে অসতর্কতা থাকলেও রসাস্বাদন-ব্যাপারে এবংবিধ দুর্বলতা বিশেষ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি।" সমালোচক কবির রচনারীতির ত্রুটি অস্বীকার করেন নি কিন্তু তাকে লঘু করে দেখাবার চেষ্টায় একটা আতিশয্যের ভাব দেখা যায়। "সমকালীন সকল শক্তিমান কবির কাব্যে এরূপ শৈথিল্য প্রায়ই পরিলক্ষিত হয়" বলে সমকালীন কবিদের অক্ষমতা প্রদর্শন করা হয়েছে—কিন্তু স্বর্ণকুমারীর গৌরব তাতে বৃদ্ধি পায় নি।

স্বর্ণকুমারীর সংগীতশিল্পে যে নৈপুণ্য ছিল তদ্বিষয়ে প্রমাণের অভাব নেই। সংগীত রচয়িতা হিসাবেই তাঁর প্রথম পরিচয় আমরা পাই। পিয়ানো বাজিয়ে যখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নূতন নূতন সুরের ইন্দ্রজাল রচনায় ব্যাপৃত, তখন তাঁর সেই সদ্যোজাত সুরগুলিকে কথা দিয়ে বাঁধবার চেষ্টায় যে তিনজন নিযুক্ত ছিলেন স্বর্ণকুমারী তাঁদের অন্যতম। গীতরচনার প্রসঙ্গে তাঁর জীবনীতে রবীন্দ্রনাথের অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে বারংবার। রবীন্দ্রজীবনকথার মধ্যেও এই গানের সূত্রেই তাঁকে দেখতে পাই। শাস্ত্রীয় রাগরাগিণী ও তাল মান সম্বন্ধে যে তাঁর বিশেষ জ্ঞান ছিল তার প্রমাণের অভাব নেই। (পৃ ৩৮১-৮৩)।

যাঁরা অনেক লেখেন তাঁদের একটা বিপদ এই যে পাঠক নির্বিচারে সব নেয় না। অনেক শ্রেষ্ঠ রচনাও শ্রেষ্ঠতরের আড়ালে পড়ে যায়। রবীন্দ্রজীবনেও তাই দেখেছি। স্বর্ণকুমারীর জীবনেও তাই ঘটেছে। তাঁর ভাবনার পরিধি যে কত বিস্তৃত ছিল তা ভাবলে অবাক্ লাগে। উপন্যাস গল্প কবিতা ও গানের সঙ্গে সঙ্গে তিনি গুরু গম্ভীর প্রবন্ধ এমন কি বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধও অনেক লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বঙ্কিম ছাড়া বঙ্গসাহিত্য-ব্যবসায়ী আর কোনো লেখকই বোধ হয় বিজ্ঞান সম্পর্কে এমন আন্তরিক অনুরাগ পোষণ এবং এমন গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন নি।

ভারতী সম্পাদনা এই মহীয়সী মহিলার আর এক মহৎ কীর্তি। আলোচ্য গ্রন্থে ভারতী পত্রিকা প্রসঙ্গে তাঁর সেই কীর্তির পরিচয় বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। ভারতী ঠাকুরবাড়িরই সৃষ্টি এ কথা সত্য, কিন্তু সে যে অকৃতজ্ঞ নয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস তা প্রমাণ করবে। ভারতীকে উপলক্ষ করে যত রচনা লেখা বা লেখানো হয়েছিল এবং ভারতীর মাধ্যমে যত রচনা এবং যে-জাতীয় রচনা প্রকাশিত হয়েছিল তার হিসাব নিলেই আমার বক্তব্য পরিস্ফুট হবে।

'স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য'— গ্রন্থটি ব্যক্তিজীবন সমালোচনার ক্ষেত্রে একটি উন্নত মান স্থাপন করবে বলে আমার বিশ্বাস। গ্রন্থটির আয়তন একটু বৃহৎ হয়েছে তার কারণটি লেখকের স্বভাবের মধ্যেই নিহিত। তথ্য সংকলনে তাঁর ক্লান্তি নেই এবং পাঠকের পক্ষে যা জ্ঞাতব্য বলে তিনি মনে করেন তা যতক্ষণ না সম্পূর্ণ হচ্ছে ততক্ষণ তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। আরও ভালো করার চেষ্টায় তাঁকে দুঃখ কিছু পেতে হয়েছে, গ্রন্থটি শেষ করে প্রকাশ করতে দীর্ঘকাল লাগল। কিন্তু সে দুঃখ নিরর্থক হবে না। ঠাকুরবাড়ির প্রসঙ্গ নিয়ে এর পরে যাঁরা কাজ করতে আসবেন বার আনা উপকরণ তাঁরা এই গ্রন্থেই পাবেন। শুধু তাই নয় সাহিত্যশিল্পীর জীবনসাধনার ইতিহাস হিসেবে গ্রন্থটি ভবিষ্যৎ গবেষকদের পক্ষে একটি আদর্শ ছকের (pattern) কাজ করবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
কলিকাতা
১৫ আগস্ট ১৯৭১

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য

নিবেদন

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের সমর্থ রূপদক্ষগণের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৬-১৯৩২) বিশিষ্টতম। তিনিই প্রথম কৃতী লেখিকা যিনি সবিশেষ আন্তর্জাতিক খ্যাতি-প্রতিপত্তি অর্জন করেন। বিদেশীর সমালোচনা-মানে উত্তীর্ণ তাঁর কয়েকটি অনূদিত গল্প-উপন্যাস-নাটক, কন্টিনেন্টাল পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত কিছু রচনা, দেশবিদেশের নিরপেক্ষ সমালোচকের প্রশংসাধন্য কোনো কোনো ইউরোপীয় সাহিত্যিকের তুলনায় তাঁর কৃতিত্বের স্বীকৃতি ইত্যাদি থেকে উল্লিখিত সিদ্ধান্ত সমর্থিত হতে পারে। অথচ সম্প্রতি তিনি বিস্মৃতপ্রায়। এক প্রান্তে বঙ্কিমচন্দ্রের উপস্থিত ঔজ্জ্বল্য আর অন্য দিগন্তে রবীন্দ্রনাথের পৌনঃপুনিক চমৎকার এই বিস্মরণের প্রত্যক্ষ কারণ। উক্ত হারিয়ে-যাওয়া বিশিষ্টতাটুকুর পুনরুদ্ধারের জন্য সমসাময়িক পূর্বাপরের বিচার-বিশ্লেষণ অপরিহার্য, এবং সেই বিচার সম্ভব হলে বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির নিকট স্বর্ণকুমারী কতটা নিয়েছেন আর রবীন্দ্রনাথ প্রমুখকে কতখানি দিতে পেরেছেন তা স্পষ্ট হতে পারে।

প্রস্তাবিত অবকাশের প্রতি লক্ষ রেখে 'স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য' রচিত হল। স্বর্ণকুমারীর জীবনকথা ও সাহিত্যসাধনার বিস্তারিত পরিচয় তুলে ধরাও এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। এ সম্পর্কে কোনো প্রশস্ত আলোচনা-গ্রন্থ আজও প্রকাশিত হয়নি। তাই প্রাথমিক স্তরে তথ্য আহরণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, এবং শেষ পর্যন্ত ঐ সকল তথ্যের ভিত্তিতে লেখিকার সাহিত্যকৃতিকে সমগ্রভাবে পর্যালোচনার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও নির্ভরযোগ্য উপকরণ সর্বত্রই প্রাধান্য পেয়েছে, ক্ষেত্রবিশেষে স্বল্প এবং স্বতোবিরোধী তথ্যের বিশ্লেষণের মাধ্যমে গ্রাহ্য ও পরীক্ষামূলক (tentative) সিদ্ধান্তগুলি নির্ণীত।

গ্রন্থের 'প্রথম পর্বে' স্বর্ণকুমারীর জীবনকথা বর্ণিত হল। রেনেসাঁসের ফ্লোরেন্টাইন মেদিসিগোষ্ঠীর মত জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি উনিশ শতকের বাংলা দেশে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন প্রসঙ্গে স্বর্ণকুমারী-স্বীকৃত পারিবারিক ও সামাজিক রিক্থ-উত্তরাধিকারের কথাটি প্রথমে সংক্ষেপে বলে নেওয়া হয়েছে। এর পর জীবনের ঘটনাবলীর পরিচয় প্রদানকালে তাঁর মেজাজ-মনন-মানসতার বৈশিষ্ট্যাদি এবং শিল্পীমনের উন্মেষ ও ক্রমবিকাশ পরিলক্ষিত। গ্রন্থের 'দ্বিতীয় পর্বে' স্বর্ণকুমারীর সাহিত্যকর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে সমগ্র রচনাকে উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক ও প্রহসন, কবিতা, গান, প্রবন্ধ প্রভৃতি পৃথক পৃথক পর্যায়ে বিভক্ত করে প্রতিটি পর্যায়ের সাহিত্যগত উৎকর্ষ নিরীক্ষিত হয়েছে। 'পরিশিষ্টে' প্রদত্ত বিষয়গুলি মূল গ্রন্থের সঙ্গে কোনো-না-কোনোভাবে সম্পৃক্ত। সর্বশেষে 'নির্দেশিকা' দেওয়া হল।

'স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য' নামক এই গবেষণা-কর্মের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে ডি. ফিল. উপাধি প্রদান করেন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের ভূতপূর্ব রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক এবং আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগের প্রধান মাননীয় ড. শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য নির্দেশকরূপে বর্তমান গবেষণায় অধ্যক্ষতা করেছিলেন। পূজ্যপাদ আচার্য গ্রন্থটির যে ভূমিকা লিখে দিয়েছেন তা আশীর্বাদের মতই শিরোধার্য হয়ে রইল।

পরলোকগত অধ্যাপক ড. বিমানবিহারী মজুমদার, ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত ও ড. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রেরণা ও উৎসাহ দানের কথা আজ বারবার মনে পড়ছে। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ড. শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ড. শ্রীউপেন্দ্রকুমার দাস, ড. শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, ড. শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল প্রমুখ বিদ্বজ্জন প্রথমাবধি নিরন্তর উৎসাহ ও উপদেশ দিয়ে এসেছেন। শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, ড. শ্রীগোপিকানাথ রায়চৌধুরী ও ড. শ্রীরবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট কোনো কোনো বিষয়ে আলোচনা করে বড়ই উপকৃত হয়েছি। শ্রীঅমিত্রসূদন ভট্টাচার্য আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, এসিয়াটিক সোসাইটি, ন্যাশনাল লাইব্রেরি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান থেকে সর্ববিধ সুযোগ-সুবিধা পেয়েছি। বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রসদন ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার আমাকে অকৃপণভাবে সাহায্য করেছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. শ্রীবিমলকুমার দত্ত, শ্রীরণজিৎ রায়, শ্রীরমারঞ্জন ভট্টাচার্য, শ্রীসিতিকণ্ঠ ভট্টাচার্য এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মীদের ঋণ অপরিশোধ্য।

বিশ্বভারতী বিশেষ যত্ন সহকারে গ্রন্থটির প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন, এজন্য কৃতজ্ঞ বোধ করছি।

কোজাগর ১৩৭৮ পশুপতি শাশমল

প্রথম পর্ব

স্বর্ণকুমারীর জীবনকথা

জোড়াসাঁকো ঠাকুরপরিবার ও স্বর্ণকুমারী

১

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাবধি বিবিধ কারণবশত কলিকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং বিভিন্ন দিক থেকে ঠাকুরপরিবার ক্রমে বাঙালির আশাভরসাস্থলে পরিণত হয়। ইতিমধ্যে কলিকাতা থেকে আধুনিক যুগোপযোগী ভাবনাসমূহ সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করে। প্রাচীন এথেন্সের মত পলাশীযুদ্ধ-পরবর্তীকালে বাংলাদেশ ভারতবর্ষের শিক্ষকতা করেছে, আধুনিক জীবনের প্রাণস্রোত এই গঙ্গোত্রী থেকে দেশের শিরায় উপশিরায় সঞ্চারিত হয়।

তৎকালে বাংলাদেশের মধ্যে যে ব্যাপক জাগরণ দেখা দেয় তার প্রাণকেন্দ্র ছিল কলিকাতা। ইংরেজগণের বঙ্গবিজয়ের পর কলিকাতাকে কেন্দ্র করে তার চতুষ্পার্শ্বে একটি নূতন জীবনবোধের অভ্যুদয় হয়, এই নবজাগ্রত নাগরিকতা তার সমূহ শুভাশুভ নিয়ে বঙ্গসংস্কৃতির নবপর্যায়ের সূচনা করেছিল। পলাশীযুদ্ধের পরবর্তী অষ্টাদশ শতাব্দী বিশেষত উক্ত শতকের অন্ত্যপাদ বিশৃঙ্খলা অব্যবস্থা ও প্রশাসনিক পরিবর্তনের যুগ, তথাপি এই দুরবস্থার মধ্যে আধুনিক যুগের হৃদস্পন্দন অনুভূত হয়। ইংরেজের প্রতিযোগিতাহীন অবাধ বাণিজ্যনীতি বনিকবৃত্ত বাঙালির সঙ্কটকে অধিকতর ঘনীভূত করে এবং বংশানুক্রমিক বৃত্তি ও উপজীবিকা থেকে সে সমূলে উৎপাটিত এবং পরিচিত অভ্যস্ত জীবনাশ্রয় থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়; পক্ষান্তরে এই দেশব্যাপী জীবনবোধের বিপর্যয় ও ধ্বংসস্তূপের উপর নব্যবাণিজ্যনীতি-সম্ভূত উদ্যোগী ও সৌভাগ্যকামী দেওয়ান-বেনিয়ানরূপী হঠাৎ-নবাবগণ অভিনব আভিজাত্য ও সংস্কৃতির বীজ বপন করে। বিদেশীর প্রথম সাক্ষাৎকার-জনিত বিস্ময় ভঙ্গের পর তাদের চিত্তাকর্ষক সাহচর্যের জন্য এই নবজাতক অভিজাতগণ যে ঔৎসুক্য প্রকাশ করতে থাকেন তার অনিবার্য পরিণাম সাংস্কৃতিক হুড্‌কার। কালক্রমে অপরিণামদর্শী পঙ্গপালের উৎকট উৎসাহ অবসাদগ্রস্ত হতে থাকে। বিদেশীর সান্নিধ্যে বাঙালিমনের জগৎ ও জীবনের পরিধি বিস্তৃততর হল এবং বৈদেশিক বাণিজ্যকেন্দ্রিক জীবনস্রোতের স্ফীতি-সঙ্কোচ রহস্যবিষয়ে তার অস্পষ্ট আগ্রহ অনুভূত হতে লাগল; তাছাড়া ভূম্যধিকার এবং জমিস্বত্বের পরিবর্তিত আইনবিধি প্রবর্তনের ফলে তার বৈষয়িক বুদ্ধিবৃত্তিও প্রখরতর হতে থাকে। প্রথম পর্যায়ে বাঙালিমানসের আধুনিকতার বিচ্ছিন্ন ও অসম্পূর্ণ বিকাশ এইসব দিক থেকে পরিলক্ষিত হতে পারে।

'পতঙ্গবদ্‌ বহ্নিমুখং বিবিক্ষু' দেশীয় অত্যুৎসাহী ভাগ্যান্বেষী-সম্প্রদায় বা আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী হঠাৎ-নবাববর্গ, দ্বৈতশাসনের ছিদ্রপথে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকারলোলুপ

বহিরাগত বণিকসমাজ প্রভৃতি প্রত্যেকে এই নবোদ্ভূত জীবনবেদের মন্ত্র উচ্চারণ করেছিল নিজেদের মনোভঙ্গী নিয়ে ; ঐ একই সূত্রাবলম্বনে অনিবার্যের মত মধ্যবিত্ত শ্রেণী আর বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠীর স্বাধিকার-প্রমত্ততার ইতিহাস পরবর্তী সময়ে যে বিস্ময়কর নবজাগরণকে সম্ভব করে তুলেছিল কলিকাতা সেই আন্দোলনের আদিপীঠ। নবজাগ্রত কলিকাতায় বিশিষ্ট নাগরিক মানসিকতার যে পীঠস্থান প্রস্তুত হয়েছিল তার প্রারম্ভিক পর্যায়ে ঠাকুর-পরিবার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। মধ্যযুগীয় অন্ধকারে তন্দ্রামগ্ন ভারতবর্ষের প্রথম সূর্যোদয় তখন হয়েছে বাংলাদেশে, সেই ব্রাহ্মমুহূর্তে উক্ত পরিবার ভোরের পাখির মত নবজাগরণের সূর্যবন্দনা করেছিল ; কিন্তু বৈতালিকের গীতরচনাতেই তাঁদের কর্তব্য সমাপ্ত হয়ে যায় নি, শক্তিমান নায়কের মত প্রতিবন্ধসমূহ দূর করে দিয়ে অপূর্ব জীবনক্ষেত্রে সূর্যবীজ বপন করেছিলেন তাঁরা। অবশ্য এই পরিবার প্রথম আলো জ্বালবার আয়োজন করে নি তথাপি এরাসমাস-রামমোহনের আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে মধ্যযুগোচিত তমিস্রার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল।

২

ঠাকুরগোষ্ঠীর ইতিহাস ও ঐতিহ্যকথা প্রসঙ্গত স্মরণীয়। সম্ভবত যশোর-খুলনা থেকে কলিকাতায় স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্ববর্তীকাল থেকে ভারতবর্ষের বিশিষ্ট পরিবারভুক্ত সন্তানরূপে তাঁরা চিহ্নিত হয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বীকার করেছেন যে তাঁর পূর্বপুরুষ বেণীসংহার-রচয়িতা ভট্টনারায়ণের নাম তিনি তাঁর কর্মস্থলে নানাপ্রসঙ্গে শুনতে পেয়েছিলেন ; এতদ্ব্যতীত হলায়ুধ জগন্নাথও সেখানে বিখ্যাত ছিলেন।[১] কিন্তু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও মিঃ ফারেল লক্ষ্মণসেন দেবের মন্ত্রী ও ব্রাহ্মণসর্বস্ব-রচয়িতা হলায়ুধকে ঠাকুরগোষ্ঠী বা পিঠাভোগের সুশিক্ষ-শ্রোত্রিয় কুশারীবংশের পূর্বপুরুষরূপে উল্লেখ করলেও এ সিদ্ধান্ত তর্কাতীত নয় কারণ ব্রাহ্মণসর্বস্বে আত্মপরিচয় প্রদানকালে যেহেতু হলায়ুধ আপনাকে বাৎস্যগোত্রীয় বলে বর্ণনা করেছেন সেহেতু বাৎস্য হলায়ুধের পক্ষে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ঠাকুর বংশের আদিপুরুষ হওয়া অসম্ভব।[২] পরবর্তী সময়ে ঠাকুরগোষ্ঠীর অন্যতম পূর্বপুরুষ

---

১ ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী, পুরাতনী, ১৮৭৯ শক, সত্যেন্দ্রনাথ লিখিত 'স্ত্রীর প্রতি পত্র', সংখ্যা ৩৩, পৃ ১২৮।

২ নগেন্দ্রনাথ বসু ও ব্যোমকেশ মুস্তফী, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—ব্রাহ্মণ কাণ্ড ৩য় ভাগ, পীরালী ব্রাহ্মণ-বিবরণ ১ম খণ্ড, ব্রাহ্মণকাণ্ডের ৩ঠ অংশ, পৃ ২৭১, ৯ সংখ্যক পাদটীকা। গ্রন্থকারের মতে প্রসন্নকুমারের সংগৃহীত একটি পুস্তিকা, রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দ্বারা প্রকাশিত বেণীসংহার নাটকের ভূমিকায় লিখিত বংশপরিচয় এবং জেমস ফারেল প্রণীত গ্রন্থ ঠাকুরগোষ্ঠীর বংশলতা নির্মাণের পক্ষে অপরিহার্য। দ্র বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, পৃ ২৬৩, ৮ সংখ্যক পাদটীকা।

পিঠাভোগের জমিদার শুদ্ধ-শ্রোত্রিয় জগন্নাথ কুশারী পীরালিদুহিতার পাণিগ্রহণ করে জাতিচ্যুত হলেন।[৩] বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসে এই ঘটনার প্রভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী কারণ তদানীন্তন বিধর্মী রাজশক্তির অনুগ্রহপুষ্ট ও সমাজচ্যুত আদিপীরালি গুড়ী শুকদেব রায়চৌধুরীর আত্মীয়তা অর্জন করে জগন্নাথ অপাঙ্‌ক্তেয় পীরালিতে পরিণত হলেও বিশাল জগৎ এবং বিপুল জীবনের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায় তাঁর পারিবারিক প্রতিপত্তি ও প্রসারের সম্মুখে। সংস্কারাচ্ছন্ন সঙ্কীর্ণতা থেকে বর্ণোচিতসংস্কারবিহীন অধস্তন পুরুষ প্রাণচাঞ্চল্যে ও স্বাভাবিকতায় অনেক বেশি সমৃদ্ধ হতে পেরেছিলেন; পরিবারের অন্যতম উদ্যোগী পুরুষসিংহ পঞ্চানন প্রথম কলিকাতার নাগরিক জীবনরস ও আধুনিকতার আস্বাদ লাভ করলেন, ধীরে ধীরে উক্ত গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত ও মর্যাদামণ্ডিত হয়ে উঠতে লাগল।

ঠাকুর উপাধি বা পদবীর অভ্যুদয়ের ইতিহাস-চর্চাকালে সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন যে তাঁর কর্তাদাদার কর্তাদাদার কর্তাদাদা পঞ্চানন যশোর থেকে কলিকাতার নিকট বাস করতে এসে ইংরেজদের কর্ম করাতে 'ঠাকোর' পদবী পেয়েছিলেন।[৪] এই ধারণার পশ্চাতে কর্মযোগী পঞ্চাননের অস্তিত্ব নিহিত থাকলেও ব্যাখ্যাটি সর্ববাদিসম্মত নয়। সম্ভবত দেশান্তরী ব্রাহ্মণ পঞ্চানন 'ঠাকুর' উপাধি পেয়েছিলেন অন্ত্যজ ও অনভিজাত প্রতিবেশী এবং অধীনস্থ কর্মচারী কিংবা শ্রমিকের ভীতিমিশ্রিত শ্রদ্ধাবোধ থেকে। ব্রাহ্মণবংশীয় পূজনীয় শিক্ষাচার্য অথবা পুরোহিতকে সম্ভ্রম জ্ঞাপনের নিমিত্ত ঐভাবে অভিহিত করা হয়, এই স্বাভাবিক কারণবশত পঞ্চানন কুশারী কলিকাতার সমাজে ঠাকুররূপে পরিচিত হয়েছিলেন। কথিত উপাধির এবম্বিধ উদ্ভবহেতুব্যাখ্যা অমূলক নয়। আবার কেউ কেউ মনে করেন, ১৬৯০ খৃস্টাব্দে যশোর ত্যাগ করে পঞ্চানন কলিকাতায় বসতিস্থাপন করেন, স্থানীয় বণিককুল তাঁকে ঠাকুরমশাই বা Reverend Sir রূপে সম্বোধন করতেন এবং ক্রমে তিনি ঠাকুররূপে পরিচিত হতে থাকেন।[৫] পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই মন্তব্যের ঈষৎ পরিমার্জন করতে চেয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য: ঠাকুর মশাই এর অর্থ পূজনীয় ব্রাহ্মণ, এর অনুবাদ Revered Sir ঠিক নয়, হওয়া উচিত Revered Brahmin; ব্রাহ্মণেতর জাতির নিকট বর্ণবাচক

---

৩ ঐ পৃ ২৭৩-৭৫। এ বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথের মন্তব্য ভ্রমপূর্ণ: "পুরুষোত্তম নামক আমাদের পূর্বজ হইতে আমরা পীরালী হইয়াছি।" দ্র পুরাতনী, পৃ ১২২-২৩। "প্রবাদ আছে যে পুরুষোত্তম এক মুসলমান রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন—আমাদের পীরালী হইবার মূল এইরূপ কোন ঘটনা হইবে।" ঐ পৃ ১৩১। সত্যেন্দ্রনাথের সংশয় লক্ষণীয়।

৪ পুরাতনী, পৃ ১২২, পত্রসংখ্যা ৩১, মাদ্রাজ ১১ আগস্ট ১৮৬৮।

৫ Tagore Genealogy, The Calcutta Municipal Gazette: Tagore Memorial Special Supplement, September 13, 1941, edited by Amal Home, Part II, A.

ব্রাহ্মণ অর্থে 'ঠাকুর' গ্রাহ্য এবং এর ইংরেজিরূপ 'টেগোর' পরে উপাধিতে পরিণত হয়েছিল।[৬] সরকারী কাগজপত্র থেকে প্রমাণিত হয় ১৭৫৮ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বরের পূর্বেই তাঁরা কলিকাতার সমাজে ঠাকুর বা Tagoor রূপে পরিচিত হয়েছিলেন।[৭] সে যা হোক কলিকাতাস্থ নূতন আবাসস্থলের মধ্যে মৎস্যব্যবসায়ী ধীবর-কৈবর্ত ও বণিকবৃত্ত পুণ্ড্রের প্রাধান্য থাকায় তারা মহা আগ্রহে একমাত্র উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণপরিবারকে গ্রহণ করে এবং এদের নিকট পঞ্চানন ঠাকুরমশাই রূপে অভিহিত হতে থাকেন। সেই ঠাকুর আখ্যাতেই তাঁরা ইংরেজ বা বিদেশী বণিকের নিকট পরিচিত হলেন; অর্ডার দেওয়া বিল করা প্রভৃতি সমুদয় বৈষয়িক কর্ম উক্ত নামেই হত, বিদেশীরাও তাঁদের ঐ উপাধিতে সম্বোধন করতেন। এবং এভাবে কথিত উপাধি প্রচলিত হয়ে গেল।[৮] এমন মনে করারও যথেষ্ট অবকাশ আছে যে হয়ত পীরালি কুশারীর কাছে এই নবার্জিত ঠাকুর পদবী নিতান্ত অনভিপ্রেত ছিল না। এরূপ ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য নচেৎ সত্যেন্দ্রনাথের বক্তব্য অনুসারে কেবল ইংরেজদের কর্ম করাতে ঠাকুর পদবী পাওয়া তেমন বিশ্বাস্য বা সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

বিদেশাগত বণিকবৃন্দের কর্মচঞ্চল জীবনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করার দুঃসাহসের মধ্যে কুশারী থেকে ঠাকুর উপাধিতে পরিবর্তিত হওয়ার ইতিহাস প্রচ্ছন্ন। বিভিন্ন ঐতিহাসিক দলিল-দস্তাবেজ কাগজপত্র থেকে প্রমাণিত হয়েছে পঞ্চানন বিদেশী বণিকের জাহাজে সরবরাহকারের ব্যবসায়ে অর্থোপার্জন আরম্ভ করেন ও পরবর্তীকালে ইংরেজ দুর্গের সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করতে থাকেন। পঞ্চাননের পুত্রদ্বয় জয়রাম ও সন্তোষরাম বা রামচন্দ্র ওরফে রামসন্তোষ ইউরোপীয়গণের সাহচর্য লাভ করে ইংরেজি শিখেছিলেন এবং তৎকালীন বৈষয়িক ব্যাপার-নির্বাহোপযোগী পারসী বিদ্যায় সবিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। পঞ্চাননের প্রতিপত্তি ও অনুরোধের জোরে জয়রাম কোম্পানির সরকারের বেতনবিভাগের অধ্যক্ষের অধীন প্রধান কর্মচারীর পদ পেলেন; স্বকার্যে যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে ইংরেজ আমলের প্রথম জরীপের সময় (১৭০৭ খৃস্টাব্দ বা ১১১৪ সাল) প্রধান আমীনের

৬ রবীন্দ্রনাথের বংশলতায় অনুভূতিমূলক ভ্রম, প্রবাসী বৈশাখ ১৩৫০, পৃ ২৪।

৭ Consultations, September 18, 1758, Rev. Long's Selections from Unpublished Records, 1748-1767, p 149. দ্র বিনয় ঘোষ, ঠাকুরপরিবারের আদিপর্ব ও সেকালের সমাজ, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৮শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, পৃ ৩১০।

৮ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, পৃ ২৭৭-৭৯। ২৭৯ পৃষ্ঠার পাদটীকায় আছে, "করেন বলেন, তখনকার সাহেবেরা ঠাকুর শব্দটি Taguore এইরূপে লিখিতেন, ক্রমে তাহাই Tagore রূপে পরিণত হইয়াছে।" সম্ভবত কারেন্সের গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে এরূপ বক্তব্য পরিত্যক্ত; উক্ত সংস্করণের বর্তমান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, Panchānana, the fifth in descent from Bolorām, appears to have been the first member of the family who received the title of Thākur, which in its corrupted form of Tagore, they still continue

পদমর্যাদা লাভ করেন,[৯] এ ব্যাপারে তাঁর একমাত্র সহযোগী ছিলেন কনিষ্ঠ ভ্রাতা সন্তোষরাম। মারাঠা খাল খননকার্যে অন্যতম পরিদর্শক নিযুক্ত হন আমীন জয়রাম।[১০] আবার ক্লাইভ যখন নূতন ফোর্ট উইলিয়ম নির্মাণ করেন তখন জয়রামের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র গোবিন্দরামই তার পরিদর্শক ছিলেন।[১১] জয়রামের পিতৃব্য কৃষ্ণচন্দ্র কোম্পানির অধীনে কোনো কর্ম না করে ইংরেজদের সরাসরি জিনিসপত্র সরবরাহের ব্যবসা করতে থাকেন। ১৭৬৫ খৃস্টাব্দে কোম্পানি বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করার পর ক্লাইভের আমলে জয়রামের পুত্র নীলমণি উড়িষ্যার কালেকটরের অধীন সেরেস্তাদার হলেন। ভ্রাতা দর্পনারায়ণও হুইলার সাহেবের দেওয়ানি করে[১২] স্বাধীন ব্যবসাদির মাধ্যমে বিলক্ষণ অর্থোপার্জন করেছিলেন, জানা যায় তিনি সাধারণভাবে ফরাসি কোম্পানির দেওয়ানি এবং কখন কখন কন্ট্রাকটরের কাজ করতেন।[১৩] নীলমণির পুত্রগণের মধ্যে প্রখর বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন রামলোচন, কলিকাতা পুলিশ বিভাগের প্রধান বাঙালি কর্মচারী রামমণি ও কটক আদালতের কর্মে নিযুক্ত রামবল্লভের নাম উল্লেখযোগ্য। ইংরেজিতে কৃতবিদ্য রাধানাথ কটকে পিতৃব্য রামবল্লভের সহকারী ছিলেন কিন্তু পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের হিসাব-বিভাগের প্রধান পদে অধিষ্ঠিত হন। প্রসঙ্গত দ্বারকানাথের কর্মময় জীবনকথাও স্মরণীয়। বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রমানাথ আলিপুর কালেকটরের কর্মচারী ও পরে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছিলেন।[১৪] অর্থাৎ বহুকাল যাবৎ ইংরেজ ও ফরাসি এই দুই শ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় জাতির সঙ্গে নানাদিক থেকে ঠাকুরপরিবারের যে নিবিড় সংযোগ ঘটেছিল

to bear. James W. Furrell, The Tagore Family : a memoir, Calcutta 1892, p 20. পরিবর্তিত হলে ব্যাপারটির গুরুত্ব বর্ধিত হয়।

৯ বিলাতে দ্বারকানাথের মৃত্যুর (১২৫৩) পর ৩ আগস্ট, ১৮৪৬ তারিখের টাইমসে প্রকাশিত বিবরণে জয়রাম সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে তিনি held the office of Ameen of the 24 Perganahs, and head native revenue-supervisor, previous to and at the time of the capture of Calcutta, in 1756. He was a man of opulence and reputation.

১০ দ্র বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, পৃ ২৮৪, ১৬ সংখ্যক পাদটীকা।

১১ ঐ পৃ ২৮০, ১৯ সংখ্যক পাদটীকা। মন্ট্রিও লিখিত হিন্দু আইন ঘটিত মামলা সমূহের বিবরণ বিষয়ক গ্রন্থের (William Austin Montriou, Cases of Hindu Law before H. M. Supreme Court, from A. D. 1810 to 1840 inclusive etc., Calcutta D' Rozario & Co., 1861) ৫২০ পৃষ্ঠায় এসকল তথ্য আছে।

১২ কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত সম্পাদিত কিশোরীচাঁদ মিত্রের 'দ্বারকানাথ ঠাকুর', ১৯৬২, দ্র সম্পাদকীয় 'প্রসঙ্গ কথা', পৃ ২৫৩।

১৩ Narendra Krishna Sinha, The Economic History of Bengal, vol. II, 1962, p 221.

১৪ ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রমানাথ, মাসিক বসুমতী জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪, পৃ ১৯২-৯৩।

উপর্যুক্ত তথ্যাবলী থেকে তা সমর্থিত হয়। ফলত বিধর্মী ক্ষত্রিয়ের সান্নিধ্যের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যবুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও বৈশ্যবুদ্ধির চাতুর্য সংমিশ্রিত হওয়ায় এই পরিবার অচিরে ধনাঢ্য ও অভিজাত হয়ে উঠল।[১৫]

ব্যবসাবাণিজ্য এবং সরকারী কার্যনির্বাহের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা আধুনিক ও নবাগত বিদেশীয় শাস্ত্রবিদ্যায় শিক্ষিত দীক্ষিত হয়ে উঠছিলেন ক্রমশ। ইতিহাস থেকে পূর্বপুরুষের মার্জিত মন ও রুচির যে পরিচয় পাওয়া যায় তা আকস্মিক নয়, ধারাবাহিক ও বংশানুক্রমিক। দর্পনারায়ণের ইংরেজি ও ফরাসিজ্ঞান ছিল বিখ্যাত; গোপীমোহন আবার পোর্তুগীজ ভাষাও জানতেন।[১৬] রামলোচনের জীবনে বেশভূষার পারিপাট্য সান্ধ্যভ্রমণ সংগীতানুরাগ বিশেষত কবিগান ও কালোয়াতি গানের পৃষ্ঠপোষকতা প্রভৃতি সেকালের আভিজাত্যের লক্ষণ বিদ্যমান। রাধানাথ ছিলেন সে যুগের ইংরেজি শিক্ষায় কৃতী ব্যক্তি। দ্বারকানাথের বদান্যতা ও সৌন্দর্যপ্রীতি তথা বিলাসিতা ও সৌন্দর্যসম্ভোগের অপরিসীম অসামান্য ক্ষমতা তাঁকে রূপকথার রাজপুত্রে পরিণত করেছে। কেবল পুরুষ নয়, সেকালের অন্তঃপুরের অসহায় বিধবা রামপ্রিয়া দেবী আত্মীয়স্বজনের পরামর্শে কলিকাতায় নবপ্রতিষ্ঠিত সুপ্রিম কোর্টে (১১৮০ সাল বা ১৭৭৩ খৃস্টাব্দ) নীলমণি ও দর্পনারায়ণের নামে বিষয় বিভাগের জন্য ১১৮৯ সালে (১৭৮২) যে নালিশ করেন তা-ই হল ইংরেজ আদালতে ঠাকুরগোষ্ঠীর প্রথম মোকদ্দমা, হিন্দু বিধবার দায়াদাধিকারঘটিত মামলা সম্ভবত সুপ্রিম কোর্টে এই প্রথম; রামপ্রিয়ার তীক্ষ্ণ বৈষয়িক জ্ঞান ও স্নেহপরায়ণতা এবং স্বাত্মনির্ভর বুদ্ধিমত্তা সেকালের পক্ষে দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিল।[১৭] সূক্ষ্ম সাংসারিক জ্ঞানসম্পন্ন দূরদর্শী রামলোচন তাঁর উইলে দত্তকপুত্র দ্বারকানাথের প্রতি যে নির্দেশ দেন তার একাংশ এরূপ: "এখনও তুমি নাবালক একারণ এই জমিদারি ওগায়রহ জে কিছু বিসয় তোমাকে দিলাম ইহার কর্ম্মকার্য্য জাবত আমি বর্ত্তমান থাকিব তাবৎ আমিই করিব আমার অবর্ত্তমানে জাবত তুমি বয়সপ্রাপ্ত না হও তাবৎ

---

১৫ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড, সংশোধিত সং ১৩৬৭, পৃ ১৫।

১৬ Not only, however, do we find the Tagores conspicuous among the earliest Indian students of the English language and literature, but we shall look in vain among their countrymen for more brilliant examples of success in the practical application of such studies than their ranks have produced. Long before knowledge of English had become a recognised passport to preferment in the public service, or the Government had afforded any special facilities for its acquisition, Darpa Narayan Tagore was a proficient not only in that language but also in French; his son, Gopee Mohun Tagore was equally well versed in English, French, Portuguese, Persian and Urdu......etc. The Tagore Family, pp 8-9.

১৭ ব্র বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, পৃ ৩০১—০২, ৩১ সংখ্যক পাদটীকা।

পরগণাদিগর এ সকল বিষয়ের কর্ম্মকার্য্য ও সহী দস্তখত বা বন্দবস্ত ও হুকুমহাকাম সকলি তোমার মাতা করিবেন তুমি প্রাপ্তবয়স হইলে জমিদারিদিগর আপন নামে হুজুর লেখাইয়া এবং আপন একারে আনিয়া জমিদারির ও সংসারের কর্ম্মকার্য্য ও জমিদারির বন্দবস্ত ও খরচপত্র ওগায়রহ তোমার মাতার অনুমতি ও পরামর্শে তুমি করিবা এবং জাবত তোমার মাতা বর্ত্তমান থাকিবেন তাবত পরগণার মুনাফা ওগায়রহ জে কিছু আমদানির তহবিল তোমার মাতার নিকট জেমন আমি রাখিতাম তুমিও সেইমত রাখিবা।"[১৮] স্পষ্টত উপলব্ধ হয় পর্দার অন্তরাল থেকে রামলোচনের পত্নী অলকাসুন্দরী দেবী বিষয়কার্য তত্ত্বাবধানে সমর্থ ছিলেন, তাই তাঁর অভিভাবকত্ব নাবালক দ্বারকানাথের রক্ষাকবচস্বরূপ পরিগণিত এবং তত্ত্বাবধানযোগ্যতা সকল প্রশ্নের উর্ধ্বে। দ্বারকানাথের পত্নী দিগম্বরী দেবীর তেজস্বিতার পরিচয় পাওয়া যায় স্বামীর পাশ্চাত্ত্য জাতি-প্রীতির প্রতিবাদে।[১৯] সারদা দেবীর স্বাভাবিক কর্ত্রীত্বশক্তি দেবেন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে সুবৃহৎ পরিবারের সুষ্ঠু পরিচালনায় মধ্যে প্রকাশিত এবং তা একান্তভাবে উক্ত পরিবারোচিত।[২০] এমনকি এই বংশের সর্বসাধারণের বাগ্‌ভঙ্গি বেশভূষা ও আদবকায়দার মধ্যে একটা বিশেষ মোগলাই পারিপাট্য ও আভিজাত্য সুরক্ষিত ছিল; রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য, "আমাদের ভাষায় একটা কিছু ভঙ্গী ছিল কলকাতার লোক যাকে ইসারা করে বলত ঠাকুরবাড়ির ভাষা। পুরুষ ও মেয়েদের বেশভূষাতেও তাই, চালচলনেও।"[২১]

বিগত শতাব্দীর ঠাকুর পরিবারের যে বিপুল ঐশ্বর্য তা কেবল উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নয়, দ্বারকানাথ পর্যন্ত প্রত্যেকের বুদ্ধি ও শ্রমের বিনিয়োগে বিনিময়ে সেই শ্রীসম্পদ ক্রমশ পুঞ্জীভূত। সমকালীন কলিকাতার ধনাঢ্যসমাজ থেকে তাঁদের এই স্বাতন্ত্র্য অনস্বীকার্য, বিশেষত ইউরোপীয় জাতিসমূহের ব্যবসাবাণিজ্যের সঙ্গে তাঁদের আন্তরিক সহযোগের ব্যাপারটি সমকালীন কলিকাতার অপর কোন অভিজাত বংশের ইতিহাসে তেমন পাওয়া যায় না। কেবল বৃত্তি নয়, শ্রেষ্ঠ দুটি ইউরোপীয় শক্তির সান্নিধ্য ও মানসিক নৈকট্য উক্ত পরিবারকে মধ্যযুগীয় ধারণা ভাবনা ও সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আত্মরক্ষার সামর্থ্য দান করেছে। ব্যবসাবাণিজ্যে শিক্ষাদীক্ষায় আচারআচরণে সমাজ পরিবার ও ব্যক্তিজীবনের সর্বত্র তাই তাঁরা পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার সঙ্গে অনায়াসে সংযোগ স্থাপন করেছেন। সামাজিক দিক

---

১৮ দ্বারকানাথ ঠাকুর, পৃ ২৩০।

১৯ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জন্মকথা, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা জ্যৈষ্ঠ ১৮৩৮ শক, পৃ ২৮।

২০ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রকথা, ১৩৪৮; দ্র রবীন্দ্রজীবনী ১ম, পৃ ১২, ২ সংখ্যক পাদটীকা

২১ রবীন্দ্র-জয়ন্তী, প্রবাসী মাঘ ১৩৩৮, পৃ ৪১০।

থেকেও এই পরিবারটি ছিল স্বতন্ত্র। বর্ণাশ্রম ধর্মের সঙ্কীর্ণতার ফলে তখন হিন্দুগণের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া ও রক্ষণশীলতা দেখা দেয় তার ফলে পীরালিগণ সমাজের মধ্যে ব্রাত্যপতিতরূপে পরিগণিত হতে থাকে। এই দলাদলির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পরশ্রীকাতরতা—যেন ধর্মে পতিত হওয়ার জন্যই তাঁরা অগাধ ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছেন, 'অকথ্য কালাপাহাড়ীর পুরস্কার' লাভ করেছেন; এইরূপ অসূয়া বিদ্বেষ তখনকার সমাজে ছিল অত্যন্ত তীব্র। রবীন্দ্রনাথের জন্ম-পূর্বকাল পর্যন্ত বিবাহাদি ব্যাপারে আদানপ্রদান এমনকি বিবিধ আচার-অনুষ্ঠানে তাঁদের সামাজিক মর্যাদা স্বীকৃত হত না।[২২] সমগ্র ঠাকুরপরিবার সামাজিক ক্ষেত্রে এভাবে একঘরে হয়ে পড়ায় শাপে বর হল; সমকালীন অন্তঃসারশূন্য ঐশ্বর্যবিলাসে অভিভূত হওয়ার হাত থেকে এঁরা পরোক্ষ রক্ষা পেলেন, অথচ এই আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য তথা প্রাচুর্য আত্মপ্রকাশের সূর্যালোকিত রাজপথ অন্বেষণ করেছে বলে সামাজিক অবরোধের মধ্যে আত্মরক্ষা এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা ও বিকাশের বলিষ্ঠ প্রয়াস বিলাসব্যসন-অবক্ষয়ের তীব্র আকর্ষণ উপেক্ষা করে এমন একটা উপায় অবলম্বন করল যা সংস্কৃতিনির্ভর জীবনাদর্শসম্মত; অপরদিকে সামাজিক প্রতিকূলতার প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিমাগত আধুনিক ভাবধারা-স্বীকরণে তাঁরা উৎসাহিত। যে সত্যেন্দ্রনাথ বঙ্গসমাজে স্ত্রীশিক্ষা ও নারীস্বাতন্ত্র্যের অনুমোদন লক্ষ করেন নি, বোম্বাই অঞ্চলে কিংবা কলিকাতার পশ্চিমী ভোজসভায় সেই চিন্তাকে সম্বর্ধিত হতে দেখে তিনি স্বভাবত পুলকিত হয়েছিলেন এবং এরই প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ দৃষ্ট হয় যে পরবর্তীকালে কেবল ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরাবরোধই উন্মোচিত হয় নি, সেই অসূর্যম্পশ্য জীবনকে এক আলোকান্বিত জগতে মহিমামণ্ডিত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিতও করা হয়েছিল। অর্থাৎ পাশ্চাত্ত্য সংস্পর্শে এসেই তাঁরা ক্ষান্ত হন নি জীবনের অন্দরমহলে তাকে এমন সুন্দরভাবে অভ্যর্থনা করেছিলেন যা তৎকালীন অপর কোন লক্ষেশ্বরের গৃহে দেখা যায় নি; সম্পদের সঙ্গে শ্রীর অপূর্ব সমন্বয়ে তাঁদের ধনপতি-গৌরব শ্রীমন্ত হয়ে উঠে।

৩

আত্মপরিচয় প্রদানকালে রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকো ঠাকুরপরিবারের স্বতন্ত্রতা দাবি করেছেন। যে নিভৃত নিরালা সংসারে তাঁর প্রথম চক্ষুরুন্মীলন ঘটেছিল তাঁর জন্ম-পূর্বকাল থেকে সেই পরিবার সমাজের নোঙর তুলে দূরে বাঁধা-ঘাটের বাইরে এসে ভিড়েছিল, আচার অনুষ্ঠান ক্রিয়াকাণ্ড সেখানে বিরল এবং এর বৈশিষ্ট্য ছিল মহাদেশ থেকে দূরবিচ্ছিন্ন

২২ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্রপ্রতিভার উপক্রমণিকা: কুলায় ও কালপুরুষ, ১৩৬৪, পৃ ৫।

দ্বীপের উদ্ভিদ ও প্রাণীর স্বাতন্ত্র্যের মত স্বাভাবিক।[২৩] এই স্বাতন্ত্র্যকে পরিপুষ্টতা দান করেছে কয়েকজন ব্যক্তির অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রবল। যাঁদের অমোঘ আকর্ষণে সেকালের নবোদ্ভূত বুদ্ধিজীবীসম্প্রদায় ও বিবিধ গুণীজনের সমাবেশে উক্ত পরিবার একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য দ্বারকানাথ ও দেবেন্দ্রনাথ। মহর্ষিদেবের চরিত্র বিশ্লেষণকালে রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র যে বিশিষ্ট দিকটির কথা তুলে ধরেছেন তা এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক, "আমাদের পিতা যেমন আমাদিগকে দারিদ্র্য হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন তেমনি ধনের গণ্ডির মধ্যেও আমাদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। পৃথিবী আমাদের সম্মুখে মুক্ত ছিল, ধনী দরিদ্র সকলেরই গৃহে আমাদের যাতায়াতের পথ সমান প্রশস্ত ছিল। সমাজে যাঁহাদের অবস্থা আমাদের অপেক্ষা হীন ছিল তাঁহারা সুহৃদভাবেই আমাদের পরিবারে অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইয়াছেন, পারিষদভাবে নহে।"[২৪] জগৎ ও জীবনের সর্বস্তরে সহানুভূতি প্রকাশের বিশিষ্ট ভাবনার জাগরণকালে ঠাকুরপরিবারের এই মনোভাবটি তাঁদের 'আধুনিক' আখ্যা দান করেছে।

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের (১৭৯৪-১৮৪৬) প্রবল ব্যক্তিত্ব এবং অপ্রতিহত প্রভাবের ফলে উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বার্ধে এই গোষ্ঠী অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কলিকাতার সমাজে পিতামহের এই প্রতিপত্তি সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেন যে সেকালের সমাজে ধর্ম সম্বন্ধে স্বাধীন চিন্তা অপ্রতিহতভাবে চলিত থাকলেও সামাজিক রীতিনীতি সংস্কার ঐতিহ্য ব্যবস্থা প্রভৃতির বিরুদ্ধাচরণ গর্হিত বিবেচিত হত। কলিকাতার সমাজবন্ধন দৃঢ় ছিল, সাধারণত ধনী অভিজাত বংশ এবং মধ্যবিত্ত সাধারণ নিম্ন শ্রেণীতে সমাজ বিভক্ত ছিল; পিতামহ দ্বারকানাথকে সকল প্রকার গৃহস্থ সম্মান করতেন বলে সকল পক্ষের দোষ গুণ বিচার করে তিনি সমাজ শাসন করতেন[২৫]—সামাজিক ও সমাজশাসক দলপতির এবম্প্রকার মর্যাদা তিনি অর্জন করেছিলেন। ফলত সামাজিক অধিকার লাভের পরিণামে এই বংশলতাটি দ্বারকানাথের মত বনস্পতিকে আশ্রয় করে পরবর্তীকালে একটা জটাজূটবিলম্বিত বিশাল বনস্পতির আকার ধারণ করে। দ্বারকানাথের অগাধ অর্থোপার্জন ও বিপুল ঐশ্বর্যবিলাস, বংশোচিত আভিজাত্য ও দুর্লভ মার্জিত রুচি তাঁকে রূপকথার রাজপুত্রের মত অবিশ্বাস্যপ্রায় করে তুলেছে। কোম্পানির লবণবিভাগের দেওয়ান থাকা কালে তাঁর বিরুদ্ধে একটি মোকদ্দমা উঠে এবং সম্ভবত এই কারণে অবস্থার চাপে তিনি ১৮৩৪ খৃস্টাব্দে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। বোর্ড অব সল্টের অন্যতম সদস্য পার্কারের মতে এই মামলা ষড়যন্ত্রের

---

২৩ প্রবাসী মাঘ ১৩৩৮, পৃ ৫০৯-১০।

২৪ চারিত্রপূজা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৪র্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী সং ১৩৫৭, পৃ ৫৩৩।

২৫ বিপিনবিহারী গুপ্ত, পুরাতন প্রসঙ্গ, বিদ্যাভারতী সং ১৩৭৩, পৃ ২৮৪-৮৫।

নামান্তর যার সাহায্যে কোনো কোনো স্বদেশী এবং বিদেশী তাঁর শুভ্র নামে কলঙ্ক লেপন করতে চেয়েছিলেন। দারোগা গোপীমোহন মল্লিকের আকস্মিক মৃত্যুতে ঐ ঘটনার প্রকৃত ইতিহাস এখন পাওয়া অসম্ভবপ্রায় তথাপি বিভিন্ন দলিল থেকে ষড়যন্ত্রকারীর যে মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় তা থেকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে পারে যে দ্বারকানাথের অত্যাশ্চর্যজনক ব্যবসায়িক সাফল্য ও কূটনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি সেকালের কোনো কোনো বিদেশীরও ঈর্ষা উদ্রেক করেছিল। পার্কারের মন্তব্যের অনুসরণে বলা যায় দ্বারকানাথের প্রতি এই অসূয়া-বিদ্বেষের কারণ ছিল বহুবিধ। রামমোহনের অন্যতম সুযোগ্য উত্তরাধিকারীরূপে রাজনৈতিক মর্যাদা সম্বন্ধীয় আন্দোলন[২৬] এবং সমাজ ও ধর্মসংস্কারের বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে অনেকে অসূয়াপরতন্ত্র হয়ে উঠেন; রক্ষণশীল সমাজের প্রতিক্রিয়াপূর্ণ ব্যবস্থা ও আক্রমণাত্মক মনোভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ব্যক্তিগত বিদ্বেষ, ইউরোপীয়গণের নৈকট্যলাভ ও পাশ্চাত্ত্য জীবনবোধের দীক্ষা গ্রহণের ফলে এই বিরূপতা বিজাতীয় বিদ্বেষে পরিণত হয়; পক্ষান্তরে কোম্পানির গভীর আস্থাভাজন হওয়ায় কেবল দেশীয় লোক নয় অনেক বিদেশীয় পর্যন্ত শত্রুভাবাপন্ন হয়ে পড়েন। অর্থাৎ তাঁর প্রসিদ্ধি স্বাভাবিক কারণে সর্বশ্রেণীর উচ্চাকাঙ্ক্ষের শিরঃপীড়ার হেতুতে পরিণত হয়[২৭] এবং এইসকল কারণ সেই নবজাগরণের কালে পরিবারটিকে বিখ্যাত করে তুলে।

ইউরোপীয় শিল্পবিপ্লবের প্রভাবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রথম পর্যায়ে যে পরিবর্তন সূচিত হয় তার স্বর্ণপ্রসূ সম্ভাবনা যদিও ছিল তবু এক শোচনীয় পরিণামের সম্মুখীন তাকে হতে হয়। শিল্পবিপ্লবের অনিবার্য ফল হিসাবে কারখানা ও বৃহদায়তন শিল্প ইউরোপীয় কুটীর শিল্পকে অপসারিত করে দ্রুত তার শূন্যস্থান পূর্ণ করেছিল বরং আরও বেশি কিছু করেছিল, তাই সেখানে প্রচলিত ব্যবস্থার বিপর্যয়ে অর্থনৈতিক ক্ষতি বিশেষ হয়নি। কিন্তু বাংলাদেশের শিল্পবিপ্লবের এই প্রাথমিক ইতিহাসটি ছিল একটু অন্যরকম। এই শিল্পবিপ্লব স্বাভাবিক বা স্বতঃস্ফূর্ত নয় বরং বহুল পরিমাণে

---

২৬ পরাধীন স্বদেশবাসীর মৌলিক অধিকারের প্রশ্ন উত্থাপিত ১৮৩৬ সালের ১৮ জুনের বক্তৃতায়। দ্র রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত, ১৯০৯, পৃ ১১৭। পার্লামেন্টে ভারতীয় প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থানির্দেশ ও প্রতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি—The Parthenon, 15 February, 1830; ১৮৩০ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারির ইণ্ডিয়া গেজেট উদ্ধৃত।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: Bimanbehari Majumdar, History of Indian Social and Political Ideas from Rammohan to Dayananda, (1818-1884), 1967 pp 80-82.

২৭ Tarasankar Banerjee, Dwarakanath Tagore: The Salt Dewan, The Calcutta Review, November 1968, p 211.

সৃজিত ও আরোপিত। শিল্পবিপ্লবের ফলে এখানে কুটীর শিল্পের নাভিশ্বাস উঠেছিল সত্য কিন্তু কোনো বৃহদায়তন কারখানা অথবা শিল্পপদ্ধতির বৃহত্তর পরিকল্পনা সেই মুমূর্ষুর স্থান অনবিলম্বে অধিকার করে নি, অন্য কোনো বিকল্পব্যবসার জন্য দেশীয় শিল্পও তেমন প্রস্তুত ছিল না। এইজন্য দেখা যায় অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর সন্ধিকালের প্রায় পঞ্চাশবছর শিল্প-উৎপাদনের বাজার ছিল একান্তভাবে মন্দা বা মৃতপ্রায়, বাংলায় শিল্পগত অর্থনৈতিক ব্যবসায় পুরাতন রীতির অবসান হলেও আধুনিক পদ্ধতির স্বীকরণে জনসাধারণের উৎসাহ ছিল না বলা চলে। যদি এই নবাগত শিল্পনীতি বাংলাদেশে স্বাভাবিকভাবে দেখা দিত তাহলে এত দীর্ঘকাল পর্যন্ত সেই পদ্ধতি নিশ্চয়ই অবহেলিত রইত না। সে যাহোক এরূপ আকস্মিক ও অস্বাভাবিক আর্থিক সঙ্কটকালে ঠাকুর-পরিবারের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যে পরিবর্তন স্বাভাবিক বা স্বতঃস্ফূর্ত নয় বরং আকস্মিক তাকেই প্রথম বিশেষ আয়োজন ও আড়ম্বরসহকারে স্বীকৃতি-সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন দ্বারকানাথ। ব্যাঙ্কব্যবস্থা জাহাজনির্মাণ এবং লবণ তুলা প্রভৃতি ব্যবসায় দ্বারা[২৮] তাঁর যে প্রভূত অর্থাগম হয় তা-ই স্বদেশবাসীকে উদ্দীপিত করেছিল আধুনিক যুগোচিত ইউরোপীয়-সুলভ শিল্পব্যবসায়-রীতিগ্রহণে। বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায়ে তাঁর বিপুল সাফল্য পরিলক্ষিত হয়, এসকল কর্মে নিয়োজিত তাঁর উৎসাহ ও উদ্যোগের প্রাচুর্য-বৈচিত্র্যের পরিচয় আছে দ্বারকানাথের সংগ্রামমুখর জীবনের প্রত্যেকটি সন্ধিতে। রথীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য থেকে কোনো কোনো প্রবীণ গবেষক প্রবাসে দ্বারকানাথের আকস্মিক ও রহস্যময় অপমৃত্যুর কারণস্বরূপ তাঁর আকাশ-স্পর্শী দুরাকাঙ্ক্ষার উল্লেখ করেন।[২৯] প্রকৃত ব্যাপার সম্বন্ধে বিশেষ কোনো মতামত প্রকাশ না করে উল্লিখিত তথ্য থেকে এটুকু প্রমাণ করা সম্ভব যে বিদেশী বণিকের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রধানতম কারণ ছিল অগাধ আত্মবিশ্বাস ও প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষা;[৩০] এর

২৮ হরিরঞ্জন ঘোষাল প্রণীত Economic Transition in the Bengal Presidency (1793-1833) গ্রন্থের ৩১৪ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত একটি জাহাজের বিবরণ এইরূপ: Bark Water Witch. 369 $\frac{84}{94}$ tons. Belonging to Dwarakanath Tagore, William Storm and Andrew. Bound on a voyage from Calcutta with a cargo of Saltpetre, lead, cotton and opium to Canton to bring tea not exceeding 1,000 chests. Registered on 10 th June, 1831.

২৯ জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথের সখ্য, শারদীয়া বসুমতী ১৩৬৪, পৃ ১৪১।

৩০ It is believed that the important business which took the Prince to England was to try to negotiate with the British Government for an izara (permanent lease) of the provinces of Bengal, Bihar and Orissa in supersession of the East India Company. He was well received by Queen Victoria. But this ambitious project of his came to nothing on account of his sudden death under somewhat mysterious circumstances. Rathindranath Tagore, On the Edges of Time, 1958, p

মধ্যে নিহিত আছে তাঁর আত্মপ্রত্যাশ্রিত স্বদেশপ্রিয় মনের পরিচয় যা কোনো কারণে বিদেশীর নিকট কখনও অভিভূত হয়ে পড়ে নি। অজিতকুমার চক্রবর্তী বলেন, "দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংরাজদিগের সহিত বন্ধুতা করিতেন এবং ইংরাজ সরকারের কাছেও বিশেষভাবে সম্মানিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার দেশহিতৈষা কোনদিন সেই সম্মানলুব্ধতার দ্বারা আচ্ছন্ন হয় নাই। দেশের মঙ্গলের জন্য সরকারের কাজের যেখানে প্রতিবাদ করা দরকার মনে করিয়াছেন সেইখানে তিনি সকলের আগে প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহার এই দেশপ্রীতি তাঁহার পুত্র পৌত্রদের মধ্যে একটি অমূল্য সম্পত্তির মত তিনি রাখিয়া গিয়াছেন" ইত্যাদি।[৩১] সকল প্রকার অভিনবত্ব স্বীকারে তিনি এমন অতিসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন যা পরবর্তী বংশধরগণের নিকট নবীনবরণের সুন্দর আদর্শরূপে পরিণত হয়েছে। ঠাকুরপরিবারের এই বিশিষ্ট পরিচয় এভাবে দ্বারকানাথের কর্ম ও চিন্তাশক্তির দ্বারা গঠিত ও প্রভাবিত হয়েছে বললে অত্যুক্তি হয় না, উত্তরসূরীর জন্য এই তাঁর শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার সৃজন। রাজর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ। আর কেবল বস্তুজগতের একরাট হওয়া নয়, এবার আত্মজগতে রাজচক্রবর্তী পদলাভ করে অন্তর ও বাহিরকে এমন ভাবে মিলিয়ে দেওয়া হল যার পটভূমিকায় কয়েকটি বিচিত্র প্রতিভার অঙ্কুরোদগম কালক্রমে সমগ্র বাংলাদেশে ছায়া দান করতে পারে। কোনো কিছু নূতন নয় অপ্রত্যাশিত নয়, দীর্ঘকালের আয়োজন সার্থক হতে চলেছে; ভারতীয় জীবনাদর্শের পুনর্জাগরণ হল সাহিত্যে শিল্পে, জগৎ ও জীবনের সর্বস্তরে এল বিপুল প্রাণচাঞ্চল্য, তরুণ গরুড়গণ বিশ্বের কুলায়ে আপন নীড় রচনায় মনোযোগী হয়ে উঠেছেন; ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির নবজাগরণের লগ্নে প্রত্যেকে সমিধ সঞ্চয়ে আগ্রহান্বিত। ঠাকুরপরিবারের মহিমা ও আভিজাত্য এভাবে বিশেষত্বে চিহ্নিত হয়ে উঠল; পরিণামে এই পরিবার পঞ্চদশ শতাব্দের ফ্লোরেন্সের মেডিসি গোষ্ঠীর মত সার্থকতা ও বিশিষ্টতা অর্জন করেছিল।[৩২]

প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য এবং পৌরাণিক সংস্কৃতিকে আধুনিক জীবনের উন্মুক্ত বাতায়ন পথে নিরীক্ষণ করার ব্যাপারে তাঁদের ঔৎসুক্য নিতান্ত কম ছিল না। রামমোহনের অসমাপ্ত কার্যভার সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব প্রকৃতপক্ষে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি গ্রহণ করলেন, আবার পূর্বসূরীর দৃষ্টান্তে দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ চিন্তাশীলগণ বেদউপনিষদ ও বেদান্তের আদর্শ প্রচার করেছেন: "যখন দেশের শিক্ষিত দলের মধ্যে প্রতীচ্যানুরাগ প্রবল, সকলেই পশ্চিমদিকে

৩১ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯১৬, পৃ ১০।

৩২ Nisikánta Chattopádhyáya, The Yátrás; Or, The Popular Dramas of Bengal, 1882, p 28.

চাহিয়া রহিয়াছে, তখন তিনি এদেশের প্রাচীন জ্ঞান-সম্পত্তির প্রতি মুখ ফিরিলেন ; এবং বেদবেদান্তের আলোচনার জন্য তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপন করিলেন। তিনি ধর্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন ; কিন্তু আপনার কার্য্যকে জাতীয়তারূপ ভিত্তির উপরে স্থাপিত রাখিতে ব্যগ্র হইলেন। এই বিশেষত্ব তিনি চিরদিন রক্ষা করিতেছেন।"৩৩ পরবর্তীকালে সহাধ্যায়ী বন্ধুবর প্যারীমোহনের পুত্র কেশবচন্দ্র সেনের সহায়তা দেবেন্দ্রনাথের এই মনোভাবকে যথেষ্ট আনুকূল্য দান করে। কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মধর্মানুরক্তি ও দেবেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক জীবনের অভিনব সন্তাহ্নত উপলব্ধি ব্রাহ্মসমাজে জাগরণের প্লাবন ডেকে আনে এবং তারই ফলে ব্রাহ্মসমাজ এমন সব নূতন কাজে আত্মনিয়োগ করতে থাকে যা ধর্মীয় গণ্ডির মধ্যে একান্তভাবে আবদ্ধ ছিল না। ইতিমধ্যে ব্রাহ্মসমাজ ব্যাপকতর অর্থে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে যার স্নায়ুকেন্দ্র তখনও ছিল ঠাকুরবাড়ির মধ্যে। ১৭৬৫ শকের ১ভাদ্র (১৮৪৩, ১৬ আগস্ট) তারিখে প্রকাশিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় পত্রিকা প্রকাশের যে উদ্দেশ্য মুদ্রিত হয় তার মর্মার্থ—তত্ত্ববোধিনী সভার দূরস্থিত সভ্যগণকে সভার কার্যবিবরণাদি জ্ঞাপন, ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন ও উন্নতির উপায়চিন্তা, রামমোহন-প্রণীত গ্রন্থব্যাখ্যাদির সারাৎসার পরিবেশন ও সংগ্রহ, চিত্তশুদ্ধি তথা চিত্তোন্নয়নের উপায় সন্ধান ও নির্দেশ প্রভৃতি ; এতৎসঙ্গে ছিল 'বিচিত্র শক্তির মহিমা জ্ঞাপনার্থে সৃষ্ট বস্তুর বর্ণনা এবং অনন্ত বিশ্বের আশ্চর্য্য কৌশল' বর্ণন ও প্রকাশের প্রতিশ্রুতি।৩৪

৩৩ শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, ১৯০৪, পৃ ১৭৭।

৩৪ "...তত্ত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষেরা যে অভিপ্রায়ে এতৎ পত্রিকার সৃষ্টি করিলেন তাহার স্থূল বৃত্তান্ত এস্থলে অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যাইতেছে।

তত্ত্ববোধিনী সভার অনেক সভ্য পরস্পর দূর দূর স্থায়ী প্রযুক্ত সভার সমুদয় উপস্থিত কার্য্য সর্ব্বদা জ্ঞাত হইতে পারেন না, সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলনা এবং উন্নতি কি প্রকার হইবেক ? অতএব তাহারদিগের এসকল বিষয়ের অবগতি জন্য এই পত্রিকাতে সভার প্রচলিত কার্য্য বিষয়ক বিবরণ প্রচার হইবেক।

অনেক সভ্য দূরদেশ বশতঃ বা শরীরগত অসুস্থতা হেতু বা কোন কার্য্যক্রমে অথবা অন্যকোন দৈব বিপাকে ব্রহ্মসমাজে উপস্থিত হইতে অশক্ত হয়েন বিশেষতঃ তাঁহারদিগের নিমিত্তে উক্ত সমাজের ব্যাখ্যান সময়ে সময়ে এই পত্রিকাতে প্রকটিত হইবেক।

মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা এইক্ষণে সাধারণের অপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং অনেকে তাহার মর্ম জানিতে বাসনা করেন, অতএব সেই সকল গ্রন্থ এবং অন্য যে কোন গ্রন্থ যাহাতে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রসঙ্গ আছে তাহা এই পত্রিকাতে উদ্ধৃত হইবেক। পরব্রহ্মের উপাসনার প্রকার এবং স্বরূপ লক্ষণ জ্ঞাপনার্থে এবং সর্ব্বোপাসনা হইতে পরব্রহ্মের উপাসনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে ইহা জানাইবার নিমিত্তে আমারদিগের শাস্ত্রের সারমর্ম সংগৃহীত হইবেক। বিচিত্র শক্তির মহিমা জ্ঞাপনার্থে সৃষ্ট বস্তুর বর্ণনা এবং অনন্ত বিশ্বের আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশিত হইবেক।

মহর্ষিদেবের আত্মজীবনীতেও এ সকল সমর্থিত হয়েছে।[৩৫] পরবর্তীকালে এই পত্রিকা প্রতিশ্রুত উদ্দেশ্যের সীমা অতিক্রম করেছিল কারণ নব্যশিক্ষিত তরুণদের উন্মার্গগমন ও উগ্র হিন্দুধর্মবিদ্বেষকে সুপথে পরিচালনা, বিদেশী খৃস্টান মিশনরীদের হিন্দুধর্মবিরোধী নিন্দাবাদ ও প্রচারের সদুত্তর প্রদান, যুবসমাজের ধর্মান্তরগ্রহণের অভিযান প্রতিরোধ এবং বেদান্ত-উপনিষদের অন্তর্নিহিত সত্যপ্রচার প্রভৃতি বহুমুখ উদ্দেশ্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সাধন করেছিল।[৩৬] এতদতিরিক্ত নিশ্চয়ই কিছু ছিল যার আকর্ষণে অক্ষয়কুমার দত্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রাজেন্দ্রলাল মিত্র রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি বিদ্বৎসমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিগণ উক্ত পত্রিকার প্রতি মনোযোগী হয়েছিলেন; সম্ভবত এই অতিরিক্তের মধ্যে বিচিত্রশক্তির মহিমা জ্ঞাপনার্থে সৃষ্ট বস্তুর স্বভাব বর্ণনা ও অনন্ত বিশ্বের পরম রহস্যময় কৌশলনির্ণয় অন্যতম, তাছাড়া 'পরমার্থ ঘটিত রচনা প্রকাশের' সঙ্গে সঙ্গে 'আপনারদিগের অভিলষিত রচনা প্রকাশ' উল্লেখযোগ্য। এর সাহায্যে 'সর্বসাধারণ সমীপে মনোগত জ্ঞান আলোকের প্রকাশ' সম্ভব হয়েছিল। অর্থাৎ তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকা কালক্রমে ধর্মীয় প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছিল এবং এই একই মানসিকতা-সূত্রাবলম্বনে নব্য অভিজাত ও বুদ্ধিজীবী বা বিদ্বৎসমাজের মুখ্য সংস্থারূপে ব্রাহ্মসমাজ বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে পড়েছিল। অর্থনীতির মত ধর্মীয় ব্যাপারেও অবাধ ব্যক্তিস্বাধীনতাকে অঙ্গীকার করার ফলে ব্রাহ্মসমাজ সকল দিক থেকে আধুনিক ভাবাদর্শের পৃষ্ঠপোষক পীঠস্থানে পরিণত হয়। ঠাকুরপরিবারের পক্ষে সামাজিক নেতৃত্বের সুযোগ এভাবে এসেছে এবং বিদ্যা ও বিত্তের সমবায়ে তা অতিরিক্ত মর্যাদায় ভূষিত হয়েছে।

৪

বাধাবন্ধহারা ব্যক্তিস্বাধীনতার উন্মেষলগ্নে ঠাকুরবাড়ির লক্ষ্মী ও সরস্বতীর অধিষ্ঠানভূমি অন্তঃপুরের শাপমোচন ঘটেছিল। "আলপনা-আঁকা ঠাকুরঘরটি অন্তঃপুরেই বিরাজমান এবং সেই ঠাকুরঘরটির ভিতরেই মা সরস্বতীর লীলা-নিকেতন। পরন্তু ভোরের স্বর্ণরাগ

কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার চেষ্টা না থাকিলে ব্রহ্মজ্ঞানে প্রবৃত্তি হয় না, অতএব যাহাতে লোকের কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি থাকিবার চেষ্টা হয় এবং মন পরিশুদ্ধ হয় এমত সকল উপদেশ প্রদত্ত হইবেক।

বৈষয়িক সম্বাদপত্রে পরমার্থ ঘটিত রচনা প্রকাশের প্রথা না থাকাতে অনেক জ্ঞানিব্যক্তি আপনারদিগের অভিলষিত রচনা প্রকাশ করিতে অশক্ত ছিলেন, অতএব এই পত্রিকা প্রকাশ হইয়া তাঁহারদিগের সে খিন্নতা এইক্ষণে নিবৃত্ত হইল, এবং সর্ব্বসাধারণ সমীপে মনোগত জ্ঞান আলোকের প্রকাশ হইবার বিলক্ষণ উপায় হইল।" তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১ম সংখ্যা, ১ ভাদ্র ১৭৬৫ শক, পৃ ১।

৩৫ সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, প্রকাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত ১৯৬২ সং, সপ্তম পরিচ্ছেদ, পৃ ৩৫-৩৬।

৩৬ বিনয় ঘোষ, ব্রাহ্মসমাজ ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭০, পৃ ৪৬।

যেমন আলোকসাগর হইতে ফুটিয়া ওঠে না, আঁধারের নিকষেই তাহার রম্য বর্ণবিকাশ, তেমনি সাহিত্যগগনের এই আলোক-প্রভাতবিভা বাহিরের আলোকাম্বরা কর্মভূমিতে আত্মপ্রকাশ করে নাই, তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছিল অন্তঃপুরের তামসী যবনিকা ভেদ করিয়া। এবং তাহারই প্রসাদাৎ আজ আমরা বরণীয় বিদুষী রমণিশিরোমণিস্বরূপ স্বর্ণকুমারী, কামিনী ও গিরীন্দ্রমোহিনী প্রমুখ ধন্যি মেয়েদের পাইয়াছি।"[৩৭] মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্মগ্রহণ[৩৮] ও বিষয়বাসনায় জলাঞ্জলি দান সত্ত্বেও সন্ন্যাসীর কৃচ্ছ্রসাধন অথবা জীবনবৈরাগ্য কখনও উগ্রভাবে তাঁর মানসিকতা গ্রাস করে নি। এক উদাসীন রাজসিকতার মধ্যে রাজর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উপযুক্ত কন্যা স্বর্ণকুমারীর জন্ম হয় সিপাহী বিদ্রোহ এবং বিধবাবিবাহ প্রবর্তন ও আন্দোলনের সমকালে। ঠাকুরবাড়ি তখন জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির ত্রিবেণীসঙ্গমে পরিণত, নানা বিত্ত-ঐশ্বর্য-সম্ভোগ এবং অনায়াস ত্যাগস্বীকারের সমন্বয় ঐসময় পরিলক্ষিত হয়। অপরদিকে কেবল অর্থনৈতিক বা সামাজিক ব্যাপারে নয় সাংস্কৃতিক দিক থেকেও সমগ্র বাংলায় তখন প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার সমন্বয়পর্বের প্রারম্ভিক পর্যায়। স্বর্ণকুমারীর জন্মকালে ব্রাহ্মসমাজ উন্নতির চরমবিন্দু স্পর্শ করেছে; তাঁর জন্মের কতিপয় দিবস পরে মহর্ষি দেশভ্রমণের জন্য বহির্গত হয়েছিলেন, এবং এই পর্বের ভ্রমণকালে হিমালয়সান্নিধ্যে তিনি দিব্য জীবনের ও বোধির অনুভব লাভ করেছিলেন বলে এই ব্যাপার লেখিকার জীবনে একটি বিরাট তাৎপর্য বহন করে এনেছে। হিমালয় থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজ তথা বঙ্গসংস্কৃতির গৌরবময় অভ্যুত্থানের সূচনা হয়। যুগ ও সমাজমানসে বিরোধের অবসানে সমন্বয়ের সূচনায় বাংলাদেশের নবজাগরণের সার্থক পরিণামপর্বে স্বর্ণকুমারী দেবীর এই আবির্ভাব সত্যসত্যই বিশেষত্বপূর্ণ।

৫

১৩২২ সালে ভারতী পত্রিকা সম্পাদনার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থেকে অবসরগ্রহণকালে স্বর্ণকুমারী বলেছিলেন, "পুরাতন চিরস্থায়ী নহে অথচ তাহার মৃত্যুও নাই। সে বর্তমান নূতনে। পিতামাতা সন্তানে জীবিত, পূর্বস্রোত পরবর্তী স্রোতে প্রবাহিত, অতীত ভবিষ্যতে সম্মিলিত। নূতনে লীন হইতে না পারিলেই পুরাতনের প্রকৃত মৃত্যু। পুরাতনের প্রধান ধর্ম নূতনকে অনুগামী করা অর্থাৎ পথ দেখান, অন্য কথায় নূতনকে গঠিত করিয়া তোলা। ইহাতে

---

৩৭ হেমেন্দ্রকুমার রায়, বঙ্কিম যুগের কথা, ভারতী কার্তিক ১৩১৮, পৃ ৬৬৫-৬৬।

৩৮ বৃহস্পতিবার ২১ ডিসেম্বর ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ বা ৭ পৌষ ১৭৬৫ শক। দ্র দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী, পৃ ৪৪, ৭ সংখ্যক পাদটীকা।

যে সফলতা লাভ করে তাহার জীবন সার্থক। আমার বহুদিনব্যাপী সাহিত্যসেবায় যদি এই উদ্দেশ্য কথঞ্চিৎ পরিমাণেও সার্থক হইয়া থাকে তবেই আমি ধন্য। কিন্তু বিচারের ভারও নূতনের হস্তে।" উনবিংশ শতাব্দীতে একজন পুরাঙ্গনার পক্ষে সেকালের একটি প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা দীর্ঘকাল পরিচালনা ও সম্পাদনা করা ছিল অত্যন্ত দুরূহ কর্ম; সুরুচিশীল সাহিত্যের মাধ্যমে জ্ঞানের ক্ষেত্র ও মনের প্রসার বৃদ্ধি করাই ভারতীর প্রধানতম কর্তব্য ছিল, আনুষঙ্গিক ছিল নূতন লেখকগোষ্ঠীনির্মাণ। এতদুভয় ব্যাপারে সার্থকতা অর্জন করেছেন বলে বিদায়ের দিনে তাঁর নয়ন যদিও অশ্রুপূর্ণ তথাপি হৃদয় নিষ্কাম প্রফুল্ল কারণ সযত্নপালিত ভারতীকে প্রতিভাবান নবীনের উৎসাহযুক্ত কার্যক্ষম বলশালী হস্তে সমর্পণের পর তিনি জননীর ন্যায় কৃতার্থ। সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা করে তাকে সুরুচিসম্মত মর্যাদায় সমুন্নত ও প্রতিষ্ঠিত করার সঙ্গে সঙ্গে সুযোগ্য সাহিত্যিক সৃষ্টি করা প্রত্যেক পত্রসম্পাদকের মহান কর্তব্য—স্বর্ণকুমারী সেক্ষেত্রে সাফল্যঅর্জনকারী। পরবর্তী ভারতী-সম্পাদক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রসঙ্গান্তরে তা স্বীকার করেছেন এবং এভাবে উত্তর-সাধকের সুদীর্ঘ স্বীকৃতিতে তাঁর কৃতিত্ব নির্ণীত: "বহুকাল ধরিয়া ভারতীর সেবা করিয়া পূজনীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী আজ অবসর লইতেছেন। এ অবসর তাঁর উচিতমতো প্রাপ্য হইলেও তাঁহাকে বিদায় দিতে আমাদের চিত্ত ব্যথিত ও কাতর হইয়া উঠিতেছে। আমাদের দেশের মাসিক সাহিত্যের এখনো এমন সময় আসে নাই যে তাঁহার মতো এমন একজন নিপুণ সম্পাদককে এত অনায়াসে আমরা ছাড়িয়া দিতে পারি। তাঁহার এই অবসর গ্রহণে মাসিক সাহিত্যসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইল বলিয়া আমার বিশ্বাস।...তিনি বাংলাদেশের নারীজাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন এবং বিশ্বনারীসভায় বাঙ্গালী নারীকে বরেণ্য করিয়া তাঁহাদের গৌরবআসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বাংলার অনেক নবীন লেখক তাঁহার কাছে সবিশেষ ঋণী। নবীন লেখকগণ যাহাতে নিজেদের গড়িয়া তুলিতে পারে তাহার জন্য তাঁহার একটা আন্তরিক চেষ্টা ছিল। এতটুকু লেখা যাহার ভালো দেখিয়াছেন তাহাকেই মুক্তকণ্ঠে উৎসাহ দিয়াছেন; কেমন করিয়া লেখা প্রকাশযোগ্য হইবে তজ্জন্য বিধিমত পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার এই অনুগ্রহ অনেক নবীন লেখক ইহজন্মে ভুলিতে পারিবে না।"[৩৯]

স্বর্ণকুমারীর সাহিত্যচর্চার উষালগ্নে তৎকালীন বিখ্যাত সাময়িক পত্রসমূহ তাঁর প্রশংসায় ছিলেন পঞ্চমুখ। শ্রীমতী তরু দত্তের সঙ্গে তুলনা করে সেকালের হিন্দু প্যাট্রিয়ট লিখেছিলেন যে স্বর্ণকুমারীর শিক্ষাদীক্ষা ইউরোপে হয় নি কিংবা কোনো বিদেশী ভাষা-সাহিত্যে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন না, অন্তঃপুরের অবরোধের মধ্যে দেশীয় শিক্ষারীতিতে তাঁর

---

৩৯ আমার কথা, ভারতী বৈশাখ ১৩২২

মানসিকতা পরিণত হতে থাকে; তথাপি তাঁর রচনাবলী সকলসহৃদয়হৃদয়সংবাদী হয়ে উঠেছে। সমালোচক এই কৃতিত্ব নিরূপণকালে লেখিকাহিসাবে স্বর্ণকুমারীর প্রতি বিশেষ কোনো দুর্বলতা প্রকাশ করেন নি, কঠোর ও নিস্পৃহ বিচারকের সূক্ষ্ম মূল্যায়নবোধ এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে সাহিত্য-বিচারে সেকালের হিন্দু প্যাট্রিয়ট যথেষ্ট দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। স্বর্ণকুমারীর প্রথম পর্বের সামান্য কয়েকটি সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে উপর্যুক্ত মন্তব্য পাঠকালে জানা যায় যে গাথা কাব্য প্রকাশের কালে (১৮৮০) তাঁর খ্যাতি বৃহত্তর বঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছিল।[৪০] কর্মজীবনের প্রারম্ভে সেযুগের স্বল্পসংখ্যক বাঙালি সাহিত্যিকের ভাগ্যে এরূপ সাফল্য দেখা যায়। বঙ্গললনাগণের মধ্যে স্বর্ণকুমারীই সর্বপ্রথম সার্থক উপন্যাস গাথা বৈজ্ঞানিকপ্রবন্ধ প্রভৃতি রচনা করেন।[৪১] কেবল তাই নয়, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শলাভের ফলে বাঙালির মনে যে বিশালতা ও বিপুলতার ভাব জাগ্রত হয় সেই বিশ্বজনীন ভাবের দ্বারা পরবর্তীকালে সকল চিন্তানায়কের আদর্শ এবং বিশ্বাস নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, মহিলা কবিগণের মধ্যে স্বর্ণকুমারীও এবিষয়ে প্রথম কৃতী।[৪২] খ্যাতনামা সাহিত্যিক অনুরূপা দেবী তাঁর একটি গবেষণামূলক বক্তৃতাপ্রবন্ধে স্বর্ণকুমারীর প্রতি যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছিলেন বর্তমান প্রসঙ্গে তা স্মরণীয়: "তাঁহার আবির্ভাবে বাংলার নারীসমাজের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। সেই যথার্থ যুগ-সাহিত্যিকা মহীয়সী মহিলাকে তদানীন্তন সুধীসমাজ মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ দিয়েছেন। তাঁর পূর্বেও মেয়েরা কবিতা গল্প প্রবন্ধ লিখেছেন, কিন্তু মেয়েদের লেখা তখন পর্যন্ত খানিকটা কৃপার চক্ষেই দেখা হত। তিনিই প্রথম সাহিত্যক্ষেত্রে সকল দিক দিয়ে নারীর শক্তিকে জাগিয়ে তুললেন, নারীর রচনাকে পুরুষের কৃপাদৃষ্টি থেকে উদ্ধার করে শ্রদ্ধার এবং বিস্ময়ের বস্তু করে নিলেন। তাঁর পূর্বে কোনো মহিলা লেখিকা একাধারে গদ্যে পদ্যে সমানভাবে তাঁর মতো কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। শুধু তাই নয়; গল্প উপন্যাস শিশুসাহিত্য গান গাথা ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ক প্রবন্ধ ভ্রমণবৃত্তান্ত অনুবাদ বিদ্যালয়পাঠ্য গ্রন্থ—সর্ববিধ রচনাতেই তিনি জয়যুক্ত হয়েছেন। বঙ্গসাহিত্যে নারীর দানের মধ্যে তাঁর দান যেমন বিপুল তেমনি বিচিত্র। রচনার মৌলিকতাতেও তিনিই

৪০ লেখিকার গুণমুগ্ধ জনৈক কলিকাতাবাসী সাংবাদিক মাদ্রাজের হিন্দুপত্রিকায় যে প্রশংসাব্যঞ্জক চিঠি প্রেরণ করেন তার উল্লেখ হিন্দু প্যাট্রিয়টে পাওয়া যায়: and we perfectly agree with the Calcutta correspondent of the Hindu of Madras, an extract from whose letter we published in these columns some little while ago. 'That never before in Bengal did a lady writer of such real powers and abilities appear, and shed such a lustre on the literature of her country', etc.—Hindoo Patriot, দ্র ভারতী অগ্রহায়ণ ১২৮৭, গাথার বিজ্ঞাপন।

৪১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ২৮ সংখ্যক গ্রন্থ, স্বর্ণকুমারী দেবী, ১৩৬৯, পৃ ১৩।

৪২ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বঙ্গের মহিলা কবি, ১৩৬০, ভূমিকা।

মেয়েদের প্রথম পথপ্রদর্শিকা বললে অত্যুক্তি হবে না। তাঁর সাহিত্যপ্রতিভা দীর্ঘকাল ধরে উজ্জ্বল থেকে তাঁকে দিয়ে বাংলার নারী জগতের যে উপকার সাধন করিয়েছে তার তুলনা হয় না। এরকম সর্বতোমুখী প্রতিভা শুধু এদেশে কেন কোনো দেশেই সুলভ নয়।··· তিনি শুধু নিজেই একজন বড় লেখিকা ছিলেন না, বড় লেখিকাদের শক্তিকে অঙ্কুরে চেনবার অদ্ভুত শক্তি তাঁর ছিল। অখ্যাত অজ্ঞাত লেখিকাদের আবিষ্কার করে প্রথম থেকে তাদের সাহিত্য সাধনায় উদ্বুদ্ধ করবার ক্ষমতা তাঁর ছিল অসাধারণ।···মণিলাল সৌরীন্দ্রমোহন বিভূতি ভট্ট সত্যেন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র অপরদিকে অনুরূপা দেবী ইন্দিরা দেবী শৈলবালা ঘোষজায়া আমোদিনী ঘোষজায়া লজ্জাবতী বসুকন্যা হেমনলিনী বা শৈলাঙ্গিনী দেবী প্রভৃতি নারী লেখিকারাও তাঁর বহু সহায়তা লাভ করেছেন, সে ঋণ তাঁরা কোনমতেই অস্বীকার করতে পারেন না। বস্তুত তাঁর পরেই বাংলা দেশে সর্ববিষয়ে মেয়েদের সাহিত্যচর্চা ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়।"[৪৩]

জন্মতারিখ বিচার

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি নিষ্ঠাবান গবেষক ও তথ্যানুসন্ধিৎসু স্বর্ণকুমারী দেবীর সংক্ষিপ্ত জীবনী রচনা করেছেন প্রভূত তথ্য ও উপাদান অবলম্বনে, সেই সকল নির্দেশ গ্রহণ করে লেখিকার নির্ভরযোগ্য জীবনকথা রচনা করা যায় সত্য কিন্তু কোনো কোনো বিষয়ে তাঁদের মতামতের পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার অন্তর্গত স্বর্ণকুমারী দেবী শীর্ষক গ্রন্থের প্রারম্ভে বলা হয়েছে যে তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ কন্যা,[৪৪] পাদটীকায় দেবেন্দ্রনাথের পুত্রকন্যার যে তালিকা আছে তার নির্দেশানুসারে বলা যায় মহর্ষির সন্তানসংখ্যা মোট চোদ্দ। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতেও রবীন্দ্রনাথের নদিদি স্বর্ণকুমারী মহর্ষিদেবের চতুর্থ দুহিতা। কিন্তু রবীন্দ্র-রচনাবলীর সপ্তদশ খণ্ডের (১৩৬১) শেষভাগে প্রদত্ত ঠাকুরপরিবারের বংশলতিকা থেকে জানা যায় লেখিকা পঞ্চম কন্যা ও একাদশ সন্তান। প্রকৃতপক্ষে প্রথম জাতক কন্যার (১৮৩৮) অকালমৃত্যু হওয়ায় তাকে সাধারণত হিসাবের মধ্যে ধরা হয় না বলে এরকম সমস্যা উদ্ভূত, প্রভাতকুমার এসম্পর্কে সবিশেষ অবহিত ছিলেন।

৪৩ সাহিত্যে নারী : স্রষ্টী ও সৃষ্টি, ১৩৫৯, পৃ ১২৬-২৯।

৪৪ সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, ২৮ সংখ্যক গ্রন্থ, পৃ ৫ : "কলিকাতা জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর-পরিবারে আনুমানিক ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্ণকুমারী দেবীর জন্ম হয়। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ কন্যা।"

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা বা রবীন্দ্রজীবনীতে লেখিকার জন্মতারিখ ব্যবহৃত হয় নি এবং জন্মসাল সম্পর্কে সংশয় উত্থাপিত। শেষোক্ত ব্যাপারে ব্রজেন্দ্রনাথ সংশয়সূচক 'আনুমানিক' শব্দ এবং প্রভাতকুমার জিজ্ঞাসা-চিহ্ন প্রয়োগ করেছেন।[৪৫] প্রকৃতপ্রস্তাবে সংশয়াতীতরূপে প্রায় কোনো জীবনী গ্রন্থে জন্মতারিখ বা সালের উল্লেখ পাওয়া যায় না। এসম্বন্ধে কোনো স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে বিভিন্ন মতামতের উল্লেখ ও বিশ্লেষণ করে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা আবশ্যক।

অধ্যাপক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁর বঙ্গের মহিলা কবি গ্রন্থে আনুমানিকভাবে ১৮৫৫ সালের উল্লেখ করেছেন;[৪৬] স্বর্ণকুমারীর জীবনী রচনায় গ্রন্থটির উপযোগিতা যথেষ্ট কারণ এই পুস্তক প্রণয়নকালে লেখক যে স্বর্ণকুমারীর বিশেষ সাহায্য পেয়েছিলেন বিবিধ ব্যাপারে সে বিষয়টি 'প্রথম সংস্করণের কথা'র মধ্যে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত। ব্রজেন্দ্রনাথও এই মতাবলম্বী। প্রভাতকুমারের রবীন্দ্রজীবনী প্রথম খণ্ডের ১৩৫৭ সালের সংস্করণে দ্বিধাহীন ভাবে ১৮৫৬ সালের উল্লেখ থাকলেও পরবর্তী ১৩৬৭ সালের সংস্করণে ঐ সাল ব্যবহারে সংশয় উত্থাপিত। এমনকি বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র-রচনাবলীর সপ্তদশ খণ্ডের শেষাংশে প্রদত্ত বংশলতিকায়ও সংশয়ব্যঞ্জক ১৮৫৬ সালের নির্দেশ লক্ষণীয়। বসুমতী সংস্করণের স্বর্ণকুমারী দেবীর গ্রন্থাবলীর তৃতীয়ভাগের শেষে লেখিকার যে পরিচয় পাওয়া যায় সেখানে ১৮৫৭ সাল জন্মসাল রূপে চিহ্নিত; প্রসঙ্গত স্মরণীয় বসুমতীসাহিত্যমন্দিরের সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাহিত্যব্যাপারে লেখিকা জড়িত ছিলেন এবং স্বর্ণকুমারীর জীবদ্দশায় উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রন্থাবলী প্রকাশিত (১৯১৬-১৭) হয়েছিল বলে কথিত গ্রন্থে পরিবেশিত তাঁর জীবনী সম্বন্ধীয় বিবিধ সংবাদ একান্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলে ১৮৫৫ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত সমূহ বৎসরের উল্লেখ পাওয়া যায় বলে ব্যাপারটি যে বেশ জটিল তা সহজেই বোঝা যায়। বর্তমান অবস্থায় কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পূর্বে এ সম্পর্কে লেখিকার নিজস্ব বক্তব্য কিংবা তাঁর আত্মীয় ও বন্ধুবর্গের কোনো কোনো মন্তব্য থেকে সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে।

যোগেন্দ্রনাথ সালের সঙ্গে সঙ্গে মাসের উল্লেখ করেছেন, সেক্ষেত্রে তাঁর নির্দেশ ভাদ্রমাস। গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত জীবনীতেও ভাদ্রমাসের উল্লেখ বর্তমান। সাধারণত জন্মসালের নির্দেশে সবদা সাদৃশ্য না থাকলেও মাসের নির্দেশ সঠিক হয়ে থাকে, বিশেষত সকলের পক্ষে সালের চেয়ে মাসের কথা মনে রাখা স্বাভাবিক ব্যাপার কারণ এর সঙ্গে জড়িত জন্মতিথিপালন প্রভৃতি বিশিষ্ট পারিবারিক উৎসব। সচরাচর দেখা যায় বহুসন্তানবিশিষ্ট পরিবারে জাতকের

৪৫ রবীন্দ্রজীবনী ১ম, পৃ ১৪, "চতুর্থী কন্যা স্বর্ণকুমারী (? ১৮৫৬-১৯৩২) বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক ও প্রসিদ্ধ লেখিকা; ইনি রবীন্দ্রনাথের 'ন দিদি'।"

৪৬ বঙ্গের মহিলা কবি, পৃ ৩৯।

জন্মের সনতারিখের কথা অভিভাবকগণের মনে না থাকলেও জন্মমাস এবং বারের কথা মনে থাকে। সেদিক থেকে উপরিলিখিত মন্তব্যে যে মাসের উল্লেখ পাওয়া যায় তা গ্রহণ করা যেতে পারে কারণ দুটি ক্ষেত্রেই মাসের নির্দেশে সাদৃশ্য আছে এবং অন্য কোনো স্থলে অপর কোনো মাস পাওয়া যায় না।

স্বর্ণকুমারীর অব্যবহিত অগ্রজা ও অনুজার নাম যথাক্রমে শরৎকুমারী (১৮৫৪-১৯২০) ও বর্ণকুমারী (১৮৫৮-১৯৪৮); তিন ভগিনী পরপর জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ববর্তী ও পরবর্তীর জন্মসন বংশলতিকায় নিঃসংশয়ভাবে ব্যবহৃত অথচ মধ্যবর্তিনীর ক্ষেত্রে এই সংশয় বর্তমান। একটি কৌতূহলোদ্দীপক সমস্যা এক্ষেত্রে উল্লেখ্য। মহর্ষি দেশভ্রমণের উদ্দেশ্যে দীর্ঘকালের জন্য গৃহত্যাগ করেন ১৮৫৬ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে এবং কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করেন ১৮৫৮ সালের ১৫ নভেম্বর তারিখে—দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর চতুর্থ সংস্করণে (১৩৬৮ চৈত্র বা ১৯৬২) প্রদত্ত 'সময়সূচী' থেকে ঐ তথ্যাবলী আহৃত। দু বৎসরের অধিককাল তিনি কলিকাতায় অনুপস্থিত ছিলেন বলে ১৮৫৮ সালে বর্ণকুমারীর জন্ম অসম্ভব। সঠিক কখন তাঁর জন্ম হয় তার স্পষ্ট নির্দেশের প্রয়োজন এস্থলে নেই তবে তা যে ১৮৫৮ সালের মধ্যে নয় সেকথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা চলে; আবার ১৮৫৯ সালে যদি বর্ণকুমারীর আবির্ভাব হয় তবে ঐ একই বৎসরে পরবর্তী সন্তান সোমেন্দ্রনাথের জন্ম হতে পারে না যদিও বংশ-লতিকায় সোমেন্দ্রনাথের নামের পার্শ্বে উক্ত সাল ব্যবহৃত। এইসকল আলোচনা থেকে অন্তত দুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়: প্রথমত বংশলতিকায় পরিবেশিত সালগুলি সর্বদাগ্রাহ্য নয়; দ্বিতীয়ত ১৮৫৮ সালকে স্বর্ণকুমারীর জন্মসন হিসাবে গ্রহণ করা যায় না কারণ ঐ বৎসরে মহর্ষির কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করতে পারেন না। কোনো কোনো সমালোচক স্বর্ণকুমারীর জন্মসাল রূপে ১৮৫৮ খৃস্টাব্দের পরোক্ষ নির্দেশ দিয়েছেন[৪৭] বলে এ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হল। আবার কেউ কেউ বলেছেন ১৮৫৪ সালের কথা, তাও ধর্তব্য নয় কারণ ঐ বৎসর শরৎকুমারীর জন্ম। অতএব সমস্ত তথ্যনির্দেশ মনে রেখে বলা যায় ১৮৫৫ থেকে ১৮৫৭ সালের মধ্যবর্তী কোনো একটি বৎসরের ভাদ্রমাসে স্বর্ণকুমারী দেবীর জন্ম হয়েছিল। এখন কোন বৎসর সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাই নির্ণেয়।

একাধিক কারণে ১৮৫৭ সালের কথা বাদ দেওয়া উচিত। ইতিহাসের দিক থেকে বিখ্যাত সিপাহী বিদ্রোহের এই বৎসরটি মনে রাখা সহজ বলে কোথাও না কোথাও কোনও

৪৭ মন্মথনাথ ঘোষ, স্বর্ণ-স্মৃতি, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা আষাঢ় ১৮৫৪ শক: "অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্ণকুমারীর প্রথম গ্রন্থ দীপনির্বাণ উপন্যাস প্রকাশিত হয়।" অতএব হিসাব অনুসারে তাঁর জন্মসন পাওয়া যায় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ। কিন্তু তা ঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে কুড়ি বৎসর বয়সে তাঁর প্রথম উপন্যাস মুদ্রিত হয়েছিল।

না কোনও প্রসঙ্গে এর নিশ্চিত উল্লেখ থাকত, স্বর্ণকুমারীর জীবনী সংক্রান্ত কোনো রচনায় তা দুর্লভ। এই সালটি গ্রন্থাবলীর তৃতীয় ভাগে মাত্র একবার উল্লেখিত এবং তা অত্যন্ত শিথিল-ভাবে; সিপাহী বিদ্রোহের প্রসঙ্গ অনুচ্চারিত। তাছাড়া লেখিকার জীবনসম্বন্ধীয় অন্যান্য যে নির্দেশ পাওয়া যায় তার সঙ্গে ১৮৫৭ সালের কোনো সঙ্গতি নেই। যেমন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বামাবোধিনী পত্রিকা প্রভৃতিতে স্বর্ণকুমারীর বিবাহকালীন বয়সের যে উল্লেখ পাওয়া যায় তার সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ কালসীমা যথাক্রমে বার এবং চোদ্দ। অন্যান্য হিসাব বাদ দিয়েও বলা যায় যদি ১৮৫৭ খৃস্টাব্দকে জন্মবৎসর ধরা যায় এবং ১৮৬৭ সালের নভেম্বর মাসে যদি তাঁর বিবাহ হয়ে থাকে তবে এই উভয় তারিখের অন্তর্বর্তীকাল চোদ্দ তো দূরের কথা এগারও পূর্ণ হয় না। একাধিক কারণে ১৮৫৫ সালও বর্জনীয়। এ সম্বন্ধে বলা যায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের মত যোগেশচন্দ্র বাগল উক্ত বৎসরকে জন্মসালরূপে সসংশয়ে ব্যবহার করেছেন সরলা দেবীর জীবনের ঝরাপাতার (১৮৭৯ শক) পরিশিষ্টে। নানাকারণে গ্রন্থটির গুরুত্ব অবশ্যস্বীকার্য বলে এই নির্দেশ অনুপেক্ষণীয়। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডে (১৩৬৯) সুকুমার সেন বিনা দ্বিধায় ১৮৫৫ সালের ব্যবহার করেছেন। কিন্তু লেখিকা স্বয়ং একস্থানে বলেছেন চোদ্দ বৎসর বয়সে ১৮৭০ খৃস্টাব্দে তিনি বোম্বাই যাত্রা করেন। ১৮৭০ সালে যে তাঁর বয়স চোদ্দই ছিল তা পরে আলোচিত হবে, তাই ১৮৫৫ সাল গৃহীত হতে পারে না।

এবারে ১৮৫৬ খৃস্টাব্দ সম্বন্ধে আলোচনা করা যায়। নানাদিক থেকে বিচার করে দেখা গিয়েছে যে এই খৃস্টাব্দেই লেখিকার জন্ম হয়। ১৮৭০ সালে ১৪ বৎসর বয়সে তিনি বোম্বাই গমন করেন সেকথা একটু আগে বলা হয়েছে, সেদিক থেকে ১৮৫৬ সালকে জন্মবৎসর ধরা যেতে পারে। রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত দেবেন্দ্রনাথের দুটি পত্রের স্থান ও তারিখ যথাক্রমে 'চন্দননগর ৭ আষাঢ় ১৭৭৭' এবং 'চন্দননগর ২২ বৈশাখ ১৭৭৮'।[৪৮] তারিখ ও স্থান দেখে মনে হয় ১৭৭৭ শকের আষাঢ় মাস (১৮৫৫) থেকে ১৭৭৮ শকের বৈশাখ (১৮৫৬) পর্যন্ত মহর্ষি বাংলা দেশে ছিলেন। অতএব এতদুভয় তারিখের পরে স্বর্ণ-কুমারীর জন্ম হওয়া স্বাভাবিক। কন্যা হিরণ্ময়ীর একটি মন্তব্য থেকে জানা যায় বিবাহকালে জননী স্বর্ণকুমারীর বয়স ছিল বার বৎসর; অর্থাৎ স্বর্ণকুমারী বিবাহের বৎসরে ভাদ্রমাসে ১২ বৎসরে পদার্পণ করেছেন এবং অগ্রহায়ণ বা নভেম্বরে যখন বিবাহ হয় তখন তাঁর প্রকৃত বয়স ছিল এগার বৎসর দুমাসের চেয়ে কিছু বেশী। এখন ১৮৬৭ সালের নভেম্বরে

৪৮ দ্র পত্রাবলী, সংখ্যা ১৫ এবং ১৬, পৃ ১৫-১৭। পত্রাবলীর ১৪ থেকে ১৬ সংখ্যক এবং ৪২ থেকে ৪৫ সংখ্যক পত্রে উল্লিখিত স্থানকাল দেখে স্পষ্ট উপলব্ধ হয় যে মহর্ষি ২৩ বৈশাখ ১৭৭৭ শক থেকে ২২ বৈশাখ ১৭৭৮ শক পর্যন্ত বাংলাদেশে অবস্থান করেছিলেন।

বিবাহ কালে কন্যার বয়স যদি প্রায় এগার বৎসর দু-তিনমাস হয় তবে তাঁর জন্মসন স্বাভাবিকভাবে দাঁড়ায় ১৮৫৬ খৃস্টাব্দ, এই হিসাব থেকে জন্মমাস আগস্ট বা ভাদ্রও পাওয়া যায় বলে সমস্ত কিছুরই সঙ্গতি থাকে। কন্যা হিরণ্ময়ীর উক্ত মন্তব্য যে নির্ভরযোগ্য পরে তা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হবে। স্বরচিত 'সাহিত্য-স্রোত' গ্রন্থে কেশবচন্দ্রের জীবনসম্পর্কিত একটি প্রবন্ধে স্বর্ণকুমারী যা বলেছেন তা থেকে বোঝা যায় ১৮৬২ সালে তাঁর বয়স ছিল মাত্র ছয়। এই হিসাব থেকেও ১৮৫৬ সাল পাওয়া যাবে।

এই প্রসঙ্গে মন্মথনাথ ঘোষ প্রণীত 'স্বর্ণ-স্মৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধটির কথা পুনরায় উল্লেখযোগ্য। স্বর্ণকুমারীর মৃত্যুর পর স্মৃতিতর্পণের উদ্দেশ্যে রচিত প্রবন্ধটি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৮৫৪ শকের আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হয়; তারও পূর্বে দিল্লির বেঙ্গল লাইব্রেরি এণ্ড লিটারেরি সোসাইটির সাহিত্যবিভাগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ১৯৩২ সালের ১৬ জুলাই তারিখের স্মৃতিসভায় রচনাটি পঠিত হয়েছিল।[৪৯] ফলে এই প্রসিদ্ধ জীবনচরিত-রচয়িতা নিষ্ঠার সঙ্গে তথ্যাদি আহরণ করে প্রবন্ধটি নির্মাণ করেছিলেন, তাছাড়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল বলে এর তথ্যাবলীকে নির্ভরযোগ্য বলা যায়; আবার স্মৃতিতর্পণমূলক প্রবন্ধ বলে লেখিকার স্বর্গারোহণের পর তথ্যানুসন্ধিৎসু লেখকের পক্ষে প্রকৃত সত্য অবগত হয়ে প্রবন্ধ রচনা করাটা স্বাভাবিক ব্যাপার। মন্মথনাথ বলেছেন ১৮৫৬ খৃস্টাব্দের ২৮ আগস্টে লেখিকা জন্মগ্রহণ করেন। মন্মথনাথ ব্যক্তিগতভাবে যে লেখিকার সস্নেহ অন্তরঙ্গতা লাভ করেছিলেন সেকথা মূল প্রবন্ধে স্বীকৃত, সেই যোগাযোগের সুদীর্ঘ ইতিহাসপাঠে উপলব্ধ হয় মন্মথনাথ বহু তথ্য লেখিকার নিকট থেকে সংগ্রহ করেছিলেন; সুতরাং তাঁর মন্তব্যাদি প্রকৃত এবং বিশ্বাস্য। উক্ত প্রবন্ধপ্রকাশ ও লেখিকার তিরোধানের সমকালীন সাময়িক পত্রের অন্য একটি সংবাদ থেকে মন্মথনাথের তথ্য সমর্থিত হয়। ১৩৩৯ সালের প্রবাসীর শ্রাবণ সংখ্যায় এই তিরোধান সম্পর্কে বলা হয়েছে যে 'জীবনের ৭৫ বৎসর অতিক্রম করিয়া পরলোক গমন করিয়াছিলেন' স্বর্ণকুমারী। একাধিক সূত্র থেকে অবগত হওয়া যায় লেখিকার মৃত্যু হয়েছিল ১৩৩৯ সালের ১৯ আষাঢ় বা ১৯৩২ খৃস্টাব্দের ৩ জুলাই। ১৮৫৬ খৃস্টাব্দের ২৮ আগস্ট তারিখে তাঁর জন্ম হয়েছিল—একথা ধরে নিলে মৃত্যুকালে তিনি পঁচাত্তর বৎসর অতিক্রম করেছিলেন অর্থাৎ তখন তাঁর প্রকৃত বয়স ছিল পঁচাত্তর বৎসর দশমাসের একটু বেশি। প্রবাসীর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে লেখিকার ঘনিষ্ঠতা ছিল দীর্ঘকাল থেকে এবং প্রদীপ পত্রিকা প্রকাশের সময় থেকে তা ঘনিষ্ঠতর হতে থাকে।[৫০] সুতরাং প্রত্যাশা করা যায় লোকান্তরিত লেখিকার প্রতি শ্রদ্ধা

---

৪৯ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা আষাঢ় ১৮৫৪ শক, পৃ ৯০, পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৫০ শান্তা দেবী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও প্রদীপ, দেশ ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৪৪, পৃ ১৭২।

নিবেদনকালে প্রখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে নির্ভরযোগ্য সংবাদ পরিবেশন করেছিলেন। এসম্পর্কে আরও কয়েকটি তথ্য প্রদত্ত হল। প্রভাতকুমার রবীন্দ্রজীবনীর মধ্যে সংশয় প্রকাশ করলেও অন্যত্র[৫১] নিঃসংশয়ে ১৮৫৬ খৃস্টাব্দ গ্রহণ করে নিয়েছেন। লেখিকার তিরোধানের কয়েক বৎসর পরে ১৯৩৬ সালের ২০ ডিসেম্বর তারিখের সানডে স্টেটসম্যানে স্বর্ণকুমারী সম্বন্ধে প্রকাশিত প্রবন্ধের লেখিকা উল্লেখ করেছেন যে ১৮৫৬ সালের ২৮ আগস্ট কলিকাতার জোড়াসাঁকোয় স্বর্ণকুমারীর জন্ম হয়েছিল ;[৫২] উক্ত প্রবন্ধে তিনি অন্যান্য যে সনতারিখসম্বলিত তথ্য দিয়েছেন তা যথাযথ বলে এই সংবাদ বিশ্বাসযোগ্য। অন্যত্র পাওয়া যায় ১২৬৩ সালের ১৪ ভাদ্র বা ১৮৫৬ খৃস্টাব্দের ২৮ আগস্টের নির্দেশ।[৫৩] পঞ্জিকার নির্দেশানুসারে বলা যেতে পারে উক্ত দিবস ছিল বৃহস্পতিবার।

লেখিকার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ১৩৩৯ সালের ভারতবর্ষ পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় যে বিশেষ শোকসংবাদ প্রকাশিত হয় তাতে বলা হয়েছিল, "আমরা আয়োজন করিতেছিলাম, আগামী ১৪ই ভাদ্র তিনি সাতাত্তর বৎসর পূর্ণ করিলে আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিব,··· ১২৬৪ সাল (ইং ১৮৫৭) ১৪ই ভাদ্র স্বর্ণকুমারী দেবীর জন্ম হয়।" জন্মতারিখ হিসাবে ১৪ ভাদ্র নির্ভুল হলেও জন্মসালটি প্রমাদপূর্ণ। ভারতবর্ষের নির্দেশানুযায়ী ১৩৩৯ সালের ১৪ ভাদ্র তারিখে যদি সাতাত্তর পূর্ণ হয় তাহলে লেখিকার জন্মসন দাঁড়ায় ১২৬২ সাল বা ১৮৫৫ খৃস্টাব্দ, অধিকন্তু জন্মসন হিসাবে যে ১২৬৪ সাল এবং ১৮৫৭ খৃস্টাব্দ উদ্ধৃতিতে ব্যবহৃত তা লক্ষণীয় ; উভয় মন্তব্যের মধ্যে অসঙ্গতি প্রভূত পরিমাণে বিদ্যমান। এতদ্ব্যতীত পঞ্জিকানুযায়ী ১৮৫৫ খৃস্টাব্দের ২৮ আগস্ট ১২৬২ সালের ১৪ ভাদ্র নয়, ১৩ ভাদ্র ; পক্ষান্তরে ১৮৫৬ খৃস্টাব্দের ২৮ আগস্ট আর ১২৬৩ সালের ১৪ ভাদ্র একই দিনে পড়ে। সেদিক থেকে শেষোক্তটি সমর্থনযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে ১৩৩৯ সালের ১৪ ভাদ্র তারিখে তাঁর বয়স ছিয়াত্তর পূর্ণ হত, সাতাত্তর নয়। সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা নামক পত্রিকায় প্রকাশিত 'শোকাঞ্জলি' থেকে আমাদের সিদ্ধান্তের আনুকূল্য পাওয়া যায়,[৫৪] এই পত্রিকার সঙ্গে ঠাকুরপরিবারের বিশেষত স্বর্ণকুমারীর প্রত্যক্ষ আত্মীয়তা ছিল এবং এর প্রদত্ত তথ্যাবলীর সঙ্গে অন্যান্য নির্দেশের সুন্দর সঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়।

---

৫১ রবীন্দ্রবর্ষপঞ্জী, ১৯৬২ ডিসেম্বর, পৃ ৭।

৫২ Padmini Sathianadhan, They paved the way : Swarna Kumari Debi, The Sunday Statesman, 20 December, 1936.

৫৩ অনিলচন্দ্র ঘোষ, বাংলার বিদুষী, ১৩৩৪, পৃ ৩১।

৫৪ সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা শ্রাবণ ১৩৩৯, পৃ ২৫৫ : "সাহিত্য: সেবক সমিতি কর্তৃক তাঁর বড়সপ্ততিতম জয়ন্তী উৎসবের আয়োজন প্রস্তাবিত হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দেশবাসীর অদৃষ্টে তাহা ঘটিল না।"

এইসকল আলোচনা থেকে স্বর্ণকুমারী দেবীর আবির্ভাবকাল হিসাবে ১৮৫৬ খৃস্টাব্দের ২৮ আগস্ট বা ১২৬৩ সালের ১৪ ভাদ্র বৃহস্পতিবারকে দৃঢ়তার সঙ্গে গ্রহণ করা যায়। কন্যার জন্মকালে মহর্ষি কলিকাতাতেই ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীতে প্রদত্ত সময়সূচী এবং সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক লিখিত পরিশিষ্ট পাঠে জানা যায় ১৮৫৬ সালের (১৭৭৮ শক) শ্রাবণ মাসে দেবেন্দ্রনাথ সংসারে বিরক্ত হয়ে বরাহনগরে নির্জনবাস করে শাস্ত্রপাঠ এবং ধর্মালোচনায় গভীর মনোনিবেশ করেন। ঐসময় মুক্তভাবে বিচরণের যে বাসনা হৃদয়ে জাগ্রত হয় তন্নিমিত্ত তিনি দীর্ঘকালের জন্য দেশত্যাগ করে ভ্রমণে বহির্গত হয়েছিলেন; সেপ্টেম্বর মাসে 'দেশত্যাগ করিবার পূর্বে চারি পুত্রকে লইয়া কিছুকাল পদ্মানদীতে যাপনে'র মনস্থ করেন এবং সেখান থেকে ৩ অক্টোবর তারিখে (১৮৫৬) তিনি কাশী অভিমুখে যাত্রা করেন।[৫৫] এপ্রসঙ্গে যে বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ তা হল এই যে ১৮৫৬ সালের সেপ্টেম্বরে কলিকাতা ত্যাগের পূর্বে তিনি নবজাত কন্যার মুখ দর্শন করেছিলেন; সম্ভবত প্রসূতিকে বিপন্মুক্ত দেখে নিশ্চিন্তমনে দীর্ঘকালের ভ্রমণে বহির্গত হয়েছিলেন দেবেন্দ্রনাথ, এরূপ মনে করা সঙ্গত ও স্বাভাবিক। এই ভ্রমণ (অক্টোবর ১৮৫৬-নভেম্বর ১৮৫৮) মহর্ষির জীবনকে স্বর্ণপ্রসূ করে তুলেছে, সিমলায় অবস্থানকালে[৫৬] তিনি ঈশ্বরাদেশ সিদ্ধিলাভ প্রভৃতি যে বিরাট আধ্যাত্মিক সাফল্য অর্জন করেন তা এই ভ্রমণপর্বে সম্ভব হয়েছিল; সদ্যোজাত কন্যার শুভ আবির্ভাবে সেই সম্ভাবনা সূচিত হয়েছে।

সেকালের অন্তঃপুরশিক্ষা ও স্বর্ণকুমারীর বাল্যকাল

১

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্যশিক্ষা প্রবর্তিত হওয়ার পূর্ববর্তীকালে এদেশে স্ত্রীশিক্ষা সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটুটারি কমিশনের সহকারী কমিটি ১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বরের রিপোর্টে স্বীকার করেছেন যে প্রাচীন বাঙালি হিন্দু বা মুসলমান মহিলাগণ ধর্মীয় সাহিত্য ও প্রাচীন শাস্ত্রে সবিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদের

৫৫ সময়সূচী, আত্মজীবনী, পৃ ৩৮-৪১; পরিশিষ্ট, পৃ ৪০০-০২।

৫৬ "সিমলায় দেবেন্দ্রনাথ এক বৎসর ৮ মাস কাল অবস্থিতি করেন।...এই সময়ের মধ্যে তিনি তিন বার সিমলা ত্যাগ করিয়া তিন স্থানে গিয়াছিলেন।" ঐ পৃ ৪০১। সম্ভবত সিমলায় অবস্থানকাল কুড়ি মাস নয়; ১৮৫৭ সালের ২৭ এপ্রিল সিমলা শৈলারোহণ আরম্ভ এবং ১৮৫৮ এর ১৬ অক্টোবর বিজয়া দশমীতে সিমলা ত্যাগ করেন, তাহলে অবস্থান বা অন্তর্বর্তীকাল দাঁড়ায় এক বৎসর পাঁচ মাসের একটু বেশি। দ্র ঐ পৃ ৪০-৪১।

বিদ্যাসুন্দর কাব্যের নায়িকার শিক্ষাভিমান নিতান্ত প্রথানুবর্তন-সম্ভূত নয়, ঐতিহ্যানুগ। অষ্টাদশ শতাব্দীর পদ্মাপুরাণকার দ্বিজ বংশীদাস বা বংশীবদন চক্রবর্তীর কন্যা রামায়ণ-রচয়িতা চন্দ্রাবতীর কবিপ্রতিভা সে যুগেও প্রশংসনীয় ছিল; বিক্রমপুরের অধিবাসী চণ্ডীমঙ্গল-প্রণেতা জয়নারায়ণ রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী দয়াময়ী-আনন্দময়ী এবং ভাগিনেয়ী গঙ্গার খ্যাতি সাহিত্যসমালোচকের স্বীকৃতি অর্জন করেছে, বিশেষত সত্যনারায়ণের পাঁচালি বিষয়ক হরিলীলা রচনায় (১৭৭২-৭৩) আনন্দময়ী পিতৃব্যকে সাহায্য করেছিলেন।[৫৭] 'চতুষ্পাঠীর যুগে বিদুষী বঙ্গমহিলা'রূপে হটী বিদ্যালঙ্কার, হটু বিদ্যালঙ্কার ও দ্রবময়ী দেবীর কার্যকলাপ সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার ৮৭তম সংখ্যায় আলোচিত হয়েছে; শ্রীরামপুর মিশনের উইলিয়ম ওয়ার্ড তাঁর গ্রন্থে হটীর স্মৃতি ব্যাকরণ নব্যন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্রে গভীর অধিকার সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন;[৫৮] রাজা নবকৃষ্ণের পত্নীগণের বিদ্যাধিকারের কথা অবগত হওয়া যায় ওয়ার্ডের অন্য একটি মন্তব্য থেকে।[৫৯] রাজা রাধাকান্ত দেব তাঁর ফিমেল এডুকেশন ইন ক্যালকাটা শীর্ষক গ্রন্থে স্বীকার করেছেন যে তাঁর অন্তঃপুরের অধিকাংশ রমণী বিদুষী ছিলেন। সীতানাথ তত্ত্বভূষণ সোসিয়াল রিফর্ম ইন বেঙ্গল গ্রন্থে ফরিদপুর জেলার কাটালিপাড়া গ্রামের জনৈক বিদ্বানের ব্রাহ্মণী শ্যামাসুন্দরীর ব্যাকরণ ও ন্যায়শাস্ত্রচর্চার কথা উল্লেখ করেছেন (পৃ ৩৮), এ সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত সংবাদপত্রে সেকালের কথার প্রথম খণ্ডে বিবিধ তথ্য পাওয়া যায়। সীতানাথের পুস্তক থেকে অবগত হওয়া যায় যে সেকালের বৈরাগিনী ও সন্ন্যাসিনী সম্প্রদায়ের প্রাচীন সংস্কৃতশাস্ত্রে বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থে এবং লোকায়ত আঞ্চলিক সাহিত্যে বিশেষ আগ্রহ বর্তমান ছিল; ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে শান্তিপুর ও নদীয়া এই দুই বৈষ্ণব পীঠস্থানের কোনো কোনো মহিলা ছিলেন known not only to possess a rudimentary knowledge of the vernacular, but some even acted as public preachers. সায়ের-উল-মতাক্ষরীনের দ্বিতীয় ভাগে মুসলমান রমণীবৃন্দের শিক্ষাচর্চার পরিচয় বিদ্যমান।

ধর্মীয় উদ্দেশ্য ব্যতীত সাধারণভাবে স্ত্রীসমাজে বিদ্যার প্রতি আগ্রহের প্রমাণ দুর্লভ নয়। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের বিশেষ প্রতিনিধিরূপে উইলিয়ম অ্যাডাম ১৮৩৩-৩৪ সালে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা পর্যবেক্ষণকালে মন্তব্য করেছেন যে প্রধানত বৈষ্ণবগণ তাঁদের দুহিতাদের শিক্ষাপ্রদানে উৎসাহী ছিলেন। মাতৃভাষা শিক্ষাসংক্রান্ত দ্বিতীয় রিপোর্টে অ্যাডাম মন্তব্য

---

৫৭ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ড অপরার্ধ, ১৯৬৫, পৃ ৪২৭।

৫৮ Account of the Writings, Religion, and Manners, of the Hindoos including Translations from their Principal Works, vol. I, 1811, pp 195-96.

৫৯ History of the Hindoos, Vol. I, 1818, p 399.

করেন, They (the Zamindars) in general instruct their daughters in the elements of knowledge, although it is difficult to obtain from them an admission of this fact. They hope to marry their daughters into families of wealth and property and they perceive that without a knowledge of writing and accounts their daughters will, in the event of widowhood, be incompetent to manage their deceased husband's estates, and will unavoidably a prey to the interested and unprincipled....Instances sometimes occur of young Hindu females who have received no instructions under their parents' roof, taking lessons at the instigations of their parents, after they have become widows with a view to adequate protection of the families of which they have become members.[৬০]

২

ইংরেজশাসনের পূর্ববর্তীকাল পর্যন্ত নানা কারণে বাংলা দেশের স্ত্রীসমাজ অনগ্রসর ও অশিক্ষিত ছিল। কালক্রমে পাশ্চাত্ত্যশিক্ষার মহৎ সংস্পর্শ লাভ করার পর মানুষের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হতে থাকে এবং রুচিও বদলাতে থাকে, তখন নারী জাতির নেপথ্যোচিত ভূমিকা ও হৃতসর্বস্ব মূর্তি এতদ্দেশীয় জনসাধারণের নিকট পীড়াদায়ক হয়ে উঠল ; ফলত স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা সম্বন্ধে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ প্রত্যক্ষভাবে সহানুভূতিশীল হয়ে উঠলেন। ঐসময় ভারতবন্ধু কয়েকজন বিদেশীয় স্ত্রীপুরুষ এই ব্যাপারে সক্রিয় সাহায্যদানে কৃতসংকল্প হলে এতদ্দেশীয় বুদ্ধিজীবী ও সমাজসংস্কারকগণ তাঁদের এই মহত্ত্বকে সাদর সম্বর্ধনা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন এবং এর পরিণামে স্ত্রীশিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটতে থাকে। কিন্তু ১৮৪৯ খৃস্টাব্দের ৭ মে তারিখে বেথুন কর্তৃক বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বপর্যন্ত শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যাগণকে প্রকাশ্যে বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করতে দেখা যায় নি।[৬১]

এদেশে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদর্শসম্মত স্ত্রীশিক্ষা যখন প্রবর্তিত হয় নি তখনও অন্তঃপুরিকাগণ একেবারে 'অ-শিক্ষিত' ছিলেন না। পূর্বেই বলা হয়েছে, সেকালের কোনো কোনো সম্ভ্রান্ত অভিজাত পরিবারের স্ত্রীলোকগণ বিশেষভাবে শিক্ষিত ছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্ম-জীবনী পাঠে জানা যায় তাঁর জন্মের (৩১ জানুয়ারি ১৮৪৭) বহুপূর্বে জননী গোলোকমণি

৬০ দ্র Kalikinkar Datta, Education and Social Amelioration of Women in Pre-Mutiny India, 1936, p 5.

৬১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্র সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ১৭ সংখ্যক গ্রন্থ, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, ১৩৬৩, পৃ ৫।

দেবী পতিগৃহে বিবিধ উপায়ে বিদ্যাশিক্ষা করতেন, শাস্ত্রী মহাশয়ের বাল্যশিক্ষায় জননীর সহায়তার কথাও উল্লিখিত হয়েছে উক্ত গ্রন্থে। শিবনাথ বলেছেন, "আমার মাকে অন্নদামঙ্গল, রামায়ণ, মহাভারত, রোমিও জুলিয়েট প্রভৃতি পড়িতে দেখিয়া তাঁর (জনৈক প্রতিবেশিনীর) লেখাপড়া শিখিবার বড় ইচ্ছা হইয়াছিল।"[৬২] উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চব্বিশ পরগণার একটি গ্রামের জনৈক সাধারণ গৃহস্থবধূর ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি প্রীতি বড়ই আশ্চর্যের বিষয়। প্রসন্নময়ী দেবী (১৮৫৭-১৯৩৯) বরেন্দ্রভূমির বিখ্যাত চৌধুরী বংশের রমণীকুলের শিক্ষা ও শিক্ষণীয় বিষয়ের একটি প্রসঙ্গ অবতারণা করেছেন তাঁর স্মৃতিকথায়, "আমরা শৈশবে অনেক সময়ই বালকবেশে কাছারী বাড়ীতে সরকারের নিকট পড়িতে যাইতাম।...পাঠশালায় যাইবার রীতি ছিল না। গ্রাম্য কালীবাড়ীর স্কুলে গৃহের বালকগণ পড়িতে যাইত। আমরা কেবলমাত্র প্রাতে একবার তালপত্রে লেখা শিখিতাম ও দাতাকর্ণের উপাখ্যান প্রভৃতি পড়িতাম।"[৬৩] অবশ্য প্রসন্নময়ীর পিতা পাবনার বিখ্যাত অভিজাতবংশীয় দুর্গাদাস চৌধুরী পরবর্তীকালে কন্যার বিদ্যার্জনে আগ্রহ লক্ষ করে সুব্যবস্থা করেন, নিযুক্ত জনৈক ফিরিঙ্গি মেম ইংরেজি ও শিল্পকার্য শিক্ষা দিতে আসতেন। প্রসন্নময়ী তাঁর স্মৃতিকথায় পাবনা অঞ্চলে স্ত্রীশিক্ষাব্যবস্থার একটি মনোহর আলেখ্য রচনা করেছেন, "আমাদের গ্রামের অধিকাংশ রমণী তৎকালেও লেখাপড়া জানিতেন। ছাপার পুস্তক পাঠ ও নাম স্বাক্ষর করিতে না পারিতেন এমন নারী সেকালে অল্পই ছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ রীতিমত লেখাপড়া জানিতেন, কেহ বা কাজ চালাইতে পারিতেন এই যাহা প্রভেদ। আমার মধ্যমা পিতৃস্বসা ৺ভগবতী দেবী, ছোট তরফের ৺কৃষ্ণসুন্দরী দেবী ও নপিসীমাতা মৃন্ময়ী দেবী বেশ লিখিতে পড়িতে পারিতেন, তবে কাশীশ্বরী (জনৈক বালবিধবা) সর্বাপেক্ষা পণ্ডিতা, ছোট ছোট বালকবালিকাগণ তাঁহার নিকট লেখাপড়া শিখিতে যাইত।...কাশীশ্বরী তীর্থ ভ্রমণ করিয়া 'হঠি তর্কালঙ্কার' সাজিয়া মুণ্ডিত মস্তকে গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া এক পাঠশালা খুলিয়া বসিলেন,...।" সত্যেন্দ্রপত্নী জ্ঞানদানন্দিনীর আত্মকথা থেকে জানা যায় তাঁর পিতা অভয়াচরণ মুখোপাধ্যায় যশোরের নরেন্দ্রপুরে নিজের বাড়িতে যখন পাঠশালা বসান তখন সেই পাঠশালায় ছোটমেয়ে জ্ঞানদানন্দিনী (জন্ম ১৮৫২) পাঠলাভ করেছিলেন: "সে সময় ওদেশে মেয়েদের লেখাপড়া বড় নিন্দনীয় ছিল। আমি একদিন রাত্রে হঠাৎ জেগে উঠে মাথা তুলে দেখি যে আমার মা কি লিখছেন না পড়ছেন...আমাদের এক প্রতিবেশিনী বয়স্কা আত্মীয়া লেখাপড়া জানতেন, লোকনিন্দার ভয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে হিসেব-কিতেব চিঠিপত্র লিখতেন।...পাঠশালা সম্বন্ধে আমার যা-কিছু জ্ঞান তা এই

৬২ মাতার কাছে পাঠশিক্ষা, আত্মচরিত, ১৯৫০, পৃ ৩২

৬৩ পূর্ব্বকথা, ১৩২৪, পৃ ৪৪।

পাঠশালা থেকেই হয়েছিল ; যদিও তখন আমার চার পাঁচ বছরের বেশি বয়স হবে না।"[৬৪] সুদূর পল্লীঅঞ্চলে সেকালের স্ত্রীশিক্ষার এ এক অমূল্য চিত্র।

সমকালীন কলিকাতার বিভিন্ন অভিজাত পরিবারে অন্তঃপুরশিক্ষার উপযোগী বিচিত্র আয়োজন ছিল। রাজা নবকৃষ্ণ ও রাজা রাধাকান্তের অন্তঃপুরপ্রসঙ্গ পূর্বেই উত্থাপিত। তাছাড়া কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতোম প্যাচার নকশার মধ্যে আছে, "আমাদের বুড়ো ঠাকুরমা রোজ রাত্তিরে শোবার সময় 'বেঙ্গমা-বেঙ্গমী' 'পায়রা রাজা' 'রাজপুত্তুর, পাত্তরের পুত্তুর, সওদাগরের পুত্তুর ও কোটালের পুত্তুর চারবন্ধু' 'তালপত্তরের খাঁড়া জাগে ও পক্ষিরাজ ঘোড়া জাগে' ও 'সোণার কাটি রূপোর কাটি' প্রভৃতি কতরকম উপকথা কইতেন। কবিকঙ্কণ ও কাশীদাসের পয়ার মুখস্থ আওড়াতেন...।"[৬৫] কালীপ্রসন্ন গ্রন্থের অন্যত্র এই পরিবারের 'বাঙ্গালা ভাষার উপর বিলক্ষণ ভক্তি'র কথা উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর পিতামহী জননী প্রভৃতির শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহের নানাপ্রসঙ্গকথা উত্থাপিত হয়েছে। প্যারী-চাঁদ মিত্র (জন্ম ১৮১৪) তাঁর 'আধ্যাত্মিকা' পুস্তকের ইংরেজি ভূমিকায় এইরূপ লিখেছেন যে শৈশবে তিনি যখন পাঠশালায় অধ্যয়ন করতেন তখন দেখেছেন তাঁর পিতামহী মাতৃদেবী ও অন্যান্য আত্মীয়া সকলেই বাংলাপুস্তকপাঠে অভ্যস্ত, বাংলা লেখা ও হিসাব রক্ষায় তখন তাঁরা সবিশেষ পারদর্শী।[৬৬] স্পষ্টত একথা উপলব্ধ হয় যে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবার এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চলের বিভিন্ন অভিজাত বংশের অন্তঃপুরিকাগণের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার একটা ক্ষীণ ধারা পূর্বাবধি প্রবাহিত হয়ে আসছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত স্ত্রীলোকগণের অবস্থা ও মর্যাদা বিশেষ উন্নত ছিল না। সামাজিক মানুষ হিসাবে স্ত্রীলোকের মৌলিক অধিকার মর্যাদা সম্মান ও সম্ভ্রম অবশ্যপ্রাপ্য— একথা রামমোহন নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছিলেন, অবহেলিত সম্প্রদায়ের মত অস্বীকৃত ও উপেক্ষিত নারীসমাজের মুখপাত্ররূপে একদা তিনি লেখনী ধারণ করেছিলেন ; কেবল সতীদাহ বা সহমরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণাতেই তাঁর কর্তব্য নিঃশেষিত হয়ে যায় নি, বহুবিবাহ-বাল্যবিবাহের বিপক্ষে এবং নারীর দায়াদাধিকারের সপক্ষেও তিনি সেকালে দুঃসাহসিক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন।[৬৭] স্ত্রীজাতির এইসকল অধিকার অর্জনের জন্য স্ত্রীশিক্ষার

৬৪ ছেলেবেলার কথা : বাপের বাড়ী, পুরাতনী, পৃ ৯।

৬৫ হুতোম প্যাঁচার নকশা, ১৩৫৪, পৃ ৮২।

৬৬ যোগেশচন্দ্র বাগল, বাংলার স্ত্রীশিক্ষা : ১৮০০-১৮৫৬, ১৩৫৭, পৃ ১।

৬৭ দ্র Brief Remarks regarding Modern Encroachments on the Ancient Rights of Females, according to the Hindu Law of Inheritance, By Rammohun Roy, Calcutta: Printed at the Unitarian Press, 1822.

প্রয়োজনীয়তা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেন। সমসাময়িক সমাজপতি রাজা রাধাকান্ত দেবও স্ত্রীশিক্ষার প্রতি যথেষ্ট আনুকূল্য প্রদর্শন করেছিলেন এবং তজ্জন্য সংস্কৃত সাহিত্য-শাস্ত্রগ্রন্থাদি থেকে হিন্দুরমণীর বিদ্যাচর্চার বহু প্রমাণ সংগ্রহ করে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারকে দিয়ে 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' নামক পুস্তিকাটি রচনা করিয়েছিলেন।[৬৮] স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন ও প্রসারের কার্যে পুস্তিকাটি প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করে। গ্রন্থের পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণে (১৮২৪) 'দুই স্ত্রীলোকের কথোপকথন' যুক্ত হয়;[৬৯] দ্বিতীয়ভাগের নাম 'স্ত্রীলোকের বিদ্যাভ্যাসের প্রমাণ,' বলা বাহুল্য এই দ্বিতীয় ভাগটিতে রাধাকান্ত দেবের সাহায্যের পরিমাণ অধিকতর। দুজন রমণীর 'কথোপকথনে'র মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে বলা হয়েছে; স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে যে সমস্ত মত আছে তার অধিকাংশই অযৌক্তিক, গৌরমোহন একটির পর একটি খণ্ডন করে চলেছেন: "সেকালের স্ত্রীলোকেরা কহেন, যে লেখাপড়া যদি স্ত্রীলোকে করে তবে সে বিধবা হয় একি সত্য কথা? ...না বইন, সে কেবল কথার কথা। কারণ আমি আমার ঠাকুরানী দিদির ঠাঁই শুনিয়াছি যে কোন শাস্ত্রে এমত লেখা নাই, যে মেয়্যা মানুষ পড়িলে রাঁড় হয়।...কত স্ত্রীলোকের বিদ্যার কথা পুরাণে শুনিয়াছি, ও বড় ২ মানুষের স্ত্রীলোকেরা প্রায় সকলেই লেখাপড়া করে এমত শুনিতে পাই।" চরিত্র ও কথোপকথন কাল্পনিক হতে পারে কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে ১৮২৪ খৃস্টাব্দেরও আগে (গ্রন্থটি ১৮২২ সালে প্রথম রচিত, পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত ১৮২৪ সালে) সমাজের উচ্চ কোটির অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত ছিল। কথিত প্রশ্নোত্তরিকার এক স্থানে বলা হয়েছে, "আমারদের দেশের

৬৮ J. C. Bagal, Beginnings of Modern Education in Bengal: Women's Education, Appendix 70—Radhakanta Deb's Letter to J. E. D. Bethune.

৬৯ "স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক। / অর্থাৎ / পুরাতন ও ইদানীন্তন ও বিদেশীয় স্ত্রীলোকের / শিক্ষার দৃষ্টান্ত ও কথোপকথন। / কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির মুদ্রাগৃহে মুদ্রিত হইল / বাং সন ১২৩১। / An Apology for Hindoo Female Education; / Containing / Evidence in Favour / of the / Education of Hindoo Females, / from the examples of illustrious Women, / Both Ancient and Modern / Third Edition Enlarged." প্রথম সংস্করণের পরিচয়পত্র এইরূপ: "স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক। অর্থাৎ পুরাতন ও ইদানীন্তন ও বিদেশীয় স্ত্রীলোকের শিক্ষার দৃষ্টান্ত। কলিকাতার মিশুন মুদ্রাগৃহে মুদ্রিত হইল বাং সন ১২২৮। The Importance of Female Education; or evidence, in favour of the Education of Hindoo Females, from the examples of illustrious women, both ancient and modern. Calcutta: Printed at the Baptist Mission Press, for the Female Juvenile Society for the Establishment and Support of Bengalee Female Schools, 1822." প্রথম সংস্করণ ১৮২২ সালের মার্চে, দ্বিতীয় সংস্করণ ঐ বৎসর আগস্টে ও তৃতীয় সংস্করণ ১৮২৪ সালে প্রকাশিত হয়। স্কুলবুক সোসাইটির ষষ্ঠ রিপোর্ট পাঠে জানা যায় তৃতীয় সংস্করণে গ্রন্থটির অবয়ব দ্বিগুণ বর্ধিত হয় এবং প্রয়োজনবোধে ভাষা সরলীকৃত।

স্ত্রীলোকের লেখাপড়ার পদ্দি আগে ছিল না, এইজন্যে কিছুদিন কেহ করে নাই। কিন্তু প্রথম ইং ১৮২০ শালের জুন মাসে শ্রীযুত সাহেব লোকেরা এই কলিকাতায় নন্দনবাগানে যুবনাইল পাঠশাল[৭০] নামে এক পাঠশালা করিলেন, তাহাতে আগে কোন কন্যা পড়িতে স্বীকার করিয়াছিল না, এইক্ষণে এই কলিকাতায় প্রায় পঞ্চাশটা স্ত্রী পাঠশালা হইয়াছে। তাহার প্রত্যেক পাঠশালায় ন্যূন সংখ্যাতে ১৬ জন কন্যা গণনা করিলেও ৮০০ কন্যার শিক্ষা হইতেছে, ইহাতে কাহারও কিছু ক্ষতি কিম্বা অখ্যাতি হয় নাই।"[৭১]

রাজা রাধাকান্ত দেববাহাদুর ১৮২১ সালের ১০ ডিসেম্বর তারিখে তৎকালীন স্কুলবুক সোসাইটির ইউরোপীয় সেক্রেটারিকে যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে বলা হয়, none of the good and respectable Hindoo families will give her access of their Women's Apartment, nor send their females to her school (Miss Cooke's School) if organized. They may be all convinced of the utility of getting their female children taught at home in Bengalee, by their domestic school mistress, as some families do, before such female children are married, or arrived at the age of 9 or 10 years at farthest.[৭২] এ চিঠি পাঠকালে বোঝা যায় ১৮২১ সালের আগে গৃহশিক্ষিকার (domestic school mistress) সাহয্যে কোনো কোনো পরিবারের ললনাগণের শিক্ষাকার্য সম্পন্ন হত। এক্ষেত্রে রাধাকান্তের সংশয় প্রকাশিত হয়েছে যে শ্রীমতী কুকের স্কুলে কোনো অভিজাত বংশীয় বালিকা পাঠগ্রহণ করবেন না, অথচ রাধাকান্তেরই পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত গৌরমোহনের 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' এর তৃতীয় সংস্করণে (১৮২৪) দেখা যায় পূর্বোক্ত চিঠির প্রায় তিন বছরের মধ্যে কলিকাতায় অন্তত ৫০টি স্কুলে ৮০০ বালিকা শিক্ষাগ্রহণ করছে। মাত্র তিন বৎসরেরও কম সময়ের ব্যবধানে স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক মনোভাব কত উদার ও আগ্রহ কত ব্যাপক হয়ে উঠেছে তা এই আলোচনা থেকে বোঝা যায়। বিদেশীয় রমণীগণের সাহায্যে শিক্ষাগ্রহণকে আর নিন্দনীয় জ্ঞান করা হচ্ছে না। অবশ্য সমাজের সর্বস্তরে যে এই উপায় গৃহীত হয়েছিল তাও নয়। গৌরমোহনের গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে গ্রামের পাঠশালায় কন্যাগণ শিক্ষার জন্য যেতে পারেন না, তাই এই অসহায় রমণীসমাজ বলেছেন, "আমরা তো ভালমানুষের কন্যা পাঠশালায় গেলে ভাই বাপ গালি দিবে। সাহেব লোকের পাঠশালার কোন শিক্ষিতা কন্যা আনিয়া ঘরের মধ্যেই শিখিব।" তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আশঙ্কা প্রকাশ করছেন যে দারিদ্র্যবশত শিক্ষিকাকে দক্ষিণা দেওয়া সম্ভব হবে না তাঁদের পক্ষে ;

৭০ গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক, ১৩৪৪, ভূমিকা ।৵০ : "ফিমেল জুভিনাইল সোসাইটি এই জুভিনাইল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।"

৭১ ঐ পৃ ৯।

৭২ ঐ ভূমিকা ।০-।৵০

উত্তরে আরেকজন আকুল আবেদন করেছেন, "যদি সাহেব লোকেরা দয়া করিয়া ধর্ম্মার্থে ভালমানুষের বাড়ীতে এক ২ জন বালিকা পাঠান তবে বুঝি হয়।" প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক রচনার বহু পরে কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মবন্ধুসভা (১৮৬৪) স্থাপিত হয়। নারীশিক্ষার প্রসারোদ্দেশ্যে পরবর্তীকালেও পুস্তিকাসমূহ রচিত হয়েছে। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'পতিব্রতোপাখ্যান' (জানুয়ারি ১৮৫৩) থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত হল: "এই বসুন্ধরা মধ্যে প্রায় যাবতীয় ভদ্রব্যক্তি এক্ষণে স্ব স্ব পুত্রকে সাদরে বিদ্যাশিক্ষা করাইতেছেন,…কিন্তু এতদ্দেশীয় অভাগা যোষাজাতির প্রতি কেহই দৃষ্টিক্ষেপ করেন না, ইহারা কন্যাসন্তানকে অনাস্থা করিয়া যে বিদ্যা শিক্ষা করান না এমত নহে অস্মদ্দেশীয়েরা অতি ধনলোভি ইহারা কহেন কন্যারা কি ধনোপার্জ্জন করিবে যে তাহাদিগকে বিদ্যা শিক্ষা করান আবশ্যক…বিদ্যারসে স্ত্রীজাতিকে বঞ্চিত রাখা কদাপি যুক্তিযুক্ত নহে। স্ত্রীজাতিকে বিদ্যাশিক্ষা না করাইলে অনেকানেক দৃষ্ট দোষ আছে…।"[৭৩] ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্র সংবাদ সাধুরঞ্জনের ২৮মে ১৮৪৯ তারিখের (১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৬) সংখ্যায় প্রকাশিত জনৈক অজ্ঞাতনামা লেখকের 'স্ত্রীবিদ্যা বিষয়ে দুইজন স্ত্রীলোকের কথোপকথন' শীর্ষক রচনাটি প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য; বেথুনস্কুল প্রতিষ্ঠার (৭ মে ১৮৪৯) স্বল্পকাল পরে মুদ্রিত রচনাটিতে কথিত বালিকা-বিদ্যালয়ের সম্বন্ধে অনেক আশা-প্রত্যাশার কথা বর্তমান, প্রবন্ধে পরিবেশিত সেকালের শিশিক্ষু স্ত্রীসমাজের নানাবিধ আকাঙ্ক্ষা তৎসময়োচিত দুঃসাহসিকতার পর্যায়ে উন্নীত।[৭৪]

১৮১৩ খৃস্টাব্দে কোম্পানির নূতন সনদ লাভ করার পর খৃস্টান মিশনরিদের প্রচেষ্টায় কলিকাতায় ও মফস্বলে বহু শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। তাঁরাও কিন্তু প্রথমে প্রত্যক্ষ-ভাবে স্ত্রীবিদ্যালয় স্থাপনে অগ্রণী হন নি, সে সম্মান প্রাপ্য ইউরোপীয় মহিলাবৃন্দের। ডেভিড হেয়ারের পরলোক গমনের পর (১ জুন ১৮৪২) স্ত্রীশিক্ষার প্রসারোদ্দেশ্যে এবং সমাজে এর অনুকূলে মত গঠনের জন্য ১৮৪৪ সনে হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড খোলা হয়, এর পরিচালকদের মধ্যে নব্যবঙ্গের কর্ণধার রামগোপাল ঘোষ প্যারীচাঁদ মিত্র কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় শিবচন্দ্র দেব দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের নাম স্মরণীয়।[৭৫] দেবেন্দ্রনাথ তাঁর দ্বিতীয় কন্যা

৭৩ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৫ সংখ্যক গ্রন্থ, রামনারায়ণ তর্করত্ন, ১৩৬৬, পৃ ১৮।

৭৪ সংবাদ সাধুরঞ্জন ২৮ মে ১৮৪৯: "তবে দিদী যদি শাস্ত্রে দোষ নাই, তবে আমরা কেন না শিখ্‌ব, মেয়েরা কেন না শিখ্‌বে, হতভাগা পুরুষেরা যদি রাজী না হয়, আমি তো বাপের বাড়ী চোলে যাব, আমার ভেয়েরা লেখাপড়া শেখাবে।…আজ আমি রেতের বেলা অম্নেকে বুঝ্য়ে বল্‌ব, রাজী হয় তো ভাল, নইলে এবারে ভাত খেতে চাইলে উনুনের ছাই পাঁস বেড়ে খেতে দিব, দিদী তুমি তো এখন গিন্নী হয়েছ, কোমর বেঁধে লেগে যাও, ভয় কর্‌লে কিছু হয় না।"

৭৫ Peary Chand Mittra, A Biographical Sketch of David Hare, 1877, pp 107-09,

সৌদামিনীকে ১৮৫১ সালের জুলাই মাসে বেথুন স্কুলে ভর্তি করে দিলেন।[৭৬] বেথুন স্কুলের বিজ্ঞপ্তি থেকে স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে জানা যায় যে বাংলা পুস্তকপাঠ হস্তাক্ষর পাটীগণিত পদার্থবিজ্ঞান ভূগোল সূচীকর্ম প্রভৃতি বিষয়ে বালিকারা শিক্ষালাভ করত ; সকলেই বাংলা ভাষা শিখত কিন্তু যাদের অভিভাবক ইংরেজি শেখাবার পক্ষপাতী তারা ইংরেজি চর্চা করত।[৭৭] এখানে বলা প্রয়োজন স্বর্ণকুমারী তাঁর বাল্যকালের অন্তঃপুরশিক্ষার যে বিবরণ ১৩০৬ সালের ভাদ্র মাসের প্রদীপ পত্রিকায় দিয়েছেন তার সঙ্গে বেথুনের পাঠ্যবিষয়ের সাদৃশ্য বিদ্যমান।

ঠাকুরবাড়ির অন্যশাখার প্রধান ব্যক্তি প্রসন্নকুমার স্ত্রীশিক্ষার সমর্থন করতেন, কিন্তু মিশনরিগণের বিদ্যালয়ে প্রবর্তিত শিক্ষাপ্রণালী তাঁর মনোমত হয় নি[৭৮] বলে স্বগৃহে স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তাঁর কন্যা হরসুন্দরী এবং পুত্রবধূ বালসুন্দরী (জ্ঞানেন্দ্রমোহনের প্রথম পত্নী, কেউ কেউ এঁকে প্রসন্নকুমারের কন্যা বলে ভ্রম করেছেন)[৭৯] ইংরেজ গৃহশিক্ষিকার নিকট পাঠাভ্যাস করে বিভিন্ন বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। অন্তঃপুরে ইংরেজ গৃহশিক্ষিকা নিয়োগ সম্পর্কে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন, The provisions which Baboo Prosunno Coomar Tagore had made for the education of his much-lamented daughter, were significant proofs of his sense of paternal duty, as well as of his energy and public spirit ; and the happy effects produced by his exertions were illustrative of the probability of the plan we are recommending. For a Hindu gentleman of rank and station, so far to disregard the corrupt prejudices of a bigoted community, as to engage a European tutoress for the purpose of instructing a female member of his household ; and the success which crowned his efforts, was an earnest of what might be expected from similar measures.[৮০] কৃষ্ণমোহনের মতে এতদ্দেশীয় অভিজাত পরিবারের বালকগণের শিক্ষাব্যাপারে ইতিমধ্যে (১৮৪০-৪১) ইউরোপীয়

৭৬ **The Calcutta Christian Observer, August 1851, p 374 : One of the most influential natives of Calcutta, Devendranath Tagore, has added his own daughter to the long list of eighty female children already receiving instruction in this institution...etc.**

৭৭ সংবাদ প্রভাকর, দ্র ১৩ জানুয়ারি ১৮৫৭ তারিখে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি।

৭৮ **The Asiatic Journal, June 1832 : Asiatic Intelligence, Calcutta, pp 80-81.**

৭৯ **Khagendranath Chattopadhyay, Family Tree of Darpanarayan Tagore.** দ্র বিশ্বভারতী পত্রিকা ৭ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, পৃ ২৫১।

৮০ **A Prize Essay on Native Female Education, 1841, pp 114-15.**

গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিল, তিনি বালিকাগণের ক্ষেত্রেও শিক্ষিত ইউরোপীয় গৃহশিক্ষিকা নিয়োগের প্রস্তাব করেছিলেন। প্রসন্নকুমারের পরিবারের ন্যায় সে যুগে কোনো কোনো সম্ভ্রান্ত অন্তঃপুরে এরূপ শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত হয়। রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের সহধর্মিনীকে হেদুয়ার পূর্বপার্শ্বস্থ সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুলের মিসেস উইলসন শিক্ষাদান করতেন।[৮১]

পরবর্তীকালে গৃহশিক্ষিকা নিয়োগব্যবস্থা জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। ১৮৬৪ খৃস্টাব্দে কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মবন্ধুসভা 'অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা'র নিমিত্ত একটি বৃহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৭৮৫ শকের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় বলা হয়েছিল যে কেবল বালিকা নয়, বয়স্থা নারীগণের শিক্ষার্থে সভ্যেরা এক অভিনব প্রণালী অবলম্বন করেছিলেন। সভার সম্পাদক হরলাল রায় বলেছেন, "যাহাতে বালিকাগণ উত্তমরূপে শিক্ষালাভ করিতে পারে এইরূপ একটি কলিকাতার ব্রাহ্মবন্ধুসভা অবলম্বন করিয়াছেন। এই প্রণালীক্রমে বালিকাগণ বিদ্যালয়ে না গিয়া বাটীতে নিযুক্ত শিক্ষকদ্বারা বা পরিবারস্থ কোন ব্যক্তিদ্বারা সুশিক্ষিত হইতে পারিবেক।" দুই বৎসর পরে এই সভার কার্য বামাবোধিনী সভা গ্রহণ করেন, বামাবোধিনী পত্রিকার ১২৭৪ সালের আশ্বিন সংখ্যায় (১৮৬৭ অক্টোবর) এ সংবাদ সমর্থিত হয়েছে।[৮২] এপ্রসঙ্গে বলা যায় যে ১৮৬২ সালের এপ্রিল থেকে ১৮৬৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ঠাকুরপরিবারের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা ছিল, কেশবপত্নী জগন্মোহিনী দেবী ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরিকা হয়ে উঠেছিলেন উক্ত সময়। স্বর্ণকুমারীর বয়স তখন দশের কোঠায়; ১৩০৬ সালের ভাদ্র সংখ্যার প্রদীপে এবং সাহিত্য-স্রোত গ্রন্থের নানা প্রবন্ধে লেখিকা কেশবদম্পতির এই শুভাগমনের স্মৃতিকথা পরিবেশন করেছেন। ঐ সময়ে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরে প্রথম পুরুষ গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন; 'কেবল স্ত্রীশিক্ষার জন্যই আর একজন অনাত্মীয় পুরুষ অন্তঃপুরে প্রবেশলাভ করেছিলেন', তাঁর নাম অযোধ্যানাথ পাকড়াশী। ফলে ঠাকুরপরিবারের অন্তঃপুরে প্রচলিত স্ত্রীশিক্ষা-ব্যবস্থা বিশেষত দেশীয় গৃহশিক্ষকের নিয়োগ ব্যাপারটি কেশবচন্দ্র নিরীক্ষণ করেছিলেন। তাই একথা মনে করার যথেষ্ট অবকাশ আছে যে পরবর্তী কালের ব্রাহ্মবন্ধুসভার অন্তঃপুরশিক্ষার পরিকল্পনাটি ঠাকুরপরিবারের অন্তঃপুরিকাগণের জন্য গৃহীত এই অভিনব শিক্ষাব্যবস্থাদ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। অতঃপর সেকালের ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরশিক্ষার স্বরূপ সন্ধান করা যেতে পারে।

৮১ Priscilla Chapman, Hindoo Female Education, 1839, p 88.

৮২ দ্র যোগেশচন্দ্র বাগল, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৯৭ সংখ্যক গ্রন্থ, কেশবচন্দ্র সেন, ১৩৬৫, পৃ ৭২-৭৪।

৩

১৩০৬ সালের ভাদ্র মাসের প্রদীপ পত্রিকায় 'আমাদের গৃহে অন্তঃপুরশিক্ষা ও তাহার সংস্কার' নামে স্বর্ণকুমারীর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়; নানাকারণে প্রবন্ধটি অত্যন্ত মূল্যবান, সেকালের অন্তঃপুরিকাগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও শিক্ষাদীক্ষার নির্ভরযোগ্য দলিলরূপে রচনাটি মর্যাদালাভ করেছে। লেখিকার গ্রন্থাবলীর চতুর্থ ভাগের শেষ প্রবন্ধ 'সেকেলে কথা' রচনাকালে তিনি পূর্বোক্ত প্রবন্ধের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। বর্তমান প্রসঙ্গে গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত 'সেকেলে কথা'র প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত হল, এর সাহায্যে সেকালের অন্তঃপুরিকাগণের বিশেষত ঠাকুরপরিবারের মহিলাগণের শিক্ষায় আগ্রহ ও পারিবারিক শিক্ষাব্যবস্থার বিষয়াদি সম্বন্ধে নানা কথা জানা যেতে পারে। স্বর্ণকুমারী বলেছেন, "যখন আমার মাতৃদেবী পুত্রবধূ হইয়া আমাদের গৃহে আসেন, সে প্রায় শতাব্দীকালেরই কথা। তখন আমাদের প্রপিতামহের পরিবারে অন্তঃপুর পরিপূর্ণ। পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং তাঁহার ভ্রাতা ভগিনীগণ সকলেই তখন সপরিবারে এক বাড়ীতেই বাস করিতেন। শুনিয়াছি, এই বহু পরিবারের মধ্যে কোন নারীই তখন মূর্খ ছিলেন না, বরঞ্চ ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশেষ বিদ্যাবতী বলিয়া আদরণীয়া ছিলেন। স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা তখনো তাঁহারা গৌরবের বিষয় বলিয়াই মনে করিতেন।

এই ত গেল আমার পক্ষেও যাহা সেকাল, সেই কালের কথা। আর আমাদের কালেও তাহারি জের চলিয়া আসিয়াছে। আমি দেখিয়াছি, আমাদের দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়া ভগিনী, মাতার বয়স্যা,— চমৎকার বিশুদ্ধ বাঙ্গালা লিখিতেন। সংস্কৃতও তিনি কিছু কিছু শিখিয়াছিলেন। সেইজন্য মেয়েমহলে শুধু নয়, পুরুষমহলেও তাঁর যথেষ্ট সম্মান ছিল।

ইহাদিগের পৌত্রী দৌহিত্রীদিগের মধ্যে বরঞ্চ লেখাপড়ার এরূপ আদর দেখি নাই, কাহাকে কাহাকেও মূর্খ দেখিয়াছি। বৃদ্ধাগণ প্রৌঢ়াগণ আমাদের বাড়ীতে যেরূপ বিদ্যানুশীলনের আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের পরবংশীয়া নবীনাগণ অন্যত্র গিয়া শিক্ষা লাভের সম্ভবতঃ সেরূপ সুবিধা পান নাই।

আহার বিরাম পূজা-অর্চ্চনার ন্যায় সেকালেও আমাদের অন্তঃপুরে লেখাপড়া মেয়েদের মধ্যে একটি নিত্যনিয়মিত ক্রিয়ানুষ্ঠান ছিল। প্রতিদিন প্রভাতে গয়লানী যেমন দুগ্ধ লইয়া আসিত, মালিনী ফুল জোগাইত, দেবজ্ঞঠাকুর পাঁজিপুঁথি-হস্তে দৈনিক শুভাশুভ বলিতে আসিতেন, তেমনি স্নানবিশুদ্ধা, শুক্লবসনা, গৌরী বৈষ্ণবীঠাকুরানী বিদ্যালোক বিতরণার্থে অন্তঃপুরে আবির্ভূতা হইতেন। ইনি নিতান্ত সামান্য বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্না ছিলেন না। সংস্কৃত বিদ্যায় ইঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল, অতএব বাঙ্গালা জানিতেন, ইহা বলা বাহুল্য। উপরন্তু ইঁহার চমৎকার বর্ণনাশক্তি ছিল, কথকতাক্ষমতায় ইনি সকলকে মোহিত করিতেন।

যাঁহাদের বিদ্যালাভের ইচ্ছা নাও বা থাকিত, তাঁহারাও বৈষ্ণবীঠাকুরানীর দেবদেবীবর্ণনা, প্রভাতবর্ণনা শুনিতে কুতূহলী হইয়া পাঠগৃহে সমাগত হইতেন। আমার ভাগ্যে বৈষ্ণবী-ঠাকুরানীর দর্শনলাভ ঘটে নাই, সুতরাং তাঁহার বর্ণনাসম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান আমার নাই। কিন্তু কাকীমার নিকট ইহার প্রভাতবর্ণনার অনুকরণ যাহা শুনিয়াছি, নব্যবংশের প্রীতির জন্য তাহা সযত্নে স্মৃতিরক্ষিত করিয়া নিম্নে বিবৃত করিলাম।

'যামিনী চতুর্যামে লগ্না হয়ে পড়েছেন, কিন্তু বিদায় গ্রহণ করতে পারছেন না; প্রভাত পূর্ব্বদিগন্তের নীচে এসে দাঁড়িয়ে আছেন, তবু প্রকাশ হতে পারছেন না। কেন না, শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা দোঁহে দোঁহার প্রেমবন্ধনে নিদ্রাচেতন হয়ে রয়েছেন। আহা, সারানিশি মানভঞ্জনে উভয়ের গত হয়েছে, নিশিভোরে তাই ঘুমে বিভোর হয়ে পড়েছেন। মরি মরি! আহা, প্রাণস্বরূপ শ্রীহরি, প্রেমস্বরূপিণী শ্রীরাধার এই প্রেমমিলনে দ্যুলোক ভূলোক বিশ্বচরাচর স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে। বিহঙ্গবিহঙ্গীর কলরব নাই; নদনদী নিঃস্রোত, জীবজন্তু নরনারী গভীর নিদ্রামগ্ন, শুকতারা পূর্ব্বাকাশ হতে এখনো অস্ত যেতে পারছেন না, সূর্য্যদেব অরুণ-রথে সমাসীন হয়ে উদয় হতে ভয় পাচ্ছেন। সৃষ্টিতে প্রলয় আসে আসে। সূর্য্যদেব চিন্তাকুল হৃদয়ে রথ ফিরিয়ে ভগবান্ ব্রহ্মার সদনে উপনীত হলেন, সেখানে গিয়ে তাঁকে এই সমূহ বিপদের কথা অবগত করালেন। ব্রহ্মা মনে মনে প্রমাদ গণনা করে ধ্যানমগ্ন হলেন। ধ্যানভঙ্গে অন্যোপায় না দেখে কৃষ্ণ পক্ষীর (রামপক্ষী) স্মরণ করলেন, পক্ষী আগত হলে বললেন, হে কৃষ্ণভক্ত বিহঙ্গম, তুমি না রক্ষা করলে এ বিপদে পরিত্রাণ নাই। হে অগতির গতি, ভক্ত চূড়ামণি, তুমি ভিন্ন ভগবান্ বিষ্ণুদেবের নিদ্রাভঙ্গ করে, এমন সাধ্য আর কার? অতএব দেবদানব নররাক্ষস সকলের প্রতি কৃপাবান্ হয়ে তুমি গিয়ে তাঁকে জাগরিত কর; নচেৎ সৃষ্টি এখনি লোপ পায়। পক্ষিবর ব্রহ্মার বচনে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে নির্ভয় প্রদান করে বৃন্দাবনের নিকুঞ্জদ্বারে এসে ডাকলেন—কুককুহুকু অর্থাৎ উঠ হে উঠ,—কুককুহুকু! কুককুহুকু! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদেব কমললোচন উন্মীলন করে দেখলেন, প্রভাত হইয়াছে।'

যতদূর স্মরণ হচ্ছে, তাতে লজ্জিত বোধ না করে এই সুখের মিলনভঙ্গজনিত অপরাধে তিনি পক্ষিবরকে যে অভিশাপ প্রদান করলেন, সেই শাপেই তখনকার পূজ্য পবিত্র কুক্কুট পক্ষী এখন হিন্দুর অস্পৃশ্য ও ম্লেচ্ছের খাদ্য।

আমি যে গল্পটি হুবহু আমার খুল্লতাত-পত্নীর ভাষায় আবৃত্তি করিলাম, এমন নহে; ভাষার রূপান্তর হইয়াছে সন্দেহ নাই। সে এত ছেলে-বেলার কথা—যখন কাকীমার মুখ হইতে পীড়াপীড়ি করিয়া এই বর্ণনা শুনিতাম। সমস্ত কৌতূহল, সমস্ত প্রাণ তখন কুক্কুহু কথাটির উপর পড়িয়া থাকিত। কখন পাখী ডাকিয়া উঠিবে, সেই আগ্রহে প্রথমাংশের প্রতি তেমন মনোযোগই হইত না। তবে এতবার এই গল্পটি শুনিয়াছি তাই এখন মনে করিয়া ভাষা রচন করিতে পারিলাম।

বৈষ্ণবী আসিতেন অন্তঃপুরের চতুঃসীমাবদ্ধা মহিলাগণের জন্য ; বালিকা নববধূ ও বিবাহিতা বালিকা কন্যাগণ ইহার কাছেই শিক্ষা লাভ করিতেন। কিন্তু বাড়ীর অবিবাহিতা কন্যাগণ বালকদিগের সহিত একত্র গুরুমশায়ের পাঠশালায় গমন করিত। ইহাতে আর কিছু না হউক, বালক-বালিকার শিক্ষার ভিত্তি সমভাবেই গঠিত হইত।

তখন বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় হয় নাই। বৈষ্ণবীঠাকুরানী যে পুস্তক হইতে বর্ণবোধ করাইতেন, তাহার নাম শিশুবোধ। পুস্তকখানি আমি বড় হইয়া দেখিয়াছি। অক্ষরমালা, বানান, দেবদেবীবন্দনা, যামবর্ণনা, লিপিলিখন-প্রণালী—এ সমস্তই এই একখানি পুস্তকের মধ্যে স্তূপীকৃত। বন্দনা ও বর্ণনার ভাষা এত কঠিন দুর্ব্বোধ্য যে তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া পড়িলেই বাঙ্গালা ভাষাশিক্ষা একরকম শেষ হইয়া যায়। তাঁহারা লেখা অভ্যাস করিতেন প্রথমে তালপাতে, তাহার পর কলাপাতে। বালির কাগজে কঞ্চির কলমের মক্‌স সর্ব্বশেষে।

'আমি শৈশবে অন্তঃপুরে সকলেরই লেখাপড়ার প্রতি একটা অনুরাগ দেখিয়াছি। মাতাঠাকুরানীও কাজকর্ম্মের অবসরে সারাদিনই এক খানি বই হাতে, আর কোন বই না পাইলে শেষে অভিধানখানাই খুলিয়া পড়িতে বসিতেন। বড়দাদামহাশয়ের তত্ত্ববিদ্যার সমজদার তাঁহার মত আর কেহ ছিল না। মামীমা, দিদি, বধূঠাকুরানীগণ প্রভৃতি নবীন দল অবশ্য কাব্য উপন্যাসেরই অনুরাগিণী ছিলেন। পড়িতে শিখিয়া অবধি আমাদের মাতুলানীকে রামায়ণ, মহাভারত, হাতেমতাই প্রভৃতি পড়িয়া শুনান আমার একটা বিশেষ কার্য্য ছিল। মনে আছে, বাড়ীতে মালিনী বই বিক্রী করিতে আসিলে মেয়েমহল সেদিন কি রকম সরগরম হইয়া উঠিত। সে বটতলার যত কিছু নূতন বই, কাব্য, উপন্যাস, আষাঢ়ে গল্প অন্তঃপুরে আনিয়া দিদিদের লাইব্রেরীর কলেবর বৃদ্ধি করিয়া যাইত। ঘরে ঘরে সকলের যেমন আলমারীভরা পুতুল, খেলানা, বস্ত্রাদি থাকিত, তেমনি সিন্দুকবন্দী পুস্তকরাশিও থাকিত।) বড় হইয়া সে-কালের বইগুলি যথেষ্ট নাড়াচাড়া করিয়াছি,—মানভঞ্জন, প্রভাস-মিলন, দূতী-সংবাদ, কোকিলদূত, রুক্মিণীহরণ, পারিজাতহরণ, গীতগোবিন্দ, প্রহ্লাদচরিত্র, রতিবিলাপ, বস্ত্রহরণ, অন্নদামঙ্গল, আরব্যোপন্যাস, পারস্যোপন্যাস, চাহার-দরবেশ, হাতেমতাই, গোলেবকায়লী, লয়লামজনু, বাসবদত্তা, কামিনীকুমার ইত্যাদি। পাঠক দেখিতেছেন, এতগুলির মধ্যে একখানি কেবল নামকরণে সামাজিক, কামিনীকুমার কাব্যে লিখিত উপন্যাস, তখন পর্য্যন্ত গদ্যে উপন্যাস লিখিত হয় নাই। অনেক পরবর্ত্তী সময়ে আমাদের শৈশবে রামনারায়ণ তর্করত্ন গদ্যে সংস্কৃত নাটকাদি অনুবাদের পর, 'কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব', 'বহুবিবাহ নাটক' প্রভৃতি সামাজিক নাটক রচনা করেন। কালী সিংহের

হুতোম-প্যাঁচার নক্সা, প্যারীচাঁদ মিত্রের উপন্যাসাবলী ইহারও পরে রচিত। অথচ সাহিত্যনামাবলীতে কামিনীকুমারের নাম কেন দেখিতে পাই না? কামিনীকুমার পদ্যে লিখিত উপন্যাস, কিন্তু ইহার বিশেষত্ব এই, বিদ্যাসুন্দরের ঠিক অনুকরণ নহে। পূর্ব্বে কাব্য লিখিতে হইলে ভারতচন্দ্র রায় তাহার আদর্শ হইত। শুনিয়াছি, মদনমোহন তর্কালঙ্কার 'বাসবদত্তা' লিখিবার সময় পণ করিয়া লিখিতে বসেন যে, তিনি ভারতচন্দ্রের অনুকরণে কাব্য লিখিয়া ভারতচন্দ্রকেও হারাইবেন। কিন্তু পুস্তক বাহির হইলে, তখনকার সমজদারদের বিচারে তাঁহাকে ভগ্নচেতা হইতে হয়, ক্ষোভে সাধের বাসবদত্তা তিনি অগ্নিসমর্পণ করেন। দুইচারিখানি পুস্তক ইতিপূর্ব্বেই যাহা বাহিরে প্রচার হইয়াছিল তাহাতেই মাত্র মদনমোহনের মহিমা আবদ্ধ থাকে।

কবিত্বে বা ঔপন্যাসিক রহস্যে কামিনীকুমারের মূল্য অধিক, এরূপ বলিতে পারি না—তথাপি সাহিত্যসমাজে ইহার নাম রক্ষা হওয়া উচিত। চলিত বঙ্গসমাজে স্ত্রীপুরুষ লইয়া নায়ক-নায়িকা রচনার ইহা সর্ব্বাদি পুস্তক। যতদূর মনে পড়িতেছে, কামিনী-কুমারের গল্পটি এইরূপ— প্রথমে নায়কনায়িকার জন্মবিবরণ, রূপবর্ণনা, পরে বয়ঃপ্রাপ্তে উভয়ের দর্শন, পরস্পরের প্রতি অনুরাগ, মিলনআশায় উভয়ের দেশভ্রমণে নির্গমন; স্থান বর্ণনা, কোন কোন স্থানে উভয়ের সন্দর্শনলাভ; কামিনী ছদ্মবেশী পুরুষ, অতএব কুমারের নিকট অপরিচিত, কিন্তু কুমারকে কামিনী চিনিয়া তাহার সহিত রহস্যালাপে রত, অবশেষে উভয়ের গৃহে প্রত্যাগমন, মিলন ও বিবাহ। ইহার রচয়িতা শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর—আমার মধ্যম খুল্লতাত।"

স্বর্ণকুমারীরচিত 'সাহিত্য-স্রোত' নামক পাঠ্যপুস্তকে 'ভারতসাহিত্যে রমণী-প্রতিভা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ আছে, তার মধ্যেও লেখিকা ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরের শিক্ষাব্যবস্থার মনোহারী চিত্র অঙ্কন করেছেন; বিখ্যাত বৈষ্ণবঠাকুরানীর কথকতার নমুনাস্বরূপ কৃষ্ণ-কুক্কুটপক্ষী-সংবাদটি সেখানে উদ্ধৃত হয়েছে। বিভাস রাগের ধ্যানরূপের সঙ্গে উক্ত কাহিনীর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়;[৮৩] অবনীন্দ্রনাথের 'আলোর ফুলকি'র[৮৪] কাহিনীর সঙ্গে এর একটি সুদূরসাদৃশ্য নির্ণীত হতে পারে। সঙ্গীতবিদ্যানুশীলনের পৃষ্ঠপোষকতায় এই পরিবার অসামান্য অংশগ্রহণ করেছিল, এইসকল প্রসঙ্গ থেকে অন্তঃপুরের জীবনে তার ক্ষীণ প্রভাবটি অনুভূত হয়। সে যাহোক ঠাকুরপরিবারে শিক্ষিত বৈষ্ণবীর সমাগম বহুকাল ধরে চলে আসছিল। খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "রামলোচন ঠাকুরের দীক্ষাগুরুর নাম ছিল হরিমোহন

৮৩ অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, রাগরাগিণীর নামরহস্য, ১৯৬০, পৃ ২৭ : শুভ্রাম্বর গৌরবর্ণঃ সু-কান্তি/বীরোল্লসৎ কুণ্ডলধৃষ্টগণ্ডঃ। অরুণোদয়ে কুক্কুটপক্ষী শব্দে / বিভাষা রাগঃ স্মর-চারু-মূর্ত্তিঃ।

৮৪ প্রথম প্রকাশ : ভারতী বৈশাখ-অগ্রহায়ণ ১৩২৬, পুস্তকাকারে ১৯৪৭।

গোস্বামী ; ইঁহার পত্নী কাত্যায়নী দেবীই অলকাসুন্দরীর দীক্ষাগুরু ছিলেন।" মহর্ষির আত্মজীবনীতে বর্ণিত 'মা-গোঁসাই' ইনিই, অন্তঃপুরে এই রমণীর 'সতত যাতায়াত' এর কথা মহর্ষি উক্ত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া "এক শ্রেণীর বৈষ্ণব শিক্ষয়িত্রী সেযুগে পরিবারে পরিবারে গমন করিয়া মেয়েদের লেখাপড়া শিখাইতেন। দ্বারকানাথের পরিবারেও তাহা করা হইত। এই বৈষ্ণবীগণও খড়দহের গোস্বামীদের বিশেষ জানিত না হইলে পরিবারে অবাধ প্রবেশলাভ করিতে পারিতেন না। তাঁহারা প্রতিদিন পড়াইতে আসিতেন। অনেক সময় ছাত্রীদের বাটীতেও থাকিতেন। এইসকল বৈষ্ণবীর শিক্ষাদান কেবল বাংলায় শেষ হইত না ; তাঁহারা সংস্কৃত বৈষ্ণব স্তবগুলিও অর্থের সহিত শিক্ষা দিতেন।"[৮৫] সৌদামিনী দেবীও একস্থানে সেকথা স্বীকার করেছেন।[৮৬] স্বর্ণকুমারী যে-'খুল্লতাত-পত্নী'র কথা উল্লেখ করেছেন তিনি হলেন গিরীন্দ্রনাথের পত্নী যোগমায়া দেবী ; এই মহিলার অপত্য স্নেহ ছিল বড়ই প্রবল। সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন, "মার কাছে আমরা বেশীক্ষণ থাকতুম না—আমাদের আসল আড্ডা ছিল মেজকাকিমার ঘর ; সেই আমাদের শিক্ষালয়, সেই বিশ্রামস্থান। বলতে গেলে মেজকাকিমাই আমাদের মাতৃস্থানীয়া ছিলেন ; তাঁর কাছে আমরা গল্প শুনতুম, তাঁর সঙ্গে তাস খেলতুম, তাঁর কাছ থেকে বেছে বেছে বই পড়তুম—হাতেমতাই, লয়লা-মজনু, নবনারী, আরবা উপন্যাস, লাম্বস টেল, পল ভার্জিনিয়ার অনুবাদ এইরকম কতকগুলি বই আমাদের পুঁজি ছিল। আমাদের অন্তঃপুরে মহিলাদের মধ্যে সেকালে উচ্চশিক্ষার প্রচার ছিল না, তবুও কাকিমা প্রভৃতি বাড়ীর মেয়েরা কেহ কেহ বাঙ্গালা বেশ জানতেন, তাঁরাই আমাদের একপ্রকার শিক্ষয়িত্রী ছিলেন।"[৮৭]

৮৫ দ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, পরিশিষ্ট, পৃ ২৫২-৫৩। খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় অন্যত্র বলেছেন, "মহর্ষির পিতামহ রামমণি ঠাকুরের সময় হইতে তাঁহাদের পরিবারে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন সম্বন্ধে বিশেষ প্রমাণ পাইতেছি। মহর্ষির মধ্যমা পিসি এবং লেখকের বৃদ্ধা প্রপিতামহী রাসবিলাসী দেবীর একখানি পুঁথি হইতে জানা যায়, খড়দহ গ্রামের বৈষ্ণবীরা তাঁহাদের অন্তঃপুরিকাদের বৈষ্ণব স্তবাবলীর সাহায্যে সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন। উক্ত রাসবিলাসী দেবী মহাশয়ার হাতবাক্সে রক্ষিত শ্রীমদ্রূপগোস্বামী রচিত 'হরি কুসুম স্তব' এর একখানি পুঁথিতে দেখিতে পাই যে কাল অক্ষরে সংস্কৃত শ্লোকটি লিখিত এবং প্রত্যেক শব্দের উপরে লাল অক্ষরে তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া আছে। দেবনাগর ছোট অক্ষরে লেখা আছে 'লিখিতং শ্রীকিশোরী বৈষ্ণবী সাকিন্ শ্রীপাট খড়দহ গ্রাম'। পুঁথিতে কোন তারিখ নাই। আমার খুল্লপিতামহ ৺গোকুলনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেন যে তাঁহার পিতামহী রাসবিলাসী দেবীর মুখে শুনিয়াছিলেন যে বিবাহের পর দুই তিন বৎসর বৈষ্ণবীর নিকটে মেয়েদের সংস্কৃত শিখিতে হইত।" দ্র রবীন্দ্রকথা, পৃ ১৩১।

৮৬ পিতৃস্মৃতি, প্রবাসী ফাল্গুন ১৩১৮, পৃ ৪৭৪-৭৫।

৮৭ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস, ১৯১৫, পৃ ১৫।

৪

শিক্ষার প্রতি অন্তঃপুরিকাগণের অপরিসীম আগ্রহ দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে ; ধর্ম ও সমাজসংস্কারক মহর্ষি শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষত অন্তঃপুরশিক্ষার ব্যাপারে তাই উৎসাহ প্রদর্শন করেন। হিমালয় ভ্রমণশেষে কলিকাতায় তিনি প্রত্যাবর্তন করেন ১৮৫৮ খৃস্টাব্দের ১৫ নভেম্বর (১৭৮০ শক, ১ অগ্রহায়ণ সোমবার)। 'সেকেলে কথা'র মধ্যে স্বর্ণকুমারী বলেছেন, "তিনি আসিয়াই প্রথমে শালগ্রামশিলা বিসর্জ্জন দিলেন, বাড়ীর সকলকে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। প্রতিদিন উপাসনার সময় সত্যধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় উপদেশ এবং ভিন্ন সময়ে নানারূপ সরল সহজ বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতায় তাঁহার পরিবারের, বিশেষ অন্তঃপুরিকাগণের বুদ্ধি, জ্ঞান, ধর্ম্মবৃত্তি সমভাবে সমার্জ্জিত করিতে লাগিলেন। পৌত্তলিক আচার অনুষ্ঠান উঠাইয়াই ক্ষান্ত না হইয়া সমস্ত ভারতব্যাপী বহুকালপ্রচলিত হীন স্ত্রীআচার দুই একটি করিয়া নিজ অন্তঃপুর হইতে একেবারে উঠাইয়া দিলেন ; আজিকালিকার মত বয়স্ক বিবাহ না হউক, বালিকাদিগের বিবাহের একটি বিশেষ বয়ঃক্রম নির্দ্ধারিত করিলেন ও বিবাহের একটি নবপদ্ধতি গঠিত হইল। আমাদের মধ্যমা ভগিনীর বিবাহ হইতে এ পর্য্যন্ত বাড়ীতে সেই পদ্ধতি অনুসারেই বিবাহকার্য্য সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে; তাঁহার শিশুকন্যাগণ শিক্ষার বয়স প্রাপ্ত হইলে পুরাতন প্রথার পরিবর্ত্তে উচ্চ উন্নত প্রণালীতে তাহাদের শিক্ষা আরম্ভ হইল। আমাদের জন্য পণ্ডিত নিযুক্ত করিলেন। দ্বিতীয়ভাগ শেষ করিয়া বাঙ্গালার সহিত সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করিলাম। অন্তঃপুরে মেম আসিতে লাগিলেন।" পিতৃস্মৃতিতে সৌদামিনী বলেছেন, "কেশববাবুদের অন্তঃপুরে মিশনরি মেয়েরা পড়াইতে আসিত। আমাদের শিক্ষার জন্য পিতা তাহাদিগকে নিযুক্ত করিলেন। বাঙালী খ্রীষ্টান শিক্ষয়িত্রী প্রতিদিন আমাদিগকে পড়াইতেন এবং হপ্তায় একদিন মেম আসিয়া আমাদিগকে বাইবল্ পড়াইয়া যাইতেন।" স্বর্ণকুমারীর মধ্যমা ভগিনী সুকুমারীর যখন বিবাহ হয় (১৮৬১ শ্রাবণ) তখন লেখিকার বয়ঃক্রম পাঁচ ; তার পূর্বেই অন্তঃপুরশিক্ষার সংস্কার আরম্ভ হয়, তখন লেখিকার বয়স প্রায় তিন। সে যাহোক লেখিকা পূর্ব-কথিত প্রবন্ধে অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা প্রসারের ব্যাপারে অতঃপর কেশবদম্পতি, মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ও বধূঠাকুরানী জ্ঞানদানন্দিনী, স্বামী জানকীনাথ, অগ্রজ হেমেন্দ্রনাথ প্রভৃতির নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। শেষোক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে তাঁর অভিমত এইরূপ : "স্ত্রীস্বাধীনতার প্রচারক না হইলেও বাড়ীর ছেলেমেয়েদের বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে সেজদাদা পরলোকগত হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও চিরকাল উৎসাহ এবং অধ্যবসায়ের সীমা ছিল না। তাঁহার বিবাহের পূর্ব্বে অনেক সময় আমাদের নিজে শিক্ষাদান করিতেন। বিবাহের পরে তাঁহার শিক্ষাদানের

কেন্দ্রস্বরূপ হইলেন তাঁহার পত্নী। সেজদাদাই প্রথমে দেশাচার কুলাচার ভাঙিয়া তাঁহার পত্নীকে আমাদের বাড়ীর গায়ক বিষ্ণুর নিকট গান শিখাইতে আরম্ভ করেন।" প্রসঙ্গক্রমে স্বর্ণকুমারী বলেছেন যে সত্যেন্দ্রনাথের বিলাত গমনের কিছুকাল পরে "একজন অনাত্মীয় পুরুষ অন্তঃপুরে প্রবেশ লাভ করিলেন। মেমের শিক্ষাদান আশানুরূপ ফলপ্রদ বলিয়া পিতৃদেবের মনে হইল না। আদি ব্রাহ্মসমাজের নবীন আচার্য্য শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী অন্তঃপুরে শিক্ষকতাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তখন আমার সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ও বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বৌঠাকুরানী তিনজন, মাতুলানী, দিদি ও আমরা ছোট তিন বোন সকলেই তাঁহার কাছে অন্তঃপুরে পড়িতাম। অঙ্ক, সংস্কৃত, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি ইংরাজী স্কুলপাঠ্য পুস্তকই আমাদের পাঠ্য ছিল।"

মেমের পরিবর্তে অযোধ্যানাথের গৃহশিক্ষকতা সম্পর্কে আগে আলোচনা করা হয়েছে। বধূ ও কন্যাগণের শিক্ষার ব্যাপারে দেবেন্দ্রনাথের আগ্রহের গভীরতা ও ব্যাপকতা এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয়। ফুলের মালার ইংরেজি অনুবাদ দি ফ্যাটাল গার্ল্যাণ্ড এর ভূমিকায় লেখিকা বলেছেন, It was my loving father, Maharshi Devendra Nath Tagore, who had prepared me for my life's career by giving me an education unusual for Hindu girls of those days.[৮৮] এসম্পর্কে জনৈক বিদেশী লেখকের একটি মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য, ইনি লেখিকার নিকটসান্নিধ্য অর্জন করেছিলেন; স্বর্ণকুমারীর মনোগঠন এবং বাল্য-কৈশোর শিক্ষা সম্পর্কে তিনি বলেন, Although brought up strictly on Zenana lines, educated behind the purdah and married at a very youthful age, Mrs. Ghosal was encouraged both by her father and her husband to develop her unusual powers of mind and character....From her father Mrs. Ghosal inherits her passionate love and admiration for her native land, her ardent desire to rouse it from its lethargy, to inspire it to progress, and to help it cast off the yoke of its debasing traditions.[৮৯] আমাদের দেশে স্ত্রীস্বাধীনতার অভাব ও স্ত্রীশিক্ষার অনগ্রসরতার বিরুদ্ধে দেবেন্দ্রনাথ বরাবর প্রতিবাদ করে গিয়েছেন। বালিকাগণের শিক্ষার প্রতি উদাসীন ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে তিনি একদা কঠোর মন্তব্য করেন, with regard to female children there is a fourth class of men who consider female education either as practically unnecessary or as improper on social or moral grounds, who are opposed to it from a superstitious fear of the consequences of leaving

৮৮ ব্র বঙ্গের মহিলা কবি, পৃ ৪০।

৮৯ Mrs. Ghosal (Srimati Svarna Kumari Devi), An Unfinished Song, London 1914, Introduction by E. M. Lang.

upon matrimonial happiness of their daughters. But as all these obstacles raised to the instruction of females are fruits only of ignorance it must be left to time and the spread of popular education to cure people of these misgivings and errors on this subject, and I have nothing to do with this class of men here.[১০] বঙ্গললনাদিগের প্রাথমিক শিক্ষার অসুবিধা সম্পর্কে তিনি কেবল মত প্রকাশ করেই ক্ষান্ত ছিলেন না, এর প্রতিকারকল্পে তিনি যেসকল কার্য করেন তা এবারে আলোচ্য। তাঁর এই জাতীয় কর্মোদ্যম এবং স্ত্রীশিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা সম্পর্কে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ নিজকন্যা সৌদামিনীকে ১৮৫১ সনের মাঝামাঝি বেথুনস্কুলে ভর্তি করিয়া দেন। তিনি রাজনারায়ণ বসুকে একখানি পত্রে[১১] লেখেন: 'আমি বেথুন সাহেবের বালিকা-বিদ্যালয়ে সৌদামিনীকে প্রেরণ করিয়াছি, দেখি এ দৃষ্টান্তে কি ফল হয়।' এসম্বন্ধে সৌদামিনী বলেছেন, "কলিকাতায় মেয়েদের যখন বেথুন স্কুল প্রথম স্থাপিত হয় তখন ছাত্রী পাওয়া কঠিন হইল। তখন পিতৃদেব আমাকে এবং আমার খুড়তুত ভগিনীকে সেখানে পাঠাইয়া দেন।"[১২] 'পিতার বড় অনুগত' হরদেব চট্টোপাধ্যায়ের দুই কন্যা ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কয়েকটি কন্যা বেথুনে পড়তে যেতেন, প্রধানত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উৎসাহে ও উদ্যোগে এই কার্য সম্পন্ন হয়। মহর্ষির 'পত্রাবলী' পাঠকালে অবগত হওয়া যায় তিনি রাজনারায়ণ বসুকে তাঁর কন্যাগণের শিক্ষার নিমিত্ত বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের উপদেশ দিয়েছেন, চতুর্থ পত্র (৭ মাঘ ১৭৭৪ শক) তার প্রকৃষ্ট প্রমাণস্থল। প্রকৃতপক্ষে তিনি "সমাজসংস্কার সম্বন্ধে Conservative ছিলেন বলেই লোকের ধারণা, কিন্তু তখনকার কালের তুলনায় তাঁকে উন্নতিশীলের মধ্যে গণ্য করাই উচিত। তাঁর জীবনের প্রথমদিকে তিনি যে-রকম সমাজসংস্কার করেছিলেন সে সময় আর কেহই সেরূপ করেছেন কিনা জানি না।"[১৩] বিশেষত স্ত্রীশিক্ষা এবং স্বীয় অন্তঃপুরের উন্নতিসাধনের জন্য দেবেন্দ্রনাথ যথাসাধ্য করেছিলেন, একসময় তিনি 'মিস গোমিস প্রভৃতি খ্রীষ্টান মেম' কর্তৃক মহিলাদের বাংলাশিক্ষার ব্যবস্থা পর্যন্ত অনুমোদন করেছিলেন।[১৪]

---

১০ দ্র Brojendra Nath Banerji, Debendranath Tagore on Schools for the Masses, The Modern Review, December 1928.

১১ দ্র পত্রাবলী, ৩০ সংখ্যক পত্র, ২৫ আষাঢ় ১৭৭৩ শক, পৃ ৪০। অধিকন্তু দ্রষ্টব্য দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর পরিশিষ্ট: যোগেশচন্দ্র বাগল লিখিত 'মহর্ষির জীবনের আরও তথ্য', পৃ ৪৬৩-৬৪।

১২ প্রবাসী ফাল্গুন ১৩১৮, পৃ ৪৭৪।

১৩ আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাইপ্রবাস, পৃ ৩।

১৪ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবনস্মৃতি, প্রবাসী মাঘ ১৩১৮, পৃ ৩৮৯।

বিবাহ-পূর্ববর্তী জীবন

১

স্বর্ণকুমারীর বিবাহপূর্ব জীবনের যে সকল বিক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায় তার অবলম্বনে লেখিকার মানসিক ক্রমপরিণতির একটি ইতিবৃত্ত রচনা করা যেতে পারে। স্বরচিত সাহিত্য-স্রোত গ্রন্থের একটি প্রবন্ধে পিতা দেবেন্দ্রনাথের কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "ভোর হইতে না হইতে উঠিয়া বাগানে ফুল তুলিতে যাইতাম, কেহ আসিবার আগেই আঁচল ভরিয়া বাগানের যত ভাল ভাল ফুলগুলি তুলিতাম। তখন কোন বিলাতী ফুলের চাষ আমাদের বাগানে ছিল না। যত রকম দেশীয় সুগন্ধ পুষ্পে বাগান ভরিয়া থাকিত। ভোরের বেলা মৌমাছির দল তাহার উপর গুণগুণ করিয়া বেড়াইত। সেই অস্পষ্ট উষালোকে এই সুন্দর দৃশ্য আমার মনের মধ্যে ভারী একটা সুখের মোহ রচনা করিত। আমি ঘরে আসিয়া আঁচলের ফুলগুলি একখানি থালায় সাজাইয়া লইতাম পরে মাতৃদেবীর কাছে আসিয়া ফুলভরা থালাখানি তাঁহার সম্মুখে ধরিতাম। কোন ভাল ফুল তাঁহাকে দিতে গেলে তিনি লইতেন না। একবার হাতে লইয়া হাসিয়া আবার তাহা থালায় রাখিয়া দিতেন। তিনি প্রকৃতই সীতা সাবিত্রীর মত আদর্শস্থানীয়া পতিব্রতা সতী ছিলেন। দুজনে দুজনের মনের ভাব বুঝিতাম। আমি আর কিছু না বলিয়া কতকগুলি ফুল স্বতন্ত্র একখানি ছোট থালায় গুছাইয়া তরকারী বানাইবার দালানে তাঁহার আসনের নিকট রাখিয়া দিতাম।…৭টার সময় উপাসনার ঘণ্টা পড়িত। তৎপূর্বে উপাসনায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া লইতাম। উপাসনার পর পিতৃদেব তেতলায় যাইতেন আমিও ফুল লইয়া তাঁহার কাছে উপস্থিত হইতাম। তিনি সহাস্যে থালাটি গ্রহণ করিয়া ফুলগুলি আঘ্রাণ করিতেন, আনন্দে আমার হৃদয় ভরিয়া উঠিত! জানি না দেবতাকে অর্ঘ্য দান করিয়া কোনো সাধকের মনে এইরূপ আনন্দ হয় কি না!

অতঃপর পুষ্পপাত্র টেবিলে রাখিয়া পিতা আমাকে কাছে টানিয়া লইতেন। দু একটি গোলাপ আমার হাতের কাছে ধরিয়া কবিতার ভাষায় বলিতেন—পদ্মসা কমলম্ কমলেন পয়ঃ। পয়সা কমলেন বিভাতি সরঃ॥ ইত্যাদি। আমি তখন সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করিয়াছি এবং তাঁহার নিকট ব্রাহ্মধর্ম পাঠ করি। বোধহয় আমাকে মুখস্থ করাইবার জন্য এইরূপ ছোট ছোট কবিতা আবৃত্তি করিতেন। কেবল কবিতা নহে তাঁহার এক একটি সুন্দর আদর বাক্যে আমি আহ্লাদে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িতাম। আমার উপন্যাসের অনেক-স্থলে সেইসকল উপমা আমি ব্যবহার করিয়াছি।" উদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোকটি তাঁর 'হাসি' নামক ছোটগল্পে ব্যবহৃত হয়েছে। বিচিত্রা-স্বপ্নবাণী-মিলনরাত্রি এই উপন্যাসত্রয়ীর মধ্যে

পিতা-পুত্রীর যে সম্পর্ককথা বর্ণিত হয়েছে তার পশ্চাতে লেখিকার ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল, এমনকি একটি উপন্যাসের মধ্যে পিতার নিকট কন্যার উপরিউক্ত সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকশিক্ষার কথাও বর্ণিত।

বিবাহের পূর্বে এগার-বার বৎসর বয়সের মধ্যে যে তিনি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং বাংলা ভাষায় বিশেষ অধিকার অর্জন করেছিলেন সেকথা তাঁর বিবাহের বিবরণদানকালে তত্ত্ববোধিনী বামাবোধিনী প্রভৃতি পত্রিকা উল্লেখ করেছেন। সংস্কৃত শিক্ষারম্ভে কেবল নয় জীবনগঠনের উষালগ্নে পিতামাতার সান্নিধ্য বিশেষত পিতৃদেবের স্নেহানুকূল্য তিনি পেয়েছিলেন, দি ফ্যাটাল গার্ল্যাণ্ড নামক গ্রন্থের ভূমিকায় লেখিকা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সেকথা স্বীকার করেছেন। স্ত্রীশিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতার জন্যই কেবল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কন্যা স্বর্ণকুমারীর চরিত্রগঠনে সাহায্য করেন নি, এর অন্তরালে তাঁর স্নেহশীলতা এবং দুহিতাগণের প্রতি বিশেষ দুর্বলতাও প্রচ্ছন্ন। মহর্ষির অপর একটি জীবনী থেকে জানা যায়, "তাঁহার পরিবারস্থ বালক-বালিকাদিগের সকলকেই একত্র হইয়া তাঁহার নিকটে গিয়া তাঁহাকে নিত্য একবার দেখা দিয়া আসিতে হইত।"[১৫] কিন্তু অপরাপর সন্তান বা আত্মীয়গণের স্মৃতিকথা থেকে বোঝা যায় যে পুত্রগণ বরাবর একটি নিরাপদ দূরত্ব ও সশ্রদ্ধ ব্যবধান রক্ষা করে চলতেন এ ব্যাপারে। এমনকি দেবেন্দ্রনাথের সস্নেহ প্রশ্রয় সত্বেও তাঁর মধ্যম ও দুর্ধর্ষ পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই অভিভব থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেন নি। 'আমার বাল্যকথা' গ্রন্থে তিনি বলছেন, "ছেলেবেলায় আমরা বাবা মহাশয়ের কাছে বড় ঘেঁষতাম না। তিনি কখনও আমাদের ডেকে ইংরেজী বাঙলার পরীক্ষা করতেন আর কখনও বা তাঁর মজলিসে গিয়ে আমরা চুপটি করে বসে থাকতুম।" মহর্ষির বিরাট ব্যক্তিত্বের নিকট কন্যাগণ এভাবে অপ্রতিভ বা অভিভূত হয়ে থাকতেন না। পূর্বোক্ত পিতৃস্মৃতির মধ্যে পিতা ও কন্যার এমন একটি সহজ সুন্দর সম্বন্ধ ধরা পড়েছে যার পরিণাম ছিল শুভ ও সুদূরপ্রসারী। কেবল সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যশিক্ষা কিংবা রসাস্বাদনেই তা নিঃশেষিত হয়ে যায় নি, প্রত্যেকটি ব্যাপার লেখিকার জীবনে ও শিল্পে সহজভাবে স্বীকৃত হয়ে গিয়েছিল যার ফলে পিতাপুত্রীর সুন্দর সম্পর্কটি নাটকে গল্পে উপন্যাসে কবিতায় বারংবার প্রতিফলিত।

রবীন্দ্রজীবনীর মধ্যে প্রভাতকুমার জননী সারদা দেবীর জীবনীর উপাদানের অপ্রতুলতার কথা স্বীকার করেছেন। অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী রচিত মহর্ষির জীবনচরিত, খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রচরিত-বিষয়ক গ্রন্থাদির মধ্যে সে সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা আছে।

১৫ স্বর্গগত দেবাত্মা / মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের / কর্ম্মজীবন, প্রকাশচন্দ্র চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩২২, পৃ ১৯২।

স্বর্ণকুমারীর স্মৃতিকথার মধ্যে সারদা দেবীর পাতিব্রত্য ও গার্হস্থ্যজীবনের প্রাণকেন্দ্ররূপে তথা অন্তঃপুরের জীবন-উৎসরূপে তাঁর ধরিত্রীর মত সহিষ্ণুতা এবং শুশ্রূষাকারিণীসুলভ সেবা-পরায়ণতার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা একান্ত দুর্লভ। মাতার সহৃদয়তা ও স্নেহবাৎসল্য স্বাভাবিক, তথাপি বহু সন্তানবতী রমণীহিসাবে সারদা দেবীর এই ভূমিকা সমস্ত সমালোচনার ঊর্ধ্বে; বালিকা স্বর্ণকুমারীর সুকুমার বৃত্তিগুলির উন্মেষসাধনে এই প্রাতঃস্মরণীয় মহিলার জীবনাদর্শ যে কতখানি প্রেরণা সঞ্চার করেছে তা সহজেই অনুমেয়। পরবর্তীকালে সরলা দেবী স্বর্ণকুমারীর সন্তানবাৎসল্যের অভাবাত্মকতা সম্পর্কে অনুযোগ করেছেন, কিন্তু তা কতদূর পর্যন্ত সত্য অথবা অভিমানী দুহিতার ছদ্ম অভিযোগ তা চিন্তার বিষয়। সরলা দেবী জননীকে এই ব্যাপারে মাতামহীর পন্থানুসরণকারী বলে মন্তব্য করেছেন জীবনের ঝরা-পাতায়। বলাই বাহুল্য এ মন্তব্য অতিরঞ্জিত; প্রকৃত সত্য এই যে স্বর্ণকুমারী জননীর চরিত্র-ধর্ম বহুল পরিমাণে স্বীকার করেছেন এবং তার সূত্রপাত হয়েছিল শৈশব থেকে।

তাঁর ছেলেবেলার এক দাসীর নাম পাওয়া যায় 'বেনেদয়া'। ১২৯৯ সালের ভারতী ও বালক পত্রিকার একস্থলে বিনোদা বা 'বেনেদয়া' সম্বন্ধে স্বর্ণকুমারী বলেছেন, "ছেলেবেলায় জানিতাম, খাদ্যের অনাদরই চূড়ান্ত বিস্ময়জনক; কেননা পড়িবার সময় বেনেদয়া (আমাদের পুরাতন দাসী) আমাকে খাইতে পীড়াপীড়ি করিলে যদি বিরক্ত হইয়া বলিতাম যে খাবার চেয়ে আমার পড়তে বেশী ভাল লাগে, তাহা হইলে তাহার বিস্ময়ের সীমা থাকিত না।"[১৬]

স্বাদেশিকতা সম্বন্ধে তিনি বিবাহপূর্বকালেই সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। পরাধীনতার গ্লানি অনুভব ও তার প্রতিকারসাধনে আত্মনিয়োগের ফলে যে মহান জাগরণ পরবর্তীকালে স্বর্ণকুমারীর চিত্তে দেখা দেয় তার অঙ্কুরোদ্গম হয়েছিল বাল্যকালে। মহর্ষির একান্ত সান্নিধ্য ও চারিত্রিক আদর্শ সেই ব্রতসাধনে বালিকাকে অনুপ্রাণিত করেছে প্রধানত। প্রাগুক্ত প্রসঙ্গ থেকে জানা যায় যে কন্যার চরিত্রগঠনে পিতার ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিদেশী সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বহির্জগৎ ও বহির্জীবনের প্রতি সুতীব্র আকর্ষণ মহর্ষির মনের বাতায়ন দিয়েই তিনি প্রথম অনুভব করেন। স্বাদেশিকতার সঙ্গে মাতৃভাষার প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা ছিল দেবেন্দ্রনাথের জীবন ও চরিত্রের মস্ত বড় বৈশিষ্ট্য, তাঁর পুত্রকন্যা-গণের মনের মধ্যেও এই ভাবনা বাল্যাবস্থা থেকে সঞ্চারিত হয়ে যায়। রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত ১৭৭২ শকাব্দের ২৫ মাঘের চিঠি থেকে এ সম্পর্কে তাঁর মনোভাবের পরিচয় স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়, "তুমি চেষ্টা করিবে যাহাতে স্বদেশীয় মাতৃভাষায় উত্তমরূপে সকলের

১৬ ভারতী ও বালক অগ্রহায়ণ ১২৯৯, পৃ ৪৩৮। সম্ভবত এর নাম বিনোদা।

মন আকর্ষণ করিতে পার। ইংরাজী ভাষার ঠনঠনানির অপেক্ষায় মাতৃভাষাতে জলাঞ্জলি দেওয়াতে বিস্তর হানির সম্ভাবনা।" রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে বর্ণিত জনৈক আত্মীয়ের ইংরেজি পত্র প্রত্যাখ্যানের মধ্যে ঐ একই ভাব প্রচ্ছন্ন ছিল। সেকালের পক্ষে চিত্তাকর্ষক পাশ্চাত্ত্য ভাষা ও সাহিত্যের মোহ অপেক্ষা এইকারণে মহর্ষিদেব মাতৃভাষার অধিক গুরুত্ব স্বীকার করেছিলেন সন্তানগণের বাল্যশিক্ষার ব্যাপারে। স্বর্ণকুমারীর বাল্যশিক্ষার ব্যবস্থায় সেই একই ভাবনার প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। লেখিকা স্বয়ং একথা স্বীকার করেছেন সাহিত্য-স্রোত গ্রন্থের দেবেন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধে; বাল্যবিবাহের বিরোধী ও স্ত্রী-শিক্ষায় উৎসাহী দেবেন্দ্রনাথের উদ্যোগেই "পরবর্ত্তীকালে আমরা তাঁহার শিশু কন্যাগণ বাংলা শিক্ষার সহিত সংস্কৃতও শিক্ষা পাইতাম, অধিকন্তু পিতৃদেব আমাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম পাঠ করিতে শিখাইতেন। তাঁহার বিবাহিতা কন্যা ও পুত্রবধূদিগকে ভালরূপে বাংলা ও সংস্কৃত শিক্ষা-দানের জন্য তিনি পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং ইংরাজী শিক্ষার জন্য মেমও নিযুক্ত ছিলেন।...উপাসনান্তে প্রায় তিনি ধর্ম্মবিষয়ের ব্যাখ্যা করিতেন। অল্পবয়স্ক বলিয়া তাঁহার ব্যাখ্যার প্রত্যেক কথাটি সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে না পারিলেও আমি অতিশয় মুগ্ধ হইয়া তাহা শুনিতাম। মন যেন একটা স্বাভাবিক ধর্ম্মভাবে উত্তেজিত হইয়া উঠিত।...তিনি মধ্যে মধ্যে অন্তঃপুরে আসিয়া আমাদিগকে সরল ভাষায় জ্যোতিষ প্রভৃতি বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। তিনি যাহা শিখাইতেন তাহা আমাদিগকে নিজের ভাষায় লিখিয়া তাঁহারই নিকট পরীক্ষা দিতে হইত। ছাত্রীদিগের মধ্যে আমিই ছিলাম সর্বাপেক্ষা ছোট নগণ্য ব্যক্তি। সেইজন্য পরীক্ষাতে সকলের সমান হইবার জন্য আমার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মিত। কিন্তু পরীক্ষার নম্বর আমরা কেহ জানিতে পারিতাম না। এই রূপে পিতৃদেব তাঁহার অন্তঃপুরিকাদিগের মধ্যে শিক্ষার বীজ বপন করিয়াছিলেন।" এই উদ্ধৃতির সঙ্গে অজিতকুমার চক্রবর্তীর একটি মন্তব্য তুলনীয়: "তিনি (দেবেন্দ্রনাথ) প্রত্যহ স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদিগকে লইয়া উপাসনা করিতেন...নিতান্ত শিশুরা ছাড়া তাঁহার সকল ছেলে-মেয়েকেই একে একে ব্রাহ্মধর্ম্মের শ্লোক বিশুদ্ধ উচ্চারণ করিয়া পড়িতে তিনি অভ্যাস করাইতেন এবং সময়ে সময়ে জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করিয়া যাইতেন। তাহাদিগকে সেই উপদেশগুলি লিখিতে হইত। লেখা ভাল হইলে তাহার পাশে তিনি উৎসাহবাক্য লিখিয়া দিতেন।"[২১]

মহর্ষির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও স্নেহাশ্রয়ে বর্ধিত জীবনের আরেকটি পরিচয় 'পিতৃস্মৃতি'তে সৌদামিনী দিয়েছেন, "কোথাও নিমন্ত্রণে যাইতে হইলে আমার ছোটবোনেদের চুল বাঁধার

২১ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ ২৯৮।

ভার আমার উপর ছিল। কেমন চুল বাঁধা হইল এক একদিন তিনি তাহা নিজে দেখিতেন। তাঁহার পছন্দমত না হইলে পুনর্বার খুলিয়া ভাল করিয়া বাঁধিতে হইত।" সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ এবং স্পর্শকাতরতাসহ কন্যাগণের প্রতি অকৃত্রিম অথচ সুগভীর মমত্ব এখানে পরিস্ফুট। আবার সুপরিকল্পিত জীবনধর্মে বিশ্বাসী ও পরিচ্ছন্ন চিন্তার অধিকারী দেবেন্দ্রনাথ তাঁর অন্তঃপুরিকাগণের মানসিক উৎকর্ষসাধনে বিবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন সত্য, তবু তাঁর সমূহ পরিকল্পনা যে কেবলমাত্র পরীক্ষাই ছিল না, তার প্রত্যেকটি যে বালকবালিকাগণের জীবনের গভীরতম প্রদেশ পর্যন্ত প্রবেশ করেছিল সেকথা পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে। মহর্ষির প্রত্যেক সন্তান আত্মপ্রতিষ্ঠার দ্বারা সেই পরিকল্পনার সার্থকতা প্রমাণ করে গেছেন।

২

বহির্জগতের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার প্রথম পর্বে স্বর্ণকুমারীর জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ঘটে। অন্তঃপুরিকা হয়েও পালকিতে বদ্ধ অবস্থায় গুরুস্থানীয়াগণের সঙ্গে গঙ্গাস্নান কিংবা অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথের সাহচর্যে গঙ্গাদর্শনের সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা প্রসঙ্গে লেখিকা এইসকল তথ্যের অবতারণা করেছেন, এর মধ্য দিয়ে তিনি ক্রমশ বহির্বিশ্বের প্রতি একান্ত উৎসুক হয়ে উঠতে থাকেন। কিন্তু এই দুর্গেশনন্দিনীর জীবনের প্রথমদিকে বিশাল বিশ্বের আকুল আহ্বান সার্থকভাবে বহন করে এনেছিলেন কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর পত্নী জগন্মোহিনী দেবী। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজে'র মধ্যে বলেছেন, "১৮৬২ সালের ১লা বৈশাখ ১৩ এপ্রিল ১৭৮৪ শকাব্দ দিবসে কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক কলিকাতা সমাজের আচার্য্যের পদে বৃত হন। এবং ব্রহ্মানন্দ উপাধি প্রাপ্ত হন।" অন্যত্র তারিখটি পাওয়া যায় ১১ এপ্রিল। 'ব্রহ্মনন্দিনী সতী জগন্মোহিনী দেবী' গ্রন্থে আছে, "ইং ১৮৬২ সালের ১১ই এপ্রেল, বাঙ্গালা ১২৬৯ সনের বা ১৭৮৪ শকের ১লা বৈশাখ প্রধানাচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্রকে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য পদে অভিষিক্ত করেন।"[১৮] প্রকৃত তারিখ হল ১২৬৯ সনের বা ১৭৮৪ শকের পয়লা বৈশাখ এবং ১৮৬২ খৃস্টাব্দের ১৩ এপ্রিল রবিবার। ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠানে কেশবচন্দ্র জগন্মোহিনীসহ যোগদান করার ফলে পরিবার থেকে স্বতন্ত্র হয়ে পড়েন। বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত থেকে এই ঘটনাটির অসামান্য গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে। অন্যত্র বলা হয়েছে, This act of Keshub, taking his wife to the Jorasanko House to be by his side on the day of his ordination, is symbolic of the new ideal of the future Brahmo Samaj. Hitherto woman had occupied none but a

১৮ ব্রহ্মনন্দিনী সতী জগন্মোহিনী দেবী, শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রম—হাবড়া ১৩১৪, পৃ ৪২।

subsidiary place in the Brahmo Samaj.[৯৯] তৎসময়োচিত সামাজিক পটভূমিকায় ব্যাপারটি অসাধারণ এবং সুগভীর তাৎপর্যমণ্ডিত। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার তাঁর দি লাইফ এণ্ড টীচিংস অব কেশবচন্দ্র সেন নামক গ্রন্থে বলেছেন, Thus was laid the first stone of woman's education and emancipation in the Brahmo Samaj. Henceforward the wives of the Brahmos began to be recognized as a factor in the community, means began to be devised for their higher education, improvement and welfare... Plans were discussed as to how ladies might be accomodated in the prayer-hall of the Adi-Brahamo Samaj. Altogether, the movement seemed to take a new start. প্রত্যেক ঐতিহাসিক ও সমালোচক ঘটনাটিকে পরবর্তী বৈপ্লবিক অন্দোলনের গৌর-চন্দ্রিকা রূপে স্বীকার করেছেন। মহর্ষির সস্নেহ অনুমোদন এবং পরম পৃষ্ঠপোষকতা অসহায় কেশব-দম্পতিকে সেদিন নিরাপদ আশ্রয় দান করেছিল, পরিণামে এই দম্পতি ঠাকুর-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েন। স্বর্ণকুমারীর বয়স তখন প্রায় ছয় বৎসর, তবু বহিরাগত এই দুজনের কথা তাঁর মনে অক্ষয় স্মৃতিভাণ্ডার রচনা করেছিল। ১৩০৬ সালের ভাদ্র সংখ্যার প্রদীপে তিনি এ সম্বন্ধে বলেছেন, "আমাদের বাড়ীর এই নবোন্নতিকালে কেশববাবু পিতামহাশয়ের শিষ্য হইলেন। অসূর্যম্পশ্য অন্তঃপুরে বাহিরের নিঃসম্পর্কীয় লোক এই প্রথম অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের ন্যায় স্বাগত হইয়া প্রবেশ লাভ করিলেন।" পিতৃদেবের স্মৃতি-চারণাকালে সৌদামিনী দেবী লিখেছেন, "কেশববাবুর স্ত্রী তিনচার মাস আমাদের কাছে ছিলেন। তখন আত্মীয়স্বজনেরা আমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন কেহ আমাদের বাড়ীতে আসিতেন না। সেই সময়ে কেশববাবুর পত্নীকে আমাদের আত্মীয়রূপে পাইয়া আমরা বড় আনন্দে ছিলাম।... তাঁহাকে আমাদের ভগিনীর মত মনে হইত— তিনি যাইবার সময় আমরা বড় বেদনা পাইয়াছিলাম।" সাহিত্য-স্রোত গ্রন্থের মধ্যে স্বর্ণকুমারী এই দম্পতির একটি সুশ্রী চিত্র অঙ্কন করেছেন, "১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে কেশববাবু সস্ত্রীক আমাদের বাড়ী আসিয়া কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। সেদিন জোড়াসাঁকো ভবনে একটি পর্বোৎসব পড়িয়া গিয়াছিল। যেন বহু পুরাতন আত্মীয়ের সহিত সেদিন আমাদের পুনর্মিলন ঘটিল। কেশববাবুর স্ত্রীর ভারী একটি অমায়িক মধুর মুখশ্রী ছিল। আমি যদিও তখন মাত্র ছয় বৎসরের বালিকা তথাপি তাঁহার সেই রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। সর্বদা তাঁহার কাছাকাছি থাকিতে আমার বড় ভাল লাগিত। তিনি দিদিদের সহিত গল্প করিতেন আমি চুপ করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতাম। প্রীতি-আনন্দে হৃদয় ভরিয়া উঠিত।... (কেশবচন্দ্র) বেশ গল্প করিতে পারিতেন। দেখা হইলেই আমরা গল্পের জন্য

৯৯ Prosanto Kumar Sen, Biography of a New Faith, Vol. I, 1950, p 285.

তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিতাম। তাঁরও গল্পের ভাণ্ডার কখনো ফুরাইত না।" এই ক্ষণিকের অতিথি-যুগল স্বর্ণকুমারীর বালিকা-মনে যেন সুদূরের আহ্বান এবং পরম রহস্যের বার্তা বহন করে এনেছিলেন। বিশাল জগৎ ও বিপুল জীবনের প্রতি তীব্র আকর্ষণ তাঁর কিশোর মনকে যে কিভাবে দোলা দিয়েছিল ঐসময়ের বিভিন্ন স্বীকৃতি থেকে তা ভালভাবে অনুমান করা যায়।

১৩৪৮ সালের প্রবাসীর ফাল্গুন সংখ্যায় জ্ঞানদানন্দিনীর স্মৃতিতর্পণকালে কন্যা ইন্দিরা জননীর যে-কয়েকটি উক্তি ব্যবহার করেছেন তার একটিতে জ্ঞানদানন্দিনী বলেছেন, "সেকালে আমাদের অন্দরমহলে পুরুষ চাকর আসবার নিয়ম ছিল না।" বেশ বোঝা যায় ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুর কি রকম পর্দানশীন ছিল। অথচ এর অনতিকাল পরে একটি দৃষ্টিগ্রাহ্য পরিবর্তন এল। ১৮৬২ খৃস্টাব্দের বৈশাখ মাস থেকে সেই পরিবর্তন ধীরে ধীরে দেখা দিতে থাকে। এবম্প্রকার অন্তঃপুরে কেশবচন্দ্র ও জগন্মোহিনীর শুভাগমন ব্যতীত আরও একটি বড় রকমের অবস্থান্তর ঘটল। কেশবচন্দ্রের অনুপ্রবেশের অল্প কয়েক দিনের মধ্যে অযোধ্যানাথ পাকড়াশীও অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে থাকেন বধূ ও কন্যাগণকে শিক্ষা-দানের নিমিত্ত ; স্বর্ণকুমারীর বাল্যস্মৃতির ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল এই শিক্ষকের সঙ্গলাভে। শৈশবে বৃদ্ধ রামতনু লাহিড়ীর সান্নিধ্য তিনি পেয়েছিলেন বলে মনে হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে আছে, "তিনি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বাক্যালাপ করিতে বড় ভালবাসিতেন। যখনই তিনি আসিতেন বাড়ীর ছেলেমেয়েদিগকে কাছে ডাকিয়া নানারকম গল্প জুড়িয়া দিতেন।" অন্তঃপুরের চতুঃসীমার বাইরের মানুষের সঙ্গ এভাবে তাঁকে উৎসুক ও আগ্রহান্বিত করে তুলেছে বহির্বিশ্ব সম্পর্কে।

৩

অন্তঃপুরের যে পরিবেশের মধ্যে তাঁর শৈশব ও বাল্যকাল অতিক্রান্ত হয়েছে জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের আত্মকথায় তার সুন্দর পরিচয় আছে, "আগে আমাদের বাড়ীতে অবরোধপ্রথা খুবই মানিয়া চলা হইত। মেয়েদের এবাড়ী ওবাড়ী যাইতে হইলেও ঘেরাটোপ-ঢাকা পাল্কীতে চড়িয়া যাইতে হইত ; এবং পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে দুইএকজন করিয়া দারোয়ানও যাইত। যেসকল পুরস্ত্রীগণ গঙ্গাস্নানে যাইতেন তাঁহাদিগকে পাল্কী করিয়া লইয়া গিয়া পাল্কীশুদ্ধ জলে চুবাইয়া আনা হইত।" এই ব্যবস্থার প্রসঙ্গ সরলা দেবীর জীবনের ঝরাপাতায়ও সমর্থিত হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের বিলাত থেকে প্রত্যাগমনের পরও "মা ও মামীরা তখন গঙ্গাস্নানে গেলে বাড়ীভিতর থেকে পাল্কী চড়ে গঙ্গার ঘাটে পৌঁছে পাল্কীশুদ্ধ গঙ্গায় ডুব

দিইয়ে নিয়ে আসা হত তাঁদের। এবাড়ী থেকে গগনদাদাদের বাড়ীতে কখন যেতে হলেও পাল্কী চড়ে যেতেন।"

জন্মের পূর্ববর্তীকালের অন্তঃপুরের কথা লেখিকাই বলেছেন 'আমাদের গৃহে অন্তঃপুর-শিক্ষা ও তাহার সংস্কার' প্রবন্ধে, "যখন আমার মাতৃদেবী পুত্রবধূ হইয়া আমাদের গৃহে আসেন, তখন আমাদের প্রপিতামহের পরিবারে অন্তঃপুর পরিপূর্ণ। পিতামহ, দ্বারকানাথ ঠাকুরের স্ত্রী ও পুত্রবধূগণ, তাঁহার ভ্রাতৃবর্গের স্ত্রীকন্যা পুত্রবধূগণ, তাঁহার ভগিনী ভাগিনেয়ীগণ প্রভৃতি সকলেই এই এক বাড়ীতে তখন বাস করিতেন। এই বহু পরিবারের কেহই মূর্খ ছিলেন না। বরঞ্চ ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশেষ বিদ্যাবতী বলিয়া আদরণীয়া ছিলেন। স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা তাঁহারা গৌরবের বিষয় বলিয়াই জানিতেন।"[১০০] এইরকম পরিবেশে তাঁর জন্ম হওয়ায় শৈশব থেকে তাঁর শিক্ষার ব্যবস্থাও সেকালের পক্ষে ছিল যথেষ্ট উন্নত। পরিবারের কোনো কোনো অল্পবয়স্ক বালিকা কখন কখন বালকদের সঙ্গে একই গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে পাঠাভ্যাস করত। রবীন্দ্রনাথের বাল্যকাল পর্যন্ত এই রকম ব্যবস্থার অস্তিত্ব যে ছিল জীবনস্মৃতি থেকে তা জানা যায়: "ছোড়দিদি আমাদের সঙ্গে সেই একই নীলকমল পণ্ডিতমহাশয়ের কাছে পড়িতেন…" ইত্যাদি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্মৃতিকথায় বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ঐ প্রণালীর উল্লেখ করেছেন, "ঠাকুরদালানেই গুরুমহাশয়ের পাঠশালা বসিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা ভগিনী ঐ পাঠশালায় ক খ এর দাগা বুলাইতেন।"

স্বর্ণকুমারীর বাল্যকালীন অন্তঃপুরশিক্ষা সম্বন্ধে লেখিকার উক্তি উদ্ধারযোগ্য: "আমি শৈশবে অন্তঃপুরে সকলেরই লেখাপড়ার প্রতি একটা অনুরাগ দেখিয়াছি। মাতাঠাকুরানী ত কাজকর্ম্মের অবসরে সারাদিনই একখানি বই হাতে লইয়া থাকিতেন। চাণক্যশ্লোক তাঁহার বিশেষ প্রিয় পাঠ্য ছিল, প্রায়ই বইখানি লইয়া শ্লোকগুলি আওড়াইতেন। তাঁহাকে সংস্কৃত রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া শুনাইবার জন্য প্রায়ই কোন না কোন দাদার ডাক পড়িত। দিদিমা—মায়ের খুড়ীমা, তিনি ত পুস্তকের কীট ছিলেন। কাব্য উপন্যাসাদির ত কথাই নাই; তন্ত্রপুরাণ, সাংখ্য আর দর্শনাদির যত কঠিন অনুবাদই হউক না কেন, তাহাতে দন্তস্ফুট করিবার চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। আর কোন বই না পাইলে শেষে অভিধানখানাই খুলিয়া পড়িতে বসিতেন। বড়দাদা মহাশয়ের 'তত্ত্ববিদ্যা'র সমঝদার তাঁহার মত আর কেহ ছিল না। মামীমা, দিদি, বধূঠাকুরানীগণ প্রভৃতি নবীনার

১০০ দ্র সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ২৮ সংখ্যক গ্রন্থ, পৃ ৬। গ্রন্থাবলীর 'সেকেলে কথা'র সঙ্গে পাঠান্তর লক্ষণীয়।

দল অবশ্য কাব্য উপন্যাসেরই অনুরাগিণী ছিলেন। পড়িতে শিখিয়া অবধি আমাদের মাতুলানীকে রামায়ণ, মহাভারত, হাতেমতাই প্রভৃতি পড়িয়া শুনান আমার একটি বিশেষ কার্য্য ছিল। মনে আছে, বাড়ীতে মালিনী বই বিক্রী করিতে আসিলে মেয়েমহল সেদিন কি রকম সরগরম হইয়া উঠিত। সে বটতলার যত কিছু নূতন বই, কাব্য, উপন্যাস, আষাঢ়ে গল্প—ইহার সংখ্যাই যদিও অধিক—অন্তঃপুরে আনিয়া দিদিদের লাইব্রেরীর কলেবর বৃদ্ধি করিয়া যাইত।" মায়ের চাণক্যশ্লোকের আবৃত্তি, অগ্রজগণের সংস্কৃত রামায়ণ-মহাভারত পাঠ, দিদিমার দর্শনঅভিধানচর্চা, অন্যান্য পুরাঙ্গনার আধুনিক সাহিত্যানুরাগ প্রভৃতি তাঁর মনের উপর বিভিন্ন কোণ থেকে আলোকপাত করেছে এবং সেই আলোক-স্নাত মনের অধিকারী হয়ে রামায়ণ-মহাভারত-হাতেমতাই প্রভৃতি অপরকে শুনিয়ে তিনি একই সঙ্গে বাংলা ও সংস্কৃতে ধীরে ধীরে পারদর্শী হয়ে উঠেছেন। যেমন একই বায়ুমণ্ডলে বসবাস করার ফলে শ্বাসকার্যকালে ঐ বায়ু গ্রহণ করা অনিবার্য ব্যাপার, তেমনি এই অন্তঃপুরের শিক্ষাবৈচিত্র্য ও বিপুলতার মধ্যে বর্ধিত হওয়ার জন্য এর প্রত্যেকটি তরঙ্গ যে তাঁর মনের তটভূমিতে স্বাভাবিকভাবে প্রহত হয়েছে তা স্বীকার করা চলে।

৪

বিশেষত কন্যাগণের শিক্ষাব্যাপারের প্রতি মহর্ষির সজাগ দৃষ্টির কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। পিতার সেই বিষয়ে উদ্যম ও উৎসাহের কথা স্বর্ণকুমারী চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন, "তাঁহার শিশুকন্যাগণ শিক্ষার বয়সপ্রাপ্ত হইলে পুরাতন প্রথার পরিবর্ত্তে উচ্চ উন্নত প্রণালীতে তাহাদের শিক্ষা আরম্ভ হইল। আমাদের জন্য পণ্ডিত নিযুক্ত হইলেন। দ্বিতীয় ভাগ শেষ করিয়া বাঙলার সহিত সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করিলাম। অন্তঃপুরে মেম আসিতে লাগিলেন।" ইতিপূর্বে দেবেন্দ্রনাথ হিমালয় ভ্রমণ শেষ করে এসে বাড়ির সকলকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত করেন এবং 'প্রতিদিন উপাসনার সময় সত্যধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উপদেশে এবং ভিন্ন সময়ে নানারূপ সরল সহজ বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতায় তাঁহার পরিবারের, বিশেষ অন্তঃপুরিকাগণের বুদ্ধি, জ্ঞান ও ধর্ম্মবৃত্তি সমভাবে সমার্জ্জিত করিতে লাগিলেন।' অতঃপর তিনি ঠাকুর-বাড়ির মধ্যে সমূহ পৌত্তলিক আচার অনুষ্ঠান এবং সমগ্র ভারতব্যাপী বহুকালপ্রচলিত হীন স্ত্রী-আচার বর্জন করতে থাকেন। ঐসময় কেশবচন্দ্র সেন মহর্ষির পরিবারভুক্ত হয়ে পড়েন। ফলে নিঃসম্পর্কীয় বাহিরের লোকের সান্নিধ্যলাভ, মহর্ষির নিকট ধর্ম ও বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতাশ্রবণ, অগ্রজগণের নির্দেশ এবং অন্তঃপুরস্থ প্রচলিত শিক্ষারীতির সংস্পর্শে এসে স্বর্ণকুমারীর জ্ঞানের পরিধি ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হতে থাকে; তার উপর মেমের শিক্ষা। দেশীয় বিদেশীয় সকল প্রকার সাহিত্যের মধ্যে তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ এই সময় থেকেই আরম্ভ।

এই মেমের শিক্ষা অবশ্যই মহর্ষির মনঃপূত হয় নি। স্বর্ণকুমারীর মতে সত্যেন্দ্রনাথের বিলাত গমনের "বৎসরান্তে, কিংবা তাহারও পরে ধর্ম্মের জন্য নহে—কেবল স্ত্রীশিক্ষার জন্যই আর এক-জন আত্মীয় পুরুষ অন্তঃপুরে প্রবেশলাভ করিলেন। মেমের শিক্ষা আশানুরূপ ফলপ্রদ বলিয়া তাঁহার মনে হইল না। আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রবীণ আচার্য্য শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী অন্তঃপুরে শিক্ষকতাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তখন আমার মেজদাদা মহাশয়েরও বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বৌঠাকুরানী তিনজন, মাতুলানী, দিদি ও আমরা ছোট তিনবোন সকলেই তাঁহার কাছে অন্তঃপুরে পড়িতাম। অঙ্ক, সংস্কৃত, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি ইংরাজী স্কুলপাঠ্য পুস্তকই আমাদের পাঠ্য ছিল।"

'আমার বাল্যকথা'গ্রন্থে সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন যে ১৮৬০ সালে ১৯ বৎসর বয়সে তিনি বিলাত গমন করেন। কিন্তু সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার ষষ্ঠ খণ্ডে ও বিশ্বভারতী পত্রিকার চতুর্থ বর্ষের প্রথম সংখ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ বলেছেন যে তাঁর বিলাতগমন কাল হল ১৩ মার্চ ১৮৬২) যোগেশচন্দ্র বাগলের মতে অযোধ্যানাথ পাকড়াশী ১৮৬২ খৃস্টাব্দের কোনো একসময় ঠাকুর-বাড়ির অন্তঃপুরে গৃহশিক্ষকতা আরম্ভ করেন।[১০১] স্বর্ণকুমারীর মন্তব্য অনুসরণ করে বলা যায় ঠাকুরবাড়িতে কেশবদম্পতির আগমনের পর অর্থাৎ ১৮৬২ খৃস্টাব্দের ১৩ এপ্রিলের পর অযোধ্যানাথ গৃহশিক্ষকতার কার্য আরম্ভ করেন। অযোধ্যানাথের কাছে স্বর্ণকুমারী বাল্যকালে সংস্কৃত শিক্ষালাভ করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি থেকে জানা যায়, "অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয় মেয়েদিগকে সংস্কৃত পড়াইতেন।" পিতা দেবেন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে এসে উদ্ভট শ্লোকশিক্ষার কথা লেখিকা স্বীকার করেছেন সাহিত্য-স্রোত গ্রন্থের একটি প্রবন্ধে। জননীর চাণক্যশ্লোক আবৃত্তি শিশুচিত্তকে নানা কারণে মুগ্ধ করেছিল; সারদাসুন্দরীর দরবারে অগ্রজগণের সংস্কৃত রামায়ণ-মহাভারত পাঠশ্রবণে তাঁর সংস্কৃতসাহিত্য বিষয়ে গভীর আগ্রহ জন্মেছিল। এভাবে বিবাহের পূর্বে তাঁর সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যজ্ঞান পূর্ণতার পথে অগ্রসর হয়েছে।

বাংলাশিক্ষাও এই কালে যথেষ্ট পরিণতি লাভ করে। তাঁর বিবাহের কিয়দ্দিবস পরে ১২৭৪ শকের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় বামাবোধিনী পত্রিকার 'নূতনবিভাগ'-এর মধ্যে বলা হয়, "তিনি বাঙলা ভাষায় উত্তম শিক্ষালাভ করিয়াছেন এবং সংস্কৃতও কিছু অধ্যয়ন করিয়াছেন।" তাঁর বাংলাশিক্ষার ইতিহাস বড়ই বিচিত্র কারণ ঠাকুর পরিবারে তখন মেম নিযুক্ত ছিলেন উক্ত বিষয়ে শিক্ষাদানের নিমিত্ত। সিমলা পাহাড় থেকে প্রত্যাবর্তনের পর এই ব্যবস্থা অবলম্বন করেন মহর্ষিদেব। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছেন, "মিস গোমিস প্রভৃতি খ্রীষ্টীয়ান মেয়েরা বাঙলা

১০১ সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৮৫ সংখ্যক গ্রন্থ, ১৩৬৩, পৃ ২৯।

শিখাইতে আসেন।"[১০২] দ্বিতীয়ভাগ শেষ করে বাংলার সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষার কালে এই মেমের আবির্ভাব হয়। অবশ্য অনতিকাল পরে দেবেন্দ্রনাথ এই ব্যবস্থা বাতিল করে দেন। সৌদামিনী দেবী এসম্পর্কে বলেছেন, "পিতৃদেব সিমলা পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের শিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিলেন। কেশববাবুদের অন্তঃপুরে মিশনারী মেয়েরা পড়াইতে আসিত। আমাদের শিক্ষার জন্য পিতা তাহাদিগকে নিযুক্ত করিলেন। বাঙালী খ্রীষ্টান শিক্ষয়িত্রী প্রতিদিন আমাদিগকে পড়াইতেন এবং হপ্তায় একদিন মেম আসিয়া আমাদিগকে বাইবেল পড়াইয়া যাইতেন। মাসকয়েক এইভাবে চলিয়াছিল। অবশেষে একবার পিতৃদেব আমাদের পড়াশুনা কেমনতর চলিতেছে দেখিতে আসিলেন। একখানা স্লেটে শিক্ষয়িত্রী আমাদের পাঠ লিখিয়া দিয়া গিয়াছিলেন—তাহারই অনুসরণ করিয়া কপি করিবার জন্য আমাদের প্রতি ভার ছিল। স্লেটে লিখিত সেই পাঠের বানান ও ভাষা দেখিয়া পিতা আমাদের এই নিয়মের শিক্ষা বন্ধ করিয়া দিলেন।" সে যাহোক মেমের কাছে শিক্ষাগ্রহণের ফলে বিদ্যার্জন তেমন কিছু নাও হতে পারে, তবে একথা অস্বীকার করা যায় না যে আধুনিক কালোচিত ভাবধারায়-দীক্ষিত রমণীর সংস্পর্শে এসে স্বর্ণকুমারীর চিত্তোন্নতি ঘটেছিল।

অগ্রজগণের কেউ কেউ তাঁর বাল্যশিক্ষায় সহায়তা করেন, বিশেষভাবে সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের কথা লেখিকা পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন এপ্রসঙ্গে: "এক্ষণে সেজদাদা মহাশয় তাঁহার পত্নীকে ওস্তাদের নিকট গান শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা গানবাজনা লেখাপড়া সর্ব্বরকমে বেশ ভাল করিয়া শিক্ষা পাইতে লাগিল। দিদিরা পর্য্যন্ত ঘরে থাকিয়া ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করিলেন।"[১০৩] রবীন্দ্রনাথের বাল্যকাল পর্যন্ত দেবেন্দ্রনাথ যে বাড়ির বালকদের শিক্ষাব্যবস্থার উপযোগী বিবিধ উদ্যোগ-আয়োজনের দায়িত্ব গ্রহণ করছিলেন সেকথা জীবনস্মৃতির বিভিন্ন অধ্যায় পাঠকালে অবগত হওয়া যায়; বিভিন্ন বিষয় ও বিদ্যার শিক্ষাক্রম বালকদের জন্যও নির্ধারিত ছিল। যা হোক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছেন, "এই সময় আমার সেজদাদাও মেয়েদিগকে মেঘনাদবধ প্রভৃতি কাব্য পড়াইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার পর মেজদাদা বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে মেয়েদের জ্ঞানস্পৃহা দিনদিন বাড়িতেছিল এবং তাহাদের হৃদয়মনের ঔদার্যও অনেক পরিমাণে বর্ধিত হইতেছিল।" হেমেন্দ্রনাথের শিক্ষাদান-পদ্ধতির কথা বিশেষভাবে জানা যায় জ্ঞানদানন্দিনীর স্মৃতিকথা থেকে, "বিয়ের পরে আমার সেজদেওর হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০২ পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবনস্মৃতি, প্রবাসী মাঘ ১৩১৮।

১০৩ জীবনের ঝরাপাতা, ১৮৭৯ শক, পৃ ২১৩।

ইচ্ছে করে আমাদের পড়াতেন। তাঁর শেখাবার দিকে খুব ঝোঁক ছিল। নিজের মেয়েদেরও সব লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। আমরা মাথায় কাপড় দিয়ে তাঁর কাছে বসতুম আর এক একবার ধমকে দিলে চমকে উঠতুম। আমি বিয়ের আগেই লিখতে পড়তে পারতুম আর আমার হাতের অক্ষরের খুব প্রশংসা ছিল। আমার বাবামশায় একটা পাঠশালা খুলেছিলেন। সেখানে মুসলমান পর্যন্ত বড় বড় ছেলেরা যেত; কেবল আমি একলা ছোটমেয়ে ছিলুম। আমার যা কিছু বাঙলাবিদ্যা তা সেজঠাকুরপোর কাছে পড়ে। মাইকেল প্রভৃতি শক্ত বাঙলা বই পড়াতেন, আমার খুব ভাল লাগত; এখনো লাগে। উনি বিলেত থেকে ঠাকুর-পোকে লিখে পাঠিয়েছিলেন আমাকে ইংরিজী শেখাতে, কিন্তু সেটা অক্ষরপরিচয়ের বড় বেশি এগোয় নি।"[১০৪] সতীর্থ স্বর্ণকুমারীর বাংলা এবং ইংরেজি ভাষার জ্ঞান এইসময়ে শক্ত বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং স্পষ্টই বোঝা যায় হেমেন্দ্রনাথের সহায়তায় অন্দরমহলে সঙ্গীতচর্চার যে আয়োজন করা হয় সেখানেও স্বর্ণকুমারী দীক্ষিত হন, তাঁর সঙ্গীতচর্চার সূত্রপাত এখান থেকেই।

কেবল সঙ্গীত নয়, সাহিত্যচর্চার দিক থেকে প্রথম উদ্যোগ দেখা যায় এই বিবাহপূর্ব জীবনে। প্রত্যেক কন্যার সাহিত্যসৃষ্টি-ক্ষমতার উন্মেষসাধনে দেবেন্দ্রনাথের উদ্যম ও ও উদ্যোগ ছিল প্রশংসনীয়। সৌদামিনীর জীবনে তার সম্যক প্রতিফলন লক্ষিত হয়, "বাড়ীর মধ্যে আমাদের প্রাত্যহিক উপাসনার একটি ঘর ছিল। সেই উপাসনার ঘরে তিনি প্রতিদিন উপাসনা করিয়া আমাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্ম পড়াইতেন; কোন কোন দিন আমাদিগকে লইয়া গ্রহনক্ষত্রের বিষয় আলোচনা করিতেন। এইরূপ যেসকল উপদেশ দিতেন আমাদিগকে তাহা লিখিতে হইত। লেখা ভাল হইলে তাহার পাশে তিনি উৎসাহবাক্য লিখিয়া দিতেন।" মহর্ষিদেবের জীবনী-প্রণেতা অজিতকুমার চক্রবর্তীও সদৃশ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। যা হোক স্বর্ণকুমারীর জীবনে অনুরূপ ঘটনা যে বারবার ঘটেছে তার পরিচয় পাওয়া যায় অন্যত্র: "অল্পবয়সেই স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনাশক্তির বিকাশ হয়। তাঁহাকে মহর্ষি স্বয়ং এবং তাঁহার দাদারা রচনায় বিশেষ উৎসাহ দিতেন। মহর্ষি তাঁহার একটি রচনা পড়িয়া তাঁহার পার্শ্বে লিখিয়া দিয়াছিলেন—স্বর্ণ, তোমার লেখনীতে পুষ্পবৃষ্টি হউক।"[১০৫] এবিষয়ে লেখিকা স্বয়ং তাঁর সাহিত্য-স্রোত গ্রন্থে যা বলেছেন তা উল্লেখযোগ্য, "পরবর্তীকালে আমরা তাঁহার শিশুকন্যাগণ বাঙলা শিক্ষার সহিত সংস্কৃতও শিক্ষা পাইতাম, অধিকন্তু পিতৃদেব আমাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম পাঠ করিতে শিখাইতেন। উপাসনান্তে

১০৪ পুরাতনী, পৃ ২৭।

১০৫ দ্র রবীন্দ্র কথা, পৃ ১৩৭।

প্রায় তিনি ধর্ম্মবিষয়ের ব্যাখ্যা করিতেন। অল্পবয়স্ক বলিয়া তাঁহার ব্যাখ্যার প্রত্যেক কথাটি সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে না পারিলেও আমি অতিশয় মুগ্ধ হইয়া তাহা শুনিতাম। মন যেন একটা স্বাভাবিক ধর্ম্মভাবে উত্তেজিত হইয়া উঠিত।...তিনি মধ্যে মধ্যে অন্তঃপুরে আসিয়া আমাদিগকে সরল ভাষায় জ্যোতিষ প্রভৃতি বিজ্ঞানশিক্ষা দিতেন। তিনি যাহা শিখাইতেন তাহা আমাদিগকে নিজের ভাষায় লিখিয়া তাঁহারই নিকট পরীক্ষা দিতে হইত।" এবং এভাবেই স্বর্ণকুমারীর ধর্ম ও বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ রচনায় হাতেখড়ি ব্যাপারটি মহর্ষির দ্বারাই সাধিত হয়।

বিবাহের পূর্বে কেবল ধর্ম ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় আলোচনা শুধু নয়, রসসাহিত্যরচনার সূত্রপাতও হয়েছিল। সম্ভবত এ ব্যাপারে দীক্ষাগুরু ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। তাঁর জীবনস্মৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়, "আমি সন্ধ্যাকালে সকলকে একত্র করিয়া ইংরাজী হইতে ভাল ভাল গল্প তর্জমা করিয়া শুনাইতাম—তাঁহারা সেগুলি বেশ উপভোগ করিতেন। ইহার অল্পদিন পরেই দেখা গেল যে আমার একটি কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী কতকগুলি ছোট ছোট গল্প রচনা করিয়াছেন। তিনি আমায় সেইগুলি শুনাইতেন। আমি তাঁহাকে খুব উৎসাহ দিতাম। তখনও তিনি অবিবাহিতা।" অর্থাৎ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কথকতা স্বর্ণকুমারীর কথাসাহিত্যে সুন্দরভাবে রূপান্তরিত হয়েছে। এই ঘটনার অন্তরালবর্তী আরেকটি জিনিস লক্ষ করবার মত। ইংরেজি সাহিত্যের অনুবাদকথনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যখন ব্যস্ত তখন স্বর্ণকুমারী সেই অনূদিত বিদেশী কাহিনীকে স্বীকরণের কাজে মনোযোগী : পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য-সমুদ্র মন্থনের ফলে সংগৃহীত মুক্তার 'জ্যোতি' 'স্বর্ণসূত্রে' কেমন করে চমৎকার বিরাজ করছে সেই ইতিহাস এখানে দেওয়া হয়েছে। এখানে কিশোরী স্বর্ণকুমারীর দুর্লভ স্বীকরণ ক্ষমতার পরিচয় পাই। প্রাক্‌বিবাহ জীবনে স্বর্ণকুমারীর সাহিত্য-সাধনায় ও শিল্পকর্মে প্রধানতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

তাঁর জীবনে সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাবসম্পর্কে এবারে আলোচনা করা যায়। পরবর্তী জীবনের স্নেহময় রক্ষাকবচ ও প্রেরণার অনন্ত উৎসস্বরূপ মধ্যমভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ হয়ত তাঁর প্রাক্‌বিবাহজীবনে তেমন বিশেষ কিছুই করেন নি, কিন্তু তিনি এমন একটি কাজ করেছিলেন যার কথা লেখিকা জীবনসন্ধ্যায় পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন সাহিত্য-স্রোত গ্রন্থের একটি প্রবন্ধে : "বিলাত যাইবারও কিছু পূর্ব্বে মেজদাদা একদিন আমাকে গাড়ী করিয়া তাঁহার সঙ্গে গঙ্গার ধারে বেড়াইতে লইয়া গিয়াছিলেন। জাহাজগুলাকে এমন প্রকাণ্ড দৈত্যাকার বলিয়া মনে হইয়াছিল যে সেদিনকার সেই ভয় বিস্ময়ের ছাপ আলোকচিত্রে অস্পষ্ট ছায়াপাতের ন্যায় এখনো অস্ফুট আকারে মাঝে মাঝে আমার মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠে।" সত্যেন্দ্রনাথের সহায়তায় পরবর্তী জীবনে যে 'বিশ্বের মহাভাবের মধ্যে প্রবেশ করিয়া

হৃদয়প্রাণের সম্প্রসারণে কৃতার্থ ধন্য' হয়েছিলেন তিনি, এপ্রসঙ্গে লেখিকা সেকথাও স্বীকার করেছেন। তাঁর জীবনে সত্যেন্দ্রনাথ সুদূরের আহ্বান বহন করে এনেছিলেন, তাঁর মানসিক সঙ্কীর্ণতা ও গণ্ডিবদ্ধতা থেকে এবং অন্তঃপুরের অবরুদ্ধ গহ্বর কিংবা দুর্ভেদ্য দুর্গ থেকে তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন। প্রাণচঞ্চল বিশ্বের হৃদ্‌স্পন্দন অনুভবে ও তার সঙ্গে একাত্মতার উপলব্ধির পরিমণ্ডলে কিশোরীর রহস্যময় মনের গতিপ্রকৃতি উপর্যুক্ত ছত্রগুলিতে ফুটে উঠেছে। মুক্তির জগতে প্রথম পদক্ষেপের কালে চিত্তেজাগ্রত ভীতিমিশ্রিত বিস্ময় ও কুণ্ঠাযুক্ত ঔৎসুক্যের এবং আগ্রহের একটি চমৎকার ইতিহাস এখানে পাওয়া যায়।

সত্যেন্দ্রনাথের বিলাত যাত্রাকালে লেখিকার মনঃকষ্ট এবং বিলাত থেকে প্রত্যাবর্তনকালে তাঁর মানসিক উল্লাসের সুন্দর উল্লেখ আছে এক স্থলে : "মেজদাদা যখন বিলাত যান তখন আমি নিতান্ত ছোট, তবু তাঁহার বিদায়-যাত্রাকালের কষ্ট আমার মন হইতে এখনো নিঃশেষে মুছিয়া যায় নাই। ইহার দুই বৎসর পরে একদিন ভোরবেলা স্বপ্ন দেখিতেছিলাম যেন আমি রঙীন আকাশের নীচে উড়িয়া বেড়াইতেছি, (আগের দিন একটি পরীরাণীর গল্প পড়িয়াছিলাম) উড়িতে উড়িতে মনে হইতেছে যে, বাঃ এ তো বেশ সহজ ব্যাপার, সকলে কেন এমন উড়িতে পারে না। এমন সময় মামীমা ডাকিয়া বলিলেন—ওঠ, ওঠ, সতুবাবু এসেছেন। জাগিয়াই তাঁহাকে দেখিতে ছুটিলাম। সত্যই ত, আমার মেজদাদা আসিয়াছেন। উঃ! সে কী আনন্দ!! কী উল্লাস!!! আমাদের সকলের জন্য মেজদাদা কতরকম খেলানা আনিয়াছিলেন, তাহার একটি এখনও আমার কাছে আছে।" অগ্রজের শুভাগমনে বিপুল উল্লাসের পরিচয় পাওয়া যায় ক্রমবর্ধমান বিস্ময়সূচক চিহ্নের ব্যবহারে। অষ্টমবর্ষীয়ার পক্ষে পরীরাণীর গল্পপাঠ এবং স্বপ্নে তার পুনর্দর্শন বর্ষীয়সী লেখিকার নিকট তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে রূপকে পর্যবসিত। রূপকথার রাজপুত্র সাতসমুদ্র তের নদী অতিক্রম করে মুগ্ধ ভগিনীর জীবনে দেবতার আশীর্বাদের মত অবতীর্ণ হয়েছেন এবার। তাই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও ভাবাদর্শের সোনার কাঠির ছোঁয়ায় এক সুপ্রভাতে মোহগ্রস্ত রাজকন্যার জাগরণের এই ইতিহাস সত্যই তাৎপর্যপূর্ণ। এসম্বন্ধে জনৈক বিদেশীর মন্তব্য উদ্ধার করা যায়, her third brother Satyendranath, after visiting England, set himself to tear down the purdah, to remove from Indian women the many and tremendous disabilities under which they labour ; he has been warmly supported by Mrs. Ghosal, who was one of the first Bengali ladies to mix freely in society.[১০৬] সত্যেন্দ্রনাথের কৃতকর্মে অংশ গ্রহণ করার পূর্বে তাঁরই

১০৬ E. M. Lang, Introduction, An Unfinished Song.

সহায়তায় লেখিকা যে মানসিক মুক্তিলাভ করেন সেকথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। লেখিকা এই গণ্ডিবদ্ধ জীবনের যন্ত্রণা ও তা থেকে মুক্তির আনন্দের আস্বাদ পেয়েছিলেন বলেই একার্যে তাঁর উৎসাহ এত অধিক ছিল।

বিবাহ ও বিবাহপরবর্তী কয়েকটি ঘটনা

১

স্বর্ণকুমারীর বিবাহ হয় ১৮৬৭ খৃস্টাব্দের ১৭ নভেম্বর রবিবার দিবসে। ১৭৮৯ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় এসম্পর্কে যে সংবাদ প্রকাশিত হয় তা উদ্ধারযোগ্য, "গত ২ অগ্রহায়ণ রবিবার ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ কন্যার সহিত কৃষ্ণনগরের অন্তঃপাতী জয়রামপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু জানকীনাথ ঘোষালের ব্রাহ্মবিধানানুসারে শুভবিবাহ হইয়া গিয়াছে। বরের বয়ঃক্রম ২৭ বৎসর। কন্যার বয়ঃক্রম ১৩ বৎসর।" সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার স্বর্ণকুমারীগ্রন্থে এবিষয়ে বামাবোধিনী পত্রিকার যে অংশ ব্যবহৃত হয়েছে তার মধ্যে আছে, 'কন্যার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসর।' প্রকৃতপক্ষে ঐ সময়ে লেখিকার বয়স ছিল অনধিক এগার বৎসর তিনমাস। বামাবোধিনীর নির্দেশানুযায়ী তখন তাঁর বয়স কিছুতেই চোদ্দ বৎসর হতে পারে না কারণ তাঁর অগ্রজা শরৎকুমারীর বয়সই তখন প্রায় চোদ্দ; একই কারণে তত্ত্ববোধিনীর মন্তব্যানুসারে তের বৎসরও হবে না যেহেতু শরৎকুমারীরই বয়স তখন তের বৎসর কয়েকমাস মাত্র। এ সম্পর্কে কন্যা হিরণ্ময়ীর কথাকে সত্য বলা যেতে পারে। তিনি বলেছেন যে মাতৃদেবীর যখন বিবাহ হয় তখন তাঁর বয়স বার বৎসর মাত্র; অর্থাৎ এগার বৎসর অতিক্রম করে বারতে এই সময় তিনি পদার্পণ করেছিলেন। পিতার শ্রাদ্ধবাসরে লেখিকার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করেন হিরণ্ময়ী দেবী, সেখান থেকে উক্ত অংশটি গৃহীত বলে উক্তিটিকে নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণ করা চলে। তাছাড়া তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রচিত মন্মথনাথ ঘোষের 'স্বর্ণ-স্মৃতি' নামক প্রবন্ধে পাওয়া যায় যে এগার বৎসর বয়সে স্বর্ণকুমারীর বিবাহ হয়। পুনরুক্তির মাধ্যমে ঐ প্রবন্ধে জোর বা emphasis দিয়ে বলা হয় যে ১৮৬৭ খৃস্টাব্দে একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে স্বর্ণকুমারীর বিবাহ হয়। মন্মথনাথের প্রবন্ধটি যে বিশেষভাবে নির্ভরযোগ্য সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

জানকীনাথের (১৮৪০-১৯১৩) বংশপরিচয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রদত্ত বিবাহ-বিবরণের মধ্যে পাওয়া যায়, পরিশিষ্টে এই বিবরণের প্রয়োজনীয় অংশসমূহ দেওয়া হল। দুই পুত্রের

পিতা জয়চন্দ্র ঘোষালের কনিষ্ঠ পুত্র জানকীনাথ। হিরণ্ময়ী বলেছেন, "জানকীনাথের নিজ ইচ্ছামতই পিতামহমহাশয় তাঁহাকে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে বিদ্যাশিক্ষার্থ পাঠান।··· রামতনু লাহিড়ী প্রমুখ মনীষীগণের উপদেশ ও উত্তেজনায় পিতামহাশয় ও আরও কতিপয় ছাত্র জাতিভেদে বিশ্বাসশূন্য হন এবং যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করেন। আমাদের পিসেমহাশয় ৺পরেশনাথ মুখোপাধ্যায়ও[১০৭] ইহাদের মধ্যে একজন। উপবীত ত্যাগবার্তা শুনিয়া পিতামহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ত্যাজ্যপুত্র করেন, কিন্তু শুনিতে পাই পিতামহী ইহাতে মোটেই রাগ করেন নাই, বলিয়াছিলেন ছেলেরা যাহা সত্য মনে হয় তাহাই করিয়াছে, তাহা করুক।···এই সময় মাতামহ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কৃষ্ণনগরে যান ও এই সুদর্শন উৎসাহী সমাজ-সংস্কারক যুবককে দেখিয়া প্রীত ও আকৃষ্ট হয়েন এবং কয়েক বৎসর পরে মাতৃদেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ স্থির হয়। আশ্চর্যের বিষয় এই, পিতা বিবাহ করিতেছেন শুনিয়া ঠাকুরদাদা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েন এবং এই সময় হইতে আবার তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া অন্তরের সহিত তাঁহাকে পুনঃ গ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতায় আসিয়া মূল্যবান অলঙ্কার দ্বারা বধূর মুখদর্শন করেন এবং তখন হইতে মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আমাদের বাটীতে আসিয়া বাস করিতেন ও আমাদের লইয়া আহারাদি করিতেন।" জীবনের ঝরাপাতায় সরলা দেবী বলেছেন, এই অনভিপ্রেত বিবাহের জন্য পিতাপুত্রে বিচ্ছেদ ঘটে এবং বিরোধ চরমে উঠে। অবশ্য "এই দুর্জয় ক্রোধ কালক্রমে কি রকমে শমিত হল, পিতাপুত্রে বিসম্বাদ যে কেমন করে মিটে গেল আমরা ছোটরা কিছুই জানি না। আমরা যখন একটু একটু বড় হচ্ছি আমাদের স্নেহালু পিতামহের মধ্যে মধ্যে আমাদের গৃহে শুভাগমনে আমরা নানা রকমের আনন্দ-রসাস্বাদী হতে লাগলুম শুধু জানি।" সহোদরাদ্বয়ের বিবৃতির কোনো কোনো স্থলে ঈষৎ পার্থক্য সত্ত্বেও বোঝা যায় নবদম্পতি জয়চন্দ্রের ক্ষমা ও স্নেহ থেকে বেশীদিন বঞ্চিত ছিলেন না।

হিরণ্ময়ী ও সরলা উভয়েই কথিত বিবাহের দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। এই বিবাহটি ঠাকুরপরিবারে প্রচলিত রীতির মধ্যে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করতে পেরেছিল। জীবনের ঝরাপাতা থেকে জানা যায়, "বড় মাসিমা সৌদামিনী দেবীর বিবাহ অনেককাল আগে সনাতনী রীতিতেই হয়ে গেছে, কিন্তু মেজ মাসিমা সুকুমারী দেবীর সময় থেকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা দিয়ে জামাইদের বিবাহমন্ত্র উচ্চারণ করান হত, এবং পূর্বাপর প্রথামত কন্যাসহ জামাইরা শ্বশুরগৃহেই স্থায়ী বাসিন্দা হতেন। আমার পিতা এই দুটি রীতিই মানতে অস্বীকৃত হলেন। দৃপ্তপুরুষ তিনি বল্লেন—ব্রাহ্মধর্ম ও হিন্দুধর্মে মূলগত কোন ভেদ নেই, নিরাকার বা

১০৭ পরেশনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র ফণিভূষণের সঙ্গে স্বর্ণকুমারীর জ্যেষ্ঠ কন্যা হিরণ্ময়ীর বিবাহ হয়।

সাকার ব্রহ্মের উপাসক—দুইই হিন্দু। সুতরাং আলাদা করে ব্রাহ্মোপাসক বলে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেওয়া অনাবশ্যক। দ্বিতীয়ত বিবাহের পর তিনি পত্নীকে স্বগৃহে নিয়ে যাবেন, শ্বশুরগৃহে থাকবেন না। দাদামহাশয় তাঁর এই দুই সর্তই মেনে নিলেন। যদিও মা তাঁর পরম আদরের মেয়ে ছিলেন তবু তাঁকে আলাদা বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার সম্মতি দিলেন।" উক্ত গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রদত্ত হিরণ্ময়ীদেবীর স্মৃতিকথায় পাওয়া যায়, "বিবাহকালে পিতৃদেব মাতামহ পরিবারের ২টী রীতি গ্রহণ করেন নাই :— ১। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ, ২। ঘরজামাই থাকা।" জানকীনাথের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য দৃঢ়তা ও সুগভীর আত্মবিশ্বাসের পরিচয় এই আলোচনা থেকে পাওয়া যায়; মহর্ষি স্বীকার করে নিয়েছিলেন ভাবী জামাতার সমূহ মতামত। আর একটি দিক থেকে এই বিবাহ ঠাকুরপরিবারের প্রচলিত রীতিনীতির মধ্যে অভিনবত্ব আনয়ন করে; জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেকথা স্বীকার করেছেন, "স্বর্ণকুমারীর সঙ্গে যখন শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ঘোষালের বিবাহ হইল তখন আমাদের আরও কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটিতে আরম্ভ করিল। পূর্বে আমাদের শুইবার ঘরে খাট-বিছানা ছাড়া অন্য কোনও তেমন আসবাবপত্র থাকিত না; কিন্তু জানকীবাবু আসিয়াই তাঁহার ঘরটি নানাবিধ চৌকি কৌচ কেদারায় অতি পরিপাটিরূপে যখন সজ্জিত করিলেন তখন তাঁহার অনুকরণে ক্রমে ক্রমে আমাদের অন্তঃপুরের সমস্ত ঘরগুলিরই শ্রী ফিরিয়া গেল। কক্ষগুলির আমূল সৌষ্ঠব বর্ধিত হইল এবং রীতিমত সুসজ্জিত পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। জানকী আমাদের পরিবারে আরও একটি নূতন জিনিষের প্রবর্তন করেন, সেটি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা"। সত্যেন্দ্রনাথের কোনো কোনো পত্র থেকে জানা যায় এই নবাগত চিকিৎসাপদ্ধতির আদর করে নাম রাখা হয়েছিল 'হৈমবতী'।

২

স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনীকে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের কয়েকটি চিঠি ইন্দিরা দেবীর পুরাতনী গ্রন্থে পাওয়া যায়; কোনো কোনো চিঠির মধ্যে স্বর্ণকুমারী ও জানকীনাথের নানাপ্রসঙ্গ আছে; এই দম্পতিকে তিনি যে কি পরিমাণ স্নেহ করতেন বিভিন্ন পত্রে তার সুন্দর প্রমাণ বিদ্যমান। ১৮৬৮, ২৭ মের চিঠি থেকে স্বর্ণকুমারীর মনোমত একটি বাগানের কথা বলেছেন সত্যেন্দ্রনাথ, 'আম পীচ লিচু ফলসা আঙ্গুর কলা Fig প্রভৃতিতে পূর্ণ স্বর্ণের ঠিক মনোমত বাগান'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বালিকা স্বর্ণকুমারীর প্রিয় পুষ্পোদ্যানের বর্ণনা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, সেখানে তিনি পরীরানীর মত প্রত্যহ সকালে পিতার জন্য ফুল সংগ্রহ করতেন। ঐ চিঠি থেকে জানা যায় দম্পতি ঠাকুরবাড়ির তেতলার একটি ঘরে থাকতেন। অন্তঃসত্ত্বা স্বর্ণকুমারী ঐসময় পিত্রালয়ে ছিলেন। আহমদনগর থেকে লিখিত ২৬ জুনের চিঠি থেকে জানা যায়

জ্ঞানদানন্দিনী স্বর্ণকুমারী সৌদামিনী প্রভৃতি 'সাঁতলা ভাজা' ইত্যাদির মধ্য দিয়ে পরমানন্দে দিনযাপন করছেন। স্বর্ণকুমারীও মেজদাদাকে চিঠি লিখতেন। নাগর থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর রবিবার দিবসের পত্রে পত্নীকে সত্যেন্দ্রনাথ জর্জ এলিয়টের রমলা পড়ার উপদেশ দিয়েছেন সমকালীন অন্যান্য চিঠিপত্র থেকে বোঝা যায় তিনি যেসকল বইয়ের নামোল্লেখ করেছেন বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তাদের লেখক মহিলা। সখী স্বর্ণকুমারীও এই গ্রন্থাবলীর সান্নিধ্যে এসেছিলেন এই সময় থেকে। আহমদনগর থেকে লিখিত ১৮৬৮. ১৭ অক্টোবর তারিখের চিঠিতে তিনি বলেছেন, "কৃষ্ণকুমারীর ইতিহাস বাঙ্গলায় আমি মুখে বলাতে জানকী লিখিয়াছিল—তাহা তোমাকে পাঠাইয়া দিব। স্বর্ণকেও দেখাইবে।"[১০৮] এই 'জানকী' হলেন সত্যেন্দ্রনাথের অনুগ্রহপ্রার্থী জনৈক ভবঘুরে যুবক। জ্ঞানদানন্দিনীর সঙ্গে স্বর্ণকুমারীকেও সত্যেন্দ্রনাথ আপনার রচনার সমজদাররূপে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, এখান থেকে স্বর্ণকুমারীর মানসিক পরিণতির পরোক্ষ পরিচয় পাওয়া যায়। সম্ভবত ঐ সময় থেকে তাঁর মনে ইতিহাসপ্রীতি—বিশেষভাবে রাজপুত ইতিহাসের প্রতি আগ্রহ স্পষ্ট হতে থাকে; এবং মাত্র কয়েক বৎসর পরেই তাঁর প্রথম ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস দীপনির্বাণ (১৮৭৬) রচিত হয়। কেবল রাজপুত ইতিহাস নয়, 'মেজদাদা'-প্রেরিত Annals of Rural Bengal নামক গ্রন্থাবলম্বনে সত্যেন্দ্রনাথ সেসময় বাংলাদেশের ইতিহাসচর্চা করেছিলেন।[১০৯] প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য স্বর্ণকুমারীর ফুলের মালা (১৮৯৫) নামক ঐতিহাসিক উপন্যাসের পটভূমিকা বাংলা দেশ, সম্ভবত সহোদরের বঙ্গদেশীয় ইতিহাস-অনুশীলন থেকে তিনি প্রেরণা পেয়েছিলেন। এর অত্যল্পকাল পরেই স্বর্ণকুমারীর প্রথম সন্তান হিরণ্ময়ী দেবীর জন্ম হয়েছিল। নাগর থেকে সত্যেন্দ্রনাথ ১৮৬৮ সালের (২১ ডিসেম্বর ?) একটি পত্রে স্ত্রীকে লিখেছেন, "স্বর্ণের সকল আপদ কাটিয়া গিয়া নির্বিঘ্নে একটি মেয়ে হইয়াছে শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম। স্বর্ণের মেয়ে সুন্দরী হইবার ত কথাই আছে।" জননী ও কন্যার সুশ্রী দেহকান্তির উল্লেখ এখানে বর্তমান। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় ভগিনী স্বর্ণকুমারীর সঙ্গে ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথের নিয়মিত চিঠিপত্রের

---

১০৮ এই চিঠির বহু পূর্বে ১৭৭৯ শকের পৌষ সংখ্যায় (১৮৫৭) বিবিধার্থ সংগ্রহে সত্যেন্দ্রনাথের রচিত 'কৃষ্ণকুমারীর ইতিহাস' মুদ্রিত হয়েছিল।

১০৯ দ্র পুরাতনী, পত্রসংখ্যা ৬১ ও ৭৭। এই মেজদাদা সম্ভবত গণেন্দ্রনাথ (১৮৪১-১৮৬৯); কারণ সত্যেন্দ্রনাথের (১৮৪২-১৯২৩) অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ (১৮৪০--১৯২৬) এবং গণেন্দ্রনাথ। Annals of Rural Bengal সম্ভবত Sir William Wilson Hunter, K. C. S. I., M. A., LL. D. প্রণীত গ্রন্থ; প্রথম প্রকাশকাল গ্রন্থে উল্লিখিত নেই তবে স্যর সেসিল বীডনের নামে উৎসর্গীকৃত উপহার পত্রটি রচিত হয় ১৮৬৮ সালের ৪ মার্চ। ক্ষেত্রান্তরে প্রয়োজনবোধে ১৮৯৭ সালের সপ্তম সংস্করণটি (London, John Murray etc.) ব্যবহৃত হয়েছে।

আদানপ্রদান চলত। একটি চিঠিতে তিনি পত্নীকে লিখেছেন, "সৌদামিনী শরৎ স্বর্ণকে আমার ভালবাসা জানাইবে। সৌদামিনী পত্র লিখিলে পরিতুষ্ট হইব। স্বর্ণের একপত্র পাইয়াছি তাঁহার উত্তরও লিখিয়াছি—যেন মধ্যে মধ্যে পাই।"[১১০] আর একটি পত্রে (৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৬৮) তিনি লিখেছেন, "স্বর্ণের যদি নূতন ছবি নেওয়া হয় তবে আমাকে পাঠাইবে।" প্রিয় সহোদরার প্রতি প্রবাসী ভ্রাতার মমত্ব ও উৎকণ্ঠা এস্থলে সুপ্রকট।

৬

বিবাহের কিছুকাল পরে স্বর্ণকুমারী কিছুদিনের জন্য মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের নিকট বোম্বাই গমন করেন। বঙ্গের মহিলা কবি গ্রন্থে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ভুলক্রমে ১৮৬৯ খৃস্টাব্দে তাঁর বোম্বাই যাওয়ার কথা বলেছেন; গ্রন্থাবলীর তৃতীয়ভাগে লেখিকার পরিচিতিতে ১৮৭০ খৃস্টাব্দের কথা বলা হয়েছে। বোম্বাই যাওয়ার কথায় স্বর্ণকুমারী নিজে বলেছেন, "১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে আমার চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় শিক্ষার সৌকর্য্যার্থে স্বামী আমাকে বোম্বাই রাখিয়া আসিলেন। তখনও আমি ইংরাজী জানি না বলিলেই হয়, অতি সামান্যই শিখিয়াছি। শিশুকন্যা হিরণ্ময়ীকে লইয়া আমি এক বৎসর সেখানে ছিলাম।"[১১১] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বসুমতীসংস্করণ গ্রন্থাবলীর চতুর্থভাগের শেষে 'সেকেলে কথা' নামক প্রবন্ধে লেখিকা স্বয়ং ১৮৭৩ খৃস্টাব্দে বোম্বাই ভ্রমণের কথা বলেছেন, যদিও তা স্বীকার্য নয়; কারণ ঐ অংশ তিনি প্রদীপ পত্রিকায় প্রকাশিত স্বরচিত যে প্রবন্ধ থেকে গ্রহণ করেছেন তার কথা উপরে বিবৃত হয়েছে। এই প্রমাদটি যে মুদ্রণঘটিত যার ফলে মুদ্রণকালে শূন্য (০) তিন (৩) হয়ে গেছে তা সহজবোধ্য। তাছাড়া ১৮৭৩ সালে তাঁর বয়স চোদ্দর অনেক বেশী হয়ে পড়ে এবং সেটা আদৌ সত্য নয়, কারণ সকলেই চোদ্দর কথা স্বীকার করেছেন। এ বিষয়ে আরেকটি পরোক্ষ প্রমাণ উপস্থাপিত হল। জ্ঞানদানন্দিনী স্মৃতিকথায় বলেছেন, "আমার বড় ছেলে সুরেন্দ্রনাথ হবার আগের বছর পুণায় ছিলুম জানি, কারণ আমার ননদ ৺স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রথম পুত্র ও দ্বিতীয় সন্তান জ্যোৎস্নানাথ ঘোষাল পুণায় হন বেশ মনে আছে এবং তিনি সুরেনের চেয়ে এক বৎসর বয়সে বড়। স্বর্ণকুমারীর অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় তাঁর বড় মেয়ে হিরণ্ময়ীকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে পুণায় যান।" সুরেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন ১৮৭২ সালে, তাহলে জ্যোৎস্নানাথের জন্ম ১৮৭১ খৃস্টাব্দে পুণায়; অর্থাৎ ১৮৭১এর আগে লেখিকা পুণায় যাত্রা করেন। জ্ঞানদানন্দিনী স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন

১১০ আহমদনগর থেকে লিখিত ২৬ জুন ১৮৬৮ এর পত্র, দ্র পুরাতনী, পত্র সংখ্যা ৩৩, পৃ ৯৩।

১১১ প্রদীপ ভাদ্র ১৩০৬, পৃ ৩১১।

যে সুরেন্দ্রনাথের জন্ম হয় ১৮৭২ সালের জুলাই মাসে। বলেন্দ্রনাথের ব্যবহৃত এমন একটি মূল্যবান খাতা বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে যার মধ্যে দেবেন্দ্রনাথপ্রভৃতি কয়েক-জনের জন্মপত্রিকা সঙ্কলিত হয়েছিল। সেখানে জ্ঞানদানন্দিনীর জন্মসম্বন্ধে যা লিপিবদ্ধ আছে তার কিয়দংশ প্রসঙ্গত উদ্ধারযোগ্য : "শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী/জন্ম ১৭৭২ শক। ১২ শ্রাবণ/১২৫৭ সাল। ১২ শ্রাবণ/১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ। জুলাই" ইত্যাদি। কিন্তু জ্ঞানদানন্দিনীর এই জন্মসালটি ভুল। জননী পুত্র সুরেন্দ্রনাথের জন্মসম্পর্কে বলেছেন, "তার একবৎসর ও আমার একুশ বৎসর একসঙ্গে আরম্ভ হল, আমাদের ঠিক কুড়ি বৎসর বয়সের তফাৎ।" এই সূত্রকে অবলম্বন করে কন্যা ইন্দিরা দেবী ১৩৪৮ সালের ফাল্গুন মাসের প্রবাসীতে লিখেছিলেন, "যশোর জেলার নরেন্দ্রপুর গ্রামে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে জ্ঞানদানন্দিনীর জন্ম হয়। এই সালটি সনাক্ত করবার দুটি আনুষঙ্গিক উপায় আমাদের ছিল। একটি এই যে, মা বলতেন তাঁর একমাত্র পুত্র ৺সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একবৎসর আর তাঁর নিজের একুশ বৎসর বয়স একসঙ্গে আরম্ভ হয়। কারণ দুজনের জন্মদিন একই দিনে পড়ে। আর আমার দাদার জন্মের সাল জানতুম ১৮৭২ ; সুতরাং মায়ের হবে ১৮৫২। আর একটি এই যে, সুরেন্দ্রনাথ যখন একুশ পূর্ণ হলেন, তখন যেসব সরকারী কাগজপত্র এল, তাতে যেন লেখা ছিল মা-বাবার বিয়ের সাল ১৮৫৯। ওদিকে শুনেছি আমার দাদামশায় মায়ের আট বৎসর বয়সে বিয়ে দিয়েছিলেন, সে হিসাবেও ১৮৫২ সালে জন্মালে ১৮৫৯এ সাত পূর্ণ হয়ে আটে পড়ে।" এই সকল প্রমাণ থেকে প্রতীত হয় যে জ্ঞানদানন্দিনীর জন্ম ১৮৫২ খৃস্টাব্দে, ১৮৫০ এ নয়। ১৮৭২ এ সুরেন্দ্রনাথের জন্ম পুণায়, একই স্থানে ১৮৭১ এ জন্ম জ্যোৎস্নানাথের। তাই তার আগে অর্থাৎ ১৮৭০ এ স্বর্ণকুমারী বোম্বাই গিয়েছিলেন একথা বলা যায়। সম্ভবত তিনি প্রথমে ধুলিয়া যান ও পরে অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথের বদলীর সঙ্গে সঙ্গে পুণা গমন করেন। বিশ্বভারতী পত্রিকার ১৩৫২ সালের শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের 'সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ' নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথের সরকারী চাকরির যে তথ্য তিনি দিয়েছেন তা থেকে জানা যায় ১৮৭১ সালের ২৮ মার্চ সত্যেন্দ্র-নাথ পুণায় আসেন ; তাঁর পূর্ববর্তী কর্মক্ষেত্র ছিল ধুলিয়া। যেহেতু স্বর্ণকুমারী ১৮৭০ সালে বোম্বাই গিয়েছেন তাই তাঁকে প্রথম যেতে হয়েছিল ধুলিয়াতে ; পরে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি পুণায় চলে যান ও সেখানে ১৮৭১ সালে জ্যোৎস্নানাথের জন্ম হল। মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে খুবই স্নেহ করতেন। এ সম্পর্কে ইন্দিরা দেবীচৌধুরানীর বক্তব্য উল্লেখযোগ্য, "বাবা চিরদিনই স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। সেইজন্যেই বোধহয় বোনেদের মধ্যে স্বর্ণপিসিমাকে বেশি ভালোবাসতেন। আমাদেরও তাঁদের পরিবারের সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল।"[১১২] এই অন্তরঙ্গতাবশত বোম্বাইপ্রবাসে তাঁরা অনেকসময় একত্রিত

১১২ রবীন্দ্রস্মৃতি, ১৩৬৭, পৃ ৩০।

হতেন। জ্ঞানদানন্দিনীর আত্মকথাতে পাওয়া যায়, "আমাদের সঙ্গে বোম্বাইপ্রবাসে ওঁর ভাইবোনেদের মধ্যে কেউ না কেউ প্রায়ই থাকতেন, আমরা তাঁদের অনুরোধ করে নিয়ে আসতুম। আমার দেবর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ আর আমার ননদ স্বর্ণকুমারী—এঁরাই প্রথমদিকে গিয়েছিলেন।"[১১৩]

৪

বোম্বাই-গমন পর্যন্ত তাঁর জীবনের ইতিহাস যেমন পাওয়া যায় পরবর্তীকালের কথা তেমন ধারাবাহিকভাবে কোথাও পাওয়া যায় না। এ সম্পর্কে তৎকালীন বিবিধ লেখকের বিক্ষিপ্ত মন্তব্যের সূত্র ধরে কিছুটা অনুমান-নির্ভর ইতিকথা রচনা করা যায়। এই অনুমানের কারণ এই যে, যে সকল লেখক মন্তব্য প্রকাশ করেছেন তাঁরা সর্বদা সনতারিখের আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। ফলত বিবিধপ্রসঙ্গে কথিত এইসকল খাপছাড়া বিক্ষিপ্ত উপাদান ব্যতিরেকে আর কোনো পদ্ধতি-সম্মত ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় না বলে সংগৃহীত তথ্যগুলিই কেবলমাত্র পরিবেশিত হল।

স্বর্ণকুমারীর পুত্রকন্যাগণের মধ্যে প্রথম সন্তান হিরণ্ময়ীর জন্ম হয় ১৮৬৮ খৃস্টাব্দে।[১১৪] ১৮৭১ এ একমাত্র পুত্র ও দ্বিতীয় সন্তান জ্যোৎস্নানাথের এবং পরবৎসর অর্থাৎ ১৮৭২ সালে দ্বিতীয় কন্যা ও তৃতীয় সন্তান সরলা দেবীর জন্ম। সত্যেন্দ্রনাথের প্রাপ্ত চিঠিপত্রাদির সাহায্যে বোঝা যায় হিরণ্ময়ীর জন্ম হয়েছিল ১৮৬৮ সালের ২১ ডিসেম্বরের পূর্বে কারণ ঐ তারিখের পত্রে বলেছেন তিনি, "স্বর্ণের সকল আপদ কাটিয়া গিয়া নির্বিঘ্নে একটি মেয়ে হইয়াছে শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম।" ২২ নভেম্বরের চিঠিতে (১০৭ সংখ্যা) সত্যেন্দ্রনাথ ভগিনী সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন; এর পরের কোনো একটি তারিখহীন চিঠিতেও (১১৮ সংখ্যা) উৎকণ্ঠা ফুটে উঠেছে, সম্ভবত পত্রটি ডিসেম্বরের প্রথম দিকে রচিত। যে পত্রে তিনি হিরণ্ময়ীর জন্মপ্রসঙ্গ স্বীকার করেছেন তার তারিখ দেওয়া হয়েছে ২১ জুলাই, ১৮৬৮; বস্তুতপক্ষে জুলাই হবে না, হবে ডিসেম্বর; কারণ ডিসেম্বরের পর হলে খৃস্টাব্দ পরিবর্তিত হত এবং পূর্বের যে চিঠিগুলির মধ্যে অন্তঃসত্ত্বা স্বর্ণকুমারীসম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকটিত তা নভেম্বরে লিখিত। সরলা দেবী জীবনের ঝরাপাতায় বলেছেন যে 'একদিন ভাদ্রমাসে—ললিতা সপ্তমী তিথিতে' তাঁর জন্ম। প্রকৃত তারিখ হল ১৮৭২ সনের ৯ সেপ্টেম্বর।[১১৫] স্বর্ণকুমারীর শেষ বা চতুর্থ সন্তান একটি কন্যা, এর কথা খুব কম লোকেই উল্লেখ করেছেন। এই কনিষ্ঠ সহোদরার কথা বলেছেন সরলা দেবী, "মৃত্যুছায়ার একটা আভাস এল

১১৩ পুরাতনী, পৃ ৩২।

১১৪ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা আষাঢ় ১৮৫৪ শক, পৃ ৯১।

১১৫ বাংলাসাহিত্যে বঙ্গমহিলার দান, বিশ্বভারতী পত্রিকা ৮ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, পৃ ২৭৬।

আমার জীবনে আমাদের সবছোট বোন ঊর্মিলার হঠাৎ মৃত্যুতে। ঊর্মিলা ছিল নতুন মামীর আদুরে। তিনিই তাকে দেখতেন শুনতেন খাওয়াতেন পরাতেন। তাঁর সঙ্গে সে বাইরের তেতালাতেই থাকত—আমাদের তিনজনের সঙ্গে বাড়ির ভিতরে নয়। নিঃসন্তান নতুন মামীরই মেয়ে যেন সে। আমার চেয়ে দুবছরের ছোট সে। ইস্কুলে ভর্তি হওয়ার দুই এক মাস পরেই একদিন নতুন মামীর ছাদের বাঁকা সিঁড়ি দিয়ে গোলাবাড়ির দিকে আপনা আপনি নামতে গিয়ে নীচে পড়ে গিয়ে brain concussion-এ মৃত্যু হয় তার। বাবামশায় তখন বিলেতে।"[১১৬] সরলার চেয়ে 'দুবছরের ছোট' এই কন্যার জন্ম হয় সম্ভবত ১৮৭৪ খৃস্টাব্দে এবং মাত্র ছয় বৎসর বয়সে ঊর্মিলার মৃত্যু হয়; হিরণ্ময়ী দেবী পিতৃস্মৃতি-চারণাকালে উল্লেখ করেছেন যে 'ছয় বৎসর বয়স্কা কনিষ্ঠা কন্যার মৃত্যুসংবাদে' বিলাত থেকে জানকীনাথকে ফিরে আসতে হয়। অতএব ঊর্মিলার মৃত্যু হয় আনুমানিক ১৮৮০ খৃস্টাব্দে এবং এ সময় জানকীনাথ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

জানকীনাথের বিলাতগমনসম্বন্ধে হিরণ্ময়ী বলেছেন, "আইনে তাঁহার বিশেষ রূপ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিয়া তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে বিলাত যাইয়া ব্যারিষ্টার হইবার পরামর্শ দেন এবং তিনি আমাদের মাতুলালয়ে রাখিয়া বিলাত যাত্রা করেন। সেখানে অধিকাংশ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন কিন্তু শেষ পরীক্ষার পূর্বেই ছয় বৎসর বয়স্কা কনিষ্ঠা কন্যার মৃত্যু সংবাদে তাঁহাকে দেশে ফিরিতে হয়। ইচ্ছা ছিল আবার যাইয়া শেষ পরীক্ষা দিবেন এবং তজ্জন্য বরাবর ফি দিয়া নাম বজায় রাখিয়াছিলেন, কিন্তু ঘটনাচক্রে আর যাওয়া হয় নাই।" জানকীনাথের বিলাতগমনের প্রস্তুতির নানাপ্রসঙ্গ সত্যেন্দ্রনাথের পত্রে পাওয়া যায়; পুরাতনী গ্রন্থের ১০৪ সংখ্যক চিঠিতে তাঁর বিলাতযাত্রার প্রথম ব্যর্থপ্রয়াসের কথা জানা যায়। যাই হোক তাঁর বিলাত যাওয়ার ফলে স্বর্ণকুমারী পুত্রকন্যাসহ ঠাকুরবাড়িতে চলে আসেন এবং অতঃপর তাঁর সাহিত্যচর্চা বিধিবদ্ধভাবে আরম্ভ হয়: "জানকী বিলাত যাইবার সময় আমার কনিষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী আমাদের বাড়ীতে বাস করিতে আসায় সাহিত্যচর্চায় আমরা তাঁহাকেও আমাদের আর একজন যোগ্য সঙ্গীরূপে পাইলাম।" জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি থেকে যে অংশ উদ্ধৃত হল তা থেকে বোঝা যায় তিনি সাহিত্যচর্চায় বিশেষ মনোযোগী হয়ে উঠেছেন এই সময়; গান কবিতা প্রভৃতি রচনার সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসও রচনা শুরু করে দিয়েছেন কারণ এর অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ১৮৭৬ খৃস্টাব্দে দীপনির্বাণ প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে তিনি নিয়মিত সাহিত্যচর্চা আরম্ভ করে দিয়েছিলেন।

১১৬ জীবনের ঝরাপাতা, পৃ ২১-২২।

৫

জীবনের ঝরাপাতা থেকে ঘোষালপরিবারের একটি উজ্জ্বল চিত্র পাওয়া যায়। সরলা দেবীর জন্ম হয় ঠাকুরবাড়ির 'ভিতরের তেতালার একটা রোদকাটা কাঠের ঘরে,' তখন স্বর্ণকুমারীরা ভিতর বাড়ির তেতালার ঘরে থাকতেন। "বিয়ের পর মা-রা আলাদা বাড়িতে গিয়ে থাকায় আমার প্রায় পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত যোড়াসাঁকোর বাইরেই আমরা ভাইবোনেরা মানুষ হতে লাগলুম। কিন্তু যোড়াসাঁকোর সঙ্গে মা-দের সংশ্রব পুরোমাত্রাই রইল। এমন একটি দিন যেত না যেদিন হয় মা-বাবা যোড়াসাঁকোয় না যেতেন, কিংবা যোড়াসাঁকোর লোকেরা আমাদের বাড়ি না আসতেন। / ছমাস বয়সে খুব ঘটা করে আমার অন্নপ্রাশন হল পেনেটির বাগানবাড়িতে। গঙ্গাধারের সে বাগানবাড়ি তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই সম্পত্তি। সেবার যোড়াসাঁকোর বাড়িশুদ্ধ সকলের সেটা গ্রীষ্মনিবাস হয়।" সরলার আড়াই বছর মাত্র বয়সের সময় শিয়ালদহ-বৈঠকখানার যে বাড়িতে তাঁরা থাকতেন তখন তার আশে-পাশে ফিরিঙ্গিদের বাস, এরপর "বৈঠকখানা থেকে মা-রা সিমলার বাড়িতে উঠে যান। এখনকার মিনার্ভা থিয়েটারের পাশ দিয়ে একটা গলিতে সে বাড়ি। মনে পড়ে এই বাড়িতে থাকতে বছর চারেক বয়সে একদিন পা ফসকে ছাদের মার্বেল সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে একেবারে নীচের তলায় পড়ে আমার সামনের দুটো দাঁত ভেঙে রক্তারক্তি হয়,... মা কোন সাড়াশব্দই করলেন না। বাবামশায় নীচে নেমে আর্নিকাদি লাগিয়ে দিলেন।" এইপ্রসঙ্গে লেখিকা জননী স্বর্ণকুমারীর স্নেহমমতার প্রতি অভিযোগ উত্থাপন করেছেন, "তিনি আমাদের অগম্য রানীর মত দূরে দূরে থাকতেন। দাসীর কোলই আমাদের মায়ের কোল হত। মায়ের আদর কি তা জানিনে, মা কখনো চুমু খান নি, গায়ে হাত তোলেন নি, মাসিদের ধাতেও এসব ছিল না। শুনেছি কর্তাদিদিমার কাছ থেকেই তাঁরা এই ঔদাসীন্য উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন।" এই বর্ণনায় স্বর্ণকুমারীর মাতৃহৃদয় ও রমণী-চিত্তের যে চিত্রটি ফুটে উঠেছে আপাতদৃষ্টিতে তা গৌরবজনক নয়, কিন্তু স্বর্ণকুমারী একান্তভাবে স্নেহহীন ছিলেন না। অভিমানী কন্যার অনুযোগ এখানে আত্যন্তিক প্রাধান্য লাভ করায় মন্তব্যটি প্রান্তিকতাদুষ্ট হয়ে পড়েছে। সরলা দেবী নিজে অন্যস্থানে বলেছেন, "দিদি প্রথম সন্তান বলে মা-বাবার আদুরে মেয়ে, দাদা প্রথম পুত্র বলে আদুরে, আমি আর একটি অধিকন্তু অপ্রার্থিত মেয়েমাত্র। তাই বৈদিক ঋষিকুমার শুনঃশেফের মত আমার জীবনের পৃষ্ঠপটে (background-এ) একটা অনাদরের পরদা টানা।" এ থেকে বোঝা যায় সরলার অভিযোগ বহুল পরিমাণে অভিমান ও সুন্দর অসূয়াপ্রসূত। যিনি একাধিক পুত্রকন্যাকে ভালবাসেন স্নেহ করেন তিনি অপর কন্যাটির প্রতি একান্তই

উদাসীন একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। সরলা দেবীর প্রতি জনকজননীর স্নেহাদরের পরিমাণ যে কত অধিক ছিল তার প্রমাণ জীবনের ঝরাপাতায় লেখিকা নিজেই দিয়েছেন। সে কথা বাদ দিয়েও বলা আবশ্যক যে উপর্যুপরি একাধিক সন্তানের জন্ম হওয়ায় বহুসন্তানবতী রমণীর পক্ষে প্রভূত পরিমাণে 'মায়ের আদর' দান করা সবসময় সম্ভব হয়ে উঠে নি। বিবাহের মাত্র একবৎসর পরে তাঁদের প্রথম সন্তানের জন্ম হয়, তখন স্বর্ণকুমারীর বয়স মাত্র বার বৎসর কয়েকমাস এবং তদুপরি তাঁর প্রায় আঠার বৎসর বয়সের মধ্যে চারটি সন্তান জন্মলাভ করে। এত অল্পবয়সে একাধিক সন্তানের সুন্দর পরিচর্যা করা প্রসূতির পক্ষে কখনও সম্ভব নয় বলে দাসী ও ধাত্রীর ব্যবস্থা করতে হয় জানকীনাথ এবং স্বর্ণকুমারীকে। তাছাড়া তিনি ঐসময় পড়াশুনার কাজেও নবোত্তমে যোগ দিয়েছেন ; বাংলা সংস্কৃত ভালভাবে শিক্ষার পর ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে মনোনিবেশ করেছেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে 'শিক্ষার সৌকর্য্যার্থে' স্বামী তাঁকে ১৮৭০ খৃস্টাব্দে মাত্র চোদ্দ বৎসর বয়সে সত্যেন্দ্রনাথের নিকট বোম্বাই পাঠিয়ে দেন তা হল ইংরেজি শিক্ষা ; তখনও সরলার জন্ম হয় নি। এই নূতন ভাষা ও সাহিত্যের সংস্পর্শে আসার ফলে তাঁর প্রাত্যহিক কর্মপদ্ধতিপর্যন্ত বিপর্যস্ত হয়ে যায়। এই সকল অসুবিধার জন্য তিনি সন্তানদের প্রতি ঈষৎ অবহেলা করেছিলেন—এটাই নির্গলিত সার সত্য ; নচেৎ উপর্যুক্ত বিবরণ তাঁর চিত্তের দয়া-মায়া ও স্নেহের দৈন্য প্রমাণ করে না।

সিমলার যে বাড়িতে তাঁরা থাকতেন তার সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়, "সিমলে বাড়িতে বাড়ির ভিতরের দিকের সিঁড়ি উঠেই মায়ের শোবার ঘর। ঘরে এক প্রকাণ্ড পালঙ্ক। সেই পালঙ্কের উপর যোড়াসাঁকো থেকে সমাগত মাসি, মামী ও দিদিদের প্রায় নিত্যই মধ্যাহ্ন থেকে গড়ান পার্টি জমত। তাস খেলার অবসরে কাঁচা সরষেতেল-মাখা টাটকা মুড়ি, ফুলুরি ও বেগুনির রসাস্বাদন, বর্ষা হলে সাংলাভাজি—এই ছিল পার্টির মূল প্রোগ্রাম। প্রোগ্রামে কোন কোন দিন একটু বৈচিত্র্য ঢোকান হত গানে বা মায়ের রচিত কবিতা আবৃত্তিতে।" লক্ষণীয় যে বঙ্গরমণীর মধ্যাহ্ন-অবকাশ ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে সঙ্গীত ও কাব্যচর্চার মাধ্যমে। ঐসময় "বাবামহাশয়ের বিলেত যাওয়া স্থির হয়। তাঁর যাবার কিছু পূর্বে আমরা সে বাড়ি ছেড়ে যোড়াসাঁকোয় এলুম।"

স্বর্ণকুমারীর পরবর্তী জীবনযাত্রার পরিচয় দিয়েছেন সরলা দেবী, "এই তরকারী কোটায় আসরে···দিদিও যেতেন। আমার মা কখনো আসতেন না।···মা নিজের মহলে নিজের লেখাপড়া বই রচনার কাজে সদা রত থাকতেন। দৈবাৎ কখনো কোন উৎসবাদি উপলক্ষে ছাড়া এদিকে নামতেনও না।" ইতিপূর্বে তাঁর দীপনির্বাণ (১৮৭৬) প্রকাশিত হয় এবং এসময় তিনি অন্যান্য সাহিত্যসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সৃষ্ট সুরে কথা রচনা করছেন।

ঠাকুরবাড়ির মধ্যে "মায়ের মহল ছিল বাইরের তেতালার অর্ধেকটায়।···অর্ধেকটায় থাকতেন মা, অর্ধেকটায় থাকতেন নতুন মামা, নতুন মামী।" এই সময়ে লেখিকা স্বর্ণকুমারী কন্যা সরলার সঙ্গীতপ্রীতি এবং সে বিষয়ে পারদর্শিতার ও সহজাত শক্তির পরিচয় পেয়ে তৎপর হয়ে উঠেন, "একটি পিয়ানো বাজনা বাইরের তেতালায় মায়েরই বসবার ঘরে থাকত। শুধু আমাকে শেখানোর জন্যে একজন পিয়ানো-শিক্ষয়িত্রী মেম হপ্তায় দুদিন করে নিযুক্ত হলেন। মায়ের ঘরে গিয়েই শিখতুম।" সরলার প্রতি স্বর্ণকুমারী যে একেবারে উদাসীন ছিলেন না এ সকল প্রসঙ্গ থেকেই তা উপলব্ধ হয়।

কয়েক বৎসর পর অর্থাৎ জানকীনাথের বিলাত থেকে স্বদেশে প্রত্যাগমনের পর তাঁরা কাশিয়াবাগানের বাগানবাড়িতে চলে আসেন জোড়াসাঁকো ছেড়ে। সরলার উক্তি উদ্ধৃত হল, "আমরা যোড়াসাঁকো থেকে কাশিয়াবাগানে উঠে আসার আগে মেজমামীরা বিলেত থেকে ফিরেছেন।" সম্ভবত এই ঘটনাটি ১৮৮০ খৃস্টাব্দের ১১মে তারিখের কাছাকাছি কোনো একটি সময়ের ব্যাপার কারণ সত্যেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়বার বিলাতগমন ও সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ঐ তারিখে তিনি তাঁর পুরনো চাকরিতে যোগদান করেছিলেন।[১১৭] সে যা হোক ইতিমধ্যে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে 'গানবাজনা অভিনয়াদির দিক থেকে রবিমামার প্রাধান্য ক্রমশ ফুটছে। এর আগে নতুনমামা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সেদিককার কর্ণধার ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিলেতনিবাস কালেই আমার মায়ের রচিত বসন্তোৎসব গীতিনাট্যের অভিনয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অধ্যক্ষতায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সঙ্গীতের এক মহাহিল্লোলে হিল্লোলিত হয়ে উঠেছিল বাড়ি তখন।'

যোগেশচন্দ্র বাগল বলেছেন, "কাশিয়াবাগান অঞ্চল কলিকাতার বর্তমান রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট এবং উল্টাডিঙ্গি মেন রোডের মোড়বরাবর অনেকটা জায়গা জুড়িয়াছিল।" তিনি এইরূপ নামোৎপত্তির জনশ্রুতি পরিবেশন করেছেন জীবনের ঝরাপাতার ২১৪ পৃষ্ঠায়। সে যাই হোক কাশিয়াবাগানের স্মৃতিচারণাকালে সরলা দেবী বলেছেন, "তখন আমার বয়স বার বৎসর (আঃ ১৮৮৪)। হঠাৎ সেই জন্মদিনের সকালে রবিমামা এলেন কাশিয়াবাগানে হাতে একখানি য়ুরোপীয় music লেখার manuscript খাতা নিয়ে।" বেশ বোঝা যায় এই বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির ঘন ঘন যাতায়াত ছিল। ইন্দিরা দেবী বলেন, "স্বর্ণপিসিমারা জোড়াসাঁকো ছেড়ে একসময় কাশিয়াবাগান অঞ্চলে একটি বাগানবাড়িতে গিয়েছিলেন। সেখানে আমাদের সকলের খুব যাওয়া-আসা ছিল; রবিকাকাও মাঝে মাঝে যেতেন এবং আমাদের আমোদপ্রমোদে যোগ দিতেন।"[১১৮] সরলা দেবীর 'সাহিত্যগত রুচি গড়ে

১১৭ সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৭৭ সংখ্যক গ্রন্থ, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩৫৪, পৃ ১৫

১১৮ রবীন্দ্রস্মৃতি, পৃ ৩০।

দিয়েছিলেন রবিমামা। ম্যাথু আর্নল্ড, ব্রাউনিং, কীটস, শেলি প্রভৃতির রসভাণ্ডার বিলি আমার চিত্তে খুলে দেন সে রবিমামা। মনে পড়ে দার্জিলিঙের Castelton House-এ যখন মাসকতক রবিমামা, মা, বড় মাসিমা, দিদি ও আমি ছিলুম—প্রতি সন্ধ্যাবেলায় Browningএর Blot in the Scutcheon মানে করে করে বুঝিয়ে বুঝিয়ে পড়ে শোনাতেন।'

কাশিয়াবাগানের প্রাসাদটি ছিল সেকালের সাহিত্যরথীগণের মিলনক্ষেত্র; ঠাকুর-বাড়ির সাহিত্যিকবৃন্দই যে কেবল সেখানে একত্রিত হতেন তা নয়, বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ কয়েকজন অনাত্মীয় ব্যক্তির শুভাগমনও ঘটেছিল। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অবস্থানকালে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ ঘটে নানা ব্যাপারে, কাশিয়াবাগানে চলে আসার পর তা ঘনিষ্ঠতর হয়। ভারতীতে প্রকাশিত সরলার 'রতিবিলাপ' ও 'মালবিকাগ্নিমিত্র' পাঠ করে বঙ্কিমচন্দ্র লেখিকাকে একটি প্রশংসাপত্র দিয়েছিলেন। তিনি এই ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন সোল্লাসে, "বঙ্কিমের চিঠির সাথী হয়ে এসেছিল সেদিন তাঁর নিজের একসেট বই উপহার—অপ্রত্যাশিত স্নেহ-নিদর্শন।...চিঠি ও বই উপহারের পর তিনি আমন্ত্রিত হয়ে এলেন একদিন আমাদের বাড়িতে। মানুষ বঙ্কিমের সঙ্গে আমাদের সংস্পর্শ আরম্ভ হল। মনে পড়ে তিনি চা-ভক্ত ছিলেন, আর আমার পিতা ছিলেন চায়ের একজন মর্মজ্ঞ। আমাদের বাড়ির চা বঙ্কিমের সুস্বাদু বোধ হল। তার পরদিন সেই চায়ের এক প্যাকেট একগোছা গোলাপফুলের সঙ্গে তাঁর কাছে উপঢৌকন গেল।...তারপর আমাদের—আমার মাকে ও আমাকে—দিদি তখন বিয়ে হয়ে নিজের বাড়িতে থাকেন—নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়ি একদিন। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হল। বঙ্কিমের স্ত্রীর সহিত বা তাঁর সম্পর্কীয় কথায়বার্তায় একটি সুন্দর প্রীতিময় হাসিকৌতুকের ঢেউ খেলিয়ে যেত। আমরা যেন তাঁর নভেলেরই একটা দৃশ্যের মধ্যে পড়ে যেতুম। দুই দৌহিত্র দিবোন্দু ও পূর্ণেন্দুর সঙ্গে সপত্নীক বঙ্কিমের শুভাগমন অনেকবারই হতে থাকল আমাদের কাশিয়াবাগান বাগানবাড়িতে।" এবাড়িতে 'বিদ্যাসাগর মশায়ের পদধূলিও মাঝে মাঝে পড়তে থাকল। যে বাড়িতে আমার পিতামাতার থিয়সফিনিষ্ঠার দরুন মাদাম ব্লাভাটস্কি ও কর্ণেল অলকটের প্রায়ই গতিবিধি হতে লাগল, যে বাড়ি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, আশুতোষ চৌধুরী, লোকেন পালিত ও অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবী-সহ মাতুলকুলের আবালবৃদ্ধবণিতা প্রায় সমস্ত আত্মীয়-আত্মীয়ার স্মৃতিভারে নমিত ছিল—সে বাড়ি আজ গুঁড়া হয়ে রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটের ধুলায় ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। সে বাগানবাড়ির বকুলবীথি, পুকুর চাঁদনি ও ফলফুলের উপবনে যোড়াসাঁকোর শহুরে ছেলেমেয়েদের নতুন নতুন প্রাকৃতিক আবিষ্কারের বিস্ময়, পাড়ার বৌঝিদের দল ঝমঝম করে খিড়কি দরজা দিয়ে

জল তুলতে আসা, তার পুকুরে কবি রবির সাঁতার কাটা ও ঘাটে উঠে কল্পনার বীণার ঝঙ্কারে নতুন নতুন কবিতা ও গান ফোটান, সে বাড়ির তেতালার ছাদের ঘরে বড়মামার প্রজ্ঞাঘন জীবনের অনুকূল নীরব প্রশান্ততা—এই সবই কর্পোরেশনের ষ্টীম রোলারের নীচে পড়ে চিরকালের জন্যে গেছে অন্তর্হিত হয়ে।' এই বাড়ির সাহিত্যিক ও দার্শনিক বাতাবরণের কথা এখান থেকে জানা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য স্বর্ণকুমারীর শেষ কয়েকটি উপন্যাস বিশেষত স্বপ্নবাণী বিচিত্রা মিলনরাত্রি প্রভৃতি এই বাগানবাড়ির স্মৃতিতে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। বাগানবাড়ির অভ্যন্তরস্থ পুষ্করিণীটির সুন্দর বাণীচিত্র পাওয়া যায় জীবনের ঝরাপাতায়, "বাড়ির ফটকের বাইরেই একটা মস্ত লম্বা পুকুর ছিল। তার আশে-পাশে গৃহস্থদের বাস। এ পুকুরে তাদের স্নানকরা বাসনমাজাদি কাজ চলত, কিন্তু এর জল মিঠে নয় বলে খাওয়া চলত না। সেইজন্যে আমাদের বাড়ির পুকুর থেকে পাড়ার মেয়েরা খাবার ও রাঁধবার জল নিয়ে যেত। আমাদের পুকুরের নাম ছিল পাড়ায় 'মিছরি পুকুর'। কাশীশ্বর মিত্রের বাড়ীর ঘাট ঐ পুকুরের উপর।"

প্রধানত থিয়সফিক্যাল সোসাইটিকে কেন্দ্র করে স্বর্ণকুমারী কলিকাতার অভিজাত ও অনভিজাত পরিবারগুলির সঙ্গে সম্পর্কান্বিত হন। তাঁর কয়েকজন পাতান সখীর পরিচয় দিয়েছেন সরলা। কাশীশ্বর মিত্রের "বড়ছেলে শ্রীনাথ মিত্রের স্ত্রীর সঙ্গে আমার মায়ের 'বকুল ফুল' পাতান হয়েছিল।...সেকালে যোড়াসাঁকোয় পাতানর রেওয়াজটা খুব ছিল—আমার মায়ের অনেকগুলি পাতান সখী ছিলেন। কাশিয়াবাগানে এসে বকুল ফুলের পর হলেন 'মিষ্টি হাসি'! ইনি বৌবাজারের এটর্নী শ্রীনাথ দাসের পুত্র 'সময়'-সম্পাদক জ্ঞানেন্দ্র-মোহন দাসের পত্নী।" ব্যারিস্টার ডবলিউ সি ব্যানার্জি ও মনোমোহন ঘোষ এবং আইনজ্ঞ দুর্গামোহন দাসের (সরলা-অবলা-শৈলবালার পিতা) পরিবারের সঙ্গে ঘোষাল পরিবার সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হয়। এছাড়া এটর্নী কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর পত্নী শরৎকুমারীর সঙ্গে স্বর্ণকুমারীর পাতান সম্বন্ধের নাম 'বিহঙ্গিনী'। মহিলাকবি গিরীন্দ্রমোহিনীর সঙ্গে তাঁর 'মিলন-বিরহ' সম্পর্ক ছিল; প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে গিরীন্দ্রমোহিনীর 'দেবর অক্রূর দত্ত-পরিবারের গোবিন্দ দত্ত' ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বন্ধু। সরলা দেবীর একটি মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য, "বম্বে-পুণা-সাতারায় ও পার্শিদের সঙ্গে আমাদের পরিবারের মেয়েদের সহজেই খাপ খেয়ে যেত—মেজমামী ও মার অনেক পার্শি বান্ধবী হয়েছিল।"

কাশিয়াবাগানের বাড়ি থেকে স্বর্ণকুমারী ভারতী-সম্পাদনা করতে থাকেন। ভারতী পত্রিকার বিজ্ঞাপনে পত্রিকার প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশ দেওয়া হত এইরূপ: 'কাশিয়া-বাগান, বাগানবাটী, উল্টাডিঙ্গি, কলিকাতা' ইত্যাদি; কখনও 'উল্টাডিঙ্গি'র স্থলে 'আপার সারকুলার রোড' ব্যবহৃত হয়েছে। এরপর তাঁরা ২৬নং সার্কুলার রোডে উঠে আসেন।

"এ বাড়িতে সামনে একটা বড় lawn আছে, আর পিছন দিকে পুকুর ধারে একটা ছোটখাট চৌকোনো জায়গা আছে, সেখানে ছেলেরা নানারকম অস্ত্রশিক্ষা করে।" এরই চিত্র ফুটে উঠেছে স্বর্ণকুমারীর 'ত্রয়ী'র মধ্যে; ত্রয়ীর নায়িকা রাজকুমারীর পরিচালনায় প্রজাসাধারণ ও উৎসাহী তরুণসম্প্রদায়ের শরীরচর্চা, লাঠি ও তলোয়ার খেলা প্রভৃতির যে বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায় উপন্যাসে তার উপাদান এখান থেকেই সংগৃহীত।

পোষাক-পরিচ্ছদ ও প্রসাধনের প্রতি জননীর সুন্দর আগ্রহের পরিচয় দিয়েছেন সরলা, "একবার মা যাচ্ছিলেন মেজমামার সঙ্গে কারোয়ারে। কতদিন ধরে তার জন্যে উদ্যোগ-আয়োজন চলছিল। বাড়িতে দর্জি বসে গিয়েছিল, মায়ের জন্যে নতুন নতুন কাপড় সেলাই চলছিল।" বিদেশীও তাঁর বেশভূষার প্রশংসা করেছেন, তাঁরা তাঁর wonderfully embroidered saris with their gold borders; her magnificent necklaces and bracelets and the splendid jewels that used to fasten her saris on shoulder and breast ইত্যাদির বর্ণনা দিয়েছেন।[১১৯]

স্বাদেশিকতা

স্বর্ণকুমারী দেবীর জন্মপূর্ববর্তী বাংলাদেশে স্বাদেশিকতা কিংবা জাতীয়তা-আন্দোলন তত তীব্র ছিল না, স্বদেশ ও স্বজাতি সম্বন্ধীয় ভাবনা-চেতনা এবং উপলব্ধি ইতস্তত অনুভূত হচ্ছিল কেবলমাত্র; কিন্তু লেখিকার জন্মের পর সিপাহী বিদ্রোহের মত কয়েকটি ঘটনা সমগ্র দেশকে এসম্পর্কে সচকিত করে দেয়। সমসাময়িক অন্তঃপুরও এই ভাবে এবং ভাবনায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতে থাকে, তাই বালিকা স্বর্ণকুমারীর মন-সংগঠনে নবোদ্ভূত স্বদেশ ও স্বজাতি সম্বন্ধীয় চেতনা যথেষ্ট সাহায্য করেছে। স্বদেশপ্রেম তাঁর সকল রচনারই হেতু, প্রথম উপন্যাস দীপনির্বাণ রচিত হয়েছিল কেবলমাত্র 'আর্যঅবনতি-কথা'কে সম্বল করে; আত্মবিস্মৃত দেশবাসীকে সজাগ করাই ছিল এক্ষেত্রে তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য।

জাতীয়তা আন্দোলনের ইতিবৃত্ত পাঠকালে জানা যায় এর উষালগ্ন থেকে ঠাকুরপরিবার নানাভাবে এই আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকেন। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতালোপের উদ্দেশ্যে ১৮২২ খৃস্টাব্দের ১৭ অক্টোবর যে আইনের খসড়াটি লর্ড হেস্টিংস কর্তৃক বিলাতে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত হয় তা যথাকালে কর্তৃপক্ষ ও সুপ্রিম কোর্টের অনুমোদন লাভ করে (১৮২৩,৩১ মার্চ)। এই আইন বিধিবদ্ধ (১৮২৩, ৪ এপ্রিল) হওয়ার আগে রামমোহন সুপ্রিম কোর্টে এর বিরুদ্ধে আবেদন করেছিলেন এবং ঐ কার্যে তাঁকে যে কয়জন সহায়তা

১১৯ Introduction, An Unfinished Song.

করেন তারমধ্যে দ্বারকানাথ ছিলেন অন্যতম।[১২০] আবার এই আইনকে অস্বীকার করে যে বেঙ্গল হেরাল্ড (১৮২৯, ৫ মে) ও তার বঙ্গানুবাদ বঙ্গদূত প্রকাশিত হতে থাকে তার স্বত্বাধিকারীরূপে রামমোহন দ্বারকানাথ প্রসন্নকুমার প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। পরবর্তী-কালে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা যখন অর্জিত হল (১৮৩৫, ৩ আগস্ট) তখন দ্বারকানাথ ইংলিশম্যান বেঙ্গলহরকরা প্রভৃতি অতিখ্যাত সংবাদপত্রের মালিকানা ক্রয় করতে থাকেন; বলাবাহুল্য এই পত্রিকাগুলি এতদ্দেশীয় নাগরিকগণের স্বার্থরক্ষা ও অধিকারপ্রতিষ্ঠায় অতঃপর বিশেষভাবে সাহায্য করতে থাকে। এতদ্ব্যতীত দ্বারকানাথ ১৮৪২ সালে বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির সদস্য মানবহিতৈষী জর্জ টমসনকে বাংলাদেশে আনয়ন করেন; এর ফলে বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপিত হয় (১৮৪৩, ২০ এপ্রিল) এবং সভার মুখপত্র হল বেঙ্গল স্পেকটেটর। সংবাদ পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধাদি এই পত্রিকায় যেমন মুদ্রিত হত তেমনি প্রচলিত শাসনব্যবস্থা ও সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বিচারবিশ্লেষণেও উক্ত পত্রিকা সংসাহস প্রদর্শন করত। দ্বারকানাথের সৌজন্যে ও বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির কর্মতৎপরতায় শিক্ষিত নাগরিকগণের চিত্তে জাগরণ দেখা দিল। প্রায় একই সময়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত (১৮৪৩, ১৬ আগস্ট) হয়; "মূলতঃ বেদান্তপ্রতিপাদ্য একেশ্বরবাদ ও তাহার সমর্থক বিষয়াদির জন্য প্রকাশিত হইলেও জাতীয় শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি ও বিভিন্ন সমস্যার আলোচনায় এই পত্রিকাটি বিশেষভাবে লিপ্ত হয়। 'বেঙ্গল স্পেকটেটর'-এর পক্ষে এককভাবে তখন যাহা করা সম্ভব হয় নাই, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা জাতীয় চেতনার উদ্বোধনে তাহা করিতে সক্ষম হইয়াছিল বলিতে পারা যায়।"[১২১] মৌলিক অধিকার সম্বন্ধীয় প্রশ্নের ক্ষেত্রে দ্বারকানাথের চিন্তাবলীর সম্যক পরিচয় প্রদান করেছেন কিশোরীচাঁদ মিত্র; ১৮৩০ খৃস্টাব্দ থেকে ১৮৪৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর এই কর্মজীবনের ইতিহাস যেমন জটিল তেমনই বৈচিত্র্যপূর্ণ। ১৮৩৬ খৃস্টাব্দের ১৮ জুনের বক্তৃতায় তিনি স্বদেশবাসীর জীবন স্বাধীনতা ও সম্পদের নিরাপত্তার প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন; টাউন হলে অনুষ্ঠিত একটি বক্তৃতা সভায় (১৮২৯, ১৫ ডিসেম্বর) তিনি ঔপনিবেশিকতা-সম্পর্কিত বিবিধ প্রসঙ্গ আলোচনা করেন;[১২২] তাছাড়া সুপ্রিম কোর্ট ও মফস্বল কোর্টে জুরিব্যবস্থা প্রবর্তনের সপক্ষে তাঁর বক্তৃতার (১৮৩৫, ৮ জুলাই) কথাও স্মরণীয়।[১২৩] এমনকি বৃটিশ পার্লামেণ্টে প্রতিনিধি প্রেরণ সম্বন্ধেও তিনি চিন্তিত ছিলেন।[১২৪]

---

১২০ যোগেশচন্দ্র বাগল, সে যুগের পত্রপত্রিকা ও আমাদের জাতীয়তা, দ্র বিশ্বভারতী পত্রিকা ১০ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, পৃ ৯৪-৯৫।

১২১ ঐ পৃ ৯৯।

১২২ The Bengal Spectator, 1 September, 1842.

১২৩ The India Gazette, 5 March, 1830.

১২৪ History of Indian Social and Political Ideas from Rammohan to Dayananda etc., pp 80-82.

পরবর্তী প্রসঙ্গে ঠাকুরবাড়ির উদ্যোগে আয়োজিত ও অনুষ্ঠিত চৈত্রমেলা বা হিন্দুমেলার কার্যাবলীর কথা মনে পড়ে ; ন্যাশনাল ভাবের প্লাবন এনেছিল এই অনুষ্ঠান এবং তার আনুষঙ্গিক আয়োজনাদি। সেকালের বিখ্যাত সংবাদপত্র মুখার্জিস ম্যাগাজিন (১৮৬১ ফেব্রুয়ারি) এবং বেঙ্গলী (১৮৬২, ৬মে) জাতীয়তা প্রচারে বিশেষ উদ্যমী ছিল। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অকালমৃত্যুর (১৮৬১, ১৬ জুন) ফলে হিন্দু প্যাট্রিয়টের (১৮৫৩) প্রকাশ বন্ধ হওয়ায় জনসাধারণের পক্ষাবলম্বী সংবাদপত্রের যে অভাব ও প্রয়োজন অনুভূত হয় তা কিঞ্চিৎ পরিমাণে প্রশমিত হল ইণ্ডিয়ান মিররের (১৮৬২, ১ আগস্ট) প্রকাশের ফলে ; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অর্থানুকূল্যে কৃষ্ণনাগরিক মনোমোহন ঘোষ উক্ত পত্রিকার সম্পাদনা-দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সম্পাদনা ও বিবিধ কার্যনির্বাহের ব্যাপারে পত্রিকার সঙ্গে জড়িত কেশবচন্দ্র সেন ১৮৬৫ খৃস্টাব্দের বিখ্যাত দেবেন্দ্র-কেশব বিরোধের পর নিজে ইণ্ডিয়ান মিরর পরিচালনা করতে থাকেন, এমতাবস্থায় দেবেন্দ্রনাথের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং নবগোপাল মিত্রের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক ন্যাশনাল পেপারের উদ্ভব হয় ১৮৬৫ সালের ৭ আগস্ট তারিখে। এই পত্রিকা বাঙালির জাতীয় অভ্যুত্থানের মহদুপকার সাধন করতে থাকে। ইতিমধ্যে রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুরে জাতীয় গৌরব-সম্পাদনী সভা বা জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা স্থাপন করে স্থানীয় শিক্ষিত জনচিত্তকে উন্নত জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন ; মাদকদ্রব্য বর্জন, পারস্পরিক সৌহার্দ্যস্থাপন এবং জাতীয় আচার-আচরণ-পোষাক-পরিচ্ছদাদি প্রচলনের মাধ্যমে তিনি জাতীয়তাবোধের বীজ বপন করতে থাকেন জনগণের চিত্তক্ষেত্রে। রাজনারায়ণ তাঁর উদ্দেশ্য ও সভার কার্যবিবরণী ন্যাশনাল পেপারে প্রকাশ করেন, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (১৭৮৭ শক চৈত্র) এটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হয় ; ক্রমশ নবগোপাল মিত্রও এই ব্যাপারে আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেন। রাজনারায়ণ বসুর মতে নবগোপাল হিন্দুমেলার প্রেরণা পেয়েছিলেন তাঁরই একটি প্রস্তাব থেকে।[১২৫] পরিণামে জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতা প্রচারে নবগোপালের ন্যাশনাল পেপার পরবর্তীকালে মুখর হয়ে উঠতে থাকে। রাজনারায়ণের প্রস্তাবটি প্রকাশের পরবর্তীকালে নবগোপাল সঙ্গতভাবে দাবি করেছেন, since we have begun our career, a great movement has found its feeting here—we mean the great movement of National gathering,

১২৫ বিবিধ প্রবন্ধ প্রথম খণ্ডের (১৮৮২) ভূমিকায় (১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৮০৪ শক) রাজনারায়ণ বলেছেন, "আমি ইংরাজী ১৮৬৬ সালে 'Prospectus of a Society for the Promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal' আখ্যা দিয়া ইংরাজীতে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করি।… এই প্রস্তাব দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র মহাশয় হিন্দুমেলা ও জাতীয়সভা সংস্থাপন করেন।"

which has roused the sleeping energies of the people and stimulated their physical activity, which has afforded an impetus to the advancement of our national art and industry and which, should God grant it a long life, will doubtless bring an incalculable amount of good to our coutrymen.[১২৬] এই National Gathering হল চৈত্রমেলা বা হিন্দুমেলা; এর উদ্দেশ্যাবলীর সঙ্গে রাজনারায়ণের অনুষ্ঠানপত্রের নির্দেশের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, উভয়ত জাতীয় আচার-ব্যবহার পোষাক-পরিচ্ছদ ভাষা-সাহিত্য ক্রীড়া-শিল্প প্রভৃতির উন্নতিসাধন ও অনুশীলনের লক্ষ্য ছিল সুস্থির।[১২৭] প্রথম হিন্দুমেলা হল ১৮৬৭ খৃস্টাব্দের ১২ এপ্রিল, মেলার অধ্যক্ষ ছিলেন ন্যাশনাল সোসাইটি বা জাতীয় সভা; এর অধীনে ছিল একটি ন্যাশনাল স্কুল বা জাতীয় বিদ্যালয়, পাঠ্যসূচীর মধ্যে থাকত শরীরচর্চা ও জাতীয় বিদ্যার্জন। সর্বত্র এই জাতীয়তা। প্রধানত গণেন্দ্রনাথের (১৮৪১-১৮৬৯) উৎসাহে ও নবগোপালের উদ্যোগে এই চৈত্র মেলা বা জাতীয় মেলার উদ্বোধন হয় কলিকাতার উপকণ্ঠে বেলগাছিয়ায় ১২৭৩ সালের চৈত্র সংক্রান্তির দিন।[১২৮] মেলার দ্বিতীয় অধিবেশন হয় আশুতোষ দেবের বেলগাছিয়া উদ্যানে (১৮৬৮, ১১ এপ্রিল)। মেলার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গণেন্দ্রনাথ যে প্রস্তাব পাঠ করেন তাতে বলা হয় যে 'একদিনে কোন এক সাধারণ স্থানে একত্রে দেখা শুনা হওয়াতে' 'স্বদেশের অনুরাগ প্রস্ফুটিত হইতে পারে' এবং 'এই মিলন সাধারণ ধর্মকর্মের জন্য নহে, কোন বিষয়সুখের জন্য নহে, কেবল আমোদ প্রমোদের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য—ইহা ভারতভূমির জন্য'। মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল আত্মনির্ভরতা—'স্বদেশের হিতসাধন জন্য পরের সাহায্য না চাহিয়া যাহাতে আমরা আপনারাই তাহা সাধন করিতে পারি এই

১২৬ The National Paper, 7 August, 1872.

১২৭ বিপিনচন্দ্র পাল, হিন্দুমেলা ও নবগোপাল মিত্র, বঙ্গবাণী ১৩২৯ অগ্রহায়ণ। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় ভূম্যধিকারী সভার (১৮৩৭) উদ্দেশ্যের সঙ্গে হিন্দুমেলার আদর্শের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। The Zamindary Association is intended to embrace people of all descriptions, without reference to caste, country or complexion, and rejecting all exclusiveness, is to be based, on the most universal and liberal principles, the only qualification to become its member being the possession of interest in the soil of country. সভার মুখপত্রে বিবৃত এই আদর্শের সহিত হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য তুলনীয়: We despise race distinctions. It should be our object to raise up a vast Nationality in India Composed of Christian, Hindoo, Parsee and Mohamedan governed by our interest, and our faith, viz, faith in the supremacy of human love and charity. The National Paper, 1 April, 1868.

১২৮ গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী পত্রিকা ৬ষ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যা, পৃ ১৩০।

ইহার প্রকৃত ও প্রধান উদ্দেশ্য'। এই বাৎসরিক মেলা দীর্ঘকাল ধরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, অন্তত ১৮৮০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত এর অধিবেশন হয়েছিল। ১৮৭৫ সনের ১২ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার দিবসে পার্সিবাগানে হিন্দুমেলার নবম বার্ষিক অধিবেশন হয়; রবীন্দ্রনাথ এই অধিবেশনে 'হিন্দুমেলার উপহার' কবিতাটি পাঠ করেন।[১২৯] হিন্দুমেলা বা চৈত্রমেলা তৎকালে কি পরিমাণ আস্থা অর্জন করেছিল এবং কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় অন্যভাবে; ১৩২৯ সালের ২৩ অগ্রহায়ণ ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে বাংলার 'সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার পঞ্চাশৎ-বাৎসরিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে' অমৃতলাল বসু বিরচিত যে গান গাওয়া হয় তার কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত হল:

অর্ধশত অব্দ হইল বিগত জাতীয়তা শব্দ নব কর্ণগত
নবীন তরঙ্গ-ভঙ্গে বঙ্গ-অঙ্গ আন্দোলন।
মহর্ষি-মন্দিরে এ মহানগরে ঋষিমুখে স্ফুরে জাগ রে জাগ রে,
বন্দ্যো হেমচন্দ্র দুন্দুভিনিনাদে ঘোষে জাগরণ।...
লয়ে শিশুপাল সে নবগোপাল করে মেলা বিরচন।
স্বধর্মে আবার ফিরিল বিশ্বাস দেশ-দুঃখে সবে ফেলিল নিঃশ্বাস
হৃদয়ে উচ্ছ্বাস ব্যায়াম-অভ্যাস করে বঙ্গ যুবজন।[১৩০]

স্বর্ণকুমারীর বিবাহের (১৮৬৭, ১৭ নভেম্বর) মাত্র সাত মাস পূর্বে প্রথম হিন্দুমেলা অনুষ্ঠিত হয়; অর্থাৎ ইতিমধ্যে বহির্জগতের মত অন্দরমহলও এই জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। দেবেন্দ্রনাথের পরিবারের সঙ্গে রাজনারায়ণের ঘনিষ্ঠতার সূত্রাবলম্বনে এই মহৎ কার্যটি সুসম্পন্ন হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বহুকথিত 'হাম্‌চুপামুহাফ্‌' বা সঞ্জীবনী সভার অধ্যক্ষ ছিলেন রাজনারায়ণ; স্বদেশীয় শিল্পের শ্রীবৃদ্ধিসাধন, আত্মনির্ভরতা ও ঐক্যের প্রতি সভার মনোযোগ ছিল নিবদ্ধ। অন্তঃপুরের রমণী এই সভার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না থাকলেও তাঁরা যে এর দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন তার প্রমাণ দুর্লভ নয়। স্বয়ং স্বর্ণকুমারী তাঁর স্নেহলতা উপন্যাসের মধ্যে এই গুপ্তসভার প্রসঙ্গ অবতারণা করেছেন আগ্রহের সঙ্গে; সভার কার্যাবলীর যে বিবরণ পাওয়া যায় উপন্যাসে তার সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতিতে বর্ণিত (পৃ ১৬৪-৭০) ঘটনাবলীর সুন্দর সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ঠাকুরবাড়ির পরিবেশ সেই সময় জাতীয়তার দ্বারা কি পরিমাণে উদ্বোধিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ সে সম্পর্কে বলেছেন, "বাংলার আধুনিক যুগকে যেন তাঁহারা সকল দিক দিয়াই উদ্বোধিত করিবার

---

১২৯ সজনীকান্ত দাস, রবীন্দ্রনাথ: জীবন ও সাহিত্য, পৃ ২০১। মতান্তরে ১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ, দ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৭শ খণ্ড, পৃ ৪৭৬।

১৩০ সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী, পৃ ১২৫।

চেষ্টা করিতেছিলেন। বেশে-ভূষায় কাব্যে-গানে চিত্রে-নাট্যে ধর্মে-স্বাদেশিকতায় সকল বিষয়ে তাঁহাদের মনে একটা সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ জাতীয়তার আদর্শ জাগিয়া উঠিয়াছিল।"[১৩১] জীবন-স্মৃতির স্বাদেশিকতা-অধ্যায়ে তিনি বলেছেন, "আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকল প্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল।" মহর্ষি-পরিবারে মাতৃভাষার চর্চা চিরকাল চলে আসছিল। স্বদেশীয় ভাষা ও স্বদেশীয় ভাব এবং স্বজাতির প্রতি প্রীতি সেকালের বাঙালি মনে ধীরে ধীরে প্রকাশিত হতে থাকে; ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের রচনা ও মনোভাব এবং আচরণাদি থেকে তা সমর্থিত হয়। এই নবজাগ্রত স্বদেশচেতনার সৃজনে ও স্বীকরণে ঠাকুরপরিবারের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আমল হইতেই প্রকৃতপক্ষে স্বদেশী ভাবের প্রচার আরম্ভ হয়। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় উক্ত পত্রিকাতে ভারতের অতীত গৌরবের কাহিনী লিখিয়া লোকের মনে সর্বপ্রথম দেশানুরাগ উদ্দীপিত করিয়াছিলেন; তাহার পর ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয় হিন্দুমেলার কল্পনা করিয়া এবং ৺নবগোপাল মিত্র মহাশয় অনুষ্ঠানে তাহা পরিণত করিয়া এই স্বদেশী ভাবের প্রবাহে সে সময়ে প্রচণ্ড একটা বলসঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন। বলিতে গেলে, পূর্বে আদিব্রাহ্মসমাজই তখন স্বদেশী ভাবের প্রধান কেন্দ্র ছিল।"[১৩২] জীবন-স্মৃতির প্রথম পাণ্ডুলিপিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগ সাগ্নিকের পবিত্র অগ্নির মতো বহুকাল হইতে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে।"[১৩৩] এই স্বদেশভক্তি কত তীব্র ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় পরিবারের প্রতিনিধিস্থানীয় চিন্তাশীল দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তিতে, "কখনও কোথাও আমার লেখার মধ্যে বিদেশী হাবভাব idiom তুমি খুঁজিয়া পাইবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, মনে যদি এমন কোনও ভাব উদিত হয় যাহা প্রকাশের উপযুক্ত খাঁটি দেশীয় ভাষায় প্রকাশ করা যায়—তাহাকে প্রকাশের জন্য বিদেশী idiom এর অনুবাদ করিতে যাইব কেন? আমি কখনও ও পথ মাড়াই নি।"[১৩৪] এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে বর্ণিত মহর্ষি কর্তৃক জনৈক নূতন আত্মীয়ের ইংরেজিতে রচিত পত্র-প্রত্যাখ্যানের কথা উল্লেখযোগ্য। একদা দেবেন্দ্রনাথ মনে এই আশা পোষণ করেছিলেন, "যদি বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে পারি, তবে

১৩১ জীবনস্মৃতির খসড়া, বিশ্বভারতী পত্রিকা ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা।

১৩২ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, পৃ ১৩১।

১৩৩ রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৭শ খণ্ড, পৃ ৪৭৪।

১৩৪ বিপিনবিহারী গুপ্ত, পুরাতন প্রসঙ্গ, ১৩৭৩, দ্বিতীয় পর্যায়, পৃ ২০৪।

সমুদায় ভারতবর্ষের ধর্ম এক হইবে, পরস্পরবিচ্ছিন্নভাব চলিয়া যাইবে, সকলে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইবে, তার পূর্বেকার বিক্রম ও শক্তি জাগ্রৎ হইবে, এবং অবশেষে সে স্বাধীনতা লাভ করিবে··· ।"[১৩৫] রাজনারায়ণ বসুকে একদা তিনি কোনো এক পত্রে সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করেছিলেন, "তুমি চেষ্টা করিবে যাহাতে স্বদেশীয় মাতৃভাষায় উত্তমরূপে সকলের মন আকর্ষণ করিতে পার। ইংরাজী ভাষার ঠনঠনানির অপেক্ষায় মাতৃভাষাতে জলাঞ্জলি দেওয়াতে বিস্তর হানির সম্ভাবনা।"[১৩৬] স্বর্ণকুমারী এই পরিবারেরই সন্তান, তাই জাতীয়তায় আগ্রহী এইরূপ সুন্দর একটি মনোভাবের অনায়াস উত্তরাধিকার তিনি অর্জন করতে পেরেছিলেন।

স্বাদেশিকতা সম্বন্ধীয় ভাবনা ও চিন্তায় বাঙালিই প্রথম দীক্ষিত হয়। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা প্রথম অবলম্বন করে বাংলা-বোম্বাই-মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী; কিন্তু ইংরেজি ভাষাজ্ঞ বাঙালি নানাবিধ কর্মসূত্রে একদা সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিলেন, আর সরকারী কর্মচারীরূপে অগ্রণী হওয়ার ফলে শিক্ষিত বাঙালিগণ শাসক ও শাসিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টিসমক্ষে বিশেষ মর্যাদামণ্ডিত হতে থাকেন। ভারতবর্ষীয় জনসাধারণের এই অংশটি পরবর্তীকালে আপনাদের অভাব-অভিযোগ উত্থাপন ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন, শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী কিংবা কাঞ্চনকৌলীন্যের অধিকারী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সকল যুগে সকল দেশে আপনাদের অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং পরিণামে নানাবিধ অধিকার অর্জন করেছেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা; হীনমন্যতায় আক্রান্ত চিত্তের ক্ষোভ থেকে ঐতিহ্যচর্চা ও অতীতপ্রীতি তথা স্বদেশপ্রীতির উদ্ভব হয়েছিল বাংলাদেশে, তৎসঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত স্বদেশ-স্বধর্মপ্রীতি যুক্ত হল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে সিপাহি বিদ্রোহের পরবর্তী ত্রিশ বৎসরের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ও জাতীয়তাকামী সর্বভারতীয় যে সভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার উদ্যোক্তাগণের মধ্যেও বাঙালি ছিলেন; কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর থেকে স্বর্ণকুমারীর স্বামী জানকীনাথ ঘোষাল আমরণ এর সম্পাদক ছিলেন।

সিপাহি যুদ্ধের পর লর্ড লিটনের নায়কত্বে যে 'দরবার' হয় সেখানে ইংলণ্ডেশ্বরীকে ভারতেশ্বরী রূপে ঘোষণা করা হয়, কিন্তু That Durbar, we may say, marked the beginning of the movement which filled the educated Indian with the idea of obtaining his rightful place in the Empire......He was no longer satisfied with the minor positions which he held in the Government of India. He claimed his country as his own, and raised the cry of 'India for Indians'.[১৩৭] এইকালে লেখিকার জন্ম, ফলে তাঁর শৈশব ও কৈশোর জাতীয়তা

১৩৫ আত্মজীবনী, পৃ ৬৬।

১৩৬ পত্রাবলী, ২৪ সংখ্যক পত্র, কলিকাতা ২৫ মাঘ ১৭৮২ শক, পৃ ৩০।

১৩৭ Lajpat Ray, Young India, 1927, p 126.

আন্দোলনের উদ্যমগুলেই অতিবাহিত হয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজ, থিয়সফিক্যাল সোসাইটি, সংস্কৃত সাহিত্য তথা ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চাকেন্দ্রসমূহ, মহারাষ্ট্রসভা, আর্যসমাজ, সনাতন সভা প্রভৃতির উদ্যোগে এই জাতীয়তাকামী আন্দোলন ক্রমশ পুষ্ট হয়ে উঠছিল ; এতদ্দেশীয় প্রাচীন ইতিহাস কিংবা পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় ব্যাপক গবেষণায় বাঙালি ও মারাঠি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় আত্মনিয়োগ করতে লাগলেন। আমাদের অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাবশত The Theosophical Society began to praise and justify every Hindu institution and to find science on every custom. এই থিয়সফিক্যাল সোসাইটির সঙ্গে লেখিকার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ঘটেছিল পরবর্তীকলে। লেখিকার পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যিক মনোভূমিও থিয়সফির দ্বারা বহুল পরিমাণে প্রভাবিত হতে থাকে। এইভাবে তাঁর কৈশোরকাল যেমন নবজাগরণোন্মুখ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পরিমণ্ডলে অতিক্রান্ত হয় তেমনি পরবর্তী জীবনও নানাভাবে স্বাদেশিকতার স্রোতে অতিবাহিত হতে থাকে।

দৃঢ় ও রক্ষণশীল সাম্রাজ্যবাদী লর্ড লিটনের পরবর্তী ভাইসরয় লর্ড রিপনের সময় একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। তিনি স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার নীতি গ্রহণ করেন, and thus laid the foundations of representative institutions in India ; এই ব্যবস্থা থেকেই পরবর্তীকালের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব অনিবার্য হয়ে উঠে। পরবর্তী ভাইসরয় লর্ড ডাফরিন সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে as head of the Government, he had found the greatest difficulty in ascertaining the real wishes of people ; and that for purposes of administration it would be a public benefit if there existed some responsible organisation through which the Government might be kept informed regarding the best Indian Public Opinion. লর্ড ডাফরিনের এই চিন্তাপ্রসূত ফল হল ভারতের জাতীয় কংগ্রেস—কারণ তিনিই ভারত সরকারের অবসরপ্রাপ্ত সেক্রেটারী হিউমকে যে পরামর্শদান করেন তার ফলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। হিউমের জীবনীকার স্যার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ তাঁর অ্যালান অকটাভিয়ান হিউম নামক গ্রন্থের মধ্যে (পৃ ৫৯) বলেছেন, Indeed in initiating the National Movement Mr. Hume took counsel with the Viceroy, Lord Dufferin, and whereas he was himself disposed to begin his reform propaganda on the social side, it was apparently by Lord Dufferin's advice that he took up the work of political organisation as the first matter to be dealt with. ১৮৮৩ খৃস্টাব্দের একটি বিখ্যাত পত্রে হিউম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকগণের নিকট স্বদেশের হিতার্থে আত্মোৎসর্জনের

নিমিত্ত আবেদন জ্ঞাপন করেন, এবং ঐ বৎসরই তিনি প্রধান প্রধান নগরীর আঞ্চলিক সমিতিগুলির সহায়তায় যে সর্বভারতীয় জাতীয় সংস্থা (Indian National Union) নির্মাণ করেন কালক্রমে তাই জাতীয় কংগ্রেসে পরিণত হয়।[১৩৮] হিউম ছিলেন স্বাধীনতার পূজারী, তিনি চেয়েছিলেন বৃটিশের ছায়াশ্রয়ে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা। থিয়সফিক্যাল সোসাইটির বার্ষিক সম্মিলনীর আদর্শে রাজনৈতিক সমাবেশের চিন্তা থেকে থিয়সফিস্ট হিউম কংগ্রেসের সূচনা করেন, ঐসকল কার্যে স্বর্ণকুমারীর স্বামী জানকীনাথ ঘোষাল (১৮৪০-১৯১৩) তাঁকে পরম সুহৃদের মত সাহায্য করেন। মাদ্রাজের পরমেশ্বর পিলে বলেন, "হিউম জানকীনাথকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন, কি জানকীনাথ হিউমকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন জানা যায় না—তবে দুই জনের যোগে কংগ্রেসের কল্পনা কার্যে পরিণত হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনি না হইলে কংগ্রেস কনফারেন্স হইত না—কংগ্রেসের সব নিয়ম তাঁহার নখদর্পণে ছিল।"[১৩৯] তাঁর মতে কংগ্রেসের পিতা হলেন হিউম, জানকীনাথ তার জননী, আর রঘুনাথ রাও এবং সুব্রহ্মণ্য আয়ার এর জন্মলগ্ন থেকেই ধাত্রীস্বরূপ; বিশেষত জানকীনাথ ছিলেন কংগ্রেস সভাপতির দক্ষিণ হস্ত ও অভিভাবক এবং কংগ্রেসের বিশ্বকোষ ও মেরুদণ্ড ইত্যাদি।[১৪০] কংগ্রেসের আদিপর্বের বিবিধ অধিবেশনের রিপোর্ট ও ইতিহাসাদি পাঠকালে এই নবজাতকের গঠন ও ক্রমোন্নেষের ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য প্রভাবের কথা অবগত হওয়া যায়।[১৪১] প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য সক্রিয় রাজনীতির ব্যাপারে পত্নী স্বর্ণকুমারী দেবী সর্বদা স্বামীর সহায়তা করতেন।[১৪২]

হিউম-প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল ইউনিয়ন (১৮৮৩) পরবর্তীকালে কংগ্রেসে পরিণত হল; ১৮৮৫ খৃস্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বরে বোম্বাই নগরে কংগ্রেসের যে প্রথম অধিবেশন হয় সেখানে এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের সম্পাদক জানকীনাথ যোগদান করেন, উক্ত অধিবেশনেই নববিভাকর পত্রিকার সম্পাদক গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায় ভারতীয়গণের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য সর্বপ্রথম বিদেশী দ্রব্য বর্জনের কথা বলেছিলেন।[১৪৩] কংগ্রেসের পঞ্চম (১৮৮৯ বোম্বাই) ও ষষ্ঠ (১৮৯০ কলিকাতা) অধিবেশনে স্বর্ণকুমারী প্রতিনিধিরূপে যোগদান

১৩৮ Amit Sen, Notes on the Bengal Renaissance, 1957, p 58.

১৩৯ স্বর্ণকুমারী গ্রন্থাবলী ৩য় ভাগ, বসুমতী সংস্করণ, 'শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, পৃ ১৪৪।

১৪০ G. Parameshwaram Pillai, Indian Congressmen, 1899, p 39.

১৪১ Bimanbehari Majumdar and Bhakat Prasad Mazumdar, Congress and Congressmen in the Pre-Gandhian Era : 1885-1917, 1967, pp 119-20.

১৪২ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮২৪ শক আষাঢ়, পৃ ৯৩।

১৪৩ যোগেশচন্দ্র বাগল, মুক্তির সন্ধানে ভারত, ১৩৬৭, পৃ ১৪৭।

করেছিলেন। রহমতুল্লা সায়ানির সভাপতিত্বে ১৮৯৬ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের দ্বাদশ অধিবেশন হয়; এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল শিল্পপ্রদর্শনী, কংগ্রেসনেতা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন এই বিশিষ্ট অনুষ্ঠানের মূলে এবং সুরেন্দ্রনাথসহ অন্যান্য কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে তাঁকে সবিশেষ সাহায্য করেছিলেন। স্বদেশী শিল্পের মর্যাদা এবং স্বাধীনতার সঙ্গে স্বদেশী শিল্পোন্নয়নের সম্পর্ক স্বীকার ও ক্ষুদ্র সম্মেলন থেকে বৃহৎ সম্ভাবনার সূত্রপাতের দিক থেকে এই প্রচেষ্টাকে পরবর্তীকালে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে স্বর্ণকুমারীর সখিসমিতির (১২৯৩) উদ্যোগে বেথুন স্কুলের মহিলা-শিল্পমেলা এর বহুপূর্বে (১২৯৫ পৌষ) অনুষ্ঠিত হয়েছিল। স্বর্ণকুমারীর কোনো কোনো উপন্যাসে—প্রধানত শেষ-বয়সের রচনায়—এই স্বদেশী শিল্পমেলার উল্লেখ আছে; স্বপ্নবাণীর চতুর্থ পরিচ্ছেদে শিল্পমেলার বিবরণ পাওয়া যায়। শিল্পমেলা সম্বন্ধীয় নিজস্ব পরিকল্পনার সঙ্গে কংগ্রেসের শিল্প-প্রদর্শনীর আদর্শকেও স্বর্ণকুমারী গ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া আরও একটি তথ্যের অবতারণা করা যায়। যোগেশচন্দ্র বাগল বলেছেন, "রমেশচন্দ্রের জামাতা প্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ববিদ প্রমথনাথ বসু ভারতবর্ষের শিল্পোন্নতি-মানসে ১৮৯১ সনে কলিকাতায় একটি শিল্প-সম্মেলনের আয়োজন করিয়াছিলেন। তদবধি শিল্পপ্রদর্শনী এবং শিল্পসভা, ভারতীয় শিল্পসম্পদ সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা প্রভৃতি মাঝে মাঝে হইতে থাকে। কংগ্রেসও বাৎসরিক অধিবেশনের সঙ্গে ক্রমে একটি করিয়া শিল্পপ্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিল। ১৯০৫ সনে বঙ্গভঙ্গহেতু যে স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা হইল তাহার একটি প্রধান অঙ্গ ছিল স্বদেশী শিল্পের পুনরুজ্জীবন, উন্নতিসাধন এবং স্বদেশজাত দ্রব্যের বহুল ব্যবহার বিষয়ে উদ্যোগ।"[১৪৪] রমেশচন্দ্র ১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কাশীতে অনুষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কনফারেন্স বা ভারতীয় শিল্প-সম্মেলনের সভাপতি হয়েছিলেন। ঐ বৎসর বারাণসীতে কংগ্রেস অধিবেশন হয় (একবিংশ অধিবেশন) গোপালকৃষ্ণ গোখলের সভাপতিত্বে; উক্ত অধিবেশনের সঙ্গে যে শিল্পপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় তাকে একটি বাস্তব ও বৃহৎ আকার দানের জন্যই ভারতীয় শিল্প সম্মেলন হয়েছিল। ১৯০৫ খৃস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে কাশীর সেই শিল্প-সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে রমেশচন্দ্র বলেন, the Swadeshi Movement is one which all nations on earth are seeking to adopt in the present day......It will certainly foster and encourage our industries in which the Indian Government has always professed the greater interest.[১৪৫] স্বর্ণকুমারীর বিচিত্রা-স্বপ্নবাণী-মিলনরাত্রি এই ত্রয়ীর মধ্যে দেখা যায় রাজা ও রাজকুমারী শিল্পপ্রদর্শনীর জন্য সরকারী

১৪৪ ভূমিকা, রমেশরচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, পৃ ১৶০।

১৪৫ J. N. Gupta, Life and Work of Romesh Chunder Dutt, C. I. E., 1911, p 402.

আনুকূল্য প্রার্থনা করে নিষ্ফল হননি। নানা প্রসঙ্গে স্বদেশীয় শিল্পমেলা বা প্রদর্শনী সম্বন্ধে লেখিকার অভিমত ব্যক্ত হয়েছে এই ত্রয়ীর মধ্যে।

স্বদেশের হিতসাধনে এই অন্তঃপুরিকা ছিলেন সদা-উৎসাহী। তাঁর রাজনৈতিক প্রবন্ধাবলী কিংবা ভারতী পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যসমূহের মধ্যে এতদ্বিষয়ক একটি সতর্ক মনের পরিচয় পাওয়া যায়, যেন অতন্দ্র প্রহরীর মত স্বদেশ ও স্বজাতির সমূহ মর্যাদা ও সম্মানের প্রাসাদকে তিনি চিরকাল রক্ষা করে যাওয়ার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। জীবনের ঝরাপাতায় সরলা দেবী বলেছেন, "আমাদের বাড়িতে থিয়সফির প্রভাবের দিনে কাশী থেকে একজন মাতাজীর প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। মা বলতেন—'সরলার বিয়ে দেব না, ঐ মাতাজীর মত দেশের কাজে উৎসর্গিত থাকবে'।"[১১৩] স্বদেশের কল্যাণসাধনের ব্রতে দীক্ষিত সরলার জীবন অনুসরণ করে তিনি তাঁর 'ত্রয়ী' উপন্যাসের নায়িকা রাজকন্যার চরিত্রটি নির্মাণ করেছিলেন। বেশ বোঝা যায়, স্বর্ণকুমারী চাইতেন যে স্বদেশের ললনাগণ প্রবল স্বাদেশিকতা ও স্বাজাত্যাভিমানের তাড়নায় মাতৃভূমি রক্ষাকল্পে আত্মবিসর্জন করুন। তাঁর রণসঙ্গীতগুলির মধ্যে সেই বন্দী বাসনা মুক্তি পেয়েছিল ; অন্যান্য রচনায়ও দেখা যায় নরনারী নির্বিশেষে চরিত্রসকল স্বদেশরক্ষার মহান প্রতিজ্ঞায় নিজেদের আবদ্ধ করে ফেলেছেন। এই স্বাদেশিকতা-আন্দোলনের প্রবল বন্যায় তাদের ভাললাগা-মন্দলাগা স্বার্থবুদ্ধি প্রেম-ভালবাসা ভেসে গেছে ; একেই তিনি প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন 'দীপনির্বাণে'র বেতনভুক হিন্দুসৈন্যদলে, 'বিদ্রোহে'র ভীলজাতির মধ্যে। 'এক জাতি এক রাষ্ট্র' কিংবা জাতীয়তাকেন্দ্রিক রাষ্ট্র-গঠনে সেকালের রাজপুত (বিদ্রোহ) ও বাঙালিগণ (ফুলের মালা) যেন তৎপর হয়ে উঠেছিল। বিদেশী শত্রুর আক্রমণ-আশঙ্কায় তাদের দলবদ্ধভাবে আক্রমণ-প্রতিরোধাত্মক মনোভাব প্রকাশের মধ্যে সমসাময়িক স্বদেশী আন্দোলনের সাদৃশ্য অনুভব করেছেন লেখিকা ; মহান ও প্রশংসনীয় দেশপ্রেমবশত এই ক্ষেত্রে ঔচিত্যকে অতিক্রম করতে তিনি দুঃসাহসী হয়ে উঠেছিলেন।

ভারতী পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন তিনি দীর্ঘকাল। এই ভারতীর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, "নবযুগের গোড়াপত্তন করলেন নবগোপাল মিত্তির। চারদিকে ভারত, ভারত—ভারতী কাগজ বের হল। বঙ্গ বলে কথা ছিল না তখন। ভারতীয় ভাবের উৎপত্তি হল ওই তখন থেকেই, তখন থেকেই সবাই ভারত নিয়ে ভাবতে শিখলে।"[১১৭] রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন, "ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই

১১৩ জীবনের ঝরাপাতা, পৃ ১০৭।

১১৭ ঘরোয়া, ১৩৫০, পৃ ৬৯।

প্রথম হয়।"[১৪৮] বঙ্গদর্শন (১৮৭২) ও ভারতীর (১২৮৪) প্রথম প্রকাশের ব্যবধান মাত্র পাঁচ বৎসর। যদিও বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ কয়েকজন চিন্তাশীল মনীষী ভারত সম্বন্ধীয় কয়েকটি রচনা প্রকাশ করেছিলেন তথাপি মাত্র পাঁচ বৎসরের মধ্যেই ভারতবর্ষের সম্পর্কে আলোচনার জন্য পৃথক একটি সাময়িক পত্রিকার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল, অবনীন্দ্রনাথের মন্তব্যের মধ্যে সেই কথা ধ্বনিত হয়েছে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কত দ্রুত প্রসার লাভ করেছে তা এ প্রসঙ্গ থেকে উপলব্ধ হয়। ভারতীর অন্য ভূমিকার কথা আধুনিক গবেষক স্বীকার করেছেন। ভারতীর প্রথম সম্পাদক "দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন ষোল আনা 'স্বদেশী' মানুষ; 'ভারতী'ও শিল্প-সাহিত্যাদির আলোচনার মধ্য দিয়া জাতীয়তা প্রচার আরম্ভ করিয়া দেন।"[১৪৯] দ্বিতীয় সম্পাদক স্বর্ণকুমারীর সঙ্গে সম্পাদিত সাময়িকী ভারতীর আত্মীয়তা এই সূত্র থেকেও সমর্থিত হতে পারে।

শিবনাথ শাস্ত্রীর মতে ১৮৫৬ থেকে ১৮৬২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত এই অন্তর্বর্তী কাল বঙ্গসমাজের পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ;[১৫০] সকল দিক থেকে বিবেচনা করে বলা চলে উক্ত মাহেন্দ্রক্ষণে স্বর্ণকুমারীর জন্ম। তাঁর বিবাহপূর্ব কালে হিন্দুমেলা বা চৈত্রমেলা অনুষ্ঠিত হয়, বাংলা সাহিত্যে এই মেলার প্রভাব সর্বাতিশায়ী ও সুদূরপ্রসারী। এই স্বদেশী মেলার সময় থেকে স্বদেশী বা দেশপ্রেমমূলক সঙ্গীত রচনারম্ভ হয়।[১৫১] "নবগোপালের সময় থেকে এই 'ন্যাশনাল' শব্দটা দাঁড়াইয়া গেল। ন্যাশনাল সঙ্গীত রচিত হইতে আরম্ভ হইল"— দ্বিজেন্দ্রনাথের এই মন্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।[১৫২] স্বর্ণকুমারীর পরম পৃষ্ঠপোষক সত্যেন্দ্রনাথের 'মিলে সবে ভারতসন্তান', গণেন্দ্রনাথের 'লজ্জায় ভারতযশ গাহিব কী করে', দ্বিজেন্দ্রনাথের 'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি' প্রভৃতি গান হিন্দুমেলার উপলক্ষে রচিত; এই গানগুলিতে 'দেশমুক্তি কামনার সুর ভোরের পাখির কাকলির মত শোনা যায়'। স্বর্ণকুমারীর স্বদেশবিষয়ক গান এই ধারানুসরণে লিখিত হয়, নবজাগরণের দিনের আশা আকাঙ্ক্ষা উৎসাহ ও উদ্দীপনা গানগুলিতে প্রমূর্ত; পরবর্তী সাহিত্যিকসমাজ স্বাদেশিকতার যে মহাজনপথে দৃঢ়তার সঙ্গে পদক্ষেপ করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ গণেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ স্বর্ণকুমারী প্রভৃতি তার প্রদর্শক ও পথিকৃৎ।[১৫৩] আবার উপর্যুক্ত

১৪৮ স্বাদেশিকতা, জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৭শ, পৃ ৩৪৮।

১৪৯ যোগেশচন্দ্র বাগল, জাতীয়তার উন্মেষে সাময়িক পত্র, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১০ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, পৃ ১৬০।

১৫০ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, ১৯৫৭, পৃ ২০২।

১৫১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী পত্রিকা ৬ষ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যা, পৃ ১৩০।

১৫২ বিপিনবিহারী গুপ্ত, পুরাতন প্রসঙ্গ—দ্বিতীয় পর্যায়, পৃ ২৯৮।

১৫৩ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বঙ্গের জাতীয় কবিতা ও সংগীত, দেশ ১১শ বর্ষ ৩২ তম সংখ্যা, পৃ ১৫৪।

হিন্দুমেলা এবং জাতীয় আন্দোলন বঙ্গীয় রঙ্গালয়কেও নবপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে তুলে ঐ সময়, এর প্রথম প্রকাশ হিসাবে কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারতমাতা (১৮৭৩) নামক ক্ষুদ্র রূপক-দৃশ্যটি উল্লেখ্য।[১৫৪] এই সূচনা স্বর্ণপ্রসূ ও যুগান্তকারী কারণ 'ভারতভূমির ও ভারত-সন্তান-গণের বর্তমান দুরবস্থা প্রদর্শনই "ভারত মাতার" উদ্দেশ্য'; কিরণচন্দ্রের অপর রচনা ভারতে যবন (১৮৭৪), হারাণচন্দ্র ঘোষের ভারত দুঃখিনী (১২৮২), নটেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই কি সেই ভারত (১৮৮২), কুঞ্জবিহারী বসুর ভারত অধীন (১২৮১) এবং ধর্মক্ষেত্র (১২৮৩), হরলাল রায়ের হেমলতা নাটক (১৮৭৩) ও বঙ্গের সুখাবসান (১৮৭৪) ঐ একই ভাবনার অনুবৃত্তি ও পরিণাম। স্বর্ণকুমারীর ইতিহাসাশ্রিত রচনাবলীর উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা বর্তমান প্রসঙ্গে স্বভাবত মনে পড়ে।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এবং তৎসময়োচিত অন্যান্য ঘটনার পর কংগ্রেসের জন্মান্তর ঘটে, উক্ত প্রতিষ্ঠান অতঃপর একান্তভাবে স্বদেশী ও স্বরাজ আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকে; এই রূপান্তরের সময় থেকে সাধারণভাবে স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ ও বিদেশী পণ্যবর্জন নীতির সূত্রপাত। 'স্বদেশী' শব্দের তাৎপর্যব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লাজপত রায় বলেন, Swadeshi means the cult of home industries, i. e., the use of the articles made in the country.[১৫৫] সমসাময়িক জাতীয়তাবাদীর একটি কর্মসূচীর পরিচয় পাওয়া যায় বিপিনচন্দ্র পাল-বিরচিত দি স্পিরিট অব ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিজম এর মধ্যে: Boycott both economic and political, boycott of foreign and especially British goods, and of all honorary associations with the administration, national education implying a withdrawal of the youths of the nation from the officialised universities and government-controlled schools and colleges, and training them up in institutions conducted on national lines subject to national control and calculated to help the realisation of the national destiny, national civic volunteering, aiming at imparting a healthy civic training to the people by the voluntary assumption of as much of the civic duties, at present discharged by official or semi-official agencies, as could be done without any violation of the existing laws of the country,—duties, for instance, in regard to rural sanitation, economic and medical

১৫৪ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ২য়, পৃ ২৭৭।

১৫৫ Young India, p 171, F. N.

relief, popular education, preventive and police duties, regulation of fair and pilgrim gathering,—settlement of civil and non-cognisable criminal disputes by means of arbitration committees... স্বর্ণকুমারীর কোনো কোনো উপন্যাসে বিশেষত স্নেহলতা (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ), বিচিত্রা, স্বপ্নবাণী, মিলনরাত্রি, নব ডাকাতের ডায়েরি প্রভৃতি রচনায় উদ্ধৃত জাতীয়তাবাদী মত ও পথ সম্বন্ধে লেখিকার সুচিন্তিত মন্তব্য স্থানলাভ করেছে। স্বদেশী ডাকাত ও সন্ত্রাসবাদীর কার্যকলাপ অবলম্বনে কয়েকটি ছোট গল্প রচিত হয়েছে। স্নেহলতার প্রথম ভাগে (অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ) বর্ণিত ষোড়শবর্ষীয় বালক চারুর 'গুপ্তসভা'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঞ্জীবনী সভার আদর্শে পরিকল্পিত হয়েছে। এইসকল গুপ্তসভার কার্যকলাপ ও সন্ত্রাসবাদীর আন্দোলন ত্রয়ীর মধ্যে উজ্জলভাবে বর্ণিত। সন্ত্রাসবাদ ও অহিংসা আন্দোলনের পথ ও মতের ভিন্নতা সম্বন্ধে তিনি প্রথমাবধি সচেতন ছিলেন, তাঁর শেষ বয়সের গল্প ও উপন্যাসগুলির মধ্যে এতৎসম্বন্ধীয় চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে।

সর্বশেষে বলা যায়, তিনি নিজেই যে কেবল স্বদেশভক্ত ছিলেন তা নয়, পুত্র কন্যাগণকেও এই স্বদেশসেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করার ব্যাপারে তিনি ছিলেন বিশেষভাবে আগ্রহী। তাঁরই অনুমোদন ও উৎসাহ লাভ করে সরলা দেবী জনসেবার এবং স্বদেশমুক্তির নানাবিধ কর্মে আত্মনিয়োগ করতে পেরেছিলেন। পূর্বেই বলা হয়েছে ত্রয়ী উপন্যাসের নায়িকা-চরিত্র পরিকল্পনাকালে লেখিকা নিজ দুহিতা সরলার জীবনকথা বারংবার স্মরণ করেছেন, সরলার জীবনাদর্শ ও কর্মপন্থা তাঁর চিত্তকে এতদূর অধিকার করেছিল। সরলার মত ত্রয়ীর নায়িকা রাজকন্যাও ব্যায়ামসমিতি স্থাপন এবং স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী নির্মাণ প্রভৃতি কাজ করেছিলেন। বিচিত্রার একাদশ পরিচ্ছেদের একটি অংশ প্রদত্ত হল :—"রাজা হৃষ্টচিত্তে বাড়ী ফিরিবামাত্র কন্যা তাঁহার হাতে তাহার ব্যায়ামসমিতির একখানি নিয়মাবলী আনিয়া দিল। তাহাতে নিম্নলিখিত নিয়মসূত্র লিখিত ছিল—

১। ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইবে।

২। ভারত-সম্রাটের শুভকামনা করিবে।

৩। দেশমঙ্গলে নিজের মঙ্গলজ্ঞান করিবে।

৪। নারীসম্মান রক্ষা করিবে ; এবং দুর্বলের সহায় হইবে। স্বদেশী-বিদেশী নির্বিচারে অত্যাচারিত ব্যক্তির পক্ষাবলম্বন করিবে।

৫। শরীর-মনের তেজোবৃদ্ধিকর ব্যায়ামচর্চা করিবে।

৬। অযথা বলপ্রকাশ বা দ্বন্দ্ব করিবে না, কিন্তু অপমানিত হইলে নতমুখে তাহা সহ্য করিবে না।"

ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলন পাশ্চাত্ত্যের মত একান্তভাবে রাজনৈতিক ব্যাপার ছিল

না, ধর্মের এবং আধ্যাত্মিক ভাবনা ও প্রত্যয়ের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ ও সুগভীর সম্পর্ক এই স্বাদেশিক আন্দোলনকে যে স্বতন্ত্রবর্ণরঞ্জিত এবং বৈশিষ্ট্যচিহ্নিত করে দিয়েছিল[১৫৩] উপর্যুক্ত প্রথম সূত্রপাঠে তা প্রমাণিত হয়। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা উদারহৃদয় অকটাভিয়ান হিউমের উদ্দেশ্যানুযায়ী বৃটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষপুটাশ্রয়ী ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা (political liberty for India under the aegis of the British Crown) নির্মাণের দৃষ্টিকোণ থেকে দ্বিতীয় সূত্রটি সমর্থনযোগ্য। উপরিলিখিত নিয়মাবলীর মধ্যে স্বর্ণকুমারীর জাতীয় আদর্শ ও ভাবনা পুঞ্জীভূত, তাঁর রাজনৈতিক প্রবন্ধাবলীর মধ্যে অকারণ রাজনিন্দা বা হিংসাত্মক কার্যকলাপের প্রতি প্রীতির পরিচয় অলভ্য, সত্যসুন্দরমঙ্গলের উপাসক কুশ্রীকে কদাপি সহ্য করেননি। দুর্বলের ছলনালব্ধ সিদ্ধি বা অধর্মার্জিত সাফল্য সর্বদা তিরস্কৃত হয়েছে তাঁর রচনায়, এক্ষেত্রে আত্মিক উন্নতিই তাঁর নিকট শ্রেয়স্ক প্রেয়স্ক ; স্বাধীনতালাভের কামনা-বাসনা সত্বেও অনায়াসসিদ্ধি সর্বত্র নিন্দিত হয়েছে—নব ডাকাতের ডায়েরি নামক গল্পে সন্ত্রাসবাদী স্বদেশী দস্যুদলের হিংস্র কার্যকলাপ যে কত বিপজ্জনক অথচ নিষ্ফল তার শোচনীয় চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন, স্বদেশমুক্তি কামনার দুর্বলতাবশত ঐসকল অন্যায় প্রশ্রয় লাভ করেনি।

ভারতী সম্পাদনা

স্বর্ণকুমারী বঙ্গবাণীর সেবা করেছেন সুদীর্ঘকাল এবং তার যোগ্য পুরস্কারও যথাকালে লাভ করেছেন। তাঁর সাহিত্যসেবার প্রাথমিক ইতিহাস পর্যালোচনাকালে দেখা যায় পিতৃদেবের প্রার্থনাত্মিক ধর্ম-বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতার অনুসরণে প্রবন্ধ রচনা ছিল বাল্যকালের অভ্যাস ; জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অভিনব সুরসৃষ্টিকে বাণীবদ্ধ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন বিবাহপরবর্তী কালে। তাছাড়া তাঁর বাল্যকালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যখন 'ইংরাজী হইতে ভাল ভাল গল্প তর্জমা' করে অন্তঃপুরিকাদের নিকট পরিবেশন করেন তখন লেখিকা শ্রুত কথাবলম্বনে 'ছোট ছোট গল্প রচনা' করেন। এবম্বিধ অনুশীলনের মাধ্যমে তাঁর সাহিত্যচর্চার প্রাক্‌প্রস্তুতি ক্রমপরিণত হয়ে উঠতে থাকে। মাত্র চতুর্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে শিক্ষার সৌকর্যার্থে তিনি বোম্বাই গমন করেন ; ইতিপূর্বে অর্থাৎ বিবাহের আগে তিনি বাংলা ও সংস্কৃত ভাল করে শিক্ষা করেন, অতঃপর বোম্বাই গমনে ও সত্যেন্দ্রনাথের পরিবারের সান্নিধ্যে এসে তিনি ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য উত্তমরূপে আয়ত্ত করেন। ঐসকল অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি

১৫৩ Tarasankar Banerjee, Indian Nationalism and Religion, The Quarterly Review of Historical Studies, vol. V, No. 4, p 231.

সাহিত্যসৃষ্টিতে মনোনিবেশ করেন এবং ১২৮৩ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস দীপনির্বাণ প্রকাশিত (১৫ ডিসেম্বর ১৮৭৬) হয়। দীপনির্বাণের প্রকাশকালে গ্রন্থে লেখকের নাম ব্যবহার করা হয়নি, অনেকে কোনো পরিণত প্রতিভাধর শিল্পীর রচনা বলে অনুমান করেন; আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলের নিকট থেকে গ্রন্থটি প্রশংসা অর্জন করে। তখন তাঁর বয়স মাত্র কুড়ি বৎসরের কিছু বেশি। এরপর ভারতী পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকলে সেখানে তাঁর গল্প কবিতা উপন্যাস প্রভৃতি মুদ্রিত হয়েছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "বঙ্গ-মহিলাগণের মধ্যে তিনিই বোধ হয় সর্বপ্রথম উপন্যাস, গাথা ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করেন।"[১৫৭]

ভারতী পত্রিকা সম্পাদন স্বর্ণকুমারীর জীবনের স্মরণীয় কীর্তি। ১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে ভারতী প্রথম প্রকাশিত হয়; দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এর প্রথম সম্পাদক হলেও ঐ সময় 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী ও রবীন্দ্রনাথ— এই তিনজনও সম্পাদকীয় চক্রমধ্যে ছিলেন।' পত্রিকার অষ্টম বর্ষ অর্থাৎ ১২৯১ সাল থেকে ১৩০১ সাল পর্যন্ত স্বর্ণকুমারী সম্পাদনা করেন। এর পরে হিরণ্ময়ী ও সরলা যুগ্মভাবে (১৩০২-০৪) আর রবীন্দ্রনাথ (১৩০৫) ও সরলা (১৩০৬-১৪) এককভাবে পত্রিকা সম্পাদন করতে থাকেন; অতঃপর ১৩১৫ সালে দ্বিতীয় বার উক্ত পত্রিকার সম্পাদিকা হয়েছিলেন স্বর্ণকুমারী এবং ১৩২১ সালে এই কার্য থেকে তিনি চিরকালের জন্য অবসর গ্রহণ করেন।

সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনীর উৎসাহে ও সম্পাদনায় ১২৯২ সালের বৈশাখ মাস (এপ্রিল ১৮৮৫) থেকে 'বালক' পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে; কিন্তু পরবৎসর ভারতীর সঙ্গে বালক যুক্ত হয়ে যায়[১৫৮] এবং পত্রিকার নাম হয় 'ভারতী ও বালক'; বলাবাহুল্য ভারতীর সম্পাদক তখন স্বর্ণকুমারী। ভারতী ও বালক এই নামে উক্ত পত্রিকা ১২৯৯ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয় এবং ১৩০০ সাল থেকে শুধু 'ভারতী' নামটি পুনরায় ব্যবহৃত হতে থাকে, তখনও লেখিকা এর সম্পাদিকা ছিলেন।

ভারতীর অষ্টম বর্ষ থেকে স্বর্ণকুমারী সম্পাদিকা হলেন। "দ্বিজেন্দ্রনাথ ১২৯০ সাল পর্যন্ত, সাত বৎসর, সুষ্ঠুভাবে পত্রিকা পরিচালন করিয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী, সাহিত্যানুরাগিনী কাদম্বরী দেবীর অপমৃত্যুর (৮ বৈশাখ ১২৯১) সঙ্গে সঙ্গে 'ভারতী'র সেবকেরা উহার প্রচার রহিত করাই সাব্যস্ত করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ঘোষণা করেন—'ভারতী বিশেষ কারণে আর প্রকাশিত হইবে না'।"[১৫৯] শরৎকুমারী

১৫৭ সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ২৮শ, পৃ ১৩।

১৫৮ রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৭শ, পৃ ৪০৩, পাদটীকা।

১৫৯ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাময়িকপত্র-সম্পাদনে বঙ্গমহিলা, বিশ্বভারতী পত্রিকা ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, পৃ ৩৫।

চৌধুরানী তাঁর 'ভারতীর ভিটা' প্রবন্ধে এ সম্পর্কে বলেছেন, "ফুলের তোড়ার ফুলগুলিই সবাই দেখিতে পায়, যে বাঁধনে তাহা বাঁধা থাকে তাহার অস্তিত্বও কেহ জানিতে পারে না। মহর্ষি-পরিবারের গৃহলক্ষ্মী শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী ছিলেন এই বাঁধন। বাঁধন ছিঁড়িল—ভারতীর সেবকেরা আর ফুল তোলেন না, মালা গাঁথেন না, ভারতী ধূলায় মলিন। এই দুর্দিনে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী নারীর পালনশক্তির পরিচয় দিলেন। ধূলা ঝাড়িয়া সস্নেহে ভারতীকে কোলে তুলিয়া লইলেন; সেই সঙ্কটকালে তিনি রক্ষা না করিলে আজ ভারতীর নাম বিলুপ্ত হইয়া যাইত।"[১৬০] ভারতীর সম্পাদিকারূপে বড় দুর্দিনে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ; তবু দীর্ঘকাল যোগ্যতার সঙ্গে তিনি তাঁর কর্তব্য পালন করেছিলেন এটাই বড় কথা। দায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি যে সংখ্যাটি প্রথম প্রকাশ করেন তার প্রারম্ভে (বৈশাখ ১২৯১) 'ভূমিকা' নামক একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়, তাতে বলা হয়েছে:

"আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর দাদামহাশয় বর্তমান বৎসর হইতে এই পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পরিবর্তে আমরা উক্ত ভার গ্রহণ করিলাম।

ভারতী এতদিন যেরূপ উৎকৃষ্টরূপে সম্পাদিত হইয়া আসিয়াছে তাহা অপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্টরূপে ইহা সম্পাদন করা দুর্ঘট, সে আশা দূরে থাক, ভারতীর পূর্ব প্রতিষ্ঠা সমান রাখিতে পারিলেই যথেষ্ট, কিন্তু কেবল এই আশার বশবর্তী হইয়া যে আমরা ভারতী গ্রহণ করিয়াছি এমন নহে, কিম্বা এতদিন এই পত্রিকার সহিত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ থাকায় ইহার প্রতি যে মমতা জন্মিয়াছে— সেই মমতাও আমাদের এ গুরুভার গ্রহণ করার প্রধান কারণ নহে। আরম্ভ হইতে এ পর্যন্ত যিনি এই পত্রিকা এমন সুন্দররূপে চালাইয়া আসিয়াছেন, অন্য কার্যবশতঃ এখন তাঁহার সময় অভাব হইয়াছে, সে নিমিত্ত তিনি যখন সম্পাদকীয় ভার ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন তখন ভারতী উঠাইয়া দেওয়াই স্থির হইল, আমাদের দেশের এবং বাঙ্গলা ভাষার বর্তমান অবস্থায় ভারতীর ন্যায় কোন একখানি পত্রিকার অকালমৃত্যু বড়ই কষ্টকর। এইরূপ অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার ইচ্ছাতেই আমরা ভারতীর সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়াছি। পূজনীয় ভারতীর পূর্বতন সম্পাদক মহাশয় তাঁহার প্রতিভাকে স্বদেশের উপকার সাধনব্রতে ব্রতী করিয়া ১২৮৪ সালে ভারতী পত্রিকা সংস্থাপন করেন এবং গত সাত বৎসর ধরিয়া ভারতীকে বহু যত্নে কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, অঙ্ক প্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া, পিতার ন্যায় সস্নেহে লালনপালন করিয়া, এখন তিনি ভারতীকে হস্তান্তরে সমর্পণ করিলেন।

১৬০ বিশ্বভারতী পত্রিকা ৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, পৃ ১১৭।

মাতা পিতা আত্মীয় স্বজন ছাড়িয়া শ্বশুরালয়ে যাইবার সময় কন্যা গভীর দুঃখে অশ্রুজল ফেলিতে থাকেন, তাঁহার মাতাপিতা স্বজনবর্গও দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়েন, তাঁহাদের সাধের প্রতিমা পরের ঘরে প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল—তাঁহাদের মত যত্ন আদর তাহাকে আর কে করিবে। কিন্তু শ্বশুরালয়ে আসিয়া কন্যা যখন দেখিতে পায়—এখানেও তাহাকে আদর করিবার, এখানেও তাহাকে যত্ন করিবার লোক আছে, এখানেও তাহার মলিন মুখ দেখিলে প্রাণে ব্যথা পাইবার লোক আছে, এখানেও তাহাকে সুখী করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিবার লোক আছে, তখন সেই যত্নে সেই আদরে কন্যা ক্রমে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া উঠে এবং কন্যাকে সুখী দেখিয়া কন্যার পিতা মাতা আত্মীয়বর্গও তখন সুখী হইয়া থাকেন। ভারতীর সম্বন্ধেও আমরা পাঠকদিগকে বিনীতভাবে বলিতেছি যে ভারতী আমাদের হইয়া অযত্নে পড়িবেন না—ভারতীর পূর্বতন বন্ধুগণ তাঁহার মঙ্গলের নিমিত্ত যেরূপ শ্রম স্বীকার করিতেন আমরাও ভারতীর জন্য সেইরূপ শ্রম স্বীকার করিতে চেষ্টা করিব। আর এক কথা, কন্যা শ্বশুরালয়ে গমন করিলে, পিতামাতা তাহার পর হইয়া যান না, তাঁহারা পূর্বেও যেমন আপনার ছিলেন এখনও তেমনি থাকেন, পূর্বেও যেমন স্নেহ করিতেন এখনও তেমনি স্নেহ করেন—সেইরূপ ভারতী হস্তান্তরিত হইল বলিয়া পূর্বতন বন্ধুদিগের সহিত ইহার সম্বন্ধ রহিত হইল না, তাঁহারা পূর্বেও ইঁহাকে যেরূপ যত্ন করিতেন এখনও ইঁহাকে সেইরূপ যত্ন করিবেন। সুতরাং অন্য গৃহে আসিয়াও পাঠকদিগের নিকট ইনি সেই পূর্বের ভারতীই রহিলেন। সেইজন্য নূতন করিয়া এই পত্রিকার উদ্দেশ্যাদি এখানে বর্ণনা করা যে তেমন আবশ্যক তাহা নহে। তবে ভারতী নূতন সম্পাদকের হাতে আসিয়াছেন, আবশ্যক থাক আর নাই থাক, কি প্রণালীতে নূতন সম্পাদক এই পত্রিকা চালাইতে চাহেন তাহা একবার বলা একটি চিরন্তন প্রথা।

সেইজন্য ভারতীর ন্যায় জনসাধারণের পাঠোপযোগী মাসিক পত্রিকার কি কি উদ্দেশ্য, আর আমরা কি কি প্রকারে সেইসকল উদ্দেশ্য সাধন করিতে চাই, তাহা সংক্ষেপে বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

প্রত্যেক দ্রব্য দেখিয়াই আমরা আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি—ইহার প্রয়োজন কি, সুতরাং মাসিক পত্রিকা সম্বন্ধেও এই প্রশ্ন লোকের মনে উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে আজকাল এত মাসিক পত্রিকা দেখা যায় যে, প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই মাসিক পত্রিকার প্রয়োজন কি অর্থাৎ ইহা হইতে আমাদের কি কার্য সিদ্ধি হইতে পারে—তাহা অবগত আছেন। ইহা সত্ত্বেও এ বিষয়ে আমরা দু একটি কথা বলিতে চাই মাসিক পত্রিকা হইতে আমাদিগের কি উপকার হইতে পারে? আমাদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোকই সাংসারিক কার্যে ব্যস্ত, অধিকাংশ লোকই অন্নবস্ত্রের আয়োজনে নিযুক্ত; এই-

সকল লোকের যে-কিছু অবকাশ থাকে তাহা বিশ্রাম করিতেই বোধ হয় নিঃশেষিত হইয়া যায়, ইহাদিগের নিঃস্বার্থভাবে চিন্তা করার সময় হইয়া উঠে না। ... আমাদের স্বার্থসিদ্ধি হইবে ভাবিয়া যেসকল কার্যে আমরা ব্যাপৃত থাকি সেসকল কার্য করিবার সময় হয়ত অন্যের হিতাহিতের উপর আমাদের যথোপযুক্ত মনোযোগ না থাকিতেও পারে, তখন আমাদিগের নিজের সামান্য সামান্য বৈষয়িক চিন্তাকেই আমরা প্রাধান্য দিতে পারি, এবং এইরূপভাবে চিন্তা করিয়া আমাদিগের মন চুম্বক শলাকার ন্যায় এক দিকেই নামিয়া পড়ে, এরূপ অবস্থায় আমাদিগের সত্য নিরূপণ ক্ষমতা হ্রাস হইয়া যাইতে পারে আর তাহা হইলে সমাজের উন্নতিপক্ষে ব্যাঘাত জন্মিবার সম্ভাবনা। সমাজের এই ক্ষতি-সম্ভাবনা দূর করিবার অভিপ্রায়ে, সমাজস্থ সাধারণ ব্যক্তিদিগকে নিঃস্বার্থভাবে চিন্তা করিতে শিক্ষা দেওয়ার বাসনায়, সাধারণের মনের যথাসম্ভব সর্বাঙ্গীন সৌষ্ঠব বিধান করিবার উদ্দেশ্যে সমাজের মধ্যে কেহ কেহ মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই প্রকার মাসিক পত্রিকায় সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির আলোচনা করা হইয়া থাকে আর লোকে অবকাশ মতে ঐ পত্রিকা পাঠ করিয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য বৈষয়িক চিন্তা হইতে দূরে থাকিয়া স্ব স্ব মানসিক উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হন। জনসাধারণের মানসিক সৌষ্ঠব বিধানই মাসিক পত্রিকার উদ্দেশ্য...ইহা হইতে দেখা যাইতেছে— অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীবনবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি বিজ্ঞান, দর্শন, কবিতা আর উপন্যাসাদি এই সকলগুলিই মাসিক পত্রিকার সাধারণ আলোচ্য বিষয় এবং এতদিন পর্যন্ত ভারতীতে এইসকল বিষয়ই (অধিকই হউক কি অল্পই হউক) আলোচনা হইয়া আসিয়াছে, আমরাও এখন এসকল বিষয়ে ভারতীর প্রতিষ্ঠা সমান রাখিতে চেষ্টা করিব। তবে আমরা এখন হইতে বিজ্ঞানের মাত্রা কিছু বাড়াইতে ইচ্ছা করি— আমাদের মতে বিজ্ঞান শিক্ষার বিশেষ উপকারিতা আছে এবং আজকাল এদেশে বিজ্ঞান আলোচনার কতক অনুরাগও দেখা যাইতেছে। ভারতবর্ষীয় মহিলাগণ আজকাল বিদ্যানুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন অথচ তাঁহাদের মধ্যে অনেকের ইয়োরোপীয় কোন ভাষার সহিত বিশেষ পরিচয় না থাকায় তাঁহারা বর্তমান কালের বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে অপারক তাহা ছাড়া ইংরাজি জানিয়াও অনেক স্ত্রীপুরুষ অধিক সময় বা অর্থ দিয়া বিজ্ঞান আলোচনা করিতে পারেন না সেইজন্য ভারতীতে সহজ ভাষায় বিবিধ প্রকার বৈজ্ঞানিক বিষয় আলোচনার বিশেষরূপে ইচ্ছা রহিল। পরিশেষে সম্মান-পুরঃসর বক্তব্য এই যে বঙ্গীয় পাঠক ও সমালোচকমণ্ডলী এই পত্রিকার প্রতি এতদিন যে সমাদর দেখাইয়া আসিয়াছেন, এখন যেন তাঁহারা সেই সমাদরের হ্রাস না দেখান। ভারতী এইবার অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন, বঙ্গদেশে ইহার এই সময়ের মধ্যে আকাঙ্ক্ষানুযায়ী প্রতিপত্তি হইয়াছে ; কিন্তু তথাপি স্বদেশানুরাগী মাতৃভাষানুরাগী বঙ্গীয় পাঠকগণের

স্মরণ রাখা আবশ্যক যে ভারতীর এখনও তরুণ বয়স, সুতরাং ইহার প্রতি এক্ষণে শিথিলযত্ন হইলে ইহার সম্পূর্ণ স্ফূর্তিপ্রাপ্তিপক্ষে ব্যাঘাত জন্মিতে পারে।"

১২৯৩ সাল থেকে পত্রিকা নাম পরিবর্তন করে কারণ ঐ সময় ভারতীর সঙ্গে বালক যুক্ত হয়েছিল। এ সম্পর্কে ১২৯৩ সালের ভারতী ও বালকের বৈশাখ সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় একটি বিবৃতি মুদ্রিত হয়: "নূতন বৎসরের ভারতী। দুই বৎসর পূর্বে ভারতীর জীবনে একটি পরিবর্তন ঘটিয়াছে, আজ আর একটি পরিবর্তন,—সেদিন তিনি বালিকা বেশে গৃহ হইতে গৃহান্তরে পদার্পণ করিয়াছিলেন, আজ তিনি বালক ক্রোড়ে আর এক নূতন বেশে দেখা দিলেন। আজ হইতে 'বালক' ভারতীর সহিত মিলিত হইল।

পাঠকেরা মনে করিবেন না, ইহাতে ভারতীর গাম্ভীর্য নষ্ট হইল—কিম্বা ইহার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র হইয়া পড়িল। কারণ 'বালক' নামেমাত্র বালক ছিল— প্রকৃতপক্ষে ইহা বয়স্ক পাঠকদিগেরই উপযোগী হইয়া উঠিয়াছিল, এরূপস্থলে এই মিলনে ভারতীর বল বৃদ্ধি হইবে আশা করিয়া আমরা সুখী হইতেছি, ভরসা করি পাঠকেরাও সুখী হইবেন। এই উপলক্ষে ভারতীর কলেবরও বৃদ্ধি করা গেল।" ১২৯৯ সাল পর্যন্ত পত্রিকার নাম ছিল 'ভারতী ও বালক', ১৩০০ সাল থেকে পুনরায় 'ভারতী' নামটি গৃহীত হয়। স্বর্ণকুমারী ১৩০১ সাল পর্যন্ত ভারতী পত্রিকা সম্পাদনার পর অবসর গ্রহণ করেন। ১৩০২ সালের বৈশাখ সংখ্যার একেবারে প্রথমে এ সম্পর্কে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়, স্বর্ণকুমারীর নামাঙ্কিত সেই অবসর গ্রহণের সংবাদটি এইরূপ: "অবসর গ্রহণ। এতদিন আমি আমার সাধ্যমতে ভারতীর সম্পাদন-কার্য নির্বাহ করিয়া আসিয়াছি; এক্ষণে শরীর অসুস্থ হওয়াতে আমার কন্যাদ্বয়ের প্রতি ভারতীর ভার সমর্পণ করিয়া বর্তমান বৎসর হইতে আমি অবসর গ্রহণ করিলাম। শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।" উক্ত সংখ্যায় কন্যা হিরণ্ময়ী দেবীর নামযুক্ত একটি 'ভূমিকা'য় বলা হয়েছে,

"সূর্য যবে অস্ত যায়—তার ঠাঁই ক্ষুদ্র দীপ জ্বলে গৃহমাঝে;
আমিও এ ক্ষুদ্রবল, তাই সমর্পিনু, মা, তোমার কাজে।

পৃথিবীতে যোগ্যতা বিচার করিয়া কর্ম-ভার গ্রহণ করিতে হইলে বিস্তর লোককে অলস বসিয়া থাকিতে হইত। গুরুতর কর্তব্য যখন সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং কোন যোগ্য ব্যক্তি যখন তাহা বহন করিতে প্রস্তুত না থাকেন, তখন বলদাতা বিধাতার প্রতি নির্ভর করিয়া একান্ত বিনয় অথচ দৃঢ় সংকল্পের সহিত তাহা গ্রহণ করিবার জন্য ক্ষুদ্র-শক্তি ব্যক্তিরও প্রস্তুত থাকা কর্তব্য, এই মনে করিয়াই আমরা ভারতীর সম্পাদকত্ব-ভার স্বীকার করিলাম। ইহাতে যদি আমাদের কিছুমাত্র অহংকার প্রকাশ পাইয়া থাকে আশা করি পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্বক মার্জনা করিবেন;

ভারতীর সম্পাদকত্ব গ্রহণ—এই একটি কর্তব্যের মধ্যে জননীর ভার লাঘব, এবং জন্মভূমির কার্যসাধন, এই দুইটি উদ্দেশ্য একত্র মিলিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম উদ্দেশ্যটি একমাত্র আমাদের, তাহা ব্যক্তিগত—পাঠকসাধারণের সহিত তাহার কোন যোগ নাই, এবং সেজন্য তাঁহাদের নিকট সহানুভূতি প্রত্যাশা করিতে আমরা সাহস পাই না। কিন্তু দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটিতে সর্বসাধারণের সহিত আমাদের সম্বন্ধ আছে; সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমরা অসংকোচে সাধারণের সহায়তা ও উৎসাহ প্রার্থনা করিতে পারি। যদি আমাদের দুর্বল হস্তেও ভারতীর পূর্ব গৌরব রক্ষিত হয়, তবে তাহাতে আমাদের অহংকার বৃদ্ধি হইবে না, কেবল এইমাত্র প্রমাণ হইবে যে বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রের উর্বরতাগুণেই বহু দিনের এই বনস্পতি নানা বিঘ্ন সত্বেও সতেজে জীবনধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছে।"

ভারতীর ১২৯১ সালের বৈশাখ মাসে স্বর্ণকুমারী লিখিত যে 'ভূমিকা' প্রকাশিত হয় তার উদ্দেশ্যের সঙ্গে বর্তমান 'ভূমিকা'র উদ্দেশ্যাবলীর বিশেষ সম্পর্ক লক্ষিত হয়। বোঝা যায় হিরণ্ময়ী-সরলা জননী-প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণে অধিকতর সমুৎসুক। হিরণ্ময়ীর 'ভূমিকা'র পর সরলা দেবীর একটি 'নিবেদন' ১৩০২ সালের ভারতীর বৈশাখ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল; সরলা দেবী তখন মহীশূরে ছিলেন বলে এই রচনাটি 'নবীন, দূরস্থ সম্পাদকের নিবেদন। মহীস্থর।' এই শিরোনামে মুদ্রিত হয়। সরলা দেবী বলেছেন, "আমরা কেন এ সম্পাদকত্ব গ্রহণ করিলাম? যোগ্যতর হস্তে যাহা পরিচালিত হইয়া আসিতেছিল, কি ধৃষ্টতায় আমরা তাহার ভার লই? ধৃষ্টতা নহে, আত্মম্ভরিতা নহে, মাতৃভূমির প্রতি একান্ত অনুরাগে শুধু এ ব্রত গ্রহণে সাহসী হইয়াছি। যখন দেখা গেল পূজনীয়া মাতাঠাকুরানী ইহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, আমাদের তরুণ স্কন্ধে তাঁহার ভার যদি বহন না করি তবে ইহার সম্পূর্ণ বিলোপ করিতে হইবে, তখন বিবেচ্য হইল এ কর্তব্য একেবারে বিসর্জন দেওয়া ভাল কি আমাদের দুর্বল স্কন্ধেও উঠাইয়া লওয়া ভাল।" বলাবাহুল্য তাঁরা এই দুরূহ কর্তব্যভার বহন করতে এগিয়ে এলেন। যে যে কারণে ভারতীর অস্তিত্বের পক্ষপাতী ছিলেন সরলা দেবী তাও উক্ত 'নিবেদনে' বিবৃত হয়েছে। মহীশূরে অবস্থানকালে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন সেখানে সমস্ত দেশে একটি পত্রিকা নেই এবং "ইহার মানে সমস্ত দেশের শ্রেষ্ঠ চিন্তার, শ্রেষ্ঠ আকাঙ্খার, শ্রেষ্ঠ অধ্যবসায়ের নির্গম-প্রণালী নাই।...যে বার্তাবহ কতিপয় চিন্তাশীল হৃদয়ের চিন্তার ও পরিশ্রমের ফল অনুত্থানিযুক্ত বাকী সমস্ত মানবের ঘরে ঘরে বিতরণ করিবে, সে বার্তাবহ নাই তাই যেন বার্তাও কিছু নাই। এ দেশে যাহা নাই দেখিতেছি তাহার দ্বারা আমাদের দেশে যাহা আছে তাহার মূল্য আরও সম্যক অনুভব করিতেছি। যদি বঙ্কিম কোন দিন বঙ্গদর্শন প্রচার না করিতেন তবে কি আজ বাঙ্গালী এ বর্তমান আনন্দের রাজ্যে আসিয়া দাঁড়াইত? ভারতী যদি

বহু কাগজের আবির্ভাব ও তিরোভাবের চাঞ্চল্যের মধ্যে অষ্টাদশ বৎসর ধরিয়া তাহার নিয়োগে সমান অটল না থাকিত তবে কি সে আনন্দ দেশে এতদিন একটানা জাগাইয়া রাখা যাইত? যখন আর সকলে নীরব তখনও ভারতীর কণ্ঠে এ দেশের শ্রেষ্ঠতম চিন্তার ঝঙ্কার শুনা গিয়াছে।…ভারতীর এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে যে স্থান তাহা অন্যকে দিয়া পূরণ করা সহজ হইবে না। সে স্থান যদি একবার শূন্য কর বহুকাল শূন্য থাকিবে, এবং সেই সঙ্গে ভারতীর সহিত লেখক ও পাঠকসূত্রে সম্বন্ধযুক্ত বহু লোকের হৃদয়েও একটা শূন্য রাখিয়া যাইবে। একটা মাসিক পত্রিকা সমস্ত জাতির মিলনক্ষেত্র; প্রতি মাসে মাসে যেন এক বার করিয়া সকলের সহিত সাক্ষাৎ করা যায়—যে যে পাড়ায় থাকে সে তাহার সন্নিকটতম উদ্যানে স্বাস্থ্যোদ্দেশ্যে পরস্পরের সহিত ভাবের আদান প্রদানের সুখোদ্দেশ্যে যায়।… আমাদের সাহিত্যচর্চাই ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের অপেক্ষা আমাদের স্বদেশবৎসল করিয়াছে। ভারতী এই সাহিত্যচর্চার বিশেষ সহায়তা করিয়া আসিয়াছে। অনেক নবীন স্খলিতপদ ভীরু লেখককে উৎসাহ দিয়া হাত ধরিয়া তুলিয়া সাহিত্যজগতে পরিচিত করিয়া দিয়াছে।…তাহার কর্তব্য এখনও সমাধা হয় নাই, তাই তার অপ্রার্থনীয় মৃত্যু নিবারণেচ্ছায় আমাদের যৌবন দিয়া তাহার জরা নিরোধ করিতে এ গুরুভার গ্রহণ করিলাম।"

পূর্বের আলোচনা থেকে জানা যায় ১৩১৫ সাল থেকে স্বর্ণকুমারী পুনর্বার ভারতীর সম্পাদক হলেন; এবং এই সময় থেকে ভারতীর একটি স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়। ঐ বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের ভারতীতে দীনেশচন্দ্র সেনের 'মাসিক পত্রের ত্রুটি' নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। উক্ত প্রবন্ধে দীনেশচন্দ্র যেসকল মন্তব্য করেন সে সম্পর্কে ঐ মাসের সংখ্যাতেই 'সম্পাদকের মন্তব্য' প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয়েছে, "'আমাদের দেশের সঙ্গে আমাদের কোন পরিচয়ই নাই' এ কথা না মানিয়াও এই পরিচয় স্থাপনের জন্য দীনেশবাবু যে পথ দেখাইয়া দিতেছেন তাহা যে অতি উৎকৃষ্ট পথ ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি।… রীতিমত প্রণালীতে দীনেশবাবুর অঙ্গুলিনির্দিষ্ট পথ অবলম্বনে বঙ্গের গ্রামপল্লীতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যদি উপকরণ সংগ্রহ করা যায় তাহা হইলে মাসিক পত্রের যে বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। ইহাদ্বারা এক দিকে যেমন মৌলিক ও সরস প্রবন্ধে জাতীয় সাহিত্য-ভাণ্ডার পরিপুষ্টি লাভ করিবে অন্য দিকে তেমনি প্রবন্ধের অভাবও দূর হইবে। কেবল তাহাই নহে ইহাতে আর একটি বিশেষ মঙ্গল হইবে এই যে, এই উপায়ে নব নব অঙ্কুরশালী প্রতিভাগুলি প্রস্ফুটিত হইতে থাকিবে।" প্রথম যখন ১২৯১ সালে তিনি সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করেন তখন বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশের দিকে তাঁর আগ্রহ ছিল সমধিক, এবার অর্থাৎ ১৩১৫ সাল থেকে গ্রামবাংলা ও 'দেশের সঙ্গে' শিক্ষিত জনসাধারণের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার মহান ব্রতটি গৃহীত হয়। 'সম্পাদকের মন্তব্যে'র একেবারে শেষ অনুচ্ছেদে

তাই স্বীকার করা হয়েছিল, "এইখানে বলা কর্তব্য, আমরা উপরিউক্ত প্রণালীতে ভারতী পরিচালিত করিবার মানসে এখন হইতে উপকরণ সংগ্রহে প্রয়াসী হইয়াছি। শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার এ বিষয়ে আমাদের কতদূর সাহায্য করিতেছেন তাহা তাঁহার গীতিকথাবলী হইতেই পাঠক দেখিতে পাইবেন।" এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে দীনেশ-চন্দ্রের প্রবন্ধটি মুদ্রিত হওয়ার এক মাস আগে দক্ষিণারঞ্জনের 'বাঙ্গালীর গীতিকথা' (ভারতী বৈশাখ ১৩১৫) প্রকাশিত হয়, তাই স্বর্ণকুমারী ও ভারতী পত্রিকা যে এই ব্যাপারে একেবারে নিরুত্তম ছিলেন তা মনে করা যায় না।

১৯১৩ সালের মে মাসে জানকীনাথের মৃত্যু হয়; তাই লেখিকা ১৩২১ সাল পর্যন্ত পত্রিকা সম্পাদনা করে অপরের হস্তে এই গুরুভার অর্পণ করেন। ১৩২২ সালের বৈশাখ সংখ্যার প্রথমে স্বর্ণকুমারী লিখিত যে 'বিদায় গ্রহণ'-সম্পর্কিত রচনাটি প্রকাশিত হয় তা নিম্নরূপ: "বিদায় গ্রহণ। পুরাতন চিরস্থায়ী নহে অথচ তাহার মৃত্যুও নাই। সে বর্তমান নূতনে। পিতামাতা সন্তানে জীবিত, পূর্বস্রোত পরবর্তী স্রোতে প্রবাহিত, অতীত ভবিষ্যতে সম্মিলিত। নূতনে লীন হইতে না পারিলেই পুরাতনের প্রকৃত মৃত্যু।

পুরাতনের প্রধান ধর্ম নূতনকে অনুগামী করা অর্থাৎ পথ দেখান, অন্য কথায় নূতনকে গঠিত করিয়া তোলা। ইহাতে যে সফলতা লাভ করে তাহার জীবনই সার্থক। আমার বহুদিনব্যাপী সাহিত্যসেবায় যদি এই উদ্দেশ্য কথঞ্চিৎ পরিমাণেও সার্থক হইয়া থাকে তবেই আমি ধন্য। কিন্তু সে বিচারের ভারও নূতনের হস্তে।

সংসারে কোন সংকল্পই, কোন সাধনাই প্রায় বাধাবিঘ্নহীন নহে। আমার পক্ষেও ভারতীর সম্পাদন কার্য নিষ্কণ্টক কর্তব্যপালন ছিল না। পত্রিকা সম্পাদনের অর্থই, পাঁচ জনকে লইয়া পাঁচ জনের হইয়া কাজ করা; এই কাজের মধ্যে একটি সেরা কাজ শ্রেষ্ঠ লেখকদিগের দ্বারস্থ হওয়া, অর্থাৎ ভিক্ষা করা। কোন পুরবালার পক্ষে এ কার্য কিরূপ অসম্ভব তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। ভারতীর সৌভাগ্য এই যে—এ বিষয়ে বিশেষভাবে তাহাকে মনোযোগ প্রদান করিতে হয় নাই। তবে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, যেখানে অকুণ্ঠিত প্রার্থনায় বড় আশা করিয়া হাত পাতিয়াছি সেখানেও অধিকাংশ সময় হতাশ্বাসের দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে হইয়াছে। আবার আশাতীত স্থল হইতেও স্বতঃপ্রবৃত্ত সহায়তা লাভে হৃদয় কৃতজ্ঞতাপূর্ণ আশ্বস্ত হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপেই বুঝি জীবনের তৌলদণ্ডে আশা-নৈরাশ্যের পরিমাণ সমান থাকিয়া যায়।

সুরুচিসম্পন্ন সাহিত্যের মধ্য দিয়া জ্ঞানের ক্ষেত্র ও মনের প্রসার বৃদ্ধি করাই ভারতীর প্রধানতম কর্তব্য ছিল; আর আনুষঙ্গিক একটি কর্তব্য ছিল, নূতন লেখকদিগকে গড়িয়া তোলা। গুপ্ত প্রতিভাকে ফুটাইয়া তুলিতে ভারতী কোন দিন পরিশ্রমকাতর হয় নাই।

যে লেখার মধ্যেই কোন একটু সার পদার্থ মিলিয়াছে তাহাই মার্জিত সুশোভিত আকারে ভারতীর পত্রে স্থান লাভ করিয়াছে।

যখন এই সম্পাদন ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলাম তখন ফলাফল লাভক্ষতি গণনা করিয়া প্রবৃত্ত হই নাই। কর্মের আনন্দই কর্মে উত্তেজিত উৎসাহিত করিয়াছিল। আজ সে উৎসাহ-উত্তেজনার দিন ফুরাইয়া গিয়াছে। আজ আমি বড়ই একাকী, বড় অসহায়; আজ শ্রান্তক্লান্ত দেহমন একান্তই নিবৃত্তিলোলুপ।

কিন্তু প্রবৃত্তিতে আনন্দ আছে নিবৃত্তিতে কি নাই? দানের তৃপ্তি কি গ্রহণের তৃপ্তি হইতে অল্প? পূজার মাহাত্ম্য কি বিসর্জনেই ঘনীভূত নহে? বস্তুতঃ ত্যাগের মধ্যেই মুক্তির আনন্দ বিরাজিত। ব্রত গ্রহণ করিয়া আমি যে উদ্যাপনে অবসর পাইলাম ইহাই আমার কর্মের প্রকৃত পুরস্কার।

বিদায়ের দিনে আজ আমার নয়ন যদিও অশ্রুপূর্ণ কিন্তু হৃদয় নিষ্কাম নিশ্চিন্ত প্রফুল্ল। সযত্নপালিতা ভারতীকে নবীনের উৎসাহযুক্ত, কার্যক্ষম, বলশালী হস্তে সমর্পণপূর্বক আজ আমি মাতার ন্যায়ই কৃতার্থ।

এই ব্রতসাধনে এতদিন যাঁহারা আমাকে কিছুমাত্র সাহায্য করিয়াছেন কর্মজীবনের সেই সহায় বন্ধুদিগকে আজ অবসর গ্রহণ কালে অন্তরের সহিত কৃতজ্ঞতা নমস্কার জ্ঞাপন করি।

পত্রিকা পাঠসূত্রে পাঠকগণও সম্পাদকের সহিত পরিচিত। তাঁহারাও আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন। ভারতীর প্রতি তাঁহারা যেরূপ প্রীতিপূর্ণ অনুরাগ দেখাইয়াছেন তজ্জন্য আমি আপনাকে যথেষ্ট সম্মানিত জ্ঞান করি। তাঁহাদের প্রতি নিবেদন এই, সম্পাদক-পদ ত্যাগ করিলাম বলিয়া ভারতীর সহিত আমার সম্বন্ধ একেবারেই যে ছিন্ন হইয়া গেল এমনটা যেন তাঁহারা মনে না করেন। লেখকরূপে ভারতীর পত্রে তাঁহাদিগের সহিত মধ্যে মধ্যে আবার দেখা সাক্ষাৎ হইবার আশা রাখি।

নবীন সম্পাদক শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় আমার স্নেহভাজন আত্মীয়;—তাঁহার প্রতি আশীর্বাদ এই, বিধাতা এ কার্যে তাঁহাকে কৃতকার্য ও জয়যুক্ত করুন!

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।"

এই রচনার মধ্যে সাহিত্যপত্র সম্পর্কে স্বর্ণকুমারীর ধারণাটি প্রস্ফুটিত; বিশেষত 'সুরুচি-সুশ্রীল সাহিত্যে'র পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি যে ছিলেন বিশেষ আগ্রহী—তাও এই রচনা থেকে জানা যায়। ঐ একই সংখ্যায় ভারতীর অন্যতম সম্পাদক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৮-১৯২৯) 'আমার কথা' নামক যে বিবৃতি দিয়েছেন তার মধ্যেও স্বর্ণকুমারীর উদ্দেশ্যাবলী স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নবীন ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মণিলাল বলেছেন: "পূজনীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী

দেবী ভারতীর সম্পাদনভার আমার হাতে সমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার এ স্নেহের দান আমি পরম শ্রদ্ধার সহিত মাথায় তুলিয়া লইতেছি। এ ভার গ্রহণ করিবার যোগ্যতা আমার আছে কি না জানি না, তবে এইটুকু বলিতে পারি যে ভারতীর গৌরব যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় তজ্জন্য আমার মনপ্রাণ সর্বদা সজাগ রাখিতে চেষ্টা পাইব।......বহুকাল ধরিয়া ভারতীর সেবা করিয়া পূজনীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী আজ অবসর লইতেছেন। এ অবসর তাঁর উচিতমতো প্রাপ্য হইলেও তাঁহাকে বিদায় দিতে আমাদের চিত্ত ব্যথিত ও কাতর হইয়া উঠিতেছে। আমাদের দেশের মাসিক সাহিত্যের এখনো এমন সময় আসে নাই যে তাঁহার মতো এমন একজন নিপুণ সম্পাদককে এত অনায়াসে আমরা ছাড়িয়া দিতে পারি। তাঁহার এই অবসর গ্রহণে মাসিক সাহিত্যসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইল বলিয়া আমার বিশ্বাস। তবে আশার কথা এই যে তিনি আশ্বাস দিয়াছেন, ভারতীর সম্পাদন-ভার ত্যাগ করিলেও তিনি সাহিত্যসেবা এবং ভারতীর সহিত তাঁহার সম্পর্ক একেবারে রহিত করিবেন না।

ভারতীর সেবায় তাঁহার যেরূপ অদম্য উৎসাহ, অসীম আনন্দ, উদার নিষ্ঠা এবং অক্লান্ত পরিশ্রম দেখিয়াছি এমন কোথাও দেখি নাই। যখনি তাঁহার কাছে গিয়াছি দেখিয়াছি পূজারিনীর মতো তিনি ভারতীর পুষ্পপাত্র সাজাইতেছেন। বাংলা দেশের একজন মহিলার পক্ষে ভারতীর মতো একখানা সুনিয়ন্ত্রিত মাসিক পত্রিকার পরিচালনা কিরূপ দুরূহ ব্যাপার তাহা যিনি নিজ চক্ষে উহা না দেখিয়াছেন তিনি বুঝিতে পারিবেন না। এই দুরূহতার সহিত প্রতিদিন তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে দেখিয়াছি; বিপদ আপদেও কখনো তাঁহাকে বিচলিত হইতে দেখি নাই। ভারতীর কাজে তাঁহার এমন একটি পরিপূর্ণ আনন্দ ছিল যাহার বলে সমস্ত বাধাবিঘ্ন এবং নৈরাশ্যকে দলিয়া যাইতে পারিতেন।

সাহিত্যসাধনাই তাঁহার চিরজীবনের সাধনা—ইহা কাহারো অবিদিত নাই। তাঁহার সে সাধনার ফল সম্বন্ধে আলোচনা করার উপযুক্ত স্থান ও কাল ইহা নহে। তবে সকলে এ কথায় আমার সহিত একমত হইবেন যে, তিনি বাংলা দেশের নারীজাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন; এবং বিশ্বনারীসভায় বাঙালী নারীকে বরেণ্য করিয়া তাঁহাদের গৌরব-আসন সুপ্রতিষ্ঠ করিয়াছেন।

বাংলার অনেক নবীন লেখক তাঁহার কাছে সবিশেষ ঋণী। নবীন লেখকগণ যাহাতে নিজেদের গড়িয়া তুলিতে পারে তাহার জন্য তাঁহার একটা আন্তরিক চেষ্টা ছিল। এতটুকু লেখা যাহার ভালো দেখিয়াছেন তাহাকেই মুক্তকণ্ঠে উৎসাহ দিয়াছেন; কেমন করিয়া তাহার লেখা প্রকাশযোগ্য হইবে তজ্জন্য বিধিমত পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার এই অনুগ্রহ অনেক নবীন লেখক ইহজন্মে ভুলিতে পারিবে না। আমিও সেই দলের একজন।

তাঁহার নিকট হইতে সাহিত্যসাধনায় নানা বিষয়ে আমি এত উৎসাহ পাইয়াছি যে বলিয়া শেষ করিতে পারি না। এ ঋণ শুধু কৃতজ্ঞতা জানাইয়া পরিশোধ করিবার নহে।"

প্রথম (১২৯১-১৩০১) ও দ্বিতীয় (১৩১৫-২১) পর্যায়ে যথাক্রমে এগার ও সাত বৎসর বা সর্বমোট আঠার বৎসর ভারতীর সম্পাদনা করেন স্বর্ণকুমারী। ভারতীর দুর্যোগের দিনে তিনি এই মহান ব্রত গ্রহণ করেন ও কেবলমাত্র শারীরিক অপটুতা এবং প্রিয়জনবিয়োগজনিত শোকহেতু এই কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করেন। প্রথম বারে তিনি যখন এই কার্য থেকে বিরত হন তখন দায়িত্ব অর্পিত হয় তাঁরই আত্মজাদ্বয়ের উপর। হিরণ্ময়ী এবং সরলা যখন সম্পাদক ছিলেন না তখনও তাঁরা এই পবিত্র কার্যে জননীকে নানা প্রকারে সহায়তা করেছিলেন, আবার জননীর অসুস্থতার কালে তাঁরা এই গুরুভার গ্রহণ করে স্বর্ণকুমারীর স্নেহঋণ পরিশোধে উদ্যোগী হয়ে উঠেন। ১৩১৫ সালে কন্যা সরলার হাত থেকে পুনর্বার ভারতী সম্পাদনার ভার নিলেন স্বর্ণকুমারী;[১৬১] পরে পতিবিয়োগে অত্যন্ত কাতর হয়ে ১৩২২ সাল থেকে যখন অবসর গ্রহণ করলেন তখন দায়িত্ব সমর্পিত হল মণিলাল ও সৌরীন্দ্রমোহনের উপর। প্রথম দিকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হত আপার সারকুলার রোডের কাশিয়াবাগান বাগানবাড়ি থেকে; পরবর্তী কালের প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা ছিল '১ সানি পার্ক (Sunny Park) ওল্ড বালিগঞ্জ রোড' এবং 'কলিকাতা ৪৪ ওল্ড বালিগঞ্জ রোড'।[১৬২]

ভারতী সম্পাদনাকালীন লেখিকার ব্যক্তিগত জীবনের পরিচয় দিয়েছেন শরৎকুমারী চৌধুরানী তাঁর 'ভারতীর ভিটা' প্রবন্ধে: "কোন কোন দিন বৈকালে আমরা জানকীবাবুর রামবাগানস্থ বাড়ীতে যাইতাম— সেখানে ন-বৌঠাকুরানী, নতুন বৌ, জ্যোতিবাবু, রবিবাবু প্রভৃতিও আসিতেন। ... সকলে মিলিত হইলে ভারতীর জন্য রচিত নূতন প্রবন্ধাদি পাঠ, আলোচনা, রবীন্দ্রনাথের গান হইত, পরে আহারাদি সমাপনান্তে বাড়ী ফিরিতে রাত্রি ১০।১১ টা বাজিয়া যাইত।"[১৬৩] প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে ভারতী সম্পাদনের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ জোতিরিন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলেই তাঁকে সহায়তা করেছিলেন। তাঁদের বাড়িতে এইসকল বিদ্বজ্জনের যে সমাবেশ মাঝে মাঝে ঘটত সেখানে এই পত্রিকার শুভাশুভাদি আলোচিত হত, শরৎকুমারী সে ইঙ্গিতও দিয়েছেন। তাছাড়া তাঁর স্বামীও এই গুরুতর ব্যাপারে সর্বদা তাঁকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছেন, প্রশ্রয়

১৬১ সম্পাদনার বর্তমান পর্যায়ে (১৩১৫-২১) তাঁর সহকারী ছিলেন সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। দ্র বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ৪র্থ, ১৩৫৮, পৃ ১৫৭। কিন্তু ভারতী পত্রিকায় এ সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ দেখা গেল না।

১৬২ ভারতী বৈশাখ ১৩১৯, ক্রোড়পত্র দ্রষ্টব্য।

১৬৩ বিশ্বভারতী পত্রিকা ৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, পৃ ১১২।

দিয়েছেন ; পরবর্তী কালে লেখিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে সেকথা স্মরণ করেছেন, The deep love of literature that he fostered in me urged me to accept the responsibility of editing one of the most intellectual magazines of the day[১৬৪] ইত্যাদি।

তাঁর পত্রিকা সম্পাদন সম্বন্ধীয় শেষ কথাটি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুসরণ করে উল্লেখ করা যায়,—"কেহ কেহ বলেন, বঙ্গমহিলাদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবীই সর্বপ্রথম বাংলা মাসিক পত্রিকা পরিচালন করেন। প্রকৃতপক্ষে এ সম্মান থাকমণি দেবীরই প্রাপ্য ; তিনি ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে (শ্রাবণ ১২৮২) 'অনাথিনী' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের (মতান্তরে ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়ের) জামাতা কাঁঠালপাড়া-নিবাসী সুলেখক অনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের যত্নে 'অনাথিনী' প্রচারিত হইয়াছিল (জন্মভূমি পৌষ ১৩০৩, পৃ ১৬ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু মহিলা-পরিচালিত বাংলা সংবাদপত্র ইহারও পাঁচ বৎসর পূর্বে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহা খিদিরপুর-নিবাসিনী এক বঙ্গমহিলা (সম্ভবত ডবলিউ. সি. বোনার্জীর ভগিনী মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়) কর্তৃক পরিচালিত পাক্ষিক পত্রিকা 'বঙ্গমহিলা' (শনিবারের চিঠি অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৫০ দ্রষ্টব্য)।"[১৬৫] স্বর্ণকুমারীর ভারতীর পূর্ববর্তী মহিলাকর্তৃক সম্পাদিত ও পরিচালিত পত্র-পত্রিকার পরিচয় অন্যত্র[১৬৬] ব্রজেন্দ্রনাথ দিয়েছেন ; সেখান থেকে জানা যায় বঙ্গমহিলা হল মহিলা-সম্পাদিত প্রথম পাক্ষিক সাময়িকপত্র (বৈশাখ ১২৭৭ বা এপ্রিল ১৮৭০)। মহিলা-পরিচালিত প্রথম মাসিক পত্রিকা হল অনাথিনী ; সম্পাদিকা ছিলেন থাকমণি দেবী ; প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১২৮২ বা জুলাই ১৮৭৫। হিন্দুললনা হল 'বঙ্গমহিলা-সম্পাদিত দ্বিতীয় সংবাদপত্র। এই পাক্ষিক পত্রিকা ১২৮৪ সালের মাঘ মাসে (ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮) বারাকপুরের নবাবগঞ্জ হইতে প্রকাশিত হয়।' ফলত দেখা যায় ১২৯১ সালের ভারতীর পূর্বে মহিলাকর্তৃক পরিচালিত কিংবা সম্পাদিত একাধিক সংবাদপত্র ও সাহিত্যবিষয়ক সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়েছিল।

সে যাই হোক, ভারতী পত্রিকাকে কেন্দ্র করে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সম্যক প্রকাশ ও বিকাশ ঘটেছিল। এই পত্রিকায় "শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর কবিতা, উপন্যাস, ছোট গল্প প্রভৃতি প্রায়ই থাকিত। 'ভারতী' প্রকাশিত হইবার পূর্বেই তাঁহার 'দীপনির্বাণ' উপন্যাস বাহির হয় ; তাঁহার দ্বিতীয় পুস্তক 'ছিন্নমুকুল' বোধ হয় ভারতীর তৃতীয় বৎসরে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতে থাকে।"[১৬৭] প্রকৃতপক্ষে ছিন্নমুকুল প্রকাশিত হয় ভারতীর দ্বিতীয়

১৬৪ The Fatal Garland-এর ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

১৬৫ সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ২৮শ, পৃ ১১, পাদটীকা।

১৬৬ সাময়িকপত্র-সম্পাদনে বঙ্গমহিলা, বিশ্বভারতী পত্রিকা ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, পৃ ৩৩-৩৫।

১৬৭ বিশ্বভারতী পত্রিকা ৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, পৃ ১১৩।

বৎসর অর্থাৎ ১২৮৫ সালের পৌষ সংখ্যা থেকে। ভারতীতে প্রকাশিত তাঁর প্রথম রচনা হল বাল্যসখী (ফাল্গুন ১২৮৪, পৃ ৩৮৩) শীর্ষক কবিতাটি, কবিতাটির শেষে লেখিকার নাম নেই, তবে শুধু লেখা আছে 'স্ব'—এই ইঙ্গিত থেকে লেখিকার নাম অনুমান করা যেতে পারে; গ্রন্থাবলীর চতুর্থ ভাগে সন্ধ্যাসঙ্গীত নামক স্বর্ণকুমারীর যে কাব্যটি আছে বাল্যসখী তার তৃতীয় কবিতা, এই প্রমাণ থেকেও এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। ভারতীর প্রথম বৎসরে (১২৮৪) স্পষ্টভাবে লেখিকার নাম-চিহ্নিত অন্য কোনো রচনা প্রকাশিত হয়নি।

স্বর্ণকুমারী সম্পাদিত ভারতী এবং ভারতী ও বালক পত্রিকার প্রথম পর্যায়ে (১২৯১-১৩০১), যেসকল লেখিকার রচনাবলী মুদ্রিত হয় তাঁদের মধ্যে হিরণ্ময়ী দেবী (১৮৬৮-১৯২৫), গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮-১৯২৪), প্রতিভাসুন্দরী দেবী, সরলা দেবী (১৮৭২-১৯৪৫), সরোজকুমারী দেবী (১৮৭৫-১৯২৬), কৃষ্ণভাবিনী দাস, সরলাবালা সরকার, ইন্দিরা দেবী, প্রমীলা বসু (১৮৭১-৯৬), শরৎকুমারী চৌধুরানী (১৮৬১-১৯২০), উমাশশী দেবী, ধনদামোহিনী দেবী, সরলাবালা দাসী (১২৮২-?) প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রমীলাসুন্দরী (১২৯৩ আশ্বিন), প্রিয়ম্বদা দেবী (১২৯৩ কার্তিক), বিনয়কুমারী বসু (১২৯৫মাঘ) প্রভৃতির নামের পর 'বালিকার রচনা' এরূপ মন্তব্য প্রদত্ত; গিরীন্দ্রমোহিনীর নামের পরিবর্তে কখনো কখনো 'কবিতাহার রচয়িত্রী প্রণীত' (১২৯১ জ্যৈষ্ঠ), 'কবিতাহার রচয়িত্রী' (১২৯২ অগ্রহায়ণ) প্রভৃতির ব্যবহার লক্ষিতব্য। সরলাবালা দাসী সম্ভবত ভারতী ও বালকে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন।[১৬৮] স্বর্ণকুমারীর দুহিতা হিরণ্ময়ী প্রধানত বিচিত্র বিষয়সর্বস্ব প্রবন্ধলেখক, তবে তাঁর কবিতা গল্প গান অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে ভারতীর পৃষ্ঠায়; এই পর্বের শক্তিমান কবি গিরীন্দ্রমোহিনীর বিবিধ রচনা ভারতীর প্রায় সমূহ সংখ্যায় মুদ্রিত হত।

জনহিতকর কার্যাবলী

স্বর্ণকুমারীর জীবনের কয়েকটি কীর্তির কথা এবারে আলোচ্য। জগৎ ও জীবনের প্রতি এক বিপুল আগ্রহ নিয়ে তাঁর অনুভূতিশীল হৃদয় একদা চক্ষুরুন্মীলন করেছিল, তার সার্থক পরিণাম লক্ষিত হয় বিবিধ প্রকারের সামাজিক উন্নতিসাধন-প্রয়াসের মধ্যে। বিশেষত সেকালের অনুন্নত ও অশিক্ষিত বঙ্গললনাগণের মানসিক উৎকর্ষ ও সামাজিক মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে তাঁর প্রশংসনীয় উদ্যম ছিল অফুরন্ত। অন্তঃপুর ও বহির্জগৎ এতদুভয়ের মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন তিনি। তজ্জন্য সাহিত্যসেবাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল না ; নারীজাতির সর্বপ্রকারের উন্নতিসাধন, তাদের পৃষ্ঠপোষণ ও নারীকল্যাণ-বিষয়ক নানাবিধ কর্মের মধ্যে তিনি আপনাকে একান্তভাবে উৎসর্গ করেন।

১৬৮ লজ্জাবতী, ভারতী ও বালক অগ্রহায়ণ ১২৯৭।

বলা হয়েছে, "সাহিত্য রচনা ছাড়া অন্যরূপ দেশহিতকর কার্যেও ইহাকে ব্রতী দেখা যায়। ১২৯৩ সালে ইহার কর্তৃক 'সখিসমিতি' নামে একটি মহিলাসমিতি সংস্থাপিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য,—(১) সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের একত্র সম্মিলনে পরস্পর সদ্ভাববর্ধন এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশহিতকর কার্যের অনুষ্ঠান। (২) পিতা অক্ষম হইলে তাঁহার বালিকা কন্যাকে শিক্ষার্থে সাহায্য দান, অনাথ অসহায় বিধবাদিগকে অর্থ সাহায্য দান এবং কোন বিধবা ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে আশ্রয় দান করিয়া যাহাতে তিনি দেশহিতকর কার্যে জীবন দান করিতে পারেন সেইরূপ শিক্ষাপ্রদান।

অন্য কথায় অসহায়া বিধবাদিগের জন্য একটি আশ্রম স্থাপন করা 'সখিসমিতি'র বিশেষ ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তজ্জন্য লক্ষ লক্ষ মুদ্রার আবশ্যক। সমিতির বহু চেষ্টাতেও যে সামান্য অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে তাহাতে সে ইচ্ছা পূর্ণ হইবার নহে। সেই অর্থের সুদ বালিকা-শিক্ষার জন্য এবং কতিপয় দীনা বিধবা রমণীর সাহায্যের জন্য প্রদত্ত হইয়া থাকে। বিধবা রমণীগণের মধ্যে অধিকাংশই সম্ভ্রান্ত গৃহের বিধবা মহিলা ; এখন দুরবস্থায় পড়িয়া এইরূপ দান গ্রহণে বাধ্য হইয়াছেন।

'মহিলা শিল্পমেলা' ইহার আর একটি অনুষ্ঠান। অন্তঃপুর-মহিলাগণের হৃদয়-মনের প্রসারসম্পাদন এবং তাঁহাদের শিল্পোন্নতিসাধন উদ্দেশ্যে কেবল মহিলাদিগের জন্য এবং মহিলাগণ কর্তৃক বৎসরান্তে উক্ত নামে একটি ক্ষুদ্র প্রদর্শনী সংগঠিত হইত। এই প্রদর্শনীতে বোম্বাই আগ্রা দিল্লী জয়পুর কানপুর কৃষ্ণনগর প্রভৃতি ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানের শিল্পাদি রক্ষিত হইত এবং মহিলাগণ তাঁহাদের রচিত নানারূপ শিল্পও প্রেরণ করিতেন। শিল্প-নৈপুণ্যের তারতম্য অনুসারে তাঁহারা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইতেন। অন্তঃপুর-মহিলাগণের নিকট উক্ত মহিলা শিল্পমেলা একটি বিশেষ আনন্দ-উৎসব বলিয়া গণ্য হইত। তাঁহারা প্রতিবৎসর ইহার জন্য আগ্রহভাবে অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন। এই মেলা হইতে যে অর্থলাভ হইত তাহা সখিসমিতি ভাণ্ডারে যাইত।"[১৬৯] এই প্রবন্ধ যখন রচিত হয় তখনো হিরণ্ময়ীর 'বিধবা-শিল্পাশ্রম' গঠিত হয়নি ; তাই বর্তমান উদ্ধৃতির দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটিতে অপূর্ণ ইচ্ছাটি ব্যক্ত হয়েছে। সে যা হোক এইসকল গঠনমূলক কার্য সম্বন্ধে তাঁর প্রচেষ্টা ও সাফল্যের ইতিহাস এবারে আলোচনা করা যায়।

স্বর্ণকুমারী দেবী ১৮৮২ থেকে ১৮৮৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত লেডিস থিয়সফিক্যাল সোসাইটির সভানেত্রী ছিলেন। হেলেনা পেট্রোভনা ব্লাভাটস্কি এবং এইচ. এস. অলকটের উৎসাহে একদা মাদ্রাজের আডিয়ারে থিয়সফিক্যাল সোসাইটির প্রধান কেন্দ্রটি স্থাপিত হয় ; তার অন্যতম প্রধান

১৬৯ বঙ্গভাষার লেখক, হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, বঙ্গবাসী সং ১৩১১, প্রথম ভাগ অষ্টম পরিচ্ছেদ, পৃ ৭৯৯-৮০০।

শাখা ছিল কলিকাতাতে, জানকীনাথ প্রমুখ ব্যক্তি এর উৎসাহী সক্রিয় সদস্য ছিলেন। মহিলাগণের সুবিধার্থে এই সোসাইটির যে মহিলা-শাখা গঠিত হয় স্বর্ণকুমারী তারই সভানেত্রী ছিলেন। পরে থিয়সফির প্রতি তাঁদের অনাস্থা ফুটে উঠে এবং এই সোসাইটির জীবনাবসান ঘটে। 'নিজ নিজ ধর্মে আস্থাবান' থাকার জন্য নেতৃস্থানীয় থিয়সফিস্টগণ উপদেশ দিতেন; 'বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভ্রাতৃভাবের উদ্রেকের নিমিত্ত' তাঁরা আগ্রহী ছিলেন। তাই এরূপ মহান আদর্শের জন্য দেশ-বিদেশের সুধীবৃন্দ স্বভাবত থিয়সফির প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন। লোকাতীতের প্রতি সর্বসাধারণের চিরন্তন কৌতূহল এবং অলোকসামান্য ক্রিয়াকলাপের প্রতি মানুষের অন্তর্নিহিত দুর্বলতাও এই আন্দোলনকে জনপ্রিয় করে তুলে;[১১০] অবশ্য পরে অনেকে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেন। যাই হোক, স্বর্ণকুমারী-জানকীনাথ এবং ঠাকুরপরিবারের অনেকে থিয়সফির ভক্ত ছিলেন। সরলা দেবী এ সম্বন্ধে বলেছেন, "থিয়সফির তখন খুব প্রচার, আমাদের বাড়িতে মহিলা-থিয়সফিক্যাল সভা বসিত। নানা পরিবারের মেয়েদের আনাগোনা ও মাতৃদেবীর সহিত সখিত্ব স্থাপিত হইল। মাদাম ব্লাভাটস্কি ও কর্ণেল অলকট সর্বদা যাতায়াত করিতেন, মহিলাদের উপদেশ দিতেন।"[১১১] রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে জনৈক থিয়সফিস্ট বন্ধুর প্রসঙ্গ অছে; স্বর্ণকুমারীর গল্প-উপন্যাসের কোথাও কোথাও থিয়সফি সম্বন্ধীয় নানা মতামত প্রকাশ করা হয়েছে। থিয়সফির প্রতি লেখিকা কতটা আকৃষ্ট হয়েছিলেন অন্যত্র তার প্রমাণ আছে। জীবনের ঝরাপাতায় সরলা বলেছেন, "আমাদের বাড়িতে থিয়সফির প্রভাবের দিনে কাশী থেকে একজন মাতাজীর প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। মা বলতেন—'সরলার বিয়ে দেব না, ঐ মাতাজীর মত দেশের কাজে উৎসর্গিত থাকবে'।"

নানা দিক থেকে থিয়সফির প্রভাব সুফলপ্রসূ হয়ে উঠেছিল জানকীনাথ ও স্বর্ণকুমারীর জীবনে। হিরণ্ময়ী এ সম্পর্কে বলেছেন, "যে সময়ে অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন মাদাম ব্লাভাটস্কি ভারতবর্ষে আসিয়া থিয়সফি প্রচার করেন সে সময় জানকীনাথ থিয়সফিস্ট সম্প্রদায়ভুক্ত হন। মিঃ হিউমও থিয়সফিস্ট ছিলেন। সেকালে বৎসরান্তে মান্দ্রাজে একটি থিয়সফিক্যাল কনফারেন্স হইত, ভারতবর্ষের সকল অংশ হইতে থিয়সফিস্টগণ সেখানে সম্মিলিত হইতেন। এইরূপ সম্মিলনী হইতেই হিউম সাহেবের একটি ভাবের স্ফুরণ হইল যে, সমগ্র ভারতবাসীর এরূপ পলিটিক্যাল সম্মিলনী গড়িয়া তুলিতে পারিলে ভারতবাসীর অশেষ মঙ্গল হইবে। এই ভাব হইতেই কংগ্রেসের উৎপত্তি এবং সেই ভাবটিকে কাজে পরিণত

১১০ J. N. Farquhar, Modern Religious Movements in India, 1915, pp 208-91.

১১১ ভারতী ফাল্গুন ১৩৩২, পৃ ৬৭৪।

করার মূলে ছিলেন জানকীনাথ ঘোষাল। তিনি তখন কিছুকালের জন্য এলাহাবাদে থাকিয়া Indian Union নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। কংগ্রেসের আরম্ভ হইতে তিনি যে কিরূপভাবে ইহার জন্য কাজ করিয়াছেন, ধন প্রাণ মন দিয়া সকলের তিরস্কার নিগ্রহ সহ্য করিয়া অম্লানচিত্তে কার্য করিয়া গিয়াছেন তাহা সর্বজনবিদিত।" সেকালের শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী মহলে সুপরিচিত থিয়সফিক্যাল সোসাইটি প্রতিবৎসর ডিসেম্বর মাসে প্রধান কেন্দ্রস্থল মাদ্রাজের আডিয়ারে এসে কনভেনশন বা সভা করতেন। "১৮৮৪ সালে কনভেনশনের পরে মাদ্রাজের রাও বাহাদুর রঘুনাথ রাওয়ের গৃহে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মিলিত হয়ে প্রস্তাব করেন যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিবছর অনুরূপ সম্মেলন করলে মন্দ হয় না।"[১৭২] কংগ্রেসের জন্মের ইতিহাস এইরূপ এবং এভাবে থিয়সফি থেকে কংগ্রেসের যে উদ্ভব হল তাকে আশ্রয় করে জানকীনাথ ও তাঁর পরিবারস্থ সকলেই স্বাদেশিকতায় সক্রিয়ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেন।

স্বর্ণকুমারীর স্বদেশানুরাগ সম্বন্ধে সকলেই নিঃসন্দেহ। কংগ্রেসের পঞ্চম (বোম্বাই ১৮৮৯, সভাপতি স্যার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ) ও ষষ্ঠ (কলিকাতা ১৮৯০, সভাপতি ফিরোজ শা মেহতা) অধিবেশনে তিনি প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেছিলেন। বোম্বাই কংগ্রেসে উপস্থিত প্রায় উনিশ শত প্রতিনিধির মধ্যে "মুসলমান সদস্য ছিল প্রায় এক-পঞ্চমাংশ। পণ্ডিতা রমাবাই, লেডী বিদ্যাগৌরী নীলকণ্ঠ, রমাবাই রানাড়ে, নিকম্ব, কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় ও স্বর্ণকুমারী ঘোষাল— এই ছয়জন মহিলাও এবারে কংগ্রেসে যোগ দেন।"[১৭৩] সাহিত্য-সাধক-চরিতমালায় (২৮শ) বলা হয়েছে যে ১৮৯০ সালের কলিকাতার অধিবেশনে স্বর্ণকুমারী ব্যতীত 'আর কোন মহিলা প্রতিনিধিরূপে কংগ্রেসে যোগদান করেন নাই'। কিন্তু যোগেশচন্দ্র বাগল বলেন, "সুসাহিত্যিক স্বর্ণকুমারী ঘোষাল, প্রথম ভারতীয় মহিলা চিকিৎসক কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ পাঁচজন মহিলা এবারকার অধিবেশনে যোগদান করেন। কাদম্বিনী সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সংক্ষেপে কিছু বলেও ছিলেন।"[১৭৪]

লেডিস থিয়সফিক্যাল সোসাইটির কথা আলোচনা প্রসঙ্গে সরলা বলেছেন, "মাদাম ব্লাভাটস্কির দলভঙ্গের পর থিয়সফির প্রতি শ্রদ্ধার যখন মান্দা পড়িয়া গেল, 'সখিসমিতি' নাম দিয়া মাতৃদেবী একটি মহিলাসমিতি স্থাপন করিলেন। থিয়সফিতে দীক্ষিত হওয়ার সূত্রে যাঁহাদের সহিত পরিচয় আরম্ভ হইয়াছিল তাঁহাদের লইয়াই ইহা প্রথম আরম্ভ হইল। নামকরণ রবীন্দ্রনাথকৃত। অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষার জন্য বিপন্ন বিধবা ও কুমারী মেয়েদের বৃত্তি দিয়া শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত

---

১৭২ মুক্তির সন্ধানে ভারত, পৃ ১৪৩।

১৭৩ ঐ পৃ ১৭১।

১৭৪ ঐ পৃ ১৭৫।

করা, অন্তঃপুরে শিক্ষয়িত্রী পাঠান, শিল্পমেলায় মহিলাদের দ্বারা অভিনয় করান প্রভৃতির আয়োজনে সখিসমিতি বিখ্যাত হইয়া উঠিল। হিরণ্ময়ী দেবী এসব কার্যে মাতার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন।"[১৭৫] এই মহিলাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় '১২৯৩ সালের এক বৈশাখী অপরাহ্ণে'।[১৭৬] লেডিস থিয়সফিক্যাল সোসাইটির তিনি যেমন সম্পাদিকা ছিলেন তেমনি এই সখিসমিতির সম্পাদিকার কার্যভারও দীর্ঘকাল বহন করেন। এই প্রসঙ্গে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের একটি মন্তব্য স্মরণযোগ্য, "স্বর্ণকুমারী দেবী যখন স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার করিবার জন্য বঙ্গমহিলাদিগকে লইয়া 'সখিসমিতি' নামক সমিতি স্থাপন করেন তখন হিরণ্ময়ী দেবীই কর্মকর্ত্রীরূপে সমিতির সকল কার্য নির্বাহ করিতেন" ইত্যাদি। ১২৯৮ সালের ভারতী ও বালকের পৌষ সংখ্যায় সখিসমিতির যে বিবরণী মুদ্রিত হয়েছে সেখানে সখিসমিতির 'কর্ত্রীসভার সখিগণ'-এর একটি তালিকা আছে, তার মধ্যে স্বর্ণকুমারীর নাম সম্পাদিকারূপে ঘোষিত হয়েছে, অন্যান্য সাধারণ সদস্যগণের মধ্যে হিরণ্ময়ীর নামও পাওয়া যায়।

উপর্যুক্ত বিবরণীতে[১৭৭] প্রাপ্ত 'সখিসমিতির উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী' এইরূপ: "১। সম্ভ্রান্ত মহিলাদিগের সম্মিলন ও সদ্‌ভাববর্ধন। ২। যে কোন সঙ্গতিহীনা, কি বিধবা কি কুমারী—সখিসমিতির উদ্দেশ্যানুমোদিত সদনুষ্ঠান ব্রতপালনে ইচ্ছুক তাহাকে আশ্রয় ও শিক্ষাপ্রদান; অন্ততঃ অনাথাদিগকে সাধ্যমত অর্থসাহায্য করা। ৩। সমিতির পালিতাগণ সুশিক্ষিতা হইলে তাহাদিগকে বেতন দিয়া অন্তঃপুরের শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার।" আবার বলা হয়েছে, "সখিসমিতির উদ্দেশ্য—সঙ্গতিহীনা কুমারী ও বিধবা বালিকাদিগকে প্রতিপালন শিক্ষাদান ও স্থলবিশেষে অর্থ সাহায্য করা,—এবং পরে অবস্থা অনুকূল হইলে অর্থাৎ অর্থের সুবিধা হইলে সেই শিক্ষিত বালিকাদিগকে বেতন দিয়া অন্তঃপুরের শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা।…বোম্বাই বিভাগে পণ্ডিতা রমাবাই যেরূপ বিধবাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন, যে কোন বিধবা ইচ্ছা করিলেই যেমন সেখানে আশ্রয় পাইতে পারেন, সেই অনুকরণে এখানেও একটি অনাথাশ্রম স্থাপন করা সমিতির প্রাণগত আকাঙ্ক্ষা।" পরবর্তী কালে তাঁর এই ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছিল 'বিধবা-শিল্পাশ্রমে'র মধ্যে।

অতঃপর সখিসমিতির সাফল্য সম্বন্ধে যে দু-একটি তথ্য জানা যায় তা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১২৯৮ সালের 'পৌষ মাস হইতে সমিতি ছয়টি বালিকার ভরণপোষণ ও বিদ্যাশিক্ষার ভার গ্রহণ' করেন এবং 'গত বৎসর পর্যন্ত সখিসমিতির তত্ত্বাবধানে চারিটি বালিকা

১৭৫ ভারতী ফাল্গুন ১৩৩২, পৃ ৬৭৪।

১৭৬ বঙ্গের মহিলা কবি, পৃ ৫২।

১৭৭ ভারতী ও বালকের ১২৯৮ সালের পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত বিবরণীটির প্রয়োজনীয় অংশ পরিশিষ্টে প্রদত্ত হল।

ছিল ; উক্ত বালিকা চারিটির ভরণপোষণ ও বিদ্যাশিক্ষার ব্যয় নির্বাহিত' হয়েছিল সখি-সমিতির দ্বারা। এ তথ্য পাওয়া যায় সখিসমিতির উল্লিখিত বিবরণী থেকে। এর পর যে আয়ব্যয়ের হিসাব দেওয়া হয়েছে সেখানে আছে 'শশিপদবাবুর স্কুলে দেওয়া দুইটি বালিকা', 'বেথুন স্কুলে দেওয়া ৪টি বালিকা' এবং 'অপর দুইটির (Day Scholar)' কথা। ১২৯৮ সালের ভারতী ও বালকের মাঘ সংখ্যার শেষে যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে তাতে সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী জানিয়েছেন, "সখিসমিতির একটি বালিকা এইবার এন্ট্রেন্স পরীক্ষা দিয়াছেন। তিনি এখন হইতে অন্তঃপুরে শিক্ষাদান করিতে পারিবেন। যাঁহারা এইরূপ শিক্ষয়িত্রী চাহেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।" নীচে কাশিয়াবাগানের ঠিকানা দেওয়া হয়েছিল। উক্ত বৎসরের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার শেষে সখিসমিতির আয়ব্যয়ের যে হিসাব দেওয়া হয়েছে তার মধ্যেও শিক্ষার্থে 'শশিপদবাবুর স্কুলে দেওয়া দুইটি বালিকা'র কথা আছে ; আরও দুটি বালিকার কথা পাওয়া যায়, এঁদের মধ্যে একজন জনৈক মহিলার অনুগ্রহ লাভ করে তাঁর গৃহে স্থান লাভ করেছিলেন। হিরণ্ময়ী দেবী স্বয়ং 'কয়েকটি বালিকাকে নিজগৃহে স্থান দিয়া তাহাদের ভরণপোষণ ও শিক্ষার সকল ভারও গ্রহণ' করেছিলেন। [১৭৮] সখিসমিতির প্রতিষ্ঠা-পূর্ববর্তী কালের অপর একটি মহিলাসমিতির পরিচয় পাওয়া যায়। ১২৯২ সালের ভারতীর বৈশাখ সংখ্যায় 'একটি প্রস্তাব' প্রকাশিত হয়। সখিসমিতির কথা আলোচনা প্রসঙ্গে উক্ত 'একটি প্রস্তাবে' বলা হয়, "আমাদের বর্তমান অবস্থায় এই সম্মিলনী দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার ভিত্তি যেমন দৃঢ় হইবার সম্ভাবনা অন্য উপায়ে তাহা হওয়া সম্ভব মনে হয় না। স্ত্রীলোকদের এইরূপ সম্মিলনী যে বঙ্গদেশে একটা আকাশকুসুমমাত্র, একটা যে নিতান্ত নূতন কথা তাহাও নহে। কিছুদিন হইতে বঙ্গ-মহিলা-সমাজ নামে শিক্ষিত ব্রাহ্ম স্ত্রীলোকদিগের একটি সম্মিলনী সভা স্থাপিত হইয়াছে।" সম্ভবত 'বঙ্গ-মহিলা-সমাজ' নামক এই ব্রাহ্ম মহিলা-সভাটি ছিল সখিসমিতির আদর্শস্থানীয়। ১২৯৫ সালের ভারতী ও বালক পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় সখিসমিতি সম্পর্কে যে বিবৃতি প্রকাশিত হয় তার এক স্থানে বলা হয়েছিল, "কেহ কেহ সখিসমিতিকে ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের সমিতি বলিতে চাহেন। ইহার অনেক সখী ব্রাহ্ম ইহা অস্বীকার করি না ; কিন্তু হিন্দু সখীরও ইহাতে অভাব নাই। প্রকৃতপক্ষে ইহার সহিত সাম্প্রদায়িকতার কোন যোগ নাই— দেশের সম্ভ্রান্ত মহিলামাত্রেই ইহাতে যোগদান করিতে পারেন এবং করিয়াছেন।" সখিসমিতির পূর্বে স্থাপিত বঙ্গ-মহিলা-সমাজ একান্তভাবে 'ব্রাহ্ম স্ত্রীলোকদিগের' সম্মিলনী সভা ছিল বলে সর্বসাধারণের নিকট উপর্যুক্ত বিবৃতি প্রদান করা আবশ্যক ছিল।

১৭৮ বঙ্গের মহিলা কবি, পৃ ৫১।

সখিসমিতি দিনে দিনে পত্রেপুষ্পে শ্রীময়ী হয়ে উঠতে থাকে। এর প্রতিষ্ঠার অল্পকাল পরে ১২৯৫ সালের ১৫ পৌষ তারিখে সখিসমিতিরই তত্ত্বাবধানে প্রথম 'মহিলা শিল্পমেলা' হয়েছিল। ১২৯৫ সালের ভারতী ও বালকের বৈশাখ সংখ্যায় 'মহিলা শিল্পমেলা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তার প্রথমাংশে সখিসমিতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু-একটি কথা বলা হয়েছে। সখিসমিতির আর্থিক সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত যে ব্যবস্থাদি অবলম্বিত হয় তার মধ্যে শিল্পমেলার উদ্যোগটি অন্যতম। উক্ত প্রবন্ধের শেষাংশে আছে—"সখীগণ আপনাদের মধ্যে অতিরিক্ত চাঁদা তুলিয়া সেই অর্থ হইতে বৎসর বৎসর একটি মহিলা শিল্পমেলা খুলিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। / দেশীয় মহিলাদের ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যাদি ও মহিলাগণ-বিরচিত নানাবিধ শিল্পাদি এই মেলায় প্রদর্শিত ও বিক্রীত হইবে। বিক্রয়ের লাভ উল্লিখিত উদ্দেশ্যে ব্যয় হইবে, আর মূলধন পর বৎসরের মেলার জন্য রক্ষিত হইবে।... এই মেলা দ্বারা সমিতির অর্থবৃদ্ধি ভিন্ন আরও অনেক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। এ মেলার সহিত পুরুষের কোন সংস্রব নাই, পুরুষপ্রবেশ এখানে নিষেধ। সুতরাং পুরমহিলাগণ এখানে আসিয়া সহজেই শিল্পাদি দর্শন ও ক্রয়বিক্রয় করিতে পারিবেন এবং তাহা দ্বারা সখিসমিতির একটা প্রধান উদ্দেশ্য মহিলাগণের মধ্যে মেলামেশা তাহাও সফল হইবে। দ্বিতীয়তঃ মহিলাগণ যাহাতে শিল্পের উন্নতি বিষয়ে যত্নবতী হয়েন সেইজন্য এই সমিতি হইতে সেলাইয়ের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে এক একটি পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।...এইরূপ শিল্পমেলায় মহিলাগণের শিল্পেরও উন্নতি হইবে। তাঁহাদের যে কোন প্রকার উন্নতিই সমিতির লক্ষ্য।" ঐ বৎসর মাঘ মাসে যে শিল্পমেলা অনুষ্ঠিত হবে তার ঘোষণা করা হয়েছিল বর্তমান প্রবন্ধে: "সমিতি আগামী মাঘ মাসে এই মেলা খুলিবার ইচ্ছা করেন।" কিন্তু মেলাটি ঐ বৎসর পৌষ মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল কারণ ১২৯৫ সালের ভারতী ও বালকের পৌষ সংখ্যায় 'মহিলা শিল্পমেলা' নামক যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় তার মধ্যে আছে, "গত ১৫ই পৌষ কলিকাতায় বেথুন স্কুল বাটীতে লেডী বেলী কর্তৃক বেলা দ্বিপ্রহরের সময় এই মেলা খোলা হয়, মেলা খুলিবার পরই লেডী ল্যান্সডাউন আগমন করেন। আমরা আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি কলিকাতার অধিকাংশ সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলাগণ এই মেলায় আগমন করিয়াছিলেন। মেলা তিন দিন খোলা ছিল এবং ১২টা হইতে ৩টা অবধি মেলার দোকান খোলা থাকিত। বিক্রেতা ক্রেতা ও দর্শক সকলেই এই মেলায় মহিলা।" যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের বঙ্গের মহিলা কবি গ্রন্থে এই মেলার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা এইরূপ—"এই সমিতি হইতে মহিলা শিল্পমেলা নামক প্রতিবৎসর একটি মেলার অনুষ্ঠান হইত। সেকালের অন্তঃপুরিকাদের নিকট ইহা একটি বিশুদ্ধ আনন্দের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিল; তাঁহারা ইহার অধিবেশনের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিতেন। এইরূপ নির্দোষ

আমোদপ্রমোদ তাঁহারা ইতিপূর্বে উপভোগ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। 'রমণীতে বেচে রমণীতে কেনে লেগেছে রমণীরূপের হাট'।" এই শিল্পমেলায় সাতজন মহিলা উৎকৃষ্ট শিল্পসৃষ্টির জন্য পুরস্কৃত হওয়ার উপযুক্ত বিবেচিত হন, 'কিন্তু দানপ্রাপ্ত শিল্পের জন্যই সখিসমিতির পুরস্কার প্রদত্ত, সুতরাং ৫জন মাত্র এই কারণে সখিসমিতি হইতে পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন'। উক্ত ১২৯৫ সালের পৌষ সংখ্যার শেষে শিল্পমেলা সম্বন্ধে যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ মুদ্রিত হয় তার সবটুকু নিয়ে পাদটীকায়[১৭৯] প্রদত্ত হল, ঐসকল তথ্য থেকে শিল্পমেলার প্রথম বৎসরের আর্থিক অবস্থা এবং অন্যান্য কার্যের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যাবে। মজুত অর্থের পরিমাণ থেকে মেলার গৌরবময় সাফল্য প্রমাণিত হয়েছে। পুরস্কৃত মহিলাগণের মধ্যে কবি গিরীন্দ্রমোহিনীও ছিলেন; পূর্বেই বলা হয়েছে স্বর্ণকুমারীর সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্যের কথা, স্বর্ণকুমারীর সঙ্গে তাঁর 'বিরহ-মিলন' সখি-সম্পর্ক ছিল। পৌষ সংখ্যার (১২৯৫) 'মহিলা শিল্প-মেলা' প্রবন্ধে গিরীন্দ্রমোহিনীর নির্মিত 'মাটির গ্রাম্য ছবিটির বর্ণনা' দেওয়া হয়েছে, "একজন রমণী একখানি মাটির গ্রাম্য ছবি নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। অনেকেই এখানি কৃষ্ণনগরের মনে করিয়াছিলেন। দুখানি খড়ের ঘর। প্রাঙ্গণে রমণী ধান শুখাইতেছেন। গোয়ালে গরুটা মুখ বাড়াইয়া আছে, অদূরে একজন মাথায় কাঠ লইয়া আসিতেছে। খাঁচায় একটা

১৭৯ নিম্নলিখিত মহিলাগণ তাঁহাদের শিল্পের নিমিত্ত পুরস্কার পাইয়াছেন।

মিস মালুক, রঞ্জিতের বেত্রসেতুর ছবির জন্য প্রথম পুরস্কার পাইয়াছেন।

শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দাসী, ক্ষীরের ফুলশয্যা এবং খোদিত প্রস্তর-ছাপের জন্য দ্বিতীয় পুরস্কার পাইয়াছেন।

শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, ইনিই মাটির গ্রাম্য ছবি এবং কার্পেটের দেবী চৌধুরাণী প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইনি তৃতীয় পুরস্কার পাইয়াছেন।

মিস সরকার, সুতার সূক্ষ্ম কারুকার্যের জন্য ইনি চতুর্থ পুরস্কার পাইয়াছেন।

শ্রীমতী বসন্তকুমারী দাস, জরীর কাজের জন্য পঞ্চম পুরস্কার পাইয়াছেন।

মহিলা শিল্পমেলা সম্বন্ধীয় আয় ও ব্যয়।

তাং ৯ মাঘ ১২৯৫ সাল।

আয়।

নগদ দান খাতে	২৪৩২
মেলায় আয়	১৪৭৪৸০১৫
(দানের দ্রব্যাদি, মেলায় ক্রীত দ্রব্যাদি ও টিকিট বিক্রয়ের মূল্য এবং কমিশন প্রভৃতি সমস্ত লইয়া)	
	৩৯০৬৸০১৫
মেলায় মোট ব্যয়	১০৪০৸০
মজুত	২৮৬৬৲১৫

পাখী, দাওয়ায় একটা বেড়াল, পাশে দোলনায় ছেলে শুইয়া আছে।" ছবিটাই যেন গিরীন্দ্রমোহিনীর একটি গ্রামীণ বিষয়নির্ভর কবিতা। স্বর্ণকুমারী সখীর সাফল্যে নিশ্চয় উল্লসিত ও গৌরবান্বিত; তাঁর সেই আনন্দ ধরা পড়েছে পৌষ সংখ্যা-শেষের যে বিবৃতিটি পাদটীকায় উদ্ধৃত হয়েছে তার মধ্যে, সেখানে শিল্পীর নামোল্লেখের পরে 'ইনিই' শব্দটির উপর জোর (emphasis) দেওয়া হয়েছে।

১২৯৫ সালের মেলার আর একটি স্মরণীয় ঘটনা হল রবীন্দ্রনাথের 'মায়ার খেলা'র অভিনয়: "মেলার পর বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত মায়ার খেলা নামে একখানি গীতিনাট্য বালিকাগণ কর্তৃক অভিনীত হইয়াছিল, দর্শক মহিলাগণ অনেকেই অভিনয় দর্শনে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন।"[১৮০] বাংলা দেশের নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসে মায়ার খেলার অভিনয় বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা কারণ এর দর্শক-শ্রোতা-অভিনেতা সকলেই ছিলেন মহিলা। দুর্গামোহন দাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা ও ডক্টর প্রসন্ন কুমার রায়ের পত্নী সরলা রায়ের অনুরোধে নাটিকাটি রচিত হয় বলে গ্রন্থটি তাঁর নামেই উৎসর্গীকৃত। এ গ্রন্থের উপস্বত্ব লাভ করেন সখিসমিতি।[১৮১] মহিলা শিল্পমেলায় নাটিকাটির অভিনয়ের উপযোগিতা ও সুবিধা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, "কেবল মেয়েরাই শিল্পমেলায় অভিনয় করিবে বলিয়া বোধ হয় ইহার অধিকাংশ ভূমিকা মেয়েদেরই। আর যে-কয়েকটি পুরুষচরিত্র আছে, তাহারা এমন নিরীহ যে মেয়েরা সে-অংশ গ্রহণ করিলেও বেমানান হয় না।" গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী এই অভিনয় সম্পর্কে দু-চার কথা বলেছেন; প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ এইরূপ: "বেথুন কলেজে প্রথম উদ্ঘাটিত শিল্পমেলায় যেদিন মহিলাগণ কর্তৃক 'মায়ার খেলা' অভিনয় হয়, এবং মেয়েরা পুরুষদের মতো সম্মুখে গ্যালারিতে বসিয়া সে অভিনয় দর্শন করে, সে কি-এক নূতন আমোদ সকলে অনুভব করিয়াছিলেন।"[১৮২] সরলা দেবীও এই অভিনয়ের একটি কৌতুকাবহ বিবরণ দিয়েছেন, "'মায়ার খেলা'র প্রথম অভিনয় 'সখিসমিতি'তে হয়। সেবার দাদা ও সুরেন স্টেজ ম্যানেজার ছিলেন। মায়াকুমারীদের মাথায় অলক্ষ্য তারে বিজলীর আলো জ্বালান তাঁদের একটি বিশেষ কারিগরি ছিল।...মেলাটি বেথুন স্কুলের চাতালে হয়। মেলা সুন্দর করে সাজান, স্টেজ বাঁধা, স্টল ঘেরা প্রভৃতি সব কাজেই দাদাদের ব্যাপৃত থাকতে হয়েছিল কদিন ধরে।"[১৮৩]

১৮০ মহিলা শিল্পমেলা, ভারতী ও বালক পৌষ ১২৯৫।

১৮১ রবীন্দ্রজীবনী ১ম, পৃ ২৪৪।

১৮২ ভারতী জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩, পৃ ২৪৪।

১৮৩ জীবনের ঝরাপাতা, পৃ ৫৯।

১২৯৬ মাঘ সংখ্যার ভারতী ও বালকে মহিলা শিল্পমেলার যে বিজ্ঞপ্তি মুদ্রিত হয় (পৃ ৫৮০) তা থেকে জানা যায়, "আগামী মার্চ মাসে এই মেলা হইবে। আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে জানাইতেছি মাননীয়া লেডী ল্যান্সডাউন মহোদয়া মেলায় উপস্থিত থাকিয়া মেলা খুলিবেন।" ঐ বৎসরের চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত মেলার বিবরণে বলা হয়েছিল, "গত ১২ই চৈত্র হইতে ১৫ই চৈত্র পর্যন্ত ২৯৭ নং আপার সারকুলার রোডের বাগানবাটীতে মহিলা শিল্পমেলার দ্বিতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।…প্রধান শিল্পী শ্রীমতী ভুবনমোহিনী ও গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী। ইহারাই শিল্পের নিমিত্ত প্রথম পুরস্কার পাইবেন।…আমাদের দেশের রমণীগণের নিকট কেবল নহে; লেডী ল্যান্সডাউন লেডী বেলী প্রমুখ সম্ভ্রান্ত বিদেশীয় মহিলাদিগের নিকটে পর্যন্ত এবং স্বদেশীয় ও বিদেশীয় পুরুষদিগের নিকট পর্যন্ত সমিতি যে সহানুভূতি ও সহায়তা লাভ করিয়াছে তজ্জন্য তাহার আহ্লাদ ও কৃতজ্ঞতার সীমা নাই।" যে বাড়িতে এইবার মেলা অনুষ্ঠিত হয় সম্ভবত সেটি ঘোষালপরিবারের, কারণ কাশিয়াবাগানের বাড়িটি ছিল আপার সার্কুলার রোডের উপর সেকালের একটি বাগানবাড়ি; ঐ বৎসরের ভারতী ও বালক পত্রিকার শেষে এমন একটি অলঙ্কারের দোকানের বিজ্ঞাপন পাওয়া যায় যার মধ্যে জানকীনাথের স্বাক্ষরযুক্ত প্রশংসাপত্র ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে জানকীনাথের স্বাক্ষরের পর যে ঠিকানা ও তারিখ দেওয়া হয়েছে তা এইরূপ: Kashiabagan Garden House,/Upper Circular Road, Calcutta./ The 14th November, 1887. (Sd. J. Ghosal). এই ঠিকানা এবং তারিখ উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তের অনুকূল। কথিত শিল্পমেলার দূরপ্রসারী প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন স্বর্ণকুমারী-দুহিতা হিরণ্ময়ী দেবী; প্রতিবৎসর মহিলা শিল্পমেলায় শিল্পপ্রদর্শনী হত এবং "এই প্রদর্শনীর দৃষ্টান্ত হইতেই পরে জাতীয় সম্মিলনীর সময় ভারতশিল্প-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইয়া আসিতেছে।" তিনি এই শিল্পমেলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন, "শিল্পসমিতি সখিসমিতিরই নূতন সংস্করণ। কেবলমাত্র মহিলা সম্মিলন-উদ্দেশ্য সখিসমিতির মধ্যে রাখিয়া উহার অন্যান্য উদ্দেশ্য শিল্পসমিতির অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।…শিল্পশিক্ষাদানই যে শিল্পসমিতির প্রধান উদ্দেশ্য নামেতেই তাহার প্রকাশ।"[১৮৪] প্রসঙ্গক্রমে ভারতী পত্রিকার ১৩০০ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় মুদ্রিত 'সাত বৎসরের সখিসমিতি' প্রবন্ধটি উল্লেখ্য, তন্মধ্যে সখিসমিতির বিবিধ কার্যের পরিচয় পরিবেশিত।

স্বর্ণকুমারীর পরবর্তী নারীকল্যাণমূলক উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর মধ্যে 'বিধবা-শিল্পাশ্রম' অন্যতম। এই ব্যাপারে হিরণ্ময়ী তাঁকে প্রভূত সাহায্য করেন, "কালক্রমে সখিসমিতির আয়ু ফুরাইয়া আসিলে, উহাকে সঞ্জীবিত রাখিবার জন্য হিরণ্ময়ী দেবী ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে রূপান্তরিত

---

১৮৪ হিরণ্ময়ী দেবী, মহিলাশিল্পসমিতি, ভারতী আশ্বিন ১৩১৫।

আকারে বর্তমান প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া তোলেন।"[১৮৫] যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত রচিত বঙ্গের মহিলা কবি গ্রন্থ থেকে জানা যায়, 'সখিসমিতি যখন লুপ্ত হইবার উপক্রম হয় তখন তাঁহার (হিরণ্ময়ী) সঞ্চিত অর্থের উপর নির্ভর করিয়া একটি বিধবা-আশ্রম' খোলা হয়। এই বিধবাশ্রমের উৎপত্তি সম্বন্ধে সরলা দেবী বলেছেন, "উপর্যুপরি অনেকগুলি সন্তানবিয়োগে হিরণ্ময়ীর সন্তান-বাৎসল্য-বুভুক্ষিত হৃদয় সখিসমিতির আশ্রিত কোন কোন অনাথ বা দুরবস্থাপন্ন বালিকাদের নিজের কাছে রাখিয়া পালনের জন্য উন্মুখ হইল। বরাহনগরের শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত বিধবাশ্রমের সহিত এই উপলক্ষ্যে তাঁহার পরিচয় হয়। তাহার পর মাতৃপ্রতিষ্ঠিত ম্রিয়মাণ সখিসমিতি সঞ্জীবিত রাখার চেষ্টায় নাম ও আকারের নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া উহা বর্তমান বিধবা-শিল্পাশ্রমে পর্যবসিত হইল। এই শিল্পাশ্রমের অনতিপূর্বে তিনি অন্তঃপুরমহিলাদের শিক্ষার জন্য একটি কলাভবন খুলিয়াছিলেন। মূল সখিসমিতি ও কলাভবনের সংমিশ্রণজাত এই বিধবা-শিল্পাশ্রম হিরণ্ময়ী দেবীর নিজস্ব কীর্তি।...এখন একটি কমিটির সহায়তায় এই আশ্রমটি পরিচালিত হইতেছে—কমিটির প্রেসিডেন্ট পূজনীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।...তাঁর (হিরণ্ময়ীর) দেশসেবার অনুপ্রেরণা মাতৃভক্তি হইতেই আসিয়াছিল, মাতার কীর্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সখিসমিতিকে কালোপযোগী রূপান্তর দেওয়ার প্রচেষ্টায় বিধবাশ্রমের জন্ম।"[১৮৬] এ সম্পর্কে যোগেশচন্দ্র বাগলের মন্তব্য উদ্ধৃত হল, "আশ্রমটি সখিসমিতির অনুক্রম। সখিসমিতির উদ্দেশ্য সঞ্জীবিত রাখিবার জন্য স্বর্ণকুমারী দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যা হিরণ্ময়ী দেবী ১৯০৬ সনে রূপান্তরিত আকারে বিধবা-শিল্পাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। মৃত্যুকাল (১৯২৫) পর্যন্ত তিনি ইহা পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ইহা 'হিরণ্ময়ী বিধবা-শিল্পাশ্রম' নাম পরিগ্রহ করে। অতঃপর স্বর্ণকুমারী দেবীর অধ্যক্ষতায় ইহা পরিচালিত হয়। আশ্রমের অধ্যক্ষ-সভার নাম সখি-শিল্পসমিতি। স্বর্ণকুমারী দেবী ১৯৩১ সনে তাঁহার রচিত যাবতীয় পুস্তকের স্বত্ব এই সমিতিকে দান করেন।"[১৮৭]

১২৯৮ সালের ভারতী ও বালকের পৌষ সংখ্যায় মুদ্রিত সখিসমিতির ত্রিবিধ উদ্দেশ্যের মধ্যে দ্বিতীয়টি উল্লিখিত হল, "যে কোন সঙ্গতিহীনা, কি বিধবা কি কুমারী—সখিসমিতির উদ্দেশ্যানুমোদিত সদনুষ্ঠান ব্রতপালনে ইচ্ছুক তাহাকে আশ্রয় ও শিক্ষাপ্রদান" ইত্যাদি। ঐ সংখ্যায় অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে এক স্থানে বলা হয়, "বোম্বাই বিভাগে পণ্ডিতা রমাবাই যেরূপ বিধবাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন, যে কোন বিধবা ইচ্ছা করিলেই যেমন সেখানে আশ্রয়

১৮৫ সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ২৮শ, পৃ ২২।

১৮৬ ভারতী ফাল্গুন ১৩৩২, পৃ ৬৭৪-৭৫।

১৮৭ জীবনের ঝরাপাতা, পৃ ২২২।

পাইতে পারেন, সেই অনুকরণে এখানেও একটি অনাথাশ্রম স্থাপন করা সমিতির প্রাণগত আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু দুঃখ এই, এখনো পর্যন্ত সমিতি তাহাতে অপারক। তথাপি আমরা নিরাশ নহি। এই শিশুসমিতির সাহায্যে আমরা যেরূপ দানপ্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতে আমরা দানশীল মহোদয়-মহোদয়াগণের নিকট কৃতজ্ঞ এবং ভবিষ্যতে তাঁহাদের মুক্তহস্ততায় সমিতির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে এইরূপ প্রত্যাশা করিতেছি।" প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই পণ্ডিতা রমাবাইয়ের[১৮৮] সঙ্গে স্বর্ণকুমারী ১৮৮৯ সালের বোম্বাই কংগ্রেসে যোগদান করেন, তাছাড়া সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে থাকার ফলে সেখানকার বিধবাশ্রমের সম্যক পরিচয় তিনি অবগত হয়েছিলেন বলে মনে হয়। বর্তমান প্রবন্ধে পণ্ডিতা রমাবাইয়ের উদ্যম ও কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে তাই কিছু তথ্য পরিবেশন করতে পেরেছিলেন স্বর্ণকুমারী। 'পণ্ডিতা রমাবাই আমেরিকা হইতে ভিক্ষা আনিয়া প্রায় অর্ধলক্ষ টাকায় বিধবাশ্রম বাটী ক্রয় করিয়াছেন' এবং 'আমেরিকাবাসীগণ এ দেশের বিধবাদিগের সাহায্যে রমাবাইকে মাসিক ১০০০ হাজার টাকা দান করেন'। এইজন্য প্রবন্ধ-শেষে সখিসমিতির সম্পাদিকারূপে লেখিকা দেশীয় বিদেশীয় রমণী ও পুরুষের সহৃদয়তা এবং সহানুভূতির নিকট আকুল আবেদন জ্ঞাপন করেছেন। সে যা হোক, ১৯০৬ সালে এই বিধবা-শিল্পাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হলেও বহু পূর্ববর্তী কাল থেকে অর্থাৎ সখিসমিতির প্রতিষ্ঠার কালে স্বর্ণকুমারী প্রভৃতি উদ্যোগীর মনে যে ঐ বাসনা অঙ্কুরিত হয়েছিল তা বেশ বোঝা যায়। আর্থিক অসামর্থ্য সম্বন্ধে সচেতন থেকেও তাঁরা কখনও হতাশ হননি।

এ প্রসঙ্গে হিরণ্ময়ী দেবী যা বলেছেন তা বস্তুত মূল্যবান, "শিল্পসমিতির প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য বিধবাশ্রম স্থাপন। ইহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য অন্তঃপুরের মহিলাদিগকে বিদ্যা ও শিল্প-শিক্ষাদান।"[১৮৯] শিল্পসমিতি হল সখিসমিতিরই পরিপূরক, তাই তাদের উভয়ের উদ্দেশ্যের মধ্যে ঐক্য লক্ষিত হয়। কথাপ্রসঙ্গে হিরণ্ময়ী জানিয়েছেন বিধবা-শিল্পাশ্রম সম্পর্কে, "এখন (আশ্বিন ১৩১৫ অর্থাৎ আশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রায় দু বছরের মধ্যে) এই আশ্রমে ত্রিশটি কন্যা বাস করেন। তন্মধ্যে অধিকাংশই হিন্দুবিধবা এবং ইহাদের ব্যয়ভার সমিতিই বহন করে। দৈনিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা এখন প্রায় ৫০টি। কিন্তু এই বিদ্যালয়ে প্রবেশলাভের জন্য প্রতিদিন বহু অনাথা বিধবা ও দৈনিক ছাত্রীর আবেদন পাওয়া যাইতেছে।" এই প্রসঙ্গে অর্থাৎ ১৩১৫ সালের ভারতীর আশ্বিন সংখ্যার ২৭৭ পৃষ্ঠায় শিল্পাশ্রমের পরিচালিকাগণের নাম দেওয়া হয়েছে, উক্ত সমিতির সভ্যসংখ্যা সম্পাদিকা হিরণ্ময়ীসহ মোট বাইশ জন; দেখা যাচ্ছে স্বর্ণকুমারীও এঁদের অন্যতম।

১৮৮ পণ্ডিতা রমাবাই (১৮৫৮-১৯২২) ছিলেন একজন Christian missionary, scholar of Sanskrit, social reformer and educationist.—The Collected Works of Mahatma Gandhi, vol XVIII, Government of India, 1965, p 34, F. N. 4

১৮৯ মহিলাশিল্পসমিতি, ভারতী আশ্বিন, ১৩১৫, পৃ ২৭৭।

১৩১৭ সালের ভারতীতে (অগ্রহায়ণ, পৃ ৭০৩) স্বর্ণকুমারী দেবী 'পূজার সময় সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট শিল্পসমিতির বিধবাশ্রমের সাহায্য ভিক্ষা প্রার্থনা' করেন; তার উত্তরে সিমলা পাহাড় থেকে শ্রীমতী জ্ঞানদাবালা মিত্র একটি পত্র ও প্রায় এক শত টাকা প্রেরণ করেন। ভারতীতে প্রকাশিত উক্ত পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত হল: "যে কয়েকটি কারণে আপনার ভিক্ষা প্রার্থনা আমাকে বিচলিত করিয়াছে তাহার একটি এখানে ব্যক্ত করা আবশ্যক মনে করি। হিন্দুবিধবার সাংসারিক দুর্দশা দেখিয়া আজকাল অনেক সুশিক্ষিত লোকসমাজের উচ্চ স্তরে পর্যন্ত বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন; ইহারা বোধ হয় অনুভব করেন নাই অবিকৃত-স্বভাব হিন্দুমহিলার নিকট বিধবার ব্রহ্মচর্যরূপ প্রাচীন সুমহান আদর্শ কতদূর সম্মান ও আদরের বস্তু। ... এই সঙ্কট সময়ে আপনার হিন্দু-বিধবাশ্রম বিধবার আর্থিক অসহায়তা দূর করিবার প্রয়াসী হইয়া সমস্ত হিন্দুনারী-সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছে।"

'শিল্পসমিতির একজন সদস্যা'-প্রণীত 'অন্তঃপুর-কলাভবন—সাপ্তাহিক সম্মিলনী'র একটি বিবরণ পাওয়া যায়;[১২০] তার মধ্যে স্বর্ণকুমারী-হিরণ্ময়ীর সখিসমিতি-বিধবাশ্রম সংক্রান্ত কয়েকটি প্রয়োজনীয় সংবাদ আছে বলে বিবরণীটির কোনো কোনো অংশ উদ্ধৃত হল: "কয়েক বৎসর হইল অন্তঃপুর মহিলাদের শিক্ষার উন্নতিকল্পে মহিলাশিল্পসমিতি কর্তৃক অন্তঃপুর-কলাভবন নামে কলিকাতায় একটি শিক্ষালয় স্থাপিত হইয়াছে। ...যেসকল বালিকারা বিবাহের পর সাধারণ বিদ্যালয়ে যাইতে পারেন না তাঁহাদের জন্যই ইহার বিশেষ উপযোগিতা। এতদ্ভিন্ন যাঁহারা এরূপ অন্তঃপুর শিক্ষালয়েও আসিতে অনিচ্ছুক তাঁহাদের শিক্ষার জন্য বাড়ী বাড়ী শিক্ষয়িত্রী পাঠাইবার উদ্দেশ্যও সমিতির ছিল এবং সেই উদ্দেশ্যে সমিতির প্রতিষ্ঠিত বিধবাশ্রমে কয়েকটি রমণীকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছিল। কিন্তু এখন ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল এই কার্য হস্তে লওয়ায় শিল্পসমিতি ইহা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। এইখানে বলা আবশ্যক ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের প্রবর্তিকা শ্রীমতী সরলা দেবী এবং শিল্পসমিতির প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী উভয়েই পূজনীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা। বস্তুতঃ ২৫।৩০ বৎসর পূর্বে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রতিষ্ঠিত সখিসমিতি নামক সমিতির দুইটি উদ্দেশ্যই দুই ভগিনীতে ভাগ করিয়া লইয়া তাহা সাধনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।" হিরণ্ময়ী তাঁর পূর্বকথিত প্রবন্ধে এই অন্তঃপুর-কলাভবনের কথা উল্লেখ করেছিলেন যেখানে 'প্রতিদিন বহু অনাথা বিধবা ও দৈনিক ছাত্রীর আবেদন পাওয়া' যাচ্ছিল। বিধবা-শিল্পাশ্রমেও যে শিল্প-শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল সেকথা প্রতিষ্ঠানের নামের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

বিধবা-শিল্পাশ্রমের উদ্ভবের ইতিহাস আলোচনাকালে পণ্ডিতা রমাবাইয়ের বিধবাশ্রমের

১২০ ভারতী ভাদ্র ১৩১৯, পৃ ৫৬৩-৬৪।

দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে 'সেবাব্রত' শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪০-১৯২৪ ?) বরাহনগরে যে হিন্দু-বিধবাশ্রম স্থাপন করেন তার কথাও উল্লেখযোগ্য : "সেই আশ্রমে বহুসংখ্যক বিধবা শিক্ষা পাইয়া স্বাধীনভাবে সদুপায়ে উপার্জনক্ষম হন। সেবাব্রতের এই আশ্রমটি চল্লিশ বৎসর জীবিত ছিল। এই সময়ের মধ্যে তিনি চল্লিশটি বিধবার বিবাহ দিতে সক্ষম হন। তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি তিনি দান করিয়া যান।"[১১১] এই আশ্রমেরই আদর্শে হিরণ্ময়ী দেবীর বিধবা-শিল্পাশ্রম পরিকল্পিত হয়—এরূপ মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। ১২৯৬ সালের ভারতী ও বালক পত্রিকায় (পৌষ, পৃ ৫২৩) 'বরাহনগর হইতে প্রাপ্ত' 'বরাহনগর মহিলাশ্রম' শীর্ষক প্রবন্ধটি মুদ্রিত হয় ; ৫২৪ পৃষ্ঠায় প্রবন্ধের শেষে পাদটীকার মধ্যে পত্রিকার সম্পাদিকা হিসাবে স্বর্ণকুমারী মন্তব্য করেছেন, "আমরা সর্বান্তঃকরণে বরাহনগর মহিলাশ্রমের কল্যাণ প্রার্থনা করি। দেশে এরূপ যত আশ্রম হয় ততই ভাল। ভাং সং।" এই উক্তির মধ্যে তাঁর সুপ্ত বাসনার সন্ধান লাভ করা যায়। শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধবাশ্রম সম্বন্ধীয় ঐ মূল প্রবন্ধে বলা হয়, "বোম্বাই সহরে প্রসিদ্ধ রমাবাই স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যা ও শিল্পশিক্ষা দিবার জন্য শারদাশ্রম নামক যে আশ্রম খুলিয়াছেন তাহা বোধ হয় অনেকেই শুনিয়াছেন। কিন্তু শারদাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রায় দুই বৎসর পূর্বে বঙ্গদেশের কলিকাতার নিকটবর্তী বরাহনগরে স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা ও শিল্পাদি শিক্ষার জন্য যে বোর্ডিং স্কুল হইয়াছে তাহা অদ্যাপি সাধারণে অবগত নহেন। এই বিদ্যালয়ের স্থাপয়িতা শ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিনা আড়ম্বরে ইহা প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া প্রথমে সকলে ইহার বিষয় জানিতে পারেন নাই। ধীরে ধীরে আজ চারি বৎসর এই বোর্ডিং বিদ্যালয়ের কার্য চলিতেছে।" খৃস্টান বা ফিরিঙ্গি স্ত্রীলোকদিগের সাহায্যে শিক্ষাবিস্তারের কুফল অনুভব করেছিলেন এই মহিলাশ্রম; তাই তাঁদের প্রথম উদ্দেশ্য ছিল বয়স্কাদের শিক্ষিত করে দেশীয় বালিকা বিদ্যালয়-সমূহের উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী' নির্মাণ। তা ছাড়া "যাহাতে স্ত্রীলোকেরা সুশিক্ষিত হইয়া সুশৃঙ্খলরূপে গৃহকর্মাদি করিতে পারেন তাহা এই বিদ্যালয়ের অপর একটি উদ্দেশ্য।... দেশের মধ্যে বিধবাগণ যদি বালিকাগণের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিবার উপযুক্তা হন তাহার তুল্য সুখের বিষয় আর নাই। এখানে বিধবাদিগকে শিক্ষয়িত্রী করিবার চেষ্টা হইতেছে। অসমর্থ বিধবাগণ এখানে বিনা ব্যয়ে অবস্থান করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে পারেন কর্তৃপক্ষগণ এমন বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ···বরাহনগর মহিলাশ্রমে দেশীয় ভাবে অল্প ব্যয়ে উপযুক্ত শিক্ষক দ্বারা বালিকা ও মহিলাগণ শিক্ষালাভ করিয়া থাকেন।" কর্মপন্থা এবং উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশ্রমের সঙ্গে হিরণ্ময়ী -স্বর্ণকুমারীর প্রতিষ্ঠানের সাদৃশ্য ছিল দৃষ্টিগ্রাহ্য। তাই কোনো-এক সময়ে সখিসমিতির কয়েকজন আশ্রিতা 'সেবাব্রতে'র

১১১ জীবনের ঝরাপাতা, পৃ ২২২।

মহিলাশ্রমে বিদ্যাভ্যাসের জন্য ভর্তি হয়েছিলেন; উক্ত প্রতিষ্ঠানটির প্রতি স্বর্ণকুমারী হিরণ্ময়ী প্রভৃতির সমর্থন না থাকলে কখনও এরকম হত না।

জীবনের ঝরাপাতায় সরলা দেবী বিধবা-শিল্পাশ্রমের উদ্ভবের যে ইতিহাস পরিবেশন করেছেন তা উপরিলিখিত সিদ্ধান্তের অনুকূল। তিনি বলেছেন, "উপর্যুপরি অনেকগুলি সন্তানবিয়োগ হয় দিদির। তাঁহার হৃদয় স্নেহদানের জন্য বুভুক্ষিত ছিল। তিনি সখিসমিতির আশ্রিত কোনো কোনো অনাথ বালিকাদের নিজের কাছে রেখে পালনের জন্য উন্মুখ হলেন। তারাই তাঁকে 'মা' বলে। ঠিক নিজের মেয়ের মতো তাদের জন্য সব করেন তিনি। এই সময়ে বরাহনগরে শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত বিধবাশ্রমের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। মায়ের প্রতিষ্ঠিত সখিসমিতি যখন কাল-প্রভাবে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ল, তখন তাকে সঞ্জীবিত রাখার চেষ্টায় দিদি তাকে নাম ও আকারের নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে চালিয়ে বর্তমান বিধবা-শিল্পাশ্রমে পরিণত করলেন। এই শিল্পাশ্রমটি তাঁর একান্ত উদ্যম, বিপুল অধ্যবসায়, অনেক যত্ন ও অনেক প্রীতি দিয়ে গড়া।" (পৃ ৬০)

জীবনের ঝরাপাতার শেষাংশের সংযোজনে যোগেশচন্দ্র বাগল সরলা দেবীর 'বিবাহোত্তর জীবন-কথা'য় বলেছেন যে সখিসমিতি ও বিধবা-শিল্পাশ্রম ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের মধ্যে সার্থক পরিণতি লাভ করে। "মাতা স্বর্ণকুমারীর 'সখিসমিতি' এবং দিদি হিরণ্ময়ীর 'মহিলা-শিল্পাশ্রম' এই প্রতিষ্ঠান দুইটির আদর্শ তাঁহার সম্মুখে। এই প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের যে যে অভাব ছিল তাহা পূরণকল্পেই এই ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের প্রতিষ্ঠা।" ১৯১০ সালে এলাহাবাদে জাতীয় কংগ্রেসের যখন অধিবেশন হয় তখন "সরলা দেবীর উদ্যোগে একটি নিখিল ভারতীয় মহিলা সম্মেলনের অধিবেশন হইল ভাজিয়ার মহারানীর সভানেত্রীত্বে। অধিবেশনে সরলা দেবী ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল স্থাপনকল্পে একটি ভাষণ দেন।...সরলা দেবীর এই সুচিন্তিত ভাষণটির প্রিয়ম্বদা দেবীকৃত অনুবাদ 'ভারতী'তে (চৈত্র ১৩১৭) প্রকাশিত হইয়াছিল। সরলা দেবী ইহা পুস্তিকার আকারেও প্রকাশিত করেন।" সরলা দেবীর ভাষণটি পড়লে ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের ব্যাপকতর ও মহত্তর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়। ১৯১০ খৃস্টাব্দের ঐ বক্তৃতা থেকে জানা যায় যে শতকরা এক জন মহিলা বিদ্যালয়ে গিয়ে থাকেন—এই তথ্য বক্তা শিক্ষাবিভাগ থেকে সংগ্রহ করেন, এবং তখনও পর্যন্ত অবরোধ প্রথার অত্যাচার কমেনি। তাই সখিসমিতি ও বিধবা-শিল্পাশ্রম প্রতিষ্ঠার বহু পরেও সরলা দেবী অন্তঃপুর-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন এবং 'সেইজন্যই অন্তঃপুর-শিক্ষা-প্রচার ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের সর্বপ্রথম সাধ্য'রূপে বিবেচিত হয়। সে যা হোক সর্বশেষে পূর্বকথিত বিধবাশ্রম সম্পর্কে বলা যায় যে হিরণ্ময়ী দেবীর মৃত্যুর পর থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত স্বর্ণকুমারী এই শিল্পাশ্রমের সভানেত্রী ছিলেন। ১৯৩১ খৃস্টাব্দে তিনি এই আশ্রমকে তাঁর

রচিত 'যাবতীয় পুস্তকের স্বত্ব' দান করেন।[১১২] বালীগঞ্জের উক্ত বিধবা-শিল্পাশ্রমের (Widow's Industrial Home at Ballygunge) প্রতি কি গভীর ভালবাসা তাঁর ছিল এই সূত্র থেকে তা যথার্থ উপলব্ধ হয়।

ভ্রমণ

নানা কার্যোপলক্ষে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি ভ্রমণ করেছেন, ঐসকল স্থানে তাঁর অবস্থান বা ভ্রমণ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না, তা'ই কেবল এ সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত কালানুক্রমিক বিবরণ এখানে দেওয়া হল।

বিবাহের পর অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথের কর্মক্ষেত্র বোম্বাই প্রদেশে তিনি কিছুকাল অবস্থান করেন, ১৮৭০ খৃস্টাব্দে 'চতুর্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় শিক্ষার সৌকর্যার্থে' তিনি বোম্বাই গমন করেন (প্রদীপ ভাদ্র ১৩০৬, পৃ ৩১৯)। ১২৯০ সাল বা ১৮৮৩ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি কোনো এক সময়ে তিনি কারোয়ারে ছিলেন কারণ ১৩০২ সালের ভাদ্র সংখ্যার ভারতীতে প্রকাশিত 'সমুদ্রে' শীর্ষক রচনায় তিনি বলেছেন, "প্রায় ১২ বৎসর পূর্বে বম্বে হইতে তিন দিনের সমুদ্রপথে কারোয়ারে যাই।"

রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো চিঠিপত্রে স্বর্ণকুমারী প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর দার্জিলিং যাত্রার কৌতুকপূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। একটি পত্রে তিনি বলেছেন, 'আমি প্রায় এক মাস কাল দার্জিলিঙে কাটিয়ে এলুম'; এ পত্রের তারিখ 'অক্টোবর ১৮৮৭'।[১১৩] 'দার্জিলিং/১৮৮৭' তারিখযুক্ত আর একটি চিঠিতে[১১৪] রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'এই তো দার্জিলিং এসে পড়লুম'। তাঁদের এই দার্জিলিং যাত্রা সম্বন্ধে প্রভাতকুমার রবীন্দ্রজীবনীর প্রথম খণ্ডে বলেছেন, "১২৯৪ সালের শরৎকালে (১৮৮৭ অক্টোবর) রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে দার্জিলিং গেলেন।…সঙ্গে ছিলেন সৌদামিনী দেবী স্বর্ণকুমারী দেবী ও স্বর্ণকুমারীর দুই কন্যা হিরণ্ময়ী (১৯) ও সরলা (১৫)।" ১২৯৫ সালের ভারতী ও বালক পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় স্বর্ণকুমারীর 'দার্জিলিং পত্র' প্রকাশিত হয়; জ্যৈষ্ঠ থেকে ভাদ্র এবং কার্তিক মাসের ভারতী ও বালকে 'দার্জিলিং' শিরোনামে তাঁর বিস্তৃত পত্রপ্রবন্ধটি প্রকাশিত হতে থাকে, এই পত্রগুচ্ছ ও প্রবন্ধাবলী থেকে উক্ত ভ্রমণের ও দার্জিলিঙে অবস্থানের মনোরম চিত্র পাওয়া যায়। ছিন্নপত্রের উল্লিখিত

১১২ Padmini Sathianadhan, They Paved the Way—Srimathi Swarna Kumari Debi, The Sunday Statesman, 20 December, 1936.

১১৩ ছিন্নপত্র, ১৩৬২, পত্রসংখ্যা ৭। এই পত্রের সূত্রানুসারে বলা যায় যে সম্ভবত তাঁরা ১৮৮৭ সালের সেপ্টেম্বরে দার্জিলিঙে গমন করেছিলেন।

১১৪ ঐ পত্রসংখ্যা ৯।

পত্রগুলিতে রবীন্দ্রনাথ যেমন ন-দিদি স্বর্ণকুমারী সম্বন্ধে নানা কৌতুকপূর্ণ মন্তব্য করেছেন তেমনি ভারতী ও বালকের পত্রপ্রবন্ধগুলির মধ্যে তাঁদের 'পুরুষ অভিভাবক' রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও বিভিন্ন সরস কথা পাওয়া যায়। দার্জিলিঙে তাঁরা বিশাল কাসলটন হাউসে ছিলেন; স্বর্ণকুমারী বলেছেন, "লেফটেনেন্ট গভর্ণরের বাড়ি ছাড়া দার্জিলিঙে শুনতে পাই এত বড় বাড়ি আর নেই।" স্বর্ণকুমারী প্রভৃতির দার্জিলিঙে এই অবস্থানের বিস্তৃত পরিচয় পরবর্তী প্রসঙ্গে উত্থাপিত হবে।

এবারে স্বর্ণকুমারীর গাজিপুর ভ্রমণের কথা উল্লেখযোগ্য। ১২৯৪ সালের শেষ দিকে রবীন্দ্রনাথ 'সপরিবারে গাজিপুরে গিয়া বাস করিতে মনস্থ' করেন। রবীন্দ্রনাথের এই গাজিপুরবাস পর্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রজীবনীর প্রথম খণ্ডে বলা হয়েছে, "গাজিপুরে যে বরাবর ছিলেন তাহা নহে, বোধ হয় বার-দুই কলিকাতায় যান। একবার গিয়া সুরেন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা দেবীকে আনেন, আষাঢ়ের শেষাশেষি (৭ জুলাই ১৮৮৮) তাহাদের পুনরায় রাখিয়া আসেন ও শ্রাবণ মাসে ন-দিদি স্বর্ণকুমারীকে লইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসেন।" ১২৯৬ সালের ভারতী ও বালক পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যায় স্বর্ণকুমারীর 'গাজিপুর পত্র' প্রকাশিত হয়; এই পত্রাবলীতেও অনুজ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ন-দিদির স্নেহ-মিশ্রিত কৌতুকপূর্ণ মন্তব্যের পরিচয় পাওয়া যায়। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার গাজিপুর পত্রের এক স্থানে লেখিকা বলেছেন, 'আমি আগে শীতকাল ছাড়া অন্য সময় কখনো পশ্চিমে আসি নাই' (পৃ ৯০)। গাজিপুরে কিছুকাল অবস্থানের পর স্বর্ণকুমারী কাশী গমন করেন কয়েকদিনের জন্য; ১২৯৬ সালের ভারতী ও বালকের ভাদ্র সংখ্যার 'গাজিপুর পত্রে' এই কাশী ভ্রমণের কথা আছে।

১৮৮৮ সালের শেষ দিকে স্বর্ণকুমারী দেবী কন্যা সরলাকে নিয়ে রাজসাহী গিয়েছিলেন। জীবনের ঝরাপাতায় সরলা বলেছেন, "আমি যখন এণ্ট্রান্স পাস করলুম ফণীদাদা তখন রাজসাহী কলেজে প্রোফেসর। মাকে দিদি সেখানে নিজের কাছে কয়েক মাসের জন্যে নিয়ে যাবার আয়োজন করলেন। সেবার এলাহাবাদে বোধ হয় প্রথম কংগ্রেসের অনুষ্ঠান চলেছে। বাবামশায় সেখানে।" জর্জ ইউলের সভাপতিত্বে ১৮৮৮ খৃস্টাব্দে এলাহাবাদে কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশন বসে। স্বর্ণকুমারীর প্রথম জামাতা ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় ১৮৮৩ সালের জুলাই মাস থেকে রাজসাহী কলেজে অধ্যাপনা করতে থাকেন এবং সরলা এণ্ট্রান্স পাস করেন ১৮৮৬ খৃস্টাব্দে। বেশ বোঝা যায় গাজিপুর থেকে প্রত্যাবর্তনের অল্পকাল পরে তাঁরা রাজসাহী গমন করেন। সরলা দেবীর বিবরণ থেকে জানা যায় যে দার্জিলিঙে অবস্থানের মত রাজসাহীর দিনগুলিও 'সাহিত্যিক বা রাজনৈতিক আলোচনায় আহারে-বিহারে, আমোদে-প্রমোদে' মুখরিত হয়ে উঠে; ঐ সময় জর্জ এলিয়ট এ পরিবারের নিত্যসঙ্গী

হয়ে উঠেছেন। তাছাড়া 'অত্যন্ত intellectual' লোকেন পালিতের সান্নিধ্য এবং বৈকালিক ভ্রমণ কিংবা রাজসাহীর 'জঙ্গলে বেড়াতে যাওয়া'র অনেক কথা সরলা দেবী বলেছেন।[১১৫]

ওয়েডারবার্ণের সভাপতিত্বে ১৮৮৯ খৃস্টাব্দে কংগ্রেসের যে পঞ্চম অধিবেশন হয় সেই সম্মেলনে প্রতিনিধিরূপে যোগদানের জন্য স্বর্ণকুমারী বোম্বাই গমন করেন।

১৮৯০ খৃস্টাব্দে তিনি সোলাপুরে সত্যেন্দ্রনাথের নিকট গিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ১৮৮৬ খৃস্টাব্দের ৭ অক্টোবর থেকে ১৮৯৪ খৃস্টাব্দের ১৬ মার্চের পূর্ব পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথ সোলাপুর-বিজাপুরে কর্মে নিযুক্ত ছিলেন।[১১৬] ভারতী ও বালক পত্রিকার ১২৯৮ সালের আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত পত্র-শীর্ষক রচনাটির একস্থানে বলা হয়েছে, 'দুই বৎসর আগে যখন আমরা সোলাপুরে আসি....' ইত্যাদি (পৃ ৩৭০)। সোলাপুর থেকে লিখিত ঐ পত্রগুলি থেকে জানা যায় যে এগুলি রচিত হয় ১৮৯২ খৃস্টাব্দের শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে; তাই বলা যেতে পারে 'দুই বৎসর আগে' অর্থাৎ ১৮৯০ সালের বর্ষাকালের পূর্বে (অন্তত পরে নয়) তিনি সোলাপুর গিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বার তিনি সোলাপুরে যান ১৮৯২ সালের শ্রাবণ মাসে কিংবা তার অল্পকিছু কাল পূর্বে, কারণ পূর্বোক্ত পত্রে তিনি বলেছেন, "আরবারে (১৮৯০) এ সময় সোলাপুর কি শ্যামল শোভা ধারণ করিয়াছিল।...এবার (১৮৯২) বর্ষাতে বর্ষা নাই; তাই সোলাপুরের এই মরু-দৃশ্য।"[১১৭]

কিছুকাল পরে তিনি সোলাপুর-সাতারা-মহীশূর ভ্রমণ করেন। সরলা দেবী এক সময় কোনো কার্যোপলক্ষে মহীশূরে ছিলেন, সেখানে যাওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন তিনি, "মেজমামা তখন সেতারায়। মহীশূর যেতে বম্বে দিয়ে সেতারা পথে পড়ে। মা সেতারা পর্যন্ত আমার সঙ্গে গেলেন। মেজমামা সেতারা থেকে আমার অভিভাবক হয়ে আমায় মহীশূরে ছাড়তে গেলেন।"[১১৮] সত্যেন্দ্রনাথ সোলাপুর-বিজাপুর থেকে বদলী হয়ে সাতারায় যোগদান করেন ১৮৯৪ খৃস্টাব্দের ১৬ মার্চ তারিখে। সে যাই হোক মহীশূরে মাত্র ছয় মাস থাকার পর সরলার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, তাই "মা-দের কাছে টেলিগ্রাম গেল। মা তখনো সাতারায় ছিলেন। সেখান থেকে তিনি এলেন অসুখে আমার তত্ত্বাবধানের জন্যে। ...তিন মাসের ছুটি নিয়ে মা-র সঙ্গে প্রথমে সাতারায় গেলুম আমি।"[১১৯] এইবারে স্বর্ণকুমারী কমপক্ষে নয় মাস কলিকাতার বাহিরে ছিলেন।

---

১১৫ জীবনের ঝরাপাতা, পৃ ৯৫-৯৭।

১১৬ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ, বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫২।

১১৭ ভারতী ও বালক আশ্বিন-কার্তিক ১২৯৮, পৃ ৩৬৯।

১১৮ জীবনের ঝরাপাতা, পৃ ১০৮।

১১৯ ঐ পৃ ১২৪।

১৩০২ সালের ৬ মে স্বর্ণকুমারী কলিকাতা থেকে নীলগিরি ভ্রমণের উদ্দেশ্যে জাহাজে যাত্রা করেন এবং ১১ মে তারিখে মাদ্রাজে উপনীত হন। ১৩০২ সালের ভারতী পত্রিকার ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত 'সমুদ্রে' নামক প্রবন্ধ থেকে তাঁর যাত্রার বিস্তৃত বিবরণ জানা যায়; ঐ বৎসরের পৌষ সংখ্যার ৫১৫ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত একটি প্রসঙ্গ থেকে বোঝা যায় তিনি ১১ মে তারিখে মাদ্রাজে উপনীত হয়েছিলেন। এই পৌষ সংখ্যায় নীলগিরি-শীর্ষক যে রচনাটি প্রকাশিত হয় তা উক্ত ভ্রমণেরই ফল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় ১৩০২ সালের ভাদ্র মাসে স্বর্ণকুমারী মহীশূরে অবস্থান করছিলেন, কারণ 'কবিতা ও গান' গ্রন্থটির বিজ্ঞাপন মহীশূর থেকে ঐ বৎসর লিখিত হয়েছিল।

১৯০৫ খৃস্টাব্দে স্বর্ণকুমারী ছিলেন বৈদ্যনাথে; জীবনের ঝরাপাতা থেকে জানা যায় যে সরলা দেবীর বিবাহের কিছুকাল পূর্ব থেকে স্বর্ণকুমারী 'শরীর শোধরাবার জন্য বৈদ্যনাথে' ছিলেন (পৃ ১৮৬)।

বিবিধ পুরস্কার

বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিসাধনে স্বর্ণকুমারীর প্রশংসনীয় উদ্যম ও উল্লেখযোগ্য সাহিত্যসৃষ্টির কথা স্মরণ করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২৭ খৃস্টাব্দে তাঁকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক দান করেন, মহিলাগণের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এই পুরস্কার অর্জন করেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে স্যার আশুতোষের অসাধারণ উদ্যমের কথা সর্বজনবিদিত। জগত্তারিণী ছিলেন আশুতোষের জননী; জননীর স্মৃতিরক্ষা ও মাতৃভাষার উন্নতিসাধনকে এক সূত্রে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল এই সুবর্ণ পদকের মধ্যে। এ সম্পর্কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯২২ সালের ক্যালেণ্ডারে বলা হয়েছে, The medal will be bestowed once in two years on that individual who not having been a recipient of the medal during the preceding ten years, shall be deemed by the Syndicate as most eminent for original contribution to letters or science written in Bengali language. ১৯২১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা হয় এবং ঐ বৎসর রবীন্দ্রনাথ প্রথম জগত্তারিণী পদকে ভূষিত হন। স্বর্ণকুমারীর উল্লিখিত পদক প্রাপ্তির সংবাদটি সমসাময়িক সংবাদপত্রে এভাবে প্রকাশিত হয়: "এসোসিয়েটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছে যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রদত্ত গত বৎসরের জগৎতারিণী সুবর্ণ পদক পুরস্কার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভগ্নী শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী পাইয়াছেন। পরলোকগত সার আশুতোষ মুখার্জি তদীয় পরলোকগত মাতার স্মৃতির উদ্দেশ্যে ঐ পুরস্কার

প্রবর্তন করেন। সিণ্ডিকেটের মতে বাঙলা ভাষার উৎকর্ষসাধনের জন্য সর্বাপেক্ষা বেশী চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া বিবেচিত ব্যক্তিকে এই পদক পুরস্কার দেওয়া হয়। ইতঃপূর্বে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চ্যাটার্জি ও শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু প্রভৃতি ঐ পুরস্কার পাইয়াছেন।"[২০০]

উক্ত পুরস্কার ব্যতীত অন্য দিক থেকেও সেকালের সুধীসমাজ তাঁর সাহিত্যকৃতিকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। 'জাতীয় ভাষা ও সাহিত্য জাতীয় ঐক্যবন্ধন রক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়' এবং 'এই বন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য বর্ষে বর্ষে বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন নগরে সাহিত্য-সম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়া সাহিত্যসেবীদিগের মিলন-সাধন'-এর উদ্দেশ্যে ১৩১৪ সালের ১৭ থেকে ১৮ কার্তিক কাশিমবাজারে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হয়।[২০১] উক্ত সম্মিলনের 'ঊনবিংশ বাৎসরিক অধিবেশনের সভাপতির পদগ্রহণে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন' রবীন্দ্রনাথ ; [২০২] সাহিত্য দর্শন ইতিহাস ও বিজ্ঞান প্রভৃতি শাখার সভাপতি হিসাবে যথাক্রমে স্বর্ণকুমারী দেবী, কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, শরৎকুমার রায় ও হেমেন্দ্রকুমার সেন মনোনীত হন।[২০৩] স্বর্ণকুমারীর পূর্বে তাঁর কন্যা সরলা দেবী বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তদশ অধিবেশনে (সিউড়ি, ২০-২১ চৈত্র ১৩৩২) সাহিত্য-শাখার সভাপতিত্ব করেন, সেবারে মূল সভাপতি ছিলেন অমৃতলাল বসু। সাহিত্য-সম্মিলনের ঊনবিংশ বাৎসরিক অধিবেশনে মূল সভাপতিত্বের আমন্ত্রণ স্বীকার করার পর রবীন্দ্রনাথ বরোদা যাত্রা করেন (১০ জানুয়ারি ১৯৩০)। "কবি সফর করিতে করিতে বুঝিতে পারিলেন যে, যথাসময়ে সম্মেলনে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব তাই তাঁহার ভাষণ লিখিয়া তিনি কলিকাতায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট পাঠাইয়া দেন। কবি সভায় উপস্থিত না হওয়ায় লোকে খুবই মর্মাহত হয়— তাহারা কবিকে তাহাদের মধ্যে চাহিয়াছিল— ভাষণে তাহারা তৃপ্ত নহে। কবি ফেব্রুয়ারির গোড়ায় ফিরিলেন বটে, তখন সম্মেলন শেষ হইয়া গিয়াছে ; তাঁহার ভাষণ সম্মেলনের শেষ দিন স্বর্ণকুমারী দেবী পাঠ করিয়া দেন (৪ফেব্রুয়ারি)।"[২০৪] এই অধিবেশনের জন্য রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণটি প্রস্তুত করেন তা আমেদাবাদে রোগশয্যায় লিখিত হয়—

২০০ আনন্দবাজার পত্রিকা ৭ মাঘ ১৩৩৪, ২১ জানুয়ারি ১৯২৮, শনিবার।

২০১ দ্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-এর দ্বাদশ বার্ষিক বিবরণ।—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিষৎ-পরিচয় : ১৩০০-৫৬, ১৩৫৬, পৃ ২২-২৫।

২০২ রবীন্দ্রজীবনী ৩য়, ১৯৬১, পৃ ৩৬৬।

২০৩ পরিষৎ-পরিচয়, ১৩১৬, পৃ ২৪-২৫।

২০৪ রবীন্দ্রজীবনী ৩য়, পৃ ৩৬৬।

"এত ক্লেশ করে আমার জীবনে আর কোনো দিন লিখিনি।"[২০৫] বিচিত্রার ১৩৩৬ সালের ফাল্গুন সংখ্যার 'নানা কথা'য় উক্ত প্রবন্ধ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে চিঠি প্রকাশিত হয়েছে তাতে কবি বলেছেন, "সম্ভাষণটা অনেক দুঃখের লেখা। আঙুল চলতে চায় না, মাতালের মত টলোমলো করে, হৃৎপিণ্ডের মধ্যে ভূমিকম্প হতে থাকে—উপবাস-ক্লান্ত দুর্বল মস্তিষ্ক করুণা ভিক্ষা করে। যমদূতকে উপেক্ষা করে কোনোমতে লিখেছি" ইত্যাদি। উক্ত সম্মিলনের জন্য রচিত ও প্রেরিত 'পঞ্চাশোধ্বর্ম্'-শীর্ষক প্রবন্ধটি সম্বন্ধে কবি বলেছেন, "শুনলুম ডাক পেয়াদার মারফত না গিয়ে অবনের মারফতে লেখাটা যাওয়াতে তাঁরা অসম্মানের ক্ষোভে লেখাটার অস্তিত্ব স্বীকার করেননি।" কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে যে অধিবেশনের মূল সভাপতিরূপে স্বর্ণকুমারী স্বয়ং ঐ প্রেরিত ভাষণটি পাঠ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিবশত উনবিংশ বাৎসরিক সম্মিলনে (ভবানীপুর, ১৩৩৬ সালের ১৯-২১ মাঘ বা ১৯৩০ খৃস্টাব্দের ২-৪ ফেব্রুয়ারি) 'সর্বসম্মতিক্রমে স্বর্ণকুমারী সভানেত্রীর আসনে বৃত হন'।[২০৬] উক্ত অধিবেশনের কার্যবিবরণী থেকে আরও জানা যায় যে বিখ্যাত মহিলা কবি কামিনী রায় স্বর্ণকুমারীর স্থান গ্রহণ করেন অর্থাৎ সাহিত্য-শাখার সভাপতি হন। ঐ সাহিত্য-সম্মিলন সম্বন্ধে জানা যায়, "গত ১৯শে, ২০শে ও ২১শে মাঘ কলিকাতা ভবানীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের উনবিংশ বাৎসরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এবারকার সম্মেলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার কথা ছিল শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের,—কিন্তু তিনি সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী মহাশয়া সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিলেন। রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতির জন্য সকলেই দুঃখিত হইয়াছিলেন।

সম্মেলনের সহিত প্রাচীন পুঁথি, তাম্রলিপি ও পুস্তকাদির একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও ছিল। স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। সম্মেলনের প্রথম দিন সন্ধ্যাকালে সুপরিচিতা সাহিত্যিক শ্রীমতী লীলা দেবীর আলিপুরের ভবনে প্রীতি-সম্মেলন ও লীলা দেবী রচিত একটি নাটিকার অভিনয় হয়। অভিনয় দেখিয়া সকলেই আনন্দলাভ করিয়াছিলেন।"[২০৭]

ভবানীপুরের সাহিত্য-সম্মিলনে মূল সভাপতিরূপে স্বর্ণকুমারী যে ভাষণ দেন তার সম্বন্ধে

২০৫ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত 'রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী', ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০ তারিখের পত্রাংশ, দ্র প্রবাসী আষাঢ় ১৩৪৮, পৃ ২৭৩।

২০৬ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ২০শ কল্প ২য় ভাগ, আষাঢ় ১৮৫২ শক, পৃ ৯৩।

২০৭ নানা কথা, বিচিত্রা মাঘ ১৩৩৬, পৃ ২৯৬।

বলা হয়েছে,—In 1930, she presided over the 19th session of the Bengali Literary Conference at Bhowanipur, and made a most enlightened and inspired speech.[২০৮] ভাষণটি 'ভারত-সাহিত্যে রমণী-প্রতিভা' শিরোনামে লেখিকার 'সাহিত্য-স্রোত' গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে ; প্রবন্ধটি গ্রন্থের প্রথম রচনা এবং গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠার পাদটীকা থেকে জানা যায়, প্রবন্ধটি 'ঊনবিংশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনে পঠিত। ১৩৩৬ মাঘ'। নানা দিক থেকে প্রবন্ধটির গুরুত্ব স্বীকৃত হতে পারে বলে পরিশিষ্টের মধ্যে সমুহ রচনাটি প্রদত্ত হল। এখানে একটি কথা বলা দরকার, স্বর্ণকুমারীর পূর্বে অপর কোনো মহিলা বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের মূল সভাপতি হতে পারেননি, তাঁর পূর্বে একজন মহিলা—স্বর্ণকুমারীরই কন্যা সরলা দেবী কেবলমাত্র সাহিত্য-শাখার সভাপতি হয়েছিলেন।

অপর একটি সূত্র থেকে জানা যায় যে ১৯২৭ খৃস্টাব্দে "বৈদ্যবাটী সাহিত্য সম্মেলন তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র দিয়াছেন।"[২০৯] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার স্বর্ণকুমারী বিষয়ক গ্রন্থটিতে এ বিষয়ে কিছুই বলেননি। বৈদ্যবাটী যুবক সমিতির সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণী (১৯০৮-৫৮) থেকে জানা যায় ঐ বৎসর 'প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক সুলেখিকা' হিসাবে তিনি সম্বর্ধিত হয়েছিলেন ; অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন। 'স্মরণী'তে আরও বলা হয়েছে, "হেমেন্দ্রকুমার রায় তাঁর 'যাঁদের দেখেছি' গ্রন্থে লিখেছেন—'বৈদ্যবাটী যুবক সমিতি স্বর্ণকুমারীর জন্য এক অভিনন্দন সভার আয়োজন করে এবং আমি সেখানে একটি স্বরচিত কবিতা পাঠের জন্য আহুত হই। স্বর্ণকুমারী তখন অতি প্রাচীনা।' তথাপি তিনি সভায় উপস্থিত থেকে স্বহস্তে মানপত্র গ্রহণ করে সমিতিকে ধন্য করেছিলেন। তাঁর ভাষণ পাঠ করেছিলেন শ্রীমতী তমাললতা বসু।"[২১০]

স্বর্ণকুমারীর তিরোধানের অল্পকাল পূর্বে বাংলা দেশের বিদ্বজ্জন তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের আয়োজন করেছিল, কিন্তু তাঁর আকস্মিক পরলোকগমনের ফলে উক্ত সম্বর্ধনা-সভা অনুষ্ঠিত

২০৮ Padmini Sathianadhan, They Paved the Way— Srimathi Swarna Kumari Debi, The Sunday Statesman, 20 December, 1936.

২০৯ বঙ্গের মহিলা কবি, পৃ ৫১।

২১০ সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণী : ১৯০৮-৫৮, বৈদ্যবাটী যুবক সমিতির সুবর্ণ জয়ন্তী কমিটির সভাপতি জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৫৮, পৃ ৫-৬। বৈদ্যবাটী যুবক সমিতির পক্ষ থেকে সম্প্রতি জানান হয়েছে যে ১৯২৭ সালে সমিতির বিংশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে (মার্চ মাসের কোনো একটি রবিবারে) স্বর্ণকুমারীকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সমিতির তখন নিজস্ব কোনো গৃহ বা হলঘর না থাকায় স্থানীয় বিদ্যালয় বি. এম. ইনষ্টিটিউশনের হলঘরে সভার ব্যবস্থা করা হয় ; অনুষ্ঠানে উপস্থিত অভ্যাগত অতিথির মধ্যে প্রথম দিনের সভাপতি স্যার পি. সি. মিত্র, স্বর্ণকুমারীর দুহিতা সরলা দেবী, তমাললতা বসু, গিরিজাকুমার বসু প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়।

হতে পারেনি। ১৩৩৯ সালের ভারতবর্ষ পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যা (পৃ ১২৯) থেকে জানা যায়, "আমরা আয়োজন করিতেছিলাম, আগামী ১৪ই ভাদ্র তিনি সাতাত্তর বৎসর বয়স পূর্ণ করিলে আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিব, বাঙ্গালা সাহিত্যিকগণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিব; হঠাৎ সংবাদ পাওয়া গেল পাঁচ দিনের ইনফ্লুয়েঞ্জাতে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন।" ঐ বৎসরের সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকার শ্রাবণ সংখ্যা থেকেও (পৃ ২৫৫) এই সংবাদটি সমর্থিত হয়, "সাহিত্য-সেবক সমিতি কর্তৃক তাঁর ষড়সপ্ততিতম জয়ন্তী উৎসবের আয়োজন প্রস্তাবিত হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দেশবাসীর অদৃষ্টে তাহা ঘটিল না।" সে যাই হোক, তাঁর মৃত্যুর পর দেশবাসী নানাভাবে তাঁর স্মৃতিরক্ষার আয়োজন করেন।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে তাঁর সাহিত্যকৃতির খ্যাতি কেবলমাত্র বাংলা দেশ এবং বাঙালি কিংবা বঙ্গভাষাভাষীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। তাঁর একাধিক পুস্তক বিদেশী ভাষায় অনূদিত হয়। 'ফুলের মালা'র ইংরেজি অনুবাদ ১৯০৯ সালের মডার্ণ রিভিউতে প্রকাশিত হয়, অনুবাদিকা হলেন এ. ক্রিষ্টিনা আলবার্স; ১৯১০ সালে উক্ত উপন্যাস 'দি ফ্যাটাল গার্ল্যাণ্ড' নামে মুদ্রিত হয়, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬৩। 'কাহাকে' উপন্যাসটির অনূদিত রূপ 'অ্যান আনফিনিসড সং' নামে ১৯১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়, অনুবাদক স্বয়ং স্বর্ণকুমারী; লণ্ডনের টি. ওয়ের্নার লরি লিমিটেড গ্রন্থটির প্রকাশক। মাদ্রাজের একটি পুস্তক প্রকাশন সংস্থা তাঁরই কয়েকটি অনূদিত গল্পের একটি সংকলন প্রকাশ করেন 'শর্ট স্টোরিজ' নাম দিয়ে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে তাঁর 'দিব্যকমল' নাটকটি "জার্মান্ ভাষায় Princess Kalyani নামে প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যান্য ভাষাতেও তাঁহার কোন কোন রচনা অনূদিত হইয়াছে।" ১৯৩৬ সালের ২০শে ডিসেম্বর তারিখের রবিবাসরীয় স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত স্বর্ণকুমারী সম্বন্ধীয় একটি প্রবন্ধে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, Two of her novels, The Fatal Garland and The Unfinished Song, have been rendered into English and published in London, and her play, Kalyani has been translated into German.

অন্যান্য ঘটনা

১

ঘোষালপরিবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের জীবনের আরও কয়েকটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে এই পরিবারের উদ্যম সত্যই প্রশংসনীয়। হিরণ্ময়ী ছিলেন বেথুনের ছাত্রী; এখান থেকে ১৮৮২ সালে তিনি মাইনর পরীক্ষা পাস করেন। বামাবোধিনী পত্রিকায় ১২৮৮ সালের পৌষ সংখ্যায় এই সংবাদ প্রকাশিত হয়, "এবার মাইনর পরীক্ষায় বেথুন স্কুলের ছাত্রী কুমারী শৈলবালা দাস এবং হিরণ্ময়ী দেবী ২য় বিভাগে এবং কুমারী

গিরিবালা মজুমদার ৩য় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।" বেথুন স্কুলে সরলাকে ১৮৮০ খৃস্টাব্দে নিম্ন শ্রেণীতে ভর্তি করা হয় এবং এখান থেকেই ১৮৮৬ সালে তিনি দ্বিতীয় বিভাগে প্রবেশিকা ও ১৮৯০ সালে বি-এ পাস করেন। বি-এ পরীক্ষায় মহিলাদের মধ্যে সর্বাধিক নম্বর পাওয়ার জন্য তিনি সর্বপ্রথম 'পদ্মাবতী মেডাল' পেয়েছিলেন। ঊর্মিলাকেও বেথুনে ভর্তি করা হয়েছিল, জীবনের ঝরাপাতায় সরলা দেবী তার উল্লেখ করেছেন।

১৮৮৩ খৃস্টাব্দে হিরণ্ময়ীর বিবাহ হয় বিলাত-প্রত্যাগত ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। ফণিভূষণের পিতৃব্য পরেশনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন জানকীনাথের ভগিনীপতি। "পাঠ্যাবস্থাতেই ফণিভূষণ পিতৃব্যের সহিত কলিকাতাস্থ ঘোষালভবনে যাইতেন। ক্রমে এই পরিবারের সঙ্গে ফণিভূষণের ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ফণিভূষণ গিলক্রাইস্ট বৃত্তি লইয়া ১৮৭৮ সনে বিলাত গমন করেন।...ফণিভূষণ ১৮৮৩, জুলাই মাসে সরকারী শিক্ষাবিভাগের কার্যে নিযুক্ত হন এবং রাজসাহী কলেজে অধ্যাপক হইয়া যান। হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে ফণিভূষণের এই সময়ে বিবাহ হয়।"[২১১]

১৩০০ সালের ভারতী ও বালক পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় 'বন্দেমাতরম্' গানটির সরলা দেবীকৃত স্বরলিপি মুদ্রিত হয়। সরলা দেবীর বিবাহ হয় '১৯০৫ সনে পঞ্জাবের আর্যসমাজ-নেতা পণ্ডিত রামভজ দত্তচৌধুরীর সহিত।'[২১২]

রামভজের মৃত্যু হয় ১৯২৩ খৃস্টাব্দের ৬ আগস্ট। ১৯২৭ সালের ১৪ ডিসেম্বর ফণিভূষণ পরলোকগমন করেন; ইতিপূর্বে অর্থাৎ ১৯২৫ খৃস্টাব্দের ১৩ জুলাই হিরণ্ময়ী দেহত্যাগ করেন (২৯ আষাঢ় ১৩৩২ সাল)। সরলার দেহান্তর ঘটে ১৯৪৫ খৃস্টাব্দের ১৮ আগস্ট তারিখে। এর বহু পূর্বে জানকীনাথের তিরোধান ঘটে (২ মে ১৯১৩)।[২১৩]

স্বর্ণকুমারী ছিলেন দীর্ঘজীবী, তাঁর এই কর্মময় জীবনের অবসান হয় ১৯৩২ খৃস্টাব্দের ৩ জুলাই বা ১৩৩৯ সালের ১৯ আষাঢ় দিবসে। সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকার ১৩৩৯ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় মুদ্রিত 'শোকাঞ্জলি'তে (পৃ ২৫৫) বলা হয়েছে, "গত ৩রা জুলাই, রবিবার বেলা দশ ঘটিকার সময় তাঁর অমর আত্মা অমর লোক লাভ করিয়াছে।" আনন্দবাজার পত্রিকার ২০ আষাঢ় ১৩৩৯ সালের (৪ জুলাই ১৯৩২) সোমবারের সংখ্যায় একটি বিস্তারিত সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল এ সম্বন্ধে, তার প্রয়োজনীয় অংশবিশেষ এরূপ: "পরলোকে সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী/ শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী আর ইহলোকে নাই। গতকল্য রবিবার বেলা আন্দাজ সোয়া দশটার সময় তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। / বৃদ্ধ বয়সে

২১১ জীবনের ঝরাপাতা, পৃ ২১১।

২১২ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৭, পৃ ২৭৬।

২১৩ সুবলচন্দ্র মিত্র, সরল বাঙ্গালা অভিধান, ৫ম সং, পৃ ১১২৮।

স্বর্ণকুমারী কলিকাতার ৩ নং সানি পার্কে তাঁহার কন্যা শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরানী এব একমাত্র পুত্র শ্রীযুত জ্যোৎস্না ঘোষালের সহিত বাস করিতেছিলেন।...মৃত্যুকালে ঠাকুরপরিবারের শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন।...তাঁহার মৃতদেহ পুষ্পমাল্যাদিতে ভূষিত করিয়া লোয়ার সার্কুলার রোডস্থিত শ্মশান ক্ষেত্রে প্রেরণ করা হয়। শ্মশান ক্ষেত্রে যে দাহ-কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতেই স্বর্ণকুমারীর নশ্বর দেহ ভস্মীভূত করা হইয়াছে।...শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বর্তমানে শান্তিনিকেতনে আছেন। তথায় তাঁহার নিকট তার করা হইয়াছে।" ভারতবর্ষ পত্রিকায় (শ্রাবণ ১৩৩৯, পৃ ৩২৯) প্রকাশিত 'শোক সংবাদে' আছে, "বিগত ১৯ শে আষাঢ় রবিবার পূর্বাহ্ণে তিনি তাঁহার বালিগঞ্জের বাসভবনে দেহরক্ষা করিয়াছেন।... পাঁচ দিনের ইনফ্লুয়েঞ্জাতে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন।" অন্য একটি গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে তিনি হাঁপানি রোগের আক্রমণে দেহত্যাগ করেন ;[২১৪] সম্ভবত যখন স্বর্ণকুমারী ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়েছিলেন তখন হাঁপানির প্রকোপ বৃদ্ধি পায়, সম্ভবত ঐ রোগে তিনি দীর্ঘকাল ভুগেছিলেন বলে জীবনীকার এইরূপ মন্তব্য করেছেন।

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি মন্তব্য থেকে জানা যায় যে 'পূজনীয়া স্বর্ণকুমারী দেবী পরলোকগতা হইলে তাঁহার কন্যা সরলা দেবী চতুর্থাহ শ্রাদ্ধ করাইবার জন্য' চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়কে আহ্বান করেছিলেন।[২১৫]

২

স্বর্ণকুমারীর তিরোভাবের পর কোনো স্মৃতিসভায় পাঠের নিমিত্ত বিখ্যাত জীবনী-রচয়িতা মন্মথনাথ ঘোষ 'স্বর্ণ-স্মৃতি' নামক একটি প্রবন্ধ রচনা করেন ; প্রবন্ধটি ১৮৫৪ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। আষাঢ় সংখ্যার রচনাটিতে লেখিকার জীবনের কয়েকটি প্রশংসনীয় কার্যের উল্লেখ আছে এবং সে সম্পর্কে নানা তথ্য-বিবরণ আছে ; কিন্তু শ্রাবণ সংখ্যার প্রবন্ধাংশে লেখিকার শেষ জীবনের সুন্দর ইতিহাস রচনার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। ব্যক্তিগতভাবে মন্মথনাথ স্বর্ণকুমারীর স্নেহ-প্রীতি অর্জন করতে পেরেছিলেন, বিশেষভাবে লেখিকার জীবনের অন্তিম পর্যায়ে তিনি নানা কার্যোপলক্ষে তাঁর ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেন ; তাই শ্রাবণ সংখ্যার প্রবন্ধটিতে লেখিকার জীবনের শেষ পর্বের যে ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন তা যেমন মনোরম তেমনই বিশ্বাস্য। এই কারণে উক্ত প্রবন্ধের প্রয়োজনীয় অংশসমূহ নিয়ে উদ্ধৃত হল, উদ্ধৃতি থেকে তাঁর জীবনের ব্যক্তিগত দিকগুলি

২১৪ অখিলচন্দ্র ঘোষ, বাংলার বিদুষী, ১৩৬৪, পৃ ৩৮।

২১৫ পরলোকগত আচার্য্য চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিকল্পে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা শ্রাবণ ১৮৫৪ শক, পৃ ১২৪।

সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা হতে পারে। মন্মথনাথ বলেছেন, "বাল্যকাল হইতে স্বর্ণকুমারীর সাহিত্যপ্রতিভার সহিত পরিচিত হইলেও তাঁহার সহিত প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হইবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলাম মাত্র সাত বৎসর পূর্বে। তখন (১৩৩২ বঙ্গাব্দে) আমি তাঁহার প্রতিভাশালী ভ্রাতৃগণের অন্যতম বঙ্গসাহিত্যের অক্লান্ত সেবক জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনচরিত লিখিতে প্রবৃত্ত। জীবনীর উপকরণাদি সংগ্রহমানসে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করি। প্রত্যুত্তরে তিনি আনন্দ প্রকাশ করিয়া স্বহস্তে কম্পিত অক্ষরে আমাকে তাঁহার ৩নং সানি পার্কস্থিত বালীগঞ্জের ভবনে সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিলেন। মনে হয় মধ্যাহ্নে গিয়াছিলাম। সন্ধ্যা পর্যন্ত উৎসাহের সহিত সাহিত্যালোচনা করিলেন। বলিলেন, 'তুমি আমাকে নতুন দাদার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া যাও, আমি উত্তর দিতেছি।' জ্যোতিবাবুর ও তাঁহার অপ্রকাশিত চিত্র ও পত্রাবলী চাহিলাম। তিনি অন্বেষণ করিয়া উহা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তাঁহার নবপ্রকাশিত গ্রন্থ 'মিলনরাত্রি' উপহার দিয়া তাহা পড়িয়া আমার মতামত জানাইতে বলিলেন। তখন তাঁহার দুইখানি উপন্যাস ইংরাজীতে অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। হয়ত তাঁহার কয়েকটি সঙ্গীতেরও অনুবাদ প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা ছিল। আমাকে বলিলেন, 'তোমার জানা এমন কেহ আছেন, যিনি ইংরাজী পদ্যে আমার কয়েকটি গীত অনুবাদ করিয়া দিতে পারেন? অনুবাদ তাঁহার নামেই প্রকাশিত হইবে।' আমার পরম পূজনীয় পিতৃদেব চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কয়েকজন প্রসিদ্ধ কবির কয়েকটি উৎকৃষ্ট গানের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং কিছু দিন পূর্বে আমি উহা পুস্তিকাকারে D athless Ditties নামে প্রকাশিত করিয়াছিলাম। আমি বলিলাম, 'আমার পিতৃদেব হয়ত করিতে পারেন, তিনি সম্মত হইলে জানাইব।'

ইহার অল্প কয়েকদিন পরেই পত্র পাইলাম কয়েকখানি ফটো ও পত্র তিনি অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছেন। বলাবাহুল্য, আমি অনতিবিলম্বে সেগুলি আনয়ন করিবার জন্য তাঁহার নিকটে যাই। ইতিমধ্যে তাঁহার প্রদত্ত উপন্যাসখানি পাঠ করিয়াছিলাম এবং দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম এই প্রবীণা উপন্যাসরচয়িত্রী কিরূপে আধুনিক রাজনৈতিক সমস্যা ও তরুণ বাঙ্গালীর আশা-আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি নিপুণতা-সহকারে উপন্যাসখানির মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। 'জীবন ফুরায়ে এল আঁখিজল ফুরাল না' প্রভৃতি তাঁহার কয়েকটি পুরাতন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতের পিতৃদেব-কৃত ইংরাজী অনুবাদও তাঁহাকে উপহার দিবার জন্য সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম। অনুবাদের নমুনাস্বরূপ কয়েকটি ছত্র নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

১

জনম আমার শুধু সহিতে যাতনা,
জীবন ফুরায়ে এল, আঁখিজল ফুরাল না।
এমনি অদৃষ্ট ঘোর, জনমেও সখি মোর,
পূরিল না জীবনের একটি কামনা।
এখন সুখের কথা, উপহাসি দেয় ব্যথা,
এই এ মিনতি সখি, ও কথা বলো না।

1

To suffer anguish was I born,—
Fresh ills my bosom pierce ;
While fast the sands of life run out,
Exhaustless flow my tears !
Ah ! so perverse my fortune is,
It ne'er fulfilled a wish ;
All talk of bliss to me's a taunt ;
So, pray, no more of this.

২

এ জনমের মত সুখ ফুরায়ে গিয়াছে সখি।
এখন তবুও হৃদে জলিছে দুরাশা একি।
জানি এ অভাগী-ভালে, সুখ নাই কোন কালে,
দুরন্ত পিপাসা তবু থামিবার নহে দেখি।
এত যে যতন করি, এ অগ্নি নিভাতে নারি,
প্রেমের এ দাবানল জলে উঠে থাকি থাকি।

My stock of bliss for this life, dear,
Hath been exhausted all ;
Yet still I hear, within my heart,
False Hope's delusive call.

I know my fate—no happiness
Is written in my lot ;
And yet my heart's consuming thrist
Extinguish I cannot.

I try so hard this smouldering fire
Of love to quench for e'er ;
But still it flares up now and then,
And baffles all my care.

তাঁহার নিকট সংগৃহীত চিত্র ও পত্র মৎ-প্রণীত 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ' নামক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। তাঁহার গানের ইংরাজী অনুবাদগুলি পড়িয়া সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু বলিলেন, 'আমি ত ইহা চাহি নাই ; আমার ইচ্ছা ছিল আমি কতকগুলি গীত নির্বাচিত করিয়া দিব, সেইগুলির অনুবাদ করাইয়া দিবে।' আমি বলিলাম, 'বেশ, আপনি কতকগুলি নির্বাচিত করিয়া দিবেন।' কিন্তু সে নির্বাচনের তিনি সময় পান নাই। সেদিনও সন্ধ্যা পর্যন্ত নানা বিষয়ে সাহিত্যালোচনা করিলেন। সাহিত্যালোচনায় এমন উৎসাহ অতি অল্পই দেখিয়াছি। জরা যেন সেই বর্ষীয়সী বাণীপুত্রীর মানসিক শক্তির এতটুকুও খর্বতা সাধন করিতে পারে নাই, নয়নের সেই প্রতিভাদীপ্তি এতটুকু ম্লান করিতে পারে নাই। কিছুদিন পরে স্বর্ণকুমারী-প্রদত্ত ফটোগুলি তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতে যাই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-জীবনী 'মানসী ও মর্মবাণী'তে যেমন যেমন প্রকাশিত হইতেছিল, তাঁহাকে একখানি করিয়া ফাইল কপি পাঠাইয়া দিতাম। অনুরোধ করিয়াছিলাম কোন তথ্যের ভুল থাকিলে তিনি যেন আমাকে জানান, তাহা হইলে গ্রন্থাকারে পুনর্মুদ্রণকালে বহিখানি অনেকটা নির্ভুল হইতে পারিবে। দেখিলাম তিনি আগ্রহসহকারে উহা পড়িতেন ; স্মরণ হয় দুই-এক স্থলে ভ্রম প্রদর্শনও করিয়া দিয়াছিলেন, গ্রন্থাকারে মুদ্রণের সময় আমি সংশোধিত করিয়া দিই। স্বনামপ্রসিদ্ধ ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কন্যা এবং সাহিত্যজগতে সুপরিচিত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের সহধর্মিণী ইন্দিরা দেবীর নিকট কিছু উপকরণ থাকিতে পারে ভাবিয়া তিনি তাঁহাকে পত্র লিখিয়া আমার সহিত একজন লোক সঙ্গে দিয়া তাঁহার বাড়ীতে পাঠাইয়া দেন। বৃদ্ধ বয়সেও কাজ তিনি করিতেন আগ্রহসহকারে, অনেকের ন্যায় অনর্থক লোককে হাঁটাহাঁটি করাইতেন না।

ইহার পর কিছুকাল তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই। ১৩৩৫ সালে আমি যখন বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের জননী ও সহধর্মিণীদের চিত্র সংগ্রহ ও প্রকাশে প্রবৃত্ত তখন একবার শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁহার নিকট গিয়াছিলাম। তিনি তখন অসুস্থ ছিলেন। আমার উদ্দেশ্যের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিলেও আমাকে সাহায্য করিতে পারিলেন না।

গত বৎসর হঠাৎ এক দিন তাঁহার একখানি পত্র পাইলাম। তাহাতে স্নেহের মৃদু ভর্ৎসনা ছিল। পত্রের মর্ম এই—'অনেক দিন আস নাই কেন? আগামী রবিবার প্রাতঃকালে আসিলে সুখী হইব। তোমার সঙ্গে আমার একটু কাজও আছে।'

তাঁহার অনুরোধ আদেশ বলিয়া শিরোধার্য করিলাম। নির্ধারিত সময়ের কিছু পরে পৌঁছিয়াছিলাম। চা ও জলযোগ করাইয়া তিনি নানা প্রকার সাহিত্যালোচনা করিতে লাগিলেন। সেকালের অনেক কথা হইল। তিনি বলিলেন, 'তুমি এত সব সেকালের কথা জানিলে কি করিয়া ?' আমি বলিলাম, আমার পিতামহ 'হিন্দুপেট্রিয়ট' ও 'বেঙ্গলী'র প্রবর্তক ও প্রথম সম্পাদক ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং আমার প্রমাতামহ 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড'-সম্পাদক ৺কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের জীবনীর উপকরণ ও রচনাবলী সংগ্রহের জন্য তৎকালীন অনেক সংবাদপত্র পাঠ করিতে হয় ও তাহাতে অনেক তথ্য জানিতে পারি। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পুস্তকাবলী, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য মহাশয়ের স্মৃতিকথা প্রভৃতিতেও সেকালের অনেক কথা আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—কৃষ্ণকমল বাবু এখন কোথায় আছেন, কেমন আছেন, কবে আমার সহিত তাঁহার দেখা হইয়াছে, তিনি এখনও পড়াশুনা করিতে পারেন কি না—নানা প্রশ্ন। বেলা বাড়িয়া গেল, ছাড়িতে চান না। অবশেষে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি বলিয়াছিলেন আপনার কি কাজ আছে—আমি কি করিতে পারি ?' তিনি বলিলেন, 'কাজ ? এমন কিছু নয়। তোমাকে অনেক দিন দেখি নাই, দেখিতে ইচ্ছা হইল। আর দেখ, তোমার সব বই কালীসিংহের জীবনী, নতুন দাদার জীবনী, কিশোরীচাঁদ মিত্রের জীবনী আনাইয়া পড়িলাম। পড়িয়া বড় ভাল লাগিল। মনে করিলাম তোমাকে লিখিয়া জানাই, তারপর ভাবিলাম কি আর লিখিব, তার চেয়ে তোমাকে মুখেই বলিয়া দি। আর একটা কথা। আমি একটা নূতন বই লিখছি তাতে বাঙ্গালা গদ্যলেখক যেমন দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ, কালীসিংহ প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত জীবনী ও রচনার নিদর্শন থাকিবে। তোমার বইগুলা থেকে অনেক সাহায্য নিচ্ছি।' আমি বলিলাম, 'সে ত আমার সৌভাগ্য। আমি ত পয়সার লোভে বই লিখি না, যশের লোভেও লিখি না। বিস্মৃতকীর্তি মহাত্মাদের সহিত নবীনগণের পরিচয় সাধন করিয়া দেওয়াই উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য আপনার নামের সহিত বিজড়িত গ্রন্থ দ্বারা আরও বেশী সিদ্ধিলাভ করিবে।'

তাহার পর কিছুক্ষণ গম্ভীর থাকিয়া বলিলেন, 'দেখ, তোমার বই পড়িতে পড়িতে একটা কথা মনে হল। আমি অনেক বড়, তোমাকে যদি একটা কথা বলি ত রাগ করিবে না ত ?' আমি বলিলাম, 'নিশ্চয়! আপনারাই ত আমাদের উপদেশ দিবেন। যদি কিছু অন্যায় লিখি আপনারা দেখাইয়া দিবেন না ত দিবেন কে ?'

তিনি বলিলেন, 'দেখ তোমার—এর জীবনীটি *সুন্দর* হয়েছে কিন্তু এক স্থানে তাঁহার চরিত্রদোষের উল্লেখ করিয়াছ। আমার মনে হয় ওটা না করিলেই ভাল হইত। লোকে পরলোকগত হইলে তাঁহার দোষের কথা বিস্মৃত হওয়াই উচিত।'

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। এ দেশে পরলোকগত ব্যক্তিগণকে দেবতা করিয়াই অঙ্কিত করা নিয়ম। 'Paint me as I am' জীবিতেরাও এ দেশে কেহ বলে না। কিন্তু জীবনচরিত-লেখক কি কেবল গুণের স্তাবক? বাল্মীকি বা ব্যাস অলৌকিক গুণসম্পন্ন মহাপুরুষগণের চরিত্রের গুণগানের সহিত তাঁহাদের কলঙ্ককথাও নির্ভীক ও অকুণ্ঠিতচিত্তে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

আমি বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া আসিবার সময় তিনি পুনরায় বলিলেন, 'ও কথাটা মনে রেখ, যেটা বললাম। স্বর্গগত ব্যক্তিদের দোষের কথা মনে করিতে নাই।' ইহার পরদিনই বোধ হয় তিনি চিঠি লিখিয়া জিজ্ঞাসা করেন, আচার্য কৃষ্ণকমলের 'পুরাতন প্রসঙ্গ' ও শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' কোথায় পাওয়া যায়।

গত ভাদ্র মাসে (১৩৩৮) তাঁহার নিকট যাইবার আমার প্রয়োজন হয়। পরবর্তী আশ্বিনে 'বিচিত্রা'র রবীন্দ্রজয়ন্তী সংখ্যা বাহির হইবে, সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে বলিলেন, উহার জন্য কোন নূতন ছবি ও সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ দিতে হইবে। আমি বলিলাম, 'দেখুন, এত কাল রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কত প্রবন্ধ ছাপা হইল, তাঁহার কত ছবি প্রকাশিত হইল, কিন্তু আমার দুঃখ হয়, তাঁহার পত্নী আপনাদের নিকট এরূপ উপেক্ষিতা রহিলেন কেন? তাঁহার ছবি এ পর্যন্ত কোথাও কোন সম্পাদককে ছাপিতে দেখিলাম না, তাঁহার কোনও বৃত্তান্ত কোথাও প্রকাশিত হইতে দেখিলাম না।' উপেন্দ্রবাবু ইহা শুনিয়া বলিলেন, 'ঠিক বলিয়াছেন। আপনাকে এই কাজটা করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথের সহধর্মিণীর চিত্র ও সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত আপনাকে বিচিত্রায় সংগ্রহ করিয়া দিতে হইবে।' রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সহধর্মিণীর ছবি চাহিলে দিবেন কি না কে জানে? যাঁহার নিকট একখানি ছবি পাইব আশা করিয়াছিলাম, তিনি শেষ মুহূর্তে দিতে পারিলেন না। অগত্যা এক দিন প্রাতঃকালে স্বর্ণকুমারীর শরণাপন্ন হইলাম। তাঁহার নিকট চিত্র পাওয়া যাইবে, কবিপত্নী সম্বন্ধে দুই-একটি কথাও জানা যাইবে, উভয় উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইবে, এই আশা করিয়া গেলাম। দেখিলাম তিনি একজন গায়ককে লইয়া তাঁহার রচিত ছেলে-মেয়েদের পাঠোপযোগী একটি গ্রন্থের গানের স্বরলিপি করাইতেছেন। আমাকে বলিলেন, 'তুমি গান শুনিতে ভালবাস?' আমি বলিলাম—'গান শুনিতে কে না ভালবাসে?' 'কি গান শুনবে? নাচের গান ভাল লাগে, না প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যবিষয়ক গান, না ধর্মসঙ্গীত?' আমি বলিলাম, 'সব গানই ভাল লাগে।' তখন গায়ককে এক-একটি গানের প্রথম পদ বলিয়া দিয়া গান গাহিতে বলিলেন। কতকগুলি গান শুনা হইল। তাহার পর আমার আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলাম। তিনি বলিলেন, 'তার ছবি রবির কাছে চাইলে না কেন, কি রথীর কাছে? তাদের কাছে পরিণত বয়সের ভাল ছবি আছে।' আমি

বলিলাম, 'আমরা চাই তাঁহাদের না জানাইয়া ছাপিতে—তাঁহাদের একটা surprise দেওয়া যাইবে।' তিনি আমার দুষ্টামি বুঝিলেন, মৃদু হাসিলেন। তারপর বলিলেন, 'আমার কাছে যে ছবি আছে সে বহু পুরাতন ছবি, বিবাহের পরেই তোলা, সে ছবি কি ছাপা ভাল হবে? ছবিখানা খুঁজিয়াও দেখিতে হইবে, কোথায় আছে।' আমি বলিলাম—'আমার অসুস্থতার জন্য আসিতে পারি নাই, অথচ 'বিচিত্রা'কে প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছি, দুই-চারি দিনে কাগজ বাহির হইবে, ছবিখানি দুই-এক দিনের মধ্যেই যে আমার চাই।' দুই-এক দিনের মধ্যেই পত্র পাইলাম, ছবি খুঁজিয়া পাইয়াছেন, আনিতে পারি। আমার অসুস্থতার জন্য নির্দিষ্ট দিনে যাইতে পারিলাম না। দুই দিন পরে কর্মস্থল হইতে ফিরিবার সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি তখন তাঁহার নূতন স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ সাহিত্য-স্রোতের ফাইলগুলি দেখিতেছিলেন। আমাকে দেখাইলেন। উহাতে প্রাগুল্লিখিত কয়েকজন গদ্য-লেখকের জীবনী ও রচনার নিদর্শন ছাপা হইয়াছে। দেখিলাম কালীপ্রসন্ন সিংহ ও প্যারীচাঁদ মিত্র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি আমার গ্রন্থের নিকট ঋণী তাহা স্পষ্ট লিখিয়াছেন। স্কুলপাঠ্য গ্রন্থে নূতন গবেষণা থাকে না, প্রকাশিত গ্রন্থ হইতে সারভাগ সঙ্কলন করা হয় তজ্জন্য কেহ ঋণ স্বীকার করে না এবং না করিলেও কেহ দোষ গ্রহণ করে না। অনেক খ্যাতনামা গবেষক বেমালুম পরের লেখা নিজের বলিয়া চালাইয়া দিয়া থাকেন, ঋণ স্বীকার করা প্রয়োজন মনে করেন না। কিন্তু স্বর্ণকুমারী যাহার যাহা প্রাপ্য তাহা তাহাকে দেওয়া সঙ্গত বিবেচনা করিতেন। রবীন্দ্রনাথের সহধর্মিণীর চিত্র তৎক্ষণাৎ আনাইয়া দিলেন। উহা গত বৎসরে আশ্বিনের বিচিত্রায় প্রকাশিত করিয়াছিলাম।

সাহিত্য-স্রোত গ্রন্থ সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিয়াছিলাম প্রত্যেক লেখকের জীবনী ও রচনার সহিত তাঁহাদিগের এক-এক খানি প্রতিকৃতি দিলে ভাল হয়; ইহার পর আমি বিদায় গ্রহণ করিয়া বাটী ফিরিয়া আসিলাম। জানিতাম না ইহাই আমার শেষ দেখা ও শেষ বিদায় গ্রহণ।

ইহার পর তাঁহার একখানি মাত্র পত্র পাইয়াছিলাম। তাহাতে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—প্যারীচাঁদ মিত্র ও অক্ষয়কুমার দত্তের যৌবনের ছবি পাওয়া যায় কি না। উত্তরে আমি লিখিয়াছিলাম যে প্যারীচাঁদের যৌবনের ছবি মদ্বিরচিত 'ভোলানাথ চন্দের জীবনচরিতে' এবং অন্য গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। অক্ষয় দত্তের বৃদ্ধ বয়সের ছবিই দেখিয়াছি, যৌবনের ছবি পাওয়া যাইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই।

তাঁহার সহিত শেষ সাক্ষাতের দিনে সাহিত্যালোচনায় তাঁহার যে উৎসাহের অগ্নিশিখা, নয়নে যে প্রতিভার দীপ্তি দেখিয়াছিলাম, তাহা যে এত শীঘ্র নির্বাণ লাভ করিবে তাহা

কে জানিত? যাঁহারা আমাদের মত তাঁহাকে অল্পকালও দেখিবার সুযোগ ও অধিকার লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, তাঁহারা জানেন সাহিত্যপ্রেমের এই স্বর্ণপ্রতিমা বাণীসেবার এই মূর্তিমতী নিষ্ঠা কত সাহিত্যসেবকের হৃদয়ে সাহিত্যানুরাগ প্রজ্বলিত করিয়াছেন, কত অভিনব প্রেরণা দান করিয়াছেন। কালে হয়ত তাঁহার মূল্যবান গ্রন্থরাজি অনাদৃত হইতে পারে কিন্তু প্রায় ষাটবর্ষব্যাপী অক্লান্ত বাণীসেবার দ্বারা তিনি সাহিত্যচর্চার যে আদর্শ রাখিয়া গেলেন, উপদেশ ও উৎসাহ দ্বারা যে অসংখ্য লেখককে বাণী-সেবায় ব্রতী করিয়া গেলেন তজ্জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার প্রতিভাবান সহোদরগণের সহিত স্বর্ণকুমারীর নামও স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।"

৩

পূর্বেই বলা হয়েছে স্বর্ণকুমারীর সম্বর্ধনার নিমিত্ত একদা দেশবাসী উদ্যোগী হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর ফলে বঙ্গবাসীর সেই সদভিপ্রায় অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়। তাঁর তিরোধানের পর স্মৃতিরক্ষার তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য আয়োজন না হলেও কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে এ সম্পর্কে প্রশংসনীয় উদ্যম প্রকাশ করা হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে এ ব্যাপারে যে উদ্যোগ করা হয় তা এইরূপ: "১৩৩৯ সালের ১৯ আষাঢ় স্বর্ণকুমারী দেবীর মৃত্যু হয়। পরবর্তী ২৮ এ শ্রাবণ তারিখে পরিষদের কার্যনির্বাহক-সমিতির অধিবেশনে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব আলোচিত হয় এবং ইহার ব্যবস্থা করিবার জন্য নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া একটি শাখা-সমিতি গঠিত হয়:—

কামিনী রায় (পরে শ্রীরাজকুমারী দাস)
শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদক)
শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ (আহ্বানকারী)
(প্রয়োজন বোধ করিলে সমিতি সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন)

এই সমিতির প্রথম অধিবেশনে (২০ ভাদ্র ১৩৩৯) চিত্রশিল্পী এ. কে. নাগ দ্বারা স্বর্ণকুমারী দেবীর একখানি লাইফ সাইজ চিত্র প্রস্তুত করাইবার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং আরও স্থির হয়, 'একটি বার্ষিক পদক বা পুরস্কার দিবার জন্য অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থা করা হউক'।

২১৬ পরিষৎ-পরিচয়, কার্তিক ১৩৪৬, পৃ ১১৯।

চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে, তবে ইহার স্থানে স্থানে সংশোধন আবশ্যক।"[২১৬] পরবর্তী কালে 'স্বর্ণকুমারী-স্মৃতিরক্ষা-সমিতি' কর্তৃক 'স্বর্ণকুমারী-স্মৃতিরক্ষা-তহবিল' নির্মিত হয়; এর উদ্দেশ্য ছিল 'সুষ্ঠু উপায়ে স্মৃতিরক্ষা'। পরিষৎ-প্রদত্ত বিবরণ থেকে জানা যায়, "এই তহবিলের আয়ে স্বর্ণকুমারী দেবীর একখানি তৈলচিত্র প্রস্তুত করাইয়া পরিষদ্-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; ইহা ছাড়া সতী ঘোষকে 'স্বর্ণকুমারী-স্বর্ণপদক' দান ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত স্বর্ণকুমারীর জীবনী প্রকাশ করা হইয়াছে।"[২১৭] জানা যায় যে ১৩৪২ সালের ১৯ আষাঢ় তারিখে তৈলচিত্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ঐ বৎসরে "শ্রীমতী সতী ঘোষকে 'বঙ্গসাহিত্যে স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীর দান' বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার জন্য ২৪ এ ভাদ্র তারিখের বিশেষ অধিবেশনে 'স্বর্ণকুমারী-স্বর্ণপদক'" দান করা হয়।

২১৭ পরিষৎ-পরিচয়, ফাল্গুন ১৩৫৬, পৃ ৯৪।

দ্বিতীয় পর্ব

র্ণকুমারীর সাহিত্যসাধনা

উপন্যাস

১

বঙ্গদেশীয় মহিলাবর্গের সাহিত্যসৃষ্টির ইতিহাস পর্যালোচনাকালে ১৮৬৬-৭১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত কবিতা নাটক সন্দর্ভ প্রভৃতি রচনায় তাঁদের উৎসাহ উদ্যমের প্রমাণ পাওয়া গেলেও উপন্যাস ছোটগল্প অথবা আখ্যানধর্মী গদ্যরচনার নিদর্শন তেমন পরিলক্ষিত হয় না; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রমণীগণের কাব্যকবিতানির্মাণে প্রীতি ও আগ্রহ অধিকতর স্পষ্ট—কারণ সমকালীন বাংলা সাহিত্যে তখনও কবিতার প্রভাব অতিশয়িত। সাহিত্যক্ষেত্রে স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রথম আবির্ভাবকাল সম্ভবত ১৮৭৬ সালের ডিসেম্বরে, তাঁর প্রথম উপন্যাস দীপনির্বাণ ঐসময় প্রকাশিত হয়। তৎপূর্ববর্তী উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের মধ্যে কয়েকটি এইরূপ: কৃষ্ণকামিনী দাসীর কাব্য 'চিত্তবিলাসিনী' (১৮৫৬), পাবনার বামাসুন্দরী দেবীর সন্দর্ভ 'কি কি কুসংস্কার তিরোহিত হইলে এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে' (১৮৬১), কালীঘাটের হরকুমারী দেবীর কাব্য 'বিদ্যাদারিদ্র্যদলনী' (১৮৬১), দুর্গাচরণ গুপ্তের পত্নী কৈলাসবাসিনী দেবীর প্রবন্ধদ্বয় 'হিন্দুমহিলাগণের হীনাবস্থা' (১৮৬৩), এবং 'হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভাস ও তাহার সমুন্নতি' (১৮৬৫), মার্থা সৌদামিনী সিংহের 'নারীচরিত' (১৮৬৫), রাখালমণি গুপ্তের 'কবিতামালা' (১৮৬৫), শিবপুরের কামিনীসুন্দরী দেবীর 'উর্ব্বশী নাটক' (১৮৬৬) এবং 'বালা বোধিকা' (১৮৬৮) ও 'ঊষা নাটক' (১৮৭১), বরিশালের বসন্তকুমারী দাসীর 'কবিতামঞ্জরী' এবং 'যোবিদ্বিজ্ঞান' (১৮৭৫), কৈলাসবাসিনী দেবীর সন্দর্ভ 'বিশ্বের শোভা' (১৮৬৯), দময়ন্তী দেবীর সন্দর্ভ 'পতিব্রতা ধর্ম্ম' (১৮৬৯), নবীনকালী দেবীর উপন্যাস 'কামিনীকলঙ্ক' (১৮৭০), কৃষ্ণময়ী দাসীর 'পদ্যমালা' (১৮৭০), অন্নদাসুন্দরী দাসীর কাব্য 'অবলা-বিলাপ' (১৮৭২), লক্ষ্মীমণি দেবীর সামাজিক নাটক 'চিরসন্ন্যাসিনী' (১৮৭২), হেমাঙ্গিনীর আখ্যায়িকা 'মনোরমা' (১৮৭৪), প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীর পত্নী সুরঙ্গিনী দেবীর রাজস্থানীয় ইতিহাস-মূলক আখ্যায়িকা 'তারাচরিত' (১৮৭৫) প্রভৃতি।[১] উল্লেখিত গ্রন্থ ও গ্রন্থকর্ত্রী ব্যতীত আরও একাধিক লেখিকার রচনা যে সংবাদপ্রভাকর, বামাবোধিনী পত্রিকাদিতে সমাদৃত হয়েছিল তার প্রমাণ বর্তমান।

উপর্যুক্ত তালিকা থেকে অবগত হওয়া যায় ঔপন্যাসিকরূপে স্বর্ণকুমারীর আত্মপ্রকাশের পূর্বে রচিত মার্থা সৌদামিনী সিংহের নারীচরিতে আখ্যানের আভাস পাওয়া যায়, তাছাড়া হেমাঙ্গিনীর মনোরমা এবং সুরঙ্গিনী দেবীর তারাচরিত সম্পূর্ণত আখ্যায়িকাধর্মী; নবীন-

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা-সাহিত্যে বঙ্গমহিলার দান, বিশ্বভারতী পত্রিকা ৮ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, পৃ ২৬৫-৬৭।

কালীর কামিনীকলঙ্ক উপন্যাসরূপে এবং সুরঙ্গিনীর তারাচরিত রাজস্থানের ইতিহাস-নির্ভর কাহিনীগ্রন্থরূপে স্বীকৃতিলাভ করেছিল। ফলত মহিলা-রচিত ইতিহাসাশ্রয়ী আখ্যায়িকা বিশেষত রাজস্থানের ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত উল্লিখিত গদ্যগ্রন্থ এবং উপন্যাস দীপনির্বাণের পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। কথাগ্রন্থ ব্যতীত সন্দর্ভ কবিতা ও নাটক রচয়িত্রীরূপে স্বর্ণকুমারীর একাধিক পূর্বসূরীর নাম উক্ত তালিকায় পাওয়া যাবে। তথাপি একথা প্রসঙ্গক্রমে স্মরণীয় যে স্বর্ণকুমারী দেবী সাহিত্যসৃষ্টি ব্যাপারে এই মহিলা সাহিত্যিকগণের রিক্থ গ্রহণ অপেক্ষা সমকালীন শক্তিমান উপন্যাসশিল্পীর নিকট অধিক ঋণ স্বীকার করেছেন। তাঁর অপূর্ব আত্মপ্রকাশ ও শক্তির স্ফূরণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, "গত শতাব্দীর সপ্তম দশকে এমন একজন প্রতিভাশালিনী সাহিত্যিক আবির্ভূত হন, যাঁহার গদ্য-পদ্যে আমরা সর্বপ্রথম নূতনত্বের আস্বাদ পাই। ইনি রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা স্বর্ণকুমারী দেবী। প্রতিভার যাদুস্পর্শে সর্বপ্রথম ইঁহার রচনাই শিল্পসুষমামণ্ডিত হইয়া উঠে, একথা বলা চলে। সাহিত্যের সকল বিভাগেই তাঁহার দান বিপুল। এই সময় হইতেই প্রকৃতপক্ষে আমরা এমন কতকগুলি মহিলা-সাহিত্যিকের দর্শন পাই, যাঁহারা সাহিত্যে বিশিষ্ট ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন।"[২] অর্থাৎ বঙ্গসাহিত্যের প্রথম কৃতী মহিলা সাহিত্যিক তিনিই, তাঁর পূর্বে কোনো কোনো লেখিকার অভ্যুদয় হলেও তাঁরা এই সম্মানের অধিকারী হতে পারেননি। বিশেষত উপন্যাসের ক্ষেত্রে যে তিনি নবীনকালী দেবী কিংবা সুরঙ্গিনী দেবীর দ্বারা প্রভাবিত হননি তা স্বীকার করা চলে। বস্তুত স্বর্ণকুমারীর দীপনির্বাণ প্রভৃতির সঙ্গে সমকালীন বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্র প্রমুখ ঔপন্যাসিকের প্রবর্তিত রীতি ও ধারার যতটা সাদৃশ্য ও সম্পর্ক আছে ততটা তাঁর পূর্ববর্তী লেখিকাগণের রচনার সঙ্গে নেই। তবে তাঁর পূর্ববর্তী মহিলাশিল্পীর রচনা-বস্তু নিরীক্ষণ করলে স্বর্ণকুমারীর শ্রেষ্ঠত্বসূচক আবির্ভাবকে আকস্মিক বলে মনে হবে না।

২

প্রকাশকালের ক্রমানুসারে স্বর্ণকুমারী-বিরচিত উপন্যাসের তালিকা প্রদত্ত হল: দীপনির্বাণ, ছিন্নমুকুল, মালতী, মিবাররাজ, হুগলীর ইমামবাড়ী, স্নেহলতা, বিদ্রোহ, ফুলের মালা, কাহাকে, বিচিত্রা, স্বপ্নবাণী এবং মিলনরাত্রি। এর মধ্যে মালতী নানা কারণে গল্পরূপে বিবেচিত হওয়ায় ছোটগল্প-অধ্যায়ে তার আলোচনা করা হল। অবশিষ্ট গ্রন্থগুলি অভিনিবেশ সহকারে পাঠকালে দেখা যায় তারা সাধারণভাবে ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাসরূপে

২ ঐ পৃ ২৩৭।

অভিহিত হতে পারে। এ সম্পর্কে লেখিকা সচেতন ছিলেন বলে মনে হয় কারণ কোনো কোনো গ্রন্থের আখ্যাপত্রে এবং বিজ্ঞাপনে ঐতিহাসিক বা সামাজিক উপন্যাসরূপে তাদের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ভারতী কিংবা ভারতী ও বালক পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন-গুলির মধ্যে এর সমর্থন পাওয়া যায়। সে যা হোক এই দ্বিবিধ উপন্যাসের মধ্যে কোনো স্পষ্ট যোগসূত্র আছে কি না, একটি অপরটির পরিণাম কি না সেসকল অত্যাবশ্যক প্রসঙ্গের অবতারণা করার পূর্বে লেখিকার উপন্যাস সম্পর্কিত সাধারণ ধারণা এবং তাঁর উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যাদি আলোচনার যথেষ্ট অবকাশ আছে।

৩

উপন্যাস বা কথাসাহিত্য হল মানবহৃদয়ের ছবি, মানুষের স্বরূপের অভিব্যক্তি-সাধন তাই ঔপন্যাসিকের আদর্শ। মানুষের জীবন এবং তার হৃদয়রহস্য তথা স্বরূপসন্ধান কথাসাহিত্যের মূল লক্ষ্য। সেহেতু ব্যাপকতম অর্থে উপন্যাস হল a personal, a direct impression of life : that, to begin with, constitutes its value, which is greater or less according to the intensity of the impression.[৩] সাহিত্যিক জীবনকে আবিষ্কার করেন স্বীকার করেন, তাই সাহিত্যে মানবজীবনসম্পর্কিত অনুভূতিসমূহ সমর্পিত হয়। তারই মধ্যে আমরা আপনাকে এবং আপনার আবেষ্টনী তথা সমগ্রভাবে জগৎ ও জীবন এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের স্বরূপ উপলব্ধি করি, এই আত্মোপলব্ধির ও জীবনরস আস্বাদনের অলৌকিক আনন্দ কথাসাহিত্যপাঠে পাওয়া যায় বলে তা সার্থক শিল্প। জীবন ব্যাপারে ঔপন্যাসিকের কর্তব্য সম্বন্ধে ভার্জিনিয়া উলফ বিষয়ান্তরে যে মন্তব্য করেছেন তার স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করে বর্তমান ক্ষেত্রেও বলা চলে, Life is not a series of gig lamps symmetrically arranged, life is a luminous halo, a semi-transparent envelope surrounding us from the beginning of consciousness to the end. Is it not the task of the novelist to convey this varying, this unknown and uncircumscribed spirit, whatever aberration or complexity it may display, with as little mixture of the alien and external as possible ?[৪] এরূপে জীবনভাবনার ব্যাপারে ঔপন্যাসিকের নিষ্ঠা পরিলক্ষিত হয়। কথাসাহিত্য একান্তভাবে জীবনঘটিত

৩ Henry James, The Art of Fiction and Other Essays, 1948, p 8,

৪ The Common Reader, first series, 1957, p 189,

এবং that life has a pattern. After all, the fact that the novelist writes about life is not so very extraordinary ; it is the only thing he knows anything about.[৫] অতএব বিশ্বস্ততার সঙ্গেই তিনি একাজ সম্পন্ন করে থাকেন।

(লেখকের জীবনদর্শন বা জীবন সম্বন্ধে তাঁর প্রসারিত দৃষ্টি এবং সুতীব্র সহানুভূতিসঞ্জাত বিপুল অভিজ্ঞতা চরিত্র কাহিনী প্রভৃতির আধারে পরিবেশিত হয় এবং তা যথার্থ সহৃদয়ের হৃদয়সংবাদী হয়ে উঠে; সুন্দর ও সমর্থ নীতিবোধের দ্বারা এই জীবনবিষয়ক পরম বোধাবলী উদ্দীপ্ত হয়ে থাকে। মহৎ শিল্পমাত্রই মূলত নীতির সঙ্গে যুক্ত বলে শ্রেষ্ঠ শিল্পনির্মাণের জন্য রূপকার নীতিকে উপেক্ষা বা তার বিরুদ্ধতা করতে পারেন না।) স্বর্ণকুমারীর সমসাময়িক বঙ্কিমচন্দ্রের নির্দেশগুলি প্রসঙ্গত স্মরণীয়: "সৌন্দর্য সৃষ্টিই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।" "যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।" "সাহিত্যও ধর্ম ছাড়া নহে। কেন না, সাহিত্য সত্যমূলক। যাহা সত্য, তাহা ধর্ম।"[৬] দ্বিতীয় বক্তব্যটি অনুধাবনকালে মনে হয় যেন মঙ্গলসাধন ও সৌন্দর্যসৃষ্টির কোনো অপরিহার্য বন্ধন নেই, যেন এই বিধানদ্বয় পরস্পরের বিকল্প। প্রকৃতপক্ষে এতদুভয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, উভয়েই সমার্থক কারণ সত্য ধর্ম ও সুন্দরের সমন্বয়ে যে সাহিত্য রচিত হয়ে থাকে তা-ই মহৎ শিল্পসৃষ্টি। উত্তরচরিত-শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন, "কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে—কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষ সাধন—চিত্তশুদ্ধিজনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা—কিন্তু নীতিব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও নীতিশিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন। এই সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।" অথচ পরবর্তী কালে রচিত 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদনে' বলা হয়েছে, "যাহা অসত্য, ধর্মবিরুদ্ধ; পরনিন্দা বা পরপীড়ন বা স্বার্থসাধন যাহার উদ্দেশ্য, সেসকল প্রবন্ধ কখনও হিতকর হইতে পারে না, সুতরাং তাহা একেবারে

৫ Edwin Muir, The Structure of the Novel, 1957, pp 10-11.

৬ প্রথম উদ্ধৃতিটি বিবিধ প্রবন্ধ গ্রন্থের অন্তর্গত 'উত্তরচরিত' শীর্ষক প্রবন্ধ (বঙ্গদর্শন জ্যৈষ্ঠ-আশ্বিন ১২৭৯) থেকে গৃহীত; দ্বিতীয়টি ঐ গ্রন্থের 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' (প্রচার মাঘ ১২৯১) এবং তৃতীয়টি একই গ্রন্থের 'ধর্ম এবং সাহিত্য' নামক প্রবন্ধ (প্রচার পৌষ ১২৯২) থেকে সংগৃহীত। পরবর্তী আলোচনা থেকে স্পষ্টত উপলব্ধ হয় যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যাদর্শও রূপপরিবর্তমান এবং তা আপাতদৃষ্টিতে নীতিমার্গচারী হয়ে উঠেছে।— দ্র অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ ১ম খণ্ড, ১৩৭৬ পৃ ৩৩-৩৭।

পরিহার্য। সত্য ও ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য।" শিল্প জীবন-সমুৎপাদিত বলে জীবনের উপরে তা ক্রিয়াশীল; এইজন্য জীবনের প্রতি শিল্পী ও শিল্পের দায়িত্ব অস্বীকার করা চলে না। নীতি এভাবে জীবনের সঙ্গে কবচ-কুণ্ডলের মত জড়িত থাকার ফলে প্রকারান্তরে তা সাহিত্যের সঙ্গে সংমিশ্রিত। জগৎচরাচরব্যাপী যে নিয়মের রাজত্ব বর্তমান তার সঙ্গে মানুষের ভালমন্দ সুখদুঃখের কাহিনী একই সূত্রে গ্রথিত, একথা মহৎ শিল্পীমাত্রেই সর্বদা স্মরণ রাখেন। সমুন্নত নীতিবোধ এবং বিশ্ববিধান ও নিয়মপ্রপঞ্চের স্রোতে প্রবাহিত বিভাবিত জীবন তাই অপরিসীম বিশালত্ব লাভ করে, মহাকালের পদস্পর্শে মহতো মহীয়ান্ এবং অণোরণীয়ান্ সকলেরই উজ্জীবন ঘটে। শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শন এবং জীবনাদর্শ এ কারণে এত মহিমান্বিত, তাই এর সান্নিধ্যে এসে সহৃদয়ের পরিশীলিত চিত্ত অনায়াসে বিস্ফারিত হয়ে যায়। লেখকের এই জীবনদর্শন কি? জগৎ ও জীবনের মধ্যবর্তী আপাতশৃঙ্খলাবিহীন যেসকল ভাব ও ভাবনা নিরন্তর প্রবাহিত হতে থাকে সাধারণত লেখক organise these discrete ideas into a stable attitude towards the world, an attitude that readers can at least feel behind his work, even though neither he nor they can define it in terms of logic. This is his philosophy of life, and a novelist without a plilosophy of life may safely be ignored.[৭] সমস্ত কিছুরই মূলে রয়েছে মানবহৃদয়কে অবলম্বন করে মানুষের স্বরূপসন্ধান এবং জীবনজিজ্ঞাসা। একটি পরিবারের বাস্তিঘর দেখতে যাওয়ার জন্য যে আয়োজন উদ্যোগ তার মধ্যে ঘটনা আছে, কোনো মধ্যযুগীয় দুর্গাবরোধের কাহিনীর তুলনায় তা কম চিত্তাকর্ষক নয়। মানবজীবনের আশানৈরাশ্য আকাঙ্ক্ষা-অস্থিরত্বের চাঞ্চল্যে তা প্রাণবন্ত এবং যতই অস্থির ততই চমৎকার। প্রাচীন দুর্গসম্পর্কিত অজ্ঞানতাজনিত রহস্যময়তা, পাষাণ প্রাকারের দুর্ভেদ্য দৃঢ়তা, কারাগারকেন্দ্রিক যুগযুগসঞ্চিত ব্যর্থতা বেদনার গুরুভার দীর্ঘশ্বাস সমস্ত কিছুই সুবিপুল বিস্ময় উদ্রেক করে। কিন্তু যে মানবিক আশা-অস্থিরতা দিগন্তপ্রসারী জীবনসমুদ্রে সতত সঞ্চরমাণ, যে অকিঞ্চিৎকর প্রাত্যহিকতা তীব্র অনুভূতির সঙ্গে বাগর্থের মত সম্পৃক্ত তাও কম চিত্তবিস্ফারক নয়। প্রাণধারণের নিমিত্ত যে প্রবীণ মানুষটি আদিম ও রুদ্র সমুদ্রের মুখের গ্রাস বক্ষের মণি ছিনিয়ে আনে সেই সংগ্রামশীল মৎস্যশিকারীর সঙ্গে যখন আমরা আত্মীয়তা অনুভব করি তখনই আমরা মহৎ, কারণ এর পশ্চাতে যে জীবনদর্শন সক্রিয় তা মহৎ ও বিশাল এবং তদ্দ্বারা স্পৃষ্ট কাহিনী ও চরিত্র তথা জীবন অবশ্যই সমুন্নত।

কথাসাহিত্যে 'কথা' আদৌ গৌণ নয়। নাটকেও কথা ছিল, কথা ছিল মহাকাব্যে

৭ John Carruthers, Scheherazade or The Future of the English Novel, p 33.

কিংবা নাট্যধর্মী ও মহাকাব্যোপম রচনায়; অথচ স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করা হল কথা-সাহিত্যকে। কথা এক্ষেত্রে কত প্রধান তা সহজেই অনুমেয়। ঋগ্বেদ, অথর্ববেদ (৮. ১. ১৬) পাণিনী (৫. ৩. ২৬) ও তৈত্তিরীয় সংহিতায় 'কথা' ঔৎসুক্য-কৌতূহল-জিজ্ঞাসাবাচক শব্দরূপে ব্যবহৃত; মনুসংহিতায় উক্তি ও কথোপকথন বোঝাতে শব্দটি প্রযুক্ত। আবার রামায়ণ মহাভারত হিতোপদেশ প্রভৃতির মধ্যে গল্পের প্রতিশব্দ রূপে 'কথা'র ব্যবহার লক্ষিত হয়।[৮] কথাসাহিত্যের 'কথা'র আধুনিক তাৎপর্যের সঙ্গে তাই তার প্রাচীন অভিধার ব্যবধান খুবই কম। অবশ্য সাধারণ গল্প থেকে উপন্যাসের কথা বা কাহিনীর স্বাতন্ত্র্য আছে। শুধু ঘটনাবিবৃতির স্থান এখানে নেই, কালনিবদ্ধ ঘটনাপরম্পরার মধ্যে রহস্যময়তা এবং সম্ভাব্য অপ্রত্যাশিতের সৃষ্টি করা ঔপন্যাসিকের কর্তব্য। গল্প বা Story হল সাধারণ ঘটনাবিবৃতি মাত্র, কিন্তু A plot is also a narrative of events, the emphasis falling on casualty[৯] এবং এর ফলেই how-whence-why-এর সুপ্রচুর অবকাশ থাকে কথাসাহিত্যের মধ্যে। এই ঘটনার মূলে আছে চরিত্র, বরং বলা ভাল ঘটনা ও চরিত্র পরস্পরনিবদ্ধ; এই পরস্পরসাপেক্ষতার জন্য ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে যেমন চরিত্রের আবির্ভাব তেমনি চরিত্রবিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনার অগ্রগতি। জনৈক সমালোচক মন্তব্য করেছেন, ঘটনা ও চরিত্রকে কেবলমাত্র কৃত্রিমভাবে পরস্পরবিচ্ছিন্ন করা চলে।[১০] কারণ ঘটনা সর্বদা জীবনকেন্দ্রিক বলে ঘটনার সমাগমে চরিত্রও অনিবার্যভাবে অভ্যুদিত হয়। জাগতিক ঘটনা সম্বন্ধে লেখক সর্বদা সচেতন থাকেন বলে লেখকের অভিজ্ঞতা-ভাণ্ডার সতত সমৃদ্ধ হতে থাকে; তাই শিল্পের জগৎ হল সমূহ জীবন, সকল অনুভূতি, সর্ববিধ পর্যবেক্ষণ—এককথায় সমগ্র অভিজ্ঞতা।[১১] প্লট ও চরিত্রনির্মাণের পশ্চাতে লেখকের বিচিত্র জীবনবোধ ও বিপুল অভিজ্ঞতা সজাগ ও সক্রিয় থাকে, সহৃদয় পাঠক এদের সান্নিধ্যে এসে উল্লসিত হতে থাকেন আত্মোপলব্ধি ও আত্মাবিষ্কারের ফলে। বলা হয়েছে, character, in any sense in which we can get at it, is action, and action is plot, and any plot which hangs......plays upon our emotion, our suspense, by means of personal references.[১২]

৮ Monier Monier-Williams, A Sanskrit-English Dictionary, 1936, p 247.

৯ E. M. Forster, Aspects of the Novel, 1927, p 130.

১০ Robert Liddell, A Treatise on the Novel, 1955, p 71.

১১ The Art of Fiction etc., p 17.

১২ Henry James, Partial Portraits—Essays on Maupassaut, 1888. রবার্ট লিডলের প্রাগুক্ত গ্রন্থে ব্যবহৃত (পৃ ৭২) উদ্ধৃতির কিয়দংশ।

প্লট চরিত্র ও জীবনদর্শনের এই অবিচ্ছেদ্যতা কথাসাহিত্যনির্মিতিতে সর্বদা স্বীকৃত হয়। 'এক যে ছিল' দিয়ে গল্প অবতারণার সঙ্গে সঙ্গে 'রাজা' নামক ব্যক্তিটির আগমন অনিবার্য। 'নগেন্দ্র দত্ত নৌকারোহণে যাইতেছিলেন' কিংবা 'অনেক দিনের পর আমি শ্বশুরবাড়ী যাইতেছিলাম' এর মধ্যেও একই ব্যাপার সংঘটিত। ঘটমান অতীতে রচিত প্রথম বাক্যটির পর চরিত্রকে সরিয়ে রেখে নৌযাত্রার বর্ণনা এবং অপর ক্ষেত্রে যাত্রাকথার পরিবর্তে 'আমি'র পরিচয় প্রাধান্য অর্জন করেছে; অন্তত এটুকু বেশ বোঝা যায় ঘটনা ও চরিত্র ভাইবোনের মত পরস্পরের হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে পড়েছে, জীবনদর্শনের অভিভাবকত্বও অনুভবগ্রাহ্য। 'মহিমের পরম বন্ধু ছিল সুরেশ'—এর মধ্যে আছে দুটি চরিত্র আর তাদের পরম বন্ধুত্বের প্রসঙ্গ; কিন্তু ছোট্ট সমাপিকা ক্রিয়াটি ইঙ্গিত করছে এক অশুভ ব্যাপার, যা 'ছিল' এখন আর তা নেই কিংবা থাকবে না অথবা কি যেন হয়ে যাবে। অপূর্ব অদ্ভুত রহস্যময়তা-জিজ্ঞাসা-কৌতূহল এখানে এসে জড় হয়ে দাঁড়ায়। এই 'ছিল' সংকেত করছে ঘটনার অনিবার্য রূপান্তর, পরিবর্তন ও casualty। এভাবে সম্ভাব্য অপ্রত্যাশিত বিকশিত হয়ে উঠেছে, ঘটনা ও চরিত্র বিকশিত হয়ে উঠেছে; সুতীব্র অনুভূতি আর বিস্তৃত সহানুভূতি নিয়ে উপন্যাস দ্রুত বিকাশাত্মক হয়ে পড়েছে। কথাসাহিত্য পাঠের পরিণামে সকল সহৃদয়ের হৃদয় এর সংস্পর্শে এসে ব্যাপ্তি ও বিশালতা লাভ করে, ঔপন্যাসিকের জীবনবোধ তার হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়ে যায়।

৪

উপন্যাস নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা স্বর্ণকুমারী করেননি। এমন কি সাহিত্যসাধনার প্রথম পর্বে লেখিকা উপন্যাস শব্দটিকে নানা অর্থে ও বিবিধ প্রকারে অর্থাৎ শিথিলভাবে প্রয়োগ করেছেন। 'ক্ষত্রিয় রমণী', 'কুমার ভীমসিংহ' প্রভৃতি ইতিহাসাশ্রিত গল্পকে তিনি বলেছেন 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'; 'রাজকন্যা' নাটককে অভিহিত করেছেন 'নাট্যোপন্যাস' রূপে; অন্যত্র 'কুমার ভীমসিংহ' গল্পটিকে বলা হয়েছে 'ঐতিহাসিক নাটক'। সাধারণভাবে বলা যায় যে আখ্যান বা উপাখ্যান বোঝাতে ব্যাপকভাবে 'উপন্যাস' শব্দটির ব্যবহার লক্ষিত হয়। অবশ্য পরবর্তী কালে তাঁর নিকট উক্ত শব্দ আধুনিক কালে প্রচলিত অভিধাযুক্ত ও তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে বিশিষ্ট পরিভাষায় রূপান্তরিত হয়ে যায়।

১২৯১ সালের ভারতীর বৈশাখ সংখ্যায় মুদ্রিত 'ভূমিকা' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি প্রসঙ্গক্রমে উপন্যাস সম্পর্কে যা বলেছেন তা এক্ষেত্রে উদ্ধারযোগ্য: "কবিতা ও উপন্যাসে এক প্রভেদ এই যে পদ্যে যে গুণের বর্ণনা করা হইতেছে সেই গুণই প্রকাশ্যতঃ মুখ্য বিষয় করা হয়, উপন্যাসে কোন একটি গুণ মুখ্য করার অভিপ্রায় থাকিলেও তাহা অন্যান্য কয়েকটি গুণের

পার্শ্বস্থ একটি গুণ বলিয়া প্রকাশ করা হয়।...সীতা কাব্যের নায়িকা—শকুন্তলা (কাব্যাকারে) উপন্যাসের নায়িকা। সীতার পতিপরায়ণতা দেখানই কবির একমাত্র উদ্দেশ্য,... একমাত্র পতিপরায়ণতা ভাবই সীতাতে মূর্তিমতী। আর শকুন্তলা? শকুন্তলার প্রেম কি সীতার মতই গভীর, নিঃস্বার্থ—দুষ্মন্তময় নহে? তথাপি শকুন্তলা মানুষ। শকুন্তলার প্রেম গভীর কিন্তু তথাপি শকুন্তলার অন্য হৃদয়ভাব একেবারে মুছিয়া যায় নাই। কালিদাস শকুন্তলার প্রেমকে মুখ্য পদবীতে দাঁড় করাইয়া অন্য সকল আনুষঙ্গিক ভাবও গৌণরূপে আঁকিয়াছেন।"

সীতা সম্বন্ধে তাঁর সকল কথা সত্য কি না সে প্রসঙ্গ স্বতন্ত্র, তবে সীতা এবং শকুন্তলার চরিত্র বিশ্লেষণ করে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা উপন্যাসের অনুকূলে প্রযোজ্য হতে পারে। শকুন্তলাকে মানুষরূপে অনুভব করা, তার চরিত্রের সর্ববিধ দোষগুণকে প্রকাশ করে পূর্ণ জীবন্ত চরিত্র নির্মাণ করা যে ঔপন্যাসিকের কর্তব্য সেকথা তিনি উল্লেখ করেছেন। জীবনের সমগ্রতার উপর নির্ভরশীল যে সাহিত্যিক চরিত্র আমাদের সহানুভূতি জাগ্রত করে তাকে জীবন্ত বলতে লেখিকার আপত্তি নেই; শকুন্তলার পতিপরায়ণতা ও সুগভীর প্রেমের সঙ্গে অন্য হৃদয়ভাব অঙ্কিত হয়েছে বলে মানুষ শকুন্তলা সৃষ্ট হয়েছে, তার সমগ্রতা এসেছে। জীবন্ত চরিত্র সম্বন্ধীয় এই ধারণার সঙ্গে আধুনিক কবি এলিয়টের মন্তব্যের সাদৃশ্য পাওয়া যায়—A 'living' character is not necessarily 'true to life'. It is a person when we can see and hear, whether he be true or false to human nature as we know it. What the creator of character need is not so much knowledge of motives as keen sensibility ;.........but he must be exceptionally aware of them.[১০]

স্বর্ণকুমারী কাহাকে-শীর্ষক উপন্যাসের মধ্যে উপন্যাস এবং ঔপন্যাসিকের ধর্ম বিশেষত জর্জ এলিয়টের রচনাবলী সম্পর্কে তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেছেন। উক্ত গ্রন্থের একাদশ পরিচ্ছেদে জর্জ এলিয়টের মিডলমার্চে পরিবেশিত 'লম্বা লম্বা লেকচারে'র পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি বলেন, "তাতে গল্পের interest তেমন নেই বটে, কিন্তু লেখকের ideal তা থেকে বেশ স্পষ্ট মনে বসে। বলতে কি, জর্জ এলিয়টের একটি লাইনও আমার বাদ দিতে ইচ্ছা করে না, অনাবশ্যক বা অপ্রীতিকর বলে মনে হয় না। যে পাতা ওলটাই যেখান থেকেই পড়ি, পড়তে পড়তে একটা জলন্ত সহানুভূতির ভাবে হৃদয় যেন সতেজ হয়ে উঠে—পৃথিবীর জীবনসমষ্টির মধ্যে নিজেকে অতি ক্ষুদ্রবল মনে হয় এবং সেই মহাসমষ্টিতে আপনার সুখদুঃখ বিসর্জন দিয়ে সুখী হতে ইচ্ছা করে।" অর্থাৎ নিছক ঘটনার পরিবেশন অপেক্ষা

১০ Robert Liddell, Principles of Fiction, 1956, p 106.

অভিজ্ঞতা প্রজ্ঞা তথা জীবনদর্শনের দ্বারা সিঞ্চিত কাহিনীবিন্যাস তাঁর অভিপ্রেত ; এস্থলে অলস্ত সহানুভূতি সঞ্চার ও সুমহৎ জাগতিক নিয়মস্রোতে অবগাহনের প্রসঙ্গটিও উত্থিত হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে বলা হয়েছে grand intellect এর সঙ্গে sympathetic heart and subtle instinct of true woman-এর মিলনসাধনের কথা। 'মানুষের সামান্য অসামান্য প্রত্যেক কার্যটি তার অন্তর স্বভাবের কিরূপ নিগূঢ় উদ্দেশ্য কিরূপ সূক্ষ্মতম ভাব থেকে প্রসূত' তার নির্ণয়ে ঔপন্যাসিকের আগ্রহ-অভিপ্রায়ের প্রসঙ্গও উত্থাপিত। কাহাকে উপন্যাসের নায়ক আরও বলেছেন, "নভেলিস্ট আর নীতিশিক্ষক এক নন। তিনিও নীতিশিক্ষা দেন বটে কিন্তু তাঁর প্রণালী স্বতন্ত্র, তিনি চিত্রকর। বিশ্বের অভঙ্গ অব্যর্থ নিয়মের মধ্যে, সমাজের ভঙ্গপ্রবণ ক্ষণিক নিয়মের মধ্যে নিয়তির এবং স্বভাবচক্রের গতিতে চরিত্রভেদে মানুষ কিরূপ বিচিত্র মূর্তিতে ফুটে ওঠে তাই ছবির মত এঁকে দেখানই নভেলিস্টের কাজ। জর্জ এলিয়ট মানুষের মনুষ্যত্ব ছুঁতে চান না, তাকে জড় বা দেবতা করতে চান না। সহানুভূতিতে ভালবাসাতে সেই মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ করতে চান মাত্র।" ঔপন্যাসিকের কর্তব্য এবং উপন্যাসের ধর্ম সম্বন্ধীয় উপর্যুক্ত মন্তব্যানুসারে এতদ্দেশীয় শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হলেন বঙ্কিমচন্দ্র, কাহাকে-এর মধ্যে সে কথাও উচ্চারিত।

ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের উদ্দেশ্য হিসাবে প্রধানত সৌন্দর্য-সৃষ্টির মাধ্যমে জগতের চিত্তশুদ্ধিবিধান অর্থাৎ সৌন্দর্যরচনা ও দেশের বা সমগ্র মনুষ্যজাতির কল্যাণসাধনের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন ; রমেশচন্দ্র শেষোক্ত পন্থায় অধিকতর আগ্রহশীল। স্বর্ণকুমারীর সাহিত্যসাধনার পশ্চাতেও স্বদেশহিতৈষণা যে প্রবলভাবে সক্রিয় ছিল তা দীপনির্বাণের উপহারপত্র পাঠ করলে জানা যায়। সংকীর্ণ কিংবা ব্যাপক অর্থে তিনি মানবজাতির কল্যাণকামী ও বিশ্ববন্ধু ছিলেন। উপন্যাসের উদ্দেশ্য ও কথাসাহিত্য পাঠের পরিণাম সম্পর্কে তাঁর যে ধারণা ও বিশ্বাস তার সঙ্গে উপরিউক্ত সিদ্ধান্তের সাদৃশ্য আছে। তিনি ১২৯১ সালের ভারতীতে মুদ্রিত 'ভূমিকায় বলেছেন, "কবিতা উপন্যাস ও ইতিহাস পাঠে আমাদিগের উদ্দমন বৃত্তির উন্নতি সাধনপক্ষে বহুল উপকারের সম্ভাবনা।… বিজ্ঞানে জ্ঞানবৃত্তির আর কবিতা উপন্যাস ইতিহাসে অনুভূতি ও উদযমন বৃত্তির বিশেষ উন্নতি সম্ভাবনা।" সংকীর্ণ অর্থে দেশের এবং ব্যাপক অর্থে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ-কামনার সঙ্গে সৌন্দর্যসৃষ্টি ও আনন্দানুভূতির সমন্বয়ে তিনি একান্ত বিশ্বাসী ছিলেন এবং উপন্যাসের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি এই ধারণাই পোষণ করতেন।

৫

স্বর্ণকুমারীর উপন্যাসের প্রথম প্রকাশের কালানুক্রমিক তালিকা থেকে সমর্থিত হয় যে প্রথমে তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন এবং পরিণামে সামাজিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে অন্তরিত হয়ে যান। তাই প্রথমে ঐতিহাসিক বা ইতিহাসাশ্রয়ী কিংবা ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে লেখিকার তৎসম্বন্ধীয় ধারণাগুলির কথা বলা যেতে পারে। (সাধারণভাবে বলা যায় ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাস এমন একটি অপরিহার্য বস্তু যাকে অবলম্বন করে কিংবা যার আধারে উপন্যাসের রস পরিবেশিত হয়ে থাকে। ইতিহাসনিষ্ঠা ও ইতিহাসচেতনা আধুনিক মনোভাবাপন্ন মানুষের লক্ষণ। সহৃদয় শিল্পীর ইতিহাসপ্রীতিও সেই বোধসঞ্জাত বলে আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যশিল্পের ক্ষেত্রে এই ইতিহাস-বিভাবনার শুভাবির্ভাব ঘটেছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে ইতিহাস অবলম্বন করে কাব্য মহাকাব্য নাটক প্রভৃতি বিচিত্র সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস প্রাচীন কালেও পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই আবির্ভূত হয়েছে।) নেপোলিয়নের পতনের প্রায় সমকালে স্কটের Waverly (১৮১৪) প্রকাশিত হয়। (নেপোলিয়নের পতনের পরে রাজনীতি রাষ্ট্রীয় ভৌগোলিক সীমাকে অতিক্রম করে বিশ্বব্যাপী হয়ে পড়ে, ফলে মানুষের ইতিহাসচেতনায় ব্যাপকতা ও প্রবল আগ্রহ দেখা দেয়। ফরাসী বিপ্লবের পূর্ববর্তী কাল থেকে বিখ্যাত কয়েকজন মনীষী আধুনিক মনোভাব নিয়ে ইতিহাস রচনায় আত্মনিয়োগ করেন ; এইরূপ ইতিহাসচিন্তার ফলে এমন একটি অভিনব সমাজের জন্মসম্ভাবনা অনিবার্য হয়ে উঠে সাম্য মৈত্রী আর স্বাধীনতা যার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত।) ফরাসী বিপ্লবের ব্যাপক প্রভাবেই আধুনিক মানুষের ইতিহাসজ্ঞান প্রখর হয়ে উঠে এবং It was the French Revolution, the revolutionary wars and the rise and fall of Napoleon which for the first time made history a mass experience ;[১৪] কেবল তাই নয়, (বিপ্লবোত্তর কালের সমগ্র ইউরোপে যে বিদ্রোহ-বিপ্লবের শোভাযাত্রা হয়েছিল তা-ই পরিণামে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে পর্যবসিত হয়। পরাধীন কিংবা অনুন্নত ও পীড়িত জাতির বেদনা বিপ্লবের আকারে বহুপরবর্তী কালে দেখা দিলেও এইসময় থেকেই তার অঙ্কুরোদ্গম ঘটে। আবার সমালোচকগণ পরাধীন জাতির হীনমন্যতার সঙ্গে ইতিহাসপ্রীতির নিগূঢ় সম্বন্ধ নির্ণয় করেছেন কারণ বিজিত ও পরাভূত এবং প্রবঞ্চিত জাতি বা ব্যক্তি ঐতিহ্যের মধ্যে ইতিহাসের মধ্যে সান্ত্বনা অন্বেষণ করতে থাকে। প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গবেষণার মধ্যেও জাতির অতীত গরিমা সন্ধানের মনোভাবটি প্রচ্ছন্ন। স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা, বিজয়ীর উদ্ধত

১৪ Georg Lukács, The Historical Novel, 1962, p 19.

মনোভাব কিংবা গর্বিত উল্লাস পরাভূতের চিত্তে অসূয়া ও ঈর্ষাবিদ্বেষ জাগ্রত করে থাকে বলে শেষোক্ত শ্রেণী অতীতের গহ্বরে আত্মগোপন করতে চায়; কোনো কোনো সময় সে প্রতিশোধপরায়ণ হয় এবং তখন প্রবঞ্চিত জনগণ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে প্রবল প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। স্বদেশের প্রতি ঐকান্তিক আনুগত্য, ইতিহাসের প্রতি প্রবল আসক্তি ও অতীত গৌরবের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার সঙ্গে একতাবোধের সংমিশ্রণের ফলে যে বিরুদ্ধতার উদ্ভব ও সমাবেশ ঘটে তা কেবল প্রাতিস্বিকতা বা ব্যক্তিগত আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য, একে সমষ্টিগতভাবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন রূপেও অভিহিত করা চলে।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশের ইতিহাস থেকেও কথিত সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যায়। নবজাগ্রত বুদ্ধিজীবী বাঙালির অসন্তোষ ক্রমে ক্রমে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে; রামমোহনের মৌলিক অধিকার দাবী দিয়েই তার সূত্রপাত। আত্মপ্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট ও আত্মসচেতন বাঙালির সম্মুখে যে প্রচণ্ড হতাশা দেখা দেয় তারই প্রতিক্রিয়ায় আমাদের জাতীয়তাবোধের উন্মেষ। অত্যুগ্র হীনমন্যতা থেকে আমাদের প্রত্নতত্ত্ব চর্চা ও ইতিহাস অনুশীলনের উদ্ভব, রাজেন্দ্রলাল বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্র প্রমুখের ইতিহাসচিন্তা থেকেই তা প্রমাণিত হয়। এই অতীতচারণার ফলে ঘটে the awakening of national sensibility and with it a feeling and understanding for national history. উনবিংশ শতকের প্রথম পর্যায়ের খ্যাতনামা সাহিত্যিকগণ প্রধানত এই কারণে টডের রাজস্থানের মধ্যে সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহে ব্যস্ত হয়েছিলেন। যে দুএকটি ইতিহাসগ্রন্থ তখনকার দিনে প্রকাশিত হয় তার সামান্য তথ্য ভিত্তি করেই তাঁরা সাহিত্যরচনা করেন এবং প্রত্যেকের সাহিত্যশিল্পে নবজাতক গরুড়ের ক্ষুধা অনুভূত হয়—সদ্য অনুভূত স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তা প্রত্যেকটি গ্রন্থের মধ্যেই লালিত পালিত হয়েছে। তাই বলা যায় ইতিহাস-চেতনা যখন স্বাদেশিকতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রখর থেকে প্রখরতর হয়ে উঠল তখনই ঐতিহাসিক উপন্যাসের আবির্ভাব।

ইতিহাস আধুনিক যুগের সাহিত্যে সমর্পিত হওয়ার ফলে কয়েকটি সমস্যা দেখা দিল। ইতিহাসপ্রীতি কোনো কোনো ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় মনোভাবের প্রতি আসক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। কল্পনার মুক্তপক্ষ আশ্রয় করে অতীতের পরিমণ্ডলে স্বেচ্ছাচারিতা আরম্ভ করলেন কেউ কেউ, সামান্যতম ঐতিহাসিক উপাদান নিয়ে তাঁদের এই রসোল্লাস ছদ্ম-ঐতিহাসিক উপন্যাসের জন্ম দিয়েছিল; ফলে ইতিহাসের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত না হয়ে তাঁরা রসাভাস সৃষ্টি করে চললেন। দ্বিতীয়ত, মধ্যযুগের প্রত্যাবর্তনের ফলে আধুনিক মানুষের পক্ষে পিছিয়ে পড়ার বিপদ ছিল। তৃতীয়ত, ইতিহাসকে অবিকৃত ও বিশুদ্ধভাবে রক্ষা করতে গেলে ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রাক্তনেরই পুনরাবৃত্তিরূপে পর্যবসিত হবে অবশ্য যদি প্রাচীনের

স্পষ্ট এবং যথার্থ উপাদান পাওয়া সম্ভব হয় ; কিন্তু অতীতযুগের প্রকৃত চিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব কারণ একার্যে প্রয়োজনীয় উপাদানের ঐকান্তিক অভাব থাকবেই। প্রাচীন ইতিহাসের মধ্যে সর্বতোভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়লে ঐতিহাসিক উপন্যাস থেকে আধুনিক জীবনভাবনা ও জীবনের মূল্যবোধ পাওয়া যাবে না ; ফলে আধুনিক প্রাগ্রেসর মানুষ তার মধ্যে আত্ম-আবিষ্কারের আনন্দ থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হবে। তাছাড়া আধুনিক ভাবনা ও মূল্যবোধ যদি অতীত কথার মধ্যে পরিবেশিত হয় অর্থাৎ কান্যকুব্জাধিপতি পৃথ্বীরাজ যদি ইসলাম আক্রমণের বিরুদ্ধে স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে অস্ত্রধারণ করেন তাহলে তখন কালবিরোধ বা কালাতিক্রমণ-দোষ (anachronism) কিংবা অনৌচিত্য দেখা দিতে পারে।

তথাপি সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হয়েছে, উপরিউক্ত প্রবল প্রতিবন্ধকতাগুলি কেউ কেউ অতিক্রম করেছেন। ঘটে যা তা সব সত্য নয় ; যথার্থ মহাকবি ঐতিহাসিক তথ্য অপেক্ষা কাল্পনিক সত্যকে প্রশ্রয় দেন। তাই শক্তিমান শিল্পী যখন ঔচিত্যকে অতিক্রম করেন তখন তিনি তার বিকল্পে অভিনব ঔচিত্য সৃষ্টিও করে থাকেন যা বিশ্বাস্য এবং সহৃদয়গ্রাহ্য হতে পারে। কবি তাঁর তৃতীয় নয়নের দৃষ্টিক্ষমতায় অতীতকে যেন নিকট থেকে পর্যবেক্ষণ করেন, অতীতের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাকে আবিষ্কার করেন।[১৫] তাই বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির সময় ইতিহাস-গবেষণার পরিমাণ ও অতীত সম্পর্কিত তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থের প্রাচুর্য না থাকলেও প্রাচীন কালের যথার্থ স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে ব্যর্থ হয়নি মহাকবিসমাজ।

প্রাচীন কালের ইতিহাস প্রধানত রাজজীবনকেন্দ্রিক বলে প্রতিটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে সাধারণত রাজনৈতিক উপপ্লবের কথা থাকে ; একটি সুদূরপ্রসারী যুদ্ধ কিংবা বিপ্লবকে অবলম্বন করে কতিপয় সাধারণ ও অসাধারণ মানবমানবীর জীবনলীলার ইতিহাস রচনা করা হয় এইজাতীয় উপন্যাসে। এই বিপর্যয় আলোড়ন ও উত্থান-পতনের মধ্যে সাধারণ মানুষও অসাধারণ হয়ে উঠে—দস্যু মানিকলাল সেনানায়কে পরিণত হয়ে যায়, বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতেও সে কাহিনীকে আর অবিশ্বাস্য বলে মনে হয় না। মধ্যযুগে প্রত্যাবর্তন এদিক থেকে সাধারণ মানুষের একান্তকাম্য ব্যাপাররূপে পরিগণিত হতে পারে। তাছাড়া ত্রিকালদর্শী রূপদক্ষগণ মধ্যযুগীয় জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্নতার দিকে মনোযোগ করেন না, পক্ষান্তরে তার মধ্যে আধুনিক জীবনোচিত ভাবনার সমর্থন অন্বেষণ করেন। আরেক দিক থেকেও এই মধ্যযুগপ্রীতি প্রবল হয়ে উঠতে পারে। আধুনিক যুগের উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বাতাবরণে মধ্যযুগীয় যাজকতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের স্বৈরাচারিতার পুনরাবির্ভাব আর সম্ভব নয়

১৫ প্রমথনাথ বিশী, লালকেল্লা, ১৩৭১, ভূমিকা।৶০

বলে অতীতকে বিশুদ্ধ idyllic Middle Ages বলে মনে হয়; মধ্যযুগীয় জীবনের কলঙ্কহীন আদর্শান্বিত অস্তিত্ব (কারণ যাজকতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের নিরঙ্কুশ ভয়াবহ প্রাধান্য অপসৃত ও তাদের পুনরাগমনের সম্ভাবনা তিরোহিত) আমাদের নিকট শৌর্য-বীর্য ও মর্যাদা-মহিমায় মণ্ডিত হয়ে এক কল্পলোকে পরিণত হয়। আবার অতীত বলে সেই বিগত জীবনের তুচ্ছতা পর্যন্ত মহান হয়ে উঠে এবং দিকচক্রবালের একটি সুন্দর নীল বেষ্টনীর মত বিগত জীবনকে বর্তমানের দূরত্ব থেকে আমরা নিশ্ছিদ্র ও ত্রুটিমুক্ত বলে মনে করি। ঐতিহাসিক উপন্যাস স্রষ্টা ও পাঠকের স্বপ্নপ্রয়াণের জগৎ।

স্বর্ণকুমারীর এজাতীয় উপন্যাসের মধ্যে পূর্বোক্ত আলোচনার সুন্দর সমর্থন পাওয়া যায়। সেই consciousness and respect for history, value attributed to traditional customs, awaking of nationality in the place of a superficial and one-sided cosmopolitanism[১৬]-এর অস্তিত্ব এখানেও পাওয়া যায়। (ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্বন্ধে তিনি সরাসরি অথবা পরোক্ষে যেসকল মত প্রকাশ করেছেন তা এবারে উল্লেখ করা যেতে পারে। ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্বন্ধীয় ধারণার ক্ষেত্রে তাঁর মানসবিবর্তনের কথা পূর্বে বলা হয়েছে। সেই সূত্রানুসরণে বলা যায় 'ক্ষত্রিয় রমণী'র মত কোনো কোনো ক্ষুদ্রাবয়ব গল্পকে তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাসরূপে অভিহিত করেছেন; আবার 'কুমার ভীমসিংহে'র মত ইতিহাসাশ্রিত ছোটগল্পকে গ্রন্থাবলীর মধ্যে বলা হয়েছে 'ঐতিহাসিক নাটক', অন্যত্র 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'।[১৭] তাছাড়া প্রকৃত ইতিহাসের অবলম্বনে রচিত মিবাররাজ-বিদ্রোহ প্রভৃতিকে স্পষ্টত ঐতিহাসিক উপন্যাসরূপে তাঁর স্বীকৃতি বিজ্ঞাপিত।) সম্ভবত সাহিত্যিক জীবনের প্রারম্ভিক পর্বে ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্পর্কে তিনি একটু ব্যাপক ধারণা পোষণ করতেন, পরবর্তী কালে এই পরিভাষার যথানির্দিষ্ট অর্থের প্রতি তাঁর আনুগত্য পরিলক্ষিত হয়; অথবা একথাও বলা যায় নাটক উপন্যাস ছোটগল্প প্রভৃতির অভিধা তাঁর জীবনের প্রথম পর্বে বিশেষ সংকুচিত বা একান্তভাবে নির্দিষ্ট ছিল না, মানসিক পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রেণীসমূহ যথাবিহিত অর্থযুক্ত হয়ে উঠেছে। ফলকথা ঐতিহাসিক নাটক বা ঐতিহাসিক উপন্যাস বলতে যে শ্রেণীর সাহিত্যকেই বোঝাক না কেন তার মধ্যে ইতিহাসের অস্তিত্ব যে বর্তমান সে সম্পর্কে প্রথমাবধি তিনি নির্ভুল ইঙ্গিত দিয়ে এসেছেন; অর্থাৎ (যে নাটক উপন্যাস বা ছোটগল্প তথাকথিত ইতিহাসের কাহিনী অবলম্বনে রচিত তাকে তিনি সাধারণভাবে 'ঐতিহাসিক' বলেই মনে করতেন।)

---

১৬ Benedetto Croce, European Literature in the Nineteenth Century, trns. by Douglas Ainslie, 1924, p 69.

১৭ ভারতী ও বালক বৈশাখ ১২৯৩, পৃ ৩৪।

(১২৯১ সালের ভারতী পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় মুদ্রিত 'ভূমিকা'য় তিনি প্রসঙ্গচ্ছলে ইতিহাস সম্বন্ধে বলেছেন, "ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই মনুষ্য প্রকৃত কার্যক্ষেত্রে কোথায় কিরূপ ব্যবহার করিয়া কিরূপ সুখদুঃখ ভোগ করিয়াছে, কবিতা ও উপন্যাসে ঐ বিষয়গুলি কল্পনা দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া চাকচিক্যশালী হয় এবং ইহাতে উহার মনোহারিত্ব আরো বৃদ্ধি করা হইয়া থাকে।") উদ্ধৃতির প্রথমাংশে ব্যবহৃত 'মনুষ্য', 'প্রকৃত কার্যক্ষেত্রে, 'সুখদুঃখভোগ' প্রভৃতি শব্দ বা শব্দগুচ্ছের অবলম্বনে ইতিহাসের মনুষ্যজীবন সম্বন্ধীয় স্বর্ণকুমারীর ধারণার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার অবকাশ আছে; ইতিবৃত্তকথার সাধারণ অসাধারণ সর্বশ্রেণীর মানুষের প্রতি আধুনিক মনুষ্যসুলভ স্বাভাবিক কৌতূহলের ইঙ্গিতটুকুও এক্ষেত্রে লক্ষণীয় ব্যাপার। সংগ্রামশীল মানুষ অথবা কার্যকারণ-পারম্পর্যের স্রোতেবাহিত মানবজীবন আর তার 'সুখদুঃখভোগ' আশা-নৈরাশ্য আনন্দ-বেদনার কাহিনী লেখকের মনোনয়ন লাভ করেছে; কাব্যে উপন্যাসে এদেরই সমগ্র পরিচয় সমর্পিত হয়, কল্পনা-স্পৃষ্ট ইতিহাসের অন্তর্গত ভদ্রেতর মানবসমাজের 'মনোহারিত্ব' বা চমৎকারিত্ব বর্ধিত হয়। ফলত স্বর্ণকুমারীর ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসে মানবজাতির সমগ্র স্তর-শ্রেণী সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি অর্জন করেছে। তাছাড়াও বলা যেতে পারে, ঐতিহাসিক কিংবা ইতিহাসাশ্রিত কাব্য বা উপন্যাসে ইতিহাসের তথ্যাবলীর সঙ্গে কল্পনার সংমিশ্রণ তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। রাজসিংহের চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপনে (১৮৯৩) বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, "উপন্যাস-লেখক সর্বত্র সত্যের শৃঙ্খলবদ্ধ নহেন। ইচ্ছামত, অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য কল্পনার আশ্রয় লইতে পারেন।" স্বর্ণকুমারীও কল্পনাবলে ঐতিহাসিক তথ্য এবং ঘটনাবলীকে চমৎকৃতি দান করেছেন। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র কল্পনাশক্তিকে অধিকতর মর্যাদা দিয়েছেন, কল্পনার প্রবল প্রভাবের কথা তিনি স্বীকার করেছেন, "ঔরঙ্গজেব, রাজসিংহ, জেব-উন্নিসা, উদিপুরী, ইহারা ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ইহাদের চরিত্র ইতিহাসে যেরূপ আছে সেইরূপ রাখা গিয়াছে। তবে তাঁহাদের সম্বন্ধে যেসকল ঘটনা লিখিত হইয়াছে, সকলই ঐতিহাসিক নহে। উপন্যাসে সকল কথা ঐতিহাসিক হইবার প্রয়োজন নাই।" এ বিষয়েও স্বর্ণকুমারী বঙ্কিমচন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন সত্য তথাপি তাঁর তথ্যনিষ্ঠা অনেক বেশি প্রখর বা ইতিহাসানুগ বলে মনে হয়।)

৬

স্বর্ণকুমারী-বিরচিত ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে পৃথক পৃথক আলোচনা করা দরকার। রাজস্থানের অতীতগরিমা এবং বাংলা দেশের প্রাচীন কাহিনী অবলম্বনে তাঁর এই জাতীয় উপন্যাসগুলি রচিত হয়েছে। কেবল বাংলা দেশের ভৌগোলিক

চতুঃসীমার সংকীর্ণতায় তাঁর দৃষ্টি আবদ্ধ ছিল না, সুদূরবর্তী রাজপুতানার পটভূমিকায়ও কবিচিত্তের উল্লাস পরিলক্ষিত হয়; এমন কি সামাজিক উপন্যাস রচনাকালেও তিনি বৃহত্তর বঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতের কথা সর্বদা স্মরণ করেছিলেন। দীপনির্বাণ, মিবাররাজ ও বিদ্রোহে রাজস্থানের কাহিনী পরিবেশিত; ফুলের মালা ও হুগলীর ইমামবাড়ীতে বাংলা দেশের অতীত কালের কথা বলা হয়েছে। ফুলের মালা নামক দুটি উপন্যাস—দুটির ঘটনাই পৃথক যদিও উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য কিছু পরিমাণে রয়েছে—ভারতীতে বিভিন্ন সময় প্রকাশিত হয়। ভারতীর ১২৮৯ সালের অগ্রহায়ণ থেকে ১২৯০ এর বৈশাখের মধ্যে যে ফুলের মালা প্রকাশিত হয় তা অসম্পূর্ণ এবং পরবর্তী কালে গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত হয়নি; পক্ষান্তরে ১২৯৯ সালের ভারতী ও বালকের ভাদ্র সংখ্যা থেকে অপর ফুলের মালা প্রকাশিত হতে থাকে এবং ১৮৯৫ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে এইটি গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। যা হোক এতদুভয়ের আলোচনা করা হয়েছে একসঙ্গে। দ্বিতীয় ফুলের মালার আগে হুগলীর ইমামবাড়ী ভারতীতে (১২৯১-৯৩) এবং গ্রন্থাকারে (১৮৮৮) প্রকাশিত হয়; স্বাভাবিক কারণে আলোচনায় হুগলীর ইমামবাড়ী অগ্রাধিকার লাভ করেছে। আবার যেহেতু অসম্পূর্ণ ফুলের মালাটি (ভারতী ১২৮৯-৯০) সম্পূর্ণ ফুলের মালার সঙ্গে আলোচিত হয়েছে তাই সাময়িক পত্রে আগে প্রকাশিত হলেও অনিবার্যকারণে হুগলীর ইমামবাড়ীর পর তা বর্তমান প্রবন্ধে আলোচিত হল। এই পাঁচটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে রাজপুতানার কথাশ্রিত উপন্যাস তিনটি আগে আলোচিত হল, পরে বাংলা দেশের পটভূমিকায় রচিত উপন্যাসদ্বয় সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে।

দীপনির্বাণ

॥১॥ স্বর্ণকুমারীর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থরূপে দীপনির্বাণ জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করে ১৮৭৬ সালের ডিসেম্বর মাসে।[১৮] কেবল তাই নয় এই বইটি তাঁর প্রথম উপন্যাসও বটে। শরৎকুমারী চৌধুরানী বলেছেন, "ভারতী প্রকাশিত হইবার পূর্বেই তাঁহার দীপনির্বাণ উপন্যাস বাহির হয়।"[১৯] ভারতীতে তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস ছিন্নমুকুল। প্রকৃতপ্রস্তাবে ভারতী প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে, সেদিক থেকে দীপনির্বাণ ভারতীর কয়েক মাস আগেই প্রকাশিত হয়। কিন্তু প্রকাশেরও একাধিক বৎসর পূর্বে সম্ভবত পুস্তকটি রচিত হয়। 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে বলা হয়েছে, "ইহার প্রথম উপন্যাস দীপনির্বাণ

---

১৮ "দীপ-নির্বাণ (উপন্যাস)। ১২৮৩ সাল (১৫ ডিসেম্বর ১৮৭৬)। পৃ ৩২১।"—সা. সা. চ. ২৮শ সংখ্যা, পৃ ১৩।

১৯ ভারতীর ভিটা, বিশ্বভারতী পত্রিকা ৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, পৃ ২১৩।

রচিত হইয়া দুই বৎসর পরে সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়।"[২০] এই মন্তব্যের যথার্থতা এবং সত্যতা যদি স্বীকার করা যায় তাহলে মেনে নিতে হয় যে গ্রন্থটি অন্তত ১৮৭৪ খৃস্টাব্দ বা ১২৮১ সালের কাছাকাছি কোনো সময়ে রচিত হয়েছে। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এক স্থানে বলেছেন, "বঙ্গাব্দ ১২৮৩ (ইংরাজি ১৮৭৭) সালে স্বর্ণকুমারীর দীপনির্বাণ প্রথম প্রকাশিত হয়।"[২১] জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিকার সম্ভবত শিথিলভাবে ১৮৭৭ খৃস্টাব্দ ব্যবহার করেছেন। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথও বলেছেন, "বিবাহের পর তিনি দীপনির্বাণ নামে একখানি উপন্যাস লেখেন। দীপনির্বাণ প্রকাশিত হইলে সকল কাগজেই ইহার খুব প্রশংসা বাহির হইয়াছিল।"[২২] স্বর্ণকুমারীর বিবাহ হয় ১৮৬৭ সালের ডিসেম্বরে, অর্থাৎ বিবাহের প্রায় নয় বৎসর পরে এই উপন্যাসটির প্রকাশ, তখন লেখিকার বয়স প্রায় কুড়ি বৎসর। অনেকে মনে করে থাকেন এই উপন্যাস রচনার পশ্চাতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্নেহানুকূল্যের পরিমাণ ছিল প্রভূত। ভারতী পত্রিকায় 'সত্যসুন্দর-মঙ্গল' নামক গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে অজ্ঞাতনামা সমালোচক অনুবাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলেছেন। তারই এক স্থানে বলা হয়েছে, "ভারতী-সম্পাদিকা রচিত প্রথম উপন্যাস দীপনির্বাণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎসাহেই রচিত বলিয়া শুনিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাদি কিংবা অন্য সদ্‌গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাহা মহিলাগণের নিকট সাগ্রহে পাঠ করিয়া শুনাইয়া পরিবারে সাহিত্যানুরাগ সঞ্চারিত করিতেন।"[২৩] এই উপন্যাস রচনাকালে জ্যোতিরিন্দ্রব্যক্তিত্বই কেবল প্রভাব বিস্তার করেনি, তাঁর রচনাবলীও লেখিকার মনকে সামগ্রিকভাবে অধিকার করে রেখেছিল।

দীপনির্বাণের আত্মপ্রকাশ যে তৎকালের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় সম্বর্ধিত হয়েছিল তার আভাস জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উপরিলিখিত মন্তব্য থেকে পাওয়া যায়। ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায় বলা হয়েছিল, We have no hesitation in pronouncing this book to be by far the best that has yet been written by a Bengali lady, and we should no more hesitate to call it one of the ablest in the whole literature of Bengal.[২৪] সাধারণী পত্রিকা বলেছিলেন, "দীপনির্বাণ নামে একখানি

২০ হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বঙ্গভাষার লেখক, বঙ্গবাসী সং ১৩১১, পৃ ৭৯৮।

২১ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, পৃ ১২০, পাদটীকা।

২২ ঐ পৃ ১১৯।

২৩ ভারতী মাঘ ১৩১৮, পৃ ৯৯২।

২৪ স্বর্ণকুমারী রচিত পৃথিবী (১২৮৯) গ্রন্থের পরিশিষ্ট।

অভিনব নভেল আমরা সমালোচনার জন্য পাইয়াছি। শুনিয়াছি এখানি কোন সম্রান্তবংশীয়া মহিলার লেখা। আহ্লাদের কথা, স্ত্রীলোকের এরূপ পড়াশুনা এরূপ রচনা এরূপ সহৃদয়তা এরূপ লেখার ভঙ্গী বঙ্গদেশ বলিয়া নয় অপর সভ্যতর দেশেও অল্প দেখিতে পাওয়া যায়।"[২৫] বান্ধব পত্রিকায় ১২৮৮ সালের পৌষ সংখ্যায় বলা হয়েছে "দীপনির্বাণ রচয়িত্রী কর্তৃক প্রণীত মালতী, ছিন্নমুকুল, বসন্ত-উৎসব, গাথা ও দীপনির্বাণ। / বঙ্গের চিরভূষণস্বরূপা কুসুমকুমারীর কুসুমিকার সহিত এস্থলে একত্র স্থাপিত ও একসূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। দীপনির্বাণ, ছিন্নমুকুল ও গাথা প্রভৃতি গ্রন্থ এভাবে এবং এইরূপে সমালোচিত হইতে পারে না। আমরা যদি কখনও হিমেন্স, হানা মোর, হেরিয়েট মার্টিনিয়ু এবং মেরিয়া এজওয়ার্থ প্রভৃতি বৃটিশ-ললনাদিগের কবিত্ব ও লিপিনৈপুণ্যের সমালোচনা করিতে অবসর পাই তাহা হইলে তুলনায় সমালোচনা করিয়া তখন আমরা এই চিরস্মরণীয় বঙ্গললনার কবিত্ব চিত্রনৈপুণ্যের পরিচয় দিব। ইহার সম্বন্ধে সম্প্রতি আমরা এইমাত্র বলিতে ইচ্ছা করি যে, ইহার পুষ্পময়ী লেখনীর উপর ভারতীর পুষ্পবৃষ্টি হউক, এবং বঙ্গের যেসকল শিক্ষানুরাগিনী কুলকামিনী লেখাপড়া শিখিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা একবার ইহার গ্রন্থগুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ করুন। পড়িলে অনেক বিষয়েই তাঁহাদিগের ও আমাদিগের উপকার হইতে পারে।" দীপনির্বাণের রচয়িত্রী সম্পর্কে অনেক বিদেশী মন্তব্য করেছেন, At a very early age Mrs. Ghosal ...... showed unusual ability and force of character ; before she was twenty she had published an anonymous novel which became an immediate success, and the revelation of its authorship caused a great sensation, as it was the first time an Indian woman had attempted such a feat.[২৬]

গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে লেখকের কোনো নাম ছিল না, সাধারণী পত্রিকার গ্রন্থসমালোচকও সে আভাস দিয়েছেন। এমন কি বিলাতে অবস্থানকালে অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথও বুঝতে পারেননি গ্রন্থটির রচয়িতা কে। হিরণ্ময়ী দেবী বলেছেন, "মেজমামা পূজনীয় সত্যেন্দ্রনাথ বিদেশে এই বইখানি হাতে পাইয়া ভাবিলেন, নতুনমামার রচনা। তিনি লিখিলেন, জ্যোতির জ্যোতি কি প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে?"[২৭] সত্যেন্দ্রনাথের এই মন্তব্য থেকে ঔপন্যাসিকরূপে স্বর্ণকুমারীর কৃতিত্ব পরিস্ফুট হয়। দীপনির্বাণের পূর্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কিঞ্চিৎ জলযোগ (১৮৭২), পুরুবিক্রম নাটক (১৮৭৪), সরোজিনী নাটক (১৮৭৫)

২৫ ঐ।

২৬ An Unfinished Song, London 1914, Introduction by E. M. Lang.

২৭ কৈফিয়ৎ, ভারতী বৈশাখ ১৩২৩।

প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থ রচিত হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে, যে সাহিত্যবোধ ও সংস্কার নিয়ে স্বর্ণকুমারী বাংলা সাহিত্যের দরবারে আবির্ভূত হয়েছিলেন তা বহুল পরিমাণে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আনুকুল্য লাভ করেছিল, বিশেষত স্বর্ণকুমারীর সাহিত্যজীবনের প্রথম পর্বে জ্যোতিরিন্দ্র-প্রতিভার প্রভাব ছিল অনিবার্য। এই মানসিকতার সাধর্ম্য ও নৈকট্যবশত সত্যেন্দ্রনাথের নিকট স্বর্ণকুমারীর রচনা জ্যোতিরিন্দ্র-প্রতিভার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছিল; অর্থাৎ স্বর্ণকুমারীর প্রথম আবির্ভাবের মধ্যেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরিণত শিল্পীমানসের সাদৃশ্য-সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। তৎকালীন পত্র-পত্রিকার যেসকল মন্তব্য পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে তার দ্বারা উপরিলিখিত সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়। পরবর্তী কালে হেমেন্দ্রকুমার রায় বলেছিলেন, "বোধ হয় বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনীর পরে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য উপন্যাস পূজনীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর। তাহা দীপনির্বাণ।"[২৮] স্পষ্টত বোঝা যায় দীপনির্বাণের মধ্যে স্বর্ণকুমারীর পরিণত মনেরই প্রকাশ ঘটেছিল।

দীপনির্বাণের 'উপহার' অংশটি এইরূপ: "শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীচরণেষু / মেজদাদা!

উপহার সমর্পিনু সোহাগে যতনে
লহ হাসিমুখে নিরখিব সুখে
 সে মধুর স্নেহহাস্য সদা জাগে মনে।
যে হাসি দেখিলে হৃদয় সলিলে
ফুটিবে হরষ-পদ্ম অপূর্ব শোভায়,
 হাস সে বিনোদ হাসি বড় সাধ যায়।
কিন্তু বা কেমনে কহি হাসিতে আবার?
আর্য-অবনতি কথা পড়িয়ে পাইবে ব্যথা
 বহিবে নয়নে তব শোক অশ্রুধার!
কেমনে হাসিতে বলি সকলি গিয়েছে চলি
 ঢেকেছে ভারত-ভানু ঘন মেঘজাল—
 নিভেছে সোনার দীপ ভেঙ্গেছে কপাল!"[২৯]

উৎসর্গ পত্রের শেষাংশে লেখিকার এই শ্রেণীর উপন্যাস রচনার মূল উদ্দেশ্য ব্যঞ্জিত হয়ে উঠেছে। মহম্মদ ঘোরীর হাতে পৃথ্বীরাজের পরাভবের কাহিনী উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ঘটনা, তার সঙ্গে

২৮ বঙ্কিমযুগের কথা, ভারতী কার্তিক ১৩১৮, পৃ ৬৬৬।

২৯ বর্তমান ক্ষেত্রে মূল রচনারূপে 'দীপনির্বাণ। ১৯০৩ সালের ১১ই জুলাইতে প্রাপ্ত বেঙ্গল লাইব্রেরীর গ্রন্থ' (ন্যাশনাল লাইব্রেরির 182·0C/908·30 সংখ্যক গ্রন্থ) ব্যবহৃত।

চিতোরের রাণার পারিবারিক জীবনের ইতিহাস সংমিশ্রিত হয়ে গেছে। এই ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসটির মধ্যে স্বর্ণকুমারীর স্বদেশহিতৈষণা অনুপ্রবেশ করেছে। অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টির ইতিহাসের কারণ অনুসন্ধান করলে জানা যায় যে সেখানেও ঐ একই মনোভাব ছিল প্রবলভাবে সক্রিয়, "হিন্দুমেলার পর হইতে কেবলই আমার মনে হইত কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশপ্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে। এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া··· আমি পুরুবিক্রম নাটকখানি রচনা করিয়া ফেলিলাম।"[৩০] পুরুবিক্রমের এই উদ্দেশ্য সেকালে অনেকের নিকট সম্বর্ধনা লাভ করেছিল, বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, "এইরকম লোক যদি নাটক লেখেন তাহা হইলে দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে।"[৩১] পূর্বেই বলা হয়েছে দীপনির্বাণের আগে পুরুবিক্রম নাটক সরোজিনী নাটক প্রভৃতি প্রকাশিত হয়েছে এবং স্বর্ণকুমারীর সাহিত্যিক জীবনের প্রথম পর্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের প্রভাব ছিল আত্যন্তিক; তাই একথা বলা সঙ্গত যে এই দীপনির্বাণের উদ্দেশ্য পরিকল্পনা প্রভৃতির উপর জ্যোতিরিন্দ্র-প্রতিভার ছায়াপাত ঘটেছে যদিচ পরবর্তী কালে এই প্রভাবকে তিনি অনায়াসে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। এই সুগভীর স্বাদেশিকতাই তাঁর সাহিত্যসাধনার উৎসাহকে বারংবার নিয়ন্ত্রিত করেছে। কবিতা গান ছোটগল্প প্রবন্ধ উপন্যাস প্রভৃতির মধ্যে স্বদেশপ্রেমিকের মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে; কিন্তু তিনি ছিলেন প্রধানত ঔপন্যাসিক তাই উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই স্বাদেশিক ভাবনা অধিক পরিমাণে স্ফূর্তিলাভ করেছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রধান বাহন ছিল নাটক এবং সেখানেই তিনি স্বদেশের কথা পরিবেশন করেছেন। সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় ব্যাপার হল স্বর্ণকুমারীর কোনো নাটক সরাসরিভাবে স্বদেশপ্রেমকে অবলম্বন করে রচিত হয়নি; সেখানে পারিবারিক জীবনের ক্ষয়-ক্ষতি আশা-আনন্দ কিংবা সামাজিক জগতের জীবনচাঞ্চল্য সহৃদয়তার সঙ্গে অনুভূত হয়েছে সত্য কিন্তু তাদের রচনার পশ্চাতে স্বদেশচিন্তা বা স্বাদেশিকতা প্রত্যক্ষভাবে মোটেই সক্রিয় ছিল না।

দীপনির্বাণের সাহিত্যিক উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচারের পূর্বে কয়েকটি তথ্যের অবতারণা করা যেতে পারে। ১৩১৭ সালের আশ্বিন সংখ্যার ভারতী পত্রিকার ৪৭৫ পৃষ্ঠায় 'দীপনির্বাণ' নামে একটি ছবি মুদ্রিত হয়েছে। ঐ সংখ্যায় স্বর্ণকুমারীর 'ক্রীড়াকৌতুক' (পৃ ৪৭২-৭৬) নামক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়; ইংরেজদের খেলার অনুকরণে বাঙালি মহিলাদের ক্রীড়াকৌতুকের আলোচনাপ্রসঙ্গে লেখিকা বলেছেন, "আমরা এক দিন বই সাজিয়া আসিবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। বাঙালি মহিলারা বাংলা বা সংস্কৃত পুস্তকের

৩০ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, পৃ ১৪১।

৩১ বঙ্গদর্শন ভাদ্র ১২৮২। দ্র বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৬১পৃ ২৮৫, পা. টী.।

চিহ্ন ধারণ করিয়াছিলেন…" ইত্যাদি। সেই অনুসারে দীপনির্বাণ পুস্তকের নামব্যঞ্জক চিত্রটি প্রদত্ত হয় এবং ঐ চিত্র অনুসরণে গ্রন্থের নাম নির্ণয়ের জন্য আগ্রহী পাঠক-পাঠিকা আহূত হন। বাতায়নপথে মুক্তাকাশ পরিদৃশ্যমান, খণ্ডচন্দ্রের আভাস; জনৈক শ্মশ্রুপৃষ্ঠ ইসলামধর্মাবলম্বী কক্ষমধ্যস্থ প্রদীপ নির্বাপণে উদ্যত। ৫৩২ পৃষ্ঠার চিত্র-ব্যাখ্যায় বইটির নামের উত্তরে স্বর্ণকুমারীর উপন্যাসের নামটি ব্যবহৃত হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা যায় বিভিন্ন সময়ে ভারতীর পৃষ্ঠায় স্বর্ণকুমারীর বক্ষ্যমাণ উপন্যাসের বিবিধ কাহিনী অবলম্বনে অঙ্কিত চিত্র মুদ্রিত হয়েছে। এইসকল তথ্য তাঁর উপন্যাসের জনপ্রিয়তার কথা প্রমাণ করে। হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকায় বলা হয়েছিল, The first production of Srimati Swarnakumari Devi, Dip Nirvan, an historical romance, made its appearance in 1876; and it is no exaggeration to say that the literary public was surprised with it. As the book which possessed great merits did not disclose the name of its writer, speculation was naturally rife as to its authorship. It became known in course of time that the accomplished writer was a young Hindu lady belonging to one of the highest in the metropolis. The Dip Nirvan, as might have been expected, called forth warm encomiums from literary critics and the Bengali reading public. It displayed such beautiful conception and skilful delineation of characters, such depth and purity of thought and such chasteness and eloquence of style, that the public was forced to the conclusion that writer was possessed of high talents.[৩২]

॥২॥ অধুনা প্রায়দুষ্প্রাপ্য এই দীপনির্বাণ উপন্যাসের একটি 'উপক্রমণিকা'[৩৩] আছে; আলোচনার সুবিধার জন্য সমগ্র উপক্রমণিকাটি প্রথমে উদ্ধৃত হল: "মুসলমানের ভারতাধিকারের অব্যবহিতপূর্বে যেসময় হিন্দুরাজদিগের মধ্যে একতার দৃঢ়বন্ধন ক্রমে ক্রমে শিথিল হইয়া আসিয়াছিল এবং সর্বোচ্চ পদলাভ-লালসায় পরস্পর সকলেরই মধ্যে গৃহবিচ্ছেদের সূত্রপাত হইয়াছিল সেই সময়ের একটি ঘটনা অবলম্বন করিয়া এই উপন্যাসের আরম্ভ—এবং গৃহবিচ্ছেদহেতু আর সুযোগ বুঝিয়া যবনেরা যেসময়ে ভারতের চিরপ্রজ্বলিত দীপ নির্বাপিত করিল সেই দীপনির্বাণেই এই দীপনির্বাণের সমাপ্তি।

৩২ ভারতী অগ্রহায়ণ ১২৮৭, সংখ্যাশেষের বিজ্ঞাপন।

৩৩ স্বর্ণকুমারীর একাধিক উপন্যাসে এরূপ উপক্রমণিকা, পরিশিষ্ট বা পাদটীকা পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, There are footnotes and learned references in the manner of Sir Walter Scott's novels which had been a general feature of the times.—Priyaranjan Sen, Western Influence in Bengali Novel; Journal of the Department of Letters, University of Calcutta, Vol XXII, Book II, p 37.

উপন্যাস মধ্যে দিল্লীই প্রধান রঙ্গভূমি। যেসময় কুরুরাজ দুর্যোধন হস্তিনাপুরের রাজা ছিলেন সেই সময়ে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির আর একটি রাজধানী নির্মাণ করিয়া তাহার নাম ইন্দ্রপ্রস্থ রাখিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর পাণ্ডবেরা একাদিক্রমে ৩০ পুরুষ পর্যন্ত ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসন অধিকার করিয়া আসেন। পাণ্ডবদিগের পর গৌতমবংশ রাজা হয়। গৌতম-বংশোদ্ভব রাজা দিলু ইন্দ্রপ্রস্থের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে আর একটি স্বতন্ত্র নগরী নির্মাণ করিয়া সেই স্থানেই স্বীয় রাজধানী স্থাপন করিলেন। তাঁহার নিজের নাম হইতে সেই নগরীর নাম দিল্লী রাখিলেন। ক্রমে দিল্লিরই প্রাধান্য হইয়া উঠে, এবং এক সময়ে এই নগরী প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষের রাজধানীরূপে পরিগণিত হয়। পরে কুমায়ুন দেশের রাজা পুরুরাজ দিলুরাজকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া দিল্লী অধিকার করেন। এইসকল ঘটনার অনতিপরে তুয়ার বংশ এবং তৎপরে চোহান বংশ দিল্লীতে রাজত্ব করেন। তুয়ার বংশের রাজা অনঙ্গপাল দিল্লী নগরীকে নানা স্তম্ভ দুর্গ ও অট্টালিকায় বিভূষিত করিয়াছিলেন।

তন্নির্মিত আয়স-স্তম্ভ সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে কোন খ্যাতনামা জ্যোতির্বিদ গণনাদ্বারা অনঙ্গপালকে বলেন, দিল্লীর সিংহাসন টলমল করিতেছে; আর অধিক দিন ইহা আপনার বংশীয় প্রবল প্রতাপান্বিত রাজাদিগের ভার সহ্য করিতে পারিবে না! এই বাক্যে বিষম ভীত হইয়া অনঙ্গপাল ব্রাহ্মণদিগকে ইহার প্রতিকারের উপায় চিন্তা করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহারা বলিলেন, এক বৃহৎ আয়স-স্তম্ভ ধরণীগর্ভে প্রোথিত করা হউক। বাসুকি পূজাদ্বারা প্রসন্ন হইয়া সেই স্তম্ভ মস্তকে ধারণ করিলে দিল্লীর সিংহাসনও অটল হইবে। অনঙ্গপাল আশ্বস্ত হৃদয়ে ইঁহাদের কথামত আয়স-স্তম্ভ নির্মাণ করাইলেন। ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, এ স্তম্ভ যতকাল অটল থাকিবে দিল্লীর সিংহাসনও ততকাল অটল রহিবে। রাজ্য-প্রাপ্তির কিছুদিন পরে পৃথ্বীরাজ এই স্তম্ভ ভূগর্ভোত্থিত করিয়া উহা প্রকৃতপক্ষে বাসুকির মস্তকোপরি অবস্থিত হইয়াছে কি না দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ব্রাহ্মণেরা অনেক নিষেধ করিলেন; কিন্তু পৃথ্বীরাজ কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। স্তম্ভ উঠান হইলে দেখা গেল তাহার মূলদেশ শোণিতাক্ত। এই দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা তাহা বাসুকির মস্তকশোণিত ভাবিয়া মুগ্ধ হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন, 'দিল্লী তো ঢিল্লি হো গিয়া—রাজ কা রাজ যাতা রহা।'

অনঙ্গপালের মৃত্যু হইলে তাঁহার দৌহিত্র আজমীরাধিপতি সোমেশ্বরের পুত্র পৃথ্বীরাজ দিল্লীর সিংহাসনারূঢ় হইলেন। তাঁহার সময়ে যদিও ক্ষত্রিয় রাজাগণ সকলেই পরাক্রান্ত ছিলেন তথাপি গৃহবিচ্ছেদে তাঁহাদের একতা অনেকটা শিথিল হইয়া আসিয়াছিল। সেই গৃহবিচ্ছেদই পরে সকল অনর্থের মূলস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। কান্যকুব্জাধিপতি জয়চন্দ্রই গৃহবিচ্ছেদের মূল কারণ। যখন নাগোর দেশের বহুকালপ্রোথিত ৭০ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রার সন্ধান পাইয়া পৃথ্বীরাজ চিতোরাধিপতি সমরসিংহের সাহায্যে তাহা হস্তগত করিতে সচেষ্ট হইলেন

তখন জয়চন্দ্র ও পত্তনরাজ ঈর্ষা-প্রযুক্ত তাঁহার দর্পচূর্ণ করিবার অভিলাষে সাহায্যে প্রতিশ্রুত হইয়া মহম্মদ ঘোরীকে দিল্লী আক্রমণ করিতে আহ্বান করিলেন। ১১১৩ শকাব্দে অর্থাৎ ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী আর্যাবর্তে উপস্থিত হইলেন। স্থানেশ্বরে হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম হইল। সেই যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ ও সমরসিংহ কেবল যবনদিগকে পরাজিত করিয়াই যে ক্ষান্ত ছিলেন এমন নহে, মহম্মদ ঘোরী এবং অন্যান্য অনেক সম্রান্ত যবনদিগকে বন্দী করিয়া আনিয়াছিলেন। পরিশেষে পৃথ্বীরাজ আপন সৌজন্য ও উন্নত স্বভাবের গুণে তাঁহাদিগকে মুক্ত করিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। স্থানেশ্বরের প্রথম যুদ্ধবৃত্তান্তের সহিত আমাদের এই উপন্যাসের কোনও সম্পর্ক নাই বলিয়া জয়চন্দ্রকে আর উপন্যাসভুক্ত করা হয় নাই, প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার নামোল্লেখমাত্র করা হইয়াছে।

ঐ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের প্রায় দুই বৎসর পরে ১১১৫ শকাব্দে যবনেরা পুনরায় দিল্লী আক্রমণার্থ আগমন করে। জয়চন্দ্র প্রভৃতি রাজাগণ ঈর্ষাপরবশ হইয়া সানন্দচিত্তে তাহা দেখিতে লাগিলেন এবং গোপনে নানারূপে সাহায্য করিতেও ত্রুটি করিলেন না। এবারেও স্থানেশ্বরে যুদ্ধ হয় এবং এই যুদ্ধে তিন দিন ঘোরতর সংগ্রামের পর যবনদিগের ধূর্ততায় ও বিশ্বাসঘাতকতায় পৃথ্বীরাজ পরাজিত হইলেন। সেই অবধি হিন্দুরাজ্যের অপলোপ হইতে আরম্ভ হইল।

চিতোরাধিপতি সমরসিংহ পৃথ্বীরাজের পরম বন্ধু ছিলেন। মুসলমানদিগের সহিত তাঁহার যে দুইবার যুদ্ধ হয় সেই উভয় যুদ্ধেই তিনি বিশেষ সহায়তা করেন। উপন্যাসে সমরসিংহ সম্বন্ধে দুই স্থলে ইতিহাসের ব্যতিক্রম লক্ষিত হইবে। প্রথমতঃ—এ গ্রন্থে সমরসিংহের বয়ঃক্রম ইতিহাসাপেক্ষা চারি বৎসর অধিক করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ— সমরসিংহ পৃথ্বীরাজের ভগিনীপতি ছিলেন কিন্তু উপন্যাসে সে সম্পর্কের উল্লেখ করা হয় নাই। যদিও এই পুস্তক উপন্যাসমাত্র তথাপি গ্রন্থসন্নিবিষ্ট প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ প্রায়ই ইতিহাস-মূলক এবং তাঁহাদের স্বভাব ও জীবনের মূল ঘটনাবলীর ঐতিহাসিক ভিত্তি রক্ষা করিতে চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই।

চাঁদকবি প্রকৃতই একজন প্রসিদ্ধ রাজপুত মহাকবি। তিনি পৃথ্বীরাজের পরম বন্ধু ছিলেন। চাঁদকবি পুস্তকমধ্যে কবিচন্দ্র নামে অভিহিত হইয়াছেন। ইংলণ্ডের স্যার ফিলিপ সিডনী ও স্যার ওয়ালটার র‍্যালের ন্যায় তিনিও কাব্য এবং যুদ্ধ উভয় বিষয়েই সম্যক পারদর্শী ছিলেন— কিন্তু কাব্যই তাঁহার যশের নিদান। তাঁহার সকল মহাকাব্যেই রাজপুতদিগের—বিশেষতঃ পৃথ্বীরাজের কীর্তিকলাপ ও শৌর্যপরাক্রম গীত হইয়াছে। সুতরাং সমস্ত আর্যজাতির মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারত যেরূপ আদরণীয়— রাজপুতদিগের মধ্যে চাঁদকবির কাব্যসমূহও সেইরূপ আদরণীয়। কিন্তু চাঁদকবির রচনায় কল্পনার উচ্ছ্বাস অতি

অল্প, প্রকৃত ইতিবৃত্তান্তের অংশই অধিক। দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহার সমগ্র জীবনচরিত কোথাও পাওয়া যায় না এবং তাঁহার কাব্যসমূহের অধিকাংশই প্রায় প্রাচীন হিন্দী ভাষার মধ্যে অবরুদ্ধ।

পৃথ্বীরাজের সময়ে হিন্দুদিগের মধ্যে কামান ব্যবহার যে প্রচলিত ছিল ইহা হয়ত অনেকেরই কাল্পনিক বলিয়া ধারণা হয়। কোন কোন ইংরাজী ইতিহাস-লেখক বলেন যে বাবরের আমল হইতে এদেশে প্রথম কামান ব্যবহার আরম্ভ হয়। (পা. টী. Major-General Briggs, quoted by Elliot in his History of India) তাহার পূর্ব হইতে যে এদেশে কামানের প্রচলন ছিল তাহা তাঁহারা স্বীকার করিতে চাহেন না। বিশেষতঃ ইউরোপে কিনা ১৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কামান প্রচলিত ছিল না, সুতরাং তাহার শত শত বৎসর পূর্বে যে হিন্দুরা কামান নির্মাণ বা ব্যবহার করিতে জানিত ইহা পাশ্চাত্য জাতিমণ্ডলের নিকট সহজে বিশ্বাস হইবার কথা নহে। সাধারণ মত এই যে ১৩৩৬ কিংবা ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে প্রথম কামান ব্যবহৃত হয়। কিন্তু অনেক অনুসন্ধানের পর আধুনিক ঐতিহাসিকগণের মধ্যে ইহা এখন একপ্রকার সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে তাহার পূর্বে ১৩২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমে মূরগণ স্পেনে একপ্রকার কামান ব্যবহার করিয়াছে। মূরগণ যে আরবদিগের কর্তৃক অস্ত্রবিদ্যায় দীক্ষিত হইয়াছিল ইহা সর্ববাদিসম্মত। এতদ্ব্যতীত অধুনা প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে আরবেরা ভারতবর্ষ হইতে চিকিৎসা গণিত প্রভৃতি বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিল, তাহাতে বোধ হয় যে কামানের ব্যবহারও ভারতবর্ষ হইতে শিক্ষা করিয়া পরে তাহাদের কর্তৃক ইউরোপে প্রচলিত হইয়াছে।

কিন্তু মূরদিগের কর্তৃক ইউরোপে কামান প্রচলিত হইবার বহুপরে সবেমাত্র ১৩৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজেরা সর্বপ্রথম কামান ব্যবহার আরম্ভ করেন। সুতরাং ভারতবর্ষে যে অল্পদিন হইতে কামান চলিয়াছে একথা স্বদেশাভিমানী ইংরাজ যে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্যের বিষয় কি আছে। কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারতে যে শতঘ্নী অস্ত্রের উল্লেখ আছে তাহা অনেক ইংরাজ গ্রন্থকারদিগের মতেও কামান ব্যতীত অপর কিছুই হইতে পারে না। হ্যালহেড মহোদয় কামান ব্যবহার বিষয়ে নানা তর্কবিতর্ক করিয়া এই স্থির করিয়াছেন যে, হিন্দুরা ও চীনদেশীয় লোকেরা এত পুরাকালে বারুদ প্রস্তুত ও ব্যবহার করিতে জানিত যে তাহার কাল নির্ণয় করা সুকঠিন (পা. টী. Halhead says, 'Gun powder has been known in China as well as Hindoostan far beyond all periods of investigation.'—Quoted by Elliot in his History of India) কিন্তু শতঘ্নীর বিষয়ে নানাপ্রকার সন্দেহের কারণ থাকিলেও কবিচন্দ্রের যুদ্ধবর্ণনা পড়িলে পৃথ্বীরাজের সময়ে যে কামান ব্যবহারের প্রচলন ছিল তদ্বিষয়ে আর কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

তিনি কনোজখণ্ডের এক স্থলে লিখিয়াছেন—(পা. টী. 'নৃপ পংগ নয়র ছুটে অরাব। কোটহ কংগূর চটি চটি সিতাব॥ জংবুর তোপ ছুটহি ঝনংকি। দশকোশ জায় গোলা ভনংকি॥ সিরদার ভার বারাহ রোহ। লংগী অমংগ বর হনৈ কোহ॥') 'কামানসমূহ হইতে এমন বিকট ধ্বনি এবং তাহার গোলার দ্বারা এমন ভয়ানক শব্দ হইতে লাগিল যে তাহা দশ ক্রোশ পর্যন্ত শুনা গিয়াছিল।' আবার 'নয় লক্ষ মুদ্রার হার' নামক কাব্যে যুদ্ধবর্ণনা স্থলে তিনি বলিয়াছেন, 'বিষম ভারযুক্ত কামানসমূহ শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত ছিল।' অপর এক স্থলে লিখিয়াছেন, 'কামানসমূহ ও বারুদের থলিকাগুলি তিন ক্রোশ পথ পর্যন্ত ব্যাপিয়া অবস্থিত ছিল।' যে কোন হিন্দীভাষাজ্ঞ ইংরাজ গ্রন্থকার কবিচন্দ্রের কোন কোন কবিতা অনুবাদ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই এই কামান শব্দ Cannon শব্দের দ্বারা ভাষান্তরিত করিয়াছেন।

যমুনাস্তম্ভ কুতবমিনার নামেই অধুনা প্রসিদ্ধ। এই নামের সংযোগেই উহা যে হিন্দুদের কৃত এই সত্যটি আবরিত রহিয়াছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে যমুনাস্তম্ভ পৃথ্বীরাজ-কৃত। কন্যাবৎসল পৃথ্বীরাজ প্রত্যহ সায়ংকালে কন্যার যমুনা-সন্দর্শনার্থ উক্ত স্তম্ভ নির্মাণ করেন। এই প্রবাদটি আমাদের কল্পনাপ্রসূত নহে। দিল্লী অঞ্চলে জনসাধারণের মধ্যে এই প্রবাদটি প্রচলিত। মেটকাফ হিবর প্রভৃতি অনেক ইংরাজ এবং কোন কোন মুসলমান লেখক ও যমুনাস্তম্ভ যে হিন্দুদিগের নির্মিত তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। যমুনাস্তম্ভের নির্মাণকৌশলের সহিত মুসলমানদের স্তম্ভ-নির্মাণকৌশলের প্রভূত বৈষম্য প্রদর্শন করিয়া বেগলার মহোদয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে যমুনাস্তম্ভ হিন্দুদিগের কর্তৃকই নির্মিত। (পা. টী. Journal of the Asiatic Society for Bengal, Vol. XXXIII, 1864) আর আলিগড়নিবাসী খ্যাতনামা স্যার সৈয়দ আহমেদ কর্ণেল কানিংহামকে এই বিষয়ে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে (পা. টী. Cunningham's Archeological Survey of India, Vol. IV), যমুনাস্তম্ভ কখনই মুসলমানকৃত হইতে পারে না। বিশেষতঃ যমুনাস্তম্ভের তলদেশে হিন্দুদিগের পূজার ঘণ্টা প্রভৃতি যেসকল প্রতিমূর্তি খোদিত রহিয়াছে তাহাতে উহা হিন্দুদিগের কৃত বলিয়াই সপ্রমাণ হইতেছে। যমুনাস্তম্ভ আদিকালে যত উচ্চ ছিল এখন আর তত উচ্চ নাই। কুতবউদ্দীন উহার শিখরদেশ ভগ্ন করিয়া মুসলমান রীতি অনুসারে পুনর্বার উহার শিখরদেশ নির্মাণ করিয়া স্বনামেই উহা প্রসিদ্ধ করিয়াছেন।

যেমন কুরুক্ষেত্র এখন স্থানেশ্বর নামে অভিহিত, সেইরূপ কুরুক্ষেত্রের প্রান্তবাহী পুণ্যনদী দৃশদ্বতীও অধুনা কাগার (পা. টী. Elphinstone's History of India) নামে খ্যাত। ইহা স্থানেশ্বর প্রদেশের দক্ষিণাঞ্চলে প্রবাহিত হইতেছে।

পাগলিনীর ব্যাপার একটি প্রকৃত ঘটনার আভাস হইতে কল্পিত।

কাপ্তেন টডের রাজস্থান পাঠে জানা যায় যে আশাপূর্ণা নামে দেবী যথাযথই দিল্লীর কুলদেবতা ছিলেন এবং সকল রাজপুতেরাই কোন কর্মে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে আশাপূর্ণা-দেবীর পূজা করিতেন।"

॥৩॥ উদ্ধৃত সুদীর্ঘ উপক্রমণিকাটি অবলম্বন করে দীপনির্বাণ উপন্যাসের পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে; তজ্জন্য ভূমিকার মধ্যে যেসকল বিষয়ের ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন সেগুলি উপন্যাসের মধ্যে কি পরিমাণে পরিবেশিত হয়েছে তা পরপর আলোচনা করে দেখান প্রয়োজন।

উপহার-পত্র থেকে জানা যায় যে উপন্যাসের মধ্যে 'আর্য-অবনতি কথা' প্রাধান্য লাভ করেছে; উপক্রমণিকার প্রারম্ভেই সেকথা স্বীকার করা হয়েছে—মহম্মদ ঘোরীর ভারত আক্রমণের পূর্বে পশ্চিম ভারতের নরপতিগণের মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ দেখা যায় 'এবং গৃহবিচ্ছেদ-হেতু সুযোগ বুঝিয়া যবনেরা' ভারতের চিরপ্রজ্বলিত স্বাধীনতা-প্রদীপ নির্বাপিত করল, 'সেই দীপনির্বাণেই এই দীপনির্বাণের সমাপ্তি।' মহম্মদ ঘোরী প্রথম আগমন করেন '১১১৩ শকাব্দে অর্থাৎ ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে' এবং থানেশ্বরের যুদ্ধে তিনি পরাভূত ও বন্দী হন; পরে ১১১৫ শকাব্দে তিনি পুনরায় ভারত আক্রমণ করেন এবং থানেশ্বরের দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ পরাভূত হন—'সেই অবধি হিন্দুরাজ্যের অপলোপ হইতে আরম্ভ হইল।' লেখিকা স্বীকার করেছেন যে 'স্থানেশ্বরের প্রথম যুদ্ধবৃত্তান্তের সহিত আমাদের এই উপন্যাসের কোনও সম্পর্ক নাই বলিয়া জয়চন্দ্রকে আর উপন্যাসভুক্ত করা হয় নাই, প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার নামোল্লেখ মাত্র করা হইয়াছে।' প্রকৃতপক্ষে গৃহবিচ্ছেদের শোচনীয় চিত্রাঙ্কনে তিনি প্রতিবেশী জয়চন্দ্রকে তেমন গুরুত্ব দান করেননি, অথচ আত্মকলহের চিত্রও তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন পৃথ্বীরাজের মন্ত্রীপুত্র বিশ্বাসঘাতক বিজয়সিংহের চরিত্র সৃষ্টি করে; ফলে প্রতিবেশী জয়চন্দ্রের শত্রুতা অপেক্ষা অধীনস্থ আত্মীয় বিজয়সিংহের ষড়যন্ত্রপ্রিয়তা ও গুপ্তঘাতকতা কাহিনীকে অধিকতর শোচনীয় করে তুলেছে। লেখিকা বাইরের সংকটের সঙ্গে আভ্যন্তরিক দুর্বলতাকে মিশ্রিত করে দিয়েছেন। গৃহযুদ্ধ এবং আত্মকলহ তৎকালীন হিন্দুর পতনের প্রসিদ্ধ কারণরূপে ঐতিহাসিকগণেরও অনুমোদন লাভ করেছে।

যদিও উপন্যাসের প্রারম্ভকাল ১০৯৪ শক—প্রথম পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে এই কালসংকেত প্রদত্ত—তথাপি জয়চন্দ্র-পৃথ্বীরাজ সংঘর্ষ এবং থানেশ্বরের প্রথম যুদ্ধ গ্রন্থমধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করেনি, সংক্ষেপে এই ঘটনাটি নেপথ্যকথারূপে বিবৃত হয়েছে। ফলে ঘটনার সমস্ত শাখা-প্রশাখা দ্বিতীয় যুদ্ধের দিকে স্থির লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন প্রথম পরিচ্ছেদের স্থান চিতোর, কিন্তু লেখিকা বলেছেন—'উপন্যাস মধ্যে দিল্লীই প্রধান রঙ্গভূমি।' প্রকৃতপক্ষে চিতোর থেকে দিল্লি পর্যন্ত ঘটনাস্থানগুলি প্রসারিত হওয়ায় এই দুই

রাজবংশের মিলন ভারতবর্ষের সংকটলগ্নে মহিমা অর্জন করতে পেরেছিল। থানেশ্বরের দ্বিতীয় যুদ্ধে কেবল পৃথ্বীরাজেরই ভাগ্য বিপর্যস্ত হয়নি, চিতোরাধিপতি রাণা সমরসিংহের রাজ্যে এবং পরিবারেও নিয়তির অভিশাপ নেমে এসেছিল অনিবার্যভাবে। ফলত ঘটনাটি মহাকাব্যোচিত বিশালতা লাভ করেছে এবং প্রতিনিধিস্থানীয় হয়ে উঠেছে এই দুই রাজ-পরিবার। উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে সমরসিংহের দ্বিতীয় পুত্র কিরণসিংহের জন্মকথা বর্ণিত হয়েছে; কিরণসিংহ দৈবদুর্বিপাকে রাজধানী থেকে অপহৃত ও স্থানান্তরিত হন অতি-শৈশবে এবং পরিণামে ভারতবর্ষের ভাগ্যবিপর্যয়ের দিনে তিনি পৃথ্বীরাজের আশ্রয় লাভ করেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে দীপনির্বাণের মধ্যে ইতিহাস ও পারিবারিক জীবনের যে সংমিশ্রণ লক্ষিত হয় কিরণসিংহ প্রভৃতি তৎসম্পাদনে যথেষ্ট সক্রিয়তা প্রদর্শন করেছেন। তাই যদিও 'কান্যকুব্জাধিপতি জয়চন্দ্রই গৃহবিচ্ছেদের মূল কারণ' এবং 'সেই গৃহবিচ্ছেদই পরে সকল অনর্থের মূলস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল' তথাপি জয়চন্দ্র-আখ্যান উপন্যাসে বর্জিতপ্রায়। ইতিহাসের কাঠামোয় পারিবারিক জীবনের ভয়াবহ পরিণাম চিত্রণে লেখিকা ছিলেন বিশেষ যত্নবান। স্পষ্টত দেখা যায় পৃথ্বীরাজ, রাজমহিষী ও রাজকন্যা উষাবতীর পারিবারিক জীবনের সমস্যা এবং রাণা সমরসিংহ, যুবরাজ কল্যাণসিংহ ও কিরণসিংহের ব্যক্তিগত ভাব-ভাবনা-সঞ্জাত সংকটই ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে আলোকিত হয়ে উঠেছে; এইসকল ব্যক্তিগত ব্যাপার আবার ইতিহাসের ভয়াবহ আবর্তকে জটিলতর ও কুটিলতর করে তুলেছে। পারিবারিক ও ঐতিহাসিক ঘটনার এই বিপুল আয়োজনকে লেখিকা একটা সংযত শ্রী দান করতে চেয়ে-ছিলেন বলে অন্যান্য ব্যাপার অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে।

গ্রন্থের ঐতিহাসিক উপাদানের সম্বন্ধে তিনি ছিলেন বড়ই সচেতন: 'যদিও এই পুস্তক উপন্যাসমাত্র তথাপি গ্রন্থ-সন্নিবিষ্ট প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ প্রায়ই ইতিহাসমূলক এবং তাঁহাদের স্বভাব ও জীবনের মূল ঘটনাবলীর ঐতিহাসিক ভিত্তি রক্ষা করিতে চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই।' এই প্রসঙ্গে থানেশ্বরের যুদ্ধে হিন্দুগণের কামান ব্যবহারের সপক্ষে বিস্তৃত তথ্য ও যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণমূলক আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে। লেখিকা বিশেষভাবে এলিয়টের হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়া, কানিংহামের আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, এলফিনস্টোনের হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়া এবং টডের রাজস্থান প্রভৃতি গ্রন্থ ও নানাবিধ পত্রিকার আশ্রয় নিয়েছেন এই ব্যাপারে; এমন কি চাঁদকবির বিখ্যাত কাব্য থেকেও প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করেছেন আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য। এই অংশে লেখিকার ইতিহাসপ্রীতি ও তথ্যসচেতনতার প্রমাণ বর্তমান। যমুনাস্তম্ভ সম্বন্ধেও এই একই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। দিল্লির কুলদেবতা আশাপূর্ণা দেবীর কথা টডের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

সর্বত্রই যে তিনি ইতিহাসের যথাযথ অনুসরণ করেছেন তা নয়। বিশেষত সমরসিংহ

সম্বন্ধে তিনি স্বয়ং দ্বিবিধ ব্যতিক্রমের কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এই ব্যতিক্রম অনৌচিত্য সৃষ্টি করেনি বরং শিল্পমর্যাদা লাভ করেছে। প্রথমত, 'সমরসিংহের বয়ঃক্রম ইতিহাসাপেক্ষা চারি বৎসর অধিক' করা হয়েছে। ফলে সমরসিংহ উপন্যাসের মধ্যে প্রবীণ ও শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তিরূপে প্রতিভাত হয়েছেন, দিল্লির নরপতি পৃথ্বীরাজের উপদেষ্টা ও গুরুজনস্থানীয় ব্যক্তিরূপে চিত্রিত হওয়ায় সমরসিংহ মহিমান্বিত হয়ে উঠেছেন: 'পৃথ্বীরাজের সহিত সমরসিংহের অতিশয় বন্ধুতা ছিল। তিনি পৃথ্বীরাজের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। প্রতি যুদ্ধে তাঁহারই আনুকূল্যে দিল্লীশ্বর জয়লাভ করিতেন, কোন বিপদে পড়িলে অগ্রে তাঁহারই পরামর্শ গ্রহণ করিতেন এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় তাঁহাকে ভক্তি ও সম্মান করিতেন।' (ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ) দ্বিতীয়ত, 'সমরসিংহ পৃথ্বীরাজের ভগিনীপতি ছিলেন কিন্তু উপন্যাসে সে সম্পর্কের উল্লেখ করা হয় নাই।' এভাবে উপস্থাপিত না হওয়ার ফলে ঐতিহাসিক যুদ্ধে তাঁর আত্মদান দেশহিতৈষণার রূপ ধারণ করেছে কারণ অনাত্মীয় হয়েও নিঃস্বার্থ হৃদয়ে তিনি এগিয়ে এসেছেন স্বদেশের মর্যাদারক্ষাকল্পে। ফলত এই অন্ধকারময় যুগের গৃহশত্রুতা ও আত্ম-কলহের বীভৎস নরকের মধ্যে তিনি অমৃতের পুত্ররূপেই যেন আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর তেজস্বিতা ও রণক্ষেত্রে মৃত্যু কেবল বীরোচিত মহিমায় মণ্ডিত হয়নি—তাকে স্পর্শ করেছে মহাকাব্যোচিত বিশালতা ও সমুন্নত গাম্ভীর্য। বর্তমান প্রসঙ্গে আরও বলা যায় যে আধুনিক কালের গবেষকগণ চন্দবরদাই-প্রণীত পৃথ্বীরাজরাসো গ্রন্থটির ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেছেন। গবেষক অমৃতলাল শীল সমরসিংহ ও পৃথ্বীরাজের আত্মীয়তা অস্বীকার করেন, 'সমরসিংহ ঔর রত্নসিংহকে জো কই দানপত্র মিলে হৈঁ উনসে প্রমাণিত হোতা হৈ কি সমরসিংহ পৃথ্বীরাজনে এক শতাব্দী পীছে চিতৌরকে রাজসিংহাসন পর বৈঠা থা ঔর উসকা পুত্র রত্নসিংহ … আলাউদ্দীন খিলজীকে সময় বিদ্যমান থা। ইসসে প্রমাণিত হোতা হৈ কি সমরসিংহ পৃথ্বীরাজকা বহনোই অথবা রত্নসিংহ পৃথ্বীরাজকা ভানজা নহীঁ হো সকতা।'[৩৪] পরবর্তী কালের অন্যান্য পণ্ডিতও মন্তব্য করেছেন যে সমরসিংহকর্তৃক 'পৃথাবাইকে বিবাহ কী কথা ভী কপোলকল্পিত হৈ';[৩৫] কারণ পৃথ্বীরাজের দেহান্ত ঘটেছিল ১১৯১-৯২ খৃস্টাব্দে[৩৬] এবং সমরসিংহ বা সমরসী ১৩০২ খৃস্টাব্দে পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।[৩৭] প্রকৃতপক্ষে শতাধিক

৩৪ চন্দবরদাইকা পৃথ্বীরাজরাসো, সরস্বতী ২৭শ ভাগ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জুন ১৯২৬, পৃ ৬৭৮। দ্র বিপিনবিহারী ত্রিবেদী সম্পাদিত রেবাতট (পৃথ্বীরাজ রাসো), ১৯৫৩, প্রথমভাগ, পৃ ২১২-১৩।

৩৫ পৃথ্বীরাজ রাসো কা নির্মাণকাল, নাগরী প্রচারিণী পত্রিকা ১৯২৯, ১০ম ভাগ, পৃ ৪৪-৪৫।

৩৬ বিপিনবিহারী ত্রিবেদী সম্পাদিত রেবাতট দ্বিতীয় ভাগ, পৃ ৩৮।

৩৭ নাগরী প্রচারিণী পত্রিকা, প্রথম ভাগ, পৃ ৪১৩।

ঐ পৃ ৪৪৩, ৫৭ সংখ্যক টীকা।

বৎসরের ব্যবধানের জন্য এই উভয় রাজপুরুষের কথিত আত্মীয়তা একান্তভাবে অবিশ্বাস্য ; তাই স্বীকার করা চলে যে সমরসিংহ পৃথ্বীরাজের ভগিনীকে বিবাহ করেননি। অথচ টডের ইতিহাসের বর্তমান পর্বে রাসোকাব্য যদিও তাঁর নিকট আকরগ্রন্থরূপে বিবেচিত হয়েছিল এবং যদিও স্বর্ণকুমারী ছিলেন টডের অনুসরণকারী তথাপি টডের ইতিহাসে এবং রাসোকাব্যে বর্ণিত সমরসিংহ-পৃথ্বীরাজের এই আত্মীয়তার প্রসঙ্গটি বর্জন করে লেখিকা ভালই করেছেন। এখানে একটি কথা বলা দরকার যে এইসকল বিচার ও আলোচনা প্রকাশিত হওয়ার প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে দীপনির্বাণ উপন্যাস রচিত হয়েছিল, ফলে লেখিকা বর্তমান বিষয়ে যে ঐতিহাসিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন তার উল্লেখের অবকাশ আছে। প্রকৃত ঘটনা যা ঘটেছিল সে সম্বন্ধে অনুমান করেছেন গবেষক বিপিনবিহারী ত্রিবেদী। তিনি তাঁর রেবাতট (পৃথ্বীরাজ রাসো দ্বিতীয় ভাগ, পৃ ৬৮-৬৯) এবং চন্দবরদাই ঔর উনকা কাব্য (পৃ ২৭) নামক গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে চন্দবরদাইর কাব্যের মধ্যে বর্ণিত যে ব্যক্তি পৃথ্বীরাজ (তৃতীয়)-এর সহোদরা পৃথাকে বিবাহ করেছিলেন তিনি হলেন তৎকালীন মেবারের অধিপতি সামন্তসিংহ বা সমতসী। প্রথমত, দেবনাগরী হরফে লিখিত 'সমতসী' শব্দটি লিপিকরের অজ্ঞতাবশত 'সমরসী'তে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে ; এর অনুকূলে সমালোচক বলেছেন যে রাসোকাব্যেই কখনো কখনো সমরসীকে 'সমতসী' বা সামন্তসিংহ অথবা সামন্তসিংহকে 'সমতসী' বা 'সমরসী' বলা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, রাসোর মধ্যে সমরসিংহের চরিত্র অবতারণার কারণ উক্ত নামটির জনপ্রিয়তা এবং তারই ফলে স্বলিখিত কাব্যে চন্দবরদাই কিংবদন্তীর প্রভাব মেনে নিয়েছেন। এমন কি অন্যান্য কাব্যেও এইরূপ কিংবদন্তী স্থান লাভ করেছে (রাজপ্রশস্তি মহাকাব্যের তৃতীয় সর্গের ২৪ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য)। বেশ বোঝা যায় ভাট এবং কবিকুল একাকার করে দিয়েছেন সামন্তসিংহ ও সমরসিংহের পৃথক পৃথক অস্তিত্বকে ; কিংবদন্তীও এই কাজে কম সহায়তা করেনি। এইসকল তথ্য ও সিদ্ধান্ত স্বীকার করেছেন পণ্ডিতপ্রবর গৌরীশংকর হীরাচন্দ ওঝা তাঁর উদয়পুর রাজ্য কা ইতিহাস (পৃ ১৫৩-৫৪) এবং ডুংগরপুর রাজ্য কা ইতিহাস (পৃ ৫৩) নামক যুগল গ্রন্থে। স্বর্ণকুমারী এই বিতর্কের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হয়ে টড তথা চন্দবরদাইর অনুসরণে উপন্যাসের কাহিনী রচনা করেছেন বলে তাঁর গ্রন্থে সামন্তসিংহের পরিবর্তে সমরসিংহ নামটিই স্বীকৃত হয়েছে এবং পৃথ্বীরাজ ও সামন্তসিংহের তথা সমরসিংহের পারিবারিক আত্মীয়তা উপক্রমণিকার মধ্যে স্বীকৃত হলেও মূল উপন্যাসে বর্জিত। পূর্বেই বলা হয়েছে এই আত্মীয়তার কথা গ্রন্থে অনুল্লেখিত হওয়ার ফলে সমরসিংহের যুদ্ধযাত্রা এবং রণক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জনের পটভূমিকায় তাঁর স্বাদেশিক মনোভাব উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে ; গ্রন্থের উদ্দেশ্যও ছিল তাই।

এইসকল আলোচনা থেকে বোঝা যায় দীপনির্বাণ গ্রন্থের পরিকল্পনায় এবং ঐতিহাসিক উপাদানের ব্যবহারে তিনি প্রধানত টডের প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থের আশ্রয় নিলেও ঔচিত্যাশ্রয়ী কালাতিক্রমণ করেছেন প্রয়োজনবোধে; বিবিধ জনশ্রুতিকে যুক্তি ও তথ্যের দ্বারা সমর্থন করেছেন তিনি এবং উপন্যাসের মধ্যে তার ব্যবহারেও কোনো কুণ্ঠাবোধ করেননি। এই প্রকার পরিকল্পনার রূপায়ণে তাঁর দক্ষতার কয়েকটি প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে। প্রথমত, গ্রন্থের উপক্রমণিকায় বর্ণিত যমুনাস্তম্ভ বা কুতবমিনার সম্বন্ধে উপন্যাসের চতুর্দশ পরিচ্ছেদের প্রথমে পাওয়া যায়, 'পৃথ্বীরাজ কন্যার যমুনাসন্দর্শনজন্য এই বৃহৎ ও চমৎকার স্তম্ভ নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা অদ্যাপি বর্তমান। মুসলমানেরা দিল্লীজয়ের পর অবধি ইহার নাম কুতবমিনার রাখিয়াছে। প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে আয়সস্তম্ভ সগর্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া পৃথ্বীরাজের গরিমা প্রচার করিতেছে এবং তাহার কিঞ্চিৎ অন্তরে প্রস্তরময় লোহিত দুর্গ নগরের শোভা সম্পাদন করিতেছে।' দ্বিতীয়ত, হিন্দুমুসলমানের যুদ্ধে কামান ব্যবহারের কথা গ্রন্থে একাধিকবার বলা হয়েছে। অবশ্য উপন্যাসে কামান অপেক্ষা অস্ত্র ধনুর্বাণ প্রভৃতির প্রাধান্য লক্ষিত হয়, তথাপি কামানের প্রয়োগ নিতান্ত গৌণ নয়। চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'বিকট গর্জনে কামান গর্জিতে লাগিল। গোলার আঘাতে সম্মুখীন বিশালাকার যবনেরা খড়্গ ও ধনুক হস্তে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িতে লাগিল।' কিন্তু অনেক সমালোচক মনে করেন এই শব্দের প্রতিশব্দ 'ধনুষ';[৩৮] হোয়েরনলে সম্পাদিত পৃথ্বীরাজরাসো গ্রন্থের একটি খণ্ডের শেষে যে চিত্রাবলী পরিবেশিত তার মধ্যে ধনুকজাতীয় যুদ্ধাস্ত্রবিশেষকে কামান বলা হয়েছে।[৩৯] তবে গ্রন্থের উপক্রমণিকার একটি পাদটীকায় লেখিকা কবিচন্দ্রের কাব্যের কনোজখণ্ড থেকে যে অংশ উদ্ধৃত করেছেন তার মধ্যে তোপ-গোলা প্রভৃতি শব্দ আছে; এবং তাদের অনুষঙ্গে আধুনিক কামানের কথা মনে পড়া স্বাভাবিক বলে স্বর্ণকুমারীর বর্তমান সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করা যায় না। তাছাড়া চন্দবরদাইও তাঁর কাব্যে কামান শব্দটি ব্যবহার করেছেন 'কংমান'রূপে।

বর্তমান প্রসঙ্গে বলা যায় দিল্লির কুলদেবী আশাপূর্ণার কথা। উপন্যাসের চতুর্দশ পরিচ্ছেদে লেখিকা টডের অনুসরণ করে আশাপূর্ণা দেবীর কথা উল্লেখ করেছেন। সকল রাজপুত যুদ্ধযাত্রার পূর্বে দেবীর অর্চনা করতেন; কেবল তাই নয়, যুদ্ধজয়ের পরও এই উপাসনার প্রথা প্রচলিত ছিল। চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'হিন্দুরা রণজয়ী হইল। সকলে

৩৮ মাতাপ্রসাদ গুপ্ত সম্পাদিত পৃথ্বীরাজ রাসও, ১৯৬৩, পৃ ৩২৫।

৩৯ The Prithiraj Rāsau, edited by A. F. Rudolf Hoernle, 1886, part II, vol. I, plate III, no. 11.

মিলিয়া মহাদেবের পূজায় ও আশাপূর্ণা দেবীর জয়-কীর্তনে প্রায় সমস্ত রাত্রি যাপন করিয়া নিশাশেষে নিদ্রা যাইতে লাগিল।' ষড়বিংশ পরিচ্ছেদে দেখা যায় যে যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যেই দেবীর আরাধনা করা হয়েছে। মহম্মদ ঘোরীর কপট সন্ধিস্থাপনের পর 'সেনাদলের মধ্যে পৃথ্বীরাজ এই ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, আজ রাত্রিতে আশাপূর্ণা দেবীর প্রতিমা নির্মাণ করত পূজা করিয়া এবং তদুপলক্ষে উৎসব সমাধাপূর্বক কাল প্রাতঃকালেই সকলকে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।' উল্লেখ করা যায় যে দেবী-অর্চনায় ব্যস্ত সৈন্যগণের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়েই মহম্মদ ঘোরী পৃথ্বীরাজকে পরাভূত করেন। এতদ্ব্যতীত বলা যায় 'পৃথ্বীরাজের পরম বন্ধু'রূপে কবিচন্দ্র ইতিহাসখ্যাত চন্দবরদাইর চরিত্রাদর্শে নির্মিত হয়েছিল। অধিকন্তু উপন্যাসের প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদে বর্ণিত 'পাগলিনীর ব্যাপার একটি প্রকৃত ঘটনার আভাস হইতে কল্পিত'—গ্রন্থের উপক্রমণিকায় লেখিকা সেকথা স্বীকার করেছেন।

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে দীপনির্বাণের কাহিনী প্রধানত টডের প্রখ্যাত রাজস্থান থেকে গৃহীত। আবার টড তাঁর গ্রন্থের মধ্যে স্বীকার করেছেন যে পৃথ্বীরাজ-সমরসিংহ-মহম্মদ ঘোরীর কাহিনী নির্মাণে তিনি প্রধানত চাঁদকবির কাব্য অনুসরণ করেছেন এবং Though the domestic annals are not silent on his (Samarsing's) acts, we shall recur chiefly to the bard of Delhi for his character and actions, and the history of the period.[৪০] গ্রন্থকার পাদটীকায় রাজপুত ইতিহাসের আকর-গ্রন্থরূপে চাঁদকবির পুস্তকের প্রশংসা করেছেন পঞ্চমুখে এবং ইতিহাসের অধিকাংশ উপাদান তিনি যেমন চাঁদকবির গ্রন্থ থেকে আহরণ করেছেন স্বর্ণকুমারীও তদ্রূপ করেছিলেন। যেমন, চিতোরাধিপতি রাণা সমরসিংহ সম্পর্কে টডের বক্তব্য : A simple necklace of the seeds of the lotus adorned his neck ; his hair was braided, and he is addressed as Jogindra, or chief of ascetics.... It is in this, the last of the books of Chund, termed *The Great Fight*, that we have the character of Samarsi fully delineated.... The bard represents him as the Ulysses of the host : brave, cool, and skilful in the fight ; prudent, wise, and eloquent in council ; pious and decorous on all occasions ; beloved by his own chiefs, and reverenced by the vassals of the Chohan. এইসকল মন্তব্যের অনুসরণে স্বর্ণকুমারী সমরসিংহের চরিত্র নির্মাণ করেছেন। উপন্যাসের

৪০ James Tod, Annals and Antiquities of Rajasthan, or the central and western Rajpoot states of India, two volumes in one with a preface by Douglas Sladen, London, Routledge & Kegan Paul Ltd., ১৯৫০, pp ২০৬-০৭.

তৃতীয় পরিচ্ছেদের শেষে আছে, 'সেইদিন হইতে তাঁহার নাম যোগীন্দ্র হইল এবং এই নামেই তিনি পরে ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়াছেন।' ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'সেই জটা-শ্মশ্রুধারী, পদ্মবীজমালাশোভিত, স্থিরগম্ভীর মূর্তি একটি তেজস্বী ঋষিমূর্তির ন্যায় প্রতিভাত।' বিংশ পরিচ্ছেদে আছে, 'যোগীভাব এবং বীরভাব মিশ্রিত হওয়াতে তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে একটা প্রশান্ত প্রভা বিকীর্ণ হইতেছে, যেন ব্রহ্মতেজ ও ক্ষত্রতেজ একত্র সম্মিলিত হইয়াছে। তাঁহার মহাগম্ভীর অটল দৃঢ়ভাব দেখিলে তাঁহাকে দেবহিমালয় বলিয়া মনে হয়।' লেখিকাও গ্রন্থমধ্যে কবিচন্দ্রের বর্ণনানুসরণের কথা পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছেন, 'সমরসিংহ যুদ্ধক্ষেত্রে মহাসাহসী অথচ ধীর ও কৌশলনিপুণ ছিলেন। সভাস্থলে তিনি অতি বিজ্ঞ সুবিবেচক সদ্বক্তা ছিলেন। স্বভাবতঃ অতি ধার্মিক ছিলেন, সকল বিষয়েই তাঁহার ধর্মভাব ও সামাজিকতা প্রকাশ পাইত। তাঁহার অধীনস্থ করপ্রদ রাজাগণ ও সৈন্যেরা সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত, এমন কি পৃথ্বীরাজের সৈন্য-সামন্তেরাও তাঁহাকে বিশেষ ভক্তিসম্মান করিত।...কবিচন্দ্র মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, রাজ্যশাসন, মন্ত্রীনির্বাচন, রাজদূতপ্রেরণ ইত্যাদি বিষয়ে তিনি যেসকল উপদেশ দিয়াছেন সকলই সমরসিংহের রসনানিঃসৃত; এবং তিনি গল্প বা উপন্যাসচ্ছলে যাহা কিছু নীতি, ধর্ম বা কর্তব্যানুষ্ঠান, বিশেষত রাজপুত-দিগের রাজভক্তি বিষয়ে যাহা কিছু শিক্ষা দিয়াছেন সেসকলই সমরসিংহ হইতে গৃহীত।' (দীপনির্বাণ—ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ) এই উদ্ধৃতির প্রথমাংশের মত শেষাংশ দেখে মনে হয় লেখিকা টডের মন্তব্য যেন অনুবাদ করে নিয়েছেন, যথা—The bard confesses that his precepts of government are chiefly from the lips of Khoman; and of his best episodes and allegories, whether on morals, rules for the guidance of ambassadors, choice of ministers, religious or social duties (but especially those of the Rajpoot to the sovereign), the wise prince of Cheetore is the general organ.

টডের গ্রন্থের মধ্যে সমরসিংহের পুত্র কল্যাণসিংহ ও কিরণসিংহ সম্বন্ধে সামান্য দুএকটি কথা বলা হয়েছে। কল্যাণসিংহ সম্পর্কে বলা হয়েছে, On the last of three days' desperate fighting Samarsi was slain, together with his son Calian,...... থানেশ্বরের যুদ্ধক্ষেত্রে কল্যাণ বীরের মত মৃত্যুবরণ করেছিলেন— দীপনির্বাণের রচয়িত্রী মাত্র এইটুকু সংকেতকে স্বীয় কল্পনাশক্তির দ্বারা সম্বর্ধিত করেছিলেন। কিরণসিংহ সম্পর্কে টডের মন্তব্য, Samarsi had several sons; but Kurna was his heir,......Kurna (the radiant) succeeded in S. 1249 (A. D. 1193) ইত্যাদি। বেশ বোঝা যায় Kurna এবং radiant এই দুটি ইংরেজি শব্দের সঙ্গে সামঞ্জস্য ও সম্পর্ক রক্ষা করে লেখিকা

'কিরণ' শব্দটি গ্রহণ করেছেন। টডের রাজস্থান থেকে জানা যায় সমরসিংহ যখন চিতোর থেকে সসৈন্যে দিল্লি গমন করেন আসন্ন সংগ্রামে পৃথ্বীরাজকে সাহায্য করার জন্য তখন The charge of the city was entrusted to a favourite and younger son, Kurna ইত্যাদি। স্বর্ণকুমারীর উপন্যাসে আছে দিল্লিতে সমরসিংহ তাঁর অপহৃত পুত্র কিরণসিংহ বা দিলীপসিংহকে ফিরে পেয়েছিলেন ; এবং তাকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করে চিতোরে পাঠিয়ে দেন অরক্ষিত নগরী ও পরিজনবর্গের রক্ষাকল্পে। স্বর্ণকুমারী টডের সংক্ষিপ্ত নির্দেশ থেকে এভাবে বিস্তৃত কাহিনী নির্মাণ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে দিলীপ-শৈলবালা ও কল্যাণ-উষাবতীর প্রণয়কথা লেখিকার স্বকপোলকল্পিত বলে এর দায়িত্বও তাঁরই, টডে এসম্পর্কে কোনো আভাস পর্যন্ত নেই। উপন্যাসের শেষ ভাগে পৃথ্বীরাজ-মহিষীর সক্রিয়তা পাঠকের চোখে পড়ে। টডের গ্রন্থে বর্ণিত সমরসিংহের পত্নীর আচরণ ও অনুভাব অবলম্বনে মহিষীর কার্যকলাপসমূহ বিবৃত হয়েছে। টড তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, His (Samarsi's) beloved Pirtha, on hearing the fatal issue, her husband slain, her brother (Pirthi Raj) captive, the heroes of Delhi and Cheetore 'asleep on the banks of the Caggar, in the wave of the steel,' joined her lord through the flame,......etc. চন্দবরদাই-প্রণীত পূর্বোক্ত পৃথ্বীরাজরাসো কাব্যের অনুসরণে (৬৬শ সর্গ) এই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। উপন্যাসের মধ্যে দেখা যায় যে (২৯শ পরিচ্ছেদ) পৃথ্বীরাজ বন্দী হয়েছেন ; চিতোরোহণকালে এই সংবাদ শুনে মহিষী স্বয়ং যুদ্ধযাত্রায় অগ্রসর হন, 'সেই পট্টবস্ত্র পরিহিতা, রক্তচন্দনচর্চিতা, নিবিড় স্খলিত কুন্তলজালশোভিতা, অভিমান-গম্ভীর, ক্রোধারক্তনয়না, বীরপত্নী বীরতেজে উন্মাদিনীর ন্যায় সমরক্ষেত্রাভিমুখে গমন করিলেন।' অবশ্য পরিণামে তিনি অগ্নিতে আত্মাহুতি দান করেন। কিন্তু টডের গ্রন্থের উপর নির্ভর করে এটুকু বলা যায় যে তাঁর বীরাঙ্গনাসুলভ আচরণ আদৌ ভিত্তিহীন নয়। সমরসিংহের অপর মহিষী কর্মদেবীর আদর্শটি এখানে স্বীকৃত। তাঁর সম্বন্ধে কথিত আছে, Samarsi had several sons ; but Kurna was his heir, and during his minority his mother, Korum-devi, a princess of Putun, nobly maintained what his father left. She headed her Rajpoots and gave battle[৪১] in person to Kutoob-o-din,...... etc. ফলত সমরসিংহের মহিষীদ্বয় কর্মদেবী ও পার্থার (মতান্তরে প্রথা বা পৃথার) আদর্শে পৃথ্বীরাজ-মহিষী বীরাঙ্গনা ও পতিব্রতারূপে যে পরিকল্পিত হয়েছেন একথা বলা যায়।

৪১ এস্থলে টড পাদটীকায় বলেছেন, 'This must be the battle mentioned by Ferishta. See Dow, p 169, Vol II.' অতএব একথার সত্যতা নির্ভরযোগ্য।

এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে পৃথ্বীরাজরাসোর অন্যতম প্রধান ঘটনা পৃথ্বীরাজ ও সংযুক্তার (বা সংযোগিতা) পরিণয়কথা স্বর্ণকুমারীর উপন্যাসে স্থান পায়নি বলে স্বদেশরক্ষাকল্পে পৃথ্বীরাজ-সমরসিংহের কার্যকলাপসমূহ একান্ত প্রাধান্য লাভ করেছে এবং ঘটনাগত ঐক্যও সুরক্ষিত হয়েছে। সমরসিংহ-পৃথ্বীরাজের পুত্রকন্যাগণের প্রণয়কাহিনী এই উপন্যাসে স্থানলাভ করেছে বলে সংযুক্তাহরণকথা বর্জিত হওয়ায় ঔচিত্য এবং শালীনতা সুন্দর মর্যাদা লাভ করেছে।

॥৪॥ দীপনির্বাণ উপন্যাসের কালবিচারে দেখা যায় সুদীর্ঘকালের ঘটনাবলী মাত্র প্রথম কয়েকটি পরিচ্ছেদে পরিবেশিত হয়েছে। উপক্রমণিকায় বলা হয়েছে, 'মুসলমানের ভারতাধিকারের অব্যবহিত পূর্বে যেসময় হিন্দুরাজদিগের মধ্যে একতার দৃঢ় বন্ধন ক্রমে ক্রমে শিথিল হইয়া আসিয়াছিল এবং সর্বোচ্চ পদলাভ-লালসায় পরস্পর সকলেরই মধ্যে গৃহবিচ্ছেদের সূত্রপাত হইয়াছিল সেই সময়ের একটি ঘটনা অবলম্বন করিয়া এই উপন্যাসের আরম্ভ—এবং গৃহবিচ্ছেদহেতু সুযোগ বুঝিয়া যবনেরা যেসময়ে ভারতের চিরপ্রজ্বলিত দীপ নির্বাপিত করিল সেই দীপনির্বাণেই এই দীপনির্বাণের সমাপ্তি।' উপন্যাসের আরম্ভের কাল পাওয়া যায় গ্রন্থের মধ্যে: 'প্রথম পরিচ্ছেদ। শক ১০৯৪।—সময় সন্ধ্যা।' সন্ধ্যার উল্লেখ খুবই ব্যঞ্জনাগর্ভ, সন্ধ্যার অন্ধকারে ভারতবর্ষের সৌভাগ্যসূর্যের আত্মগোপনের মধ্যে 'ভারতের চিরপ্রজ্বলিত' দীপনির্বাণের ইঙ্গিত রয়েছে। বর্তমান উপন্যাসের আরম্ভে চিতোরাধিপতি সমরসিংহের পুত্র কিরণসিংহের জন্মকথা বিবৃত হয়েছে এবং মহম্মদ ঘোরীর হস্তে পৃথ্বীরাজের পরাজয়ের কথাতে গ্রন্থটি সমাপ্ত; প্রায় বাইশ বছরের ঘটনাবলী বর্তমান উপন্যাসের বিষয়বস্তু। প্রথম সাতটি পরিচ্ছেদের মধ্যে প্রায় একুশ বছরের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এবং বাকী অধ্যায়গুলির মধ্যে অবশিষ্ট এক বছরের কাহিনী স্থানলাভ করেছে।[৪২] দশম পরিচ্ছেদ থেকে উপন্যাসের অন্তিম ঘটনা পর্যন্ত কালসীমা প্রায় এক বৎসর এবং এই

৪২ গ্রন্থের মধ্যে ইতস্তত পরিবেশিত যে সংকেত ও সূত্রাবলীর অবলম্বনে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তা এখানে প্রদত্ত হল। উপক্রমণিকায় ও মূল উপন্যাসে সন-তারিখের ব্যবহারে সর্বত্র সঙ্গতি রক্ষিত হয়নি প্রসঙ্গক্রমে একথা বলা প্রয়োজন।

১ম পরিচ্ছেদ। ১০৯৪ শকে চিতোরের রাজকুমার কিরণসিংহের জন্মের কথা।

২য় পরিচ্ছেদ। 'কুমার কিরণসিংহের বয়ঃক্রম তিন বৎসর প্রায় পূর্ণ হইয়া উঠিল।' অতএব ১০৯৪+৩ বা প্রায় ১০৯৭ শকের ঘটনা।

৪র্থ পরিচ্ছেদ। কিরণসিংহের (নামান্তরে দিলীপসিংহ) বয়ঃক্রম প্রায় দশ; অতএব প্রায় ১১০৪ শকের কাহিনী।

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ। 'আরও চারি বৎসর অতীত হইয়া গেল।' অতএব কালসীমা ১১০৮ শক।

অংশে পৃথ্বীরাজের পরাজয় কথাই বিবৃত হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ঘটনাগত ঐক্যের যে অভাব ছিল দ্বিতীয় পর্যায়ে তা তিরোহিত হল। বরং দ্বিতীয় বা শেষ পর্যায়েই পৃথ্বীরাজকথা প্রাধান্য লাভ করেছে, কিন্তু প্রথমাংশে চিতোর-কনৌজ-আজমীরের কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে বলে সেখানে স্থান-কাল-পাত্র কিংবা ঘটনাগত ঐক্যের অভাব অনুভূত হয়।

কেবল কালবিচার নয়, সবদিক লক্ষ করে আমরা উপন্যাসের ঘটনাবলীকে দুটি ভাগে ভাগ করেছি। স্পষ্টত দেখা যায় প্রথম সাতটি পরিচ্ছেদে একুশ বৎসরের ঘটনা রয়েছে, ফলে প্রথম পর্যায়ের বিচিত্র জটিল ঘটনাস্রোত স্বল্প পরিসরের মধ্যে স্ফীত ও তীব্র হয়ে উঠেছে। যেমন, প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ব্যবধানকাল তিন বৎসর এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদের অন্তর্বর্তী কাল সাত বৎসর; আবার কেবল চতুর্থ পরিচ্ছেদের মধ্যেই তিনচার বৎসরের ঘটনা বিবৃত। এইভাবে বিশ্লেষণ করে দেখান যায় প্রথম কয়েকটি পরিচ্ছেদের মধ্যে ঘটনাবলী কি পরিমাণ আকস্মিক এবং তাদের গতি কত দ্রুত; ফলে উক্ত পর্যায়ে চরিত্রচিত্রণ, বর্ণনা কিংবা ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শন প্রভৃতি উপন্যাসের প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য-সমূহ উপেক্ষিতপ্রায়। কেবল ঘটনাপ্রাধান্যই উপন্যাসের প্রথম পর্যায়ের একমাত্র উল্লেখ্য বিষয়, সে তুলনায় দ্বিতীয় পর্যায় অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক ধীরগতিসম্পন্ন, বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেই গতি কিছুটা বিলম্বিত হয়ে পড়েছে। মাত্র এক বৎসরের কাহিনী উপন্যাসের শেষ চব্বিশটি অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে; চরিত্রচিত্রণেও বিশ্লেষণের অবকাশ তাই বর্তমান পর্যায়ে অধিক। উপন্যাসের ঘটনাবলী স্বাভাবিক ধীর গতিতে পরিণামের দিকে ধাবিত হয়েছে এবং লেখিকার জীবনবোধ ও অভিজ্ঞতা সেহেতু এই অংশে বহুল পরিমাণে স্থান লাভ করেছে। ঘটনার বিলম্বিত লয়ের উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় দশম একাদশ ও দ্বাদশ পরিচ্ছেদের মধ্যে যথাক্রমে প্রথম-শরৎ মধ্য-শরৎ ও শেষ-শরৎ বা শীতের প্রারম্ভকালীন ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এইসকল দিক থেকে বলা চলে দীপনির্বাণ উপন্যাসের প্রথম সাতটি পরিচ্ছেদ যেন উপন্যাসের গৌরচন্দ্রিকা এবং অবশিষ্টাংশ তারই পরিপূরক যেখানে উপন্যাসের বিশালতা ও ব্যাপ্তি ধরা পড়েছে।

॥৫॥ দীপনির্বাণের মধ্যে যেসকল অনৈতিহাসিক প্রসঙ্গ এবং উপাখ্যান কিংবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাবৃত্তের সমাবেশ দেখা যায় সেসম্পর্কে এবারে আলোচনা করা যেতে পারে।

৭ম পরিচ্ছেদ। পৃথ্বীরাজ ও মহম্মদ ঘোরীর প্রথম সংঘর্ষের সূত্রপাত; স্বর্ণকুমারীর মতানুযায়ী ১১১০ শকের ঘটনা।

৮ম-৯ম পরিচ্ছেদ। প্রথম ও দ্বিতীয় সংঘর্ষের অন্তর্বর্তী কালের কাহিনী।

১০ম পরিচ্ছেদ। 'দিলীপ এখন দ্বাবিংশতিবর্ষীয় যুবাপুরুষ।' অতএব প্রায় ১১১৫ শকের কাহিনী। এখান থেকেই পৃথ্বীরাজ-মহম্মদ ঘোরীর দ্বিতীয় সংঘাতের কাহিনীর তথা উপন্যাসের কেন্দ্রীয় আখ্যানের সূত্রপাত। স্পষ্টত উপলব্ধ হয় সপ্তম ও দশম পরিচ্ছেদের কালগত ব্যবধান সামান্য।

উপন্যাসের প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদের মধ্যে চিতোরের রাজঅন্তঃপুরের ভূতপূর্ব পরিচারিকা পাগলিনী বিন্দু কর্তৃক তিন বৎসর বয়স্ক কুমার কিরণসিংহের হরণকথা বর্ণিত হয়েছে। সমরসিংহ কিরণকে 'মম প্রাণৈঃ প্রিয়তর' জ্ঞান করতেন, তার অভাবে তিনি যে কি পরিমাণ বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন তা তৃতীয় পরিচ্ছেদের অন্তিম ঘটনাবলীর মধ্যে ব্যঞ্জিত হয়ে উঠেছে। কাহিনীর শেষতম পর্যায় পর্যন্ত হৃতসর্বস্ব পিতৃহৃদয়ের কাতরতা লেখিকা নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন। সমগ্র উপন্যাসের গঠনকৌশলের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে কিরণসিংহের অপহরণকথার গুরুত্ব তখন অসামান্য হয়ে উঠে। দীর্ঘ উনিশ বৎসর পরে পিতা ও পুত্রের পুনর্মিলন ঘটেছিল সমাসন্ন মহাযুদ্ধের প্রতিকূল পটভূমিকায়; কিরণসিংহ (নামান্তরে দিলীপসিংহ) তখন চিতোরের রাজ্যপরিচালনার ভারপ্রাপ্ত হলেন, এবং পিতা সমরসিংহ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে তিনি পৃথ্বীরাজ-ঘোরীর সংঘর্ষ-ক্ষেত্র থেকে প্রতিনিবৃত্ত হয়েছিলেন রাণাবংশের ধারাবাহিকতা ও পিতৃরাজ্য রক্ষার নিমিত্ত। কেবল ভবিষ্যৎ ইতিহাসের ব্যক্তিপুরুষরূপে নয়, উপন্যাসের ঘটনাপরিণামেও কিরণসিংহের সক্রিয়তা অসামান্য কারণ সে উপন্যাস-অংশেরও নায়ক। ফলত দেখা যায় উপন্যাসের ভূমিকাপর্বে নায়ক কিরণসিংহের জন্মকথা পরিবেশন করে লেখিকা সুবুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছেন। উক্ত কাহিনী পরিবেশনকালে তিনি টড কিংবা চন্দবরদাইয়ের দ্বারস্থ হননি অথচ ঘটনাটি কোনো ক্ষেত্রেই বিশ্বাসের সীমা অতিক্রম করেনি। প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাসের লেখক ইতিহাসের উপাদানের সঙ্গে কল্পনার চমৎকার সংমিশ্রণ সাধন করেন কারণ ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস হল not the re-telling of great historical events, but the poetic awakening of the people who figured in those events. What matters is that we should re-experience the social and human motives which led men to think, feel and act just as they did in historical reality...... The historical novel therefore has to *demonstrate* by *artistic* means that historical circumstances and characters existed in precisely such and such a way.[৪৩] আচার্য যদুনাথ ঐতিহাসিক উপন্যাসের এই বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ রেখে তার সার্থকতা সম্বন্ধে বলেছেন, 'ইতিহাস এবং উপন্যাস এক বস্তু নহে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রকৃত স্থান সাহিত্যের শ্রেণীতে, ইতিহাসের শ্রেণীতে নহে।...ঐতিহাসিক উপন্যাসের একটা সার্থকতা আছে; তাহার কারণ, সত্য ইতিহাসের মধ্যে কি-যেন-একটা অভাব বোধ হয়; অর্থাৎ অতীত যুগের মৃত নায়ক-নায়িকাগণ

৪৩ Georg Lukács, The Historical Novel, pp 42-43.

তাঁহাদের প্রায় সব গোপনীয় ব্যাপারগুলি সঙ্গে লইয়া তিরোধান করিয়াছেন, এবং আধুনিকেরা অতীত যুগকে চিরদিনই শুধু ভাঙা ভাঙা রকমে চিনিতে পারে। পাঠকহৃদয়ের এই শূন্য স্থান ঐতিহাসিক উপন্যাস পূর্ণ করে।'[৪৪] যাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসের শ্রেষ্ঠত্ব মহিমা ও উৎকর্ষ বিচারকালে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক উপরিউক্ত মন্তব্য করেছিলেন সেই বঙ্কিমচন্দ্রও এই জাতীয় উপন্যাসের কথিত ধর্মের কথা মেনে নিয়েছিলেন। রাজসিংহের চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপনে (১৮৯৩) বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, 'উপন্যাস-লেখক সর্বত্র সত্যের শৃঙ্খলবদ্ধ নহেন। ইচ্ছামত, অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য কল্পনার আশ্রয় লইতে পারেন।...... উপন্যাসে সকল কথা ঐতিহাসিক হইবার প্রয়োজন নাই।' এবংবিধ মন্তব্যের পূর্বেই স্বর্ণকুমারীর দীপনির্বাণ প্রকাশিত হলেও বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যিকের কয়েকটি ঐতিহাসিক উপন্যাস ইতিমধ্যেই মুদ্রিত হতে থাকে,[৪৫] এবং স্বর্ণকুমারীর ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসের আদর্শরূপে এই রচনাবলীর প্রভাব ছিল অসামান্য। সুতরাং এদের মধ্যে অনৈতিহাসিক ঘটনা পরিবেশনের ব্যাপারটি লেখিকা ভালভাবেই যে লক্ষ করেছিলেন সেকথা মনে করার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে। সে যাই হোক না কেন ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে অনৈতিহাসিক ঘটনা পরিবেশনে লেখকের যে ক্ষমতা ও সুযোগ থাকে স্বর্ণকুমারী তার সদ্ব্যবহার করেছিলেন।

ইতিহাসের ধূসর অতীত লোকের পৌর্বাপর্য-পারম্পর্য-যোগসূত্রহীন ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক স্বীয় তৃতীয় নয়নের দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দিয়ে থাকেন, অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞার বলে বিচ্ছিন্ন ঘটনাসমূহকে একটি সুন্দর শিল্পমূর্তি প্রদান করেন; ফলে অতীত কালের জগৎ ও জীবন সমগ্রতার সঙ্গে জীবন্ত হয়ে আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়। এইসকল ক্ষেত্রে লেখক ঔচিত্যকে অতিক্রম করেন না বলে এবং স্বাভাবিকতাকে অক্ষুণ্ন রাখেন বলে কাল্পনিক ঘটনাবলীকে আদৌ অবিশ্বাস্য মনে হয় না। সহৃদয় পাঠকের পক্ষে তাই এরূপ নব-নব-উন্মেষ-সাধনব্যাপারকে স্বীকার করে নিতে কোনো বাধা থাকে না।

স্বর্ণকুমারীর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে বিবিধ পাত্র-পাত্রীর প্রণয়লীলা একটি বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করেছে। দীপনির্বাণেরই মধ্যে শৈলবালা-কিরণসিংহ, উষাবতী-কল্যাণসিংহ, প্রভাবতী-চন্দ্রপতি প্রভৃতির প্রণয়কথা প্রাধান্য অর্জন করেছে। এমন কি প্রণয়ের ত্রিকোণ বা চতুষ্কোণ সংঘর্ষেরও অবতারণা করা হয়েছে। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হল টডের গ্রন্থে অথবা পৃথ্বীরাজরাসোর মধ্যে এর কোনোটিরই উল্লেখ নেই। বরং চন্দবরদাইয়ের মহাকাব্যে যে প্রণয়লীলা প্রধান তার পাত্রপাত্রী হলেন পৃথ্বীরাজ ও সংযুক্তা বা সংযোগিতা; অথচ এই কাহিনী বর্তমান উপন্যাসে একেবারে অনুপস্থিত, এমন কি সমরসিংহের সঙ্গে

৪৪ বঙ্কিমরচনাবলী প্রথম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ ২৭।

৪৫ বিভিন্ন গ্রন্থের প্রকাশকাল: দুর্গেশনন্দিনী ১৮৬৫, মৃণালিনী ১৮৬৯, চন্দ্রশেখর ১৮৭৫, বঙ্গবিজেতা ১৮৭৪।

পৃথ্বীরাজ-সহোদরার যে বিবাহকথা রাসোকাব্যে বর্ণিত তাও দীপনির্বাণে নেই। অর্থাৎ লেখিকা মূল মহাকাব্যে বর্ণিত প্রণয়কাহিনী সম্পূর্ণ বর্জন করে চার পাঁচটি প্রণয়-উপাখ্যান সৃজন করেছেন প্রস্তূয়মান উপন্যাসের জন্য। সাধারণভাবে বলা যায় অন্যান্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যেও এই একটি রীতি পুনঃ পুনঃ আচরিত হয়েছে এবং এ বিষয়েও তিনি বঙ্কিমচন্দ্র-রমেশচন্দ্রের সুযোগ্য উত্তরসূরী। কিন্তু একটা কথা বলা প্রয়োজনীয় যে এই প্রণয়-আখ্যানগুলি উপন্যাসের প্রধান উদ্দেশ্যের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি। যে স্বাদেশিকতার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে লেখিকা পুরাতত্ত্ব ও প্রাচীন ইতিহাসচর্বণা আরম্ভ করেছিলেন তারই পরিণামস্বরূপ ঐতিহাসিক উপন্যাসের জন্ম—দীপনির্বাণের উপহারপত্রের মধ্যেই তা আভাসিত হয়ে উঠেছে। উপন্যাসটির মধ্যে যে 'আর্য-অবনতি কথা' আছে তাকে সহানুভূতির বর্ণে রঞ্জিত করেছেন লেখিকা কিন্তু উপন্যাসের এই কেন্দ্রগত লক্ষ্য থেকে প্রণয়-উপাখ্যানগুলি ভ্রষ্ট হয়ে পড়েনি। একথা সত্য যে উপাখ্যান মূল আখ্যানের সঞ্চারী অর্থাৎ উপাখ্যান কেন্দ্রীয় ঘটনাকে বিশালতা ও ব্যাপ্তি দান করে এবং কখনও গৌণ মুখ্যকে অতিক্রম করে যায় না। এক্ষেত্রেও এই প্রণয়লীলানির্ভর উপাখ্যানসমূহ মুখ্যঘটনাকেন্দ্রিক। কল্যাণ ও উষাবতীর অপমৃত প্রণয় আসন্ন যুদ্ধের পটভূমিকায় নষ্টনীড় গার্হস্থ্যের প্রতীকে পর্যবসিত। শৈলবালা ও কিরণসিংহের পারস্পরিক আনুগত্যের উদ্ভব হয়েছিল জটিল রাজনৈতিক আবর্তের মধ্যে, উৎক্ষিপ্ত হয়েই তারা পরস্পরের নিকটবর্তী হয়। শৈলবালা-কিরণসিংহ এবং প্রভাবতী-চন্দ্রপতির প্রণয়কথা ঝটিকাসংক্ষুব্ধ সমুদ্রের বুকে 'দারুচিনি-দ্বীপের'ই মত—এই প্রণয়ী চতুষ্টয়ই উপন্যাসের মধ্যে সান্ত্বনার বাণী বহন করে এনেছে। অপরদিকে বিজয়সিংহের কলঙ্কিত আচরণ গৃহশত্রুতা বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতিহিংসা-পরায়ণতার জন্মও এই প্রণয়সমুদ্রমন্থন থেকে ; রাজকন্যা উষাবতীর প্রত্যাখ্যান তার ভাবনার জগৎকে আলোড়িত ও অশান্ত করে তুলেছে, তারই প্রচণ্ড এবং ভয়াবহ বিরোধিতায় ও প্রতিকূলতায় ভারতবর্ষের ভাগ্যাকাশে দুর্যোগ ঘনিয়ে এল। যে প্রেম হতভাগ্য কিরণসিংহের জীবনে আশ্বাসের প্রদীপ জ্বেলেছিল তা-ই বিজয়সিংহের ভাগ্যাকাশকে ধূম্রাচ্ছন্ন করে দেয় এবং এইসকলেরই ঘাতপ্রতিঘাতে ও প্রতিক্রিয়ায় ভারতবর্ষের মঙ্গলদীপ নির্বাপিত হয়ে যায়। তাই দীপনির্বাণ উপন্যাসে বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর প্রণয়লীলা সঙ্গত কারণে প্রাধান্য লাভ করেছে। আত্মীয়কলহ বিশ্বাসঘাতকতা শত্রুপক্ষসমর্থন প্রভৃতি হীনতা এই প্রণয়-উপাখ্যান-সঞ্জাত। যদিও এই ঘটনাসমূহ ইতিহাসের সমর্থন পায়নি—টডের রাজস্থানে কিংবা চন্দবরদাইয়ের পৃথ্বীরাজরাসোর মধ্যে এসকল কাহিনী অনুপস্থিত—তথাপি স্বর্ণকুমারীর সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও দূরদর্শিতা এর মধ্যে প্রতিফলিত এবং অপূর্ববস্তুনির্মাণকৌশলে তিনি এই উপাখ্যান-গুলিকে মূল উপন্যাসের সঙ্গে গ্রথিত করেছেন। আর একটি দিক থেকে ইতিহাসে

অনুচ্চারিত এইসব ঘটনার প্রয়োজনীয়তা উপন্যাসের মধ্যে স্বীকার করা যায়। পৃথ্বীরাজরাসো ইতিহাস গ্রন্থ নয়, ইতিহাসনির্ভর মহাকাব্য, তন্মধ্যে পৃথ্বীরাজ-সংযোগিতার প্রণয় একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে; কিন্তু দীপনির্বাণের মধ্যে সে কাহিনীর অনুপস্থিতি হয়ত স্রষ্টার মানসলোকে একটা অপূর্ণতা ও অভাববোধ সৃষ্টি করেছিল, তাই পৃথ্বীরাজ-সংযোগিতার প্রণয়কথার বিকল্পে তিনি অন্যবিধ প্রেমকাহিনীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন।

এমন একটি জিনিস স্বর্ণকুমারীর এই উপন্যাসে আছে যা চন্দবরদাইয়ের কাব্যে ছিল না। লেখিকা উপন্যাসের যত্রতত্র স্বাদেশিকতার প্রসঙ্গ অবতারণা করেছেন। টডের গ্রন্থে ও চন্দবরদাইয়ের কাব্যে এই আধুনিক কালোচিত জাতীয়তাবোধ প্রশ্রয় লাভ করেনি। বঙ্কিমচন্দ্র-রমেশচন্দ্রের ইতিহাস এবং পুরাতত্ত্বের চর্চার পশ্চাতে এই স্বাজাত্যাভিমান ও স্বাদেশিকতাই সক্রিয় ছিল। 'উনবিংশ শতকে ও বিংশ শতকের প্রথম দশকে আমাদের স্বাদেশিক চেতনা বা জাতীয়তাবাদী কল্পনার সঙ্গে রাজপুত মারাঠা ও শিখদের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের ইতিহাস অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে ছিল। সেজন্যই এই "জাতীয়তাবাদ"কে অনেকে "হিন্দু জাতীয়তাবাদ" বলে আখ্যাত করেন।'[৪৬] আমাদের ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে উক্ত নবজাগ্রত হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও স্বাদেশিকতার দান অসামান্য। রমেশচন্দ্র মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাতের এক স্থানে স্বীকার করে নিয়েছেন সেকথা: 'পাঠক! একত্র বসিয়া এক একবার প্রাচীন গৌরবের কথা গাইব, আধুনিক রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয় বীরত্বের কথা স্মরণ করিব, কেবল এই উদ্দেশ্যে এই অকিঞ্চিৎকর উপন্যাস আরম্ভ করিয়াছি।' উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশের পটভূমিকায় তাই স্বর্ণকুমারীর মত স্পর্শকাতর মনের অধিকারী সমাজসচেতন শিল্পীর সৃষ্টির মধ্যে এই স্বদেশপ্রীতির কথা পাওয়া খুবই স্বাভাবিক। নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধ ও স্বাধীনতা-আকাঙ্ক্ষার সুতীব্র স্পৃহার দ্বারা তাঁর বর্তমান উপন্যাসের চরিত্রচিত্রণ ও ঘটনাবিন্যাসকৌশল যে বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। প্রমাণস্বরূপ উপন্যাসের অংশবিশেষ নিম্নে প্রদত্ত হল।

১. চন্দ্রপতির প্রতি প্রভাবতী: তুমি স্বদেশরক্ষার জন্য যাচ্ছ আমি তাতে বাধা দেব না। ঈশ্বর করুন, আরবারের মত কৃতকার্য হয়ে ফিরে এসো।—সপ্তম পরিচ্ছেদ। ২. বিজয়ের প্রতি উষাবতী: তোমার মত আমি স্বদেশ অপেক্ষা প্রাণকে অধিক মূল্যবান মনে করি না।—অষ্টম পরিচ্ছেদ। ৩. পৃথ্বীরাজের অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধ মন্ত্রী অমরসিংহ: তুমি যদিও আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়, তথাপি স্বদেশের হিতের

৪৬ দেবীপদ ভট্টাচার্য, গ্রন্থপরিচয়, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৯শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, পৃ ৪২৭

নিমিত্ত তোমাকেই প্রেরণ করিতেছি— দেশের জন্য এই বৃদ্ধ বয়সে একমাত্র পুত্রকে হারাইতেও স্বীকৃত হইয়াছি।— নবম পরিচ্ছেদ। ৪. পৃথ্বীরাজ: যবন পরাজয়ই যখন তোমাদের উদ্দেশ্য, দেশরক্ষাই যখন তোমাদের ব্রত, বীরশ্রেষ্ঠ সমরসিংহ যখন তোমাদের সহায়, তখন তোমাদের শরীরে যে শোণিত-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে তাহার এক এক বিন্দু রক্তই সেই উত্তেজনার উৎস। সৈন্যগণ, সেই বীরতেজে, সেই ক্ষত্রিয় প্রতাপে, সেই দুর্ধর্ষ পরাক্রমে, আইস, আমরা আজ যবনদল দলিত করিতে অগ্রসর হই।— বিংশ পরিচ্ছেদ। ৫. চন্দ্রপতি: দেশের মঙ্গলের জন্য আমার অবিলম্বে দিল্লী পৌছান আবশ্যক, এসময় স্নেহমমতায় বন্দী হইলে চলিবে না।— ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ। ৬. মহিষীর প্রতি পৃথ্বীরাজ: ক্ষত্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া দেশরক্ষাই আমাদের প্রধান ধর্ম— আজ আবার সেই দেশরক্ষার জন্য যাইতেছি। এখন শত শত বিপদে পড়িলেও তাহাতে নিরুৎসাহী হইব না ও তাহাতে ভঙ্গ দিব না।— পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

কেবল তাই নয়, গ্রন্থের শেষ দিকে লেখিকা নানাবিধ বর্ণনায় ও মন্তব্যে আপনার হৃদয়-ভাবনা আর প্রচ্ছন্ন না রেখে একেবারে উজাড় করে দিয়েছেন ; ফলত উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর মনোভাবনার সঙ্গে আত্মভাবনার সংমিশ্রণ সাধিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ পরপর তিনটি অংশ নিয়ে পরিবেশিত হল।

১. সন্ধ্যার পূর্বেই যবনেরা জয়ী হইল। চিরপ্রজ্বলিত দীপ এইবার নির্বাণ হইল। আর্যগৌরব-সূর্য আজ অস্তমিত হইল, ধর্ম আজ অধর্মের নিকট পরাস্ত হইলেন, ভারতবর্ষ আজ বিপদ অন্ধকারে মগ্ন হইল! যবনদিগের বিজয়পতাকা জলন্ত ধূমকেতুরূপে কেবলমাত্র মস্তকোপরি জাজ্বল্যমান রহিল।—অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ। ২. পতিব্রতার আলোকস্তম্ভস্বরূপ দিগ্‌দিগন্ত আলোকিত করিয়া সেই চিতা জলিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে অনলোচ্ছ্বাস আরক্তিম হইয়া আসিল, অবশেষে চতুর্দিক অন্ধকার করিয়া সেই প্রদীপ্ত আলোকস্তম্ভ অদৃশ্য হইল, সঙ্গে সঙ্গে চতুর্থীর চন্দ্রমাও অস্তমিত হইলেন—ভারতের গৌরবদীপও নির্বাপিত হইল। / চারিদিক অন্ধকারময়— চারিদিক শূন্যময়— স্থানেশ্বর অদ্য শ্মশানময়—কেবল মধ্যে মধ্যে যবনদিগের জয়াহ্লাদ-কোলাহল, হিন্দুদিগের আর্তনাদ, আহতদিগের কাতরধ্বনি, শিবার অশিব চিৎকার দিগ্‌দিগন্ত হইতে উত্থিত হইয়া গগনমার্গ বিদারণ করিতে লাগিল। সেই অবধি এই শ্মশানক্ষেত্র ক্রমে বর্ধিতকায় হইয়া হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্যন্ত সমস্ত ভারতভূমিমধ্যে পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভারতক্ষেত্র শ্মশানক্ষেত্ররূপে পরিণত হইয়া উঠিল।—ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ। ৩. ঘাতক হস্তোত্তলনপূর্বক পৃথ্বীরাজের কণ্ঠদেশে কুঠারাঘাত করিল। রক্তোচ্ছ্বসিত

মস্তক ভূতলে পড়িল। বাসুকি সহস্রমস্তকে ব্যথিত হইল—আসমুদ্র ভারতবর্ষ কম্পিত শিহরিত হইয়া উঠিল—স্বাধীনতা অনন্ত মূর্ছায় মূর্ছিত হইলেন—দীপনির্বাণ হইল!—ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বিষয়টিকে স্পষ্ট করার জন্যই এই দীর্ঘ উদ্ধৃতির প্রয়োজনীয়তা ছিল। হিন্দুগণের পরাজয়ে লেখকের মন ও ভাবনা কি পরিমাণ উদ্বেলিত হয়েছিল উপরিউদ্ধৃত অংশগুলির মধ্যে তার প্রমাণ সংগুপ্ত। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন বিশিষ্ট কোনো ধর্ম বা ধর্মাবলম্বীর বিরুদ্ধে লেখিকার ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ছিল না, তিনি সাধারণভাবে বিদেশীয় বিজাতীয় কর্তৃক বিজিতের লাঞ্ছনার মর্মান্তিক দৃশ্য অঙ্কন করেছেন মাত্র। মুসলমানগণের ভারতবর্ষ আক্রমণ ও অধিকারের এই ইতিহাসের অন্তরালে লেখিকা এতদ্দেশীয় হিন্দুগণের দুর্দশা ও অধঃপতনের স্বরূপ সন্ধান করেছেন। প্রসঙ্গত তাঁর উপকথা[৪৭] শীর্ষক কবিতাটির কথা স্মরণীয়, সে কবিতার মধ্যে তিনি বিজয়ী যবনের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত মনোভাব পোষণ করেছেন যদিও স্বজাতীয়ের অধঃপতনে তাঁর হৃদয় বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে।

॥৬॥ দীপনির্বাণের ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্রসৃষ্টি আলোচনাপ্রসঙ্গে সুধী সমালোচকের মন্তব্য স্মরণযোগ্য, Stealing of royal princes from the cradles; their being brought up by a man who has put on a hermit's robe; the fact of Sailabala and Pravati (Pravabati ?) being disguised as men and while sheltered in a cave overhearing the negotiations of the traitor, Bijoy Sinha, and the Moslem messenger ;—all these suggest Cymbeline in particular as a possible original.[৪৮] ব্যাপারটি আকস্মিক সাদৃশ্য অথবা প্রভাব তা বিবেচনাসাপেক্ষ।

চরিত্রচিত্রণের দিক থেকে সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছেন চিতোরাধিপতি সমরসিংহ; তথাপি যেসকল কার্যকলাপের জন্য তিনি প্রধানত রাজর্ষি ও যোগীন্দ্র অভিধা লাভ করেছিলেন সেগুলি উপন্যাসের মধ্যে পরোক্ষভাবে প্রয়োগ করেছেন লেখিকা, ফলে এইসকল নেপথ্য-ঘটনা বিবৃতির সাহায্যেই পরিবেশিত হয়েছে। অবশ্য স্বদেশরক্ষাকল্পে অন্তিম সংঘর্ষক্ষেত্রে পুত্রমিত্রসহ আত্মবিসর্জন দিয়েছেন তিনি, এর ফলে তাঁর মহিমা প্রবর্ধিতই হয়েছে এবং চরিত্রটির মধ্যে সুন্দর সঙ্গতি দেখা দিয়েছে। পুত্রহারা পিতৃহৃদয়ের কাতরতা যেমন এই

৪৭ প্রথম প্রকাশ—ভারতী ভাদ্র ১৩০২, পৃ ২৬৩।

৪৮ Priyaranjan sen, Western Influence in Bengali Novel, Journal of the Department of Letters, 1932, p 32.

সিংহহৃদয়কে বিচলিত করেছিল তেমনি উপন্যাসের শেষ পর্বে পুত্র ফিরে পাওয়ার আনন্দে তাঁর চিত্ত উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। এদিক থেকে উপন্যাসের তৃতীয় পরিচ্ছেদের সঙ্গে অষ্টাদশ পরিচ্ছেদের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক এই ঘটনাবৃত্তকে পূর্ণতা দান করেছে। আবার পৃথ্বীরাজের আচার-আচরণের মধ্যে যে স্বদেশবৎসল বীরত্বব্যঞ্জক মূর্তির সন্ধান পাওয়া যায় তার মধ্যে কোনো অনৌচিত্য দেখা দেয়নি। কবিচন্দ্রের চরিত্রনির্মাণে তিনি ইতিহাসের আনুগত্য স্বীকার করেছেন, 'চাঁদকবি প্রকৃতই একজন প্রসিদ্ধ রাজপুত মহাকবি। তিনি পৃথ্বীরাজের পরম বন্ধু ছিলেন। চাঁদকবি পুস্তকমধ্যে কবিচন্দ্র নামে অভিহিত হইয়াছেন। ইংলণ্ডের স্যার ফিলিপ সিডনী ও স্যার ওয়ালটার র‍্যালের ন্যায় তিনিও কাব্য এবং যুদ্ধ উভয় বিষয়েই সম্যক পারদর্শী ছিলেন—কিন্তু কাব্যই তাঁহার যশের নিদান।...দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহার সমগ্র জীবনচরিত কোথাও পাওয়া যায় না এবং তাঁহার কাব্যসমূহের অধিকাংশই প্রায় প্রাচীন হিন্দী ভাষার মধ্যে অবরুদ্ধ।' উপক্রমণিকার মধ্যে লেখিকা এই অসন্তোষ প্রকাশ করলেও গ্রন্থের 'উপসংহারে' তাঁর জীবনের একটি বিশ্বাস্য চিত্র তুলে ধরেছেন।

রমণীচরিত্র নির্মাণের দিক থেকে তাঁর কৃতিত্ব অসামান্য। প্রভাবতী, শৈলবালা, উষাবতী, গোলাপবালা প্রভৃতি চরিত্রের সাহায্যে রমণীজীবনের উৎকৃষ্ট দিকগুলি উন্মোচিত হয়েছে। পৃথ্বীরাজ-মহিষীর ষড়ৈশ্বর্যময়ী মূর্তি ও দৃপ্ত মহিমা পাঠকের হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও ভক্তি উদ্রেক করে। টডের গ্রন্থোক্ত সমরসিংহের পত্নীদ্বয়ের (কর্মদেবী ও পৃথা) ছায়ায় যে বর্তমান চরিত্রটি প্রস্তুত হয়েছে সেসম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থের মধ্যে বিজয়সিংহের চরিত্রটির সম্যক বিশ্লেষণ আছে, তার অন্তরের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় দিয়েছেন লেখিকা। রাজকন্যা উষাবতীর প্রত্যাখ্যান তাকে পরিণামে বিশ্বাসঘাতক করে তুলে, কিন্তু এই বিষাদময় পরিণতির ও পতনের সম্ভাবনা ও বীজ তার নিজের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন ছিল ; সিংহাসনের জন্য লোভ, প্রতিপত্তি অর্জনের দুর্দমনীয় স্পৃহা যে তার অন্তরে গোড়া থেকেই প্রসুপ্ত ছিল তারও প্রমাণ আছে। ম্যাকবেথেরই মত তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাহ্যিক ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় উদ্দীপ্ত ও স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। বিজয়সিংহের চরিত্রের এই দিকটির পরিচয় দিয়েছেন লেখিকা নিপুণভাবে। অন্যদিক থেকেও বিজয়ের চরিত্রের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য ছিল। উপক্রমণিকার মধ্যে লেখিকা যে গৃহশত্রুতার আভাস দিয়েছিলেন বিজয়কে কেন্দ্র করেই তা প্রধানত রূপায়িত হয়েছে। পৃথ্বীরাজের তথা স্বদেশের শত্রুরূপে অভিহিত জয়চন্দ্র ও পত্তন-রাজের প্রত্যক্ষ সক্রিয়তা বর্তমান গ্রন্থে নেই, বিজয় চরিত্রের মাধ্যমে তারই কতকটা ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। আরেকটি দিক দিয়েও বিজয় প্রসঙ্গের সার্থকতা পাওয়া যায়। ব্যক্তিগত সমস্যা কিভাবে জাতীয় সমস্যায় রূপান্তরিত হয়ে যায় যুগবিপ্লবের কালে তা বর্তমান প্রসঙ্গ থেকে অনুভব করা যেতে পারে। উষাবতীর প্রত্যাখ্যানই

বিজয়কে দেশের শত্রুরূপে পরিণত করেছে এবং এরই ফলে জাতীয় সংকট যে ক্রুততর হয়ে উঠেছিল সেই ইঙ্গিতটুকু বর্তমান ব্যাপারে অনুধাবনযোগ্য। স্বর্ণকুমারী তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির মধ্যে পারিবারিক ঘটনাকেও আদৌ উপেক্ষা করেননি। ব্যক্তিগত ও সাধারণ দৈনন্দিন ঘটনার যে কি ব্যাপক পরিণাম দেখা দিতে পারে তার পরিচয় এইসকল প্রসঙ্গের মধ্যে নিহিত। এভাবে তিনি ব্যক্তিগত সমস্যা এবং দৈনন্দিন জীবনকে ইতিহাসের বিশালতা ও ব্যাপ্তির সঙ্গে সংমিশ্রিত করে দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই শ্রেণীর উপন্যাসে উক্ত পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ লক্ষিত হয়।

আরও কতকগুলি ব্যাপারে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে মনে হয়। দীপনির্বাণের মধ্যে জ্যোতিষবিচারের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম পরিচ্ছেদে নবজাতক কিরণসিংহের ভাগ্যগণনা করেছেন মঙ্গলাচার্য; ষোড়শ পরিচ্ছেদে কল্যাণসিংহের জ্যোতিষ-গণনার প্রসঙ্গ আছে। বস্তুত সমরসিংহের এই পুত্রদ্বয়ের ভাগ্যকে ও জ্যোতিষবিচারের ফলাফলকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ পরিণামের দিকে দ্রুতগতিতে ধাবিত হয়ে চলেছে। সনাতন হিন্দুধর্ম ও ফলিত জ্যোতিষের প্রতি শ্রদ্ধাবশত বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্র স্বর্ণকুমারী প্রমুখ লেখক আপন আপন সৃষ্টির মধ্যে এইসকল বিষয়কে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। 'বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসে সন্ন্যাস ও তাহার অলৌকিক শক্তি সক্রিয়। খুব সম্ভব দুইজনেই স্কটের উপন্যাস হইতে এই সূত্রটি লইয়াছিলেন।'[৪১] তবে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে এইসকল ব্যাপারের যে অতিপ্রভাব লক্ষিত হয় স্বর্ণকুমারীর মধ্যে তা নেই; এমন কি স্বর্ণকুমারীর পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে জ্যোতিষ ও সন্ন্যাসীর অলৌকিক কার্যকলাপের আতিশয্য তেমন দেখা যায় না। নায়ক-নায়িকার রূপবর্ণনায় লেখিকা বঙ্কিমচন্দ্রের মত তুলনামূলক পদ্ধতিকেই সমধিক পছন্দ করেন, শৈলবালা ও প্রভাবতীর রূপবর্ণনায় এই রীতি অনুসৃত হয়েছে। শৈলবালা 'এখন অপরিস্ফুট গোলাপকলিকা, আধ আধ ফুটিয়াই অতি মনোহর হইয়াছে।...... প্রভাবতী বিংশতিবর্ষীয়া, ইহার সৌন্দর্য শৈলবালার ন্যায় অর্ধস্ফুটিত গোলাপপুষ্পের মত নহে। ইহার সৌন্দর্য চন্দ্রমার ন্যায় অতি মধুর। ইহার তেজ নাই অথচ উজ্জ্বল। ইহা যত দেখ ততই দেখিতে ইচ্ছা করে, কিছুতেই চক্ষু ক্লিষ্ট হয় না। -শৈলবালা বালিকাস্বভাববশতঃ সর্বদাই হাস্যময়ী, প্রভাবতী ঈষৎ গম্ভীর।' (সপ্তম পরিচ্ছেদ) এই অংশটি পাঠকালে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনীর কথা মনে পড়া স্বাভাবিক। তা ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের রীতি অনুসরণ করে লেখিকা যত্রতত্র তত্ত্বালোচনায় মনোনিবেশ করেছেন।

৪১ প্রমথনাথ বিশী, বাংলার লেখক প্রথম খণ্ড, ১৩৫৭, পৃ ৪৬।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে দুঃখতত্ত্ব, নবম পরিচ্ছেদে কাম ও প্রেমতত্ত্ব সম্পর্কিত বিশ্লেষণ ও আলোচনাদি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

॥৭॥ খুবই বিস্ময়ের বিষয়, দীপনির্বাণের মধ্যে পাত্রপাত্রীর সংলাপে কখনো কখনো চলিত ভাষারীতি প্রযুক্ত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে যেমন বিশুদ্ধ সাধুরীতির সংলাপ আছে তেমনি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের মধ্যে চলিতরীতির অনুসরণ পরিলক্ষিত হয়। আবার তৃতীয় পরিচ্ছেদের প্রথমে চলিত ও পরে সাধুরীতি এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদের প্রথমে সাধু ও পরে চলিতরীতির সংলাপ প্রয়োগও লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য; কিন্তু সপ্তম পরিচ্ছেদে চলিতরীতি নিরঙ্কুশ প্রাধান্য বিস্তার করেছে, অথচ পরবর্তী অধ্যায়ে পুনরায় সাধুভাষা তার স্থান অধিকার করেছে। উপন্যাসের শেষাবধি দেখা যায় কখনও একটি রীতি একেবারে স্থায়িত্ব অর্জন করতে পারেনি। ফলত এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে লেখিকার মনের মধ্যে প্রথম থেকে একটা স্পষ্ট দ্বিধা থাকলেও পরবর্তী কালের রচনায় সংলাপ ব্যবহারকালে তিনি সাধুরীতির প্রতি অধিকতর মনোযোগী হয়ে পড়েন এবং সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে এই আচরণকে স্বাভাবিক বলেই মেনে নেওয়া সঙ্গত; তথাপি মাঝে মাঝে যে তিনি বিশুদ্ধ ও অবিমিশ্র চলিতরীতিকে স্বীকার করেছিলেন তার মধ্যে তাঁর দুঃসাহসিক পরীক্ষানিরীক্ষা ও সংস্কারমুক্ত মনোভাব এবং সুন্দর দূরদর্শিতা প্রতিফলিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় উপন্যাসের বর্ণনাংশে, পাত্রপাত্রীর স্বগতভাষণে, তত্ত্বালোচনায় তিনি সাধুভাষাকেই প্রয়োগ করেছেন; এমন কি উদ্বোধিত চিত্তের ও উদ্দীপ্ত মুহূর্তের ভাষাও সাধুরীতির উপর দণ্ডায়মান, বিংশ পরিচ্ছেদের সৈন্যবাহিনীর প্রতি পৃথ্বীরাজের ভাষণটি এর সার্থক উদাহরণ।

মিবাররাজ

॥১॥ ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরাদেবীর নামে উৎসর্গীকৃত মিবাররাজ নামক 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'টির উপহারপত্র নিম্নরূপ :

স্নেহময়ী ইন্দিরা,

তুই স্নেহময়ী, যেন বরষার ফুল—
কোমল মাধুরী-মাখা বিমল বকুল।
বিকসিত অশ্রুজলে, সুবাসিত শুভ্রদলে
বিধাতার দিব্যসৃষ্টি অপূর্ব অতুল।
যে তোমার কাছে আসে জুড়াও মধুর বাসে
ক্ষুদ্র হৃদে উথলিত প্রণয়-আকুল।

যে যায় দলিত রেখে, সেও গন্ধ যায় মেখে
স্বরগের পুণ্য তুমি ধরণীর ভুল।
এনেছি এ শোকগীতি, তোমার পরশ-প্রীতি
ফুটাবে বিরাগমাঝে সুরাগমুকুল।

এস্থলে স্মরণ করা যায় যে লেখিকার প্রথম গ্রন্থ ও উপন্যাস অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গ করা হয়। বর্তমান মিবাররাজ সত্যেন্দ্র-কন্যা ইন্দিরাকে প্রদত্ত। এই সূত্র থেকে পরিলক্ষিত হয় সত্যেন্দ্র-পরিবারের সঙ্গে স্বর্ণকুমারীর ঘনিষ্ঠতার সুন্দর চিত্রটি।

ভারতী ও বালক পত্রিকায় (আষাঢ়-পৌষ ১২৯৩) ধারাবাহিকভাবে 'কলঙ্ক—ঐতিহাসিক উপন্যাস' প্রকাশিত হয়। উক্ত পত্রিকার পৌষ সংখ্যার ৫৫৬ পৃষ্ঠার পাদটীকায় বলা হয়েছে, '"কলঙ্ক" শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে, কিন্তু এই নামটি সম্বন্ধে কেহ কেহ আপত্তি উত্থাপন করায় পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার সময় ইহা ভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইবে।' স্বর্ণকুমারীর এই উপন্যাসটি ১৮৮৭ খৃস্টাব্দে (১৭ জুন) 'মিবাররাজ' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

উপন্যাসের কাহিনীগত পরিণামের দিক থেকে এই নাম-পরিবর্তন বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ। রাজস্থানের প্রাচীন ইতিহাসের প্রথম রাজপুত-নায়ক গুহা কর্তৃক ভীলসর্দার মন্দালিকের হত্যার ব্যাপারটি বর্তমান ঘটনাবৃত্তের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। ভ্রমক্রমে পালক পিতাকে হত্যা করার ফলে গুহার চরিত্রে কলঙ্ক আপতিত হয়, সেদিক থেকে 'কলঙ্ক' শিরোনামটি সার্থক। কিন্তু ঘটনা-পরিণামে দেখা যায় রাজপুত গুহা মন্দালিককে হত্যা করে যে ভীলজাতির দলনায়ক হন তাদেরই সহায়তায় আবার তিনি কালক্রমে মেবারাধিপতি হয়েছিলেন— এদিক থেকে 'মিবাররাজ' নামের সঙ্গতিও অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু মেবারের রাণা হওয়া অপেক্ষা মন্দালিকহত্যার কাহিনী বর্তমান ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করেছে বলে সাময়িক পত্রিকায় ব্যবহৃত নামটি ছিল অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। এই সিদ্ধান্ত থেকে প্রমাণিত হয় যে আলোচ্য গ্রন্থটি কাহিনীধর্মী উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত বড়গল্প। প্রকৃতপ্রস্তাবে উপন্যাসের জটিল কুটিল ঘটনাবর্ত, বৃহত্তর ও মহত্তর জীবনসত্যসন্ধান তথা বিশালতা ও ব্যাপ্তি অপেক্ষা একটি খণ্ডক্ষুদ্র স্বয়ং-সম্পূর্ণ কাহিনী যেন উপন্যাসের পাত্রে পরিবেশিত হয়েছে। মিবাররাজের কলঙ্ক সেই tale বা আখ্যানের প্রাণ।

॥২॥ মিবাররাজের দশম পরিচ্ছেদ ঐতিহাসিক উপাদানে পরিপূর্ণ এবং সেসকল উপাদান টডের পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকেই সংগৃহীত। লবকোট বা লাহোরের সূর্যবংশোদ্ভূত এক রাজবংশ কিভাবে সৌরাষ্ট্রে এসে প্রথমে বীরনগর ও পরে বল্লভীপুরে রাজধানী স্থাপন করে রাজত্ব করে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখিকা টড থেকে প্রথমে সংকলন করেছেন; তারপর

শত্রু-আক্রমণে বল্লভীপুরের পতন ও শিলাদিত্য নামক নরপতির নিধনকাহিনী পরিবেশিত। এ সম্পর্কে টড বলেন, Of the prince's family, the queen Pooshpavati alone escaped the sack of Balabhi, as well as the funeral pyre, upon which, on the death of Silladitya, his other wives were sacrificed. She was a daughter of the Pramara prince of Chandravati, and had visited the shrine of the universal mother, Amba-Bhavani, in her native land, to deposit upon the altar of the goddess a votive offering consequent of her expectation of offspring. She was on her return, when the intelligence arrived which blasted all her future hopes, by depriving her of her lord, and robbing him, whom the goddess had just granted to her prayers, of a crown. Excessive grief closed her pilgrimage. Taking refuge in a cave in the mountains of Mallia, she was delivered of a son. Having confided the infant to a Brahminee of Birnugger named Camalavati, enjoining her to educate the young prince as a Brahmin, but to marry him to a Rajpootnee, she mounted the funeral pile to join her lord. Camalavati, the daughter of the priest of the temple, was herself a mother, and she performed the tender offices of one to the orphan prince, whom she designated Goha, or 'Cave-born'. The child was a source of perpetual uneasiness to its protectors: he associated with Rajpoot children, killing birds, hunting wild animals, and at the age of eleven was totally unmanageable: to use the words of the legend, 'How should they hide the ray of the sun?' At this period Edur was governed by a chief of the savage race of Bhil; his name, Mandalica. The young Goha frequented the forests in company with the Bhils, whose habits better assimilated with his daring nature than those of the Brahmins. He became a favourite with the Vena-pootras, or 'children of the forest,' who resigned to him Edur with its woods and mountains. The fact is mentioned by Abul Fuzil, and is still repeated by the bards, with a characteristic version of the incident, of which doubtless there were many. The Bhils having determined in sport to elect a king, the choice fell on Goha; and one of the young savages, cutting his finger, applied the blood as the teeka of sovereignty to his forehead. What was done in sport was confirmed by the old forest chief. The sequel fixes on Goha the stain of ingratitude, for he slew his benefactor, and no motive is assigned in the legend for the deed. Goha's name became the patronymic of his

descendants, who were styled *Gohilote*, classically *Grahilote*, in time softened to *Gehlote* . এইসকল মন্তব্য অনুসরণ করে মিবাররাজ রচনা করেন স্বর্ণকুমারী। উপন্যাসের দশম পরিচ্ছেদে গুহার জন্মপূর্ব কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে ; এই কাহিনী কমলাবতীর কন্যা সত্যবতী ও গুহার কথোপকথনের মাধ্যমে বিবৃত হয়। শিলাদিত্যের পুত্র গ্রহাদিত্য বা গুহাকে সত্যবতী তার পূর্বপরিচয় এভাবে প্রদান করেন, 'সৌরাষ্ট্রের শেষ রাজা শিলাদিত্যের অন্তঃসত্বা মহিষী প্রমরবংশীয়া রাজকন্যা পুষ্পবতী চতুর্দশ বর্ষ পূর্বে তাঁহার ভাবী পুত্রের মঙ্গলকামনায় অম্বাভবানীর পূজা দিতে পিত্রালয়ে চন্দ্রাবতী গমন করিলে রাজপুরোহিতও সপরিবারে মহিষীর সঙ্গে গমন করেন। চন্দ্রাবতী গিয়া রানীর মনস্কামনা সিদ্ধ হইল, দেবী তাঁহার ভাবী পুত্রকে শুভ বর প্রদান করিলে মহিষী হৃষ্টচিত্তে অল্পদিনের মধ্যেই আবার শ্বশুরালয়মুখী হইলেন।......অল্পক্ষণের মধ্যে সেই গুহাতেই রানীর সন্তান জন্মিল, নব-শিশুকে কমলাদেবীর হস্তে সমর্পণ করিয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন, পর্বতেই তাঁহার অগ্নিকার্য সমাধা হইল। পুরোহিত সপরিবারে চন্দ্রাবতী-সন্নিহিত নিভৃত ইদর-অরণ্যপ্রদেশে বসতি স্থাপন করিলেন।'

এইসকল বর্ণনায় লেখিকা টডের আনুগত্য স্বীকার করেছেন সত্য কিন্তু ঘটনাবিন্যাসে তাঁর মৌলিকতারও পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমত, টডের গ্রন্থে রাজপুরোহিতের কোনো প্রসঙ্গ ছিল না ; স্বর্ণকুমারীর রচনায় দেখা যায় যে রাজপুরোহিত সপরিবারে মহিষীর সঙ্গে গমন করেন। লেখিকা a Brahminee of Birnugger-কে স্বচ্ছন্দে বল্লভীপুরের রাজপুরোহিতের কুলবধূ কমলাবতীরূপে চিহ্নিত করে দিয়েছেন, ফলে কাহিনীটি যেমন একদিকে বিশ্বাস্য তেমনি অপরদিকে চমৎকারিত্ব সম্পাদনে সমর্থ হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয়ত, টডের রচনায় শত্রুহস্তে শিলাদিত্যের পরাভব ও মৃত্যুর কথা ইঙ্গিতময় ; লেখিকা সেই সূক্ষ্ম সংকেতকে প্রবর্ধিত করে একটি নির্ভরযোগ্য ঘটনা নির্মাণ করেছেন। পুষ্পবতী যখন গুহার মধ্যে অবস্থান করছিলেন এমন সময় তিনি দুঃসংবাদ পেলেন যে 'তাতাররা দেশ আক্রমণ করিয়া শিলাদিত্যকে বধ করিয়াছে, সৌরাষ্ট্র এখন তাহাদের। মহিষীগণ অগ্নি প্রবেশ করিয়াছেন, দেশের লোক পলায়নে প্রাণরক্ষা করিতেছে।' টডের প্রাণহীন বিবৃতি স্বর্ণকুমারীর রচনায় অপূর্ব নাটকীয়তা লাভ করেছে, পলাতক লোকলস্করের কথোপকথনে শিলাদিত্যের পতনের ঘটনা পরিবেশন করেছেন লেখিকা। সত্যবতীর উক্তি থেকে জানা যায় যে চতুর্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্যন্ত গুহাকে যেন ব্রাহ্মণরূপে প্রতিপালন করা হয়—পুষ্পবতী এরূপ নির্দেশ মৃত্যুকালেই দিয়ে যান কারণ 'তোমার সামর্থ্য জন্মিবার আগে ক্ষত্রিয় বলিয়া জানিলে শত্রু কর্তৃক পাছে তোমার কোন অনিষ্ট হয়, বোধ করি, এই আশঙ্কায় মহিষী এই অনুরোধ করিয়া থাকিবেন।' টডের বিবর্ণ বিবৃতির উপর লেখিকা যথোপযুক্ত যুক্তির আলোকপাত করে স্বকীয়তার প্রমাণ দিয়েছেন।

উপন্যাসের প্রথমাংশে (প্রথম থেকে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ) গুহার মৃগয়াপ্রীতি ও ভীলকুমারদের সহিত খেলাধুলার যেসকল প্রসঙ্গ অবতারণা করা হয়েছে তার সঙ্গে টডের কোনো বিরোধ নেই। প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদে 'তানা' তথা গুহার মৃগয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের মধ্যে বনপুত্রগণের রাজারূপে গুহার প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা জানা যায়। টডের অনুসরণে লেখিকাও বলেছেন, 'একজন উৎসাহোন্মত্ত ভীলযুবা নিজের আঙুল কাটিয়া সেই রক্ত লইয়া তাহার কপালে ফোঁটা পরাইয়া দিল—অমনি সকলে 'আমাদের রাজা রাজা' করিয়া চারিপাশে নৃত্য আরম্ভ করিল, ···বৃদ্ধ ভীলরাজ তাঁহার লৌহপাতমণ্ডিত বংশদণ্ড যুবকের হাতে দিয়া বলিলেন, "আজ হইতে তুমিই এই বন-প্রদেশের রাজা হইলে, আমরা তোমার প্রজা"।'

ভীলরাজ মন্দালিকের হত্যা সম্পর্কে ইতিহাসের রহস্যময় নীরবতা কিংবা গোপনীয়তাকে লেখিকা বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার চেষ্টা করেছেন। ফলে যে ঘটনাপরম্পরায় ও পরিস্থিতিতে মন্দালিকের মৃত্যুকথা উপস্থাপিত হয়েছে তা যথেষ্ট বিশ্বাসসম্মত। মন্দালিকপুত্র ও গুহার মধ্যে ক্ষমতালাভের দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং ভীলপুত্রের ঈর্ষা এই অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘটনাকে দিবালোকের স্বচ্ছতা দান করেছে; এবং জটিল ঘটনাটিও বেশ মানবিক হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের 'উপসংহার'-এ লেখিকা এ সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করেছেন তা উদ্ধারযোগ্য, 'গুহা মন্দালিককে মারিয়াছেন, তাহা রাষ্ট্র হইতে বাকি রহিল না; কিন্তু মন্দালিকের ন্যায় পিতৃতুল্য স্নেহশীল বন্ধুকে কেন যে তিনি মারিলেন তাহার কারণ ভীলেরা ভাবিয়া পাইল না, চিরকালই তাহার কারণ অজ্ঞাতের গর্ভে রহিয়া গেল। কলঙ্কের ডালি মাথায় লইয়া গুহা গ্রহাদিত্য নামে ইদরে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ইতিহাস এখন পর্যন্ত তাঁহার এই কলঙ্কের কথা ঘোষণা করিতেছে।' স্বর্ণকুমারী এই সংশয় প্রকাশ করলেও মূল উপন্যাসে তিনি গুহাকে কলঙ্কমুক্ত করেছেন। প্রকৃত ইতিহাস এখন অজ্ঞেয়, তাই তাঁর এই ব্যাখ্যা ও প্রয়াসকে ইতিহাসের অতিক্রমণ বলা চলে না। যেখানে ইতিহাসও সন্দেহাকুল সেখানে লেখক বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারেন—ঐতিহাসিক উপন্যাসে তাকে অনৌচিত্য-দোষদুষ্ট বলা চলে না।

আরেকটি বিষয় বর্তমান প্রস্তাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। শিলাদিত্যের সূর্যকুণ্ড ও সপ্তাশ্ব সম্পর্কে টড বলেছেন, **There was a fountain (*Soorya Coonda*) 'sacred to the sun' at Balabhipoora, from which arose, at the summons of Silladitya (according to the legend) the seven-headed horse Septaswa, which draws the car of Soorya, to bear him to battle. With such an auxiliary no foe could prevail ; but a wicked minister revealed to the enemy the secret of annuling this aid, by polluting the sacred founatain**

with blood. This accomplished, in vain did the prince call on Septaswa to save him from the strange and barbarous foe : the charm was broken, and with it sunk the dynasty of Balabhi. Who the 'barbarian' was that defiled with blood of kine the fountain of the sun, whether Gete, Parthian or Hun, we are left to conjecture. এই সংশয় উপন্যাসে উত্থাপিত হয়নি এবং শত্রুপক্ষীয়গণ 'তাতার'রূপে উল্লিখিত হয়েছেন। লেখিকা কোনো wicked minister-এর বিশ্বাসঘাতকতারও কথা বলেননি।

স্কট ও বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণে স্বর্ণকুমারী মিবাররাজের 'পরিশিষ্টে' কয়েকটি ঐতিহাসিক তথ্যের বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। আকরগ্রন্থ থেকে প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতিব্যবহারে, পরিশ্রম-সাপেক্ষ ও বিশ্লেষণসম্মত সিদ্ধান্তগ্রহণে তিনি যে প্রবন্ধকারের মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন তা পাঠককে একটি ভিন্নতর আস্বাদ দান করে। এই অংশটি 'রাণাবংশে ইরানীত্ব আরোপ' এই শিরোনামে ভারতী ও বালক পত্রিকার ১২৯৪ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। রাণাবংশের উদ্ভবের ইতিহাস ও গুহা এবং বাপ্পা এক ব্যক্তি কি না—প্রধানত এই দুটি সমস্যার সমাধানে লেখিকা প্রবন্ধটি রচনা করেন। তিনি বলেন যে রাণাবংশে ইরানী প্রভাব নেই, তা সূর্যবংশোদ্ভূত; এবং গুহা ও বাপ্পা এক ব্যক্তি নন, তাঁরা যথাক্রমে শিলাদিত্য ও নাগাদিত্যের সন্তান। তিনি আরও বলেছেন, 'বাপ্পাই যদিও ইতিহাসে মিবাররাজ নামে কথিত কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে এই আখ্যা ইঁহারই (গুহা বা গ্রহাদিত্যের) প্রাপ্য কেন না গুহাই মিবাররাজবংশের আদিপুরুষ। সমগ্র মিবারে ইনি আধিপত্য বিস্তার না করুন মিবার-সীমানায় ইনিই সর্বাগ্রে সূর্যবংশীয় ধ্বজা উড্ডীন করেন। ইঁহার নাম হইতেই মিবারের রাজগণ পরে "গুহলুট" এই আখ্যা পাইয়াছিলেন।' টডের কথানুসারে গ্রহাদিত্য বা গুহাকেই তিনি 'মিবারের আদিরাজরূপে' গ্রহণ করেছেন: 'বাপ্পা ও গুহা যে দুই সময়ের স্বতন্ত্র ব্যক্তি তাহা টড স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। তিনি গুহার জীবন স্বতন্ত্র লিখিতেছেন, বাপ্পার জীবন স্বতন্ত্র লিখিতেছেন, বাপ্পাকে গুহার নবম পুরুষ পরিচয় দিয়াছেন।' টডের এইপ্রকার সিদ্ধান্তের অনুকূলে তিনি আশাপুরের একটি প্রাচীন প্রস্তরলিপি ও মিবারের প্রাচীন ইতিহাসের সূত্র নির্দেশ করেছেন। একস্থানে পাদটীকায় তিনি বলেছেন যে গুহা ও বাপ্পার জীবনের ঘটনাসাদৃশ্যবশত এরূপ সমস্যার উদয় হয়েছে।

তাঁর তথ্যনির্ভর সত্যনিষ্ঠা টডের চ্যুতিকেও ক্ষমা করেনি। গুহা ও বাপ্পার সমস্যার সমাধানে অক্ষম আবুল ফজলকে লেখিকা যে কারণে আক্রমণ করেছেন ঠিক সেই কারণে রাণাবংশে ইরানীত্ব আরোপ সম্বন্ধীয় আলোচনার প্রসঙ্গে তিনি টডের প্রশংসা করেননি। স্বর্ণকুমারী বলেছেন, 'শিবাজীর ইতিহাস-লেখক "লক্ষ্মীনারায়ণ সুফিক আরঙ্গবাদি" রাণাবংশ বলিয়া শিবাজীর পরিচয়-প্রদান-প্রসঙ্গে তাঁহার পুস্তকে উল্লিখিত গ্রন্থের (মাসার অল ওমরা)

উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। টড আবার এই উদ্ধৃতাংশ অনুবাদ করিয়া' গ্রন্থে পরিবেশন করেছেন। টডের একটি মত, রাণাগণ খৃস্টবংশীয়; অপর মত, রাণাগণ ইরানী। লেখিকার মতে, সূর্য-উপাসক ইরানদেশীয় লোক ও রাণাগণের পূজাপেদ্ধতির সাদৃশ্য আছে সত্য কিন্তু কেবলমাত্র এই কারণে তাঁরা পারস্যবংশীয় একথাও প্রমাণিত হয় না। অতঃপর লেখিকা মাগধী ভাষায় রচিত 'উপদেশপ্রদান' নামক গ্রন্থ থেকে অংশবিশেষ অনুবাদ করে দেখিয়েছেন যে এই বংশের আদিপুরুষ শিলাদিত্য ভারতবর্ষীয় ও গুজরাট প্রদেশস্থ কোনো ব্রাহ্মণকন্যার সন্তান। টড আবার তাঁর গ্রন্থেও একথা স্বীকার করেছেন। প্রকৃতপক্ষে টড কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি। রাণাবংশের উৎপত্তি আলোচনায় তিনি খৃস্টানত্ব, ইরানীত্ব ও ভারতীয়ত্বের ত্রিবেণীসংগম সৃষ্টি করেছেন; পক্ষান্তরে লেখিকা কেবলমাত্র ভারতীয়ত্ব স্বীকার করে মুক্তবেণী রচনা করেছেন, অথচ এই আলোচনায় তিনি টডের ব্যবহৃত উপাদানের উপরই বেশী নির্ভর করেছেন। উপসংহারে তিনি টডের সিদ্ধান্তের প্রতি কটাক্ষপাত করলেও রুচি সংযম ও শালীনতার সীমা কখনও অতিক্রান্ত হয়নি: 'যদি পণ্ডিতগণ পণ্ডিতপ্রবর টডের ন্যায় উপরি-উক্ত প্রমাণে আমাদের খৃষ্টান মহারানীর সহিত সূর্যবংশ রাণাদিগের রক্তসম্পর্কের সম্ভাবনা দেখিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করেন—তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই—কিন্তু অজ্ঞ আমাদের টডের এ আহ্লাদ দেখিয়া পিকুইকের পুরাতত্ত্ব আবিষ্কারটিই মনে পড়ে।'

সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, এই দুটি সিদ্ধান্তই পরবর্তী কালের বাংলা দেশে গৃহীত হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথের রাজকাহিনীর মধ্যে 'গোহ' ও 'বাপ্পাদিত্য' নামক দুটি পৃথক অধ্যায় আছে, উভয় ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য সেখানে স্বীকৃত। অবনীন্দ্রনাথ রাণাবংশীয়-দের সূর্যোপাসক ও সূর্যকুলোদ্ভূত ভগবান রামচন্দ্রের বংশধররূপে গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সে যা হোক না কেন, এই পরিশিষ্টের মধ্যে লেখিকার প্রাচীন ভারতীয় জীবনপ্রীতি ও ভারতীয়ত্বপ্রীতি সুস্পষ্ট। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ভারতীয় ভাবনার প্রাধান্য বাংলা দেশের বুদ্ধিজীবী-সমাজ-মানসে লক্ষিত হয়; স্বর্ণকুমারীর ভাবনা যে তার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ও পুষ্ট হয়েছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

॥ ৩ ॥ মিবাররাজ উপন্যাস নয়, বড় গল্প—অনেকটা যুগলাঙ্গুরীয়-রাধারাণীর মত।[৫০] এর মধ্যে স্বল্প পরিমাণে কাহিনীগত জটিলতা থাকলেও বিস্তৃতি এবং বিশালতা কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। প্রধানত তিনটি চরিত্রের উত্থানপতন কিংবা ক্রমবিকাশের উপর

---

৫০ রাধারাণী 'উপন্যাস—অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস সংগ্রহ' গ্রন্থের (১৮৭৭ ও ১৮৮১) মধ্যে সন্নিবেশিত হয়; তাহাড়া চতুর্থ সংস্করণে বা 'চতুর্থ বারের বিজ্ঞাপনে' (১৮৯৩) পুস্তিকাটিকে 'ক্ষুদ্র উপন্যাস'রূপে উল্লেখ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র।

গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে, তাও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিত্রিত নয়। তাই উপন্যাসটি অনেক সময় সংক্ষিপ্ততায় অনেকাংশে সংকেতময় হয়ে উঠেছে; তাছাড়া গ্রন্থের আয়তন ও অবয়ব সংকীর্ণ ও অকিঞ্চিৎকর। মন্দালিকহত্যাই ঘটনাবৃত্তের কেন্দ্রভূমি, কিন্তু এই হত্যার কোনো দীর্ঘস্থায়ী বা বৃহৎ ও ব্যাপক পরিণাম প্রদর্শিত হয়নি; সমগ্রভাবে রাজস্থানের ইতিবৃত্তের পরিপ্রেক্ষিতে গুহার জীবনে অতঃপর যে বিপুল পরিবর্তন এসেছিল তার সামান্য আভাসমাত্র 'উপসংহারে'র কয়েকটি বাক্যে আছে এবং তা মূল উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত নয়।

কথিত উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যাদি আলোচনাসূত্রে কেউ কেউ লেখিকার 'স্ত্রীচরিত্রবিহীন পরিকল্পনা'র উপর জোর দিয়েছেন।[৫১] কিন্তু মিবাররাজের মধ্যে রানী পুষ্পবতী ছাড়াও কমলাবতী সত্যবতী প্রভৃতি রমণীচরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। অবশ্য পুষ্পবতী ও রাজদাসীর যে কথোপকথন দশম সর্গে দেওয়া হয়েছে তা সত্যবতীর প্রাক্তন ঘটনাবিবৃতির (retrospective narration) মধ্যে পরিবেশিত; কিন্তু কমলাবতী ও সত্যবতীর ভূমিকা আদৌ নেপথ্যোচিত নয়, তারা প্রত্যক্ষভাবে মূল ঘটনানিয়ন্ত্রণে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রণয়ব্যাপারে ও রোমান্সরস সৃষ্টিতে নারীচরিত্রের যে বিশিষ্ট ভূমিকা থাকে বর্তমান গ্রন্থে তার কোনো অবকাশ নেই। নরনারীর পারস্পরিক আকর্ষণ-বিকর্ষণ-কথা বর্জিত হয়েও বর্তমান উপন্যাসটি সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে। লেখিকার অন্যান্য ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাসে প্রণয়ব্যাপার প্রাধান্য লাভ করলেও একথা বলা চলে যে আলোচ্য গ্রন্থে তার বিন্দুবিসর্গ নেই। তবে মানবহৃদয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতিসমূহ— স্নেহ দয়া প্রীতি ঈর্ষা দ্বেষ জুগুপ্সা প্রভৃতি নানাবিধ ভাব এই গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে। ভীলরাজ মন্দালিক ও ব্রাহ্মণকন্যা কমলাবতীর স্নেহমমতা এবং সহোদরাতুল্য সত্যবতীর করুণা-প্রীতির পাশাপাশি ভীলপুত্র 'তালগাছে'র ঈর্ষাবিদ্বেষ প্রবাহিত হয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে ঘটনার এমন নিজস্ব চমৎকারিত্ব আছে যে গ্রন্থের উপসংহার পর্যন্ত পাঠকের আগ্রহ সুখদুঃখানুভূতির আলোছায়ায় দোদুল্যমান হয়ে চলেছে।

চরিত্রসৃষ্টির দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে এক একটি চরিত্র যেন এক একটি ভাবের সিম্বলাত্মক মূর্তি; অবশ্য তাদের মধ্যে দোলাচলতা দ্বিধা বা অন্তর্দ্বন্দ্ব যে নেই তাও স্বীকার করা চলে না। ভীলরাজ মন্দালিকের চিত্ত ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে যুগপৎ পুত্রস্নেহ ও শিষ্যপ্রীতির অন্তর্দ্বন্দ্বে। ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত ভীলরাজপুত্র তালগাছের অন্তরে বিদ্বেষ-ঈর্ষার বহ্নি প্রধূমিত হলেও গুহার প্রতি একটি সকরুণ মমত্ব সে

৫১ অপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত, বাঙ্গালা ঐতিহাসিক উপন্যাস, ১৩৬৭, পৃ ৮৫।

বরাবর অনুভব করে এসেছে। উপন্যাসের মধ্যে একমাত্র গুহা ব্যতীত এই দুইটি চরিত্র সর্বাধিক জীবন্ত।

উপন্যাসের প্রথম থেকেই রাজপুত গুহা ও ভীলপুত্র তালগাছের মধ্যে ব্যবধান স্পষ্ট করা হয়েছে : 'অন্য ভীলেরা যুবককে (গুহাকে) যেমন ভালবাসে ভীলপুত্রও এক দিন তাহাকে সেইরূপ ভালবাসিত। যুবক যখন আট দশ বৎসরের বালক তখন হইতে ভীলদিগের সহিত তাহার আলাপ, তখন ভীলপুত্র কত আগ্রহভরে তাহাকে গৃহে লইয়া আসিত, কুস্তি শিখাইত, বাণ খেলা শিখাইত, সঙ্গে লইয়া শিকার করিতে যাইত। তাহাকে না পাইলে ভীলপুত্রের তখন খেলা করিয়া শিকার করিয়া আমোদই হইত না। কিন্তু তাহার পর এখন? এখন যুবক আর তাহার বন্ধু নহে, সে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী।' শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও অধিকার বিস্তারের প্রতিযোগিতায় পরাভূত ভীলপুত্রের চিত্তে যে দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছিল লেখিকা নিপুণভাবে তা প্রকাশ করেছেন। 'কত সামান্য কারণ হইতে সংসারে অসামান্য ঘটনা উপস্থিত হয়'—এই সূত্রটিকেই যেন অবলম্বন করে লেখিকা চরিত্রটির অন্তর্দ্বন্দ্ব ও পরিবর্তন দেখাবার চেষ্টা করেছেন। ভ্রাতার স্নেহ, অগ্রজের প্রীতি প্রভৃতি সদগুণাবলীকে আচ্ছন্ন করে তার অন্তরে বিদ্বেষের বিষক্রিয়া শুরু হয়েছে। তার এই পতনের বিস্তৃত ব্যাখ্যা লেখিকা দিয়েছেন। ভীলপুত্রের স্বগত চিন্তা থেকে জানা যায়, 'যখন তাহার মনে হইল কেবল সামাজিক অধিকার নহে—তাহার পিতার স্নেহও যুবক আত্মসাৎ করিতেছে তখন আর তাহার সহ্য হইল না। সে সব সহিতে পারে, পিতার স্নেহের উপেক্ষা সহিতে পারে না; আর সব অধিকার হইতে সে বঞ্চিত হইতে প্রস্তুত, কিন্তু তাহার এই স্বাভাবিক অধিকার আর কাহাকেও সে দিতে পারে না। ভীল অসভ্য; তাহার স্বাভাবিক অবিকৃত হৃদয়ে প্রেমেরই একাধিপত্য, তাই সে ক্ষমতাকে তাচ্ছিল্য করিতে পারে—প্রেমকে পারে না।' পিতৃসিংহাসনের দায়াদাধিকার থেকে পিতৃস্নেহের উত্তরাধিকারের দিকে তার ভাবনা এভাবে দ্রুত সঞ্চালিত হয়েছে। তার এই অভিমান-ক্ষুব্ধ হৃদয় পরে মন্দালিকের স্নেহযাদুস্পর্শে প্রশান্ত হয়েছিল।

অপূর্ব উপায়ে ঔপন্যাসিক এই তিনটি চরিত্রের পারস্পরিক আকর্ষণ-বিকর্ষণ চিত্রিত করেছেন। গুহা-মন্দালিক-তালগাছের পারস্পরিক সম্প্রীতি সত্ত্বেও যে বিরোধ অনিবার্য হয়ে উঠেছে ঘটনাপরম্পরায় তা বিশ্লিষ্ট হয়েছে; লেখিকার সহানুভূতিও তাকে স্পর্শ করেছে। শুভময় সম্ভাবনা সত্ত্বেও অপরিহার্য বিপর্যয় নিয়তির অমোঘ প্রভাবকে স্পষ্ট করে তুলেছে। পরস্পর পরস্পরের হিতৈষী হওয়া সত্ত্বেও এই ত্রিকোণ সংঘর্ষের বিষময় পরিণাম তাই পাঠক হৃদয়কে ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ করে দেয়। এই মর্মান্তিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বন্য মন্দালিকের হৃদয়ে যে দোলাচলতা এসেছে তা সত্যই মর্মস্পর্শী। আরণ্যক সমাজের উক্ত প্রতিভূ কর্তব্যের যূপকাষ্ঠে পুত্রস্নেহকে বলি দিয়েছে, কিন্তু সেই হতভাগ্য পুত্রের আর্তনাদ

তার চিত্তকে দ্রবীভূত করেছে। ভীলগণ কর্তৃক নবনির্বাচিত রাজা গুহার কল্যাণের নিমিত্ত সে পুত্রকে পিতৃসিংহাসন থেকে বঞ্চিত করেছে; ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে তার সেই সীমাহীন অসহায়তার কথা আছে। তার সবচেয়ে বড় সংকট পুত্র তালগাছ ও পুত্রতুল্য গুহার মধ্যে সম্পর্কের সেতুবন্ধন সাধনে; সে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে, নিষ্ফল হয়েছে। তার এই অসহায়তা মহাভারত-কথিত অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—পুত্র অশ্বত্থামা ও পুত্রপ্রতিম অর্জ্জুনের প্রতি প্রীতির দোলাচলতায় যাঁর সমস্ত উদ্যম নিষ্ফল হয়ে গেছে। কাহিনীর মধ্যে দেখা যায় মন্দালিকের এই চিত্তসংকটের অবসান ঘটেছিল মৃত্যুতে; আরও হৃদয়বিদারক সত্য এই যে ভ্রমক্রমে পুত্রহস্তেই সে নিহত হয়েছিল। গুহা ও তালগাছের দ্বন্দ্বযুদ্ধে মন্দালিকের হৃদয়ই বিদীর্ণ হয়েছে।

মিবাররাজের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, এই গ্রন্থে ভীলজাতির জীবন যথেষ্ট পরিমাণে সমর্পিত হয়েছে। রাজস্থানের ইতিহাসকে ভিত্তি করে এবং ভীল ও রাজপুতের সম্পর্ক অবলম্বনে তিনি মিবাররাজ ও বিদ্রোহ নামক দুটি উপন্যাস রচনা করেন। মিবাররাজ বিদ্রোহের গৌরচন্দ্রিকাস্বরূপ। এই উপন্যাসে আরণ্যক মানবের সরলতা ও আতিথেয়তা এবং অনাড়ম্বর জীবনযাপন প্রণালীর দিকে অধিকতর মনোযোগী হয়েছিলেন লেখিকা। ভীলজাতির সাহস ও মৃগয়াপ্রীতিকে অবলম্বন করে উপন্যাসের আরম্ভ; তাদের ঋতুউৎসব ও বিবিধ সামাজিক উৎসবের জীবন্ত বর্ণনা লেখিকার অপূর্ব সহানুভূতির স্পর্শলাভে বঞ্চিত হয়নি। রমেশচন্দ্রর রাজপুত জীবনসন্ধ্যায় ও ভীল-রাজপুত-সম্পর্ক গৃহীত হয়েছে, কিন্তু সেখানে রাজপুতজীবনচিত্র অসাধারণত্বে মণ্ডিত হয়নি বা বিশেষ মর্যাদা লাভ করেনি। ফলত রমেশচন্দ্রে যা অপ্রাসঙ্গিক কিংবা গৌণ ব্যাপার স্বর্ণকুমারীতে তা-ই সবিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে। মিবাররাজের প্রথম ছয়টি পরিচ্ছেদে ভীলজীবনের কথাই একমাত্র পরিবেশিত, কেবল দশম পরিচ্ছেদের কাহিনীতে নাগরিক জীবনের কিয়দংশ উদ্‌ঘাটিত, ফলে গ্রন্থের কাহিনীতে যেমন ভীল-রাজপুত-সম্পর্কের প্রভাব অধিক তেমনি সমগ্র উপন্যাসে ভীলজাতির জীবনই প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে। এমন কি তাদের সংলাপে লেখিকা একটি বিশিষ্ট আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ করেছেন। সে ভাষার সঙ্গে রাজপুতানার আঞ্চলিক ভাষার কোনো সম্পর্ক নেই সত্য কিন্তু কি অপূর্ব সহৃদয়তা ও প্রবল সহানুভূতি থাকলে এরকম একটি উপভাষাকে সাহিত্যে সমর্পণ করা যায় তা সহজেই অনুমেয়। ফলে ভদ্রেতর চরিত্র-রূপে ভীলরাজ মন্দালিক, ভীলরাজপুত্র 'তালগাছ' ও অন্যান্য আরণ্যক মানুষের চরিত্র স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। পরবর্তী কালের কোনো কোনো উপন্যাসে এই রীতির যে উপভাষা (dialect) তিনি ব্যবহার করেছেন মিবাররাজেই তার সূত্রপাত।

বিদ্রোহ

॥১॥ অনেকে মনে করেন বিদ্রোহ উপন্যাসটি[৫২] মিবাররাজের পরিশিষ্ট। রাজস্থানের পটভূমিকায় ভীল ও রাজপুতের বিরোধ-মিলনের কাহিনী বর্তমান উপন্যাসেরও উপজীব্য। কিন্তু বিদ্রোহের ঘটনা মিবাররাজের ঘটনাকাল থেকে দুই শত বৎসর পরবর্তী কালের। মেবারের প্রাচীন ইতিহাসে বা গুহা (গ্রহাদিত্য) এবং মন্দালিকের সময়ে ভীল ও রাজপুত বিরোধের সূত্রপাত হয়। উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি থাকলেও ঘটনাচক্রে গুহার গর্হিত আচরণের জন্য ভীলজাতির মধ্যে অসন্তোষ প্রথম জাগ্রত হয়; ঐ অসন্তোষ পরবর্তী রাজন্যবর্গের সময় ধীরে ধীরে পুঞ্জীভূত হতে থাকে এবং নাগাদিত্যের রাজত্বকালে আগ্নেয় পর্বতের অগ্ন্যুদ্গীরণের মত ভীলবিদ্রোহ সংহারমূর্তি ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তাই বিদ্রোহের বীজ যে মিবাররাজের মধ্যে উপ্ত হয়েছিল তা অস্বীকার করা যায় না বলে মিবাররাজকে পরবর্তী উপন্যাস বিদ্রোহের 'কথামুখ'রূপে অভিহিত করা হয়েছে।[৫৩]

ভীল ও রাজপুতের সম্পর্কের কাহিনীসাদৃশ্য ব্যতীত এই উপন্যাসদ্বয়ের আর কোনো ঘনিষ্ঠ সংযোগ নেই; বরং উভয় উপন্যাসের কথাবস্তুর মত কেন্দ্রীয় ভাবটিও বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ভ্রমবশত গুহা কর্তৃক মন্দালিকহত্যার ঘটনাবিবৃতি অপেক্ষা নাগাদিত্য এবং সুহারমতীর পারস্পরিক আকর্ষণজনিত জটিলতা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিদ্রোহে স্থান পেয়েছে; স্থায়ী ভাবও সম্পূর্ণ পৃথক। কোনো কোনো সময় নায়কনায়িকার প্রাত্যহিক জীবন ও ব্যক্তিগত ভাব-ভাবনা এত প্রধান ও প্রবল হয়ে উঠেছে যে তাকে ইতিহাসের অঙ্গীভূত করতে লেখিকার বিপুল শক্তি ব্যয়িত হয়েছে। এই কথা মনে রেখেই সম্ভবত প্রবীণ সাহিত্যরসিক মন্তব্য করেছেন, 'বিদ্রোহ উপন্যাসে ইতিহাসের দুই একটি পাত্রপাত্রী থাকিলেও উহা ঠিক ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়।'[৫৪] মেবারের অধিপতি নাগাদিত্য ও ভীলকন্যা সুহারমতীর প্রণয় ঐতিহাসিক ব্যাপার কি না সে প্রসঙ্গ স্বতন্ত্র, তবে ভীলরাজপুতসম্পর্ক এবং তাদের আত্মীয়তা ও বিরোধ যে কখনো কখনো উপন্যাসের মধ্যে নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অবশ্য একথাও অস্বীকার করা যায় না যে, যে কোনো কারণেই হোক না কেন, স্বর্ণকুমারী রাজপুত ইতিহাসের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তাঁর অনেক ছোট গল্প গাথাকবিতা ও উপন্যাসের মূল কথা রাজস্থানের ইতিহাস থেকে আহৃত; সেদিক

৫২ প্রথম প্রকাশ—ভারতী ও বালকে ভাদ্র ১২৯৪ থেকে ফাল্গুন ১২৯৫, গ্রন্থাকারে—৯ আগষ্ট ১৮৯০, ১৫ শ্রাবণ ১২৯৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮২।

৫৩ দ্র রথীন্দ্রনাথ রায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৫শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, পৃ ৩৪০।

৫৪ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, ১৩৫৬, পৃ ১৩১।

থেকে বিদ্রোহকে রাজস্থানের ইতিহাসকেন্দ্রিক নিশ্চয় বলা চলে। রাজপুত ও ভীলদের জগৎ এবং জীবনের অবলম্বনে রচিত উপন্যাসাবলীর অন্যতম হল বিদ্রোহ—বিদ্রোহ সম্বন্ধে সাধারণভাবে একথা বলা যায়।

মিবাররাজ ও বিদ্রোহের সম্পর্ক সম্বন্ধে লেখিকাও সচেতন ছিলেন। বক্ষ্যমাণ উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রথমে তিনি বলেছেন, 'গুহা ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যসময়ে ইদরে যে ক্ষুদ্র রাজত্ব স্থাপন করিয়া যান, এখন অষ্টম শতাব্দীর মধ্যসময়ে তাহা মিবারের অন্তর পর্যন্ত বিস্তৃত; শতাব্দীকাল হইল গুহার প্রপৌত্র আশাদিত্য আহর পর্যন্ত স্বাধিকারভুক্ত করিয়া এইখানে আশাপুর নামে রাজধানী স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আহরের নাম হইতে গুহার বংশধরগণ এখন আহরীয় নামে খ্যাত। আশাপুরই এতদিন গুহলুট আহরীয়দিগের প্রধান বাসস্থান ছিল; মৃগয়া উপলক্ষে কখন কখন তাঁহারা ইদরে আসিয়া বাস করিতেন মাত্র। কিন্তু আশাদিত্যের পৌত্র নাগাদিত্য রাজা হইয়া অবধি ইদর আবার জাগিয়া উঠিয়াছে। ইদরই এখন রাজনিবাস। কিন্তু "মিবাররাজে" আমরা যে ইদর দেখিয়া আসিয়াছি এখনকার ইদর আর সে ইদর নহে।' এরপর লেখিকা পাদটীকায় মিবাররাজ উপন্যাসের প্রসঙ্গ নির্দেশ করেছেন।

গুহা বা গ্রহাদিত্যের পরবর্তী রাজন্যবর্গের মধ্যে নাগাদিত্য সম্বন্ধে ঐতিহাসিক টড বলেছেন, ... the Bhils, tired of a foreign rule, assailed Nagadit, the eighth prince, while hunting, and deprived him of life and Edur. The descendants of Camalavati (the Birnuggur Brahmin), who retained the office of priest in the family, were again the preservers of the line of Balbhi.[৫৫] ভীলজাতির ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ এবং বিদ্রোহের প্রাক্‌প্রস্তুতির কথা লেখিকা গ্রন্থের পঞ্চম থেকে নবম পরিচ্ছেদের মধ্যে বর্ণনা করেছেন সত্য কিন্তু স্বর্ণকুমারীর উপন্যাসের নাগাদিত্য শিকারকালে নিহত হননি; ভীলকন্যা সুহারমতীর বিবাহসভায় নাগাদিত্য নিহত হন এবং এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠে। নাগাদিত্য ও সুহারমতীর প্রণয় এবং পরিণয় ব্যাপারকে তিনি প্রাধান্য দান করেছেন, ফলে কাহিনী ঐতিহাসিক ধূসরতার ক্ষেত্রে জীবন্ত হয়ে উঠেছে এবং কাহিনীর জটিলতা বিস্তৃতি ও নাটকীয়তা এর পরিণামে দেখা দিয়েছে।

আরও একটি ব্যাপারে স্বর্ণকুমারী টডকে অতিক্রম করে মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। মিবাররাজ উপন্যাসে বর্ণিত কমলাবতীর বংশধররূপে পুরোহিত হরিতাচার্যকে[৫৬] বিদ্রোহে স্থান

৫৫ Rajasthan, Vol I, p 181.

৫৬ লেখিকা পুরোহিতের এই নামটি সংগ্রহ করেছেন টডের রাজস্থান থেকে, নাগাদিত্যের পুত্র বাপ্পাদিত্যের প্রধান উপদেষ্টারূপে পূর্বোক্ত গ্রন্থে তাঁকে স্থান দেওয়া হয়েছে।—দ্র Rajasthan, Vol I, p 184, F. N. 2.

দেওয়া হয়েছে। সুহারমতী প্রকৃতপ্রস্তাবে ভীলকন্যা নয়, সে ঐ প্রাচীন পুরোহিতবংশীয় ব্রাহ্মণকন্যা; ঘটনাচক্রে সে ভীলদের মধ্যে প্রতিপালিত হয়েছিল মাত্র। হরিতাচার্যের ভ্রাতুষ্পুত্রী এই সুহারমতী মিবাররাজ উপন্যাসের কমলাবতীর মত কুমার বাপ্পাদিত্যকে প্রতিপালন করেছিল নরপতি নাগাদিত্য ও রানী সেমন্তীর মৃত্যুর পর। মূল উপন্যাসের নায়িকা সুহারমতীর জীবনে যে অপরিচয়জনিত অস্পষ্টতা ছিল তার সঙ্গে মিবাররাজের গুহার জীবনকথার সাদৃশ্য পাওয়া যায়; সুহারমতীও গুহার মত প্রথমে নিজের প্রকৃত পরিচয় জানতে পারেনি। উপন্যাসের মধ্যে সুহারকে এইভাবে উপস্থাপন করার ফলে গ্রন্থের বিস্তৃতি ও জটিলতা বৃদ্ধিলাভ করেছে এবং আখ্যানটি একান্ত বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে।

প্রসঙ্গত অবনীন্দ্রনাথের রাজকাহিনীর কথা উল্লেখযোগ্য। যদিও টডের রাজস্থান অবলম্বনে উভয় লেখক কয়েকটি কাহিনী রচনা করেছিলেন তথাপি সদৃশ বিষয় নিয়ে রচিত গল্প-উপন্যাসের মধ্যে উভয় লেখকই নানাদিক থেকে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন; কেবল রচনারীতিতে নয়, ঘটনার সৃজনে বয়নে ও পরিবেশনে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই পার্থক্য লক্ষিত হয়। স্বর্ণকুমারীর ক্ষত্রিয় রমণী (ভারতী ও বালক জ্যৈষ্ঠ ১২৯০) নামক গল্পে যে ঘটনা গৃহীত তা-ই রাজকাহিনীর হাম্বির-শীর্ষক রচনার প্রথমাংশে[৫৭] পাওয়া যায়; স্বর্ণকুমারীর মিবাররাজ উপন্যাসের ঘটনার সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের 'শিলাদিত্যে'র শেষাংশ ও 'গোহে'র সম্পূর্ণাংশের সাদৃশ্য আছে; এমন কি অবনীন্দ্রনাথের 'বাপ্পাদিত্যে'র প্রথমাংশ ও লেখিকার বিদ্রোহ উপন্যাসের কথাবস্তু প্রায় সমান। উভয় লেখক যে একটিমাত্র আকরগ্রন্থ থেকে একই কাহিনী আহরণ করে পৃথক পৃথক শিল্পসৃষ্টি করেছিলেন কথিত তথ্যগুলি থেকে তা প্রমাণিত হয়। কিন্তু কোনো কোনো বিষয় সম্পর্কে তাঁরা পৃথক মত পোষণ করেছেন, সে সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হল।

প্রথম, নাগাদিত্যের পূর্বপুরুষগণের পরিচয় স্বর্ণকুমারী বিদ্রোহের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে দিয়েছেন। রাজকাহিনীর মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ নাগাদিত্যকে গুহার অষ্টম পুরুষরূপে বর্ণনা করেছেন এবং এ বিষয়ে তিনি ছিলেন টডপন্থী (Nagadit, the eighth prince)। কিন্তু স্বর্ণকুমারী একটু স্বতন্ত্র কথা বলেছেন, বিদ্রোহের বিভিন্ন অংশ থেকে জানা যায় গুহার প্রপৌত্র আশাদিত্যের পৌত্র হলেন নাগাদিত্য। দ্বিতীয়, টডের মতে শিকারকালে নাগাদিত্য ভীলকর্তৃক নিহত হন কারণ ভীলগণ ছিল tired of a foreign rule. অবনীন্দ্রনাথ টডকে অনুসরণ করলেও স্বর্ণকুমারী করেননি। ভীলকন্যা সুহারমতীকে বিবাহকালে ভীলপল্লীতে নাগাদিত্য ঘটনাক্রমে নিহত হন। তবে বিদ্রোহের ত্রয়োদশ

৫৭ দ্র অরিসিংহ, ভারতী বৈশাখ ১৩১৫।

পরিচ্ছেদে শিকারকালে নাগাদিত্যকে হত্যার ব্যর্থ প্রয়াস লক্ষিত হয়। তৃতীয়, একটি বিষয়ে টডকে উভয়েই অতিক্রম করেছেন। নাগাদিত্যের ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে টড কোনো স্পষ্ট মন্তব্য করেননি। রাজকাহিনীতে তিনি স্বৈরাচারী এবং তাঁরই অত্যাচারের পরিণামে ভীলবিদ্রোহের উদ্ভব। বিদ্রোহে এই ব্যাপার থাকলেও অর্থাৎ নাগাদিত্যকে ভীলবিদ্রোহের জন্য দায়ী করা হলেও তাঁর পতনের কাহিনী সহানুভূতির রঙে রঞ্জিত। রূপমোহ থেকে ভয়াবহ পরিণামের দিকে তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছেন, এই ধাপগুলি একটি একটি করে দেখান হয়েছে; তাঁর পতনের জন্য ব্যক্তিগত দায়িত্বের সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের প্রভাব দেখান হয়েছে। তাই রাজস্থানের মত রাজকাহিনীতে নাগাদিত্য সংক্ষিপ্ত ও উপেক্ষিত চরিত্র, কিন্তু স্বর্ণকুমারী তাঁর সম্বন্ধে স্বকপোলকল্পিত কাহিনী পরিবেশন করেছেন। চতুর্থ, শিলাদিত্যের সমকালীন রাজপুরোহিতের বংশধররূপে হরিতাচার্য চরিত্রটি পরিকল্পিত (বিদ্রোহ—১৭শ পরিচ্ছেদ); তাঁরই ভ্রাতুষ্পুত্রী ভীল-প্রতিপালিতা সুহাস্যমতীকে ক্ষত্রিয় রাজপুত নাগাদিত্য বিবাহ করতে আগ্রহান্বিত; নাগাদিত্যের মৃত্যুর পর গুহার বাপ্পার তত্ত্বাবধান করেন; পরবর্তী কালে গুহার মত বাপ্পাও এই ব্রাহ্মণপুরোহিত হরিতাচার্যের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। উপন্যাসের 'উপসংহারে' এইসকল তথ্য আছে। কিন্তু রাজকাহিনীর অবনীন্দ্রনাথ টডের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন বলে নাগাদিত্য-সুহাস্যমতীর প্রণয়প্রসঙ্গ উত্থাপনই করেননি কারণ বিষয়টি টডে অনুপস্থিত; তাছাড়াও অবনীন্দ্রনাথ হরিতাচার্যের প্রসঙ্গ আদৌ অবতারণা করেননি।

প্রসঙ্গক্রমে মিবাররাজ উপন্যাসের ঘটনার সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের রাজকাহিনীতে পরিবেশিত কাহিনীর তুলনা করা যায়। গুহা কর্তৃক মন্দালিকহত্যার কাহিনীটি অবনীন্দ্রনাথের রচনায় নূতন বিন্যাস লাভ করেছে। রাজকাহিনীতে এই ভীলনেতার নাম 'মন্দালিক' নয়, 'মাণ্ডলিক'। স্বর্ণকুমারীর মন্দালিক নামটি অপেক্ষা অবনীন্দ্রনাথের 'মাণ্ডলিক' শব্দটি নিতান্ত অনুপযুক্ত নয়, শব্দটির মধ্যে মণ্ডলাধিপতির (মোড়ল) তাৎপর্য প্রচ্ছন্ন রয়েছে। সে যা হোক না কেন, মন্দালিকের মৃত্যুর জন্য গুহার দায়িত্ব প্রত্যক্ষ এবং প্রবল বলেই পরিবেশন-নৈপুণ্যে স্বর্ণকুমারীর কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য ও চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে; রহস্যময় জটিলাবর্ত সৃষ্টি করে লেখিকা গুহার প্রতি সমবেদনাবশত তাঁর কলঙ্ককে সংশয়াচ্ছন্ন করে রেখেছেন। কিন্তু রাজকাহিনীতে মাণ্ডলিকহত্যায় গোহের দায়িত্ব একেবারে অস্বীকৃত বরং সেখানে একটি ইতিহাস-নিরপেক্ষ অবিশ্বাস্য কাহিনীর আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। ফলত রাজকাহিনীতে অবনীন্দ্রনাথের রূপকথাধর্মী সারল্য যেমন প্রকাশিত তেমনি মিবাররাজের মধ্যে ঔপন্যাসিক বাস্তবতা ও বিশ্লেষণনৈপুণ্য প্রস্ফুটিত। তবে নাগাদিত্যের কাহিনী রচনায় অবনীন্দ্রনাথ বিশ্বস্তভাবে টডের অনুসরণ করেছেন; কিন্তু বিদ্রোহ উপন্যাসে স্বর্ণকুমারী টডের সামান্য

বিবরণকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছেন বিনা দ্বিধায়। ঐতিহাসিক উপন্যাস-লেখকের এই অধিকার থাকে।

মিবাররাজ ও বিদ্রোহ উপন্যাসের মধ্যে গুহা ও মন্দালিকের বংশধরগণের যে উল্লেখ পাওয়া যায় তাদের একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল। মন্দালিক ছিলেন গুহার পিতৃতুল্য ব্যক্তি—এই তথ্যটি নিম্নোক্ত তালিকা অনুসরণকালে স্মরণীয়।

সুহারমতীর প্রণয়প্রার্থী ভীলযুবক ক্ষেতিয়া সুহারের সঙ্গে বাপ্পাদিত্যকে বিদ্রোহ থেকে রক্ষার জন্ত সচেষ্ট হয় এবং বাপ্পা তাদের দ্বারাই প্রতিপালিত হয়।

২। বিদ্রোহ উপন্যাসে ভীল-রাজপুত-সম্পর্কের চিত্রটি লেখিকা উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত করেছেন। বিজিত ও বিজেতার মনোভাব এই দুইটি জাতিকে পরস্পরবিরোধী ও প্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলেছে। গুহার অকৃতজ্ঞতার ফলেই যে রাজপুতগণ ভীলের জন্মভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠিত অধিকার লাভ করেছে সেকথা তারা ভুলতে পারেনি। তাই তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা কখনো কখনো অসন্তোষের তুষানলে ধূমায়িত হয়ে উঠে, এরই পরিণামে ভীলবিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। সমগ্র উপন্যাসে এই বিদ্রোহের প্রকাশ-পরম্পরা নিপুণতা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে। মিবাররাজ উপন্যাসের দুই শত বৎসর পরবর্তী কালের কাহিনী অবলম্বনে বিদ্রোহ রচিত। এই অন্তবর্তী কালে ভীলগণ স্বদেশেই অবাঞ্ছিতপ্রায়, 'গুহা ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যসময়ে ইদরে যে ক্ষুদ্র রাজত্ব স্থাপন করিয়া যান, এখন অষ্টম শতাব্দীর মধ্যসময়ে তাহা মিবারের অন্তর পর্যন্ত বিস্তৃত,······ইদরই এখন রাজনিবাস।' (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ) অতঃপর লেখিকা ইদরের সমৃদ্ধির যে বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকেই প্রমাণিত হয় রাজপুতগণ কিরূপ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে ইতিমধ্যে। কিন্তু এই ঐশ্বর্য ও ভোগের দিনে ভীলগণ অন্তেবাসী হয়ে পড়েছে, লেখক সেই সকরুণ দিকটির উপর সম্যক আলোকপাত করতে বিস্মৃত হননি। তৃতীয় পরিচ্ছেদ পাঠকালে জানা যায় নাগাদিত্যের পূর্বপুরুষ আশাদিত্যকে একজন ভীল হত্যা করতে যায় এবং তারপর থেকে 'ভীলদের সঙ্গে রাজাদের মেশামেশি ছিল না।' অর্থাৎ ভীল-অসন্তোষ কখনো কখনো দেখা দিয়েছে উগ্রভাবে কিন্তু তা তেমন ব্যাপক ছিল না; এবং

এরই ফলে রাজপুত ও ভীলদের জাতিগত বিরোধ স্পষ্টতর হয়ে উঠে। নাগাদিত্যের সময় পুনর্বার উভয় জাতির মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষিত হয়, কিন্তু নাগাদিত্যের সভাসদ ও অমাত্যবর্গ এই মহান প্রচেষ্টাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেনি বরং এরই প্রতিক্রিয়াশীল পরিণামে নাগাদিত্য স্বজাতীয়গণের অসন্তোষ বর্ধিত করেছেন। লেখিকা সুন্দরভাবে নাগাদিত্যের মহৎ প্রচেষ্টার অশুভ পরিণতির অনিবার্যতা দেখিয়েছেন। পারিষদবর্গের মধ্যে কুৎসিত ষড়যন্ত্রপ্রীতির উদ্ভব হয়েছে প্রধানত বিজিত-নির্যাতনের প্রবণতা ও উগ্র অহংবোধ থেকে; ভীলগণের ক্ষোভ এই উপেক্ষা ও ঘৃণার প্রতিক্রিয়া এবং হীনমন্যতা থেকে সঞ্জাত, পঞ্চম পরিচ্ছেদের পর তার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যাবে। এই ভীল-রাজপুত-সম্পর্ক সম্বন্ধে সমালোচক বলেছেন, 'ভীল রাজপুতের বশ্যতা স্বীকার করিয়া কৃষিকর্ম, মেষপালন প্রভৃতি নীচজনোচিত কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। সে প্রায়ই নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট ও বিজেতা রাজপুতের প্রতি অনুরক্ত, তবে কোথাও কোথাও বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অসন্তোষের ভস্মমধ্যে সুপ্ত আছে। রাজপুত ভীলের প্রতি মনে মনে একটা ঘৃণা ও অবজ্ঞার ভাব পোষণ করে, তবে সে পূর্ব উপকারের কথা একেবারে বিস্মৃত হয় নাই।'[৫৮]

উপন্যাসের পঞ্চম পরিচ্ছেদে ভীলজীবনের ঐশ্বর্য ও সন্তোষের চিত্রটি প্রদর্শিত হয়েছে, 'পাহাড়ের উপরে গ্রাম, গ্রামের নীচেই সুবিস্তৃত ঢালু শস্যক্ষেত্র; ভীলকৃষকেরা কাজ করিতেছে; কতক শস্য পাকিয়াছে, সেই পরিপক্ব শস্য বড় বড় কাস্তে-হাতে স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া কাটিতে কাটিতে হাসি-গল্প-কলহ-গণ্ডগোল একসঙ্গে বাধাইতেছে।... ক্ষেত্রের এক দিকে নবকর্ষিত মৃত্তিকায় নূতন শস্যের অঙ্কুর উদ্গত হইয়াছে, নিকটের একটি হ্রদের তীরে দুই চারিজন ভীলনী— তাহাদের কোমর হইতে হাঁটুর নীচে পর্যন্ত মোটা কাপড়ের ঘাগরা,—গায়ে আঙ্গিয়া কোর্তা,—গলায় একরাশ পুতির মালা,—তাহারা উঁচু খোঁপায় পালক গুঁজিয়া, পায়ে কাঁসার বাঁকি, নাকে-কানে মোটা মোটা কাঁসা-পিতলের চাকতি পরিয়া ডোঙ্গাকলে জল তুলিয়া মাঠে ফেলিতেছে। সে জল আল বাহিয়া সমস্ত অঙ্কুর সিক্ত করিতেছে।' দীর্ঘ উদ্ধৃতি নিষ্প্রয়োজন, ভীলজীবনের এই সুখ-সন্তোষ-সৌন্দর্যে ঔপন্যাসিকের চিত্ত যেন অবগাহন করে চলেছে। সুন্দর সহানুভূতির সঙ্গে মুগ্ধতার সমন্বয়ে সৃজনশীল প্রতিভা সবল ভীলগণের কৃষিকার্য-পশুপালনকে চমৎকারিত্ব দান করেছে। মন্দালিকের সমকালীন ষষ্ঠ শতাব্দীর আরণ্যক ভীলজাতি এখন বহুলপরিমাণে সভ্য হয়ে উঠেছে; কৃষিভিত্তিক জীবনযাত্রার সঙ্গে আরণ্যক জীবনের একটি মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় তারা সভ্যতার উন্নতি ও ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ

৫৮ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ১৩৬৯, পৃ ২৮৩-৮৫।

করেছে। কিন্তু এই সুস্থ স্বাভাবিক তৃপ্তির মধ্যেও বিঘ্নের অভাব নেই—'রাজা কিংবা তাঁহার সভাসদগণ কালেভদ্রে দলবল সঙ্গে এখানে মৃগয়া করিতে আসেন। এক দিনে গ্রামবাসীদের বহু পরিশ্রমের শস্যক্ষেত্র দলিত করিয়া তাহাদের বহু দিনের আহার্য নষ্ট করিয়া চলিয়া যান।' দুঃসাধ্য প্রচেষ্টায় উত্তোলিত যে হ্রদের জল জীবনের শস্যশ্যামল ক্ষেত্রে সঞ্চারিত হয়ে যায় বিজেতার খেয়ালে সেই সুনির্মল প্রবাহ মধ্যে মধ্যে যে পঙ্কিল হয়ে উঠে ভীলগণের সেরূপ বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা রয়েছে। এই সুখদুঃখ আশানৈরাশ্যের মধ্যে দরিদ্র অসহায় ভীলজীবন অনিশ্চয়তায় দোদুল্যমান। এর মধ্যেই ভস্মাবৃত বহ্নির মত বিদ্রোহ প্রচ্ছন্ন ছিল; জঙ্গু-কুন্নু-জংলী-জুমিয়ার সমবেত ফুৎকারে তা সর্বগ্রাসী ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করেছে। প্রকারান্তরে ভীলজীবনের সহৃদয়-হৃদয়গ্রাহ্য ছবিটি ফুটে উঠেছে, 'ভীলদের সরল গ্রাম্যজীবন, কুসংস্কারপরায়ণতা ও অজ্ঞাত বিপদের ভয়ে সন্ত্রস্ত অবস্থার চিত্র বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।' ঝন্নু গণক কর্তৃক ভীলগণের ভবিষ্যৎ নিরীক্ষা ও তার উপর সরল কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের অকৃত্রিম আস্থার কথা সপ্তম পরিচ্ছেদে বিবৃত। জীবন সম্বন্ধে স্বচ্ছ সুন্দর দৃষ্টির ফলে এই দৃশ্যটি কৌতুকে বেদনায় সমুজ্জ্বল। জঙ্গুর পিতার রাজভক্তি আদর্শস্থানীয়, এমন কি পুত্র জুমিয়ার রাজানুগত্যও ছিল সরল নিষ্ঠাসঞ্জাত। অপর দিকে জঙ্গুর পিতামহ চিন্তন এবং স্বয়ং সে রাজপুরে প্রবল বিরোধিতা করে এসেছে; গুহা কর্তৃক মন্দালিকহত্যার প্রতিশোধ-স্পৃহায় তাদের উৎসাহ অপরিসীম। গ্রামজীবনসুলভ মানবমনের এই প্রতিকূলতা অথবা আনুগত্যের মধ্যে কোনো খাদ ছিল না; বিপরীত ও প্রান্তিক গুণসমূহের অদ্ভুত সহাবস্থান সরল জীবনের মধ্যেই সম্ভব এবং সম্ভব বলেই সরল সহৃদয় ভীলগণের জাতীয় চরিত্রের বিপুল পরিবর্তন তত অপ্রত্যাশিত বলে মনে হয় না। যে ভীলজাতি একদা ক্ষত্রিয়কুমার গুহার জীবন রক্ষা করেছিল, যারা শিকার ও উৎসবকে আরণ্যক জীবনযাত্রার প্রধান অঙ্গরূপে বিবেচনা করত তারাই মাত্র ত্রিশ বৎসরের মধ্যে কৃষিজীবীতে রূপান্তরিত এবং জায়গীরদারের দাসরূপে পরিবর্তিত। দিগন্ত প্রসারিত জটিল ও দুর্ভেদ্য বনভূমিতে একদা যারা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করত আজ তারা মহাজনের স্বার্থশৃঙ্খলে আবদ্ধ, 'উপরি উপরি দুই বছর আকাল পড়িল, মুরা না খাইয়া মরিবার নাকাল হইনু, জায়গীরদার বলিল, তুইরা দাসখৎ লিখি দে, তুইদের খাওয়াইমু। মুইরা তাই করিল।' অসন্তোষ ও প্রতিহিংসার আগুনে দগ্ধীভূত জঙ্গু বিস্ময় এবং ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ করেছে, 'মাঠে ভীলেরা চাষ করিতেছে। সাধারণ ভীল হইতে তাহাদের স্বতন্ত্র বেশ। তাহাদের সঙ্গে ধনুর্বাণ কিংবা কটিদেশে কোন প্রকার খড়্গ আবদ্ধ নাই। কর্ণে রৌপ্যবলয়, পরিধেয়ে অবিকল ক্ষত্রিয়-পরিচ্ছদ, মাথায় ক্ষত্র-উষ্ণীষ, দেহ অপেক্ষাকৃত সুকুমার। জঙ্গু তাহাদের পরিধান-পরিচ্ছদ-চেহারা দেখিয়া আশ্চর্য হইয়েছে।' ইদরের সুবিশাল জটিল কুটিল অনিশ্চয়তাপূর্ণ অরণ্যানী আজ দিগন্ত-

প্রসারিত শ্যামল প্রান্তরে পর্যবসিত, সেইসঙ্গে মাত্র ত্রিশ বৎসরের মধ্যে তার অধিবাসী ভীলগণেরও জাতীয় চরিত্র বিবর্তিত এবং পরিবর্তিত হয়ে গেছে। যে ভীলসন্তান অজু বা চাঁদিলা একদা প্রকাশ্যে অসমদর্শী রাজাকে হত্যার উদ্দেশ্যে বর্শা নিক্ষেপ করে অনায়াসে নির্বাসনদণ্ড বরণ করে নিয়েছিল তাদেরই অধস্তন পুরুষেরা আজ ক্ষত্রিয় জায়গীরদার ও শাসকের স্বৈরাচারের নিকট মস্তক অবনত করেছে। পরাধীন দেশের মানুষরূপে স্বর্ণকুমারী ভীলজীবনের এই দুর্দশা-অধঃপতনকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে বিচার করেছেন। এই প্রবল সহানুভূতি ও প্রত্যক্ষ সমবেদনাবশত ভীলজীবনের চিত্র এতই মনোজ্ঞ হয়ে উঠেছে।

বিদগ্ধ সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থে স্বর্ণকুমারীর দীপনির্বাণ গ্রন্থের পরিকল্পনার একটি ত্রুটি সম্পর্কে বলেছেন, 'একজন সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতা ও হিন্দুরাজ পৃথ্বীরাজের রাজনীতি-বিরুদ্ধ উদারতা—এই দুইটি হিন্দু পরাজয়ের মুখ্য কারণরূপে বর্ণিত হইয়াছে।···হিন্দুমুসলমানের মধ্যে যুদ্ধবিষয়ে অপক্ষপাত সুবিচার করিবারও কোন চেষ্টা নাই—মুসলমানেরা যেন সম্পূর্ণভাবে ভাগ্য, বিশ্বাসঘাতকতা ও হিন্দুদের সরল বিশ্বাস-প্রবণতার জন্যই যুদ্ধ জয় করিয়াছে। ইতিহাস কিন্তু এই পক্ষপাতমূলক সাক্ষ্যে সায় দিতে পারে না।' লেখিকার বিদ্রোহ গ্রন্থটি দীপনির্বাণের প্রায় চোদ্দ বছর পরে প্রকাশিত হয় এবং ইতিমধ্যে তিনি একাধিক ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাস রচনা করে অভিজ্ঞতাভাণ্ডার বর্ধিততর করেছেন; ফলে এজাতীয় ত্রুটি বিদ্রোহে দেখা যায় না। বিদ্রোহের কারণ হিসাবে কেবল ভীলগণের দায়িত্বকেই তিনি একমাত্র বলে স্বীকার করেননি। তাদের অসন্তোষের মূলে যাদের দায়িত্ব সর্বাধিক সেই ক্ষত্রিয় রাজপুতগণের জাতীয় চরিত্র বিশ্লেষণ করে তাদের পতনের চিত্রটি সম্পূর্ণ করেছেন। রাজপুতের বিরুদ্ধে ভীলবিদ্রোহ সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে আত্মপ্রকাশ করলেও উভয় জাতির বাহ্যিক সৌহার্দ্য ও প্রীতির দুর্বল শিথিল আবরণের মধ্যে অসন্তোষ-ক্ষোভ-বিদ্বেষের বিষবাষ্প পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল ধীরে ধীরে। জাতিবৈরিতার জন্য কে প্রথম উদ্যোগ করেছিল সেই সূক্ষ্ম বিচারের প্রয়োজন নেই তবে এ ব্যাপারে দায়িত্ব যে সকলেরই ছিল এ বিষয়ে লেখিকা সঙ্গত কারণে নিঃসন্দেহ। স্বরাজ্য থেকে বিতাড়িত ও প্রতারিত ভীলের জীবন বিশ্লেষণ করেই তিনি তাই ক্ষান্ত হননি, বিজেতার অসহিষ্ণুতা স্বৈরাচার এবং পরজাতি-পীড়নোৎসাহের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় দিয়েছেন তিনি বিদ্রোহে। মৃগয়ায় মত্ত হয়ে দরিদ্র ভীলের শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস করে দিয়ে যায় ক্ষত্রিয় রাজপুত; ভীলরমণীর মর্যাদা ও শালীনতা অস্বীকার করে ক্ষত্রিয়গণ তাকে ধরে নিয়ে যায় রাজধানীতে, আর তাকে রাজঅন্তঃপুরে স্থান দেওয়ার জন্য অনুরোধ ও দাবি জানিয়ে শাস্তি পায় স্পষ্টবাদী ভীলযুবক। এই অসম বিচার-জ্ঞান গর্বান্ধ বিজেতার রাজনৈতিক দূরদর্শিতার প্রমাণ বহন করে না।

রাজপুতগণের বৈরনির্যাতন ও শোচনীয় নৈতিক অধঃপতনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাজপরিবারের উৎকেন্দ্রিকতা। এই রাজ্যের পুরোহিতপর্যন্ত স্বধর্মভ্রষ্ট: 'পৌরোহিত্যের এই মুখোসের মধ্য হইতে গণপতির মুখেচোখে হাবভাবে একটি ক্ষুদ্র মোসাহেবী ধরণ উঁকি মারিতেছে; সভাসদগণও পুরোহিত অপেক্ষা তাঁহার প্রতি অনেকটা বিদূষকের মতই ব্যবহার করেন, ঠাকুরকে লইয়া অহরহ তাঁহাদের ঠাট্টাতামাসা চলে, ঠাকুরও সন্তুষ্ট ছাড়া অসন্তুষ্ট নহেন, তিনিও. সুযোগ পাইলে তাঁহাদের তামাসা তাঁহাদেরই ফিরাইয়া দিয়া থাকেন।' প্রধান পুরোহিত হরিতাচার্যের অনুপস্থিতিতে গণপতি তাঁর কার্যভার গ্রহণ করলেও পুরোহিতের মহিমান্বিত গাম্ভীর্য ও মর্যাদাবোধ থেকে সম্পূর্ণরূপে সে বঞ্চিত। এই তরলমতি অপ্রবীণ উপদেষ্টা পুরোহিত ততোধিক চঞ্চলমতি অল্পবয়স্ক নাগাদিত্যকে যে সর্বনাশের দিকে এগিয়ে দেবে সেকথা সহজেই অনুমান করা চলে। স্বর্ণকুমারী গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে নাগাদিত্যের চতুষ্পার্শ্বস্থ সভাসদ ও হিতাকাঙ্ক্ষীগণের যে চিত্র তুলে ধরেছেন তা সত্যই শোকাবহ; তৃতীয় পরিচ্ছেদে তা আরও স্পষ্ট। জুমিয়া ভীলের গুণে বশীভূত নাগাদিত্য তাকে উচ্চ পদে নিয়োগ করেছেন। অবহেলিত ভীলের এই স্বীকৃতি রাজপুরুষগণের ক্ষোভ ও অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে। 'জুমিয়া বন্য পশুর সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়া আশ্চর্যরূপে জয়লাভ করে, জুমিয়া একজন সুনিপুণ তীরন্দাজ, কুস্তিতে রাজসভায় জুমিয়াকে কেহ পারিয়া উঠে না, অল্পদিনের মধ্যেই জুমিয়ার এইরূপ নানা গুণ রাজা আবিষ্কার করিয়া লইয়াছেন। সভাসদগণ ইহাতে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে এতদিন যে একটা রেষারেষি ছিল সেসকল ভুলিয়া পাঁচজন একত্র হইলেই তাহারা আজকাল একপ্রাণ হইয়া পড়ে, মুখে আর কোন কথা থাকে না, রাজার কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য অরাজকীয় ব্যবহারের উপর অবিশ্রাম হাস্য চলে, ভাষ্য চলে, কিন্তু যেহেতু তাহাদের পক্ষে ইহা বড় একটা হাসির কথা নহে—তাই অবশেষে সেসমস্ত হাসি-কানাকানি ক্রুদ্ধ তর্জন গর্জনে পরিণত হয়।' লেখিকা এভাবে শোচনীয় নৈতিক অধঃপতনের সঙ্গে রাজপুতগণের ঈর্ষা ক্ষোভ ও অসন্তোষের বিশ্লেষণ করেছেন। আরও মর্মান্তিক ব্যাপার হল, বুধাদিত্যের মৃত্যুর পর মাত্র ষোড়শবর্ষীয় নাগাদিত্যের প্রবল প্রতাপ ও ইচ্ছাশক্তিকে স্বার্থান্বেষী অমাত্যবর্গ এবং সভাসদগণ মুক্তমনে স্বীকার করে নিতে পারছিল না, অথচ রাজার প্রতি প্রকাশ্যে আনুগত্যহীনতা প্রদর্শনেও তারা ছিল কুণ্ঠিত ভীত। পরপ্রতাপে অসহিষ্ণুতার সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রতিষ্ঠায় উৎসাহহীনতা এবং ভীতি তাদের দুর্বলতর করে দিয়েছে। ক্ষুব্ধ অথচ প্রতিকারসাধনে অসমর্থ রাজপুরুষগণের একটি সংলাপ উল্লেখ্য: 'মন্ত্রী বলিলেন, রাজা কি আর রাজা— রাজা ত বালক। শ্রীমন্ত বলিলেন, দেশটা অরাজক হোল। মন্ত্রী গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িলেন। সেনাপতি বলিলেন, বেশীদিন আর টিকছে না, এই আমি বলে দিলেম। ভীলদের অত প্রশ্রয়

দেওয়া। মন্ত্রী বলিলেন, মহারাজ আশাদিত্যকে একজন ভীল ত মারতে যায়।' (তৃতীয় পরিচ্ছেদ) মেরুদণ্ডহীন রাজপুরুষ, ক্ষুব্ধ অমাত্যবর্গ, ঈর্ষাপরায়ণ সভাসদ ও লঘুচিত্ত পুরোহিত—নাগাদিত্যের চতুষ্পার্শ্বে এদের মায়াজাল বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। রাজপুতবর্গের এই মর্মান্তিক অধঃপতন বিদ্রোহকে ত্বরান্বিত করে দিয়েছে। ক্রমবর্ধমান ভীলের অসন্তোষ এবং ক্রমক্ষীয়মাণ রাজপুতশক্তি নাগাদিত্যের জীবননাট্যমঞ্চে অকালে যবনিকাপাত করেছে; আবার এই পারিপার্শ্বিকতাকে অস্থিরমতি নাগাদিত্যের অবিমৃষ্য-কারিতা আনুকূল্য দিয়েছে। বহ্ন্যুৎসবের সবই ছিল প্রস্তুত, কেবল প্রয়োজন ছিল স্ফুলিঙ্গের; নাগাদিত্য-সুহারের প্রণয়প্রসঙ্গ সেই অগ্নিকণা মাত্র, তাতেই বিদ্রোহের চরম বিকাশ ঘটেছিল।

উপন্যাসের এবংবিধ ঘটনা-পরিকল্পনার পশ্চাতে লেখিকার স্বাদেশিক মন ছিল অতীব সক্রিয়, সেকথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। জঙ্গু ও কুল্লুর কথোপকথন থেকে তা স্পষ্ট হয়ে উঠে। রাজপুত-অত্যাচারের প্রতিবিধানকল্পে জঙ্গুর আহ্বান কুল্লুর চিত্তে সাড়া জাগিয়েছে। কুল্লু অপ্রতিভ হয়ে জানিয়েছে সে একা এবং বিদ্রোহ একার সাধ্য নয়। জঙ্গু জানিয়ে দিল, 'একাডা হইতেই দোকাডা মেলে, দোকাডা হইতে হাজারডা মেলে।...মুই বাণ ধরি মুইভার ছাবালরা ধরুবে, তুইরা ধরুবি, ইদরের সব ভীলডা ধরুবে।' এর পর লেখিকা যেসকল মন্তব্য প্রকাশ করেছেন তার সঙ্গে আমাদের জাতীয় আন্দোলন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের ভাবনা-চিন্তার সম্পর্ক আছে।

॥৩॥ বিদ্রোহ উপন্যাসের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ (১২৭৯) ও সীতারামের (১২৯৩) সাদৃশ্য আছে। যে রূপমোহকে কেন্দ্র করে উভয় উপন্যাসের ট্রাজিক পরিণাম অঙ্কিত হয় বিদ্রোহের মধ্যে সেই রূপমুগ্ধতা ও প্রবৃত্তির উদ্দাম গতির কথা পাওয়া যায়। সীতারামের প্রারম্ভে উদ্ধৃত গীতোক্ত শ্লোকের অনুশাসন সর্বতোভাবে অনুসরণ না করলেও স্বর্ণকুমারী বিদ্রোহে স্বীকার করেছেন যে 'সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ' এবং রূপমোহের আতিশয্যবশত বুদ্ধিভ্রংশ ঘটলে পরিণামে 'বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি'। সীতারাম সম্বন্ধে যা সত্য নাগাদিত্য সম্বন্ধেও তার কিয়দংশ সত্যরূপে প্রযুক্ত হতে পারে, কিন্তু তার সঙ্গে যেন বিষবৃক্ষের নগেন্দ্র-নাথেরই সাদৃশ্য বেশী। কেবল নগেন্দ্রনাথ নয়, কুন্দনন্দিনী ও সূর্যমুখীর সদৃশ চরিত্রও বিদ্রোহে আছে; এমনকি বঙ্কিম-প্রবর্তিত মহাজনপথ অবলম্বন করে লেখিকা নাগাদিত্য ও সুহারমতীর পারস্পরিক আকর্ষণ-সঞ্জাত প্রণয়ের শতদলটিকে ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত করেছেন। ভীলযুবক জুমিয়ার উপর সুগভীর আস্থাবশত নাগাদিত্য তার পালিত কন্যা সুহারের প্রতি আকৃষ্ট হন, কিন্তু প্রথম থেকেই প্রণয় দেখা দেয়নি। পৃষ্ঠপোষিত ব্যক্তির আত্মীয়ের উপর যে স্বাভাবিক মমতার জন্ম হয় ক্রমে সেই মমতা প্রীতিতে ও প্রীতি নানাবিধ

ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে প্রণয়ে রূপান্তরিত হতে পারে। বিদ্রোহ উপন্যাসে লেখিকা এই স্তরগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং স্বাভাবিক কারণে মনোবিশ্লেষণ এখানে প্রাধান্য লাভ করেছে; একটি স্তর থেকে আরেকটি স্তরে লেখক এবং পাত্রপাত্রী ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছেন বলে সকলপ্রকারের ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব হয়েছে। ফলত প্রণয়কথাটি যেন একটি একটি দল উন্মীলন করে চলেছে।

প্রথমে নাগাদিত্য সুহারমতীর প্রতি তত বেশী মনোযোগী ছিলেন না। কিন্তু প্রজাবর্গের অপবাদ, রানী সেমন্তীর সংশয়, হরিতাচার্যের নিষেধ প্রভৃতি নানাবিধ প্রতিকূলতা তাঁকে এ ব্যাপারে সচেতন করে তুলে। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে এই প্রত্যেকটি ভৎর্সনা-নিষেধ-সংশয় উচ্চারিত হয়েছিল নাগাদিত্যের শুভাকাঙ্ক্ষায়। ট্রাজেডির অমোঘ পরিণামের সূত্রটি এখানেও খাটে—ট্রাজেডিতে প্রত্যেকটি শুভ অভীপ্সার ফল-পরিণাম অশুভাত্মক হয়ে পড়ে। নাগাদিত্যের ব্যক্তিগত জীবনে এবং ব্যাপকতর অর্থে রাজপুতগণের জীবনে ও রাজপুতানার ইতিহাসেও এই বিষাদাত্মক পরিণাম তাই অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

ঐতিহাসিক উপন্যাস-রচয়িতার বিশিষ্ট কর্তব্য হল সাধারণ জীবনকে ইতিহাসের মধ্যে সমর্পণ করা, ইতিহাসের সঙ্গে সংমিশ্রিত করা; এইজাতীয় উপন্যাসে সাধারণ জীবন তাই ইতিহাসের বর্ণানুরঞ্জিত হয়ে অসামান্যতা লাভ করে কারণ ঐতিহাসিক উপপ্লবের মধ্যে পতিত হয়ে সাধারণ জীবন দুঃখভোগের মহিমাতে অসাধারণ হয়ে পড়ে। সাধারণত 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে কোনো বিশেষ পর্বের ঐতিহাসিক ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে নায়ক করিয়া গল্প রচনা করা যাইতে পারে, আবার ঐতিহাসিক ব্যক্তিকে অন্তরালে বা গৌণ রাখিয়া কল্পিত চরিত্র সৃষ্টি করিয়াও গল্প রচনা করা চলে।'[৫১] যেখানে এই শেষোক্ত পন্থা অবলম্বিত হয় সেক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের উজ্জীবন ও সমুন্নতি এবং প্রসার ঘটে। বিদ্রোহ উপন্যাসের মধ্যে ভুমিয়া-জংলা-সুহার-কুন্নু প্রভৃতি সাধারণ স্তরের মানবমানবীগণ তাই যেমন ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তেমনি রাজঅন্তঃপুরের চিত্রটিও উপন্যাসের মধ্যে সমর্পিত। পরিচারিকা থেকে মহারানী পর্যন্ত সকলেই আপন আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে ইতিহাসের ঘটনাস্রোতে ভেসে চলেছেন। বিদ্রোহের অঙ্কুর তাঁদের সহায়তায় দ্রুত মহীরুহে পরিণত হয়েছে।

বর্তমান উপন্যাসে স্বর্ণকুমারীর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটেছে রাজা ও রানীর সম্পর্ক নির্ণয়ে: 'রাজা ও রাণীর মধ্যে ক্রমবর্ধমান মনোমালিন্যের চিত্রটি খুব সূক্ষ্ম ও নিপুণভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। ভীল যুবক ভুমিয়ার প্রতি রাজার সৌহার্দ্য ও ভুমিয়ার পালিত কন্যা

৫১ বাংলার লেখক প্রথম খণ্ড, পৃ ৫২।

সুহারের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ তাঁহার রাজ্য ও পারিবারিক জীবনে অসন্তোষের সঞ্চার করিয়াছে।...রাজা ও রাণীর মধ্যে সূক্ষ্ম ভাব-পরিবর্তনের ধারাটি ও ট্রাজেডির অনিবার্য, অবিসর্পিত গতিটি বিশেষ নিপুণভাবে অঙ্কিত হইয়াছে।' এই পর্যায়ে লেখিকা যে কেবল তাঁর সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বজ্ঞান ও নিপুণ বিশ্লেষণশক্তির পরিচয় দিয়েছেন তা নয়, মহিলা সাহিত্যিক-রূপে নারীজীবনের বিচিত্র জটিল অভিজ্ঞতার পরিচয়ও তুলে ধরেছেন। বিংশ পরিচ্ছেদের নাম মজলিস। 'অন্তঃপুরের খাসমজলিস। বিকাল বেলায় সাজসজ্জার পর মহিষী সেমন্তী সখীদিগকে লইয়া প্রমোদগৃহে বসিয়াছেন'— অন্তঃপুরের একটি উজ্জ্বল চিত্র এই প্রসঙ্গে তিনি দিয়েছেন। অবশ্য প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি সদাসতর্ক ছিলেন। রাজঅন্তঃ-পুরিকাগণের কথোপকথনে অত্যল্প কালের মধ্যে নাগাদিত্য-সুহারের কল্পিত প্রণয়কাহিনী যে কি বীভৎস রূপ ধারণ করতে পারে এখানে তারই একটি ইঙ্গিত করেছেন লেখিকা। সে যা হোক না কেন, এই অপবাদ শ্রবণে রানী সেমন্তীর মনে সংশয় দেখা দিয়েছে এবং তারই ফলে রাজার নিকট তাঁর প্রকাশ্য অভিযোগ উপস্থাপিত। এই অভিযোগ এবং অবিশ্বাসই নাগাদিত্যকে সুহারমতী সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছিল। পুত্রপ্রতিম নাগাদিত্যের কল্যাণ-কামনায় রাজপুরোহিত হরিতাচার্য রাজাকে সাবধানতাপূর্ণ উপদেশবাণী দিয়েছেন এবং হিতে বিপরীত হয়েছে। রাজা নাগাদিত্য প্রথমে সেমন্তীকে সস্নেহ উপদেশ দিয়ে তাঁর বিভ্রম দূরীভূত করেন, কিন্তু পুরোহিতের উপদেশে ও পরিচারিকার পরামর্শে রানীর চিত্ত পুনরায় সংশয়জালে জড়িত হয়। এভাবে সংশয় ও বিশ্বাসের দোলাচলতায় পাত্রপাত্রীর জীবনের সঙ্গে সঙ্গে কাহিনীও আন্দোলিত এবং আবর্তজটিল হয়ে উঠেছে।

কেবল নাগাদিত্য-সেমন্তীর সম্পর্কচিত্রণে নয়, রাজা এবং সুহারমতীর প্রণয়কথা বর্ণনেও লেখিকা সূক্ষ্ম অনুভবশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। চতুর্থ পরিচ্ছেদে মৃগয়ায় বহির্গত মহারাজ নাগাদিত্যের সঙ্গে ভীলবালিকা সরল সুহারমতীর সাক্ষাৎকার বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ। তারপর এই দর্শন থেকে ক্রমে ক্রমে রাগ ও অনুরাগ; দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে দেখা যায় নায়িকা 'অনুক্ষণং স্ববিষয়ং নবনবত্বেনানুভাবয়ন্ স্বয়ং চ নবনবীভবন্'। সুহারমতীর এই আত্ম-আবিষ্কার লেখিকার সহৃদয় অনুমোদন লাভ করেছে। রূপকথার রাজপুত্র (চতুর্থ পরিচ্ছেদ) আর বাস্তবের রাজপুত্র যখন একাকার হয়ে গেল তখনই নিষেধপ্রাপ্ত নাগাদিত্য আবিষ্কার করেছেন যুবতী সুহারমতীকে: 'সেই নির্জন নিকুঞ্জে সেই সুন্দরী রমণী-মূর্তি বনদেবীর মত তাঁহার চক্ষে প্রতিভাত হইতে লাগিল। হরিতাচার্যের কথা—রানীর কথা— তাঁহার মনে পড়িয়া গেল, তিনি মনে মনে বলিলেন— ভালবাসিবার সামগ্রী বটে।' লেখিকা সুকৌশলে নাগাদিত্য ও সুহারমতীর এই হৃদয়-জাগরণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁদের প্রথম সাক্ষাৎকার যেমন কালিদাসের বিখ্যাত নাটককে স্মরণ করিয়ে দেয় তেমনি

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদের মধ্যেস্থিত সুহারমতীর অনুভাব ও অনুকৃতিসমূহ (mimesis) পাঠকালে প্রাচীন সাহিত্যের স্মরণীয় অধ্যায়গুলির কথা মনে পড়ে ; এক্ষেত্রে লেখিকার মৌলিকতার পরিচয় না থাকলেও একটি প্রসঙ্গে রমণীহৃদয়ের সহজাত ভাবনা ও বোধ যেন সমর্পিত হয়েছে মনে হয় : 'পাহাড়ের একটি অংশ হইতে জল চুঁয়াইয়া এই নিভৃত স্থানে একটি ক্ষুদ্র জলাশয় হইয়াছে, বালিকা সেই জলাশয়ের তীরে আসিয়া বসিল ; জলাশয়ের স্ফটিক জলে তাহার মুখখানি প্রতিবিম্বিত হইল। তাহার এলোচুলের রাশি মুখের আশেপাশে পড়িয়া তাহার চোখ ঢাকিয়া দিতেছিল, বালিকার কি মনে হইল কে জানে, সে হাতে পাকাইয়া সেই ঘন চুলের রাশ একরকম করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। অন্য সময় কেহ তাহার চুল বাঁধিয়া দিতে আসিলে সে ভারী বিরক্ত হইত ;···কিন্তু আজ বালিকা চুল বাঁধিয়া মাটির একটা টিপ গড়িয়া কপালে পরিল, দুইটা বাবলার ফুল তুলিয়া কানে দিল—দিয়া জলে মুখ দেখিতে লাগিল ; কি জানি দেখিতে দেখিতে কি মনে হইল, আপন মনে বলিল,—সুন্দরী! ছি, এই বুঝি সুন্দর! বলিয়া টিপটা মুছিয়া বাবলা দুইটা খুলিয়া ফেলিল, চুলগুলি এলাইয়া দিয়া চুপ করিয়া জলাশয়ের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।' বয়ঃসন্ধির রহস্যময়তা তার হৃদয়কে স্পর্শ করেছে ; অকারণ ব্যথায় ভারাক্রান্ত অথচ আত্ম-আবিষ্কারের আকূতিতে উল্লসিত সেই হৃদয় বিশালতা লাভ করেছে ; শুধু অকারণ পুলক ও বেদনায় সিঞ্চিত হয়ে সুহারমতী যৌবনে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে – এই সহৃদয়হৃদয়গ্রাহ্য অন্তরঙ্গ বর্ণনার মধ্যে তার প্রমাণ রয়েছে। মহিলাগণের সাহিত্যের মধ্যে নারীহৃদয়ের সম্যক প্রতিফলন কি পরিমাণ যথার্থ হয়ে উঠতে পারে বর্তমান অংশটি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। স্বর্ণকুমারীর সাহিত্যের মধ্যে— কি কবিতায় কি গল্পে-নাটকে-উপন্যাসে নারীজীবনের মর্মকথাগুলির সন্ধান পাওয়া যায় প্রভূত পরিমাণে। স্রষ্টীরূপে আপনার সৃষ্ট স্ত্রীচরিত্রের আশা-আনন্দ-বেদনানুভূতির আস্বাদন-পরিচয় আমাদের সাহিত্যে খুব বেশী মেলে না, স্বর্ণকুমারী তাঁর আপনার যুগে এবং পরবর্তী কালের মধ্যেও এদিক থেকে অনতিক্রম্য ছিলেন। বর্তমান উপন্যাসে কেবল সুহার নয়, রানী সেমন্তী এবং পরিচারিকা ও অন্তঃপুরিকাগণের যে চমৎকার চিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন তা কেবল সম্ভব হয়েছে নারীরূপে নারীকে আবিষ্কার করার দুর্লভ সামর্থ্য থেকে ; এক্ষেত্রে মুখ্য বা গৌণ প্রধান বা পার্শ্বের কোনো প্রভেদ নেই।

চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশে লেখিকার কৃতিত্ব ও সাফল্য অসামান্য। 'দ্বিধায় জড়িত পদে কম্প্রবক্ষে নম্রনেত্রপাতে স্মিতহাস্যে'-মণ্ডিত সুহারমতীর যে পরিচয় আগে দেওয়া হল তার মধ্যে তার চরিত্রের সূক্ষ্ম দোলাচলতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রাজার প্রতি তার নিভৃত মনের আকর্ষণ এবং হীনমন্যতাবোধের দোটানায় অন্তর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে ; ক্ষেত্তিয়ার অকুণ্ঠ অবিরাম প্রণয়নিবেদনে বিরক্ত সুহারমতী নাগাদিত্যকে বনলতার মত নিবিড়ভাবে আশ্রয়

করেছে, অথচ রাজার দৃপ্ত ভঙ্গি ও মহিমা-মর্যাদার কথা চিন্তায় ভীরুতাবশত তার উদ্দীপ্ত চিত্ত এবং প্রেমবহ্নি নির্বাণোন্মুখ। এই দ্বন্দ্ব তাকে পরিণামে অমোঘভাবে রাজার প্রতি আকৃষ্ট করেছে, কারণ তার ভীরুতা ছদ্ম-প্রীতিমণ্ডিত; রাজার মহিমা আবিষ্কারে সে যেমন কুণ্ঠিত তেমনি অভিভূতও বটে, এ তার বিরূপতা নয়। সুহারের বৈপরীত্যে লেখিকা যে সূর্যমুখীকে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর নাম সেমন্তী—নাগাদিত্যের রাজ্যশ্রী। রানী সেমন্তীর গভীর প্রেম ও পতিভক্তির অন্তরালে সংশয়-অবিশ্বাসের ফল্গুস্রোতের নিরন্তর প্রবাহ আবিষ্কৃত হয়েছে। সুগভীর ভালবাসার পেছনে উঁকি দিয়ে থাকে হারাই-হারাই মনোভাব, এই পেয়ে-হারাবার সম্ভাব্য অথচ কাল্পনিক বেদনায় ভালবাসা শিহরিত হয়—'প্রেমবৈচিত্ত্যহেতু বিরহ করি ভাবে'; নারীমনের সহজ সংস্কারে স্বর্ণকুমারী তাকে অনুভব করেছেন। অন্তঃপুরিকাগণের ইঙ্গিতগর্ভ সংলাপে মুগ্ধ সংশয় জাগ্রত হয়ে উঠেছে, আর তাই রাজার সুন্দর কার্যকলাপ ও আচরণাদিকে রানী অর্থপূর্ণ ও বিকৃত ভাবনারঞ্জিত বলে মনে করেছেন। বিশ্বাস ও সংশয় প্রীতি ও আস্থাহীনতায় দোদুল্যমান অসহায় রমণীচিত্তের চিত্রাঙ্কনে লেখিকার এই দক্ষতা অসামান্য। পুরুষ নাগাদিত্যের মধ্যেও একই প্রবৃত্তির লীলাকে নিরীক্ষণ করেছেন লেখিকা। সহধর্মিণীর প্রতি কর্তব্যবোধ এবং সুহারের প্রতি রূপমোহসঞ্জাত অনুরাগের আকর্ষণ-বিকর্ষণে তাঁর হৃদয় ক্ষতবিক্ষত, পরিণামেও এই জটিল জাল থেকে তিনি মুক্তিলাভ করতে পারলেন না।

এই প্রধান চরিত্রত্রয়ের অন্তর্দ্বন্দ্বের গতিপথ প্রায় এক হলেও জুমিয়ার দ্বন্দ্ব স্বতন্ত্র ও বিচিত্র। প্রতিশোধবাসনায় উন্মত্তপ্রায় পিতা জঙ্গুর নির্দেশে নাগাদিত্যের বিরুদ্ধে সে এক-একবার অশান্ত হয়ে উঠে, পরমুহূর্তেই সে নির্বাপিত হয়ে যায় অসহায় পুত্রতুল্য রাজার সমদর্শিতা ও ভীলপ্রীতি দেখে। প্রধান তিনটি চরিত্রের পাশে তার এই বেদনার্ত রক্তাক্ত হৃদয়ের আলেখ্যটি অতুলনীয়; দুঃখভোগের মহিমায় সেও সাধারণের অতীত হয়ে পড়েছে, তাই তার অসহায়তা বেদনাবোধ পাঠকের হৃদয়কে স্পর্শ করে বিশাল আকার ধারণ করেছে। জঙ্গুর নিকট থেকে যখন সে জানতে পারল রাজপুতেরাই ভীলদের পরম শত্রু এবং গুহা বা গ্রহাদিত্যের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে নাগাদিত্যের রক্তে তখন 'জুমিয়ার হৃদয় সহসা কাঁপিয়া উঠিল—মুখ সহসা বিবর্ণ পাংশু হইয়া গেল। মহারাজ নাগাদিত্য যিনি জুমিয়াকে এত ভালবাসেন, যাঁহাকে বন্ধু বলিয়া জুমিয়া আলিঙ্গন করিয়াছে তিনিই তাহার প্রতিশোধের পাত্র। খানিকক্ষণ জুমিয়ার কথা বাহির হইল না, ······।' এই নির্বাক নির্জীব স্তম্ভিত জুমিয়ার চিত্রই লেখিকা উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করেছেন।

॥৪॥ বিদ্রোহ উপন্যাসের আলোচনার উপসংহারে একটি প্রসঙ্গ একান্ত আবশ্যিক। প্রবাদতুল্য মন্তব্যবাক্য রচনায় স্বর্ণকুমারীর যে কৃতিত্ব ছিল তার উৎকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় বিদ্রোহ উপন্যাসের মধ্যে। এ বিষয়ে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সার্থক উত্তরসূরী। চিন্তার স্বাতন্ত্র্যে ও জীবনদর্শনের উপলব্ধিতে সমৃদ্ধ মন্তব্যবাক্যগুলির কয়েকটিমাত্র উদ্ধৃত হল:

১. অন্য সৈনিকেরা এতক্ষণ নিজের পরিশ্রমে তাহারই যেন যশোদ্বার উন্মুক্ত করিয়া রাখিতেছিল—তাহাদের হাতের টানে টানে ঐ শিথিলমূল বৃক্ষ আরও শিথিলমূল হইয়া ভীলের হস্তে উঠিবার জন্যই যেন অপেক্ষা করিতেছিল। সংসারে অনবরত এইরূপই হইতেছে। শত ক্ষুদ্রের প্রাণপণ পরিশ্রম কাহারও চক্ষে পড়ে না, তাহার স্থলে একজন ভাগ্যবানকেই সকলে দেখিতে পায়। অদৃষ্ট শতজনের ধন দিয়া আপনার এক প্রিয় ব্যক্তিকে পোষণ করে।—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শেষাংশ। ২. লোকে অনেক সময় নিতান্ত কেবল একটা গায়ের জ্বালায় একজনের সম্বন্ধে এমনতর সব বাজে কথা বলিয়া বসে যাহার মূল কেবল বক্তার মনের মধ্যে ছাড়া অর কোথাও খুঁজিয়া মেলে না।—অষ্টম পরিচ্ছেদের প্রারম্ভ। ৩. পৃথিবীর যখন যে দেশে কোন মহৎ কার্যসিদ্ধি হয় প্রায় একজনের দ্বারাই হইয়া থাকে। দেশের অন্তর্নিহিত সমগ্র রুদ্ধ শক্তি দিয়া সময় যে ক্ষুদ্র একজনকে গঠিত করিয়া তোলে তাহার শক্তি তরঙ্গিত হইয়া দেশের শত সহস্রকে সঞ্চালিত অনুপ্রাণিত করে।—দ্বাদশ পরিচ্ছেদের প্রারম্ভ। ৪. কথা আছে, প্রণয়ী অন্ধ, যাহাকে ভালবাসে তাহাকে দেখিয়া ভালবাসে না। কিন্তু প্রণয়ীর দিব্যচক্ষু ইহাই ঠিক, সহজে অন্যে যাহা দেখিতে পায় না প্রণয়ীর নিকট তাহা সুস্পষ্ট।—ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদের প্রারম্ভ। ৫. যাঁহারা বলেন, 'কামিনী কোমল প্রাণে সহে না যাতনা', তাঁহারা ভুল কথা বলেন। ঠিক বিপরীত। যে যত কোমল তাহার সহিবার শক্তি তত অধিক।—চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদের প্রারম্ভ। ৬. যাহা সত্য যাহা সুন্দর তাহাই মহিমময়, সর্বত্র তাহার মাহাত্ম্য তাহার সমাদর, ইহা সত্য কিন্তু এ সত্য অনন্তের পক্ষে যেমন অকাট্য সত্য সংসারের পক্ষে তেমন নহে। কত সত্য সংসার ধারণ করিতে পারে না, কত সৌন্দর্য অনাদরে ম্লান হইয়া যায়।—একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদের প্রারম্ভ।

শেষের পাঁচটি উদাহরণ একটু অন্যধরণের ; প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদের আরম্ভেই লেখিকা এই জাতীয় সিদ্ধান্তসম্মত তত্ত্বচিন্তার অবতারণা করে বক্ষ্যমাণ ও উদ্দিষ্ট বিষয়ে উপনীত হয়েছেন। প্রথমটিতে এর বিপরীত পন্থা অবলম্বিত, একটি বিশেষ ঘটনাকে আশ্রয় করে সাধারণ তত্ত্বচর্বণা বা অনায়াস তত্ত্বনিষ্কাশন। এইসকল আলোচনাকালে গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কারের কথা মনে পড়া স্বাভাবিক। এখানেও সামান্যের (general) দ্বারা বিশেষ (particular) এবং বিশেষের দ্বারা সামান্য সমর্থিত, এবং এভাবেই গূঢ়ার্থপ্রতীতির উদ্গম ; সমর্থিত বা সমর্থ্য এবং সমর্থকের এই গূঢ়ার্থপ্রতীতিবিষয়ক সম্পর্ক উক্তিগুলির মধ্যে স্পষ্টীভূত। একে বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাবাশ্রয়ী সাদৃশ্যমূলক দৃষ্টান্তও বলা চলে না, সাদৃশ্য অপেক্ষা বিশুদ্ধ তত্ত্বপ্রীতি ও নীতিনিষ্কাশনের প্রয়াস একক্ষেত্রে অধিকতর প্রকট। ফলকথা বিশেষের দ্বারা সামান্য বা সামান্যের দ্বারা বিশেষের সমর্থন ঘটায় ফলে এবং সাদৃশ্যের চেয়ে নীতি ও

তত্ত্বের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য এসকল সংক্ষিপ্তদেহী মন্তব্যবাক্যগুলির মধ্যে জীবনদর্শনও পুঞ্জীভূত, এবং এতদুভয়কে সংহত শ্রীদানের ইচ্ছা থেকেই এই রীতির উদ্ভব।

হুগলীর ইমামবাড়ী

॥১॥ হুগলীর ইমামবাড়ী ভারতী পত্রিকার ১২৯১ সালের পৌষ সংখ্যা থেকে ১২৯৩ সালের বৈশাখ সংখ্যার মধ্যে প্রকাশিত হয়; ১২৯২ সালের বৈশাখ ও ১২৯৩ সালের আশ্বিন সংখ্যার ভারতী এবং ভারতী ও বালক পত্রিকায় উক্ত উপন্যাসের কোনো অংশ প্রকাশিত হয়নি। ১২৯১ সালের পৌষ মাসের ভারতীতে উপন্যাসটির প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হয়, আবার পরবর্তী সংখ্যায় অর্থাৎ মাঘ মাসে ঐ প্রথম দুটি পরিচ্ছেদ মুদ্রিত হয়েছিল। এর কারণস্বরূপ ৪৫০ পৃষ্ঠার পাদটীকায় বলা হয়েছে, 'গত পৌষ মাসের ভারতীতে প্রকাশিত হুগলীর ইমামবাড়ীর প্রথম দুইটি পরিচ্ছেদে একটি বড় ভুল হইয়া গিয়াছে। যাঁহার নাম মহম্মদ মহসীন হওয়া উচিত তাঁহার অন্য নাম হইয়া আর একজন উক্ত নামে অভিহিত হইয়াছেন। ইহাতে পাঠকদিগের নিকট সাতিশয় লজ্জিত ও অপরাধী হইয়া পড়িয়াছি। এই ভুল শোধরাইবার জন্য ভারতীতে সেই দুইটি পরিচ্ছেদ পুনঃ প্রকাশ করা যাইতেছে। এই সুযোগে একটি পরিচ্ছেদ নূতন বাড়াইয়া দিলাম।' পৌষের করীমকে মাঘে মহম্মদ মহসীন এবং পূর্বের মহম্মদ মসীমকে পরে অর্থাৎ মাঘ সংখ্যায় সালাউদ্দিন নাম দেওয়া হয়েছে। শুধু এই নাম-পরিবর্তন ব্যতীত আর বিশেষ কিছু করা হয়নি কারণ করীম ও মসীমের মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল মহসীন ও সালাউদ্দীনের মধ্যে সেই সম্পর্কই রক্ষিত।

সম্পাদিকা-লেখিকা যে পরিচ্ছেদটি বাড়িয়ে দেওয়ার কথা বলেছেন সে সম্বন্ধে এবার বলা যায়। আমরা এক্ষেত্রে গ্রন্থের প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদের কথা উল্লেখ করব। ঐ পরিচ্ছেদত্রয়ের সঙ্গে ১২৯১ সালের মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হুগলীর ইমামবাড়ীর প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদের নিকটসাদৃশ্য আছে। গ্রন্থের প্রথম তিন পরিচ্ছেদের নাম যথাক্রমে সন্ন্যাসী, ছবি ও অলঙ্কার; মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত পরিচ্ছেদগুলির নামও এদের অনুরূপ। কিন্তু পৌষ সংখ্যার প্রথম দুটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম যথাক্রমে ছবি ও অলঙ্কার। অর্থাৎ গ্রন্থের বা পত্রিকার প্রথম পরিচ্ছেদটি পৌষে ছিল না, এই সন্ন্যাসী-শীর্ষক অধ্যায়টি 'নূতন বাড়াইয়া' দেওয়া হয়েছিল। তবে একথাও ঠিক পৌষের প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম বাক্যটি পরবর্তীকালের সন্ন্যাসী-শীর্ষক পরিচ্ছেদের প্রথম বাক্যরূপে ঈষৎ রূপান্তরিত হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে, নীচে তার যথাযথ তালিকাটি দেওয়া হল।

১. পৌষ ১২৯১, প্রথম পরিচ্ছেদ—ছবি: দেড়শত বৎসরেরও পূর্বেকার কথা হইতেছে।

২. মাঘ ১২৯১, প্রথম পরিচ্ছেদ— সন্ন্যাসী : দেড়শত বৎসরেরও আগেকার কথা হইতেছে।

৩. বসুমতী সংস্করণের গ্রন্থাবলী দ্বিতীয় ভাগ, প্রথম পরিচ্ছেদ— সন্ন্যাসী : অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের কথা হইতেছে।

একথা নিশ্চয় বলা যায় মুদ্রিত গ্রন্থে লেখিকা কালনির্দেশের ব্যাপারে অনেক বেশী স্পষ্টতার আশ্রয় নিয়েছেন। সাময়িকপত্রের কালনির্দেশ অনেক অস্বচ্ছ কারণ প্রকাশকাল জানা না থাকলে ঐ কালনির্ণয় করা যায় না। প্রসঙ্গত বলা যায় যে উভয় প্রকারের কালনির্দেশের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। তাছাড়া গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে সংলাপে প্রায় সর্বত্র চলিতরীতি প্রযুক্ত হয়েছে কিন্তু সাময়িকপত্রের সর্বত্র এই নিয়ম রক্ষিত হয়নি ; গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদের সংলাপে সাধুরীতি স্বীকৃত হয়েছিল।

আর একটি দিক থেকে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত ও গ্রন্থরূপে মুদ্রিত হুগলীর ইমামবাড়ীর মধ্যে পার্থক্য আছে। সাময়িকপত্রে প্রকাশিত উপন্যাসের পরিচ্ছেদ সংখ্যা মোট ছত্রিশ— 'উপসংহার'কেও একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, যদিও মূল গ্রন্থের সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই কারণ এর মধ্যে লেখিকা কয়েকটি তথ্যনির্দেশ করেছেন। সে যা হোক না কেন সাময়িকপত্রের এই পরিচ্ছেদ সংখ্যা হওয়া উচিত 'উপসংহার'সহ মোট সাঁইত্রিশ ; কারণ ১২৯১ সালের চৈত্র সংখ্যা পর্যন্ত মোট পাঁচটি অধ্যায় প্রকাশিত, এরপর ১২৯২ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত পরিচ্ছেদের ভুল হিসাব দেওয়া হয়েছে। আবার পত্রিকার পরিচ্ছেদ উপসংহারসহ মোট সাঁইত্রিশ হলেও গ্রন্থের পরিচ্ছেদ সংখ্যা মোট একচল্লিশ ; অর্থাৎ গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে উপন্যাসের চারিটি পরিচ্ছেদ বাড়ান হয়েছিল। গ্রন্থের উনত্রিশ সংখ্যক পরিচ্ছেদ সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়নি ; আর ১২৯৩ সালের ভারতী ও বালক পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত চৌত্রিশ সংখ্যক পরিচ্ছেদটি (প্রকৃত হিসাবে পঁয়ত্রিশ) অবলম্বনে গ্রন্থের সাঁইত্রিশ থেকে উনচল্লিশ পরিচ্ছেদ রচিত হয়। সাময়িকপত্রের পঁয়ত্রিশ সংখ্যক (প্রকৃত হিসাবে ছত্রিশ) অধ্যায়টির সঙ্গে গ্রন্থের চল্লিশতম অধ্যায়ের সাদৃশ্য থাকলেও শেষোক্ত অংশটি অনেক বেশী সংক্ষিপ্ত, সে তুলনায় সাময়িকপত্রের পরিচ্ছেদটি বিস্তৃত এবং অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। আগেই বলা হয়েছে উপন্যাসের পরিচ্ছেদগুলির শিরোনাম পত্রিকায় এবং গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু সাময়িকপত্রে প্রকাশিত সপ্তদশ থেকে বিংশ পরিচ্ছেদের কোনো শিরোনাম নেই, এছাড়া আরও কয়েকটি পরিচ্ছেদের নাম পত্রিকায় ছিল না।

যা হোক সাময়িকপত্রে প্রকাশের অল্পকাল পরে ১২৯৪ সালের পৌষ মাসে (৮ জানুয়ারি ১৮৮৮) হুগলীর ইমামবাড়ী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির উপহারপত্র নীচে দেওয়া যেতে পারে :

তোমায়,
সংসারের সুখদুঃখ, সংসারের হাসি,
সংসারের মোহমায়া ভালবাসাবাসি,
এ সব চাহ না কিছু ঊর্ধ্বে আছ তার,
করুণ-নয়নে তবু কেন অশ্রুধার!
ও অশ্রু নহে ত সুখে অভিনব আশ,
ও অশ্রু নহে ত তীব্র বাসনা-পিয়াস,
বিমল করুণা-ধারা ঐ অশ্রুজল,
দুঃখের জগতে করে আশীষ মঙ্গল,
ও করুণ আঁখি তুলে চাহ একবার,
জন্ম-জন্মান্তের স্মৃতি— জীবনমরণ-প্রীতি—
এনেছি চরণে দেব, দিতে উপহার।

॥২॥ গ্রন্থের পূর্বকথিত উপসংহারে লেখিকা উপন্যাসটির উপাদান সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলেছেন, 'উপসংহারে আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের ইংরাজী বক্তৃতার সার অবলম্বনে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র মহম্মদ মহসীনের যে বাঙ্গালা জীবন-চরিত লিখিয়াছেন, "হুগলীর ইমামবাড়ী" লিখিবার সময় আমরা সেই বইখানি হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি। তবে পাঠকগণ আমাদের আখ্যায়িকার সহিত ঐ জীবন-চরিতের আখ্যায়িকার অনেক স্থলে অমিল দেখিতে পাইবেন। উক্ত জীবনচরিতে দেখা যায় যে, মুন্না বিবাহিত হইয়া যতদিন সধবা ছিলেন, স্বামীর সহিত বেশ সুখে কালাতিপাত করিয়াছিলেন, পরে বিধবা হইয়া পুত্রাদি না থাকায় মহম্মদকে বিষয়-সম্পত্তির অভিভাবক করেন ও মৃত্যুকালে তাঁহাকেই সমস্ত দান করিয়া যান। কিন্তু হুগলীনিবাসী একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট আমরা অন্যরূপ গল্প শুনিয়াছি। তিনি বলেন—"মুন্নার স্বামী বড় বিলাসপ্রিয় ছিলেন, সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া তিনি সমস্ত বিষয় উড়াইয়া দিতে লাগিলেন, মতাহার তাহাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া কন্যাকে শেষ দুর্দশা হইতে বাঁচাইবার জন্য কিছু সম্পত্তি লুকাইয়া রাখেন এবং মৃত্যুকালে তাবিচের ভিতর করিয়া দানপত্ররূপে তাহা কন্যাকে দিয়া যান। পিতার মৃত্যুর পরে সত্যই যখন মুন্নার এমন অবস্থা আসিল যে, তাহার ভিক্ষা করিতে হইল—তখন দৈবক্রমে একদিন হঠাৎ তাবিচের ভিতর হইতে সেই দানপত্র বাহির হইয়া পড়ে। কিন্তু তখন তাহার মন এতই বৈরাগ্যপূর্ণ হইয়াছে যে, সে তাহা গ্রহণ না করিয়া ভ্রাতাকে দান করিল। মসীন তাহা লইলেন বটে, কিন্তু তাহা ধর্মকার্যের জন্য দান করিয়া তিনিও ভগিনীর ন্যায় ফকিরবেশে জীবনযাপন করিতে লাগিলেন।" এই দুইটি গল্পের মধ্যে কোনটি

সত্য, তাহা জানি না, তবে শেষেরটিই না কি জনপ্রবাদ, তাই আমরা হুগলীর ইমামবাড়ীতে শেষের গল্পটিই বদল-সদল করিয়া গ্রহণ করিয়াছি।'

যে পুস্তিকাটির কথা লেখিকা উল্লেখ করেছেন তা হল 'মহম্মদ মহসীনের / জীবনচরিত। / শ্রীযুক্তবাবু মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের / ইংরাজী বক্তৃতার সার। / শ্রীপ্রমথনাথ মিত্র কর্তৃক / অনুবাদিত ও প্রকাশিত / চুঁচুড়া সাধারণী যন্ত্রে / শ্রীনন্দলাল বসু কর্তৃক মুদ্রিত। / ১৮৮০।' উক্ত পুস্তিকায় পরিবেশিত একটি পত্রবং ভূমিকার মধ্যে পাওয়া যায় যে মহেন্দ্রচন্দ্র ১৮৮০ খৃস্টাব্দের ৯ এপ্রিল হুগলী ইনস্টিটিউট নামক সভায় মহম্মদ মুহসীন সম্পর্কে একটি লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন ; গ্রন্থটি তারই অনুবাদ তবে স্থানে স্থানে 'ভাষার ও ভাবের পরিবর্তন' যে করা হয়েছে তারও উল্লেখ আছে। উক্ত গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'আগা মতাহার জীবনের শেষ ভাগে সুখী হইতে পারেন নাই।...সুখের মধ্যে তাঁহার প্রিয়তমা কন্যা মন্নুজান্ খানম্ তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি করিত।...কথিত আছে যে তিনি কন্যাকে একটি তাবিজ দান করিয়াছিলেন এবং বলিয়া দিয়াছিলেন যে তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে ঐ তাবিজ ভগ্ন না করা হয়। পরে আগা মতাহারের মৃত্যু হইলে উক্ত অলঙ্কার ভগ্ন করিয়া তাহা হইতে একটি দানপত্র বাহির হয়। ঐ দানপত্র দাতার নিজের স্বাক্ষর ও মোহর দ্বারা আবদ্ধ। স্বামীর এইরূপ আচরণে মতাহার-পত্নী অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া হুগলীনিবাসী হাজি ফয়িজুল্লা নামক এক ব্যক্তিকে বিবাহ করিলেন।...এই দম্পতি হইতে হাজি মহম্মদ মহসীনের জন্ম। তিনি ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে এই ধরাধামে জন্মগ্রহণ করেন। মন্নুজান্ খানম্ হইতে তিনি আট বৎসরের ছোট।...আগা মতাহার মৃত্যুকালে বলিয়া যান যে তাঁহার কন্যাকে তাঁহার ভাগিনেয় মিরজা সালাউদ্দীন মহম্মদ খাঁর সহিত যেন পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করা হয়। তদনুসারে তাঁহার মৃত্যুর পর মিরজা সালাউদ্দীন পারস্য দেশ হইতে আগমন করিয়া মন্নুজান্ খানমকে বিবাহ করিলেন। এই দম্পতি সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদিগের সুমহৎ দানাদিকার্য দ্বারা নগরবাসী সকলেরই প্রিয় হইয়া উঠিলেন।...মহম্মদ মহসীনের জীবন-বৃত্তান্ত আর একপ্রকার শুনা গিয়াছে। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, মহম্মদ মহসীন মুর্শিদাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তথায় তাঁহার পিতার মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার মাতা হুগলীতে আসিয়া আগা মতাহারের পাণিগ্রহণ করেন। এই দম্পতি হইতে মন্নুজান্ খানমের উৎপত্তি।...মহম্মদ মহসীন যৎকালে এই সকল দেশভ্রমণকার্যে নিযুক্ত ছিলেন মন্নুজান্ খানমের বিষয়সম্পত্তি সেইসময়ে রক্ষণাবেক্ষণ-অভাবে ক্রমশঃ বিশৃঙ্খল হইতে লাগিল। তাঁহার পতি মিরজা সালাউদ্দীন মহম্মদ খাঁ অল্পবয়সেই মানবলীলা সম্বরণ করেন। মন্নুজান্ খানম্ বৈধব্যদশায় বৈপিতৃক ভ্রাতা মহম্মদ মহসীনের স্বদেশ প্রত্যাগমন জন্য প্রতীক্ষা

করিতে লাগিলেন। বাটী আসিবার জন্য অত্যন্ত জিদ করিয়া বলিয়া পাঠান; মহম্মদ মহসীন অগত্যা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন।'[৬০]

প্রথমেই বলা প্রয়োজন প্রমথনাথের মহসীন ও মন্নুজান্ স্বর্ণকুমারীর উপন্যাসে যথাক্রমে মসীন ও মুন্নায় পরিণত। তাছাড়া এই দুই প্রধান চরিত্র সম্পর্কে লেখিকা উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বলেছেন, 'মহম্মদ মসীন ও মুন্না দুজনে ভ্রাতাভগিনী। তবে ঠিক আপনার ভাইবোন নহেন। মুন্নার মাতার দুই বিবাহ। প্রথম বিবাহের সন্তান মসীন। তাহার পর তিনি বিধবা হইয়া ঐ সন্তানটিকে লইয়া আবার বিবাহ করেন। এই দ্বিতীয় বিবাহে মুন্নার জন্ম। মসীন ও মুন্না বরাবর এক বাড়ীতেই থাকেন, ইহারা দুইজনে চারি বৎসরের মাত্র ছোট-বড়, সেইজন্য ইহাদের মধ্যে মান্যের ব্যবধান নাই, সমকক্ষভাবেই ইহারা পরস্পরকে ভালবাসেন।' লেখিকা প্রমথনাথের দ্বিতীয় জনশ্রুতি অবলম্বন করেছেন ঠিকই তবে বয়সের ব্যবধান উল্লেখে তিনি কারও অনুসরণ করেননি। এরূপ স্বাধীনতা তাঁর ছিল কারণ এই ব্যাপারে তাঁর পূর্ববর্তী কেউই সঠিক কিছু বলতে পারেননি, বলা সম্ভবও নয় যেহেতু সকলেরই উৎস জনশ্রুতি। পরবর্তী কালের জনৈক লেখক এক্ষেত্রে চোদ্দ বৎসর বয়সের ব্যবধানের কথা উল্লেখ করেছেন[৬১] যা বিশ্বাস করা শক্ত। বর্তমান উপন্যাসের ঘটনাবলীর কথা মনে রাখলে স্বর্ণকুমারী-প্রদত্ত চার বৎসরের ব্যবধানকে স্বাভাবিক ও সঙ্গত বলে মনে হয়। আরও বলা যায় প্রমথনাথ মুন্নার স্বামী সালাউদ্দীনকে সচ্চরিত্র গুণীরূপে অঙ্কন করেছেন। যদিও উপন্যাসে এর ব্যতিক্রম ও বৈপরীত্য লক্ষিত হয় তথাপি লেখিকা স্বানুকূলে যে কথা বলেছেন তা স্বীকার করা চলে। প্রমথনাথ ও স্বর্ণকুমারী উভয়েই এক্ষেত্রে কিংবদন্তীর আশ্রয় নিয়েছেন এবং সেই উভয় জনশ্রুতির মধ্যে প্রবল অসঙ্গতি থাকায় দুইজনে যে পৃথক পৃথক সিদ্ধান্ত নেবেন তা খুবই স্বাভাবিক। স্বর্ণকুমারী প্রমথনাথের মত (অবশ্য প্রমথনাথের উৎস হল মহেন্দ্রচন্দ্রের ইংরেজি বক্তৃতা) নিশ্চয়ই কিংবদন্তীর আশ্রয় নিতে পারেন তাঁর সিদ্ধান্ত যাই হোক না কেন। আবার স্বর্ণকুমারীর সপক্ষে বলা যায় যে প্রমথনাথের গ্রন্থেই পাওয়া যায়—সেকালের হুগলী বিলাসপ্রিয় ব্যক্তিগণের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়। এই পরিবেশে ধনীর গৃহজামাতা সালাউদ্দীনের সুরাসক্তি ও চরিত্রহীনতা আদৌ অস্বাভাবিক নয়, বিশেষত নবাব খাঁজাহান খানের মত উন্মার্গগামীর পরিচয়ও প্রমথনাথের গ্রন্থে পাওয়া যায়। বরং বলা ভাল এই দূষিত পরিবেশে মুন্না ও মহসীন বিশেষ ব্যতিক্রমস্বরূপ। সেদিক থেকে স্বর্ণকুমারীর সালাউদ্দীন চরিত্রের পরিকল্পনাকে আদৌ অসঙ্গত মনে হয় না বিশেষত উপন্যাসের

৬০ মহম্মদ মহসীনের জীবনচরিত, প্রমথনাথ মিত্র কর্তৃক অনূদিত ১৮৮০, পৃ ৭-১২।

৬১ বিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, হাজি মহম্মদ মহসীন, ১৩২৯, পৃ ৮।

প্রয়োজনীয়তা এই পরিকল্পনা থেকে সিদ্ধ হয়েছে। মুন্নার অসহায়তা যে কারুণ্য সৃষ্টি করেছে তার জন্য সালাউদ্দীনের হৃদয়হীন আচরণ বিশেষভাবে দায়ী ছিল, লেখিকা তাই অনুকূল জনশ্রুতিকে স্বীকার করেছেন।

লেখিকা অন্য যেসকল ক্ষেত্রে আকরগ্রন্থের প্রসঙ্গের পরিবর্তন করেছেন এবারে সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে। মহেন্দ্রনাথের বক্তৃতা থেকে বেশ বোঝা যায় মন্নুজানের বাল্যকালে পিতা মতাহারের মৃত্যু হয়। কিন্তু উপন্যাসের প্রথমে যে মুন্নার পরিচয় পাওয়া যায় তার বয়স বাইশ, অথচ উপন্যাসের শেষদিকে ত্রিংশ পরিচ্ছেদে মতাহার ও মহসীনের সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গ আছে। মতাহারের সন্ধানে মহসীনের তৎপরতা এবং উভয়ের সাক্ষাৎকার গ্রন্থের ঊনত্রিংশ ও ত্রিংশ পরিচ্ছেদে আছে; এই দুটি পরিচ্ছেদ সাময়িকপত্রে ছিল না। তাই বলা যায়, গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে লেখিকা মতাহারের উপস্থিতি অনুভব করেছেন। যদিও ব্যাপারটি অনৈতিহাসিক তথাপি সঙ্গতি রক্ষিত হয়েছিল বলে একে সুপরিচিত কালবিরোধ-দোষ নিশ্চয় বলা যায় না। ঐ পরিচ্ছেদ দুটির মধ্যে লেখকের ভৌগোলিক জ্ঞান, মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে পরিচয়ের নিবিড়তা ধরা পড়েছে; তদুপরি মতাহারের বাৎসল্য এবং মহসীনের পিতৃভক্তি পরিচ্ছেদদুটিকে স্বর্গীয় সৌরভে মার্জিত করে দিয়েছে। অর্থাৎ মতাহার চরিত্র অবতারণায় লেখিকা বৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। উক্ত ত্রিংশ পরিচ্ছেদে অভাগিনী দুহিতার প্রতি অনুতপ্ত পিতার স্নেহার্দ্র চিত্তের পরিচয় পাওয়া যায়, মুমূর্ষু মতাহার কর্তৃক মুন্নার জন্য মহম্মদ মহসীনকে একটি কবচ দেওয়ার ঘটনাও বর্তমান পরিচ্ছেদে আছে। মহম্মদ মহসীন কেবল তীর্থযাত্রার মানসে বিদেশভ্রমণে বহির্গত হননি, তার সঙ্গে গৃহত্যাগী উদাসীন পিতার অনুসন্ধানের বাসনাও যুক্ত ছিল। দেশভ্রমণ তীর্থদর্শন ও পিতৃ-অনুসন্ধান প্রভৃতি বিবিধ অভিপ্রায় একত্রিত হওয়ায় ঘটনাগত বৈচিত্র্য বৃদ্ধিলাভ করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের চতুর্থ পরিচ্ছেদে মতাহারের প্রথম জীবনের পরিচয় আছে, মুন্নার শৈশবকালে মাতৃবিয়োগ হয় এমন প্রসঙ্গও আছে। উপন্যাসের মধ্যে সেই হতভাগ্য রমণীর কোনো বিস্তৃত বিবরণ না থাকায় সবদিক থেকে ভালই হয়েছে; ফলে ঘটনার সংহতি ও একমুখিতা প্রবর্তিত। মতাহারের গৃহত্যাগের কারণ হিসাবে তীর্থদর্শনের উল্লেখ থাকলেও বিলাসী জামাতার হস্তে কন্যার নিগ্রহকে এক্ষেত্রে বড় করা হয়েছে। একমাত্র দুহিতার এই জীবনবিড়ম্বনা মতাহারকে অসহায় উদাসীন করে তুলেছিল।

উপন্যাসে বর্ণিত সন্ন্যাসী চরিত্র সম্ভবত জীবনচরিতের সীরাজি চরিত্র অবলম্বনে গঠিত। 'মহম্মদ মহসীনের প্রথম শিক্ষা হুগলীতে আরম্ভ হয়। সীরাজি নামে এক ব্যক্তি নানাদেশ পর্যটন করিয়া হুগলীতে আসিয়া বাস করেন। মহম্মদ মহসীন ও মন্নুজান্ খানম্ উভয়েই তাঁহার নিকট প্রথমতঃ বিদ্যাশিক্ষা করেন। সীরাজি নানা দেশের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া

বালক শিষ্যের চিত্ত উত্তেজিত করিয়াছিলেন।'[৩২] ইত্যাদি বর্ণনার মধ্যে পরহিতব্রতী সন্ন্যাসী-ফকিরের যে মহিমা ফুটে উঠেছিল লেখিকা তার সদ্ব্যবহার করেছেন। স্বামী-পরিত্যক্ত মুন্নাকে অত্যাচারী নবাব খাঁজাহান খাঁ বিবাহের প্রস্তাব করে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন, উপন্যাসে আরও পাওয়া যায় যে অতৃপ্ত বাসনা চরিতার্থ করার জন্য খাঁজাহান খাঁ গর্হিত কর্মে লিপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু গ্রন্থে কেবল আছে, 'একদিবস নবাব খাঁজাহান খাঁ মন্নুজান্ খানমের নিকটে বিবাহের প্রস্তাব করিয়া বলিয়া পাঠান। মন্নুজান্ খানম্ নবাবের সহিত বিবাহ করিতে অস্বীকার করিলেন এবং এই উত্তর দিলেন যে আমি এমন কোন লোকের সহধর্মিণী হইতে ইচ্ছা করি না যিনি আমার প্রেমাস্পদ না হইয়া আমার অর্থের ভোগী হইতে চাহেন।'[৩৩] এর প্রতিক্রিয়ার কোনো সংবাদ ঐ পুস্তিকায় পাওয়া যায় না।

মহসীন ভগিনীর সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন—পুস্তিকা ও উপন্যাস উভয়ত এর উল্লেখ আছে। উপন্যাসের পঞ্চম পরিচ্ছেদে মহসীনের ব্যায়ামশিক্ষা ও সঙ্গীতচর্চার যে কথা পাওয়া যায় পুস্তিকার নিম্নলিখিত দুটি প্রসঙ্গের মধ্যে তার সমর্থন লক্ষিত হয়:

১. শরীর পরিচালনা বিষয়ে তাঁহার (মহসীনের) বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল। নিজের শরীর সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ রাখিবার বিশেষ যত্ন করিতেন। তিনি তরবারি পরিচালন উত্তমরূপে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। নিয়মমত ব্যায়ামকার্য সম্পন্ন না করিয়া একদিনও অতিবাহিত করিতেন না। (পৃ ১০-১১)

২. মহম্মদ মহসীন সঙ্গীত আলাপে আনন্দ-উপভোগ করিতেন। শুনা গিয়াছে যে বৈকালে ও সন্ধ্যার পর তিনি বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে বসিয়া ভোলানাথ সিংহ নামক গায়কের গান শুনিতেন। ভোলানাথকে তিনি বড় ভালবাসিতেন। ভোলানাথের বাটী যশোহরে ছিল। (পৃ ২১)

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে উপন্যাসের মধ্যে উপর্যুক্ত গায়ক ভোলানাথ পার্শ্বসহচর চরিত্ররূপে পরিবেশিত হয়েছে; পঞ্চম পরিচ্ছেদের মহম্মদের প্রিয়সখা সাধারণ গায়ক ভোলানাথ চতুর্দশ পরিচ্ছেদের পর থেকে অন্যতম মুখ্য চরিত্রে পর্যবসিত। একেবারে প্রথম পরিচ্ছেদে বৃদ্ধা খঞ্জ ও অন্ধ এই তিনজনকে সহায়তাদানের যে ঘটনা বর্ণিত তার কোনো প্রত্যক্ষ সমর্থন পুস্তিকায় অবশ্য নেই, তবে অনুরূপ নানাবিধ কাহিনীর পরিচয় মহেন্দ্রনাথ ও প্রমথনাথ দিয়েছেন; পুস্তিকার চোদ্দ ও পনর পৃষ্ঠায় এরূপ একাধিক কাহিনী আছে। মহসীনের সহৃদয়তা দয়ার্দ্রতা ও পরহিতব্রতসাধনের মহৎ সঙ্কল্পের সঙ্গে উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনাবলীর একটি সুন্দর সঙ্গতি লক্ষ করা যায়।

৩২ মহম্মদ মহসীনের জীবনচরিত, পৃ ১০।

৩৩ ঐ পৃ ১৩।

॥৩॥ ক্রোড়পত্রের মধ্যে হুগলীর ইমামবাড়ী 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'রূপে অভিহিত। সাম্প্রতিক কালের জনৈক গবেষক বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনাকালে গ্রন্থটির উক্ত দাবী অস্বীকার করেও তাকে আলোচনার ক্ষেত্র থেকে বাদ দিতে পারেননি।[৬৪] অপর একজন সমালোচকের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য, 'হুগলীর ইমামবাড়ীকে লেখিকা ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিয়াছেন। ইহাকে বরং হাজি মহম্মদ মহসীনের উপাখ্যান বলা যাইতে পারে।'[৬৫] বিদগ্ধ সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থের মধ্যে হুগলীর ইমামবাড়ীকে ঐতিহাসিক উপন্যাসরূপে আলোচনা করেননি, গ্রন্থটি 'স্বর্ণকুমারী দেবীর সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাসের' অন্তর্ভুক্ত।[৬৬] প্রকৃতপ্রস্তাবে ঐতিহাসিক উপন্যাস ও সামাজিক বা পারিবারিক উপন্যাসের পার্থক্য স্পষ্টরূপে নির্দেশ করা কঠিন ব্যাপার। বর্তমান অতীত হলেই 'ইতি-হ-আস' হয়ে যায় সত্য, কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাসের যে অপরিহার্য নির্ভরযোগ্য উপাদান ইতিহাস তাকে বর্তমানরূপে অনুভব করেই লেখক এই শ্রেণীর গ্রন্থ রচনা করে থাকেন। হুগলীর ইমামবাড়ীকে ঐতিহাসিক উপন্যাসরূপে গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত উপর্যুক্ত দ্বিতীয় সমালোচক এইজাতীয় উপন্যাসের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা উদ্ধৃত হল: 'উপন্যাসে ইতিহাসের নাম তারিখ অথবা ঘটনার উল্লেখ থাকিলেই উহা ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না। উপন্যাসে এমন কালের ইতিহাস অবলম্বিত হওয়া চাই যেসময় লেখক জীবিত ছিলেন না। তাঁহার পক্ষে উহা অতীতকাল ছিল। কিন্তু লেখার গুণে তিনি সেই অতীত যুগকে স্পষ্ট করিয়া তুলিবেন। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি তাহাদের সমকালীন লোকের দৃষ্টিতে, তাহাদের ভাল মন্দ সকল জ্ঞানে ও বিশ্বাসে, তাহাদের রাষ্ট্রীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক সকল অবস্থায় পাঠকের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে বাস্তব চরিত্ররূপে প্রতিভাত হইবে।' সংজ্ঞাটির মধ্যে চমকপ্রদ কিছু নেই এবং লেখক সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন, এই সংজ্ঞানিরূপণে তাঁর দ্বিধার কথাও গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে; তবু এরই সাহায্যে হুগলীর ইমামবাড়ীকে ঐতিহাসিক উপন্যাসের শ্রেণী থেকে বহিষ্কৃত করা যায় না কারণ হুগলীর ইমামবাড়ীর মধ্যে সেকালের জগৎ ও জীবন নিঃসন্দেহে ফুটে উঠেছে।[৬৭]

৬৪ বিজিতকুমার দত্ত, বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, ১৩৬৯, পৃ ১৯৮।

৬৫ বাঙ্গালা ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ ৮২ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৬৬ বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ১৯৫৬ পৃ ২৪৯।

৬৭ ইতিহাস হল অতীতের ঘটনাপ্রবাহ এবং পুরাঘটিতের মহাসমগ্রতা; তাছাড়াও ইতিহাসের অন্তর্গত হল অতীতজ্ঞান বা অতীত ঘটনাজ্ঞান, অতীতের চিন্তা অথবা তৎসম্পর্কিত জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধান, এবং অভিনব তথ্যের সঙ্গে পূর্বলব্ধ জ্ঞানের সমন্বয়সাধন— তথা অতীতের পুনর্গঠন। ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসের স্রষ্টা এতদুভয়ের সমন্বয়সাধনেচ্ছুও হতে পারেন, তদ্ব্যতীত এদতিরিক্ত কিছুর অবকাশ থাকতেই পারে। সে যা হোক ব্যাপক

যে গ্রন্থ অবলম্বনে আলোচ্য উপন্যাসটি রচিত তা ত্রুটিহীন ইতিহাসগ্রন্থ নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু তার উপাদানগুলিকেও নিতান্ত অনৈতিহাসিক বলে অগ্রাহ্য করা যায় না কারণ জনশ্রুতি-কিংবদন্তী ব্যতীত মহম্মদ মহসীনের সম্পূর্ণ জীবনকথা আজ রচনা করা অসম্ভব। তাছাড়া মূল ইংরেজি প্রবন্ধটির রচয়িতা 'শ্রীযুক্তবাবু মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, এম. এ, বি. এল মহাশয়' নিষ্ঠাবান ঐতিহাসিকের মত এই প্রবন্ধ যে লিখেছেন তার প্রমাণ প্রবন্ধটির শেষাংশে পাওয়া যায়; তিনি এ ব্যাপারে পারিবারিক দলিল পত্রাদিরও আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাই এ গ্রন্থ যে একেবারে ভিত্তিহীন তা বলা চলে না। লেখিকা এরই সাহায্যে উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন সেকথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

হুগলীর ইমামবাড়ীর মধ্যে পারিবারিক জীবন বড় হয়ে উঠেছে যার প্রভাব সুদূরপ্রসারী নয়। এবং এর মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ কোনো রাজপরিবারের চিত্র অথবা বিরাট কোনো রাজশক্তির উত্থানপতন বা যুদ্ধ-সংঘাতের কথাও চিত্রিত হয়নি; কিন্তু রাজন্যবর্গের রাজ্যজয় কিংবা পরাজয়ের ইতিহাসকেই আমরা বিশুদ্ধ ইতিহাস বলিনে। হুগলীর ইমামবাড়ীতে সেকালের ভাগীরথী-তীরবর্তী জনপদের যে বিশিষ্ট চিত্র প্রস্ফুটিত তাকে অনৈতিহাসিক বলা যায় না। বিশেষত মুসলমান শাসনের অন্ত্যপর্বে হুগলীর উত্থান ও বিশিষ্ট নগরীরূপে তথা ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্রস্থলরূপে তার জাগরণের দিনের গৌরবময় অধ্যায়টি বর্তমান উপন্যাসে অবলম্বিত। কেবল ঐশ্বর্য বা বাণিজ্য নয়, সঙ্গীতশিক্ষা শরীরচর্চা সৌন্দর্যসাধনা প্রভৃতির অনুশীলনের ইতিহাস উপন্যাসের মধ্যে আছ; পক্ষান্তরে বিলাসিতা মদ্যাসক্তি দুর্নীতিপরায়ণতার পঙ্ককুণ্ডও হুগলীর বিচিত্র জীবনাবর্তকে ধারণ করতে সমর্থ হয়েছে—সালাউদ্দীনের রূপমোহ ও নীতিবিরুদ্ধ আচরণ, নবাব খাঁজাহান খানের স্বৈরাচার পরপীড়ন প্রভৃতির মধ্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইমামবাড়ী নামক বিশাল প্রাসাদ ও তন্মধ্যস্থ কয়েকজন নরনারীর জীবনকে বাহিরের এই বৈচিত্র্য একদা স্পর্শ করে, প্রভাবিত করে ও তাদের জীবনে জটিল ঘটনাবর্ত রচনা করে। সুদূর পারস্য থেকে আগত রাজবংশীয় সালাউদ্দীনের সঙ্গে মুন্নার জীবনের যে

অর্থেও সার্থক উপন্যাসমাত্রই ঐতিহাসিক উপন্যাসরূপে গৃহীত হতে পারে। 'ভ্যালু-সচেতন ইতিহাসগত মানুষের চাওয়া এবং পাওয়া—না-পাওয়া এবং পাওয়ার জন্যে সংগ্রাম, এর মধ্যে দিয়ে মানবজীবনের যে রূপবৈচিত্র্য ফুটে ওঠে, যে রূপ অগভীর ত্বকের নয়, গভীর মর্মের, ঐতিহাসিক উপন্যাস সেই রূপকেই প্রকাশ করতে চেষ্টা করে। অন্য উপন্যাস যদি তাই করে, তাহলে সে প্রকৃতপক্ষে অন্য জাতীয় নয়, সেও ঐতিহাসিক। সেই অর্থে সমস্ত সার্থক উপন্যাসই অল্পবিস্তর ঐতিহাসিক—সজ্ঞানে অথবা অলক্ষ্যে।'—দ্র সত্যেন্দ্রনাথ রায়, ইতিহাস ও ঐতিহাসিক উপন্যাস, বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭৩, পৃ ২২৫। বলাবাহুল্য ইতিহাস আর জীবনদর্শনের পরস্পরসাপেক্ষতা ও সমন্বয়সাধন বা রবীন্দ্রনাথ-কথিত 'ইতিহাস রস' ঐতিহাসিক উপন্যাস আলোচনার ক্ষেত্রে অপরিহার্য, তদভাবে মহতী বিনষ্টি।

আঘাত-সংঘাত দেখা দিয়েছিল তাকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসের বিস্তৃত পরিধি রচিত হয়েছে ; তথাপি এই উপন্যাসের মধ্যে পারিবারিক জীবনের প্রাধান্যকে অস্বীকার করা যায় না। সালাউদ্দীনের প্রত্যাখ্যান ও খাঁজাহান খানের প্রলোভন এবং গর্হিত প্রস্তাব মুন্নার নিভৃত নিস্তরঙ্গ জীবনকে সংক্ষুব্ধ করে তুলেছিল ; ফলত হুগলীর ইমামবাড়ীর অন্তঃপুরস্থ মানুষের সমাহিত শান্তি বিঘ্নিত হয়েছিল। তারই ইতিহাস বর্তমান উপন্যাসে রয়েছে।

উপন্যাসের প্রারম্ভে সন্ন্যাসীর সদুপদেশ মহসীনের দুর্কর্ষিত মনের উপর কি পরিমাণ সক্রিয় হয়ে উঠেছে তা দেখান হয়েছে, ফলে একটি সমুন্নত জীবনাদর্শে মহসীন দীক্ষিত। সন্ন্যাসী বলেছিলেন, 'সেই বীর যে দুর্বলের রক্ষক ; সেই পুরুষ যে অসহায়ের সহায় ; সেই মহাত্মা যে অত্যাচারের নিবারক। আইস, আমরা আলিঙ্গন করি, আজ হইতে তুমি আমার শিষ্য হইলে।' এই সন্ন্যাসীর সঙ্গে মহসীনের কথোপকথন-সর্বস্ব পরিচ্ছেদগুলির মধ্যে লেখিকার জ্ঞানের গভীরতা, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব আলোচনায় পারদর্শিতা এবং দর্শনশাস্ত্রে অগাধ অধিকারের প্রমাণ আছে। দুঃখতত্ত্ব বিশ্লেষণে তাঁর কৃতিত্ব অসামান্য। মহসীনের চিত্তে যে জিজ্ঞাসা জাগ্রত হয়েছিল তার প্রশমন ঘটে সন্ন্যাসীর উপদেশে। মহসীন জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার স্তর অতিক্রম করে তার সমাধানে উপনীত হয়েছিলেন : 'আমরা দুঃখলোপ করিতে পারি না বটে কিন্তু দুঃখ প্রশমনের ক্ষমতা আমাদের মধ্যে আছে। মনুষ্য কেবল স্বার্থ-স্পৃহাতেই চালিত নহে, যে যতই নিষ্ঠুর পামর হউক না কেন তাহার হৃদয়েও ক্ষুদ্র পরিমাণে প্রেম করুণা বর্তমান। যাঁহার প্রেম করুণা বিশ্বব্যাপী তিনিই মহাপ্রেমিক, তাঁহারই দুঃখনিবারণ-ক্ষমতা সর্বাপেক্ষা অধিক'— মহম্মদ মহসীন এইসকল উৎসাহবাক্যে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেন এবং তাঁর জীবনের গতিপথ এভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। ভগিনী মুন্নাও কঠিন কর্কশ বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার মধ্যে পরিণামে এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। মানবজাতির কল্যাণসাধনে, পরহিতব্রতে তিনিও দীক্ষিত হয়েছিলেন বলে তাঁর অন্তরে যে বৈরাগ্য দেখা দেয় তা নৈরাশ্যপ্রণোদিত নয়। পরম শূন্যময়-তার মাঝখানে এই সর্বহারা রমণী যে আশার আলোক নিরীক্ষণ করেছিলেন তা মানবহিতবাদরূপে কথিত হতে পারে। শেষ পরিচ্ছেদে লেখিকা এ সম্বন্ধে যা বিবরণ দিয়েছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমস্ত সম্পত্তি 'তাঁহারা ধর্মকার্যে অর্পণ করিয়া আপনারা ভ্রাতা-ভগিনীতে সামান্য অবস্থায় ঈশ্বরের চিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ভোলানাথও তাঁহাদের সঙ্গী হইলেন। মুন্নার আর আকাঙ্ক্ষার কষ্ট রহিল না, অতৃপ্তি রহিল না, তাহার হৃদয়ে মহাশান্তি বিরাজ করিতে লাগিল, সংসার হারাইয়া মুন্না হৃদয়ে স্বর্গ ধারণ করিল।' জগৎপিতার মহিমা অনুভব করে ও তাঁর বন্দনাগান করে তাঁরা দিন কাটিয়ে দিতে লাগলেন, তাঁদের ধর্মকার্য হল অতিথিসেবা ও দরিদ্রপূজা—'তাঁহাদের ন্যায়

তাঁহাদের ধন-ঐশ্বর্যও দীনদুঃখীদিগের শান্তির উপায় হইল। সেই ধনে কত অতিথিশালা, কত বিদ্যালয় স্থাপিত হইল, সেই ধনে শত শত দরিদ্রের জন্য বৃত্তি স্থাপিত হইল,……' ইত্যাদি। প্রাক্ত ব্যক্তির মতই তাঁরা এভাবে পরার্থে সর্বস্ব উৎসর্গ করেছিলেন। লেখিকার মহানুভবতা ও মানবপ্রীতি যে এইসকল অধ্যায় রচনাকালে বিশেষভাবে উল্লসিত হয়ে উঠেছিল তা সহজেই অনুমেয়।

ভ্রাতা ও ভগিনীর এক স্বর্গীয় সৌহার্দ্যের চিত্র বর্তমান উপন্যাসে উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত। গ্রন্থের চরিত্রগুলি বিশেষত মহম্মদ মহসীনের চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠেনি, কারণ আত্যন্তিক তত্ত্বপ্রিয়তা ও আদর্শপ্রীতি; তথাপি তাঁর চরিত্রের ঔদার্য ও মহিমা পাঠকহৃদয়কে স্পর্শ করে। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আঘাত-সংঘাতের অবকাশ তাঁর ক্ষেত্রে স্বল্প, এটাই স্বাভাবিক যেহেতু চরিত্রটি আদর্শের বেদিমূলে প্রতিষ্ঠিত; ফলে তাঁর মানব-মর্যাদা দুর্নিরীক্ষ্য, তিনি যে মহামানব বা দেবতার মহিমায় অন্বিত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই পর্যায়ে লেখিকা তাঁর উপন্যাসের মধ্যে আদর্শ জীবনের সন্ধান করে চলেছিলেন, সমকালীন ঐতিহাসিক সামাজিক সর্ববিধ রচনার মধ্যে তার প্রমাণ বিদ্যমান—এই তথ্যটি প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু মহসীনের ক্ষেত্রে যার অভাব মুন্নার প্রসঙ্গে তার প্রাচুর্য লক্ষণীয়। এই হতভাগিনী রমণী জীবনের বিচিত্র জটিলকুটিল পথ ধরে অগ্রসর হয়েছেন; তাঁর অসহায়তা ও সংগ্রাম-পরায়ণতা তাঁকে শ্রীময়ী করে তুলেছে। পতিপ্রেমবঞ্চিত ও উৎপীড়িত মুন্নার সহিষ্ণুতা ও তেজস্বিতা তাঁর সম্বন্ধে পাঠকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। প্রকৃতপ্রস্তাবে এ গ্রন্থ 'হাজি মহম্মদ মহসীনের উপাখ্যান' নয়, কিংবা তাঁর 'জীবনী'ও নয়। মহসীন এই উপন্যাসে বিশেষভাবে নেপথ্যোচিত, উপেক্ষিতপ্রায়; অন্তত তাঁর তুলনায় মুন্না সালাউদ্দীন মতাহার অনুজ্জ্বল ত নয়ই বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁরা স্বমহিমায় ভাস্বর। এ গ্রন্থ হুগলীর ইমামবাড়ীকে কেন্দ্র করে রচিত একাধিক পুরুষের জীবন-ইতিহাস; মতাহার মহসীন মুন্না সালাউদ্দীন এই প্রাসাদের কয়েকটি মানবমানবী, তাঁদের জীবনের আর্তনাদ-উল্লাস ভাল লাগা-মন্দ লাগাকে নিয়ে উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। কয়েকটি সাধারণ-অসাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা আনন্দ-বেদনা একদা হুগলীর ইমামবাড়ীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছিল, তারই আলেখ্য বর্তমান উপন্যাস-পটে নিবদ্ধ।

হুগলীর ইমামবাড়ীর মধ্যে লেখিকা সাহসিকতার সঙ্গে সাধারণ মানুষকে নিকট থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। দরিদ্রসেবায় উন্মুখ মহসীনের ব্রতপালনকে উপলক্ষ্য করে তিনি এ কার্য সম্পন্ন করেন, প্রথম ও সপ্তম পরিচ্ছেদে তার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া ভোলানাথের মত সহৃদয় আত্মাভিমানশূন্য আত্মবিস্মৃত সঙ্গীতজ্ঞের সার্থক চরিত্রনির্মাণকালে

তাঁকে সাধারণ জীবনের প্রাত্যাহিকতায় বিচরণ করতে হয়েছিল। সলেউদ্দীন বা সালাউদ্দীনের দুর্মতি পার্শ্বচর এবং নবাব খাঁজাহান খানের বিবেকহীন অনুচরগণের পারিপার্শ্বিকতা ও পরিপ্রেক্ষিত সৃজনে তিনি ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। এদেরই হস্তে নিগৃহীত সামান্য চুড়িওয়ালার (ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ) কাহিনীটির মধ্যে লেখিকার লোকচরিত্রজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। অসামান্য সহানুভূতির রঙে রঞ্জিত হয়েছে ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদের বুড়িমা ও তার নষ্ট-পুত্রের লোলুপতা এবং কৃতজ্ঞতার দ্বন্দ্বটি। মুন্নাকে অপহরণের জন্য পুত্র খাঁজাহান খাঁ কর্তৃক নিয়োজিত হয়েছিল, প্রচুর অর্থের লোভে সে তার আত্মা বিক্রয় করে; তার বৃদ্ধ জননী কিছু না জেনে দরিদ্রের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশত এই আকস্মিক অর্থাগমে প্রসন্ন হয়ে উঠে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার অবগত হয়ে সে বলেছে, 'অমন টাকার মুখে সাত ঝাঁটা!'

এই সাধারণ মানবমানবীর পাশাপাশি অভিজাত খাঁজাহান খাঁয়ের চরিত্র ফুটে উঠেছে। প্রবৃত্তি-শীর্ষক দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে তাঁর রূপমোহ ও কাণ্ডজ্ঞান, পাপপ্রবৃত্তি ও বিবেকের সংঘাতটি সুন্দরভাবে বিকশিত। সালাউদ্দীনের শোচনীয় পরিণাম চিত্রণেও লেখিকা সুন্দর সঙ্গতি ও পারম্পর্যের পরিচয় দিয়েছেন। রোসেনারা কর্তৃক অপমানিত সালাউদ্দীনের ভাবনাগুলি বড়ই বেদনাদায়ক—'রোসেনারার জন্য বন্ধুবান্ধব ছাড়িয়াছেন, দিবানিশি সাধ্যসাধনা ছাড়া আর জানেন না, কিছুতেই তবু তাহার মন পাইলেন না।······হৃদয়ে ব্যথা পাইয়া সালাউদ্দীন আজ অন্যের বেদনা বুঝিতে পারিলেন, সহস্র স্মৃতি এককালে তাঁহার মনে জলিয়া উঠিল। মুন্নার পূর্বের সেই আত্ম-বিসর্জীপ্রেম, বিনীত ব্যবহার, সরলতাময় বিষণ্ন মূর্তি আর আজিকার তাহার সেই দীন হীন ভিখারিনী বেশ, সেই হৃদয়ভেদী আকুল ক্রন্দন আর নিজের পিশাচ-নির্দয় পশুর-অধম-ব্যবহার তাঁহার মনে জ্বালামুখীর বিপ্লব আনিয়া ফেলিল।' তাঁর জীবনের যে ভয়াবহ পরিণতির ইঙ্গিত লেখিকা স্বল্প অবসরে দিয়েছেন তার জন্য এই নরককীটের প্রতিও আমরা ভীতিমিশ্রিত করুণা অনুভব করি। সালাউদ্দীন বুঝতে পেরেছিলেন, 'এ যন্ত্রণার নিষ্কৃতি আর নাই, চিরজীবন তাঁহার মনে এ আগুন জলিয়া রহিল, ইহা হইতে আর মুক্তি পাইবেন না। জ্বালামুখীর অগ্নি-উচ্ছ্বাসের ন্যায় যখন এ আগুন হৃদয় ফাটিয়া ভাঙ্গিয়া ছিঁড়িয়া চুরমার করিয়া বাহির হইতে চাহিবে তখনও হাসির আবরণে তাহা ঢাকিয়া রাখিতে হইবে, বিলাসের স্রোতে তাহা ডুবাইতে হইবে। হৃদয়ে এতটুকু মনুষ্যত্ব নাই, এতটুকু তেজ নাই যে জীবনের স্রোত উল্টাইয়া ফেলিয়া এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জীবন কাটাইতে পারেন। বিলাস তাঁহার শরীরের রক্ত শোষণ করিয়াছে, হৃদয়ের বল পান করিয়াছে, পশু হইতেও তাঁহাকে অধম নীচ করিয়া তুলিয়াছে, জীবন থাকিতে তিনি জীবনহীন। এই মনুষ্যত্ব-বিহীন নির্জীব প্রাণ লইয়া অদৃষ্টের সহিত সংগ্রাম করিতে তাঁহার ন্যায় দুর্বল কাপুরুষের সাধ্য নাই। একটা মড়ার মত অদৃষ্টের তাড়নায় প্রবৃত্তির

তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া বেড়ানই এ জীবনের পরিণাম, তাহা বুঝিতে পারিলেন।' বস্তুত মহৎ শিল্পীর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে এই ক্ষেত্রে। সালাউদ্দীনের ভয়াবহ অসহায়তা, অনিশ্চিত পরিণামের এই বর্ণনা পাঠকহৃদয়কে স্তব্ধ করে দেয়, এই জীবন্মৃত অবস্থার বর্ণনা এতই প্রত্যক্ষ যে আমরা একটা অনিবার্য সুতীব্র অভিভব অনুভব করতে বাধ্য হই।

ফুলের মালা

॥১॥ পূর্বেই বলা হয়েছে যে ফুলের মালা নামে লেখিকার একাধিক উপন্যাসের পরিচয় পাওয়া যায়। ১২৮৯ সালের ভারতী পত্রিকার অগ্রহায়ণ থেকে ১২৯০ সালের বৈশাখ সংখ্যার মধ্যে ফুলের মালার বাইশটি পরিচ্ছেদ মুদ্রিত হয়,[৩৮] অতঃপর অসম্পূর্ণ অবস্থায় এর প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। আবার ১২৯৯ সালের ভাদ্র মাস থেকে ভারতী ও বালক পত্রিকায় উক্ত নামে আরেকটি উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। এই সংখ্যার ২৬৩ পৃষ্ঠার একটি পাদটীকা থেকে জানা যায়, 'কয়েক বৎসর পূর্বে ফুলের মালা নামক যে উপন্যাস ভারতীতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়, এখানি নামে তাহার সহিত এক হইলেও রূপান্তরপ্রাপ্ত নূতন গল্প।' প্রথমোক্ত উপন্যাসটি অর্থাৎ ১২৮৯ থেকে ১২৯০ সালের ভারতী পত্রিকার মধ্যে প্রকাশিত বাইশ পরিচ্ছেদের অসম্পূর্ণ উপন্যাসটি পরবর্তী কালে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়নি; সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠার মধ্যে এটি একান্তভাবে আজও আবদ্ধ। কিন্তু দ্বিতীয়টি অর্থাৎ ১২৯৯ সালের পত্রিকায় মুদ্রিত ফুলের মালা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৫ সালের মার্চ মাসে।

প্রথমোক্ত ফুলের মালা একদিক থেকে লেখিকার দ্বিতীয় ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস। কারণ তাঁর প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস দীপনির্বাণ একেবারে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় ১৮৭৬ সালে; এর পর যেসকল ঐতিহাসিক রোমান্স বা উপন্যাস তিনি রচনা করেছিলেন তার মধ্যে হুগলীর ইমামবাড়ী ভারতী এবং ভারতী ও বালক পত্রিকায় (পৌষ ১২৯১—বৈশাখ ১২৯৩) আত্মপ্রকাশের দিক থেকে বয়োজ্যেষ্ঠের আসন গ্রহণ করতে পারে, কারণ কলঙ্ক (ভা ও বা ১২৯৩-৯৪) যার পরিবর্তিত নাম মিবাররাজ এবং বিদ্রোহ আরও পরবর্তী কালের রচনা। অতএব ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস রচনার দ্বিতীয় প্রয়াসরূপে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত অসম্পূর্ণ

---

৩৮ ভ্রমবশত পত্রিকায় মুদ্রিত 'ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ', প্রকৃতপ্রস্তাবে হওয়া উচিত দ্বাবিংশ। সপ্তদশ পরিচ্ছেদের পর হঠাৎ ঊনত্রিংশ (ভারতী ১২৮৯, পৃ ৪৭০), ত্রিংশ পরিচ্ছেদ ব্যবহৃত। পরবর্তী বৎসরের অর্থাৎ ১২৯০ সালের বৈশাখ সংখ্যায় প্রথমে কিছুই না উল্লেখ করে পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ (পৃ ৩১) বলা হয়েছে।

ফুলের মালায় নামোল্লেখ করতে হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় উপন্যাস রচনার দিক থেকে এটি স্বর্ণকুমারীর তৃতীয় উত্তম কারণ দীপনির্বাণ ও বক্ষ্যমাণ অসম্পূর্ণ ফুলের মালার প্রথম প্রকাশের অন্তর্বর্তী কালে ছিন্নমুকুল নামক সামাজিক উপন্যাসটি ভারতীতে (১২৮৫-৮৬) প্রকাশিত হতে থাকে। স্বর্ণকুমারীর জীবন-ইতিহাসরচয়িতা এবং সমালোচকগণ এই অসম্পূর্ণ উপন্যাসটির কথা কোথাও উল্লেখ করেননি; শুধু অসম্পূর্ণতাই তার জন্য দায়ী নয়, নামসাদৃশ্যবশতও তা উপেক্ষিত হতে পারে। কিন্তু কেবল তথ্যের দিক থেকে নয় স্বর্ণকুমারীর সাহিত্যসাধনা এবং ঔপন্যাসিক প্রতিভার ক্রমবিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে উপরি উক্ত অসম্পূর্ণ রচনাটির গুরুত্ব অসামান্য। তাছাড়া সাময়িকপত্রের মধ্যে একান্ত আবদ্ধ এই উপন্যাসের ঘটনাপরিকল্পনার কথা মনে রেখে বলা যায় পরবর্তী কালের সম্পূর্ণ ফুলের মালার সঙ্গে তার আত্মীয়তা আছে।

বক্ষ্যমাণ উপন্যাসের ঘটনাস্থল বিজয়নগর, কিন্তু পরবর্তী ফুলের মালার পটভূমি বঙ্গদেশ। অসম্পূর্ণ উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে (অগ্রহায়ণ ১২৮৯) লেখিকা প্রসঙ্গত মন্তব্য করেছেন, 'চতুর্দশ শতাব্দীতে মামুদ টুগলকের সাম্রাজ্যকালে দাক্ষিণাত্য দিল্লীর অধীনতা ছিন্ন করিল, রাজবিদ্রোহী হোসেন গঙ্গ স্বাধীন বামিনি রাজ্য স্থাপন করিলেন, হিন্দু রাজাগণও সময় পাইয়া আপন আপন রাজ্য পুনরধিকার করিয়া লইলেন। এই সুযোগে কর্ণাটরাজ মহাবীর বাক্যরাও গুরুদেব মাধব বিস্তারন্তের সাহায্যে ধ্বংসাবশিষ্ট বেলাল রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া তুঙ্গভদ্রা উপকূলে বিজয়নগর রাজধানী স্থাপন করিলেন। বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠাদিন স্মরণ রাখিবার জন্য প্রতিবৎসর এই দিনে রাজধানীতে একটি করিয়া অস্ত্রোৎসব হইত।......এক শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, পঞ্চদশ শতাব্দীও যায় যায়, বিজয়নগরে অস্ত্রোৎসব প্রথা এখনো চলিয়া আসিতেছে।' অর্থাৎ পঞ্চদশ-যোড়শ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণকে তিনি বর্তমান উপন্যাসের ঘটনাকাল রূপে গ্রহণ করে নিয়েছেন। কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে পরবর্তী ফুলের মালার ঘটনাস্থল গৌড়বঙ্গ; এবং গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে জানা যায় ঘটনাকাল চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগ। স্থান ও কালের এই বৈষম্য সত্বেও এবং ঘটনার পাত্রপাত্রী স্বতন্ত্র হলেও উভয় ফুলের মালার মধ্যে ঘটনা ও চরিত্রের পরিকল্পনাগত সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

পরবর্তী ফুলের মালা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে এটি দশ বৎসরের পূর্ববর্তী ফুলের মালা নয়, নাম সাদৃশ্য থাকলেও পরবর্তী গ্রন্থটিতে 'রূপান্তর প্রাপ্ত নূতন গল্প' পরিবেষণ করা হয়েছে। কিন্তু পূর্ববর্তী উপন্যাসের কোনো কোনো আখ্যান পরবর্তীর মধ্যে স্থান লাভ করেছে। পরবর্তী ফুলের মালার দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ এবং অষ্টম পরিচ্ছেদের ঘটনার সঙ্গে প্রথমোক্তটির যথাক্রমে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম পরিচ্ছেদের সাদৃশ্য আছে। অস্ত্রোৎসব, ফুলের মালা প্রত্যাখ্যান এবং প্রত্যাখ্যাত নায়িকার উৎকট প্রতিশোধপরায়ণতা ও ষড়যন্ত্র প্রভৃতি

ঘটনা এই সকল পরিচ্ছেদের মধ্যে পাওয়া যায়। কেবল তাই নয়, কোনো কোনো চরিত্র পর্যন্ত পরবর্তী উপন্যাসের মধ্যে নামান্তর লাভ করেছে মাত্র। বিজয়নগরের মহারাজা দেবরাও, রানী শক্তিময়ী, অমাত্যপুত্র রামচন্দ্র বা রাম রায়ের সঙ্গে বঙ্গদেশের সেকন্দর শাহ, সুলতানা শক্তিময়ী ও দিনাজপুরের রাজকুমার গণেশের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এমনকি শক্তিময়ী নামটি উভয় উপন্যাসে গৃহীত; উভয়ত তিনি নায়ক রামচন্দ্র বা গণেশের বাল্যসখী ও ব্যর্থ প্রণয়িনী, উভয়ক্ষেত্রেই তাঁর ক্ষমতাপ্রিয়তা উচ্চাকাঙ্ক্ষা তেজস্বিতা ও প্রবল আত্মমর্যাদা-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, তদুপরি দুটি উপন্যাসেই তাঁর ক্রুদ্ধ বাচনভঙ্গী বক্রভাবাপন্ন এবং শ্লেষপ্রধান। রাম রায় ও গণেশদেবের শস্ত্র এবং সঙ্গীতপ্রীতির কথা সকল উপন্যাসে আছে। রানী শক্তিময়ী ও সুলতানা শক্তিময়ীর চক্রান্তে প্ররোচনায় যথাক্রমে রামচন্দ্র রায় ও গণেশদেব কারারুদ্ধ হয়েছিলেন; এই চক্রান্তের কারণ হিসাবে ব্যর্থ প্রণয়ের নিমিত্ত প্রতিহিংসাপরায়ণতার কথা সকল উপন্যাসে উল্লেখিত হয়েছে। অস্ত্রোৎসবের কথা আগে বলা হয়েছে, উভয় ক্ষেত্রেই নায়ক রামচন্দ্র রায় বা গণেশদেব সাফল্য অর্জন করেছিলেন। অস্ত্রোৎসবের পূর্বে উভয় নায়কের বাল্যসখী শক্তিময়ী গণকের নিকট ভাগ্যগণনা করেছিলেন; কিন্তু প্রথম ফুলের মালার প্রথম পরিচ্ছেদের রামচন্দ্র ও শক্তিময়ী উভয়েই ভাগ্যগণনা করেন একসঙ্গে, পরবর্তী উপন্যাসটিতে শুধু শক্তিময়ী অদৃষ্ট গণনা করেন এবং নায়ক গণেশদেব তা দূর থেকে প্রত্যক্ষ করছিলেন মাত্র। রাজকন্যা কল্পনা ও লাবণ্যকে সংমিশ্রিত করে লেখিকা যেন পরবর্তী গ্রন্থের নিরুপমা চরিত্র সৃজন করেন; কল্পনার ভীরুতা ও লাবণ্যের অসহায়তা নিরুপমার মধ্যে সংহতশ্রী লাভ করেছে। অস্ত্রোৎসবের দিনে ফুলের মালা হস্তে রামচন্দ্রের বাল্যসখী শক্তিময়ীর সৌন্দর্য-সন্দর্শনে অভিভূত হয়ে মহারাজ দেবরাও তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব করেন; বাল্যপ্রণয়ী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে শক্তিময়ী প্রতিশোধ গ্রহণের বাসনায় এই প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিলেন এবং অতঃপর রামচন্দ্র রায়কে সমূলে বিনষ্ট করার জন্য তিনি প্রবীণ রাজার রূপমোহের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করেন ও আপন প্রভাব বিস্তার করে ক্রমাগত একটির পর একটি চক্রান্ত করে যান। গণেশদেব-শক্তিময়ী-সেকন্দর শাহের কাহিনীতেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি, তবে ঘটনা সেখানে অপেক্ষাকৃত জটিল।

অবশ্য এইসকল সাধর্ম্যের জন্য যদিও উভয় উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্রপরিকল্পনাগত আত্মীয়তার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তথাপি প্রথম উপন্যাসের পটভূমি ও চরিত্রনামের সঙ্গে দ্বিতীয়টির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নেই এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিকল্পনায় স্বাতন্ত্র্যও বিদ্যমান, তা-ই স্বাভাবিক। তাছাড়া প্রথমোক্তটিতে প্রণয়ের সমস্যা ও জটিলতার উপর লেখিকা অধিকতর আগ্রহান্বিত, শেষোক্তটির মধ্যে তৎসঙ্গে রাজনৈতিক কুটিল আবর্ত ও

ক্ষমতালাভের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে সোমনাথ কল্পনা ও স্নেহলতার প্রণয়ের ত্রিকোণ-সংঘর্ষ তীব্রতা লাভ করেছে ফলে মূল ঘটনা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে; পক্ষান্তরে পরবর্তী গ্রন্থে অন্তত এজাতীয় দুর্বলতা দেখা যায় না।

কেবল পরবর্তী ফুলের মালার সঙ্গে ঘটনা ও চরিত্রপরিকল্পনাগত সাদৃশ্যের জন্য নয়, অন্যান্য দিক থেকেও প্রথম প্রকাশিত অসম্পূর্ণ ফুলের মালার গুরুত্ব অসামান্য। দীপনির্বাণের পরবর্তী এবং সাময়িকপত্রে প্রকাশিত প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাসরূপে গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্যের কথা পূর্বেই স্বীকার করা হয়েছে। এর পূর্বে ছিন্নমুকুল-শীর্ষক সামাজিক উপন্যাস রচিত হলেও তার মধ্যে রোমান্সের আতিশয্য সুস্পষ্ট, সেদিক থেকে উপন্যাস রচনার তৃতীয় উদ্যম এই অসম্পূর্ণ ফুলের মালার মধ্যে রোমান্সের অতিশয়িত প্রভাব স্বল্পতর। স্বর্ণকুমারীর ঔপন্যাসিক প্রতিভার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে রোমান্সকে অতিক্রম করার প্রচেষ্টা লক্ষিত হয় রোমান্সের এই প্রয়োগগত ক্রমহ্রাসমানতার মধ্যে—দীপনির্বাণ-ছিন্নমুকুল-ফুলের মালা (১২৮৯) পর পর পাঠ করলে দেখা যায় তিনি ক্রমশ রোমান্সের কল্পরাজ্য অপেক্ষা বাস্তব জগৎ ও জীবনের প্রতি অধিকতর মনোযোগী হয়ে উঠছেন। প্রকৃতপক্ষে এর পরবর্তী কলহ বা মিবাররাজ, বিদ্রোহ প্রভৃতির মধ্যে সুলভ ভাবালুতা ও কল্পনার আতিশয্যকে তিনি পরিহার করে ইতিহাসের তথ্য অনুসরণ করেছেন; এইসব উপন্যাসে কপোলকল্পনা পরিবর্জিত কিংবা অনৈতিহাসিক ঘটনা যুক্তিসঙ্গত বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপস্থাপিত। ফুলের মালার প্রথম নিদর্শনটির মধ্যে ঐতিহাসিক উপাদান অবলম্বিত হয়নি সত্য, তবে যেসকল ঘটনা পরিবেশিত হয়েছে তা কাল্পনিক হলেও অসম্ভব বা অপ্রত্যাশিত নয়; ছদ্ম-ঐতিহাসিক উপন্যাসের লেখক প্রধানত এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন—স্বর্ণকুমারীর গৃহীত পন্থা তাই আপত্তিকর নয়। দীপনির্বাণের মধ্যে সেকালের সাধারণ মানুষ ও সমাজের কথা প্রায় সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত, কিন্তু আলোচ্য ফুলের মালা পাঠকালে লেখিকার সহানুভূতি ও দৃষ্টি জীবনের গভীরে ও বিস্তৃতিতে অনেক বেশী প্রসারিত বলে মনে হয়। অন্তত পুষ্পবতী ও শ্যামচাঁদের মত কৌতুকোচ্ছল জীবন্ত চরিত্রের অভাব দীপনির্বাণে আছে, এর তুলনায় কবিচন্দ্র-দম্পতির চিত্র বহুল পরিমাণে অনুজ্জ্বল। অন্তঃপুরের জীবন, সাধারণ মানুষের আচারব্যবহার ও প্রাত্যহিকতা থেকে শুরু করে সৈন্যাবাসের বিশ্বস্ত চিত্র স্বর্ণকুমারী বর্তমান উপন্যাসে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অঙ্কন করেছেন। একটি পরিচ্ছেদে গ্রামীণ যুবসম্প্রদায়কে রাজদ্রোহী রামচন্দ্র রায়ের পক্ষ অবলম্বন করার জন্য যে অনুরোধজ্ঞাপক বক্তৃতা আছে তা সত্যই মর্মস্পর্শী। এই আহ্বান ব্যর্থ হয়নি, পরিণামে উত্তেজিত গ্রামবাসী রাজশক্তির বিরুদ্ধতা করে রামচন্দ্রের সপক্ষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠে।

বাংলা উপন্যাসের ভৌগোলিক সীমাবৃদ্ধির দিক থেকে উপন্যাসটি স্মরণীয়। বিজয়নগরের

পটভূমিকায় রচিত এই উপন্যাসটির মাধ্যমে লেখিকার মানসিক প্রসারও ঘটেছিল; মধ্য ও দক্ষিণ ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় যে অভিজ্ঞতা তিনি অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথের সাহচর্যে এসে অর্জন করেছিলেন তাকে কিয়ৎ পরিমাণে বর্তমান উপন্যাসে কাজে লাগান হয়েছিল বলে মনে হয়। দীপনির্বাণে বর্ণিত হিন্দু-রাজপুত গৌরবকথার মত বিজয়নগরের হিন্দু রাজবংশের অভ্যুদয়ের কাহিনী স্বভাবত তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল বলে বাক্যরাওয়ের বংশধর দেবরাওয়ের সমকালীন ঘটনাবলী প্রথম পর্যায়ের ফুলের মালায় সমর্পিত হয়েছে। রাজ্যব্যাপী ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীরূপে চিহ্নিত অমাত্যপুত্র রামচন্দ্র রায়ের শৌর্যবীর্য মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু প্রবীণ নরপতির রূপমোহ, বাল্যপ্রণয়ে ব্যর্থতাজনিত অন্তঃপুরচারিণী মহারাজ্ঞীর সুতীব্র প্রতিশোধস্পৃহা ও রাজার উপর অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তারের অসৎ উদ্দেশ্য রাজশক্তির আভ্যন্তরিক দুর্বলতাকে সূচিত করে; রামরায়-শক্তিময়ী-দেবরায় এবং কল্পনা-সোমনাথ-স্নেহলতার প্রণয়ঘটিত ত্রিকোণসংঘর্ষ যেন আসন্ন কোনো দুর্যোগ ও অশুভময়তাকে সংকেত করছে। প্রতিবেশী বাহমনী রাষ্ট্রের সুলতান কর্তৃক বিজয়নগর রাজ্য আক্রমণের উদ্যোগ এই পরিস্থিতিকে আরও অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলেছে। উপন্যাসের মধ্যে এক বিরাট রাষ্ট্রবিপ্লবের যেমন সম্ভাবনা আছে তেমনি বিপর্যয়ের আভাসও বিদ্যমান; আকস্মিকভাবে প্রকাশ বন্ধ হওয়ার ফলে তার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় না সত্য তবে তার পরিণাম নিতান্ত অস্পষ্ট নয়।

অসম্পূর্ণ ফুলের মালার মধ্যে পরবর্তী কালের কয়েকটি স্মরণীয় চরিত্রের ও প্রসঙ্গের যেন পূর্বাভাস পাওয়া যায়। রাজকন্যা কল্পনার সঙ্গে 'রাজকন্যা' নাটকের (ভারতী ১৩১৮) কল্যাণীর এবং শক্তিময়ীর সঙ্গে কল্যাণীর বিমাতার সাদৃশ্য পাওয়া যায়; কল্পনা ও কল্যাণী উভয়েই বিমাতা কর্তৃক লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। রামরায় ও স্নেহলতার মধ্যে যে ভাইবোনের সুন্দর সম্পর্কের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে পূর্ববর্তী ছিন্নমুকুল (ভারতী ১২৮৫-৮৬) ও পরবর্তী হুগলীর ইমামবাড়ী (ভারতী ১২৯১ --ভারতী ও বালক ১২৯৩) উপন্যাসের সম্বন্ধ আছে। এই স্নেহলতা নামটি স্বর্ণকুমারীর বড়ই প্রিয়, এই নামে তিনি দুইখণ্ডের সামাজিক উপন্যাস রচনা করেন। পুষ্পবতী ও শ্যামচাঁদের প্রসঙ্গ পরবর্তী কালের সাহিত্যে নানাভাবে দেখা দিয়েছে। যাত্রাওয়ালা নবীন অধিকারী, ঘটক বা ঘটকী প্রভৃতি যে শ্রেণীর চরিত্র তাঁর নাটকে উপন্যাসে পাওয়া যায় তাদের সঙ্গে শ্যামচাঁদের সম্বন্ধ আছে; শ্লোক ও সংগীতপ্রীতি, ছড়া কাটায় সিদ্ধহস্ততা এবং নানাবিধ অসঙ্গতির মধ্য দিয়ে চরিত্রটি স্মরণীয় হয়ে আছে। স্বর্ণকুমারীর টাইপ চরিত্রগুলির মধ্যে এই শ্রেণীর চরিত্রকে অন্যতম বলা যেতে পারে।

॥২॥ এর পর পরবর্তী কালে প্রকাশিত ফুলের মালা উপন্যাসটি সম্বন্ধে আলোচনা করা

যেতে পারে। এই 'রূপান্তরপ্রাপ্ত নূতন গল্প'-গ্রন্থের উপহার-পত্রটি নিম্নরূপ। অজ্ঞাতপরিচয় কোনো এক সখীকে সম্বোধন করে তিনি বলেছেন,

এ ফুলের মালাগাছি বহুদিন ধরে—
লুকান রয়েছে গাঁথা হৃদয়ের পরে।
আজ ধরিতেছি খুলি ছিন্নভিন্ন দলগুলি
অনাদরে লবে তুমি—অথবা আদরে?

লেখিকার এই দ্বিধার কথা মনে রেখে বলা প্রয়োজন যে পরবর্তী কালে গ্রন্থটি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল কারণ উক্ত উপন্যাসের ঘটনাংশ অবলম্বন করে তৎকালীন প্রতিষ্ঠিত শক্তিমান ও প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন উদীয়মান চিত্রকরবৃন্দ একাধিক চিত্র নির্মাণ করেন এবং সেগুলি পরিচিতিসহ ভারতী পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। গ্রন্থ প্রকাশের অনতিকালের মধ্যে লেখিকার এই স্বীকৃতিলাভ দেখে তাঁর শক্তির পরিমাপ করা যেতে পারে। ১৩১৭ সালের ভারতীতে প্রদত্ত এইরূপ কয়েকটি চিত্রের পরিচিতি বা 'চিত্রব্যাখ্যা' নিম্নে উদ্ধৃত হল।

১. বৈশাখ, পৃ ৭৯-৮০। 'শক্তিময়ীর স্বপ্ন। শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার অঙ্কিত চিত্রের প্রতিলিপি। শক্তিময়ী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত ফুলের মালা উপাখ্যানের নায়িকা। বালিকা নিরুপমা ও শক্তিময়ী দুজনেই রাজকুমার গণেশদেবকে ভালবাসিত, বালক গণেশদেব কিন্তু শক্তিময়ীকেই পত্নীরূপে মনোনীত করিয়া একদিন খেলার সময় তাহাকে ফুলের মালা পরাইয়া দেন। বাস্তব জীবনে ঘটনাচক্র অন্যরূপ দাঁড়াইল; নিরুপমা হইল রাজরানী আর পরিত্যক্তা শক্তিময়ী হইলেন বঙ্গের মহামহীয়সী সুলতানা। ইহার পর গণেশদেব একসময় বিদ্রোহাপরাধে সুলতানকর্তৃক কারারুদ্ধ হন। সুলতানা তখন তাঁহার স্থলে নিজে বন্দী হইয়া তাঁহাকে মুক্তিপ্রদান করেন। কারাগারে শুইয়া তন্দ্রাবেশে শক্তি স্বপ্ন দেখিতেছেন—তিনি ও তাঁহার বাল্যসখা উভয়ে নৌকায় ভাসিয়া চলিয়াছেন, রাজকুমার শক্তিকে ফুলমালা পরাইয়া বাঁশরীতে গাহিতেছেন—

আমি কি চাহি,
সে আমার আমি তার আমার কি নাহি?

সকলই বাল্যকালের মত। সুন্দর জ্যোৎস্না, ফুলের গন্ধ, দক্ষিণা বাতাস, কোকিল পাপিয়ার মধুর সংগীত, আর তাহার মধ্যে রাজকুমারের বাঁশরীর প্রাণমনোহারী আনন্দ তান। এই আনন্দ রজনীতে তাঁহারা দুইটি প্রাণী এক আত্মা হইয়া সংগীতের সঙ্গে পৃথিবীর বন্ধন দেহের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অসীম আনন্দরাজ্যে ভাসিয়া চলিয়াছেন। এই ভাবস্বপ্ন চিত্রে চিত্রকর সুন্দররূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।'

২. শ্রাবণ, পৃ ৩৪৯-৫০। 'রাজকুমার ও শক্তিময়ী—নদীতীরে। (ফুলের মালা)

শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার অঙ্কিত চিত্র হইতে। বহুদিন পরে আবার বাল্যসখা গণেশদেবের সহিত বাল্যসখী শক্তিময়ীর সহসা দেখা হইয়াছে, তাঁহারা বিজন নদীতীরে আসিয়া বসিয়াছেন। এখন গণেশদেব যুবাপুরুষ—শক্তিময়ী যুবতী। সূর্য অস্তে গিয়াছে, কিন্তু তখনো সন্ধ্যার ধূম্রবরণে পৃথিবী আচ্ছাদিত হয় নাই। পশ্চিম গগনে উজ্জ্বল লাল মেঘের স্তর জমিয়াছে—তাহার আভায় জলস্থল উজ্জ্বল লাল হইয়া উঠিয়া শক্তির মুখমণ্ডল অপূর্ব শোভিত করিয়া তুলিয়াছে। সেই রূপমাধুর্যে রাজকুমার মুগ্ধ—আত্মবিস্মৃত। তাঁহার মনে হইতেছে, নদীতীরের এই বনতল তাঁহাদের বাল্যকালেরই সেই ক্রীড়া-উপবন। তিনি সেই চতুর্দশবর্ষীয় বালক আর শক্তি তাঁহার বালিকাসখী, তাঁহার রানী।……তিনি তখনকার দিনের মত শক্তিকে বাঁশি শুনাইতেছেন, শক্তি তন্ময় হইয়া শুনিতেছে। কবিও তন্ময় হইয়া এই চিত্র আঁকিয়াছেন।'

৩. ভাদ্র, পৃ ৪৩৬-৩৭। 'বিবাহখেলা—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ অঙ্কিত চিত্র হইতে।…… কাননতলে বালিকাসখী চারিজন রাজারানী খেলা খেলিতেছিল, এমন সময় বালক রাজকুমার গণেশদেব সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কুসুম জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা রাজকুমার তুমিই বল কে রানী? শক্তি, না, নিরুপমা?……নিরুপমা এতক্ষণ ধরিয়া যে বকুল ফুলের মালাগাছি গাঁথিয়া মাটিতে ফেলিয়া রাখিয়াছিল তাহা উঠাইয়া লইয়া শক্তির গলায় দিয়া রাজকুমার বলিলেন, এই দেখ। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত ফুলের মালার এই দৃশ্যই চিত্রকর অঙ্কিত করিয়াছেন।'

উপরে উদ্ধৃত তিনটি 'চিত্রব্যাখ্যা' পাঠকালে ফুলের মালা উপন্যাসের যথাক্রমে চতুস্ত্রিংশ, পঞ্চম ও প্রথম পরিচ্ছেদের কথা মনে পড়ে; তবে দ্বিতীয় চিত্রপরিচিতির সঙ্গে মূল উপন্যাসের ঘটনার সাদৃশ্য থাকলেও বর্তমান উদ্ধৃতির মধ্যে প্রসঙ্গটি বিস্তার লাভ করেছে, উপন্যাসে ব্যাপারটি যথেষ্ট পরিমাণে সংক্ষিপ্ত। অন্য দুটি চিত্রের এবং চিত্রবর্ণনার সঙ্গে উপন্যাসের ঘটনা এমনকি বর্ণনার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য, যে বৎসরের ভারতী (১৩১৭) থেকে এই চিত্রব্যাখ্যাগুলি গৃহীত তার সম্পাদক ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী; এই চিত্রব্যাখ্যার লেখকরূপে কোনো নামের উল্লেখ না থাকায় ধরে নেওয়া যেতে পারে রচনাগুলি সম্পাদিকার দায়িত্বেই প্রকাশিত ও মুদ্রিত হয়েছে। রচনারীতি লক্ষ করলে বিশ্বাস জাগে যে এগুলি স্বর্ণকুমারীরই রচনা, মূল উপন্যাসের বর্ণনার সঙ্গে যে এদের নিকট সাদৃশ্য বর্তমান তা উপরেই বলা হয়েছে।

॥৩॥ ফুলের মালা উপন্যাসের উপজীব্য ঐতিহাসিক ঘটনাটি হল দিনাজপুরের রাজপুত্র কর্তৃক ঘটনাচক্রে বঙ্গদেশের সিংহাসন অধিকার। বাংলায় স্বাধীন সুলতানদের আমলে যে এইরূপ ঘটনা অর্থাৎ অনেক প্রতিভাবান হিন্দু রাজপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছিল তা

ইতিহাস-সমর্থিত ব্যাপার, তবে এ সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলতে সাম্প্রতিক কালের বিচক্ষণ গবেষকগণ পর্যন্ত দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। আচার্য যদুনাথ তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থের (History of Bengal, Vol. II, Chapter IV, Section VII) একটি অধ্যায়ের নাম দিয়েছেন Why Bengal had no history under Ilyās Shāh's Grandchildren. তিনি এই যুগের ইতিহাসের নাম দিয়েছেন obscure and confused history ; এর মধ্যেই সংশয় প্রচ্ছন্ন। স্বর্ণকুমারীর সময় বিষয়টি আরও অন্ধকারময় ছিল বললে অত্যুক্তি করা হয় না, তাই উপন্যাসের ঘটনাবলী কতদূর ইতিহাসসম্মত তার বিচারকালে বিশেষ সহানুভূতি ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ইতিহাস বলতে উপাখ্যান রচনাকালীন প্রচলিত বঙ্গদেশীয় ইতিবৃত্ত গ্রন্থগুলির কথা স্মরণ করা দরকার, কিন্তু সঠিক কোন গ্রন্থ বা গ্রন্থাবলীর সাহায্য নিয়ে লেখিকা ফুলের মালা রচনা করেছিলেন তার নির্দেশ তিনি কোথাও দেননি। কেউ কেউ সংশয় প্রকাশ করেছেন যে এমনও হতে পারে তিনি কোনো ইতিবৃত্ত-রচয়িতারই দ্বারস্থ হননি, 'ইতিহাসরূপে কিংবদন্তী যাহা সেদিনে প্রচলিত ছিল তাহাই স্বর্ণকুমারী দেবী গ্রহণ করিয়াছেন।'[৬৯] ইতিহাস নির্মাণকালে কিংবদন্তী নিতান্ত উপেক্ষণীয় নয়; পরবর্তী কালের ঐতিহাসিকগণের সিদ্ধান্তের সঙ্গে যদি প্রবল বৈষম্য না থাকে তাহলে ঐতিহাসিক উপন্যাসে কিংবদন্তীকে সমর্পণ করা অপরাধরূপে বিবেচিত হতে পারে না।[৭০] কিংবদন্তী বা ইতিহাস লেখিকা যাকেই গ্রহণ করুন না কেন আধুনিক ইতিহাসের সঙ্গে তার কি পরিমাণ সাদৃশ্য আছে তা প্রথম নির্ধারণ করা আবশ্যক, প্রসঙ্গক্রমে তৎকালে প্রচলিত বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহের সঙ্গে তাঁর সিদ্ধান্তের কোনো সাদৃশ্য আছে কিনা তাও লক্ষিতব্য।

ফুলের মালার বহুপূর্বে প্রকাশিত চার্লস স্টুয়ার্টের The History of Bengal গ্রন্থখানি (১৮১৩) স্বর্ণকুমারীর সময় শিক্ষিত বাঙালি সমাজে বিশেষ পরিচিত ছিল। কাউন্সিল অব এডুকেশনের সেক্রেটারি ফ্রেড. জে. মোওয়াট, এম. ডি. কর্তৃক স্বাক্ষরিত ১৮৪৭ সালের ২৪ জুন তারিখের একটি নোটিশ থেকে জানা যায়, under the immediate superintendence and sanction of the Council of Education, for the use of the Government Colleges and Schools in Bengal পূর্বোক্ত গ্রন্থটির একটি সুলভ সংস্করণ প্রকাশ

৬৯ বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃ ৮৪।

৭০ ফুলের মালার গ্রন্থাকারে প্রকাশের দীর্ঘ কাল পূর্বে বিপিনবিহারী ঘোষালের বঙ্গের পুনরুদ্ধার (১৮৭৭) নাটকটি প্রকাশিত হয়, নাটকটি সিরাজুদ্দীন ও গণেশের সংঘর্ষ-কথাশ্রিত। তৎকালে প্রচলিত ইতিহাস ও কিংবদন্তীর অবলম্বনে রচিত কথিত নাটকটি সম্পর্কে সম্ভবত লেখিকা অবগত ছিলেন।

করা হয় কারণ এর পূর্বের সংস্করণ ছিল an expensive quarto work, out of print and inaccessible. সুলভ মূল্যে পুনর্মুদ্রিত হওয়ায় এবং স্কুল কলেজের ছাত্রগণের ব্যাপক ব্যবহারে আসায় গ্রন্থটি তৎকালীন শিক্ষিত জনগণের নিকট সুপরিচিত হয়ে উঠে। ফুলের মালায় বর্ণিত প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে স্টুয়ার্টের প্রদত্ত তথ্যাবলীর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে লেখিকা উপন্যাস মধ্যে সনতারিখযুক্ত তথ্যসমূহ গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন, তাই অনুমান হয় তিনি হয়ত কোনো ইতিহাসগ্রন্থ অবলম্বন করেছিলেন বর্তমান উপন্যাস রচনার জন্য। আমাদের বিশ্বাস সেই অনুক্ত গ্রন্থটি হল চার্লস স্টুয়ার্ট প্রণীত The History of Bengal from the First Mohammedan Invasion until the Virtual Conquest of that Country by the English, A. D. 1757.[৭১]

ফুলের মালার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লেখিকা সবিশেষ আস্থার সঙ্গে ইতিহাসচারণা করেছেন, 'চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গদেশ প্রকৃতপ্রস্তাবে দিল্লীর অধীনতা ছিন্ন করিল। সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্তা বহরম খাঁর মৃত্যু হইলে ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে তদনুচর ফকীরুদ্দীন পূর্ব বাঙ্গালায় স্বাধীন পতাকা উড্ডীন করিলেন, আর লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্তা কদর খাঁকে নিহত করিয়া আলিউদ্দীন আলি সাহ পশ্চিম বাঙ্গালার অধিপতি হইয়া গৌড়সন্নিহিত পাণ্ডুয়ায় রাজধানী স্থাপিত করিলেন। অতঃপর আলিউদ্দীনের ধাত্রীপুত্র সামসুদ্দীন ইলিয়াস সাহ শেষোক্ত রাজ্য কবলিত করিয়া ১৩৫২ খৃষ্টাব্দে সুবর্ণগ্রাম বিজয় করত সমগ্র বাঙ্গালা একাধিপত্যে আনয়ন করিলেন। সম্রাট ফিরোজ সাহ তখন দিল্লীর সম্রাট। তিনি ইহাতে প্রমাদ গণিয়া সসৈন্যে বঙ্গে আগত হইলেন।...এবং কয়েক বৎসর পরে ১৩৫৭ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার স্বাধীনতা-স্বীকারে বাধ্য হইলেন।' এই আলিয়াস সাহের পুত্র সেকন্দর সাহ ও তৎপুত্র গায়সুদ্দীনের সময় গণেশদেব বর্তমান ছিলেন বলে লেখিকা ধরে নিয়েছেন। সে যাই হোক স্টুয়ার্টের গ্রন্থের ৯১ থেকে ১০১ পৃষ্ঠার মধ্যে উপরে বিবৃত ঘটনাসমূহ পরিবেশিত হয়েছে।

ফুলের মালার ষোড়শ পরিচ্ছেদে বর্ণিত পিতা সেকন্দর সাহের বিরুদ্ধে পুত্র গায়সুদ্দীনের বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্রোহের সঙ্গে স্টুয়ার্টের সাদৃশ্য আছে। স্বাধীন বঙ্গের এই সুলতানের রাজত্বের শেষভাগে এই শোচনীয় ঘটনা ঘটে। তবে বিদ্রোহের কারণ হিসাবে স্টুয়ার্ট ও স্বর্ণকুমারী স্বতন্ত্র কথা বলেছেন। স্টুয়ার্টের গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায় বিমাতার চক্রান্তের প্রতিবাদে ও স্বীয় নিরাপত্তার জন্য গায়সুদ্দীন এই কর্মে প্রবৃত্ত হন : the youth was

৭১ বর্তমান প্রবন্ধে স্টুয়ার্টের গ্রন্থের ১৯০৩ সালের সংস্করণটি ব্যবহৃত, প্রকাশক—বঙ্গবাসী প্রেসের ঘুটুবিহারী রায়, ৩৮-২ ভবানীচরণ দত্তের স্ট্রীট, কলিকাতা।

suspicious of the machinations of his step-mother; and one day, under pretence of going to hunt, he made his escape to Sunergong, and engaged in open rebellion.[১২] কিন্তু স্বর্ণকুমারী এই বিদ্রোহের কারণ-ব্যাখ্যায় বলেছেন যে প্রবীণ পিতার রূপলালসা থেকে রক্ষার জন্ম পিতা কর্তৃক মনোনীত শক্তিময়ীকে স্বয়ং বরণ করে গায়সুদ্দীন সুলতানের বিপক্ষতাচরণ করতে বাধ্য হন। বেশ বোঝা যায় যে কারণ যাই হোক না কেন বিদ্রোহের পরিণাম সম্বন্ধে তাঁদের মধ্যে কোনো মতানৈক্য নেই। পিতার মৃত্যুর পর ১৩৬৭ খৃস্টাব্দে গায়সুদ্দীন সিংহাসনারোহণ করেন। তাঁর রাজ্য-প্রাপ্তির পর প্রথম কাজ হল to seize his half-brothers, whose eyes he ordered to be eradicated and sent to their mother. ফুলের মালার 'উপসংহার' পাঠকালে এই নিষ্ঠুর অত্যাচারী গায়সুদ্দীনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। স্টুয়ার্টের গ্রন্থে এর পর অবশ্য সেই রূপকথা-বর্ণিত ন্যায়পরায়ণ প্রসিদ্ধ বিচারসন্ধানী সুলতানের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। নিষ্ঠুরতা ও সহৃদয়তার এই দ্বন্দ্বময় হৃদয়ের সদ্ব্যবহার করেছেন লেখিকা তাঁর ফুলের মালায়। আবার স্টুয়ার্টের মতে ১৩৭৩ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত গায়সুদ্দীন রাজত্ব করেছিলেন, তারপর দুজন সুলতান হন। শেষ সুলতান দ্বিতীয় সামসুদ্দীনের সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেছেন, For little more than two years he enjoyed a tranquil reign; but at the expiration of that period, Kanis, the Zemindar of Bhetourieh, rebelled against him; and the youth being unsupported by the Mohammedan Chiefs, was defeated, and lost his life, in the year 787 (A. D. 1385). এই ব্যাপারে স্বর্ণকুমারী স্টুয়ার্টের অনুসরণ না করে অভিনব ও বিসদৃশ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। 'উপসংহারে' তিনি সংক্ষেপে বলেছেন যে অনিবার্য কোনো কারণবশত 'গণেশদেবের সহিত সুলতানের যুদ্ধ বাধিল। সুলতান (গায়সুদ্দীন) পরাজিত, নিহত হইলেন। মুসলমান হিন্দু সকলে মিলিয়া গণেশদেবকে বঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করিল, বঙ্গের ভাগ্যে সহসা এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটিল—যবনসিংহাসনে হিন্দু রাজা অধিষ্ঠিত হইলেন।' অর্থাৎ স্টুয়ার্টের অনুসরণে তিনি এই ঘটনা দ্বিতীয় সামসুদ্দীনের সময় ঘটেছিল বলে মনে করেননি। স্বর্ণকুমারীর সমর্থনে বলা যায়, গায়সুদ্দীনের পর আর তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য সুলতান বঙ্গের মসনদে উপবেশন করেননি; তাছাড়া ঘটনাকে সংহতি দানের জন্ম তিনি সম্ভবত গায়সুদ্দীনের আমলের মধ্যেই তাকে আবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন। স্টুয়ার্টের ইতিহাস এবং 'মালদহনিবাসী

১২ The History of Bengal, p 101.

গোলাম হোসেন সলেমী সংকলিত পারস্তভাষায় রচিত রিয়াজ-উস-সালাতিন'-এর মধ্যে গায়সুদ্দীনের পরবর্তী ও গণেশের পূর্ববর্তী দুজন সুলতানের উল্লেখ আছে, তাঁরা হলেন যথাক্রমে সায়ফুদ্দীন সুলতান-উস-সলাতিন এবং দ্বিতীয় সামসুদ্দীন। স্টুয়ার্ট-বর্ণিত সায়ফুদ্দীন সম্ভবত স্বর্ণকুমারীর গ্রন্থে সাহেবুদ্দীনে পরিণত। উপন্যাসের চতুর্বিংশ ও পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে তাঁর সম্বন্ধে লেখিকা দুচারকথা বলে নিয়েছেন। 'নতুন বাদশার ভাইপো' সাহেবুদ্দীন প্রাণভয়ে গণেশদেবের আশ্রয় নিয়েছিলেন। 'গায়সুদ্দীন তাঁহার সপ্ত ভ্রাতার প্রাণবধ করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। অশ্রুবান বালক ভ্রাতুষ্পুত্রের রক্তপাতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন।' সিংহাসন লাভের পর প্রথমেই গায়সুদ্দীন এইসকল নৃশংস কার্যে যে উদ্যোগী হয়েছিলেন তা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, তাই এই সম্ভাবনাকে অবাস্তব বলে মনে হয় না। লেখিকা পরবর্তী সুলতানকে গণেশদেবের আশ্রয়প্রার্থীরূপে কল্পনা করে নিয়েছেন অনায়াসে। উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে এই ঘটনা প্রাধান্য পেয়েছে। গায়সুদ্দীন ও গণেশদেবের শত্রুতার অন্যতম কারণ হিসাবে লেখিকা সাহেবুদ্দীন প্রসঙ্গের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

গায়সুদ্দীনের মৃত্যুর পরবর্তী ঘটনা সম্বন্ধে স্টুয়ার্ট বলেন, When, the soul of Ghyas Addeen had taken its flight to the other world, the nobles placed his son, Sief Addeen, on the throne ইত্যাদি। হয়ত লেখিকা পুত্রকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতুষ্পুত্র-রূপে কল্পনা করেছিলেন। সিয়েফুদ্দীন বা সাহেবুদ্দীন যে সমান্তগণের সাহায্যে সিংহাসন লাভ করেছিলেন তার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট এবং এঁদের মধ্যে দিনাজপুরের রাজা গণেশদেব ছিলেন এমন মনে করা অসঙ্গত নয়। গণেশদেব তথা সামন্তবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা লাভকারী সাহেবুদ্দীনের চরিত্র নির্মাণ করার পশ্চাতে ইতিহাসের পরোক্ষ সমর্থনের অভাব ছিল না একথা তাই শিথিলভাবে বলা চলে। রিয়াজ-উস-সালাতিন-এর মধ্যে এ সম্পর্কে একটি সুন্দর ইঙ্গিত আছে। লেখক গোলাম হোসেন দ্বিতীয় সামসুদ্দীন (গণেশের পূর্ববর্তী সুলতান) সম্বন্ধে বলেছেন, 'সায়ফউদ্দীনের (গায়সুদ্দীনের পুত্র) মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র সামসউদ্দীন রাজকীয় মন্ত্রিবর্গের পরামর্শে পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। সামসউদ্দীন পিতৃপদচিহ্ন অনুসরণপূর্বক নিরুপদ্রবে কিয়ৎকাল রাজ্যশাসন করিলেন। তারপর স্বাভাবিক পীড়াগ্রস্ত হইয়া অথবা রাজা কংশের (Kanis>গণেশ) ষড়যন্ত্রে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। রাজা কংশের প্রভাব এই সময়ে অতিশয় বিস্তৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। কোন কোন ইতিহাসবেত্তা লিখিয়াছেন যে, সামসউদ্দীন সায়ফউদ্দীনের পোষ্যপুত্র ছিলেন; এবং তাঁহার নাম সাহাবুদ্দীন ছিল।'[৭৩]

৭৩ রামপ্রাণ গুপ্ত সম্পাদিত রিয়াজ-উস-সালাতিন, সটীক বঙ্গানুবাদ, কলিকাতা অন্তঃপুর কার্যালয় থেকে শশিভূষণ চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩১২, পৃ ১০১-০২।

শেষোক্ত ইঙ্গিতটি থেকে সামসুদ্দীনের সঙ্গে সাহাবুদ্দীনের সাদৃশ্য উপলব্ধ হতে পারে। আসলে লেখিকা তাঁর উপন্যাসে এই নামবিভ্রাটকে আদৌ স্বীকার না করে সাধারণভাবে পৌত্রতুল্য সাহেবুদ্দীনকে সামসুদ্দীনের ভ্রাতুষ্পুত্ররূপে মেনে নিয়েছেন। রিয়াজ-উস-সালাতিন-এ এমন কথাও বলা হয়েছে যে '৭৭৫ সালে (১৩৭৩ খৃস্টাব্দে) রাজা কংশের চক্রান্তে সুলতান গিয়াসউদ্দীন নিহত হইলেন।' এই মন্তব্যের সঙ্গে পূর্বে আলোচিত লেখিকার সিদ্ধান্তের কোনো তারতম্য নেই।

এরপর গণেশ সম্বন্ধে স্টুয়ার্ট যা বলেছেন তা আলোচ্য। সিংহাসন লাভের আগে থেকেই তিনি একজন প্রভাবশালী সামন্তরূপে সুপরিচিত হয়ে উঠেন, তাই রাজ্য তিনি পেয়েছিলেন নিতান্ত আকস্মিকভাবে নয়। রাজা হওয়ার পর তিনি হিন্দু ও মুসলমানের প্রতি সমদর্শী হয়ে উঠেন, Raja Kanis had so well ingratiated himself with the Mohammedans, that, after his death, they claimed him as one of the *Faithful*, and disputed with the Hindoos whether his body should be buried according to their rites, or be burned on the funeral pile. গণেশের উদারতা ও পরমতসহিষ্ণুতা সম্বন্ধে লেখিকার বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ ছিল না কারণ 'রাজা' গণেশদেবের কাহিনী তিনি বর্ণনা করেননি। কিন্তু তাঁর পূর্ববর্তী জীবনকথা রচনাকালে তিনি প্রসঙ্গক্রমে যে দুএকটি কথা এ সম্বন্ধে বলেছেন তা ইতিহাসের বিরোধী নয়। ঐতিহাসিকে মন্তব্য করেছেন যে গণেশের বংশধর যদু সম্ভবত শৈশব থেকেই হিন্দুত্ব হারিয়েছিলেন কোনো বিশেষ কারণবশত; আবার কেউ কেউ অনুমান করেন রাজ্যলাভের পর যদু ধর্মান্তরিত হয়ে জালালুদ্দীন নাম ধারণ করেন। এ সম্পর্কে স্টুয়ার্টের ধারণাটি উদ্ধারের অপেক্ষা রাখে, but the probability is, that he was the offspring of a Mohammedan concubine— এই মন্তব্য অনুসারে গণেশের মুসলমান উপপত্নী ছিল এমন কথা বিশ্বাস করতে হয়। রিয়াজে এ সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি, সেখানে গণেশকে অত্যাচারী ইসলামপীড়করূপে অতিরঞ্জিত ও চিত্রিত করা হয়েছে বলে এ রকম সম্ভাবনার কোনো কথাই উঠে না। পরবর্তী কালের কোনো কোনো ঐতিহাসিক বরং এ ব্যাপারে স্টুয়ার্টপন্থী। 'বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থে দেখা যায় যে রাজ্যলাভের পর ভূতপূর্ব সুলতানের 'বেগমেরা গণেশের উপপত্নীরূপে গৌড়ের রাজ-প্রাসাদেই থাকিলেন। গণেশের নিজ পরিবার পাণ্ডুয়াতে থাকিত। মীর ফর্জন্দ হোসেন লিখিয়াছেন যে, "রাজা গণেশ বেগমদিগকে গোপনে নিকা করিয়াছিলেন। তিনি যখন গৌড়ে থাকিতেন তখন প্রায় মুসলমানের ন্যায় চলিতেন। আবার যখন তিনি পাণ্ডুয়াতে থাকিতেন অতি নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণের ন্যায় সদাচারে থাকিতেন। হিন্দু মুসলমান উভয়

জাতিই তাঁহাকে স্বজাতি জ্ঞান করিত"।'[৭৪] উক্ত গ্রন্থে গণেশের সিংহাসন প্রাপ্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে সুলতান সায়ফুদ্দীনের মৃত্যুর পর পুত্র নসেরিৎ সাহ মুসলমান অমাত্যবর্গের সহায়তায় দ্বিতীয় সামসুদ্দীন নাম ধারণ করে সুলতান হন; অন্য পুত্র আজিম সাহ এর প্রতিকারের নিমিত্ত গণেশের সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই যুদ্ধে উভয় ভ্রাতাই নিহত হন বলে উত্তরাধিকারীর অভাবে 'গণেশ নিজেই সম্রাট হইলেন।' ঘটনার পরিণাম সম্বন্ধেও পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকগণের সঙ্গে তাঁর মতভেদ দেখা যায় না।

স্বর্ণকুমারীর উপন্যাসের শেষাংশে গণেশের পুত্র যাদব এবং শক্তিময়ীর কন্যা গুলবাহারের প্রসঙ্গ অবতারণা করা হয়েছে, মাতৃহীন বালিকার প্রতি সহানুভূতিবশত বালকসুলভ চপলতায় যাদব তাকে বিবাহিত পত্নীর মর্যাদা দান করে ফেলেছেন। গুলবাহার সুলতান গায়সুদ্দীনেরও সন্তান। বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস গ্রন্থে অনুরূপ ঘটনা আছে, 'গণেশের জীবদ্দশাতেই যদু আজিম সাহের কন্যা আশমানতারার প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে ধনবান লোকের পক্ষে উপপত্নী রাখা এবং যবনীগমন দূষ্য ছিল না। আশমানতারার মাতা গণেশের উপপত্নী ছিলেন। সুতরাং গণেশ যদুকে নিবারণের কোন চেষ্টা করেন নাই।' আশমানতারার সঙ্গে ফুলের মালার গায়সুদ্দীন-শক্তিময়ীর কন্যা গুলবাহারের সাদৃশ্য আছে। এরূপ মনে করার আরও কারণ আছে। উপন্যাসের সপ্তদশ পরিচ্ছেদে সেকন্দর সাহের পুত্র গায়সুদ্দীন ও সৈফুদ্দীনের পুত্র আজিম সাহকে এক ব্যক্তি রূপে ধরা হয়েছে: 'নবাবশাহ গায়সুদ্দীন আজিম খাঁ সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্তা' ইত্যাদি। গণেশের যবনী উপপত্নীর (Mohammedan concubine) ভিত্তিতে শক্তিময়ী ও গণেশদেবের প্রণয়কথা রচিত হয়েছে। নিরুপমাকে বিবাহের পরও গণেশদেব আপনার হৃদয়ে শক্তিময়ীর প্রভাব অনুভব করেছিলেন। এমনকি সুলতান গায়সুদ্দীনকে বিবাহের পরও শক্তিময়ীর প্রতি গণেশের একটি প্রচ্ছন্ন দুর্বলতা উপন্যাসের মধ্যে ধরা পড়েছে; পক্ষান্তরে গণেশের প্রতি বিবাহিত শক্তিময়ীর আকর্ষণকথাও উপন্যাসের অন্যতম প্রধান ব্যাপার।

ফুলের মালায় গায়সুদ্দীনের পার্শ্বসহচররূপে যে কুতব চরিত্রটি পাওয়া যায় তার সঙ্গে ইতিহাসের সংযোগ থাকা অসম্ভব নয়। রিয়াজ-উস-সালাতিনের দ্বিতীয় উদ্যানে এরূপ একটি উল্লেখ আছে। 'নূরকোতবাল আলম সুলতান গিয়াসুদ্দীনের একান্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তিভাজন ছিলেন। উভয়েই সমবয়স্ক এবং নাগর (বিরভূম) নিবাসী হামিদউদ্দীনের নিকট একত্র বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। সুলতান কখনও কোতবের নিকট হইতে দূরে থাকিতেন না।'[৭৫] স্টুয়ার্টের গ্রন্থের ১০৬ পৃষ্ঠায়ও একই কথা বলা হয়েছে।

৭৪ বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস, দুর্গাচন্দ্র সান্যাল সংগৃহীত ও ফকিরচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত, ১৩১৭, পৃ ৭৪।

৭৫ রিয়াজ-উস-সালাতিন, পৃ ১০০।

কিন্তু ফুলের মালায় কুতবকে খল ও ষড়যন্ত্রপরায়ণরূপে অঙ্কিত করা হয়েছে। গায়সুদ্দীনের পরামর্শদাতা বন্ধু কুতব সম্বন্ধে লেখিকা সপ্তদশ পরিচ্ছেদে মন্তব্য করেছেন, 'কুতব তাঁহার আর এক প্রিয় বন্ধু, প্রবৃত্তি তাঁহাকে যে পরামর্শ প্রদান করে—কুতব দ্বারা অনুমোদিত হইয়া তাহা কার্যে পরিণত হয়। একজন যেন তাঁহার জীবন-ঘড়ির কাঁটা, আর একজন তাহাতে দম দিবার হাত; উভয়ের কাহাকেও নহিলে তাঁহার চলে না।' অবশ্য তার সমূহ দোষ সত্ত্বেও তাকে সর্বদাই সুলতানের অনুচররূপে উপন্যাসে দেখান হয়েছে।

অতঃপর আধুনিক ঐতিহাসিকগণের মন্তব্যগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত ও আচার্য যদুনাথ সরকার-সম্পাদিত The History of Bengal (১৯৪৮) নামক মহৎ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে ইলিয়াস সাহী রাজবংশ ও রাজা গণেশদেব সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ের বিশিষ্ট লেখক সেকন্দর সাহ ও গায়সুদ্দীনের বিবাদের কথা বলেছেন। প্রাণরক্ষা ও রাজ্যলাভের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য গায়সুদ্দীন রাজধানী পরিত্যাগ করে সোনার গাঁয়ে পলায়ন করেছিলেন, অবশেষে এই বিদ্রোহী পুত্রের নিকট সুলতানের পরাজয় ঘটে। বিজয়ী গায়সুদ্দীন আজম শাহ নাম ধারণ করে বাংলার মসনদে উপবেশন করেন।[৭০] আধুনিক ইতিহাস-রচয়িতার এই সিদ্ধান্ত উপন্যাসের পরিকল্পিত ঘটনা ও পরিণামের পরিপন্থী নয়। লেখিকাও পিতৃদ্রোহীর নাম দিয়েছেন 'গায়সুদ্দীন আজিম খাঁ', সেকথা একটু আগেই বলা হয়েছে।

রাজা গণেশ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক যদুনাথ উক্ত গ্রন্থে যা বলেছেন তার মর্মার্থ হল—গায়সুদ্দীনের পরবর্তী উত্তরাধিকারীগণ ছিলেন দুর্বল। এই সময় রাজপারিষদবর্গের সহায়তায় বেগমগণ নিজ নিজ পুত্রের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য উদ্যোগী হয়ে উঠেন। আবার গায়সুদ্দীনের রাজত্বকালের শেষ ভাগে দিনাজপুরের সামন্তরাজা (a baron) গণেশদেব ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকেন। জমিদারিতে তাঁর নিজের সৈন্যসামন্ত ছিল এবং এরা ছিল অসাধারণ যোদ্ধা; এর সঙ্গে তাঁর অভিজ্ঞতা ও সামর্থ্যের প্রাচুর্য যুক্ত হওয়ায় তিনি রাজদরবারে প্রবল প্রতিপত্তিশালী হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় When the Sultan left behind him only raw youths for his successors, Ganesh naturally became the *de facto* ruler of the state...... We can safely assume that Ganesh worked in concert with certain dowager queens and was followed by such Muslim nobles as were attached to the faction of these ladies....... At

৭০ The History of Bengal, vol. II, Chapter IV, Section VI, pp 123-14.

the very last, Ganesh (now an old man) assumed the crown himself in 817 A. H., after the last Ilyas Shahi prince Ala-ud-din Firuz Shah had met with his death probably in some futile palace intrigue against his regent.[১১] এই শেষোক্ত ব্যক্তির নামের সঙ্গে স্টুয়ার্টে বা রিয়াজে কথিত সুলতানের নামসাদৃশ্য নেই। বেশ বোঝা যায় এ বিষয়ে প্রকৃত সত্যটি এখনও জানা যায়নি কিংবা অবিসংবাদী প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। স্বর্ণকুমারীর সময় এর সঙ্গে কিংবদন্তীর মিশ্রণ ছিল প্রচুর। তাই উপন্যাসের প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ রেখে—যাকে আমরা ইতিপূর্বে ঘটনাসংহতি বলেছি—তিনি যে কোনো একটি নাম গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। স্বর্ণকুমারীর অনুকূলে এইজন্য সহৃদয় পাঠকের সমর্থন পাওয়া যায়।

আচার্য যদুনাথ গণেশদেব এবং তাঁর পুত্র সম্বন্ধে History of Bengal গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। উক্ত পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় ভাগে প্রাচীন ইতিহাস থেকে উপযোগী অংশসমূহের অনুবাদ উদ্ধৃত হয়েছে।[১৮] আলোচ্য উপন্যাসের ঐতিহাসিক উপাদান বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় সারাংশ সেখান থেকে দেওয়া হল। তবকৎ-ই আকবরীর মতে দ্বিতীয় সামসুদ্দীনের মৃত্যুর পর কংশ নামক জনৈক জমিদার বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাঁর মৃত্যুর পর রাজ্যলাভের জন্য গণেশের পুত্র মুসলমান হয়ে সুলতান জালালুদ্দীন নাম ধারণ করেছিলেন। আইন-ই-আকবরী থেকে জানা যায় গায়সুদ্দীনের পৌত্র দ্বিতীয় সামসুদ্দীনকে অপসারিত করে বঙ্গদেশীয় গণেশদেব সিংহাসন আরোহন করেন ও পরে তাঁর পুত্র ইসলাম গ্রহণ করে সুলতান জালালুদ্দীনরূপে খ্যাত হন। তারিখ-ই-ফিরিস্তাতে অনুরূপ ঘটনার বিবরণ আছে, গণেশদেবের মুসলমানপ্রীতির কথা এখানেও উল্লেখ করা হয়েছে। ঐতিহাসিক যদুনাথ এইসকল গ্রন্থ অবলম্বনে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন ফুলের মালার ঘটনাবলীর সঙ্গে স্থূলত তার সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

॥৪॥ ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্রসৃষ্টির দিক থেকে ফুলের মালা স্বর্ণকুমারীর সর্বোৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক উপন্যাসরূপে বিবেচিত হতে পারে। রাজপরিবারে পিতাপুত্রের বিরোধ ও দিনাজপুরের গণেশদেবের সঙ্গে বঙ্গের সুলতানের বংশানুক্রমিক বিরোধ এই উপন্যাসের প্রধান কাহিনী; এই রাজনৈতিক জটিলাবর্তে পতিত কয়েকটি পাত্রপাত্রীর অসহায়তা ও মহিমা পাঠকচিত্তে সুগভীর সহানুভূতি উদ্রেক করে। ঐতিহাসিক চরিত্রসৃষ্টিতে লেখিকা প্রধানত প্রচলিত-ইতিহাসের এবং কিংবদন্তীর অনুসরণ করেছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি যে উপন্যাস

১১ Ibid, chapter V, Sec. III, p 126.

১৮ Ibid, pp 122-25.

রচনা করতে চেয়েছিলেন সেকথা ক্ষণকালের জন্যও বিস্মৃত হননি। তাই সুবিপুল অভিজ্ঞতা ও সুগভীর সহানুভূতির সাহায্যে এই ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি রচনাকালে কেবল তাদের ঐতিহাসিক মহিমা মর্যাদার কথাই বলা হয়নি, তারাও যে মানুষ সে সম্বন্ধে তিনি ছিলেন সর্বদা সচেতন। ঐতিহাসিক চরিত্রকে মানবিকগুণসম্পন্ন করে তোলার এই কার্যে তিনি সমকালীন প্রতিনিধিস্থানীয় লেখকবর্গের সমকক্ষ ছিলেন; এবং এই ব্যাপারে অমূলক ভাবকল্পনা অপেক্ষা অভিজ্ঞতা ও সাধারণ জ্ঞানের আশ্রয় অধিক পরিমাণে গ্রহণ করেছিলেন। ইতিহাস যে ক্ষেত্রে অন্ধকারময় ও নীরব সেখানে লেখকের কল্পনাবৃত্তি সক্রিয় হয়ে উঠে, কিন্তু ছদ্ম-ঐতিহাসিক উপন্যাসে কিংবা রোমান্সে এই বৃত্তির স্বেচ্ছাচার লক্ষিত হয়; প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাসরচয়িতা এই কল্পনাশক্তিকে সংযতভাবে প্রয়োগ করেন বলে যেসকল ঘটনার ও চরিত্রের সম্মুখীন আমরা হয়ে থাকি তা আদৌ অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত কিংবা অপ্রত্যাশিত বলে মনে হয় না। পারম্পর্য এবং সঙ্গতি রক্ষা করা শ্রেষ্ঠ শিল্পীর মহদ্ধর্ম—স্বর্ণকুমারীর সে কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

স্বল্পপরিসরে সেকন্দর সাহের নীতিহীন রূপলালসা অসংযম অস্থিরতা প্রভৃতি ত্রুটির কথা বলে নিয়েছেন লেখিকা; এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর অপরিণামদর্শিতা। শক্তিময়ীর দেহকান্তি সন্দর্শনে অধীর সম্রাটের ক্রোধবহ্নি থেকে আত্মরক্ষার নিমিত্ত পুত্র গায়সুদ্দীন বিদ্রোহী হয়ে পড়েন। স্পষ্টই বোঝা যায় লেখিকা এই ব্যাপারে ইতিহাসের অনুসরণ করেননি। গায়সুদ্দীনের প্রতিকূলতার কারণরূপে বিমাতার চক্রান্তের কথা উল্লেখ না করে এবং কেন্দ্রীয় চরিত্র শক্তিময়ীকে সমস্ত বিপর্যয়ের কেন্দ্রস্থলে উপস্থাপিত করে ঘটনার সংহতি রক্ষা করেছেন লেখিকা। তার সঙ্গে সুলতানের চরিত্রদৌর্বল্য ও মানসিক বিকৃতিকে যুক্ত করে দিয়েছেন। প্রবৃত্তির নিরঙ্কুশ আধিপত্য কি প্রকারে মানুষের বুদ্ধিনাশ করে এবং কি ভাবে 'বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি', তার শোচনীয় চিত্র ইতিপূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণকান্তের উইল (৪র্থ সং, ১৮৯২), সীতারাম (৩য় সং, ১৮৯৪) প্রভৃতির মধ্যে অঙ্কন করেছিলেন। ফুলের মালার মধ্যে সেকন্দর সাহ ও গায়সুদ্দীনের একই পরিণাম প্রদর্শিত হয়েছে। কিন্তু লেখিকার কৃতিত্ব হল এইসকল চরিত্রের পতনের কথা বর্ণনায় তিনি উল্লসিত হননি। তাদের অসহায়তা লেখিকার হৃদয় স্পর্শ করেছিল বলে পাঠকের সহানুভূতিও এত বিপুল পরিমাণে জাগ্রত হয়। উনবিংশ পরিচ্ছেদের অবিমৃশ্যকারী অস্থিরচিত্ত সুলতানের ক্রমবর্ধমান ক্রোধ বিংশ পরিচ্ছেদে নিঃসঙ্গের আর্তনাদে রূপান্তরিত হয়েছে। পুত্র গায়সুদ্দীন, সামন্ত গণেশদেব, এমনকি প্রধান অমাত্য পর্যন্ত যখন তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছেন এবং সকলে তাঁর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করেছেন সেই বিপন্ন অবস্থায় তাঁর প্রচণ্ড তেজস্বিতা, পরিণাম সম্বন্ধে সুনিশ্চিত ধারণা সত্ত্বেও সংগ্রামপরায়ণতা পাঠকচিত্তে যুগপৎ আতঙ্ক ও করুণা সৃষ্টি করে। তাঁর চরিত্রের

মধ্যেই এই ভয়াবহ পরিণামের সম্ভাবনা নিহিত ছিল, লেখিকা প্রথমাবধি সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন বলে পৌর্বাপর্য কোথাও অস্বীকৃত হয়নি।

শক্তিময়ীর রূপবহ্নির অন্ততম পতঙ্গ সুলতানপুত্র গায়সুদ্দীন। তাঁর রূপলালসায় ইন্ধন যুগিয়েছে পার্শ্বচর একান্ত বিশ্বাসী কুতব। পিতৃমনোনীতাকে গ্রহণ করে তিনি বিদ্রোহীতে পরিণত হন, তজ্জন্য পিতাকে যুদ্ধে পরাভূত ও নিহত করতেও দ্বিধা বোধ করেননি। কিন্তু সমস্ত ঐশ্বর্যের বিনিময়েও তিনি শক্তিময়ীর হৃদয় জয় করতে অসমর্থ হন। সুলতানের পরিণীতা হয়েও শক্তিময়ী যখন কারাগারে প্রবেশ করেন গণেশদেবকে কৌশলে মুক্তিদানের জন্য, তখন এ সংবাদে সম্রাট গায়সুদ্দীন বিচলিত হয়ে পড়েন। কুতবের চক্রান্তে ও অপব্যাখ্যায় তাঁর চিত্তে যে সংশয় জাগ্রত হয় তার চিত্র সত্যই মর্মস্পর্শী। ব্যভিচারে লিপ্ত গণেশদেবের ছিন্নমুণ্ড দেখতে তিনি চেয়েছিলেন কিন্তু বেগম সম্বন্ধে এইরূপ কঠোরতা প্রদর্শন করতে পারেননি সুলতান। তিনি কুতবকে বলেছিলেন, 'বেগমসাহেবকে তোমায় কিছুই বলিতে হইবে না—তাঁহার সহিত বুঝাপড়া আমার, অন্যের সে সম্বন্ধে কিছু করিতে হইবে না।' শক্তিময়ীর প্রতি তাঁর প্রেমের গভীরতা ব্যাপকতা ও তীব্রতার প্রমাণ পাওয়া যায় 'উপসংহারে'। ঘটনাচক্রে ঘাতকের অসতর্কতা বশত শক্তিময়ী নিহত হলে গায়সুদ্দীন এই শোক সহ্য করতে পারেননি। শক্তি যেন তাঁর জীবনের আশ্রয়ভূমি, তার অভাব হেতু তিনি ছিন্নমূল বৃক্ষের মত ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়ে পড়েছিলেন। শক্তির অপমৃত্যুতে গায়সুদ্দীনের মানসিক সমতার এই বিনষ্টি প্রেমিক গায়সুদ্দীনের সুস্পষ্ট পরিচয় বহন করে। শক্তিময়ীকে লাভের জন্য বিপুল উদ্যোগ-আয়োজনের মধ্যে তাঁর প্রণয়ী সত্তার যে বিকাশ ঘটেছিল তারই ফলে তিনি সুলতান হয়েছিলেন, আবার শক্তিময়ীর জন্যই তাঁর হৃদয় বারংবার প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে অধিকতর আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছিল। শক্তিময়ীর এই বিরুদ্ধতা তাঁকে অশান্ত করে তুললেও উন্মূলিত করে দেয়নি। বলাবাহুল্য এর জন্য তাঁর অগাধ বিশ্বাস ও একনিষ্ঠতার দায়িত্ব অধিক। সেই বিশ্বাসের অভাবে তিনি যেন ঐশ্বর্যের সমুচ্চ শিখর থেকে দারিদ্র্যের অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হলেন। তাঁর এই শোচনীয় ব্যর্থতায় ও মর্মন্তুদ পরিণামে তিনি সহৃদয়হৃদয়সংবাদী হয়ে পড়েছেন।

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র গণেশদেবের জীবনকে কেন্দ্র করে লেখিকার আশা-আকাঙ্ক্ষা আবর্তিত হয়েছিল। দীর্ঘকালব্যাপী মুসলমান আধিপত্যের মধ্যে একটি স্বল্পক্ষণস্থায়ী সুন্দর ব্যতিক্রম বাংলাদেশের দুর্ভাগ্যের মেঘান্ধকারে বিদ্যুচ্চমকের মত উদ্ভাসিত হয়। গণেশদেব সেই সম্ভাবনার প্রথম পুরুষ, পথিকৃৎ। তাই কোনো কোনো ঐতিহাসিকের একদেশদর্শিতার কথা বিস্মৃত হয়ে তাঁকে কর্তব্যপরায়ণ উদ্যোগী পুরুষসিংহরূপে লেখিকা অঙ্কন করেছেন। রিয়াজ-উস-সালাতিন-এ গণেশদেব নিন্দিত, কিন্তু লেখক তাঁর কূটনীতিজ্ঞান ও হিন্দু-

মুসলমানে সমদর্শিতার কথা উল্লেখ করতে কদাপি দ্বিধা করেননি। ফুলের মালা উপন্যাসে গণেশদেবের জীবনের উদ্যোগপর্ব ও অভ্যুত্থানের কথা বিবৃত হয়েছে। নানাবিধ ঘাত-প্রতিঘাতের কণ্টকাকীর্ণ পথে তিনি অগ্রসর হয়ে চলেছেন। স্বশক্তিতে ঐকান্তিক আস্থা সত্বেও তিনি যে কেবলমাত্র বাহুবলে সাম্রাজ্য লাভ করেছিলেন লেখিকা সেই অবিশ্বাস্ত রূপকথাকে কোথাও প্রশ্রয় দেননি। কণ্টকসমাকীর্ণ বন্ধুর পথকে তিনি কুসুমাস্তীর্ণ বীথিকায় পরিণত করেন। সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী অরাজকতা ও গৃহযুদ্ধের কুটিল ঘটনাচক্রকে তিনি নিজের অনুকূলে নিয়ন্ত্রিত করেছেন মাত্র। লেখিকা গণেশদেবের জীবনের এই বিশ্বাস্ত চিত্র অঙ্কন করে ইতিহাসজ্ঞানের সঙ্গে বাস্তবতার মাত্রাবোধের পরিচয় দিয়েছেন। এই কারণে সমালোচক স্বীকার করেছেন, 'গণেশদেব কতকটা রোমান্সের নায়কের লক্ষণাক্রান্ত হইলেও একেবারে অবাস্তব নহে।'

শক্তিময়ীর প্রতি তাঁর মানসিক প্রচ্ছন্ন প্রবণতা লেখিকা পরম ধৈর্যসহকারে নিপুণভাবে অঙ্কন করেছেন। নিরুপমা ও শক্তিময়ীর মধ্যে গণেশদেব যে শেষোক্ত রমণীর প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট ছিলেন তা তাঁদের বাল্যলীলার একটি ঘটনা (প্রথম পরিচ্ছেদ) থেকেই জানা যায়। বিবাহিত গণেশদেবের সঙ্গে দীর্ঘ কাল পরে পূর্ণযৌবনা শক্তিময়ীর যখন সাক্ষাৎ হয় তখন থেকেই গণেশদেবের দ্বিধাগ্রস্ত মানসিকতার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। সহধর্মিণী নিরুপমার প্রতিও তাঁর কর্তব্যপরায়ণতা কিন্তু প্রেমহীন ছিল না। নিরুপমার প্রশান্ত সৌন্দর্য এবং পবিত্রতা-সরলতা গণেশদেবের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে অথচ শক্তিময়ীর উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বময় প্রতিভাদীপ্ত মহিমার প্রভাবকেও তিনি অতিক্রম করতে পারেননি। অন্যান্য ক্ষেত্রে সাধারণত এরকম অবস্থায় কর্তব্যবোধ ও প্রবৃত্তির উদ্দামলীলার ঘাত-প্রতিঘাতের উপর জোর দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু আলোচ্যমান উপন্যাসে দেখা যায় নিরুপমার প্রতি গণেশদেবের সহানুভূতিপূর্ণ প্রণয়েরও অভাব ছিল না; সরলহৃদয়া পত্নীর প্রতি অগাধ স্নেহ ও প্রেম শেষ পর্যন্ত গণেশদেবকে নৈতিক অধঃপতন এবং বিকৃতি থেকে রক্ষা করেছিল। অপরদিকে শক্তির দেহকান্তিই যে তাঁকে কেবল বিব্রত করেছে তা নয়, বাল্যকালে চপলতা বশত তিনি একদা শক্তিময়ীর সঙ্গে মালাবদল করে তাঁকে রানীর মর্যাদা দিয়েছিলেন সেকথা তিনি বিস্মৃত হতে পারেননি। সর্বোপরি শক্তিময়ী সেই বাল্যস্মৃতি হৃদয়ে বহন করে আজও অবিবাহিত রয়েছেন, তাই তাঁর এই নিষ্ঠাকেও গণেশদেব অবহেলা করতে পারেন না। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে এই সংকটের পরিচয় দেওয়া হয়েছে, 'রাজকুমার সেই রোরুদ্যমানা প্রেমময়ী পত্নীর মস্তক ক্রোড়ে করিয়া দারুণ যন্ত্রণাপূর্ণ হৃদয়ে নীরব হইয়া রহিলেন। একদিকে শক্তিকে বিবাহ করিয়া আনিলে নিরুপমার মত কোমল লতিকার হৃদয় দলিত করিতে হয়—অন্যদিকে শক্তিকে বিবাহ না করিলে তাহার ধর্ম নষ্ট হয়, যে

তাঁহাকে পতিরূপে বরণ করিয়াছে, তাহাকে বাধ্য হইয়া অন্যের পাণিগ্রহণ করিতে হয়। তিনি এখন কি করিবেন?' এইরূপ উভয়সংকটে পতিত হয়ে গণেশদেব বিভ্রান্ত; তাঁর জীবনে যে জটিলতা দেখা দিয়েছে তার সমাধানে তিনি অপারগ। শক্তির দুর্জয় অভিমান ও হঠকারিতা গণেশদেবকে অন্তর্বিরোধের এই শ্বাসরোধকারী যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দান করেছে। দুরন্ত আত্মাভিমানবশত ও প্রণয়-প্রত্যাখানের প্রতিশোধ গ্রহণার্থ শক্তিময়ী গায়সুদ্দীনকে বরণ করেন, ফলে গণেশদেব নিশ্চিন্ত হলেন কারণ পরস্ত্রীলোলুপতা যে অধর্ম এ কাণ্ডজ্ঞান তাঁর ছিল প্রখর। এ পর্যন্ত গণেশদেবের হৃদয়ের বৃত্তি ও মানবিক দোষগুণগুলি লেখিকা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরীক্ষণ করেছেন। অতঃপর তিনি বহুল পরিমাণে আদর্শায়িত হয়ে উঠেছেন। এইভাবে লেখিকার অন্তরূপ অভিপ্রায় চরিত্রটিকে অবলম্বন করে চরিতার্থতা অর্জন করেছে। তবু বলা যায় গণেশদেবের হৃদয়ের এই ক্ষত চিরকাল তাঁকে আড়ষ্ট করে রেখেছিল। পরবর্তী কালে তিনি এ সম্বন্ধে একাধিকবার চিন্তা করেছেন ও আপনার অপরাধ অনুভব করেছেন। 'শক্তির অবস্থা গণেশদেবের হৃদয়ে কণ্টকের মত বিঁধিয়াছিল। যদিও তিনি তাহার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী নহেন—তথাপি এই ঘটনায় তিনি নিয়ত মনে মনে অপরাধীর আত্মগ্লানি অনুভব করেন। এখন তাঁহার মনে হইতে লাগিল, এইত একজন ক্ষুদ্র রমণীর সুখ শান্তি ধর্মের উপর কুঠারাঘাত করিয়া, নিজের পৌরুষিক ধর্ম জলাঞ্জলি দিয়া লৌকিক ধর্ম রক্ষা করিলাম, সমাজবিপ্লব রহিত করিলাম, কিন্তু তাহার ফল কি অপর্যাপ্ত হিত? লোকে জানুক না জানুক, আমি জানি এই রাজ্যবিপ্লব সেই ক্ষুদ্র একজনের প্রতি অন্যায়ের প্রতিফল। সমগ্র বঙ্গদেশ আপনার রক্তপাতে সেই সামান্য নারীর কষ্টের প্রায়শ্চিত্ত বহন করিতেছে।' শক্তির জীবনের ব্যর্থতা বঙ্গদেশের দুর্দশার কারণরূপে পরিকল্পিত হওয়ায় তার চরিত্র মহাকাব্যোচিত বিশালতা ও সমুন্নতি লাভ করেছে। পক্ষান্তরে শক্তিসম্বন্ধীয় গণেশদেবের এই দীর্ঘ চিন্তা তাঁর প্রচ্ছন্ন মানসিক প্রবণতারই দ্যোতক। ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে পরিণীতা শক্তিময়ীর অভিসারের প্রতিবাদে রাজা গণেশদেব 'প্রশান্ত গম্ভীর অপক্ষপাতী কঠোর বিচারক'-এর ভাব ধারণ করলেন। কারাগারে বন্দী রাজা গণেশের এই কঠোরতা ও প্রতিকূলতা তাঁর বাল্যপ্রণয়িনীর প্রতি অনুরাগের মতই সুতীব্র। তাই শক্তির অনুরোধে ও সহায়তায় তিনি কারাগার থেকে পলায়ন করেননি এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি শক্তিময়ীর স্নেহপ্রেমকে উপেক্ষা করেছেন। গণেশদেবের চরিত্রের দৃঢ়তা ও অপূর্ব সংযম এইসকল প্রসঙ্গে অসামান্যতাকে স্পর্শ করেছে; রূপলোলুপ ও মোহগ্রস্ত সেকন্দর সাহ এবং গায়সুদ্দীনের প্রতিতুলনায় বর্তমান চরিত্রটি মহিমময় হয়ে উঠেছে। সংগ্রামী পুরুষকার, চারিত্রিক দার্ঢ্য, সংযমের আত্যন্তিকতা এই চরিত্রের আধারে পরিবেশিত হয়েছে বলে তিনি আদর্শ ও কল্পলোকের অধিবাসীরূপে পর্যবসিত এরূপ মনে হয়। এ রকম একজন

চরিত্রবান ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নায়কের যে প্রয়োজন ছিল সেকথা অস্বীকার করা যায় না, কারণ তাঁকে কেন্দ্র করেই মুসলমানের অপ্রতিহত প্রভাবের মধ্যে হিন্দুশক্তির বিস্ময়কর অভ্যুত্থান ঘটেছিল। এত বড় একটি ঘটনার যোগ্য কেন্দ্রীয় পুরুষকে অসাধারণত্ব স্বাভাবিক-ভাবেই স্পর্শ করবে।

ফুলের মালার সর্বাপেক্ষা জটিল চরিত্র শক্তিময়ী। তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্ব ও স্পর্শকাতর আত্মমর্যাদাবোধ পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে; তা এতই প্রবল যে তার অভিঘাত প্রতিটি মুহূর্তে পাঠককে স্তব্ধ করে দেয়। শক্তির এই দৃপ্ত অভিমান ও তেজস্বিতা কতকটা অতিনাটকীয় হলেও অস্বাভাবিক হয়নি। লেখিকা তাঁর দেহকান্তির যে বর্ণনা দিয়েছেন তার মধ্যেই এরূপ সম্ভাবনা নিহিত। 'শক্তি গৌরী, কিন্তু সাধারণ বঙ্গবালার ন্যায় চম্পক বা কোমল পাণ্ডুবরণী নহে, তাহার বর্ণ ইরানীর ন্যায় তেজোরাশিতে প্রফুল্ল প্রদীপ্ত স্বুবর্ণাভ। কেবল বর্ণ নহে, তাহার সুঠাম সুদীর্ঘ নাসার বক্ররেখাযুক্ত নিমীলিতপ্রান্ত ওষ্ঠাধরে, মধ্যবিভক্ত ক্ষুদ্র চিবুকে, কৃষ্ণভ্রূধনুনিম্নস্থ ঘনপত্রশালী নীল নয়নের দৃষ্টিতে আত্ম-গরিমাময় গর্বিত দীপ্ত সৌন্দর্য প্রকটিত। তাহার আননের এই তেজ এই দীপ্তি ম্লানস্নিগ্ধ গৈরিক পরিচ্ছেদে, কুঞ্চিত অলকগুচ্ছের সংস্পর্শে, নয়নের প্রেমময় আবেগচাঞ্চল্যে এবং অধরপুটের আনন্দ বিস্ফুরিতভাবে, আপাততঃ অতি মধুর কোমল কমনীয়তা লাভ করিয়াছিল।' (পঞ্চম পরিচ্ছেদ) সকলদিক থেকেই শক্তির অসাধারণত্ব স্বীকৃত হয়েছে। বাল্যসখা গণেশদেবের প্রতি চিত্তের আকর্ষণ-বিকর্ষণের মধ্যে চরিত্রটির উদ্ভব ক্রমবিকাশ ও পরিণতি। খেলাচ্ছলে একদা রাজকুমার গণেশ তাঁকে বরণ করেছিলেন, বাল্যক্রীড়ার সেই মধুর স্মৃতিকে শক্তি আপনার হৃদয়াভ্যন্তরে লালন করে এসেছেন। তাই তিনি যখন জানতে পারলেন যে গণেশদেব বিবাহিত তখন প্রচণ্ড অভিঘাতে তাঁর সুখস্বপ্ন বিপর্যস্ত হয়ে গেল; প্রবল আত্মমর্যাদাজ্ঞান হেতু তিনি অভিমানী হয়ে উঠলেন, ব্যর্থ প্রণয়ের অন্তর্জ্বালায় তিনি এর প্রতিশোধবাসনায় উন্মত্তপ্রায় হয়ে উঠলেন। তাঁর এবংবিধ আচরণ বর্ণনায় লেখিকা উপযোগী উপমানসমূহ গ্রহণ করেছেন; তন্মধ্যে 'হলাহলপূর্ণ স্বর', 'উল্কাপিণ্ডের অতিবেগ', 'ঘনীভূত ভীষণ ছায়াপুঞ্জ', 'শূন্য আকাশে প্রজ্জ্বলিত তারকারাশি' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই হতাশা ও প্রতিহিংসার তাড়নায় তিনি সুলতানের বেগম হয়েছিলেন, গণেশদেবের বিরুদ্ধে চরম ষড়যন্ত্রও তিনি করেছিলেন, তথাপি হৃদয় শান্ত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে গণেশের প্রত্যাখ্যানে তিনি নিজেকে অপমানিত বোধ করেছিলেন সত্য এবং তাঁর উচ্ছেদ-কল্পে তিনি যে ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের জাল রচনা করেছিলেন একথাও মিথ্যা নয়; তথাপি বাল্যপ্রণয়ীর প্রতি তিনি বরাবরই বিশেষভাবে দুর্বল ছিলেন। শক্তিময়ীর চিত্তের এই জটিল অবস্থাকে মনস্তত্ত্বসম্মত উপায়ে লেখিকা পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন। তাঁর প্রতিহিংসা

ও প্রেম উপেক্ষা ও আসক্তি কোনোটিই মিথ্যা নয়—একটি অপরটির পরিণামরূপেই উপস্থাপিত হয়েছে। সুলতানের বেগম হয়েও তিনি গণেশদেবকে বলেছিলেন, 'আমার হৃদয় মন দেহ অকলঙ্কিতভাবে এখনও তোমারই।' (ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ) তাঁর প্রণয়ের এই নিষ্ঠাকে আদৌ অস্বীকার করা চলে না তা সে যতই সমাজবিগর্হিত হোক না কেন।

সবচেয়ে মর্মান্তিক ব্যাপার হল, প্রাণ দিয়ে তিনি তাঁর জীবনের এই সমস্যার সমাধান করেছেন। কৌশলে গণেশদেবকে কারাগার থেকে মুক্তিদান করে তিনি বন্দীর স্থলে রয়ে গেলেন। লেখিকা এই প্রসঙ্গে তাঁর চরিত্রের একটি সার্থক সুন্দর পরিণামের আভাস দিয়েছেন। 'এতদিনে তাহার একটি বাসনা পূর্ণ হইল! একটি বাসনা, কিন্তু আজীবনের আবেগ-কেন্দ্রীভূত শেষ বাসনা! ইহার সিদ্ধিতে সে পরম সিদ্ধিলাভ করিল, ইহার সফলতায় তাহার চিরনৈরাশ্য মুহূর্তে অসীম আনন্দ-সমুদ্রে যেন বিলুপ্ত হইয়া পড়িল।......আনন্দ-উথলিত কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে সে ঈশ্বরাহ্বান করিয়া কহিল, হে করুণাময় ভক্তবৎসল, এতদিন তোমার অকারণ নিন্দা করিয়াছি—সেজন্য আমাকে ক্ষমা কর···ক্রমে শক্তির ভিন্ন-জ্ঞান লোপ হইল, তাহাদের (গণেশদেব ও শক্তিময়ীর) দুই আত্মা এক হইয়া বিশ্বের সমগ্র আত্মায় বিলীন হইয়া পড়িল, ক্ষুদ্র প্রেম মহান প্রেমে মগ্ন হইয়া গেল, এক আনন্দময় মহাচৈতন্যের মধ্যে শক্তি গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল।' (চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ) জীবনের সমূহ ব্যর্থতা ও হতাশার মধ্যে শক্তিময়ীর প্রণয় এক অভিনব সার্থকতা লাভ করেছিল। গণেশদেবের প্রতি তাঁর এই অকৃত্রিম ভালবাসাই দয়িতের প্রাণরক্ষায় তাঁকে নিয়োজিত করেছিল। মহৎ প্রেম যে কেবল গ্রহণ করে না, আত্ম-বিসর্জনের মধ্যেই যে তার চরম সার্থকতা এই উপলব্ধি শক্তিময়ীর জীবনে একটি অভিনব প্রেরণা আনয়ন করেছিল। প্রিয়জনের কল্যাণকামনায় তাঁর এই আত্মত্যাগ পাঠকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।

॥৫॥ ফুলের মালার কয়েকটি অধ্যায়ের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এইসকল স্থলে লেখিকার সুগভীর জীবনবোধ ও ব্যক্তিগত ভাবভাবনা আশ্রয় পেয়েছে।

অষ্টম ও নবম পরিচ্ছেদে শক্তিময়ী ও যোগিনীর যে কথোপকথন আছে তার মধ্যে সুপরিণত জীবনদর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতিশোধপরায়ণ শক্তিময়ীকে যোগিনী অনুরোধ করেছেন, 'বৎসে, শান্ত হও। কোমল প্রকৃতি স্ত্রীলোকের প্রতিশোধ-প্রবৃত্তি নিতান্ত অশোভন, জঘন্য, বীভৎস। তুমি কি মনে কর, তোমারই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য, তোমার অঙ্গুলি-তাড়নে চালিত হইবার জন্য বিশ্বসংসার সৃষ্ট হইয়াছে?···তোমার কষ্ট তোমারই কর্মফল—তাঁহাকে (গণেশকে) দোষী করা বৃথা।' শক্তি হৃদয়ধর্মের দোহাই দিলে সন্ন্যাসিনী বলেছেন, 'হৃদয়ের ধর্ম উচ্চ ধর্ম, হৃদয়ের অধিকার উচ্চাধিকার, সন্দেহ নাই। কিন্তু হৃদয়ধর্ম বলি কাহাকে? পারস্পরিক প্রেমভাবই হৃদয়ধর্ম। তুমি তাহাকে ভালবাস,

সেও যদি তোমাকে ভালবাসে তবেই তো প্রণয়বন্ধন ;...একপক্ষ প্রেমের কোনই অধিকার নাই।...বৎসে, ভগবান আমাদিগকে দুঃখকষ্ট দিয়া তাঁহার ন্যায়ধর্ম রক্ষা করেন বলিয়া কি তিনি আমাদের নিকট দোষী ? সেইরূপ রাজকুমার তোমাকে ভালবাসিয়াও যদি তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকেন, তোমার সুখ অবজ্ঞা করিয়া থাকেন, তবে সে কেবল কর্তব্যের অনুরোধ ; কর্তব্যের জন্য প্রাণাধিকা তোমা হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া কেবল তোমার সুখ নহে তাঁহার নিজের সমস্ত জীবনের সুখশান্তি পর্যন্ত বিসর্জন দিতেছেন। এইরূপ অবস্থায় তিনি প্রতিশোধের পাত্র নহেন, শ্রদ্ধার পাত্র।' নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই সন্ন্যাসিনী এসকল কথা শক্তিকে জানিয়েছেন, 'আমিও একদিন ঐরূপ ভাবিতাম, হৃদয়ের ধর্মকেই একমাত্র ধর্ম বলিয়া জানিতাম ; হৃদয়দেবতাকে সাক্ষাৎ ভগবানরূপী বলিয়াই ভাবিতাম ; ঈশ্বরের রাজ্যে যাহা কিছু সত্য শিব সুন্দর তাহা তাঁহাতেই উপলব্ধি করিতাম ; তাঁহার বাক্য ধ্রুবসত্য, তাঁহার কার্য অপাপবিদ্ধ পুণ্যময় বলিয়াই জানিতাম ; সংসারের মানুষের ন্যায় যে তাঁহাতে কিংবা তাঁহার আচরণে পাপ তাপ কলঙ্ক স্পর্শ করিতে পারে—এরূপ ধারণাই আমার ছিল না। কিন্তু পরে বুঝিলাম ইহা মিথ্যা ধারণা, ভ্রান্ত বিশ্বাস। সংসারে জন্মগ্রহণ করিলে ভগবানকেও সংসারনিয়মের অধীন হইতে হয়, সংসারধর্ম দিয়া হৃদয়ধর্মকে বাঁধিলেই তবে তাহার পবিত্রতা, তাহার মাহাত্ম্য রক্ষিত হয় ; নহিলে সমাজ-ধর্মের উল্লঙ্ঘনে হৃদয়ধর্ম উচ্ছৃঙ্খল ব্যভিচারী হইয়া' উঠে। কেবল জন্মচক্র বা কর্মফলবাদের উপর একান্ত নির্ভরশীল হয়ে উঠেননি লেখিকা, হৃদয়ধর্মের সঙ্গে সমাজধর্মের সমন্বয় সাধনেও ত্বরান্বিত হয়েছেন। সমাজবদ্ধ মানুষের সমাজের প্রতি যে একটি মহান দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে সেকথা উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশে অভিনবভাবে অনুভূত হয়েছিল ; আত্মপরতা স্বার্থসিদ্ধি অপেক্ষা পরের জন্য হৃদয় কুসুমকে প্রস্ফুটিত করার কথা, মনুষ্যজাতির উপর প্রীতির কথা বাঙালি এই পর্বে নূতন করে অনুভব করেছিল। যুগধর্মই এক্ষেত্রে সাহিত্যে সমর্পিত হয়েছে কারণ তা ইতিপূর্বেই বিভাবিত হয়েছিল লেখিকার উদার হৃদয়ে।

উপন্যাসের পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে আশ্রিতরক্ষার সমস্যা দেখা দিয়েছে। 'আশ্রিতরক্ষা অন্যায়দমন রাজধর্ম' এই সুমহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে গণেশদেব মাতৃআজ্ঞাকেও পর্যন্ত অস্বীকার করেছেন। শরণার্থী সাহেবুদ্দীনের জন্য নবাবের বিরুদ্ধতা অনিবার্য, এবং একজনের জন্য সহস্রজনের প্রাণহানি অবশ্যম্ভাবী ; এই সংকটে কিন্তু গণেশদেবের সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোনো অস্পষ্টতা বা দ্বিধা নেই। 'আগে হইতে লাভ-লোকসানের পরিমাণ নির্ধারণ, ফলাফল গণনা করিয়া কর্তব্য মীমাংসা করা কি ক্ষীণদৃষ্টি মানবের পক্ষে সম্ভবে ? তাহা হইলে ন্যায় মহত্ত্ব ধর্মের প্রকৃতপক্ষে কোন কার্যকরী অস্তিত্বই থাকে না।' তাই কল্যাণকর ব্রতে দীক্ষিত রাজা গণেশদেব মাতার ভর্ৎসনা পর্যন্ত উপেক্ষা করেছেন। সাহেবুদ্দীনের

রক্ষাকল্পে তাঁর এই বিস্তৃত আত্মবিশ্লেষণ ভবিষ্যতের বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করেছে।

এই পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে প্রকৃতিপুঞ্জের চিত্র পাওয়া যায়। রাজদরবারে সমবেত জনগণের রাজানুগত্য অস্থিরচিত্তা এবং তার বৈপরীত্যে মহারাজ গণেশদেবের সহৃদয়তা ও আবেদনের প্রসঙ্গ লেখিকা নিপুণ তক্ষকের মত ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে এই সভার উদ্দেশ্য: 'সাহেবুদ্দীন সম্বন্ধে তাহাদিগের মতামত জানিতে রাজা তাহাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন।' চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদেও প্রজাসাধারণের একটি ভগ্নাংশের পরিচয় পাওয়া যায়। বলাবাহুল্য এই দুইটি অধ্যায় দিনাজপুরের প্রতিবেশে রচিত। 'যুদ্ধের প্রতি সাধারণ লোকের মনোভাব, তাহাদের মনে স্বাচ্ছন্দ্যপ্রিয়তা ও দেশপ্রীতির সংঘর্ষের কতকটা ইঙ্গিত' এইসকল অধ্যায় থেকে পাওয়া যায়। একটি প্রশংসনীয় উদ্যমের আভাস পাওয়া যায় এই প্রসঙ্গে—গণেশদেব 'রাজধানীর মুখ্য প্রজামণ্ডলী'র সঙ্গে পরামর্শ করে এ ব্যাপারে ভবিষ্যৎ রাজনীতি ও কর্তব্য নির্ধারণ করতে চেয়েছিলেন।

।৬। ফুলের মালা উপন্যাসটি ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। মডার্ন রিভিয়ু পত্রিকার ১৯০৯ সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর সংখ্যার মধ্যে গ্রন্থটির সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশিত হয় ধারাবাহিকভাবে। পত্রিকায় প্রকাশিত পরিচ্ছেদের সংখ্যা হল উনচল্লিশ, এর মধ্যে উপসংহারটি অবশ্য ধরা হয়নি; অর্থাৎ উপসংহার সমেত মোট পরিচ্ছেদসংখ্যা চল্লিশ। কিন্তু নভেম্বরের সংখ্যা পর্যন্ত চৌত্রিশটি পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হয়, তারপর ডিসেম্বরের মধ্যে পঁয়ত্রিশের কোনো উল্লেখ না করে একেবারে ছত্রিশ থেকে আরম্ভ করা হয়েছে। তাই মুদ্রণ-প্রমাদের কথা স্বীকার করলে পত্রিকায় প্রকাশিত ইংরেজি অনুবাদের পরিচ্ছেদসংখ্যা দাঁড়ায় উপসংহারসহ মোট উনচল্লিশ। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে মূল গ্রন্থের উপসংহারসহ পরিচ্ছেদের সংখ্যা হল পঁয়ত্রিশ। বেশ বোঝা যায় মূল গ্রন্থের কোনো কোনো পরিচ্ছেদকে একাধিক পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে অনুবাদ করা হয়েছিল।

গ্রন্থের অনুবাদিকার নাম ক্রিষ্টিনা আলবার্স। মডার্ন রিভিয়ুর ১৯ ৯ সালের এপ্রিল সংখ্যার ৩২৭ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিতভাবে গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া হয়েছে—The Fatal Garland / by / Srimati Svarna Kumari Devi / English Edition / by / A. Christina Albers. অনুবাদক বিদেশিনীর লিখিত একটি ক্ষুদ্র ভূমিকাও পত্রিকায় দেওয়া হয়েছে, নীচে তা উদ্ধৃত হল।

Introduction./ This story which has some events of Indian history of the 14th century as its background, contains much of Indian philosophy, which give it its main value. We trust it will do something towards

making our Western friends better acquainted with Hindu ideas. It is remarkable how little even Englishmen who have lived for years in this country in many cases understand Hindu thought. The Hindus have struggled for many centuries and under different foreign rules, and they have maintained their originality under the greatest difficulties and hardships, a little of which this book shows. We further see by it that the martial spirit which is now almost entirely lost, was very strong in those days. With exception the customs, manners, thoughts and tendencies of the people are greatly the same to-day as they were in the days to which this tale carries us back./ A. C. Albers.

এই স্বল্পায়তন ভূমিকার মধ্যে এতদ্দেশীয় মানুষ ও তাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতি অনুবাদিকার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ফুটে উঠেছে ; কেবল তাই নয়, ভারতীয় দর্শনের মহিমা সম্বন্ধেও তাঁর সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাব পরিলক্ষিত হয়।

১৯১০ খৃস্টাব্দে ফুলের মালার ইংরেজি অনুবাদটি চিত্রসম্বলিত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল, এবং তার পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ১৬৩।[৭৯] এই অনুবাদের ফলে লেখিকার খ্যাতি বিদেশী সমাজেও ছড়িয়ে পড়ে, এবং এই খ্যাতির প্রসারের দ্বারাও ফুলের মালার জনপ্রিয়তা প্রমাণিত হয়।

৭

বঙ্কিমচন্দ্র-রমেশচন্দ্রের মত স্বর্ণকুমারী ঐতিহাসিক রোমান্স কিংবা উপন্যাস রচনার পর সামাজিক উপন্যাসে হস্তক্ষেপ করেছেন। রমেশচন্দ্র দত্তের এইরূপ কক্ষপরিবর্তনের কারণ অনুসন্ধানকালে প্রমথনাথ বিশী মন্তব্য করেছেন, 'ঐতিহাসিক উপন্যাস রচয়িতা রমেশচন্দ্র পরিণত বয়সে সম্পূর্ণ ভিন্নজাতের সামাজিক উপন্যাস লিখিতে গেলেন কেন? বাহ্য কারণ এই যে, ইতিমধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র সামাজিক উপন্যাস রচনার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু অন্য কারণও আছে, সেটা মানসিক।···যে সংস্কারের ভার যুগধর্ম ও মানবচরিত্রের স্বাভাবিক গতির উপর ছাড়িয়া দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চিন্ত ছিলেন, রমেশচন্দ্র তাহাকেই আইন প্রণয়ন ও

৭৯ সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, ২৮শ সংখ্যা, পৃ ১৭।

শিল্পের মাধ্যমে ত্বরান্বিত করিয়া তুলিতে সচেষ্ট ছিলেন'[৮০] এবং তাই তিনি সামাজিক উপন্যাস লিখেছিলেন। স্বর্ণকুমারীর এবংবিধ আচরণের ব্যাখ্যা হিসাবেও এ সূত্রগুলি প্রযুক্ত হতে পারে।

প্রসঙ্গত বলা যায় বঙ্কিমচন্দ্র-রমেশচন্দ্রকে অনুসরণ করে সেকালের অন্যান্য ঔপন্যাসিকগণ প্রভূত পরিমাণে ঐতিহাসিক রোমান্স বা ছদ্ম-ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস রচনা করে সাময়িক খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জন করতে থাকেন, কেবল তাই নয় তৎকালে প্রকাশিত কাব্য নাটক গল্প প্রভৃতিও ইতিহাসের অবলম্বনে প্রণীত হয়। স্বর্ণকুমারী এই স্ব-কালের প্রভাব অস্বীকার করেননি। এর সঙ্গে তাঁর স্বাভাবিক ইতিহাসপ্রীতিও সংযুক্ত হয়েছে। এমনকি উপন্যাসের মত একাধিক গল্পে বা কবিতায় কিংবা নাটকে বিশুদ্ধ অথবা ছদ্ম ইতিহাস পরিবেষণ করেছেন—গাথা কাব্যের খড়্গপরিণয় এবং নবকাহিনীর কয়েকটি গল্পের কথা স্মরণযোগ্য। তাছাড়া স্বদেশপ্রীতিবশত পুরাচর্চা ও ইতিহাসচিন্তা এবং জাতীয় হীনমন্যতা হেতু অতীত গৌরবের মধ্যে সান্ত্বনার সন্ধান প্রভৃতির কথা বিস্তৃতভাবে পূর্বে আলোচিত হয়েছে। ইতিহাসের ও অতীতের প্রতি আগ্রহের কারণ হিসাবে এগুলি আদৌ গৌণ নয়। অবশ্য তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা দীপনির্বাণ ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্স কারণ এর মধ্যে উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যের পরিমাণ স্বল্প। রোমান্স ও ঐতিহাসিক উপন্যাসের একটি সহজ সম্পর্ক আছে, উভয়ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় শূরকথা প্রণয় ও বীরমহিমার কাহিনী (a tale of wild adventures in love and chivalry— Dr. Johnson) থাকতে পারে। এই কারণে ঐতিহাসিক তথ্য থাকা সত্ত্বেও দীপনির্বাণে রোমান্সের লক্ষণ স্পষ্ট, পক্ষান্তরে বিদ্রোহের মধ্যে ইতিহাসের উপাদান যৎসামান্য তথাপি তা প্রকৃত উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের একটি গ্রন্থের নাম 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৯১৯ সংবৎ বা ১৮৬২-৬৩ খৃস্টাব্দ); উক্ত গ্রন্থের কাহিনী দুটি কণ্টারের 'রোমান্স অব হিস্টরি—ইণ্ডিয়া' থেকে গৃহীত।[৮১] বেশ বোঝা যায় কণ্টার যাকে রোমান্সের মূল্য দিয়েছেন ভূদেবের নিকট তা উপন্যাসরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই সহজ সমীকরণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে উপন্যাস ও রোমান্সের নৈকট্যটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক অনায়াসে বুঝতে পেরেছিলেন।

উপন্যাসের উদ্ভব ও বিকাশের কথা চিন্তা করলে রোমান্সের সঙ্গে তার সহজ সম্পর্কটি ধরা পড়ে। জনৈক লেখিকা এতদুভয়ের বৈশিষ্ট্য নির্ণয়কালে মন্তব্য করেছেন, The Romance is an heroic fable which treats of fabulous persons and

৮০ রমেশচন্দ্র দত্তের উপন্যাস, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৭ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, পৃ ৩৯-৪০।

৮১ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ১৮৬।

things. The Novel is a picture of real life and manners, and of the times in which it is written. The Romance in lofty and elevated language, describes what never happened nor is likely to happen. The Novel gives a familiar relation of such things, as pass every day before our eyes, such as may happen to our friend, or to ourselves; and the perfection of it, is to represent every scene, in so easy and natural a manner, and to make them appear so probable, as to deceive us into a persuasion (at least while we are reading) that all is real, until we are affected by the joys or distresses, of the persons in the story, as if they were our own.[৮২]

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে উদ্ধৃতির শেষাংশে উপন্যাস সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা রোমান্স সম্পর্কেও প্রযোজ্য হতে পারে কিনা। অবশ্যই পারে, এবং সে সম্বন্ধে তিনি সচেতনও ছিলেন বলে মনে হয়, তা না হলে at least, as if প্রভৃতি ব্যবহার করতেন না। তাঁর সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে বলা চলে সম্ভাব্যবং অসম্ভবকে রোমান্সে এবং সম্ভাব্য অপ্রত্যাশিতকে উপন্যাসে পাওয়া যেতে পারে। আসলে বাস্তবতা ও সাম্প্রতিকতা এবং তথ্যানুগত্য ও পুঙ্খানুপুঙ্খতা (details)-এর উপরই তিনি জোর দিয়েছেন রোমান্স থেকে উপন্যাসকে পৃথক করে দেখার সময়। উপন্যাসের উন্মেষ লগ্নে তার উপর রোমান্সের প্রভাব সম্বন্ধে তিনি অবহিত ছিলেন বলেই এরূপ সুন্দর আলোচনা করা সম্ভব হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে ওয়াল্টার স্কটের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে, রোমান্স ও উপন্যাসের স্বরূপসন্ধানে উদ্যোগী হয়ে তিনিও পূর্বোক্ত দ্বিধা এবং বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, We would be rather inclined to describe Romance as 'a fictitious narrative in prose or verse; the interest of which turns upon marvellous and uncommon incidents'; thus being opposed to the kindred term Novel, which Johnson has described as 'a smooth tale, generally of love', but which we would rather define as 'a fictitious narrative, differing from the Romance, because the events are accommodated to the ordinary train of human events, and the modern state of society'. এবং স্যার ওয়াল্টার স্কট এ ব্যাপারে শেষপর্যন্ত নিরস্ত হয়েই মেনে নিয়েছেন যে এই পার্থক্যকে সহজভাবে ও সাধারণভাবে

৮২ Clara Reeve, The Progress of Romance, 1785, vol. I, Evening VII.

গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ, কারণ স্পষ্ট কোনো সংজ্ঞার সাহায্যে একান্তভাবে তাদের পরস্পরবিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না যেহেতু there may exist compositions which it is difficult to assign precisely or exclusively to the one class or the other; and which, in fact, partake of the nature of both.[৮৩]

যেখানে উপন্যাসেরই কোনো স্পষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া গেল না সেখানে সামাজিক উপন্যাসের সংজ্ঞা নিরূপণ করা যে কত অসুবিধাজনক তা সহজেই অনুমেয়। জনৈক সাহিত্যরসিকের কৌতুহলোদ্দীপক মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উদ্ধার করা যায়: 'এক হিসাবে সমস্ত উপন্যাসই ঐতিহাসিক উপন্যাস। বর্তমানকে অবলম্বন করে লিখলে বলি সামাজিক উপন্যাস তবে সেই বর্তমান যখন অতীতের পর্যায়ভুক্ত হয় তখন কি তাতে ঐতিহাসিকতার আরোপ হয় না?······বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাস বিষবৃক্ষ অতীতের কুক্ষিগত হয়ে ইতিহাসের মর্যাদালাভ করেছে। বিধবা বিবাহ আইন তৎকালে যে সামাজিক সংকট সৃষ্টি করেছিল তার বিবরণ পাওয়া যাবে ঐ গ্রন্থে। রাজা রাজড়ার লড়াইকে যদি ইতিহাসের একমাত্র উপাদান বলে স্বীকার না করা যায় তবে নিঃসন্দেহে যে সব সামাজিক উপন্যাস কালের কুক্ষিগত হয়ে আজও টিকে আছে তাদের এই অর্থে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে গ্রহণ করা উচিত। ঐতিহাসিক উপন্যাস আর কিছুই নয়, কোন বিগত কাল-বিশেষকে বর্তমান বলে উপলব্ধি করে তার তথ্যনিষ্ঠ চিত্রণ মাত্র।'[৮৪] প্রকৃতপ্রস্তাবে বর্তমান যখন অতীত হয়ে যায় তখনই আমরা বলি 'ইতি-হ-আস', এবং তার অবলম্বনে রচিত কথাসাহিত্য হল ঐতিহাসিক বা ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস। সামাজিক উপন্যাসে সাম্প্রতিকতারই স্থান অধিক; সমসাময়িকতা বর্তমানবোধ বা আধুনিকতা (the times in which it is written) সামাজিক উপন্যাসের প্রাণস্বরূপ। 'সমাজবিষয়ক' এই অর্থেও 'সামাজিক' শব্দটি গ্রহণ করা চলে এবং এ সমাজ বর্তমানের জীবনকে ও তার নানাবিধ সমস্যাকে নিয়ে গঠিত। আবার উক্ত বর্তমানপ্রীতির মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে বাস্তবতা বা বস্তুতন্ত্রতা। ফলত সামাজিক উপন্যাসের উদ্ভবের মূলে এসকল প্রসঙ্গের অস্তিত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই; বাস্তবতা ও সাম্প্রতিকতার উপর তা নির্ভরশীল তবু তার সঙ্গে প্রাক্তনের উগ্র বিরোধ নেই কারণ পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে উপন্যাস কিংবা রোমান্সের স্বাতন্ত্র্য থাকলেও তাদের নিজেদের মধ্যে কোনো প্রবল বিরোধিতা নেই।

স্বর্ণকুমারীর সামাজিক উপন্যাসগুলি পাঠকালে এসকল তত্ত্ব ও সিদ্ধান্তের স্বীকৃতি অনুভূত হয়। তিনি তাঁর সমকালীন জগৎ ও জীবনের হৃদস্পন্দন অনুভব করেছিলেন এবং সর্ববিধ

৮৩ Miscellaneous Prose works, 1882, Vol VI: Essay on Romance, 1824.

৮৪ প্রমথনাথ বিশী, ভূমিকা, লালকেল্লা, ১৯৬৪, পৃ ৮/০-৮৵০

ঘটনার বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করে তাকে সাহিত্যে সমর্পণ করেছিলেন। ছিন্নমুকুলের মধ্যে এই বাস্তবতাপ্রীতি ও সমকালীন জীবনজিজ্ঞাসা স্পষ্টীভূত। ঐতিহাসিক উপন্যাস দীপনির্বাণের মধ্যে সেকালের ভারতবর্ষের জীবন্ত চিত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, কিন্তু আধুনিক কালের ভাব-ভাবনাও সেখানে অনুপস্থিত নেই। মালতী যদিও বড় গল্প (গল্প হিসাবেই আলোচিত) তবু ছিন্নমুকুলের পরেই তিনি বাস্তব জীবনের আরও নিকটে যে উপনীত হয়েছিলেন তার প্রমাণ এর মধ্যে বিদ্যমান। সাম্প্রতিক জীবনের সমস্যা ও জটিলতা তাঁকে ক্রমশ আকৃষ্ট করেছে, বহুপরবর্তী কালের স্নেহলতার মধ্যে এর তীব্রতা লক্ষিত হয়। মালতী ও স্নেহলতার মধ্যে একাধিক ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং ছোটগল্প রচিত হয়, তাছাড়া নাটক কবিতা গানের রচনাও চলছিল। বিশেষ করে এই পর্বে যে ছোটগল্পগুলি রচিত হয় তা একান্তভাবে বাঙালির পারিবারিক সমস্যাকেন্দ্রিক ও বাস্তব জীবননির্ভর বলে তাঁর সহানুভূতি আমাদের প্রাত্যহিক-তার নিকটবর্তী হয়ে পড়েছে। স্নেহলতার মধ্যে তার সারস্বত সিদ্ধি লক্ষণীয়। লেখিকা এক্ষেত্রে বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের সঙ্গে অতঃপর বিচরণ করেছেন। তাঁর সামাজিক উপন্যাসগুলি ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করলে এর সত্যতা প্রমাণিত হবে।

ছিন্নমুকুল

॥১॥ ছিন্নমুকুল স্বর্ণকুমারীর প্রথম সামাজিক উপন্যাস এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশের দিক থেকে দ্বিতীয় উপন্যাস কারণ তার আগে কেবলমাত্র যে দুটি পুস্তক মুদ্রিত হয় তার মধ্যে একটি উপন্যাস (দীপনির্বাণ) ও অপরটি গীতিনাট্য (বসন্ত-উৎসব) ; অর্থাৎ ছিন্নমুকুল লেখিকার তৃতীয় মুদ্রিত গ্রন্থ। গ্রন্থরূপে ছিন্নমুকুল প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৯ সালের ৪ নভেম্বর, পৃষ্ঠা ২৩৮ ; তবে তার আগে ভারতী পত্রিকায় ১২৮৫ সালের পৌষ সংখ্যা থেকে ১২৮৬ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় উক্ত উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। আর একটি সংবাদ পরিবেশনযোগ্য, 'তৃতীয় সংস্করণের পুস্তকে (ইং ১৯০০, পৌষ) "ইহার কোন কোন পরিচ্ছেদ একেবারে নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে" ।'[৮৫]

গ্রন্থটি উপহৃত হয়েছে 'পূজনীয়েষু জ্যোতিদাদা' এই কথাগুলির উল্লেখের সঙ্গে ; তাঁর সাহিত্যসাধনার পশ্চাতে এই অগ্রজের উৎসাহ নিরন্তর সক্রিয় ছিল। ছিন্নমুকুলের উপহার-পত্রে যা বলা হয়েছিল তা উদ্ধৃত হল :

৮৫ সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, ২০শ, পৃ ১৩।

হৃদয়-উচ্ছ্বাসভরে আজিকে তোমার করে
দলিত কুসুমকলি সঁপিনু যতনে,
কি আর চাহিতে পারি ? এক বিন্দু অশ্রুবারি
মিশাইও কনকের অশ্রুবারি সনে।

উপহার-পত্রিকার মধ্যে যে কারুণ্যের আভাস আছে তা গ্রন্থের আখ্যাপত্রে উদ্ধৃত তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের (১ম সং, মে ১৮৬০) একাংশ থেকেও সমর্থিত হয় :

ওরে রে বিকট কীট নিদারুণ শোক
এ হেন কোমল পুষ্পে তোর কিবে বাসা ?[৮৬]

সুগন্ধ কুসুমের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে অন্ধকীট যে তার সর্বনাশ সাধন করে মধুসূদন আত্ম-বিলাপ-শীর্ষক কবিতায় (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন ১৭৮৩ শক) পরবর্তী কালে তার উল্লেখ করেছেন। কনক-নাম্নী কোনো একটি কোমল চরিত্রের জীবনে যে বিড়ম্বনা ও বিপর্যয় দেখা গিয়েছিল সেকথা ছিন্নমুকুলে আছে—ক্রোড়পত্রের এবং উপহার-পত্রিকার উদ্ধৃতির মধ্যে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। উপন্যাসের নামকরণের মধ্যেও সেই তাৎপর্য নিহিত।

সেকালের নানাবিধ পত্রিকার গ্রন্থ-পরিচয়ে ছিন্নমুকুল সম্বর্ধিত হয়েছিল। ১২৮৬ সালের ভারতী পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যার শেষে ছিন্নমুকুলের যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় তার একটির মধ্যে ইণ্ডিয়ান মিররের মন্তব্য পাওয়া যায়। ঐ পত্রিকার গ্রন্থ-সমালোচক বলেছেন, Another good book is before us— Chinna Mukul—a Novel by the Authoress of Dipnirvan and Basanta Utsab. The workmanship throughout is exactly what might be expected from so able a literary artist. It is a pleasant transition to nature and fancy—to the calm and placid sweetness of Indian homelife from the din and bustle of war, the gorgeous magnificence and heroic grandeur of the ancient Rajput Princes of Dip Nirvan. A deep shade of tragedy pervades the whole of the book, giving its color to more than one of the principal characters, broken in here and there by a faint glimmer of incidental comic scenes which instead of relieving the senses, serves to thicken the gleem around. The dialogues are well sustained. The style is, as is

৮৬ তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের প্রচলিত সংস্করণে (৩য় সং, ১৮৭০) এর পাঠান্তর লক্ষিত হয়। তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যের ১ম সর্গের ৩৮২-৮৩ চরণদ্বয় দ্রষ্টব্য।

characteristic of this writer, chaste, clear, sweet and vigorous. The book is interspersed with many charming little songs, all of which, it is a pity, are not set to tune. Almost all the characters are extremely natural, especially Kanak the heroine of the story. She is an admirable portrait of self-sacrifice and disappointed love. Instances of such grand woman heroism and abnegation of self liberate the fancy and gladden the heart. The character of Promod, her selfish brother, has hardly been less cleverly drawn. It is not difficult to find original of such characters in this cold, calculating world. Niraja, the other female character, thrives well up to a certain point, and then dwindles into insignificance in the greater interest which one feels for Kanak.

The pages that describe the conflict of feelings in Kanak's mind, obedience to her brother and guardian on the one side and the dictates of an all-absorbing love on the other, constitute an interesting reading, and are sure to give the book in which they occur a respectable place in Bengali fiction. ইণ্ডিয়ান মিররের লেখক যে অতিশয় উৎসাহের সঙ্গে ছিন্নমুকুলের সমালোচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন তা এই সুদীর্ঘ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা থেকে বোধগম্য হয়। সমকালীন হিন্দু প্যাট্রিয়ট অনুরূপ পদ্ধতি গ্রহণ না করলেও সংক্ষেপে ছিন্নমুকুলের সম্পর্কে যে মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন তাও আদৌ অবহেলার যোগ্য নয়: It is needless to add that the work (Dip Nirvan) gave promise of great future excellence. Srimati Svarna Kumari Devi's two next books, Basanta Utsav or the Spring Festival, a melodrama, and Chinna Mukul or the Broken Blossom, a novel, followed each other in quick succession...Chinna Mukul which is a tale of our own days comes quite upto the mark, and fully supports the previous reputation of the writer.[৮৭]

ইণ্ডিয়ান মিররে প্রশংসিত ছিন্নমুকুলের charming little songs সম্বন্ধে দুএকটি কথা বলা প্রয়োজন। স্বর্ণকুমারীর সংগীতসাধনার বিস্তৃত ইতিহাস স্বতন্ত্র অধ্যায়ে প্রদত্ত হয়েছে। এই বিদ্যায় তাঁর অসামান্য অধিকার ছিল। কেবল নাটকে নয় উপন্যাসের মধ্যেও

৮৭ ভারতী, অগ্রহায়ণ ১২৮৭, সংখ্যাশেষে প্রদত্ত বিজ্ঞাপন দ্র।

নানা স্থানে বিবিধ প্রসঙ্গে তিনি সংগীতের ব্যবহার করেছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় উপন্যাসের মধ্যে তাঁর একটি গীতিনাট্য যে প্রকাশিত হয় সেকথা বর্তমান পরিচ্ছেদের প্রারম্ভেই বলা হয়েছে। এ তথ্যগুলি মনে রেখে বলা যায় যে প্রথম উপন্যাস দীপনির্বাণের মত ছিন্নমুকুলেও তিনি একাধিক গানের প্রয়োগ করেছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ব্যবহৃত 'সুশীতল মহীরুহ সুশীতল ছায়' গানটির রাগনির্দেশ আছে। একবিংশ পরিচ্ছেদে 'রিমঝিম ঘন বরিষে সখি লো' (ভারতী, বৈশাখ ১২৮৬, পৃ ৮) গানটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিরচিত বাল্মীকিপ্রতিভার চতুর্থ দৃশ্যান্তর্গত বনদেবীগণের কণ্ঠে গীত 'রিম ঝিম ঘন ঘন রে বরষে' এর সাদৃশ্য লক্ষিত হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের গানটি গীতবিতানে তারকা-চিহ্নিত অর্থাৎ গানটি 'এদেশীয়, পূর্বপ্রচলিত, অন্যের কোনো বিশেষ গান অথবা গতের আদর্শে বা প্রভাবে রচিত'।[৮৮] বাল্মীকিপ্রতিভা ১২৮৭ সালের ফাল্গুন মাসে রচিত ও প্রকাশিত হয়; তার প্রায় দুই বৎসর পূর্বে ভারতী পত্রিকায় স্বর্ণকুমারীর গানটি মুদ্রিত হয়েছিল। এই তথ্য থেকে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তা হল এই—হয়ত রবীন্দ্রনাথের গানটি স্বর্ণকুমারীর গানটির 'আদর্শে বা প্রভাবে রচিত' কিংবা উভয়েই কোনো পূর্বপ্রচলিত 'বিশেষ গান অথবা গতে'র অনুসরণ করেছিলেন। উভয় গানের চরণসংখ্যা ভাব ও ভাষার নিকট-সাদৃশ্য লক্ষ রেখে প্রথম সিদ্ধান্তের প্রতি পক্ষপাতী হওয়া চলে। ঐ বৎসরের ভারতী পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত উপন্যাসের চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদের 'জনম আমার শুধু সহিতে যাতনা' গানটি পরবর্তী কালে গ্রন্থ থেকে পরিত্যক্ত হয় এবং তৎস্থলে 'বুঝি গো সে এল না' গানটি দেওয়া হয়; কিন্তু প্রথম গানটির সৌন্দর্য সম্বন্ধে লেখিকা ভারতীতে প্রকাশিত উপন্যাসের উক্ত পরিচ্ছেদের মধ্যেই প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করেছিলেন।[৮৯]

সাময়িকপত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত উপন্যাসের সঙ্গে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত তৃতীয় সংস্করণের ছিন্নমুকুলের কোনো কোনো পরিচ্ছেদের বৈসাদৃশ্য থাকলেও পরবর্তী কালে গ্রন্থের অবয়ব বিশেষ বর্ধিত হয়নি। সাময়িকপত্রে উপসংহারসহ মোট বিয়াল্লিশটি পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হয়, গ্রন্থেও তাই।

॥২॥ বাংলা সাহিত্যের প্রথম পর্যায়ের সামাজিক উপন্যাস সম্পূর্ণরূপে রোমান্সের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ঐতিহাসিক উপন্যাসের মত সামাজিক উপন্যাস তখনও রোমান্সের পক্ষপুটাশ্রয়ে বর্ধিত হয়ে চলেছে বলে অতিনাটকীয় অতিপ্রাকৃত রোমাঞ্চকর অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ তার মধ্যে দেখা যাচ্ছিল; স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও এর হাত থেকে

৮৮ গীতবিতান, অখণ্ডসূচী-সহ একত্র প্রকাশ, ১৩৬০, 'প্রথম ছত্রের সূচী'র নিম্নে প্রদত্ত বিবরণ দ্র পৃ ১৩।

৮৯ ভারতী, আষাঢ় ১২৮৬, পৃ ৯৭।

অব্যাহতি লাভ করেননি। স্বর্ণকুমারীর সপক্ষে এটুকু বলা যায় যে একটিমাত্র ঐতিহাসিক রোমান্স রচনার পর ছিন্নমুকুলের সৃষ্টি, তাই ছিন্নমুকুলও রোমান্সাশ্রিত হয়ে পড়েছে। সেকালের পক্ষে ঐতিহাসিক রোমান্স বা উপন্যাসের অসামান্য জনপ্রিয়তাও এর অন্যতম কারণ। আবার ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার কৌশলটি তাঁর সামাজিক উপন্যাসেও পরিলক্ষিত হয়। শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন তাঁর বিখ্যাত সাহিত্যের ইতিহাস পুস্তকে ছিন্নমুকুল সম্বন্ধে বলেছেন, 'ছিন্নমুকুল বাঙ্গালা রোমান্সে নূতনত্বের অবতারণা করিয়াছিল, ভ্রাতাভগিনীর স্নেহ সাধারণ প্রণয়কাহিনীর স্থান লওয়ায়।'[২০] অন্যত্র তিনি প্রায় একই কথা বলেছেন, "দ্বিতীয় উপন্যাস 'ছিন্নমুকুল' (১৮৭৯), ভ্রাতার প্রতি ভগিনীর স্নেহ এবং তজ্জন্য নির্যাতন স্বীকার বইটির প্রতিপাদ্য বিষয়। এই হিসাবে এই রোমান্টিক উপন্যাসটি অভিনব বটে।"[২১]

ভ্রাতার প্রতি ভগিনীর যে স্নেহের কথা উল্লিখিত হয়েছে তার পাত্রপাত্রী হল প্রমোদ ও কনক। কনককে প্রথমাবধি ভীরু হরিণীর মত করে চিত্রিত করা হয়েছে, এবং ভ্রাতার প্রতি ভগিনীর অসাধারণ দুর্বলতা কনককে নানা বিপদের মধ্যে ফেলেছে। স্বর্ণকুমারীর সাহিত্যে এই জাতীয় স্নেহময়ী সর্বংসহা চরিত্রের অভাব নেই। লজ্জাবতী গল্পের এবং রাজকন্যা নাটকের নায়িকার সঙ্গে কনকের সাদৃশ্য প্রবল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে হুগলীর ইমামবাড়ীর মধ্যে মুন্না-মহসীনের যে কাহিনী আছে তার মধ্যেও ভাইবোনের সুন্দর সম্বন্ধটি ধরা পড়েছে। এই জাতীয় রমণী পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে নিতান্ত দুর্লভ নয়। প্রবাসী 'গুণবন্তী ভাই-'এর জন্য মন-কেমন-করার কথা ছড়ার মধ্যেই পাওয়া যায়। বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালীর সেই নিরীহ নিপীড়িত বধূর কথা, ছন্নছাড়া ভাইয়ের জন্য তার উদ্বেগের কথা এবং ম্লান অপরাহ্নের নির্জন নদীতীরে দাঁড়িয়ে দূরে অপসৃয়মান পালতোলা নৌকার দিকে তাকিয়ে হুহু-করা হৃদয়ের কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়া আদৌ অস্বাভাবিক নয়।

কনক-প্রমোদের মাসি সুশীলা সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'ব্রাহ্ম-মহিলা সুশীলার চরিত্র স্বভাবানুগত। পরবর্তী একাধিক লেখকের উপন্যাসে এই জাতীয় চরিত্রের অবতারণা হইয়াছে।'[২২] রমণীগণের পারস্পরিক সখ্য ও প্রীতির চিত্রাঙ্কনে লেখিকার বিশেষ দুর্বলতা ছিল; ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি সখিসমিতি স্থাপন করেন পরস্পরের মধ্যে প্রীতিবর্ধনকল্পে। তাই যখনই সুযোগ পেয়েছেন তখনই সাহিত্যে এর সদ্ব্যবহার করেছেন। ঊনবিংশ পরিচ্ছেদের নাম 'মনের কথা'—কনক ও নীরজার সখিত্ব সুন্দরভাবে এই পরিচ্ছেদে বিকশিত

২০ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ ২৪১।

২১ বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, ১৩৭৩, পৃ ১০৯।

২২ ঐ পৃ ১০৯।

হয়ে উঠেছে। আরণ্যক নীরজা প্রমোদের প্রেম ও কনকের প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে 'সামাজিক' হয়ে উঠেছে। প্রমোদ ও যামিনীনাথের সঙ্গে তার প্রেমের ত্রিকোণসংঘর্ষ ছিন্নমুকুলের বিশিষ্ট শাখাকাহিনী হলেও এতে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় সমস্যার ভারসাম্য বিচলিত হয়নি। পরিণামে যামিনীনাথকে ষড়যন্ত্রকারী খল চরিত্ররূপে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। স্বর্ণকুমারীর পরবর্তী উপন্যাসে এই শ্রেণীর চরিত্র নিতান্ত দুর্লভ নয়, পূর্ববর্তী দীপনির্বাণের বিজয়সিংহ এবং পরবর্তী ফুলের মালার 'সাধারণ stage villain অপেক্ষা একটু উন্নততর পর্যায়ভুক্ত' কুতব তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

ঘটনার বিশালতা ও জটিলতা ছিন্নমুকুলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, ঘটনাস্থানের বৈচিত্র্যও উল্লেখযোগ্য। প্রথম পরিচ্ছেদে বোম্বাই থেকে ঘটনাকেন্দ্র এলাহাবাদে স্থানান্তরিত; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ঘটনাস্থল কানপুর। তাছাড়া কলিকাতাও একটি মুখ্য স্থান গ্রহণ করেছে। ছিন্নমুকুলের ঘটনাস্থল ও চরিত্র যেমন বিচিত্র-বহুল তেমনি এর সংলাপও বড়ই চিত্তাকর্ষক। সংলাপে সাধু রীতি নেই বললেও চলে, কখনো কখনো সাধু-চলিতের মিশ্রণ পাওয়া গেলেও চলিতের প্রাধান্যই চোখে পড়ে। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে দাসীর সংলাপে আঞ্চলিক উপভাষা প্রযুক্ত। স্বর্ণকুমারী এ জাতীয় সংলাপ রচনায় যে সিদ্ধহস্ত ছিলেন তার প্রমাণ প্রহসন ও নাটকগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। বিংশ পরিচ্ছেদে প্রমোদ ও চৌকিদারের কথোপকথনের মাধ্যমরূপে লেখিকা কথ্য হিন্দীর প্রয়োগ করে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

স্নেহলতা

॥১॥ স্নেহলতা স্বর্ণকুমারীর মহৎ সৃষ্টি এবং বিরাট কীর্তি। ভারতী ও বালক পত্রিকার ১২৯৬ সালের বৈশাখ থেকে ১২৯৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের সংখ্যাগুলিতে এই বৃহদায়তন উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। অবশ্য ১২৯৬ সালের আশ্বিন মাঘ ও চৈত্র এবং ১২৯৭ সালের জ্যৈষ্ঠ আশ্বিন ও মাঘ মাসের পত্রিকায় স্নেহলতার কোনো অংশ মুদ্রিত হয়নি; উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ভারতীর আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যা অনেক সময় একত্রে প্রকাশিত হত। স্নেহলতা দুই ভাগে বিভক্ত; প্রথম ভাগের মোট তিরিশ পরিচ্ছেদ ১২৯৭ সালের আষাঢ় সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হয় এবং ঐ একই সংখ্যা থেকেই দ্বিতীয় ভাগের প্রকাশারম্ভ হয়েছিল। উপসংহারসহ দ্বিতীয় ভাগের পরিচ্ছেদের মোট সংখ্যা হল বত্রিশ। গ্রন্থাকারে প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৯২ খৃস্টাব্দের ১৩ অক্টোবর (১২৯৯ সাল) এবং দ্বিতীয় ভাগ ১৮৯৩ খৃস্টাব্দের ১৫ মার্চ (ফাল্গুন ১২৯৯) তারিখে; সাহিত্য-সাধক-চরিত-

মালার মধ্যে যে প্রকাশকাল দেওয়া হয়েছে তা যে ভুল সেকথা ব্রজেন্দ্রনাথ অন্যত্র স্বীকার করেছিলেন।[২৩]

উপন্যাসটির শিরোনাম সম্বন্ধে একটি কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য পরিবেষণ করা যায়। ভারতী ও বালকের ১২৯৬ সালের সংখ্যাগুলিতে উপন্যাসের নাম ছিল 'স্নেহলতা', কিন্তু ১২৯৭ সালের বৈশাখে তার নাম মুদ্রিত হল 'পালিতা' এবং এর পর থেকে উপন্যাসটি 'স্নেহলতা বা পালিতা'রূপে পরিচিত হতে থাকে। এই নামবিভ্রাট সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর 'বাংলা-সাহিত্যে বঙ্গমহিলার দান'[২৪]-শীর্ষক প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন, "স্বর্ণকুমারী দেবী 'ভারতী ও বালকে'র পৃষ্ঠায় 'স্নেহলতা' নামে একখানি উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করিতেছিলেন। কুসুমকুমারী দেবীর 'স্নেহলতা'[২৫] বাহির হইলে স্বর্ণকুমারী তাঁহার উপন্যাসখানির নাম পরিবর্তন করিয়া 'পালিতা' রাখেন ('ভারতী ও বালক', বৈশাখ ১২৯৭ দ্রষ্টব্য)। ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় 'স্নেহলতা বা পালিতা' নামে, ১২৯৯ সালে (১৩-১০-১৮৯২), পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ২৩৮।" ভারতী ও বালকের ১২৯৭ সালের বৈশাখ সংখ্যার ৫৩ পৃষ্ঠায় একটি পাদটীকা আছে, তার মধ্যে আছে—"সম্প্রতি আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেস হইতে 'স্নেহলতা' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পাঠক-পাঠিকাদিগের মধ্যে কেহ কেহ মনে করিয়াছেন যে ভারতী ও বালকে 'স্নেহলতা'-শীর্ষক যে উপন্যাসটি ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে এই পুস্তকখানি সেই একই উপন্যাস। এটি তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম। এই নব-প্রকাশিত স্নেহলতা ভারতীর স্নেহলতা এক নহে এবং একজনের লেখাও নহে। এই গোল-যোগের জন্য ভারতীর উপন্যাসটির নাম স্নেহলতার পরিবর্তে 'পালিতা' দেওয়া হইল।" সম্ভবত এই উল্লেখটি লেখিকা স্বর্ণকুমারীর, কারণ এই সংখ্যার সম্পাদনা তাঁরই।

কুসুমকুমারীর স্নেহলতা পাঠ করার পর বিদ্যাসাগর মহাশয় যে অভিমত প্রকাশ করেন ব্রজেন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত প্রবন্ধে তা পাওয়া যায়, 'সমাজচরিত্র জানিবার পক্ষে ইহা একখানা সুন্দর গ্রন্থ। স্বাধীন রাজ্য হইলে ইহার পঞ্চবিংশতি সংস্করণ হইত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।' স্বর্ণকুমারীর স্নেহলতা বা পালিতা উপন্যাসটিও সেকালের সমাজের একটি উৎকৃষ্ট দর্পণস্বরূপ।[২৬] সেদিক থেকেও উভয় উপন্যাসের মধ্যে নিকট-সাদৃশ্য থাকায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি

২৩ বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৮ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, পৃ ২৭২, পা. টী.।

২৪ ঐ।

২৫ "স্নেহলতা (সামাজিক উপন্যাস) : ১১ মাঘ ১২৯৬ (২৩-১-১৮৯০)। পৃ ২০৪-০৭। ইহা 'কোন মহিলা কর্তৃক প্রণীত'।" এরূপ স্বর্ণকুমারী রচিত এই ভ্রমবশত ব্রজেন্দ্রনাথ সাহিত্য-সাধক-চরিতমালায় তথ্যনির্দেশে ভুল করেন।

২৬ স্নেহলতার 'নিবেদন' দ্রষ্টব্য, ফাল্গুন ১৩১৪, গ্রন্থাবলী, ৪র্থ ভাগ, পৃ ৫৯।

করতে পারত বলে স্বর্ণকুমারী নাম পরিবর্তন করেছিলেন। একেবারে আধুনিক কালে যে বিভ্রম সৃষ্টি হয়েছিল, এমনকি ব্রজেন্দ্রনাথের মত সতর্ক গবেষকও যে এই বিপদে পড়েছিলেন তার প্রমাণ সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার মধ্যে আছে; তিনি ভুল করে কুসুমকুমারীর গ্রন্থের প্রকাশকাল ব্যবহার করেছিলেন স্বর্ণকুমারীর স্নেহলতা প্রথম ভাগের ক্ষেত্রে। এই ভুল সংশোধন করার পরে তিনি যে প্রকাশকাল দিয়েছেন বিশ্বভারতী পত্রিকার অষ্টম বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় তা যদিও নির্ভুল তবু অন্য প্রসঙ্গে একটু খুঁত আছে; স্নেহলতা প্রথম ও দ্বিতীয় 'খণ্ডে' বিভক্ত বলে যে নির্দেশ দিয়েছেন সেই খণ্ডের ক্ষেত্রে 'ভাগ' শব্দটি বসবে, অর্থাৎ স্নেহলতা খণ্ডিত নয়, বিভক্ত।

এইসকল প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে এবারে 'পালিতা' শব্দটি সম্বন্ধে দুএকটি কথা বলা যেতে পারে। ১২৯৮ সালের ভারতী ও বালকের পৌষ সংখ্যায় সখিসমিতি-শীর্ষক যে রচনাটি মুদ্রিত হয় তার মধ্যে সমিতির উদ্দেশ্যাবলীও ছিল। তৃতীয় উদ্দেশ্যটি এইরূপ—'সমিতির পালিতাগণ সুশিক্ষিত হইলে তাহাদিগকে বেতন দিয়া অন্তঃপুরের শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার' ইত্যাদি। সখিসমিতির নিয়মাবলীর ষষ্ঠ পর্যায়ে (ভা ও বা ১২৯৮, ৫০৯ পৃষ্ঠা) লেখিকা অনুরোধ করেছেন, 'সখীগণ লক্ষ রাখিবেন যেন টাকার বিল শোধ করিতে দেরি না হয়; কেন না এই চাঁদার উপরেই পালিতাগণের প্রতিপালন কার্য নির্ভর করিতেছে।' এক্ষেত্রে পালিতা অর্থে অসহায় বিধবা ও কুমারীকে বোঝাচ্ছে, এঁদেরই প্রতিপালনার্থে স্বর্ণকুমারীর বিবিধ প্রশংসনীয় উদ্যমের পরিচয় পাওয়া যায়। স্নেহলতা উপন্যাসের মধ্যে এই অসহায় দুর্বল পরাশ্রিত 'পালিতা'র কথাই প্রধান। উপন্যাসের প্রথমে প্রদত্ত উপহার-পত্র থেকেও অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীকে উৎসর্গীকৃত হয় গ্রন্থটি। গিরীন্দ্রমোহিনী লেখিকার সখিসমিতি, মহিলা-শিল্পাশ্রম, বিধবাশ্রম প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এছাড়া উভয়ের মধ্যে 'মিলন-বিরহ' সখী-সম্পর্ক ছিল, কবিতায় উত্তর-প্রত্যুত্তরও চলত। গিরীন্দ্রমোহিনী ছিলেন বালবিধবা এবং তাঁর শোচনীয় জীবনের বিড়ম্বনার প্রতি লেখিকা স্বভাবিকভাবে সহানুভূতিপরায়ণ ছিলেন। তাই আর একটি ব্যর্থ 'পালিতা'র জীবনচিত্র অঙ্কনের কালে সঙ্গতভাবেই তিনি গিরীন্দ্রমোহিনীর কথা স্মরণ করেছিলেন। স্নেহলতার প্রথমভাগের উপহার-এর মধ্যে বলেছেন স্বর্ণকুমারী—

ভাই মিলন,
সুখেরে লভিবারে দুখের হা-হুতাশ!
হাসির ফাঁসে অশ্রু আপনা চাহে নাশ!
আঁধার-আলো মাঝে ডুবাতে চাহে প্রাণ!
বিরহ হতে চায় মিলনে অবসান!

হায়! মিছে এ আঁকু-বাঁকু, মিছে এ যাচাযাচি
ততই দূরে দূরে যতই কাছাকাছি!
চাহিয়া দেখি আর দেখিয়া মরি ভেবে
আমার এই স্নেহ কারে দিব কে নেবে?
সখি গো ফিরাও না, এনেছি তোরি তরে,
না হয় দিও ফেলে আড়ালে কিছু পরে!

॥২॥ স্নেহলতার বৈশিষ্ট্য আলোচনাকালে শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন সংক্ষেপে মন্তব্য করেছেন, "স্বর্ণকুমারীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হইল 'স্নেহলতা' (১২৯৯)। বাঙ্গালী সমাজে আধুনিকতা প্রবেশের ফলে যেসব সমস্যা আবির্ভূত হইয়াছিল তাহার একটির যথাযথ ও স্পষ্ট চিত্র স্নেহলতায় আমরা প্রথম পাইলাম।"[৯৭] অন্যত্রও তিনি স্বীকার করেছেন, 'বাঙ্গালী সমাজে আধুনিকতার সমস্যা লইয়া এই প্রথম উপন্যাস লেখা হইল।'[৯৮] উপন্যাস প্রকাশের দীর্ঘ কাল পরে ১৩১৪ সালের ফাল্গুন মাসে স্বর্ণকুমারী যে মন্তব্য করেন তার সঙ্গে পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের সাদৃশ্য আছে। তিনি বলেছেন, 'স্নেহলতা প্রায় অষ্টাদশ বর্ষ পূর্বের রচনা। দুই তিন বৎসর কাল ক্রমান্বয়ে ভারতী পত্রিকার কলেবর পুষ্ট করিয়া ১২৯৯ সালে ইহা গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়।/ অধুনা বঙ্গসমাজে যেরূপ চিন্তা, যেরূপ ভাব, যেরূপ কার্যকলাপ শত স্রোতে প্রবাহিত—তাহারই পূর্বতন চিত্র, তাহারই সূত্রপাত উক্ত সময়ে এই উপন্যাসে অঙ্কিত হইয়াছে। অতএব যুগান্তর-ব্যবধানে বর্তমানের সহিত অতীতের যে সন্ধি, নূতন চিত্রপাতে পুরাতনের যে অপূর্ব সৌসাদৃশ্য, এককথায়, কালপ্রবাহে সমাজের ভাব ও কার্য পরম্পরার যে ধারাবাহিক ক্রমাভিব্যক্তি, স্নেহলতা পাঠে তাহা যদি নবীন পাঠক প্রত্যক্ষ করেন, তবেই লেখিকার গ্রন্থরচনা সার্থক।'[৯৯] সমকালীন জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাঁর শিল্পীমনের আগ্রহটুকু এক্ষেত্রে লক্ষ করবার মত।

স্নেহলতার প্রথম ভাগের ক্রোড়পত্রে তিনি গ্রন্থটিকে 'সামাজিক উপন্যাস'রূপে অভিহিত করেছেন। কুসুমকুমারীর স্নেহলতা ছিল 'সমাজচরিত্র জানিবার পক্ষে' একখানি সুন্দর গ্রন্থ, বিদ্যাসাগর তা স্বীকার করেছেন। স্বর্ণকুমারীর উপন্যাসেও সেকালের সমাজ এবং জীবন প্রতিফলিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর নবম দশক পর্যন্ত সময়-সীমার মধ্যে বাঙালির জীবনে যে পরিবর্তন ও ভাববিপ্লব ঘটে তার প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বর্তমান উপন্যাসে

৯৭ বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, পৃ ১০৯।
৯৮ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ ২৩১।
৯৯ নিবেদন, গ্রন্থাবলী, ৪র্থ ভাগ, পৃ ৫৯।

সমর্পিত ; এমনকি স্বদেশী আন্দোলনের উন্মেষলগ্নের পটভূমিকায় ঠাকুরবাড়ির তরুণমনে যে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল তাকেও পর্যন্ত বাদ দেওয়া হয়নি। ১৩১৮ সালের ভারতীর মাঘ সংখ্যার পুস্তক-পরিচয় বিভাগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনূদিত 'সত্য সুন্দর মঙ্গল' গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে অজ্ঞাতনামা জনৈক সমালোচক বলেছেন (পৃ ৯৯৫), 'শুনিয়াছি, ভারতী-সম্পাদিকা-রচিত স্নেহলতা উপন্যাসে নব্য যুবকবৃন্দের পরিচালিত যে সভার উল্লেখ আছে সে সভার চিত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বদেশী সভার আদর্শ অবলম্বনে রচিত।'

স্নেহলতার প্রথম ভাগের অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে 'এক সূত্রে গাঁথিলাম সহস্র জীবন' গানটি আছে ; রবীন্দ্রনাথের 'এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন' গানের সঙ্গে যে এর নিকট-সাদৃশ্য বর্তমান তা গীতবিতানের গ্রন্থপরিচয়ে স্বীকার করা হয়েছে। উক্ত প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "'জীবনস্মৃতি'র 'স্বাদেশিকতা' অধ্যায়ে যেখানে রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দুমেলা' ও 'স্বাদেশিকের সভা' সম্বন্ধে লিখিয়াছেন সেখানে প্রসঙ্গক্রমে এই গানের প্রথম-দ্বিতীয় ছত্র উদ্ধৃত হইয়াছে দেখা যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের কোনো কাব্যগ্রন্থে এই গানটি এপর্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই ; 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থেও রচয়িতা কে সে সম্বন্ধে কোনো কথাই নাই। অথচ, 'বাল্মীকিপ্রতিভা' গীতিনাট্যে 'এক ডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে' গানটির প্রথম ছত্রেই ইহার ভাবের ও ভাষার আশ্চর্য প্রতিধ্বনি আছে, দুটি গানের সুরও অভিন্ন। 'ভারতী ও বালক' পত্রের ১২৯৬ কার্তিক-সংখ্যায়, ৩৬৫ পৃষ্ঠায়, 'স্নেহলতা' গল্পে 'সঞ্জীবনী' সভার মতোই একটি সভার বর্ণনায় এই গানটি আছে—

> এক সূত্রে গাঁথিলাম সহস্র জীবন
> জীবন মরণে রব শপথ বন্ধন
> ভারত মাতার তরে সঁপিনু এ প্রাণ
> সাক্ষী পুণ্য তরবারি সাক্ষী ভগবান
> প্রাণ খুলে আনন্দেতে গাও জয় গান
> সহায় আছেন ধর্ম কারে আর ভয়।[১০০]

গীতবিতানে-সংকলিত রচনার সহিত ভাবে ও ভাষায় ইহার কতটা সাদৃশ্য তাহা ছাড়াও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে উক্ত কাহিনী-অনুসারে গানটির রচয়িতা 'চারু এখন ষোড়শবর্ষীয় বালক' অথচ বন্ধুপরিজনপ্রশংসিত কবি, তাহাকে 'গুপ্তসভার মেম্বর করিয়াছে—সেখানকার সে Poet Laureate', এবং 'যখন সকলে একসঙ্গে ইহা [সংকলিত গানটি] গাহিয়া উঠিল, চারুর আপনাকে সেক্‌স্‌পিয়ারের সমকক্ষ বলিয়া মনে হইতে লাগিল।'[১০০] উল্লিখিত 'সঞ্জীবনী

১০০ সাময়িকপত্র ও গ্রন্থাবলীর পাঠের সঙ্গে এই পাঠের প্রভেদ বহুস্থান।

সভা'র সহিত রবীন্দ্রনাথের যোগ, সেই মণ্ডলীতে কবি হিসাবে তাঁহার সমাদর, তাঁহার তখনকার বয়স এবং কৈশোরোচিত উৎসাহ, এমন-কি 'জীবনস্মৃতি'তে বর্ণিত (স্বাদেশিকতা অধ্যায় : শেষ অংশ) বৃদ্ধ রাজনারায়ণবাবু আর তরুণ সকল সভ্য মিলিয়া সমবেত গান গাওয়ার দৃশ্য—স্নেহশীলা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবী গল্পচ্ছলে প্রায় সব কথাই বলিয়াছেন ও সবটারই একটি বাস্তব ছবি আঁকিয়াছেন দেখা যায়।"[১০১]

গানটি যাঁরই হোক না কেন, এটুকু বোঝা যায় যে স্নেহলতায় বর্ণিত গুপ্তসমাজ বা গুপ্তসভার সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঞ্জীবনী সভা বা 'হামচুপামুহাফ'-এর নিকট-সাদৃশ্য বর্তমান। পারিবারিক তরুণগণের স্বদেশীয় কার্যকলাপ এভাবে তাঁর উপন্যাসে ছায়া ফেলেছে। এর সঙ্গে আরেকটি বিষয়ের সংযোজন করা চলে। ১২৯৫ সালের ভারতী ও বালক পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় অঘোরনাথ দত্তের 'য়ুরোপীয় গুপ্তসমাজ'-শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তাও তাঁর চিন্তাকর্ষণ করতে পারে কারণ স্বর্ণকুমারীর 'গুপ্তসভা'র কার্যকলাপের সঙ্গে অঘোরনাথের 'গুপ্তসমাজে'র কার্যাবলীর সুন্দর সাদৃশ্য আছে। স্বর্ণকুমারী অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে গুপ্তসভার যে বর্ণনা দিয়েছেন তা এখানে সংকলিত হল। চন্দননগরের বাগানে একটি রবিবারে উক্ত সভার অধিবেশন হয়। বদ্ধ ঘরে সমস্বরে 'আজি হতে এক সূত্রে গাঁথিনু জীবন' গান গাওয়ার পর সভাপতি পদ্মবিদ্ধ খড়্গ দেখিয়ে বললেন, 'এই পদ্ম ভারতের চিহ্নস্বরূপ, এই খড়্গ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিবার চিহ্নস্বরূপ; ইহা ধারণ করিয়া শপথ কর,······আজ হইতে তুমি ভারতের মঙ্গলকার্যে প্রাণ পণ করিলে, আজ হইতে আমাদের সহিত ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ হইলে।··· কোন কারণে সভা কর্তৃক পরিত্যক্ত কিংবা সভা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেও ইহার কার্যকলাপ প্রকাশ করিবে না—আজিকার বিশ্বাস ভঙ্গ করিবে না।' এই বদ্ধ গৃহের বর্ণনা এইরূপ: 'গৃহে একখানি চতুষ্কোণ টেবিলের দুই প্রান্তে দুইটি মৃন্ময় ধুনাপাত্রে ধূপধুনা জ্বলিতেছে। মধ্যস্থলে পদ্মবিদ্ধ কতকগুলি খড়্গ।' ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে সভাপতি জীবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ওজস্বিনী বক্তৃতা আছে। তাঁর বক্তৃতার মর্ম হল: গুপ্তসভার উদ্দেশ্য দেশোন্নতিসাধন, 'দেশহিতকর অনুষ্ঠানে জাতিগত মাহাত্ম্যবৃদ্ধিই ইহার মূল সংকল্প'। এর জন্য প্রয়োজন 'দেশে ধনবৃদ্ধি ও শিক্ষা-বিস্তার।···অতএব ইউরোপের ন্যায় হাতেকলমে বিজ্ঞান-চর্চাই এই সভার উদ্দেশ্য।···যোগ্যের জয় সর্বত্র, যদি তাহাদের অত্যাচার নিবারণ করিতে চাও নিজে যোগ্য হও, কেবল গালিবর্ষণে যোগ্যতা জন্মে না। একতা! দৃঢ়তা! কার্যতৎপরতা! আমাদের এই লক্ষ্য যেন অভঙ্গ থাকে।' এর পরবর্তী বক্তা নবীনের বক্তব্য হল, 'কেবল বিজ্ঞানচর্চা নহে—আধ্যাত্মিক উন্নতি ও জাতীয়তা রক্ষা এ সভার আর এক

১০১ গ্রন্থপরিচয়, গীতবিতান, পৃ ৯৮৫-৮৭।

উদ্দেশ্য হউক।' সভা যে কেবলমাত্র বক্তৃতাই করেছে তা নয় নানাবিধ স্বদেশী শিল্পের প্রতি সভ্যগণ উদ্যোগী ছিলেন তার প্রমাণও আছে; কাচ, সাবান প্রভৃতি শিল্পোদ্যমের কথা গম্ভীরভাবে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে 'উত্তেজনার আগুন পোহানো'র লঘুতা ছিল না; এর পরিণাম হয়ত হাস্যকর, কিন্তু যে নিষ্ঠা ও ভালবাসা নিয়ে সভ্যগণ জাতীয় উন্নতি সাধনে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন লেখিকা তাকে নিয়ে কোনো রসিকতা করেননি। পরবর্তী কালে এই সভা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে কৌতুকসৃষ্টি করেছেন প্রায় সমসাময়িক কালে স্বর্ণকুমারীর মনে সেইভাব জাগ্রত হয়নি; প্রবীণ রবীন্দ্রনাথ 'শিশুক্রীড়া হেরি হাসিয়া আকুল' হয়েছিলেন এবং সেটাই স্বাভাবিক, কিন্তু স্বর্ণকুমারী যখন স্নেহলতা রচনা করেছেন তখন এই সভা সম্বন্ধে হতাশ হওয়ার কিছু ছিল না।

স্নেহলতার প্রথম ভাগের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ব্রাহ্ম এবং হিন্দু ধর্মের আদর্শ ও মতামতের সংঘাত-কথা বর্ণিত; জগৎবাবু ও বামাচরণের কথোপকথন-তর্কবিতর্ক এই প্রসঙ্গেই হয়, এগুলি পরবর্তী কালের 'গোরা'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 'স্কুলের চারিজন ছাত্র বিকালে বিডন-গার্ডনের এক নির্জন প্রান্তে একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়া গল্প করিতেছিল'— নবম পরিচ্ছেদের এই বিশ্রম্ভালাপের বিষয় ছিল বাল্যবিবাহ এবং তার সুফলকুফলাদি; প্রসঙ্গত ইংরেজি সাহিত্যচর্চা ও উচ্চারণতত্ত্বগত বিতর্কও উত্থাপিত। উপন্যাসের দ্বিতীয় ভাগটি প্রধানত বিধবাবিবাহ সমস্যা অবলম্বনে রচিত; বিধবা স্নেহলতা ও বিপত্নীক চারুর পারস্পরিক সম্পর্ক যতই জটিল আকার ধারণ করেছে ততই উক্ত সমস্যা সম্বন্ধে গভীর বিশ্লেষণাদি অনিবার্যভাবে এসে পড়েছে। বিবিধ সামাজিক সমস্যাকে গ্রন্থে পরিবেষণ করে লেখক যে সুতীব্র সমাজসচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন সে বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। কিন্তু সেকালের পারিবারিক ও অন্তঃপুরের যে চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন তা আরও নিখুঁত। প্রথম ভাগের প্রথম পরিচ্ছেদে অন্তঃপুরিকাগণের দ্বি-প্রাহরিক তাসখেলা ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ঘটকী প্রসঙ্গের স্বচ্ছন্দ বর্ণনা আছে। একাদশ ও ত্রিংশ পরিচ্ছেদে যথাক্রমে স্নেহলতা ও টগরের বিবাহকে উপলক্ষ্য করে স্ত্রী-আচারের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে স্নেহলতায় সেকালের সমাজের একটি বিশ্বস্ত চিত্র ও চরিত্র তিনি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। প্রথম ভাগের অষ্টম পরিচ্ছেদে নির্জন গঙ্গাবক্ষে 'একখানি চট্টগ্রামী মহাজনী নৌকা'র লোকজনদের উপভাষাশ্রিত গানের যেমন স্থান আছে তেমনী দাসী-চাকরানীর প্রসঙ্গও বর্জিত হয়নি। মূলত জগৎবাবুর সংসারকে কেন্দ্র করে বর্তমান আখ্যান রচিত হয়েছে, কিন্তু জগৎবাবুর পারিবারিক চিত্রই কেবল নয় প্রাসঙ্গিক সমস্ত পরিবারের ছবি উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত।

এছাড়া স্নেহলতার 'বেশ স্বাভাবিক' 'চরিত্রচিত্রণ ও মনোবিশ্লেষণ'-এর প্রশংসা করেছেন

প্রবীণ সমালোচক।[১০২] একদা লেখিকা মালতী নামক বড়গল্পের চতুর্থ পরিচ্ছেদে 'মনের নিউটনে'র অভাব অনুভব করে আক্ষেপ করেছিলেন: 'কিসে হৃদয়ের কি হয়—কি প্রাকৃতিক নিয়মে যে তাহা চলিতেছে তাহা নির্ণয় করা বড় সহজ নহে। নিউটন গেলিলিও অনেক ভাবিয়া বাহ্যিক জগতের নিয়ম বাহির করিয়াছেন, কিন্তু মনের নিউটন এখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই। আর কবেই বা জন্মাইবে কে জানে।'[১০৩] অনাগত মনের নিউটনের আগমনী রচনা করে সাধ্যমত তাঁর ক্ষেত্রও তিনি রচনা করে দিয়ে গিয়েছেন; কিংবা বলা যায়, যে অভাব তিনি অনুভব করেছিলেন তা সম্পূর্ণরূপে দূর করতে না পারলেও সেই বিষয়ে যথেষ্ট উত্তম প্রকাশ করেছিলেন। স্নেহলতা পাঠকালে সেকথা সতত মনে পড়া স্বাভাবিক। উপন্যাসের প্রথম ভাগে এই মনোবিশ্লেষণের অবকাশ ছিল স্বল্প। সেখানে নানান ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত বিচিত্র প্রকৃতির বিপুলসংখ্যক চরিত্রের মনে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে তা-ই উপস্থাপ্য বিষয় ছিল বলে লেখিকা কোনো বিশিষ্ট নরনারীর দিকে পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেননি; অবশ্য একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে কোনো ঘটনাই অসঙ্গত অস্বাভাবিক বা যৌক্তিক পারম্পর্যবিহীন হয়ে পড়েনি। তাই বলা চলে উপন্যাসের প্রথম ভাগের বিবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিসরে যুক্তি যেমন বর্জিত হয়নি তেমনি মানসিক প্রতিক্রিয়ার ইতিহাস সংক্ষেপে পরিবেশিত হয়েছে। সেদিক থেকে অর্থাৎ মনোবিশ্লেষণের দৃষ্টিকোণ থেকে দ্বিতীয় ভাগটি অধিকতর উৎকৃষ্ট। এই পর্যায়ে শাখাকাহিনী উপকাহিনীর অভাব নেই সত্য, কিন্তু সর্বতোভাবে প্রধান হয়ে উঠেছে বিপত্নীক চারু ও বিধবা স্নেহলতার পারস্পরিক আকর্ষণ-বিকর্ষণকথা; তাই অনুকূল পরিবেশে মনোবিকলন রীতি সুন্দর প্রশ্রয় লাভ করেছে। 'চারু ও বিধবা স্নেহলতার পরস্পরের প্রতি প্রেমসঞ্চারই উপন্যাসের প্রধান বিষয়।'[১০৪] স্নেহলতার বিড়ম্বিত জীবনের প্রতি চারুর সহানুভূতি, স্ত্রী-বিয়োগে তার দাম্পত্যজগতের সর্বসংশূন্য অবস্থা, জননী ও সহোদরার উপর্যুপরি অনুরোধ প্রভৃতি চারুর কল্পনাপ্রবণ হৃদয়ের ভিত্তিভূমি ক্রমশ দুর্বল থেকে দুর্বলতর করে দিয়েছে। পক্ষান্তরে অসহায় নিরাশ্রয় স্নেহলতার জীবনে বৈধব্যের আকস্মিক বজ্রাঘাত, চারুর সহানুভূতি ও সান্নিধ্য, গৃহিনী এবং টগরের নিরন্তর তিরস্কার তাকে তার সুপ্ত বাল্যপ্রণয় সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছে। সে এই অপঘাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য বিদ্যাচর্চায় আত্মনিয়োগ করতে চেয়েছে, কিন্তু এই আত্মপ্রবঞ্চনায় প্রতিমুহূর্তে সে ক্ষতবিক্ষত। তার এই শোচনীয় অবস্থার অবসান ঘটেছে আত্মহত্যার

১০২ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ ২৫১।
১০৩ ভারতী, ফাল্গুন ১২৮৬।
১০৪ বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ২৫১।

মধ্যে। অবশ্য জগৎবাবু এই ভয়ঙ্কর পরিণতির অন্য ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন। উপন্যাসের উপসংহারে লেখিকা বলেছেন—'তাঁহার মনে হয়, স্নেহকে লেখাপড়া না শিখাইলে সে বেশ সন্তুষ্টচিত্তে আপনার অদৃষ্ট বহন করিতে পারিত, আপনার অধঃপতন মৃত্যু আপনি ডাকিয়া আনিত না। জগৎবাবুর বিশ্বাস লজ্জায় ও অনুতাপেই স্নেহ আত্মহত্যা করিয়াছে।' মোটের উপর লেখিকা নানাবিধ দৃষ্টিকোণ থেকে স্নেহলতার জীবনের পরিণামকে লক্ষ করেছেন এবং এর প্রত্যেকটিকেই তিনি বিশ্বাস্য ব্যাখ্যার ভিত্তিভূমির উপর সুদৃঢ়ভাবে স্থাপন করে দিয়েছেন।

কাহাকে ?

॥১॥ ('কাহাকে ?' উপন্যাসটি ১৮৯৮ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়, পৃষ্ঠাসংখ্যা ১২১। স্বর্ণকুমারী পরবর্তী কালে গ্রন্থটি ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন এবং ১৯১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে লণ্ডনের T. Werner Laurie, Ltd. থেকে An Unfinished Song এই নামে অনুবাদটি প্রকাশিত হয়।[১০৫]) এই অনূদিত গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছিলেন E. M. Lang ; শেষ অনুচ্ছেদে তিনি বলেছেন, This is the first time that a book of hers has been brought before the English public, and it should be of deep interest to all those who are concerned with the Woman question, for it presents a careful study of the Indian girl at this intensely interesting stage in the history of her development, and particularly of her at itude towards love and marriage ; all that is best in the old traditions of her race still holds her fast, but she is reaching out eager hands for the freedom that will someday be hers. অবশ্য এই অনুবাদের মাধ্যমে তিনি প্রথম ইংরেজ সমাজে আত্মপ্রকাশ করেননি, এর অন্তত তিন বৎসর আগে ফুলের মালার ইংরেজি অনুবাদ দি ফ্যাটাল গার্ল্যাণ্ড (১৯১০) প্রকাশিত হয়। সে যাহোক, এই ভূমিকায় শ্রীযুক্ত ল্যাং গ্রন্থকারের জীবনের বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন প্রথমে ;

১০৫ দ্র সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, ২৮শ, পৃ ১৭। ১৯১৩ সালে গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ—published at Clifford's Inn, London, by T. Werner Laurie. Ltd এবং ১৯১৪ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ—published at Essex Street, London, W. C., by T, Werner Laurie, Ltd. এক বৎসরের মধ্যে গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশ থেকে উপলব্ধ হয় গ্রন্থটির জনপ্রিয়তার পরিমাণ।

ঠাকুরবাড়ির কথা, তাঁর অগ্রজগণের কথা, এমনকি তাঁর দৈনন্দিন জীবনের নানা দিক সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করে মন্তব্য করেছেন, Mrs. Ghosal is a forerunner, a type of the future woman of India ইত্যাদি ইত্যাদি।

কাহাকে সম্বন্ধে অ্যান আনফিনিশড সং-এর মুখবন্ধে (Preface) বলা হয়েছে, This is a story of life among the Reformed Party of Bengal, the members of which have to some extent, adopted western customs. It shows the change that touch with Europe has brought upon the people of India, but in their inner nature the Hindus are still quite different from western races. The ideals and traits of character that it has taken thousands of years to form are not affected by a mere external change. This story, it is true, touches on one side of Indian life only, for in a small book it is difficult to depict many of the numerous phases of our Society ; still I trust it will give the western reader some insight inot the Hindu nature.[১০৬]

আরেকটি কথা এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন। 'উপসংহার' বাদ দিয়ে 'কাহাকে'র পরিচ্ছেদ-সংখ্যা মোট কুড়ি, কিন্তু ইংরেজি অনুবাদে মোট সংখ্যা একুশ; কারণ বাংলা গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদটি অনুবাদের সময় দুটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত হয়েছিল।

'কাহাকে' গ্রন্থের উপহার-পত্রটি একটু রহস্যাবৃত, নীচে তা দেওয়া হল :

কাহাকে ?
করুণা সে চাহে কৃতজ্ঞতা
ভালবাসা চাহে ভালবাসা,
তব প্রেম অতুল মহান,
শুধু দান নাহিক প্রত্যাশা !

১০৬ অনুবাদ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯১৪) ব্যবহৃত বিভিন্ন বিদেশী সংবাদপত্রের মন্তব্যেও এই বৈশিষ্ট্যটি ফুটে উঠেছে। যেমন, New York Herald : Mrs Ghosal has contrived in an absorbing narrative to the western reader a valuable insight into the Hindu nature.

Westminster Gazette : Mrs. Ghosal, as one of the pioneers of the woman movement in Bengal, and fortunate in her own upbringing, is well qualified to give this picture of a Hindu maiden's development.

Clarion : Remarkable for the pictures of Hindu life, the story is overshadowed by the personality of the authoress, one of the foremost Bengali writers of to-day.

নিষ্কাম চরণে তব দেব
প্রীতিময় এ পূজা, প্রণতি—
স্বার্থপূর্ণ দীন সকামের
আত্মহারা বিস্ময়-ভকতি।)

।২। উপন্যাসটি সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "'কাহাকে' (১৮৯৮) রোমান্টিক প্রেমকাহিনী মাত্র। ইহাতে ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের একটি উজ্জ্বল চিত্র আঁকা হইয়াছে।"[১০৭] কিন্তু সকল দিক থেকে বর্তমান রচনাটিকে স্বর্ণকুমারীর 'সর্বোৎকৃষ্ট উপন্যাস'রূপে স্বীকার করেছেন সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এক তরুণী তার প্রণয়কাহিনী নিজমুখে বর্ণনা করেছে। প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে এই প্রণয়মহিমার কথা জীবনের সঙ্গে তার অবিচ্ছেদ্যতার কথা কীর্তিত হয়েছে, "Man's love is of Man's life a thing apart/ 'Tis woman's whole existence. একথা যিনি বলিয়াছেন তিনি একজন পুরুষ। পুরুষ হইয়া রমণীর অন্তর্গত প্রকৃতি এমন হুবহু ঠিকটি কি করিয়া ধরিলেন, ভারি আশ্চর্য মনে হয়। আমি ত আমার জীবনের দিকে চাহিয়া অক্ষরে অক্ষরে একথার সত্যতা অনুভব করি। যতদূর অতীতে চলিয়া যাই, যখন হইতে জ্ঞানের বিকাশ মনে করিতে পারি তখন হইতে দেখিতে পাই—কেবল ভালবাসিয়াই আসিতেছি, ভালবাসা ও জীবন আমার পক্ষে একই কথা; সে পদার্থ টাকে আমা হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে জীবনটা একেবারে শূন্য অপদার্থ হইয়া পড়ে—আমার আমিত্বই লোপ পাইয়া যায়।" এই ভালবাসার স্বরূপ সন্ধানে নায়িকা তৎপর, 'আমি ভালবাসি, বিবাহের পূর্বেই ভালবাসি, তিনি যে স্বামী হইবেন এমনতর আশা করিয়াও ভালবাসি নাই। কেবল তাহাই নহে, এই ভালবাসাই আমার একমাত্র প্রথম এবং শেষ ভালবাসা নহে। আমি ইহাকে যখন ভালবাসি নাই তখনো আমার হৃদয় শূন্য ছিল না। মাকে মনে পড়ে না, শিশুকালেই মাতৃহারা; কিন্তু শৈশবে বাবাকে যেমন ভালবাসিতাম কোন সন্তান মাকে যে তাহার অধিক ভালবাসিতে পারে এরূপ আমি কল্পনাও করিতে পারি না। অনেকেরই সংস্কার আছে পিতৃমাতৃপ্রেম ও দাম্পত্যপ্রেম পরস্পর নির্লিপ্ত পৃথক দুই বস্তু, একের সহিত অন্যের তুলনাই অসঙ্গত, অসম্ভব। তুমি আমার সহিত মিলিবে কিনা জানি না, আমার কিন্তু ধারণা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। আমার অভিজ্ঞতায় শৈশবের মাতৃপ্রেমে ও যৌবনের দাম্পত্যপ্রেমে অল্পই তফাৎ। যৌবনে প্রণয়ীরই মত শৈশবে পিতামাতা আমাদের একমাত্র নির্ভরের সামগ্রী, পূজার সামগ্রী, ভালবাসার সামগ্রী; পিতামাতা রক্ষক, দেবতা, প্রণয়ী, একাধারে সর্বস্ব। উভয় প্রেমেই সেই আসঙ্গলিপ্সা,

১০৭ বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, পৃ ১০৭।

সারাদিন চোখে চোখে রাখিতে সাধ, প্রাণে প্রাণে আপনার করিবার ইচ্ছা, সম্পূর্ণভাবে দখল করিয়া রাখিবার বাসনা, না পাইলে পরম অতৃপ্তি, তাহার সুখে সুখ, তাহার সুখের জন্ত কষ্ট স্বীকারে আনন্দ—এসমস্ত একই রকম।' পিতার প্রতি স্নেহ-প্রীতি-ভক্তির রীতি এবং প্রণয়ীর প্রতি সুগভীর আকর্ষণকে সদৃশ জ্ঞান করার পশ্চাতে আধুনিক শিক্ষিতার বৈদগ্ধ্য ও মননশীলতা প্রকাশ পেয়েছে। সরলা রমণীর স্বাভাবিক সংস্কার এখানে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃত। তাই 'কাহাকে'র মধ্যে যে আধুনিকা শিক্ষিতা মার্জিতবুদ্ধি তরুণী নায়িকার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের ইন্দিরার আপাতসাদৃশ্য থাকলেও পার্থক্যও অনস্বীকার্য।

'সকলরূপ গভীর ভালবাসারই মূলগত ভাব একই; একের সহিত অন্তের পার্থক্য কেবল সে ভাবের স্থায়িত্ব ও প্রবলতার তারতম্যে। যাহাকে ভালবাসি তাহার সুখে সুখ বোধ ও তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আপনার করিবার ইচ্ছা প্রেমের এই যে নিঃস্বার্থ অথচ সর্বেসর্বা ভাব—পিতামাতার স্নেহেই ইহার প্রথম স্ফূর্তি এবং ভ্রাতাভগিনী সখাসখীর ভালবাসার মধ্য দিয়া প্রণয়ে ইহার চরম পরিণতি। আসলে প্রেমমাত্রে একই বস্তু, কেবল বিকশনে ও ভিন্নাধারে ভিন্নাকার।'—এই ধারণা-জিজ্ঞাসার সূত্র অবলম্বনে কাহাকে উপন্যাসের বিচিত্র প্রণয়কাহিনীগুলি গ্রথিত। শৈশবের পিতৃভক্তি, বাল্যের সখ্য, যৌবনের প্রণয় প্রভৃতি সকলই বর্তমান উপন্যাসে পরিবেশিত; কিন্তু বাল্যসখার মধুর সঙ্গ-সান্নিধ্যস্মৃতি পরিণামে প্রবল আকার ধারণ করেছে—বহুপূর্বে শ্রুত বাল্যসঙ্গী ছোটুর মুখে শোনা একটি সংগীতাংশ 'তাহার স্মৃতিতে একটা অজ্ঞাত প্রেমের রাগিণীর ন্যায় বাজিতে লাগিল' এবং এই সূত্রে তাহার চিত্তে এক অভিনব ভাবের জাগরণ হল যাকে প্রেমরূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

> 'হায়! মিলন হোলো,
> যখন নিভিল চাঁদ, বসন্ত গেলো!
> হাতে করে মালাগাছি সারাবেলা বসে আছি
> কখন ফুটিবে ফুল আকাশে আলো—'

ইত্যাদির মধ্যে একটি প্রতীক্ষমাণ হৃদয়ের ব্যথা ধ্বনিত হয়ে উঠেছে; পরবর্তী কালে নায়িকা এরই মধ্যে ছোটুর 'না-বলা-বাণী'কে তন্ন তন্ন করে সন্ধান করে ফিরেছে, পক্ষান্তরে ভ্রমরগুঞ্জনের ন্যায় গানের কথাগুলি তার মনের চতুর্দিকে একটি সুখাবেশের মধুর বৃত্ত রচনা করেছিল। সমগ্র উপন্যাসটি যে এই 'সুরের বাঁধনে' ধরা পড়েছে সেকথা পূর্বে বলা হয়েছে; তাছাড়া নায়িকার মানসবিকাশের সম্পূর্ণতা ও ঘটনা-পরিণাম একই সময়ে এসে পড়েছে এই সংগীতাংশকে অবলম্বন করে। ঘটনা-পরিকল্পনাগত এই চমৎকারিত্ব সত্যই প্রশংসনীয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের ইন্দিরা (৫ম সং, ১৮৯৩) ও স্বর্ণকুমারীর 'কাহাকে' উত্তম পুরুষের উক্তিতে রচিত উপন্যাস ; উভয় উপন্যাসের মধ্যেই নায়িকার প্রধান্য লক্ষিত হয়। কিন্তু কাহাকের মধ্যে 'আগাগোড়া স্ত্রীলোকের সুর ধ্বনিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে যথেষ্ট তর্ক-বিতর্ক আছে, যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের আস্ফালন আছে, ইংরেজী সাহিত্য ও সমাজের তুলনা-মূলক সমালোচনা আছে, কিন্তু সকলের উপর দিয়া একটি স্ত্রী-হস্তের লঘু-কোমল স্পর্শ অনুভব করা যায়।' প্রবীণ সমালোচকগণ কাহাকের মধ্যে এই জিনিসটির সন্ধান লাভ করেছেন। অথচ যে তর্কবিতর্কের ঝাঁজ আছে তাও অসঙ্গত হয়নি কারণ নায়িকা অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত নয়। তার বৈদগ্ধ্য মননশীলতা বিশ্লেষণী ক্ষমতা তথা প্রখর আত্মজিজ্ঞাসার জন্য এই ব্যাপারটিকে স্বাভাবিক বলে মনে হয়, 'শিক্ষা তাহাকে বাক্-সংযম দিয়াছে, তাহার রুচি মার্জিত করিয়া তাহার চরিত্র-সৌকুমার্যকে বাড়াইয়াছে'; এইসকল গুণ 'চরিত্রটিকে পুরুষোচিত করে তোলেনি, সর্বত্রই নারীসুলভ কমনীয়তা একটি লঘুস্পর্শ সৌকুমার্যের সৃষ্টি করেছে।'

।৩। শিক্ষিত 'ইঙ্গবঙ্গ সমাজের উজ্জ্বল চিত্র' বর্তমান উপন্যাসের মধ্যে পাওয়া যায়। নায়িকার 'ভগিনীপতি বিলাতফেরত ব্যারিষ্টার, ইংরাজীয়ানা চালে চলেন; টেনিস খেলা উপলক্ষে হপ্তায় হপ্তায় তাঁহার বাড়ীতে ছোটখাট একটি স্ত্রী-পুরুষ-সম্মিলনী হইয়া থাকে।' (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ) এই সমাজ বিলাতফেরৎ সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথের সমাজ থেকে পৃথক নয়। এঁদেরই পরিবারস্থ হয়ে পড়েছে নায়িকা। তাছাড়া মৃণালিনীর (সংক্ষেপে 'মনি'—নায়িকার নাম) পিতার চরিত্রও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ছায়ায় আশ্রিত। অন্তত মৃণালিনী ও তার পিতার যে সুন্দর সম্পর্ক-কথা উপন্যাসে পাওয়া যায় তার সঙ্গে স্বর্ণকুমারী ও দেবেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতার সাদৃশ্য পাওয়া যায়; দীর্ঘ কাল পরে গৃহপ্রত্যাগত পিতার জন্য দুহিতার উৎকণ্ঠিত হৃদয়াবেগ, পুষ্পচয়ন প্রভৃতির প্রসঙ্গ উপন্যাসেও আছে। সে যাহোক, যে ভগিনীপতির সমাজে মৃণালিনী বসবাস করে সেখানে সেক্সপীয়র, মিল্টন, রোমান্টিক কবিকুল ও জর্জ এলিয়ট ঘনঘন যাতায়াত করেন; অপরপক্ষে এই সমাজে কেউ কেউ আবার 'সংস্কৃতে এম. এ. দিয়াছেন' এবং তাঁরাও বিদ্যা প্রদর্শনের সুযোগ কদাপি ছাড়েন না। নায়িকার দিদি পিয়ানোতে সিদ্ধহস্ত; ভগিনীপতি সাহিত্য থেকে পলিটিক্স পর্যন্ত অবাধে 'পুনঃপুনঃ গতাগতি' করতে পারেন। নায়িকা আপনাদের সম্বন্ধে বলেছে, 'ইঙ্গবঙ্গ সমাজের সুশিক্ষিতনামা কোন বঙ্গবালা হইতে যে আমার ইংরাজী ব্যুৎপত্তি প্রতিপত্তি কিছু কম তাহা নহে, আমিও লোরেটো কনভেন্টে শিক্ষালাভ করিয়াছি; বাবাকে জেঠাইমাকে ও পিসীমাকে ছাড়া আর কাহাকেও চিঠিপত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিয়া থাকি; সখীদিগের সহিত কথাবার্তাও অনেক সময়ে ইংরাজীতেই চলে, আর এ পর্যন্ত যে কতশত ইংরাজী কবিতা উপন্যাস মস্তিষ্কজাত করিয়াছি তাহার ত ঠিকঠিকানাই নেই।' (সপ্তম পরিচ্ছেদ)

ত্রয়ী

॥১॥ 'বিচিত্রা' 'স্বপ্নবাণী' ও 'মিলনরাত্রি'র মধ্যে ঘটনার যোগ আছে বলে আমরা ঐ তিনটি উপন্যাসকে 'ত্রয়ী' (Trio) এই অভিধায় চিহ্নিত করেছি। সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার অন্তর্গত স্বর্ণকুমারী দেবী নামক গ্রন্থ থেকে উক্ত উপন্যাসত্রয়ের প্রকাশকাল নিয়ে প্রদত্ত হল :

বিচিত্রা। ১ বৈশাখ ১৩২৭, ৭ মে ১৯২০। পৃ ১৫৭।

স্বপ্নবাণী। জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮, ২৪ অক্টোবর ১৯২১। পৃ ১৭২।

মিলনরাত্রি। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২, ইং ১৯২৫। পৃ ২৮৫।

এই তিনটি উপন্যাসের প্রকাশকাল সম্বন্ধে একই তথ্য পরিবেশিত হয়েছে বিশ্বভারতী পত্রিকার অষ্টম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত 'বাংলা-সাহিত্যে বঙ্গমহিলার দান' নামক প্রবন্ধে। কিন্তু স্বপ্নবাণীর প্রদত্ত প্রকাশকাল সম্বন্ধে স্বাভাবিকভাবে সংশয় জাগ্রত হয় কারণ জ্যৈষ্ঠ ও অক্টোবর মাস একই গ্রন্থের প্রকাশকাল হতে পারে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হওয়ার পূর্বে ভারতী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে উপন্যাসগুলি যথারীতি প্রকাশিত হয়। 'স্বর্ণকুমারী দেবীর নূতন গ্রন্থাবলী'র ষষ্ঠ ভাগে উপন্যাস তিনটি আছে। সেখানে ঘটনাক্রম অনুযায়ী গ্রন্থগুলি পরিবেশিত হয়নি, এর ক্রম হল—মিলনরাত্রি, বিচিত্রা, স্বপ্নবাণী। বিচিত্রার শেষে বলা হয়েছে 'ইতি প্রথম খণ্ড'; স্বপ্নবাণীর আরম্ভে ও শেষে আছে 'বিচিত্রার পরিসমাপ্তি' এবং মিলনরাত্রির শেষে পাওয়া যায় শুধু 'সমাপ্ত' কথাটি। অর্থাৎ বিচিত্রায় যে কাহিনীর যাত্রারম্ভ মিলনরাত্রিতে তার অবসান ঘটে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে এই তিনটি গ্রন্থ একত্রে লেখিকার উপন্যাস রচনার সর্বশেষ উদ্যম।

বিচিত্রার উপহার-পত্রটি এইরূপ—

তোমারেই দিতে হবে? তাই লও বেশ!
দেখো যেন না পড়েই করিও না শেষ!
অত কেন হাসি রানি? বলো দেখি মনোবাণী
কার ছবিখানি এত দেখিছ সরেশ?

॥২॥ ত্রয়ীর মূল কাহিনী একান্ত বিষাদান্তক। প্রসাদপুরের রাজপ্রাসাদ ঘটনার কেন্দ্রভূমি হলেও পার্শ্ববর্তী কলিকাতা পর্যন্ত ঘটনার স্থানিক বিস্তৃতি ঘটেছে। রাজকন্যা জ্যোতির্ময়ীর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে নানাবিধ চরিত্রের সমাবেশ লক্ষ করা যায়। গৃহশিক্ষক দেবব্রত ভট্টাচার্যের নিকট রাজকুমারী স্বাদেশিকতার দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন; অবশ্য পিতা অতুলেশ্বরের প্রবল স্বাজাত্যাভিমান ও আত্মমর্যাদাবোধের প্রভাবে কন্যার

হৃদয়ে স্বদেশপ্রীতির অঙ্কুরোদ্গম হয়েছিল। বিদেশীয় 'বড় ইংরেজ' ম্যাজিস্ট্রেট ক্লাউডেন সাহেবের আনুকূল্যও এই রাজপরিবার লাভ করতে থাকে যার ফলে স্বদেশবাসীকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করতে অতুলেশ্বর ও জ্যোতির্ময়ী অনায়াসে সকল সরকারী বাধাবিপত্তি অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ঘটনাচক্রে পারিবারিক চিকিৎসকরূপে মেডিক্যাল কলেজের কৃতী ছাত্র শরৎকুমার চলে আসেন প্রসাদপুরে। স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবোধের বাতাবরণে জ্যোতির্ময়ী ও শরৎকুমারের প্রণয় প্রবর্ধিত হতে থাকে। পরিণামে জনৈক সন্ত্রাসবাদী বিরুদ্ধপন্থীর অতর্কিত আক্রমণে জ্যোতির্ময়ীর জীবনাবসান ঘটে এবং এই প্রণয়ও অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়। স্বাদেশিক ভাবনায় জ্যোতির্ময়ীর হৃদয় ছিল পরিপূর্ণ তড়াগের মত; এই স্বদেশপ্রীতিকে অবলম্বন করেই তাঁর চিত্তে প্রণয়ের জাগরণ এবং বিলয় ঘটে বলে অদ্ভুত বিপরীত লক্ষণার (irony) মত ঘটনার অশুভ ও শোচনীয় পরিণাম অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছে।

বিচিত্রা উপন্যাসের মধ্যে রাজা অতুলেশ্বরের প্রমাতামহী বিচিত্রাদেবীর একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা আছে। তাঁর অশ্বারূঢ় তেজস্বী মূর্তি জ্যোতির্ময়ীর চিত্তে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল; প্রবাদবাক্যের সম্রাজ্ঞী বিচিত্রাদেবীর বর্গীর বিরুদ্ধাচরণ তাঁকে যে বীরাঙ্গনার সম্মান একদা দিয়েছিল জ্যোতির্ময়ীর বালিকাহৃদয় সেই ভাবনায় বিস্ফারিত হয়ে উঠে। তাঁর উত্তেজিত চিন্তার রাজ্যে বিচিত্রাদেবী পরিণত হয়েছেন 'সাম্যমৈত্রী ভবিষ্যৎযুগের অধিষ্ঠাত্রীদেবী'রূপে। উপন্যাসের ষোড়শ ও অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। স্বপ্নবাণীর শেষ বা সপ্তদশ পরিচ্ছেদের অন্তিম পর্যায়ে আকুল চিত্তে রাজকন্যা জ্যোতির্ময়ী প্রার্থনা করেছেন, 'তুমি মাতা সাম্য-মৈত্রীর অধীশ্বরী, দেবী বিচিত্রা! বল বল দেবি, সেদিন কি আবার আসিবে তোমার অরূপ চরণস্পর্শে ভারত-ভাগ্য-গগন পুনরায় কি পুণ্যপ্রভাত মহিমায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিবে?' এই আলোচনা থেকে দেখা যায় যেমন একজন মানবী দৈবীকৃত হয়েছেন তেমনি তিনি একটি আইডিয়া বা ভাবনাদর্শেও রূপান্তরিত হয়ে গেছেন অবলীলাক্রমে। বিচিত্রা স্বপ্নবাণী ও মিলনরাত্রি এই তিনটি উপন্যাসকে কেবল ঘটনা নয় একটি ভাবাদর্শও যেন বিদ্ধ করে আছে একথা বলা তাই আদৌ অসমীচীন নয়।

চরিত্রপরিকল্পনার দিক থেকে বলা যায় স্বর্ণকুমারীর ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা এখানে যতটা সক্রিয় হয়ে উঠেছে অন্য কোনো উপন্যাসে ততটা হয়নি। নিজের বাল্যজীবনের সংস্কৃত উদ্ভটশ্লোক শিক্ষার কথা হাসির চরিত্রে প্রযুক্ত; 'পয়সা কমলম্ কমলেন পয়ঃ' প্রভৃতি উদ্ধৃত হয়েছে। হাসি ও হাসির পিতা কৃষ্ণলাল এবং জ্যোতির্ময়ী ও অতুলেশ্বরের সম্পর্ক-কথা চিত্রণকালে লেখিকা ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছেন একথা

সুনিশ্চিত, কারণ এই অংশগুলি পাঠকালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও স্বর্ণকুমারীর সুন্দর সম্পর্কের কথা মনে পড়ে। পিতার জন্য বালিকা কন্যার উৎকণ্ঠা, পুষ্পচয়ন প্রভৃতির কথা বিচিত্রার অষ্টম পরিচ্ছেদে আছে—'আসিবার সময় বাগান হইতে তাঁহার জন্য কতকগুলি ফুল তুলিয়া আনে। রাজা প্রভাতে অরুণরাগ-রঞ্জিত আকাশে নবোদিত সূর্যের শোভা দেখিয়া তন্ময়ভাবে স্বরচিত গানে ঈশ্বর বন্দনা করেন—বালিকা মুগ্ধভাবে তাহা শুনিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তান ধরে। বৈকালিক বায়ুসেবনের পরেও প্রশান্ত রজনীতে পিতাপুত্রীতে এইখানে আসিয়া বসে। রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী হইলে রাজা কন্যাকে সেতার বাজাইতে বলেন…মাঝে মাঝে রাজা যখন কন্যার সংস্কৃত বিদ্যার পরীক্ষা গ্রহণ করেন তখনই জ্যোতির্ময়ী মনে মনে বিপদ গণে। বিদ্যাশিক্ষায় সে যে আশানুরূপ মানোযোগ দিতে পারিতেছে না ইহা সে বেশ বোঝে। রাজা কিন্তু পরীক্ষায় অসন্তুষ্টির কোন কারণ পান না।' পিতাপুত্রীর সম্পর্ক চিত্রণে যখনই তিনি কোনো অবকাশ পেয়েছেন শৈশবের দিনগুলির স্মৃতি তখন জীবন্ত হয়ে উঠেছে এবং লেখিকা সবিশেষ উৎসাহে সেই স্মৃতি সমর্পণ করে গিয়েছেন।

আরও একটি প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। জ্যোতির্ময়ীর স্বদেশহিতৈষণা পিতা অতুলেশ্বরের স্নেহানুকূল্যে প্রবর্ধিত হয়েছিল ; হয়ত লেখিকা দুহিতা সরলার কথা এখানে চিন্তা করেছেন। হিরণ্ময়ী ও সরলা—বিশেষভাবে সরলাদেবী পরবর্তী কালে স্বাদেশিকতায় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন ; জীবনের ঝরাপাতা গ্রন্থে সরলাদেবী এ বিষয়ে পিতামাতার সস্নেহ প্রশ্রয় ও অনুমোদনের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছেন। জ্যোতির্ময়ীর চরিত্রটি সরলাদেবীর ছায়াশ্রিত ; তাঁরই দেশানুরাগ, ব্যায়ামশিক্ষা, ব্যায়ামসমিতিস্থাপন প্রভৃতি কার্যাবলী জ্যোতির্ময়ীর কর্মপন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছিল। কালে তেজস্বিতা ও মাধুর্য সরলাদেবীকে মহিমময়ী লোকমাতায় পরিণত করে, জ্যোতির্ময়ীর মধ্যেও তার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

হাসির পিতা কৃষ্ণলালের চরিত্রের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে। তিনিও 'ফিলজফার লোক, অতএব অলসপ্রকৃতি ; কোনও কাজে তাঁহাকে ভিড়ান বড় সহজ নহে। যতক্ষণ তিনি অন্য কাজ করিবেন ততক্ষণ তাঁহার দর্শনতত্ত্ব লেখায় ব্যাঘাত ঘটিবে।' কৃষ্ণলালের প্রাত্যহিক কর্মের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেছে বিচিত্র পন্থায় দার্শনিক জটিলতা ও সমস্যার সমাধান সাধন : 'কর্তাবাবু একটি অনতিবিস্তৃত গৃহে ছিন্ন কাগজ বেষ্টনীর মধ্যে একটি ছোট টেবিলের নিকটে বসিয়া কাগজের পর কাগজ নানা ফিগার আঁকিয়া জিওমেট্রি সাহায্যে জীবাত্মা ও পরমাত্মার একাত্মবাদ প্রমাণ করিতে ব্যস্ত। বৃত্ত বা লাইন যাহা জগতের সার নিদর্শক তাহা বিন্দুর সমষ্টি বই আর কিছুই নহে, ইহাই বিশ্বকোষ অথচ এই বিন্দুগুলি স্ব স্ব-প্রধান ; বৃত্তের মধ্যে ইহার প্রভাব অসীম, কিন্তু তফাৎ

করিয়া লও ইহা বিন্দুমাত্র; অতএব পরমাত্মাতেই জীবাত্মার এবং জীবাত্মাতেই পরমাত্মার বিকাশ' ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিচিত্রার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে প্রসাদপুরের রাজ-অন্তঃপুরের স্ত্রীশিক্ষাব্যবস্থার যে ছবি পাওয়া যায় তার সঙ্গে ঠাকুরপরিবারের স্ত্রীশিক্ষা-ব্যবস্থাদির বিশেষ সম্পর্ক আছে। রাজা অতুলেশ্বর স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা সমর্থন করতেন। তিনি বুঝেছিলেন, 'স্ত্রীশিক্ষা কেবলমাত্র কল্যাণ-জনক তাহা নয়, স্ত্রীজাতির জ্ঞাননেত্র উন্মেষের উপর জাতির গতিমুক্তি একান্তভাবে নির্ভর করিতেছে।' এজন্য তিনি কন্যা জ্যোতির্ময়ীর শিক্ষাকল্পে অন্তঃপুরে বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। 'বাঙ্গালা পড়াতেই কলিকাতা হইতে দুইজন শিক্ষয়িত্রী আসিলেন, ইংরাজীর জন্য স্থানীয় মিশনারী মেম দুইজন নিযুক্ত হইলেন। রাজবাটীর বালিকাগণ এবং প্রজাদিগের কন্যাও অনেকে এখানে শিখিতে লাগিল। ম্যাজিষ্ট্রেটপত্নী নিজে দুইতিন দিন আসিয়া সেলাই শিখাইতেন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ইহার তত্ত্বাবধান করিতেন এবং মাসে একবার করিয়া ছাত্রীদিগের পরীক্ষা গ্রহণ করিতেন।' এর পশ্চাতে মহিলা-শিল্পসমিতি ও বিধবাশ্রমের নিয়মাবলীর প্রভাব থাকাও বিচিত্র নয়।

বিচিত্রার সপ্তম পরিচ্ছেদে জ্যোতির্ময়ী সর্বসাধারণের ব্যায়ামচর্চার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন, 'সহরে নগরে গ্রামে পল্লীতে বিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে যদি রীতিমত ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে শারীরিক তেজের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের যে মনের তেজও বাড়বে তাতে সন্দেহমাত্র নেই।' এ প্রসঙ্গে হিন্দুমেলার উদ্যোগে ব্যায়ামচর্চার উৎসাহ যে দেখা দিয়েছিল তাও বলা হয়েছে। যাই হোক, রাজা অতুলেশ্বর ও ম্যাজিষ্ট্রেট ক্লাউডেনের সানন্দ অনুমোদন লাভ করে যে ব্যায়ামসমিতি স্থাপিত হয় তার নিয়মাবলী পর্যন্ত একাদশ পরিচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে। সরলাদেবীর উদ্যোগে পিত্রালয়ে অনুরূপ ব্যায়ামাগার স্থাপিত হয়, লাঠিখেলা তলোয়ারখেলা দেহচর্চা তার অঙ্গীভূত হয়।

উপন্যাসের মূল ঘটনাবলীকে সমসাময়িক উল্লেখযোগ্য আন্দোলন উৎসব-অনুষ্ঠান প্রভৃতি বিশ্বস্ত ও বাস্তব পটভূমিকা দান করেছে। বিচিত্রার সপ্তম পরিচ্ছেদে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে। স্বপ্নবাণীর প্রথম পরিচ্ছেদে বঙ্গবিভাগ ও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এমনকি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের বক্তৃতার কথা পর্যন্ত উল্লেখিত হয়েছে, এই পরিচ্ছেদে রাখী-উৎসবের কথাও আছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিদেশী দ্রব্য বর্জন সম্বন্ধে জ্যোতির্ময়ীর উক্তিতে স্বর্ণকুমারীর পরিচ্ছন্ন চিন্তা প্রতিধ্বনিত—'বিলিতি জিনিস একেবারে বর্জন করার সময় এখনো আসেনি। সেইজন্য কিছুদিন ধরে এখনো আমাদের প্রস্তুত হতে হবে।...কল-কারখানারও বিস্তৃত আয়োজন চাই, নইলে বিলিতি সস্তা জিনিসের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমরাই হেরে যাব।' তৃতীয় পরিচ্ছেদে বঙ্গভঙ্গ ব্যবস্থার প্রতিবাদসভার আয়োজন করা

হয়েছে ; ঐ জাতীয় সভায় দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগমনের সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে ন্যাশনাল শিল্পের প্রতিষ্ঠা-উৎসবের কথা পাওয়া যায়। মিলন-রাত্রির দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্রতিবাদ সভা ও আইন-অমান্য আন্দোলনের জলন্ত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে ; পুলিসের প্রবল অত্যাচারের মাঝখান দিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিবাদী জনমণ্ডলীর শোভাযাত্রার মধ্যে সেকালের আইন-অমান্যকারী স্বাদেশিক আন্দোলনের একটি বিশ্বস্ত চিত্র পাওয়া যায়। স্বদেশী সংগীতের বহুল প্রয়োগ উপন্যাস তিনটিকে বাস্তব ও প্রাণবন্ত করে তুলেছে।

কোনো কোনো বিদেশী মহিলা ঔপন্যাসিকের মত স্বর্ণকুমারীও উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর আচার-ব্যবহার ভব্যতা-শিষ্টাচার প্রভৃতির দিকে অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন। খাওয়ার টেবিলের আদবকায়দা থেকে সামাজিক ব্যবহারবিধি পর্যন্ত সকল পর্যায়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় তিনি ছিলেন বিশেষ উৎসাহী। ঠাকুরবাড়ির আদবকায়দা এবং মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের সামাজিক আচার-আচরণ যে তাঁর মনকে প্রভাবিত করেছিল এ প্রসঙ্গে সেকথা মনে পড়া স্বাভাবিক।

॥৩॥ স্বর্ণকুমারীর রাজনীতিবিষয়ক প্রবন্ধাবলী আলোচনাকালে তাঁর রাজনীতি সম্বন্ধীয় পরিণত ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। এই উপন্যাসত্রয়ীর মধ্যেও নানাবিধ অবকাশে তিনি আপনার ধ্যান-ধারণা-বিশ্বাসের পরিচয় প্রদান করেছেন। সে সম্পর্কে দুএকটি কথা বলার আবশ্যকতা আছে। স্বদেশের মুক্তিসাধনে একদল স্বার্থত্যাগী যুবক সেকালে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন ; তাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লেখিকার সহানুভূতি থাকলেও উপায় সম্পর্কে তাঁর কোনো মোহ ছিল না। ফরাসী বিপ্লবের শোচনীয় পরিণাম দেখে জগৎ যে শিক্ষা লাভ করেছিল তাকে আদৌ সমুন্নত ও মহান বলা চলে না। জ্যোতির্ময়ী স্বপ্নবাণীর প্রথম পরিচ্ছেদে বলেছেন, 'সে দৃষ্টান্ত আমাদের আদর্শ হতে পারে না। সেই ভীম বীভৎস নিষ্ঠুরতা মনে করলেও কষ্টে আতঙ্কে দেহের রক্ত জল হয়ে যায়, আত্মা করুণায় বিগলিত আর্দ্র হয়ে ওঠে। ওরকম বিজাতীয় অনুকরণের কথা ভুলেও মনে এনো না ভাই। আমাদের বলীয়ান হতে হবে ধর্মের বলে, নৈতিক বলে। দৈহিক বলের সার্থকতা সেইখানেই যেখানে এই ভক্তি আধ্যাত্মিক বলের সহায়রূপ।' তিনি আরও বলেছেন, 'নৈতিক বল হারিয়েই আমাদের এই দুর্দশা।...যাঁরা রক্তপাতের উপদেশ দিয়ে ছেলেদের বিপথে নিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা দেশের সর্বনাশ করছেন।' নায়িকা জ্যোতির্ময়ী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে একদা সাম্য-মৈত্রীর পতাকার নীচে 'জাতি বিজাতি এক হয়ে যাবে, ভারতবর্ষ বিনা রক্তপাতে অঙ্গুলি তাড়নে তখন স্বরাজলাভ করবে।'

বিদেশীয় জিনিসপত্রাদি বর্জন সম্বন্ধে তাঁর ধারণার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। 'বিদেশী

অনুকরণে পীড়ন-নীতি অবলম্বন করে' যেমন স্বদেশী হওয়া যায় না, তেমনি দোকানদারদের বিলিতি পণ্য জ্বালিয়ে দিয়ে জুলুম করে দেশোদ্ধার করাও যে যাবে না এ ধারণা তাঁর জন্মায়। মিলনরাত্রির প্রথম পরিচ্ছেদে জনৈক সন্ত্রাসবাদী দলনায়কের সঙ্গে জ্যোতির্ময়ী ও পরে শরৎকুমারের যে আলোচনা হয় তার মধ্যে সন্ত্রাসবাদের ছিন্নমস্তারূপটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তবে এ কথাও সত্য যে তাদের উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি ছিলেন দ্বিধাহীন যদিও উপায়কে তিনি সমর্থন করতে পারেননি। প্রসঙ্গত 'নব ডাকাতের ডায়েরি' নামক গল্পটির (গ্রন্থাবলী, ষষ্ঠ ভাগ) কথা উল্লেখ করা যায়; সেখানেও সন্ত্রাসবাদী স্বদেশী ডাকাতের জীবনের ভয়াবহ পরিণামের কথা আলোচিত হয়েছে সত্য, তবে এই স্বদেশভক্তের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য সম্বন্ধে সম্ভ্রমপূর্ণ ধারণার পরিচয়ও পাওয়া যায়।

বিদেশীয়দের অনুকরণ বিষয়ক যে সুচিন্তিত মতামতের উল্লেখ আগে করা হয়েছে তা অন্য প্রসঙ্গ থেকেও সমর্থিত হয়। 'ত্রয়ী'র শরৎকুমার পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং অন্যান্য পাত্রপাত্রীও প্রধানত পাশ্চাত্ত্য ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। বিপিনচন্দ্র পাল ভারতী পত্রিকায় 'ভারত ও বিলাত' (আশ্বিন ১৩১৭) প্রবন্ধের মধ্যে যেসকল মত ব্যক্ত করেন তার প্রতিবাদে স্বর্ণকুমারী একস্থানে লিখেছেন, "লেখক বলিয়াছেন, 'বিদেশী ছাঁচে স্বদেশকে ঢালিবার উৎকট উদ্যোগের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করা যাইতে পারে।' ইহার অর্থ কি—বিদেশী আদর্শ-মাত্রেই আমাদের পরিবর্জনীয়? তাহা কি আমাদের পক্ষে অমঙ্গলকর? কিন্তু আমাদের ত মনে হয় আদর্শ গ্রহণ করায় দোষ বা লজ্জা নাই। বরং তাহাতে উপকার আছে বলিয়াই আমাদিগের ধারণা।...গ্রহণমাত্রেই অনুকরণ নহে এ কথাটি আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে। বস্তুত একটি জাতিতে কোনো গুণের উৎকর্ষ দেখিয়া অপর জাতি যদি তাহার ছাঁচে আপনাকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করে তবে তাহাকে অনুকরণ বলাই সঙ্গত হয় না; তাহা সুপ্তভাবের উদ্বোধনমাত্র।" পাশ্চাত্ত্য জাতির অনুকরণ করাকে বঙ্কিমচন্দ্রও সর্বতোভাবে নিন্দনীয় মনে করেননি। তিনি অনুকরণ-শীর্ষক প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে, বলেছেন: '২। যখন কোন অপেক্ষাকৃত অসভ্য জাতি, সভ্যতর জাতির সংস্পর্শ লাভ করে, তখন দ্বিতীয় পথে সভ্যতা অতি দ্রুতগতিতে আসিতে থাকে। সে স্থলে সামাজিক গতি এইরূপ হয় যে, অপেক্ষাকৃত অসভ্য সমাজ সভ্যতর সমাজের সর্বাঙ্গীণ অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়।...৩। অতএব বঙ্গীয় সমাজের দৃশ্যমান অনুকরণপ্রবৃত্তি অস্বাভাবিক বা বাঙ্গালির চরিত্রদোষজনিত নহে। ৪। অনুকরণ মাত্রই অনিষ্টকারী নহে, কখন কখন তাহাতে গুরুতর সুফলও জন্মে; প্রথমাবস্থায় অনুকরণ, পরে স্বাতন্ত্র্য আপনিই আসে। বঙ্গীয় সমাজের অবস্থা বিবেচনা করিলে, এই অনুকরণপ্রবৃত্তি যে ভাল নহে, এমত নিশ্চয় বলা যাইতে পারে না। ইহাতে ভরসার স্থলও আছে।' এইসকল কথা চিন্তা করলে স্বর্ণকুমারীর বোধ ও

বিশ্বাসকে আদৌ অগ্রাহ্য করা চলে না। অনুকরণাতিশয্যের কুফল সম্বন্ধে তিনি সর্বদা সচেতন ছিলেন বলে তাঁর উপন্যাসে পাশ্চাত্য প্রভাবের সুন্দর পরিণাম লক্ষিত হয়। আবার পাশ্চাত্য ভাবধারার এই সহজ স্বীকরণের মধ্যে তাঁর মানসিক ঔদার্যের পরিচয়ও প্রচ্ছন্ন। সেই উদারতা এতই মহান ও দিব্য যে তিনি কল্যাণকামী বিদেশী শাসকের শুভকামনা করতেও কুণ্ঠা বোধ করেননি। বিচিত্রা উপন্যাসের একাদশ পরিচ্ছেদে নায়িকা জ্যোতির্ময়ী তাঁর নবপ্রতিষ্ঠিত ব্যায়ামসমিতির যে নিয়মাবলী প্রস্তুত করেন তার দ্বিতীয় শর্ত ছিল—ভারত-সম্রাটের শুভকামনা করিবে।' এক্ষেত্রে বলা যায় যে পরাধীনতা তাঁর কাম্য ছিল না বরং পরদেশী শাসনব্যবস্থার অবসান তিনি মনেপ্রাণে কামনা করেছেন; কিন্তু অনুন্নত স্বদেশের হিতাকাঙ্ক্ষী বিদেশী সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতাসূচক শুভেচ্ছাজ্ঞাপনকে নিন্দনীয় কর্ম বলে মনে করেননি তিনি।

৮

স্বর্ণকুমারীর উপন্যাস সম্বন্ধীয় আলোচনাকালে তাঁর কৃতিত্ব সম্বন্ধে দুএকটি কথা প্রসঙ্গক্রমে বলা হয়েছে। তা থেকে বেশ বোঝা যায় যুগের প্রয়োজনানুসারে এবং যুগাদর্শ অনুযায়ী তিনি প্রথমে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং পরে অন্যান্যদের মত সামাজিক উপন্যাস রচনা করেন। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালির নবজাগরণের ফলে যে পুরাচিন্তা ও প্রত্নচর্চা শুরু হয় তার পরিণামে লেখকগণ অতীতের কাহিনীর প্রতি স্বাভাবিকভাবে আকৃষ্ট হয়ে উঠেন। স্বদেশপ্রীতি ও জাতীয়তাবোধে দীক্ষিত নব্য বাঙালি বিদেশী সরকারের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়ে বর্তমানের জগতে ও জীবনে অবাঞ্ছিত হয়ে পড়ে; তজ্জন্য তারা অতীতচারণায় ও ভবিষ্যতের স্বপ্নপ্রয়াণে মনোযোগী হল। হীনমন্যতা-আক্রান্ত বাঙালি-মানস সান্ত্বনার অনুসন্ধানকালে প্রধানত ইতিহাসকে অবলম্বন করে সম্যক স্ফূর্তিলাভ করেছিল। অতীত গরিমার মধ্যে জাতীয় চিত্তের এইপ্রকার অবাধ সঞ্চরণে ঐতিহাসিক উপন্যাসের জন্ম। স্বর্ণকুমারীর ঐতিহাসিক উপন্যাসের আবির্ভাব-রহস্য দীপনির্বাণের উপহার-পত্রে পাওয়া যায়: 'আর্য-অবনতি কথা পড়িয়ে পাইবে ব্যথা বহিবে নয়নে তব শোক-অশ্রুধার', কারণ 'ঢেকেছে ভারত-ভানু ঘন মেঘজাল নিভেছে সোনার দীপ ভেঙেছে কপাল'। মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথকে তিনি উপহার-পত্রিকায় যা বলেছেন তার মর্মার্থ এই। তিনি এই শোচনীয় কাহিনী গ্রন্থন করেছিলেন হৃত-সর্বস্ব বাঙালি তথা ভারতীয়গণের চিত্তে নবচেতনা উদ্দীপনের জন্য। এই স্বাদেশিকতার প্রেরণা থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র এবং রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস ও প্রবন্ধাবলীর উদ্ভব হয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্র প্রভৃতির মত স্বর্ণকুমারীর ঐতিহাসিক উপন্যাসেরও 'দেশ' ছিল অতীত ভারত তথা ঐতিহাসিক যুগের রাজস্থান ও প্রাচীন বাংলা। অতীতচারণার সুবিধার্থে সমকালীন বাঙালি সাহিত্যশিল্পীগণ পশ্চিম ভারতকে এক স্বপ্নলোকরূপে কল্পনা করেছেন, অতীত কাহিনীর দূরত্ব রক্ষার জন্য তাঁরা স্থানিক ব্যবধানটুকু সহজেই স্বীকার করেছেন। স্বর্ণকুমারীর উপন্যাসগুলিতে এমনকি কোনো কোনো সামাজিক উপন্যাসেও পশ্চিম ভারতের প্রতি পক্ষপাতিত্ব পরিলক্ষিত হয়। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে—'বাল্যকাল থেকে পশ্চিম-ভারত আমার কাছে রোমান্টিক কল্পনার বিষয় ছিল। এইখানেই নিরবচ্ছিন্নকাল বিদেশীয়দের সঙ্গে এ দেশের সংযোগ ও সংঘর্ষ ঘটে এসেছে। বহুশতাব্দী ধরে এইখানেই ইতিহাসের বিপুল পটভূমিকায় বহু সাম্রাজ্যের উত্থানপতন এবং নব নব ঐশ্বর্যের বিকাশ ও বিলয় আপন বিচিত্র বর্ণের ছবির ধারা অঙ্কিত করে চলেছে।'[১০৯] পশ্চিম ভারত সম্বন্ধে সেকালের বাঙালি-মানসে বিশেষত ঔপন্যাসিকগণের হৃদয়ে এইপ্রকার একটি রোমান্টিক ধারণা ছিল, সাম্রাজ্যের নানাবিধ উত্থানপতন সঙ্গত কারণে লেখকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করে; এর সঙ্গে মিলিত হয়েছিল 'ভারতবর্ষের বিরাট বিক্ষুব্ধ অতীত যুগের স্পর্শলাভ' করার আকাঙ্ক্ষা। রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করেছেন পশ্চিম ভারতের সান্নিধ্যে এসে তিনি 'পরিচিত সংসার থেকে' এসে 'দূরত্বের দ্বারা বেষ্টিত' হয়েছিলেন এবং 'অভ্যাসের স্থূলহস্তাবলেপ দূর হবামাত্র মুক্তি এল মনোরাজ্যে'।

স্বর্ণকুমারীর ঐতিহাসিক উপন্যাসের উপাদান সম্পর্কে বলা যায় তিনি স্বকাল-প্রচলিত প্রখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলির নির্দেশ যেমন মেনে নিয়েছেন তেমনি কিংবদন্তীকেও বর্জন করেননি, সেকালের পক্ষে ঐতিহাসিক গবেষণার অপ্রাচুর্যও এর একটি অনিবার্য কারণ। প্রধানত তিনি এক্ষেত্রে 'ঐতিহাসিক রস'কেই[১১০] মর্যাদা দিয়েছেন। ঐতিহাসিক তথ্যের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছিলেন বলে তাঁকে কল্পনাশক্তির দ্বারস্থ হতে হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। এ ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্ব অসাধারণ। এই কল্পনার বলে 'চিরন্তন মানব-ইতিহাসের যে নিত্যসত্য' আবিষ্কৃত হয় তাকে ঐতিহাসিক উপন্যাসে উপলব্ধি করে আমরা আনন্দিত হই। স্বর্ণকুমারীর উপন্যাসের পাত্রপাত্রীও বহুল পরিমাণে কল্পনাপ্রসূত। এ ব্যাপারেও তাঁকে অভিযুক্ত করা যায় না কারণ ঐতিহাসিক উপন্যাসের এ রীতি স্বীকৃত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য স্মরণীয়, 'পৃথিবীতে অল্পসংখ্যক লোকের অভ্যুদয় হয় যাঁহাদের সুখদুঃখ জগতের বৃহৎ ব্যাপারের সহিত বদ্ধ। রাজ্যের

১০৯ সূচনা, মানসী।

১১০ রবীন্দ্রনাথ, ঐতিহাসিক উপন্যাস, সাহিত্য।

উত্থানপতন, মহাকালের সুদূর কার্যপরম্পরা যে সমুদ্রগর্জনের সহিত উঠিতেছে পড়িতেছে, সেই মহান কলসংগীতের সুরে তাঁহাদের ব্যক্তিগত বিরাগ-অনুরাগ বাজিয়া উঠিতে থাকে।' তাঁর যেসকল ঐতিহাসিক উপন্যাস কিয়ৎপরিমাণেও কল্পনানির্ভর সেখানেই লেখিকা চিরন্তন মানব-ইতিহাসের নিত্যসত্যের সঙ্গে চরিত্রপরিকল্পনাকে সংযুক্ত করে দিতে চেয়েছেন। ইতিহাসের পটভূমিকায় কল্পনাসৃষ্ট ব্যক্তি-চরিত্র উপস্থাপিত হওয়ায় তা সুন্দর একটি 'চিত্ত-বিস্ফারক দূরত্ব ও বৃহত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।'

অবশ্য কোনো কোনো দিক থেকে মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসের সঙ্গে যেন তাঁর রচনাবলীর সম্পর্ক নিকটতর। রাজপুত জীবন-সন্ধ্যার (১৮৭৯) প্রথম পরিচ্ছেদের আহেরিয়া বা মৃগয়াবর্ণনা মিবাররাজ উপন্যাসের আরম্ভেরই মত, এমনকি উভয়ের রচনার আরণ্যক সৌন্দর্যবর্ণনারও নিকট-সাদৃশ্য আছে। কথিত উপন্যাসের অন্যত্র[১১১] চারণদেবের গীতে লক্ষ্মণসিংহের পুত্র উরুসিংহের যে কাহিনী আছে তার সঙ্গে স্বর্ণকুমারীর 'ক্ষত্রিয় রমণী'-শীর্ষক গল্পের ঐক্য অনুভূত হয়; কেবল স্বর্ণকুমারীর নায়ক অরিসিংহ রমেশচন্দ্রে উরুসিংহে পরিণত, টড বলেন Ursi. আবার রমেশচন্দ্র ও স্বর্ণকুমারীর উপন্যাস রচনার পশ্চাতে প্রধানত সক্রিয় ছিল স্বদেশপ্রীতি ও স্বদেশহিতৈষণা। দীপনির্বাণের উপহার-পত্র ও ভূমিকার মধ্যেও এই উদ্দেশ্য স্পষ্টীভূত। মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাতের (১৮৭৮) ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে ঔপন্যাসিক মন্তব্য করেছেন, 'পাঠক! একত্র বসিয়া এক একবার দেশীয় গৌরবের কথা গাইব, আধুনিক ও প্রাচীন সময়ের বীরত্বের কথা স্মরণ করিব, কেবল এই উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করিয়াছি। যদি সেই সমস্ত কথা স্মরণ করাইতে সক্ষম হইয়া থাকি তবেই যত্ন সফল হইয়াছে, নচেৎ আমার পুস্তকগুলি দূরে নিক্ষেপ কর, লেখক তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইবে না।' স্বর্ণকুমারীর সর্বশ্রেণীর উপন্যাস রচনার পশ্চাতে উক্ত মনোভাবটি সক্রিয় ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর (১৮৭৫), রমেশচন্দ্রের মাধবীকঙ্কণ (১৮৭৭) এবং স্বর্ণকুমারীর ফুলের মালার (১৮৯৫) সূচনাটি একইরকম, শৈশবক্রীড়াতেই এর সূত্রপাত।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের রচয়িতারূপে স্বর্ণকুমারীর কৃতিত্ব বিচারকালে সমালোচকে মন্তব্য করেছেন, 'বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা রমেশচন্দ্রের দৃষ্টান্তেই যেন তিনি বেশি অনুপ্রাণিত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। বঙ্কিমের ন্যায় কল্পনার প্রসার ও তীব্র উচ্ছ্বাস তাঁহার নাই—সত্যনিষ্ঠা ও তথ্যানুবর্তনে তিনি রমেশচন্দ্রের সহিতই অধিক তুলনীয়। তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট উপন্যাসে ভাষা, মন্তব্যের সারবত্তা ও বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যের দিক দিয়া বরং সময় সময় রমেশচন্দ্র অপেক্ষা তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বেরই পরিচয় পাওয়া যায়।'[১১২] অবশ্য বিদ্রোহ নামক সুবৃহৎ উপন্যাসের

১১১ রমেশরচনাবলী, সাহিত্যসংসদ, ১৯৭০, পৃ ২৫৩-৫৫।

১১২ বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ২৫৭।

ঘটনাবলী ইতিহাস থেকে তত আহরিত হয়নি, অর্থাৎ দীপনির্বাণ ও মিবাররাজে তিনি যেরূপ ইতিহাসনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন বিদ্রোহে ততটা পারেননি। বিদ্রোহ উপন্যাসের যে বীজ তিনি সংগ্রহ করেছিলেন টডের গ্রন্থ থেকে তার পরিমাণ নিতান্তই সামান্য, তাই এখানে কল্পনার প্রসার ঘটেছে। এক্ষেত্রে বলাবাহুল্য তিনি বঙ্কিমচন্দ্রেরই পদানুসরণ করে স্বকার্যসাধন করেছেন: 'স্থূলঘটনা, অর্থাৎ যুদ্ধাদির ফল ইতিহাসে যেমন আছে, প্রায় তেমনই' রেখেছেন; 'কোন যুদ্ধ বা তাহার ফল কল্পনাপ্রসূত নহে। তবে যুদ্ধের প্রকরণ, যাহা ইতিহাসে নাই, তাহা গড়িয়া দিতে হইয়াছে' স্বর্ণকুমারীকে।

ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার পরই তিনি সামাজিক উপন্যাস প্রণয়ন করেছিলেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস দীপনির্বাণ ঐতিহাসিক ঘটনাশ্রিত, কিন্তু পরবর্তী উপন্যাস ছিন্নমুকুলে জীবনের প্রাত্যহিকতা ও বর্তমান বা সমসাময়িকতা ধরা পড়েছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের যেস্থলে ইতিহাসের সাহায্য পাননি সেখানে তিনি কল্পনার দ্বারস্থ হয়েছিলেন, কিন্তু কল্পনার স্বেচ্ছাচারিতাকে তিনি স্বীকার করেননি বলে কাল্পনিক ঘটনা ও চরিত্রকে বিশ্বাস্য করে তুলেছেন অপূর্ব জীবনানুভূতি বা বাস্তবতাবোধের সাহায্যে। সেখানেই সামাজিক উপন্যাসের বাস্তব জীবনাশ্রিত কথাসাহিত্যের পূর্বাভাস লক্ষিত হয়। ঐতিহাসিক উপন্যাসের এই অভিজ্ঞতাকে তিনি সামাজিক উপন্যাসে সমর্পণ করেছেন বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই কারণে তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসকে যেমন বাস্তবতাভিত্তিক বলে মনে হয় তেমনি তাঁর সামাজিক সমস্যাকেন্দ্রিক উপন্যাসের মধ্যেও ঐতিহাসিক উপন্যাসের বা রোমান্সের প্রভাব অনুভূত হয়। হুগলীর ইমামবাড়ী এই সন্ধিক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে রয়েছে; একে যেমন বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক বলা যায় না তেমনি শুদ্ধ সামাজিক উপন্যাসরূপেও অভিহিত করা চলে না, কেউ কেউ আবার এটিকে পারিবারিক উপন্যাসরূপে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন যদিও লেখিকা ক্রোড়পত্রে একে অভিহিত করেছেন 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বলে। স্বর্ণকুমারীর ঐতিহাসিক উপন্যাসাবলীর সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘটনার সাহচর্য লাভ করে রোমান্টিক প্রণয়াখ্যান এবং সাধারণ জীবনের কথা এক্ষেত্রে মর্যাদা-মণ্ডিত হয়ে উঠেছে; ইতিহাসের প্রতি অখণ্ড মনোযোগ সত্ত্বেও জীবনযাত্রার খণ্ড ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকরত্ব অবহেলিত হয়নি। এই সূত্র অবলম্বন করেই অন্তঃপুরের বিস্তৃত আধিপত্য দেখা দিয়েছে। এদিক থেকেও তাঁর ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাসের একটি সুন্দর সৌহার্দ্য লক্ষিত হয়। স্বর্ণকুমারীর উপন্যাস-শিল্পের ক্ষেত্রে ইতিহাস এইরূপে সামাজিক জীবনের 'অধুনা'য় পর্যবসিত হয়ে গেছে। দীপনির্বাণের পরবর্তী ও বিদ্রোহের পূর্ববর্তী গল্প-উপন্যাসসমূহে এই কারণে অতীতের জীবাশ্ম অপেক্ষা বর্তমানের হৃদ্‌স্পন্দন অধিক পরিমাণে অনুভূত হয়। সমকালীন সমাজ তার ব্যাধি ও সৌন্দর্য সমস্যা ও উদ্বেগ নিয়ে তাঁর উপন্যাসে সমুপস্থিত।

তাঁর 'অধুনা'-প্রীতির কথা পূর্বেই বলা হয়েছে; 'ইতি-হ-আস'কে অতিক্রম করে তিনি এস্থলে বাস্তব ও সমকালীন জীবনের প্রতি অধিক উৎসুক হয়ে উঠেছেন। স্নেহলতার দ্বিতীয় ভাগের 'নিবেদন'-অংশে তিনি দাবি করেছেন, 'অধুনা বঙ্গসমাজে যেরূপ চিন্তা, যেরূপ ভাব, যেরূপ কার্যকলাপ শত স্রোতে প্রবাহিত তাহারই পূর্বতন চিত্র, তাহারই সূত্রপাত উক্ত সময়ে এই উপন্যাসে অঙ্কিত হইয়াছে।' সামাজিক উপন্যাস যে a picture of real life and manners, and of the times in which it is written[১১৩] সেকথা সমালোচকগণ একবাক্যে স্বীকার করেছেন।

মহিলা ঔপন্যাসিকরূপে স্বর্ণকুমারীর কৃতিত্ব নিরূপণকালে বিদগ্ধ সমালোচকগণ তাঁর উপন্যাসের সাহিত্যিক উৎকর্ষ যতখানি পেয়েছেন 'তাহাদের মধ্যে নারীর স্বরবৈশিষ্ট্যের' ততখানি পরিচয় পাননি। কিন্তু বঙ্গীয় স্ত্রীলোকের অসহায় জীবনের যে যথাযথ চিত্রাঙ্কন তিনি করেছেন তা অকুণ্ঠ প্রশংসার অপেক্ষা রাখে। বিধবার জীবনসমস্যা, অসহায় পরগৃহপালিতার বেদনার্দ্র হৃদয়ের কথা—সমগ্রভাবে অসহায় নারীর জীবনের জটিলতা তিনি সহানুভূতির সঙ্গে সাহিত্যে সমর্পণ করেছেন। লজ্জাবতী, মালতী, পেনেপ্রীতি প্রভৃতি উপাখ্যানের মধ্যে স্বজাতীয়ের জীবনের ব্যর্থতা ও প্রবঞ্চনার দিকটি তিনি অনাবৃত করে দিয়েছেন। চিত্তের যে সহানুভূতি উদারতা ও প্রসার বশত তিনি একদা সখিসমিতি মহিলাশিল্পাশ্রম প্রভৃতি স্থাপন করেছিলেন তা-ই এক্ষেত্রে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। কাহাকে উপন্যাসের মধ্যে 'স্ত্রী-মনোভাবের নিখুঁত প্রতিবিম্ব'-এর অবকাশ সম্বন্ধে জনৈক সমালোচক দ্বিধাহীন প্রশংসা করেছেন।[১১৪]

অবশ্য তাঁর কোনো কোনো উপন্যাসে তর্কবিতর্ক ও মতামত প্রকাশের অত্যুৎসাহ লক্ষিত হয়। তাঁর আদর্শস্থানীয় মহিলা ঔপন্যাসিক জেন অস্টিন, জর্জ এলিয়ট প্রভৃতির শিল্পেও এর ব্যতিক্রম দেখা দেয়নি। শ্রীমতী ইভান্সের প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসগুলিতে স্ত্রী-হৃদয়ের সুন্দর পরিচয় থাকলেও পরবর্তী উপন্যাসগুলি বিতর্ক-জর্জর ও সমস্যা-কণ্টকিত হয়ে উঠেছিল বলে সমালোচকগণ মনে করে থাকেন; সর্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় তিনি তাঁর পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক মহিলা ঔপন্যাসিকগণের এবংবিধ 'পুরুষালি মনোভাবে'র প্রতি কঠোর শ্লেষ করেছেন একটি প্রবন্ধে। একদা তিনি বলেছিলেন, The most pitiable of all silly novels by lady novelists are what we may call the *oracular* species—novels intended to expound the writer's religious, philoso-

১১৩ The Progress of Romance, vol. I, Evening vii.

১১৪ বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ২৫৩।

phical or moral theories.[১১৪] শ্রীমতী ইভান্স বা জর্জ এলিয়টের ক্ষেত্রে যাই ঘটুক না কেন, স্বর্ণকুমারীর তর্কবিতর্ক-প্রধান উপন্যাসগুলির সপক্ষে দুএকটি কথা বলা যেতে পারে। বোঝা যায় এই তর্কবিতর্কপ্রীতি বা মননাতিরেকী প্রবৃত্তি তিনি পেয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্র প্রমুখ কয়েকজন শ্রেষ্ঠ গদ্যশিল্পীর রচনাদর্শ থেকে ; তাছাড়া জর্জ এলিয়টের রচনাবলী পাঠের প্রতিক্রিয়ায়ও এরূপ আচরণের উদ্ভব হতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য তাঁর সমকালীন বঙ্গীয় বুদ্ধিজীবী শিক্ষিতসম্প্রদায় জর্জ এলিয়টের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন ; জীবদ্দশায় জর্জ এলিয়ট তাঁর স্বজাতীয়গণের নিকটও বিপুলভাবে সমাদৃত হন। প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য ভারতী পত্রিকার নানা প্রবন্ধে জর্জ এলিয়টের সাহিত্য সম্বন্ধে বিবিধ সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১২৯৮ সালের ভারতী ও বালকের বৈশাখ সংখ্যার 'বিবিধ প্রসঙ্গে' এলিয়টের উক্তিসহ একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। তারও পূর্বে ১২৯২ সালের ভারতী পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের এলিয়ট-সম্বন্ধীয় একটি প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এসকল তথ্য থেকে প্রমাণিত হয় ভারতী-গোষ্ঠীর মধ্যমণি স্বর্ণকুমারী এলিয়টের সম্পর্কে কতখানি উৎসুক ছিলেন। এই প্রভাবের কথা বাদ দিলে আর যে কারণের কথা সর্বাগ্রে মনে পড়ে তা হল তাঁর মানসিক প্রবণতা। পুরুষের সমকক্ষতা ও স্বীকৃতি অর্জনের জন্য তাঁকে ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করতে হয়, সেই বিপুল পরিশ্রমের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এই মনোভাবের প্রকাশ। তাঁর অধিকাংশ পাঠক ছিলেন পুরুষ, তাই তাঁদের উপযোগী শিল্পসৃষ্টির প্রয়াস এর পশ্চাতে সক্রিয় হয়েছিল হয়ত। তাছাড়া তাঁর উপন্যাসের আলোচনা-বিতর্কাদি পুরুষ-চরিত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে ; অবশ্য কাহাকে-নামক উপন্যাসে আধুনিক উচ্চশিক্ষাদর্শে দীক্ষিত মহিলাগণ কখনো কখনো এই বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এতদ্ব্যতীত যে কারণ উল্লেখযোগ্য তা হল উপন্যাসের প্রয়োজনীয়তা। যেসকল রচনায় মধ্যে সামাজিক সমস্যা পরিবেশন করা হয়েছে—যেমন স্নেহলতার মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা ও ব্রাহ্মধর্ম প্রচার, বিধবাবিবাহ আন্দোলন প্রভৃতি—সেক্ষেত্রে বিতর্ক একটি অনিবার্য প্রাসঙ্গিক ব্যাপাররূপে এসে পড়েছে। লেখিকার সমাজসচেতন মন উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি জীবনের সমস্যাসঙ্কুল বিতর্কবহুল পরিবেশের যথাযথ রূপায়ণকালে এই রীতিকে পরিহার না করে ভালই করেছে। ফলত উপন্যাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপেই এই পাণ্ডিত্য-প্রকাশনা দেখা দিয়েছিল।

১১৪ George Eliot, Silly Novels by Lady Novelists, Essays of George Eliot, edited by T. Pinney, 1963, p 310.

ছোটগল্প

১

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনূদিত 'সত্য সুন্দর মঙ্গল' পুস্তকের সমালোচনাকালে জনৈক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি জ্যোতিরিন্দ্রজীবনীর কথা উল্লেখ করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেছেন, 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাদি কিংবা অন্যান্য সদ্‌গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাহা গৃহের মহিলাগণের নিকট সাগ্রহে পাঠ করিয়া শুনাইয়া পরিবারে সাহিত্যানুরাগ সঞ্চারিত করিতেন।'[১] জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই উৎসাহ ও অধ্যবসায় অন্তঃপুরিকাগণের কেবল মানসিক উৎকর্ষ বৃদ্ধি করেনি তার প্রভাব আরও দূরপ্রসারী হয়ে উঠেছিল। আপনার জীবনী-গ্রন্থে তিনি বলেছেন, 'আমি সন্ধ্যাকালে সকলকে একত্র করিয়া ইংরাজি হইতে ভাল ভাল গল্প তর্জমা করিয়া শুনাইতাম—তাঁহারা (মহিলাগণ) সেগুলি বেশ উপভোগ করিতেন। ইহার অল্পদিন পরেই দেখা গেল যে আমার একটি কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী কতকগুলি ছোট ছোট গল্প রচনা করিয়াছেন। তিনি আমায় সেইগুলি শুনাইতেন। আমি তাঁহাকে খুব উৎসাহ দিতাম। তখনও তিনি অবিবাহিতা।'[২] স্বর্ণকুমারীর বিবাহ হয় ১৮৬৭ সালের ১১ নভেম্বর রবিবার দিবসে; অর্থাৎ প্রায় এগার বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বেই তিনি গল্প রচনায় প্রবৃত্ত হন। দ্বিতীয়ত, তাঁর সেইসময়কার রচনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের প্রভাব নানাভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। তৃতীয়ত, মনে করা যেতে পারে যে ইংরেজি থেকে বাংলায় অনূদিত বিদেশী শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পসমূহ তাঁর সম্মুখে আদর্শস্থানীয় হয়ে উঠে। কিন্তু একাদশ বর্ষীয়ার নিকট এই জাতীয় রচনাদর্শের প্রভাব কি পরিমাণে কার্যকর হয়ে উঠেছিল তা বিবেচনার বিষয়। তবে গল্প পাঠ বা শ্রবণ করে গল্প রচনায় উৎসাহিত হওয়া আদৌ অসম্ভব নয় এবং অল্পবয়সীর পক্ষে বিদেশী গল্পের এইরূপ পরোক্ষ সান্নিধ্যলাভ একান্ত নিষ্ফল নাও হতে পারে—পরবর্তী কালের গল্পগুলির কথা মনে রেখে এবংবিধ মন্তব্য প্রকাশ করা চলে।

স্বর্ণকুমারী কর্তৃক মনোনীত গল্পসমূহের মধ্যে প্রকাশকালের দিক থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ ছোটগল্প 'মালতী' ১২৮৬ সালের ভারতী পত্রিকার মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। লেখিকার প্রথম ছোটগল্প সকলন 'নবকাহিনী'র মধ্যে উক্ত গল্পটি না থাকলেও, এবং উপন্যাস-রূপে বিজ্ঞাপিত হয়ে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে মালতী প্রকাশিত হলেও রচনাটিকে ছোটগল্পের শ্রেণীভুক্ত করা যায়। পরবর্তী কালে 'মালতী ও গল্পগুচ্ছ' নামক গ্রন্থের মধ্যে কথিত

---

১ ভারতী, মাঘ ১৩১৮, পৃ ৯৯২।

২ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, পৃ ১১৯।

রচনাটি স্থান লাভ করে ; উপন্যাস অপেক্ষা গল্পের সঙ্গে মালতীর নিকট-সম্পর্ক সেখানে স্বীকৃত হয়েছে। রচনাটির আয়তন ক্ষুদ্র, তাছাড়া অন্য যেসকল কারণে মালতী ছোটগল্পের লক্ষণাক্রান্ত সেসমূহ যথাস্থানে আলোচিত হবে। তাই দ্বিতীয় কোনো নিদর্শন না পাওয়া পর্যন্ত ছোটগল্পরূপে অগ্রজের সম্মান মালতীরই প্রাপ্য। রচনাটি তাঁর বিবাহের প্রায় এক যুগ পরে প্রকাশিত। এই অন্তর্বর্তী কালের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় না, তবে একথা জোর করে বলা যায় এই সময়ের মধ্যে অর্থাৎ মালতী-প্রকাশের পূর্ববর্তী কালের স্বর্ণকুমারীর রচনায় কাহিনীপ্রীতি স্পষ্টরূপে অনুভব করা যায়। দুএকটি গাথা কবিতা এই পর্বে রচিত হয়েছিল ; তারও পূর্বে দীপনির্বাণ নামক ঐতিহাসিক উপন্যাস জন্মলাভ করেছে (১৮৭৬) ; ছিন্নমুকুল উপন্যাসটিও ১২৮৫ সালের পৌষ মাস থেকে ভারতী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। এসকল তথ্য থেকে অন্য একটি সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায় : স্বর্ণকুমারী দেবী উপন্যাস রচনার পর ছোটগল্পের প্রতি মনোযোগী হয়ে উঠেন। বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের আবির্ভাবের প্রথম পর্বের প্রায় প্রত্যেক শক্তিমান লেখকের ক্ষেত্রে এই ব্যাপার ঘটেছিল।

ভিখারিনী (ভারতী, ১২৮৪), ঘাটের কথা (ভারতী, ১২৯১), রাজপথের কথা (নবজীবন, ১২৯১), মুকুট (বালক, ১২৯২) প্রভৃতির পরবর্তী রচনা দেনাপাওনাই (হিতবাদী, ১২৯৮) রবীন্দ্রনাথের প্রথম সার্থক ছোটগল্প। অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ হিতবাদী পত্রিকায় তাঁর 'ছোট গল্প লেখার সূত্রপাত'-এর কথা স্বীকার করেছেন।[৩] সার্থক ছোটগল্প রচনার দিক থেকেও স্বর্ণকুমারী রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ। হিতবাদী প্রকাশের তারিখ হল ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮ বা ৩০মে ১৮৯১ সাল।[৪] তার পূর্বে স্বর্ণকুমারীর যেসকল ছোটগল্প প্রকাশিত হয় তার তালিকা দেওয়া হল : মালতী (ভারতী, মাঘ-ফাল্গুন ১২৮৬), বীরেন্দ্রসিংহের রত্নলাভ (সখা, ১৮৮৩), কুমার ভীমসিংহ (ভারতী ও বালক, বৈশাখ ১২৯৩), ক্ষত্রিয় রমণী (ভারতী ও বালক, মাঘ ১২৯৩), এক ভয়ঙ্কর ঘটনা (ভারতী ও বালক, ফাল্গুন ১২৯৫), ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী, অশ্ব ও তরবারি (ভারতী ও বালক, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭), সন্ন্যাসী (ভারতী ও বালক, বৈশাখ ১২৯৮)। স্পষ্টই বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের আগে লেখিকা ছোটগল্পের ধর্ম সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেন।

২

॥১॥ স্বর্ণকুমারীর প্রথম গল্পসংকলন গ্রন্থ নবকাহিনী (১৮৯২) 'স্বামিন্'-এর নামে উৎসর্গীকৃত হয়। নবকাহিনীর মধ্যে যেসকল গল্প স্থান পেয়েছে তার মধ্যে একাধিক রচনা ইতিহাসাশ্রয়ী।

৩ পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র, ২৮ ভাদ্র ১৩১৭ ; দ্র আত্মপরিচয়, ১৩৬১, পৃ ১০৩।

৪ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাময়িক-পত্র, ২য় খণ্ড, ১৩৫৯, পৃ ৬০।

আকর গ্রন্থ হিসাবে তিনি প্রধানত লেফটেনাণ্ট-কর্ণেল জেমস টড প্রণীত রাজস্থানের ইতিহাস-বিষয়ক গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছিলেন। ইতিহাসের অবলম্বনে লেখিকা প্রয়োজনমত কাহিনীর সংস্কারসাধন করেছিলেন; টড তাঁর গ্রন্থে যেসকল ঘটনার আভাস বা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন স্বর্ণকুমারীর অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষম কল্পনাশক্তি তার মধ্যে প্রকৃত সত্যের সন্ধান করেছে, ফলে ইতিহাসে অনুক্ত প্রসঙ্গ তাঁর গল্পের মধ্যে অনিবার্যভাবে এসে পড়েছে। সেগুলি কতটা বিশ্বাসযোগ্য বা ঔচিত্যানুগ তারই বিচার করা দরকার। টডের পদাঙ্ক অনুসরণ করে স্বর্ণকুমারী কেবলমাত্র রহস্যের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করেননি, সংক্ষিপ্ত সূত্রকে কোথাও বিস্তৃত করেছেন, কোথাও বিস্তৃতকে সংক্ষেপিত করেছেন প্রয়োজনমত। এইসকল পরিবর্তনসাধন বা গ্রহণ-বর্জন-সৃজন প্রভৃতি ব্যাপার সহৃদয় সামাজিকের নিকট কি পরিমাণে গ্রহণযোগ্য তার আলোচনার জন্য উভয় লেখকের রচনার তুলনাত্মক আলোচনা আবশ্যক।

নবকাহিনীর প্রথম গল্প কুমার ভীমসিংহের (ভা ও বা, বৈশাখ ১২৯৩) পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে পত্রিকায় বলা হয়েছে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস', কিন্তু গ্রন্থাবলীতে উল্লেখ করা হয়েছে 'ঐতিহাসিক নাটক'। বলাবাহুল্য শ্রেণীবিচারে উপন্যাস বা নাটক শব্দের এই শিথিল প্রয়োগ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যদিও এর মধ্যে নাট্যগুণ কিংবা উপন্যাস বা উপকথার বৈশিষ্ট্য বহুল পরিমাণে রয়েছে। সে যা হোক উভয় ক্ষেত্রেই গল্পটির ঐতিহাসভিত্তির কথা স্বীকৃত হয়েছে।

টডের রাজস্থান থেকে জানা যায়, রাণা রাজসিংহের পরলোকগমনের অব্যবহিত পরে তাঁর অন্যতম পুত্র জয়সিংহ মেবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। টডের মতে ১৬৮১ খৃস্টাব্দে মেবারের ইতিহাসে এই পরিবর্তন দেখা দেয়, কিন্তু আচার্য যদুনাথ অন্যমত পোষণ করেন।[৫] মেবারের রাজনৈতিক ইতিহাসের এই সন্ধিলগ্নে যে পারিবারিক সঙ্কট দেখা দেয় তাকেই অবলম্বন করে স্বর্ণকুমারীর গল্পটি রচিত। গল্পের প্রধান চরিত্র কুমার ভীমসিংহ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক টড উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। তাঁর অতীত জীবনকথা বর্ণনাকালে টড বলেছেন যে ঔরংজেবের সঙ্গে রাণা রাজসিংহের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ যুদ্ধে মোগল শক্তির পরাজয়ের পর Prince Bheem with the left division was not idle, but made a powerful diversion of the invasion of Guzerat,......and he was in full march to Surat, when the benevolence of the Rana, touched at

৫ টড বলেছেন, the Rana died about this period (S. 1737, A. D. 1681)...Rana Jey Sing took possession of the Gadi in S. 1737 (A. D. 1681).—Rajasthan, London 1930, pp 309-11. কিন্তু যদুনাথ বলেন, '২২ অক্টোবর ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে রাজসিংহ রোগে মারা গেলেন এবং বারো দিবস অশৌচের পর তাঁহার পুত্র জয়সিংহ মহারাণার সিংহাসনে বসিলেন।'—রাজসিংহ, সাহিত্য পরিষৎ সং, ১৩৪৭, পৃ ৮০

the woes of the fugitives, who came to demand his forbearance, caused him to recall Bheem in the midst of his career. টডের মন্তব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ভীমসিংহ ছিলেন স্বনামধন্য পিতার সুযোগ্য পুত্র এবং প্রকৃত উত্তরাধিকারী; তেজস্বিতা ও ক্ষত্রিয়সুলভ মহিমা ছিল তাঁর শিরোভূষণ। বিশেষ লক্ষণীয় হল কুমারের অসামান্য পিতৃভক্তি যার ফলে যশোবিমণ্ডিত হওয়ার মধ্য পথেই তাঁকে যুদ্ধ থেকে বিরত হতে হয়। তৃতীয়ত, তাঁর নিয়তি-বিড়ম্বিত জীবনে সাফল্যলাভের পূর্বমুহূর্তেই সমূহ সম্ভাবনা বিপর্যস্ত হয়ে যায়, সর্বাপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার হল স্নেহময় পিতার নিকট থেকেই বর্তমান ক্ষেত্রে সেই বিড়ম্বনা সঞ্জাত হয়েছে। উদ্ধৃতির শেষাংশে টডেরও দীর্ঘশ্বাস শোনা যায়। স্বর্ণকুমারীর গল্প এই কাহিনীনির্ভর না হলেও যে ঘটনাকে তিনি গ্রহণ করেছেন তার আভাস পূর্বোল্লিখিত ঘটনার মধ্যে আছে বলে এদের পরম্পরবিচ্ছিন্ন মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে জন্মমুহূর্ত থেকেই কুমার ভীমসিংহের জীবনে নেমেসিসের নিষ্ঠুর হস্তক্ষেপ দেখা দিয়েছে, তবু তিনি শেষ পর্যন্ত ট্র্যাজেডির নায়কের ন্যায় সংগ্রামপরায়ণ ছিলেন।

রাণা রাজসিংহের পুত্রদ্বয় ভীমসিংহ ও জয়সিংহের জন্মপ্রসঙ্গে ঐতিহাসিকে বলেছেন, A few hours only intervened between his (Jey Sing's) entrance into the world and that of another son called Bheem. It is customary for the father to bind round the arm of a new-born infant a root of that species of grass called amirdhob, the 'imperishable' dhob, well known for its nutritive properties and luxuriant vegetation under the most intense heat.* স্বর্ণকুমারীর গল্পে নানাভাবে এই প্রসঙ্গসমূহ পরিবেশিত। যেমন, মহিষী কমলকুমারীর অভিযোগে রাজসিংহ বলেছেন, 'ভীমসিংহ ও জয়সিংহ এত অল্প সময়ের ছোট বড় যে, সেজন্য জ্যেষ্ঠ বলিয়া ভীমসিংহ রাজ্যে দাবী করিতে পারে না। দুইজনে একই দিনে জন্মিয়াছে, একই সময়ে জন্মিয়াছে বলিলেও বেশী বলা হয় না…।' স্বর্ণকুমারী প্রসঙ্গটিকে জটিলতর করে তুলেছেন কালগত ব্যবধানকে হ্রস্বতর করে দিয়ে। বিষয়টিকে বিশ্বাসযোগ্য পরিবর্তন দান করা হয়েছে অন্যত্র। কমলকুমারীর পূর্বস্মৃতিচারণায় পাওয়া যায়, 'জ্যেষ্ঠ পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার পদে অমর কবচ বাঁধিয়া দেওয়া মিবার-রাজকুলপদ্ধতি। ইহা দ্বারা পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে তাঁহার ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করা হয়।' টড বলেছেন বাহুতে একপ্রকার তৃণের মূল বেঁধে দেওয়ার কথা, স্বর্ণকুমারীতে পায়ে অমর কবচ বাঁধার

* Rajasthan, p 312.

প্রসঙ্গ আছে। অবশ্য imperishable শব্দের সঙ্গে 'অমর' শব্দটির যে তাৎপর্যগত সম্পর্ক আছে তা বলা চলে। জন্মলগ্ন থেকেই ভীমসিংহ তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত বলে টডও স্বীকার করেছেন; ভ্রমবশত অমর কবচ জয়সিংহের পায়ে বেঁধে দেওয়া হয়। 'কমলকুমারী যখন শুনিলেন—জ্যেষ্ঠ পুত্রের পরিবর্তে অন্যায়রূপে কনিষ্ঠের পায়ে তিনি সেই কবচ বাঁধিয়াছেন, তখন তীব্র কষ্টে তাঁহার হৃদয় জলিয়া উঠিল, মাতার অশ্রুজলে সেদিন নবশিশুর প্রথম অভিষেক হইল।' টড এই সম্পর্কে বলেছেন, The Rana first attached the ligature round the arm of the youngest, apparently an oversight, though in fact from superior affection for his mother. পরিবেশনগুণে এই বিশেষত্বহীন ঘটনাটি বৈচিত্র্য ও চমৎকারিত্ব লাভ করেছে। কমলকুমারীর স্মৃতিচারণায় পাওয়া যায়, 'মহিষী সেই প্রথম বুঝিলেন, স্বামীর হৃদয়ে আর তাঁহার স্থান নাই, স্বামী তাঁহাকে ভালবাসেন না। আগে কখন মনে এরূপ সন্দেহ যে আসে নাই, তাহা নহে; কিন্তু নিমেষে তাহা চলিয়া গিয়াছে···আজ সে সন্দেহ সত্যরূপে তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল, মর্মাহত হইয়া মহিষী মুমূর্ষু হইয়া পড়িলেন।' পতিস্নেহবঞ্চিত কমলকুমারীর শেষ অবলম্বন মাতৃত্বও অবমানিত হয়েছে বলেই নারীসুলভ কোমল বৃত্তিসমূহ তাঁর চিত্ত থেকে তিরোহিত হয়েছে। কাহিনীর প্রারম্ভে মহিষীর ক্ষুব্ধ মূর্তি ও আক্রমণাত্মক মনোভাব লেখিকা সহৃদয়তার সঙ্গে অঙ্কন করেছেন। তাঁর শেষ ও প্রধান অভিযোগে প্রবীণ রাণা পর্যন্ত অপ্রস্তুত এবং বিচলিত হয়ে পড়েন।

টডের ইঙ্গিতের অনুসরণে কাহিনীবিস্তারের অন্যান্য নিদর্শনও আছে। যেমন, apparently an oversight থেকে স্বর্ণকুমারীর কথা সমর্থিত হয়, 'ইহার কিছুদিন পরে একটা গুজব শুনিলেন যে, মহারাজ জানিয়া শুনিয়া কনিষ্ঠকে কবচ পরান নাই, ভৃত্যদের কথার গোলমালে চঞ্চলকুমারীর পুত্রই অগ্রে জন্মিয়াছে বুঝিয়া ভুলক্রমে তাহাকে কবচ পরাইয়াছেন। এ কথা সত্য কি না, তাহা কিন্তু কমলকুমারী এ পর্যন্ত কখনও রাজাকে জিজ্ঞাসা করেন নাই।' টডের in fact প্রভৃতি কথার মধ্যে একটু অশোভনতা আছে, স্বর্ণকুমারীর রচনায় 'গুজব' শব্দটির দ্বারা যে বিভ্রম সৃষ্টি করা হয়েছে তা রুচিসম্মত এবং রহস্যময়তায় সাহিত্য-শিল্পোচিত; বিশেষত রাণা রাজসিংহের মত রূপমুগ্ধ প্রৌঢ়ের চারিত্রিক দৌর্বল্য এখানে সংযমের সঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে। কমলকুমারী চরিত্রের জায়া ও জননী সত্তার দ্বন্দ্বটির তুলাপাত্র যে কোন দিকে অধিক পরিমাণে নত হয়ে পড়েছে তা গল্পে সম্যকরূপে বিশ্লেষিত হয়েছে, টডের মন্তব্যের শেষাংশ থেকেই লেখিকা এর কারণ-সন্ধান পেয়েছেন।

মেবারের সিংহাসনকে কেন্দ্র করে পরবর্তী কালে গৃহযুদ্ধের যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তাকে জটিলতর করে তুলেছে সপত্নীদ্বেষ ও রূপমোহ। ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব-প্রসূত গৃহবিবাদ এবং

রূপমোহসঞ্জাত সপত্নীবিদ্বেষের ফলে মহারাণার পারিবারিক জীবনে অভিশাপ নেমে এসেছে; এই সর্বনাশা ঝড়ের আঘাতে সমগ্র পরিমণ্ডল বিক্ষুব্ধ, অস্বাভাবিক অস্থিরতায় বিচলিত। সীমিত অবকাশে লেখিকা সামান্য বর্ণহীন কাহিনীকে বিশালতা দান করেছেন। প্রথম পরিচ্ছেদের শেষাংশে রাণাকে যে ধিক্কার দিয়েছিলেন কমলকুমারী তার মধ্যেই সেই ব্যাপকতা ও বিশালতা স্পন্দিত হয়ে উঠেছে, 'মহারাজ, তোমার এই অন্যায়াচরণের ফলে যখন শত সহস্র নির্দোষ প্রজার রক্তে প্লাবিত হইয়া দেশ উৎসন্ন যাইবে, যখন ভ্রাতৃরক্তের কলঙ্কে মিবারের ভবিষ্যদ্বংশ চিরদিনের জন্য কালিমাখা হইয়া পড়িবে, তখন অন্যকে দোষী করিও না। তখন মনে থাকে যেন—তাহা তোমারি কার্যের ফল, তোমারি পাপের ফল।… সত্যের জয়ে বাধা দিতে তোমার ক্ষমতা নাই।' এই সুদূরপ্রসারী ঘটনার সম্ভাবনা রামায়ণ-প্রসঙ্গকে আশ্রয় করেছে বলে সেই বিশালতা দৃঢ়মূল হয়ে উঠেছে।

কাহিনীর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ বা অবশিষ্টাংশেও টডের অনুসরণ লক্ষিত হয়। টড বলেছেন, As the boys approached to manhood, the Rana, apprehensive that this preference might create dissention, one day drew his sword and placing it in the hand of Bheem, said, it was better to use it at once on his brother than hereafter to endanger the safety of the state.[ক] This appeal to his generosity had an instantaneous effect,[খ] and he not only ratified, "by his father's throne", the acknowledgement of the sovereign rights of his brother, but declared to remove all fears, "he was not his son if he again drank water within the pass of Dobari," [গ] and collecting his retainers, he abandoned Oodipur to court Fortune where she might be kinder.[৭]

৭ গল্পের মধ্যে এই তথ্যগুলি কিভাবে পরিবেশিত হয়েছে তার বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হল :

ক-অংশ অবলম্বনে নির্মিত রাণার উক্তি : 'তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, তোমার ন্যায্য অধিকার আমি তোমাকেই দান করিব, রাজমুকুট তোমারই মস্তকে শোভিত হইবে। কিন্তু আমি দিলেও সম্মুখে একটি প্রতিবন্ধক। যাহা অজ-সিংহের ন্যায্য প্রাপ্য নহে, আমারই দোষে সে তাহা পাইবার আশা করিতেছে, এখন হঠাৎ নিরাশ হইয়া সে অমে ছাড়িবে না—রাজ্যলোভে দেশ অরাজক করিয়া তুলিবে…লও বৎস, এই অসি তাহার বক্ষে বিদ্ধ করিয়া এস। একজনের রক্তে শত শত প্রাণীর রক্তপাত নিবৃত্তি হউক।'

খ-অংশ স্বর্ণকুমারীর গল্পে এইরূপ : 'ভীমসিংহ চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।…পিতার সে উদারতা, সে মহত্ব পুত্রের মর্মে মর্মে প্রবেশ করিল—তাঁহার পিতৃভক্তি সহস্রগুণে বাড়িয়া উঠিল।'

গ-অংশটি নায়ক ভীমসিংহের উক্তির মধ্যে সমর্পিত : 'আমা হইতে যাহাতে রাজ্যের এক বিন্দু শোণিত-পাত

টডের মন্তব্যের সংক্ষিপ্ত শেষাংশ নিয়ে লেখিকা কারুণ্যের বিস্তৃতি সৃষ্টি করেছেন, 'সেইদিনেই ভীমসিংহ স্বহস্তে জয়সিংহকে রাজমুকুট পরাইয়া দিয়া, আপনার প্রিয় সৈন্যসামন্ত দলবল লইয়া সেই যে দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, আর ফিরিয়া আসিলেন না। অনেক দিন পরে তাঁহার সঙ্গীরা অনেকে মিবারে ফিরিয়া আসিল, কিন্তু তাঁহাকে লইয়া নহে, তাঁহার মৃত্যু সংবাদ লইয়া।' এই অন্তিম স্তবকটি যেন একটি বিলম্বিত দীর্ঘশ্বাস, ঐতিহাসিক টডও এই পর্যায়ে সশ্রদ্ধ সহানুভূতি জ্ঞাপন না করে পারেননি। প্রসঙ্গত উল্লেখ-যোগ্য যে টডের গ্রন্থে এর পরেও একটি উপাখ্যানের অবতারণা করা হয়েছে, স্বর্ণকুমারী তা পরিহার করে শিল্পীসুলভ সংযম এবং অনুপাতজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিকের ধারাবাহিক কাহিনীবর্ণনা অপেক্ষা গল্পকারের খণ্ড মুহূর্তকে উজ্জ্বলতাদানের প্রয়াসই এখানে পরিলক্ষিত হয়।

জয়সিংহের জননীরূপে চঞ্চলকুমারীর নাম ব্যবহৃত হয়েছে, টড এ বিষয়ে নীরব। লেখিকা সম্ভবত বঙ্কিমপ্রভাবিত হয়ে চঞ্চলকুমারী-নামটি গ্রহণ করেছেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে রাজসিংহ উপন্যাসের (১৮৮২)[৮] প্রায় পাঁচ বৎসর পরে প্রকাশিত হয়েছে কুমার ভীমসিংহ। তাই বঙ্কিমচন্দ্র যেমন রূপনগর বা কিষণগড়ের রাজকন্যা চারুমতীকে চঞ্চলকুমারী নামে উপন্যাসে স্থান দিয়েছিলেন,[৯] লেখিকাও বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণে সেই নামটি বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করেছেন। আবার স্বর্ণকুমারীর বর্তমান রচনাটিতে বঙ্কিমপ্রভাব অনুভূত হলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে লেখিকার মৌলিকতার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে কুমার ভীমসিংহকে রাণার দ্বিতীয় পুত্ররূপে উল্লেখ করা হলেও[১০] স্বর্ণকুমারী টডের নির্দেশ অনুসরণ করে জ্যেষ্ঠ পুত্রের মর্যাদা দান করেছেন ভীমসিংহকে; আবার

না হয়, যাহাতে কণামাত্র পাপ-চিন্তাও জয়সিংহকে স্পর্শ না করে, তাহা আমার কর্তব্য, তাহাই আমি করিব। আপনি আজ আমাকে যে অধিকার দান করিলেন, আমার সেই অধিকার আমি আজ জয়সিংহকে দান করিলাম। আজ হইতে রাজ্য ন্যায়রূপে তাঁহারই হইল। এখানে থাকিলে কি জানি, যদি মোহবশতঃ কখন রাজ্যে লোভ আসিয়া পড়ে—আমি মিবার পরিত্যাগ করিয়া যাইব। আজ আপনি যে স্নেহ দিয়াছেন, যে উচ্চ শিক্ষা দিয়াছেন, সেই দুর্লভ সম্পত্তি হৃদয়ে লইয়া আমি আজই জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া যাইব,—ইহার যদি অন্যথা হয়ত আমি আপনার সন্তান নহি।'

৮ 'অংশত বঙ্গদর্শনে (১২৮৪-৮৫ সাল), পুস্তক-আকারে (১২৮৮ সাল)।'—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য়, পৃ ২২২, পা. টী.। স্বর্ণকুমারীর গল্পটি এর প্রায় পাঁচ বৎসর পরে (১২৯৩) প্রকাশিত।

৯ রাজসিংহ, সাহিত্য পরিষৎ সং, যদুনাথ সরকার লিখিত ভূমিকার 'রূপনগরের রাজকুমারী' অধ্যায় দ্র।

১০ 'দিগন্তরে রাজসিংহের দ্বিতীয় পুত্র কুমার ভীমসিংহ গুজরাট অঞ্চলে মোগলের অধিকারে প্রবেশ করিয়া সমস্ত নগর গ্রাম এমনকি মোগল সুবাদারের রাজধানীও লুঠপাট করিলেন।'—বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, পৃ ৭১৩।

বঙ্কিমচন্দ্র জয়সিংহকে চঞ্চলকুমারীর পুত্র বলে কোনো মন্তব্য করেননি, কিন্তু স্বর্ণকুমারীর আখ্যানে সেই কথাই বলা হয়েছে। কাহিনীতে এই যে অভিনব তথ্যের অবতারণা করা হয়েছে তা ইতিহাসসম্মত না হলেও বহুদূরপর্যন্ত যুক্তিসহ। সামুগড়ের যুদ্ধের সময় থেকে (২৯মে ১৬৫৮) রাজপুত-মোগল বিরোধের এই পর্যায়টির শুরু হয় এবং সেইসময় কিংবা তার অনতিপরবর্তী কাল থেকে চারুমতী বা চঞ্চলকুমারী ও রাজসিংহ-সমস্যার উদ্ভব। অধিক বয়সে রাজসিংহ কর্তৃক চঞ্চলকুমারীর পাণিগ্রহণ ও তাঁর মৃত্যুর মধ্যবর্তী কালসীমা যদি অন্তত পক্ষে বিশ বছর ধরা যায় তাহলে চঞ্চলকুমারীর সন্তানরূপে কুমার জয়সিংহের পক্ষে ১৬৮০ খৃস্টাব্দের ২২ অক্টোবরের (রাজসিংহের মৃত্যু) দ্বাদশ দিবস পরে সিংহাসন আরোহণ করা অসম্ভব নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে কালবিচারের ক্ষেত্রে ন্যূনতম সীমাটি এখানে গ্রহণ করা হয়েছে।

কমলকুমারী ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ চঞ্চলকুমারীর পারস্পরিক বিদ্বেষের প্রসঙ্গ অবতারণা করে লেখিকা অসামান্য লোকচরিত্রজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। চঞ্চলকুমারীর প্রতি রাজসিংহের অনুরাগ উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে, টড ও জয়সিংহের জননীর প্রতি প্রবীণ রাণার superior affection-এর কথা বলেছেন; এতদুভয়ের সংমিশ্রণে জয়সিংহের জননীরূপে চঞ্চলকুমারীকে গ্রহণ করা হয়েছে। রাজসিংহ উপন্যাসের বহুল প্রচারের ফলে চঞ্চলকুমারী এই ব্যক্তিনামটি অপরিচিত ছিল না; পক্ষান্তরে টড তাঁর কোনো নামোল্লেখ করেননি, কেবল বলেছেন, the haughty Rajpootni.[১১] এস্থলে লেখিকার সম্মুখে স্বাধীন নাম নির্বাচনের যে সুযোগ ছিল তার সদ্ব্যবহার করেছেন তিনি একটি বিশ্বাসযোগ্য এবং বহুপরিচিত চরিত্র-নামের অবলম্বনে। আবার যদি কোনো ইতিহাসে জয়সিংহের মাতারূপে অন্য কোনো নামের উল্লেখ থাকে, তবুও এইরূপ প্রয়াসকে দোষযুক্ত বলা চলে না। অবশ্য এইসকল পরিবর্তন যথেষ্ট যুক্তিসহ এবং বিশ্বাস্য হওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া, এইজাতীয় ছদ্ম-ঐতিহাসিক উপন্যাস বা আখ্যানের মধ্যে এসকল ব্যত্যয় তেমন গুরুতর বলেও মনে হয় না।

বর্তমান রচনার মধ্যে স্বর্ণকুমারীর নারীমনের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। স্বামী-প্রেমবঞ্চিত কমলকুমারীর চরিত্রচিত্রণ দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদন করা হয়েছে। প্রাচীন রাজপুত ইতিহাসের মধ্যে গার্হস্থ্য ও রাজনৈতিক জীবনের এই বিশিষ্ট ক্ষেত্রে যে সঙ্কটের সৃষ্টি হয় তাকে পরিস্ফুট করা হয়েছে। সপত্নী-বিদ্বেষের শোচনীয়তা, দাম্পত্যের স্বর্গভ্রষ্ট অবমানিত ও প্রবঞ্চিত রমণীর আর্তনাদ এবং ভ্রাতৃকলহের বিষবাষ্প গল্পটিকে কিন্তু একেবারে আচ্ছন্ন করতে

১১ Rajasthan, p 301.

পারেনি—আত্মত্যাগের সৌরকরস্পর্শে গল্পটির পরিমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কাহিনীর প্রথম পরিচ্ছেদে রাজসিংহ ও কমলকুমারীর ঈর্ষ্যা এবং অসৌজন্যে মিশ্রিত তীক্ষ্ণ শ্লেষাত্মক বাক্যবিনিময়ের ফলে যে উত্তপ্ত বাতাবরণের সৃষ্টি হয় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রথমাংশেও তার উপশম ঘটেনি; পিতৃস্নেহবঞ্চিত কুমার ভীমসিংহের বিরূপতা ও অসহিষ্ণুতায় পাঠকচিত্ত পীড়িত হয়। কিন্তু প্রৌঢ় রাণার স্নেহ-সম্ভাষণে ও বাৎসল্যের শীতল স্পর্শে পুঞ্জীভূত অসন্তোষের কালমেঘ বিগলিত হয়ে যায়। কৃতকর্মের জন্য, প্রথমা মহিষী ও জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রতি অবিচারের জন্য রাণার অনুতাপ ও আত্মগ্লানি ভীমসিংহের চিত্ত স্পর্শ করে। কিংকর্তব্য-বিমূঢ় রাণার এই সঙ্কটাবস্থায় যে অসহায়তা দেখা যায় তার প্রতি ভীমসিংহের মত সকল-সহৃদয়হৃদয় সমবেদনা জ্ঞাপন করে। এই নাটকীয় মুহূর্তে লেখিকা নায়ক ভীমসিংহের চিত্তভাবনার দ্রুত-পরিবর্তিত স্তরগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অঙ্কন করেছেন, 'ভীমসিংহ চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। মহারাজের মনের দারুণ অবস্থা ছবির মতন তাঁহার নিকট সুস্পষ্ট হইল; কর্তব্যের জন্য তিনি যে আপনার অধিক স্নেহের ধনকে বিসর্জন দিতেছেন, তাহা তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন; পিতার সে উদারতা, সে মহত্ব পুত্রের মর্মে মর্মে প্রবেশ করিল—তাঁহার পিতৃভক্তি সহস্রগুণে বাড়িয়া উঠিল।'

টডের গ্রন্থে চিতোরের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারকারী হামীরের পিতা অরিসিংহের বিবাহ সম্বন্ধে একটি আখ্যান আছে,[১২] তার অবলম্বনে স্বর্ণকুমারীর ক্ষত্রিয় রমণী (ভারতী ও বালক, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৩) রচিত। টডের একান্ত অনুগামী হয়ে লেখিকা প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন বহুক্ষেত্রে, নীচে তার কয়েকটির নিদর্শন দেওয়া হল :

ক. Though accustomed to feats of strength and heroism from the nervous arms of their country women, the act surprised them : রাজপুতানায় রমণীগণের সাহসের অভাব নাই—তথাপি এই গ্রাম্য নারীর সাহস দেখিয়া তাহারা অবাক হইয়া গেল।

খ. the damsel with a vessel of milk on her head, and leading in either hand a young buffalo : যুবতীর মস্তকে দুগ্ধ-কলস, দুই পার্শ্বে দুইটি মহিষ, সেই মহিষ দুইটির পৃষ্ঠে দুই হাত রাখিয়া যুবতী তাহাদের চালাইয়া লইয়া যাইতেছে।

গ. a ball of clay from a sling fractured a limb of the prince's stead : একটি ঢিল সবলে তাহার দিকে পড়িতে দেখা গেল,—আর অমনি অশ্ব

১২ Rajasthan, pp 216-17.

লাফাইয়া উঠিয়া করুণস্বরে ডাকিয়া উঠিল।··· ঢিলের আঘাতে অশ্বের উরুদেশের হাড় একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে।

অন্দয়া (Ondwa) বনে অরিসিংহের (Ursi) মৃগয়াকালীন দুরবস্থার একাধিক ঘটনা স্বর্ণকুমারী টডের অনুসরণে বর্ণনা করলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি মৌলিকতার পরিচয় দিতে পেরেছেন, প্রসঙ্গবিস্তারে এবং অভিনব উপযোগী ঘটনানির্মাণেই এই স্বকীয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। রাজকুমারের অনুচরবর্গের মধ্যে রহস্যালাপের বিস্তৃততর বর্ণনা গল্পের মধ্যে দেওয়া হয়েছে, টডের সংকেত অনুসরণ করে (comments were passing on the fair arm) লেখিকা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রথমাংশে এই প্রসঙ্গসমূহ পরিবেশন করেছেন; এমনকি 'ভুঁড়িদারজি' নামে একটি অভিনব কৌতুক-চরিত্র লেখিকার স্বকপোলকল্পিত। বাংলা সাহিত্যে রুচিসম্মত হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষুদ্র পরিসরে বর্তমান গল্প তাই একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। আরও অন্তত দুটি ক্ষেত্রে স্বর্ণকুমারীর মৌলিকতা প্রশংসনীয়। রাজকুমারের অশ্ব আহত হওয়ার পর টড বলেছেন, seeing the mischief he had occasioned, she descended to express her regret, and then returned to the pursuit. এর মধ্যে আরণ্যক রমণীর সরলতা অপেক্ষা সামাজিক ভদ্রমহিলার আচরণ স্পষ্টীভূত। কিন্তু স্বর্ণকুমারীর গল্পে এই প্রাণহীন বর্ণনা জীবন্ত হয়ে উঠেছে: 'যুবতী একটু সরল হাসি হাসিয়া, সঙ্গের আনীত ঔষধ বাহির করিয়া অশ্বের উরুদেশে লেপন করিতে লাগিল, লেপন শেষ হইলে বস্ত্র দিয়া সেই স্থান বন্ধন করিল, বন্ধনান্তে কুমারদিগকে ঔষধকৌটা প্রদান করিয়া ঔষধ ব্যবহারের নিয়মাদি বলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।' অন্দয়া অরণ্যের সীমান্তবাসী গ্রাম্য কুমারীর পক্ষে এই আচরণ আদৌ বিসদৃশ বলে মনে হয় না। এভাবে নানাবিধ আচার-আচরণের মাঝখান থেকে অরিসিংহ ও যুবতীর একাধিকবার সাক্ষাৎকার সংঘটিত হয়েছে যার ফলে তাদের পারস্পরিক অনুরক্তি ক্রমবর্ধমান হয়ে চলেছে; তাছাড়া গল্পের আরম্ভ থেকে এই রমণী এত উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত যে তার এইসকল সক্রিয়তা আপত্তিকর মনে হয় না।

কালনির্দেশের দিক থেকেও প্রমাণিত হয় লেখিকার স্বাতন্ত্র্য। টড বলেছেন যে এই বীরাঙ্গনার কার্যকলাপ যুবরাজ অরিসিংহের হৃদয়ে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং তার ফলে তিনি returned the next day to the same quarter and sent for her father ইত্যাদি। কিন্তু স্বর্ণকুমারীর রচনায় ঘটনাকাল একটি দিনের কিছু-অংশ মাত্র। কালপরিধি সংক্ষিপ্ততর হওয়ার ফলে কাহিনীর মধ্যে ছোটগল্পের তীব্রগতি অনুভূত হয়, মৃগয়ার পটভূমিকায় কাহিনীও পার্বত্য নদীর ন্যায় তীব্রগতিসম্পন্ন হয়ে পরিণামের দিকে ছুটে চলেছে।

যুবতীর চরিত্রচিত্রণই গল্পের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ; পক্ষান্তরে অরিসিংহের চরিত্র-মহিমা যদিচ

শূরোচিত মাহাত্ম্য-স্পৃষ্ট নয় তথাপি অজ্ঞাতপরিচয় বীরাঙ্গনার শৌর্যে মুগ্ধতার ফলে তিনি মধ্যযুগীয় প্রণয়কাহিনীর নায়কের মর্যাদা লাভ করেছেন। তাঁর পূর্ববর্তী যেসকল লেখক উক্ত কাহিনীর আশ্রয় গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্ত অন্যতম। রমেশচন্দ্রের রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদটির নাম 'আহেরিয়া'; তন্মধ্যবর্তী চারণদেবের দ্বিতীয় গীতটিতে অরিসিংহের মৃগয়াকথা বর্ণিত হয়েছে।[১৩] রমেশচন্দ্রের উরুসিংহ (টডে Ursi, স্বর্ণকুমারীতে অরিসিংহ) চরিত্রেও মধ্যযুগীয় শূরসুলভ গুণাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু স্বর্ণকুমারীর ঘটনা যতটা চিত্তাকর্ষক রমেশচন্দ্রের গানটি ততই সাধারণ। তাছাড়া রমেশ-চন্দ্রের রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল স্বাদেশিকতার প্রসার, নিজের রচনাবলীকে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে একদা রমেশচন্দ্র বিচার করতে চেয়েছিলেন।[১৪] স্বর্ণকুমারীর রচনার মধ্যে স্বাদেশিকতার অভাব না থাকলেও তার আত্যন্তিক প্রভাব সাহিত্য-শিল্পের মর্যাদা নষ্ট করে দেয়নি। রমেশচন্দ্রের রচনাটি নিতান্ত বৈচিত্র্যহীন ও বর্ণনাসর্বস্ব কারণ টডের ইতিহাসের প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ করা হয়েছে বর্তমান ক্ষেত্রে। অধিকন্তু স্বর্ণকুমারীর গল্পটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, রমেশচন্দ্রের রচনাটি একটি বৃহদায়তন উপন্যাসের সামান্য অংশমাত্র। অবনীন্দ্রনাথের রাজকাহিনীর মধ্যেও এই আখ্যায়িকা বর্ণিত হয়েছে,[১৫] এবং তথ্যের দিক থেকে তিনিও একান্তভাবে টডের অনুসরণকারী। অথচ সরল বর্ণনাধর্মী কথকতা অবনীন্দ্রনাথের রচনায় পাওয়া গেলেও ছোটগল্পের দিক থেকে তা দোষমুক্ত নয়; সর্বোপরি এই কাহিনী স্বতন্ত্র বা স্বয়ংনির্ভর নয়, হাম্বিরের জীবনচরিত বর্ণনার গৌরচন্দ্রিকায় লেখক অরিসিংহের বিবাহপ্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন।

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘটনাবলী অবলম্বনে রচিত অন্যান্য গল্পগুলির মধ্যে 'ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী, অশ্ব ও তরবারি' (ভা ও বা, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। টডের অনুবর্তনে রচিত গল্পটির আখ্যানও রাজস্থানের ইতিহাস থেকে সংগৃহীত।[১৬] পূর্ববর্ণিত গল্পদুটির মত বর্তমান রচনাটিও কাহিনীপ্রধান, তবে চরিত্রসমূহ এখানে তেমন বিকাশলাভ করেনি। কিন্তু সমগ্র গল্পটির মধ্যে একটি বিশেষ পরিণাম-অভিমুখিতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বলে গল্পটি বহুল পরিমাণে নাটকীয়তার লক্ষণাক্রান্ত। টডের বৈচিত্র্যহীন ক্লান্তিকর বর্ণনাকে এখানেও তিনি নাটকীয় ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে ক্রিয়াশীল করে তুলেছেন। তাই ইতিহাসে অনুক্ত থাকা সত্ত্বেও অমাত্য আসফ খাঁ, রাজসভাসদ মহম্মদ খাঁ প্রভৃতির চরিত্রচিত্র পরিবেশন করে লেখিকা

১৩ রমেশরচনাবলী, পৃ ২০৩-৫৫।

১৪ মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত, ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ; দ্র রমেশরচনাবলী, পৃ ২০২-০৩।

১৫ রাজকাহিনী, ৫ম সং, ১৩৫৯, পৃ ৯৯-১০৩।

১৬ Rajasthan, vol. II, p 371.

কাহিনীকে প্রাণচঞ্চল করে তুলেছেন। টডের সামান্য ইঙ্গিতের উপর নির্ভর করেই তিনি গল্পের প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদ রচনা করেছেন, এমনকি সংলাপবর্ণনা ও চরিত্র-বিশ্লেষণ সর্বত্র তিনি মৌলিকতার প্রমাণ দিয়েছেন। প্রিয়তম বাহন পাথারের প্রতি বুন্দিরাজ দেবসিংহের স্নেহ এবং 'অশ্ববাতুল' সম্রাট সেকেন্দর লোদীর লোলুপতার কথাই আখ্যানের মূল বস্তু। দেবসিংহের পুত্রপ্রতিম অশ্ব পাথারের জন্মকথা ও বংশ-পরিচয় টডের ইতিহাসে পাওয়া যায়, লেখিকা সেই অবান্তর প্রসঙ্গ বর্জন করেছেন বলে কাহিনী লঘুভার পক্ষীর সহজ অথচ তীব্র গতিবেগ লাভ করেছে। প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদের মধ্যে বিবৃত কাহিনী চতুর্থ বা শেষ পরিচ্ছেদের ভূমিকাস্বরূপ এবং এই অন্তিম পরিচ্ছেদে নাটকীয় লক্ষণ সর্বাধিক পরিমাণে বিকশিত।

॥২॥ ঐতিহাসিকতার আবরণে লেখিকার আর যে গল্পগুলি রচিত হয় তন্মধ্যে সন্ন্যাসিনী (ভা ও বা, বৈশাখ ১২৯২) আলোচনাসাপেক্ষ। ইতিহাসের কাহিনী আশ্রয় করে রচিত প্রণয়কথার সন্ধান বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বেও পাওয়া যায়।[১৭] কখনো কখনো মূল ইতিহাসের অবলম্বন সর্বতোভাবে ত্যাগ করে বিশুদ্ধ রোমান্সসর্বস্ব কাহিনীও লিখিত হয়েছে ; এইসকল ক্ষেত্রে স্বল্প ঐতিহাসিক উপাদানের সঙ্গে বিপুল পরিমাণ কল্পনার সংমিশ্রণ ঘটেছে। ছদ্ম-ঐতিহাসিক রচনার মধ্যে লেখকের কল্পনাশক্তির স্বেচ্ছাচার থাকলেও তাকে বিশ্বাস্য পরিমণ্ডল দান করা হয়ে থাকে ; সাধারণত এইপ্রকার আখ্যানের স্থান ও কালের নির্বাচনে ইতিহাসনির্ভর বাস্তবতা কিংবা সতর্কতা পরিলক্ষিত হয় এবং পাত্রপাত্রীর নামকরণে অথবা ঘটনা-সংস্থানে একটি বিশ্বাসযোগ্য বিভ্রমের সৃষ্টি করা হয়। সন্ন্যাসিনী সেই শ্রেণীভুক্ত রচনা যাদের মধ্যে পরিবেশিত হয়ে থাকে একটি বেদনাবিধুর রোমান্সের সর্বকালীন অথচ সর্বজনীন আবেদন, কিংবা যে কোনো শোচনীয় পরিণামী প্রণয়মূলক কিংবদন্তীর সঙ্গে গল্পটি নিবিড় আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ। ভারতীতে প্রথম প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের ভিখারিনী (শ্রাবণ-ভাদ্র ১২৮৪) গল্পটি প্রসঙ্গত মনে পড়ে। কাশ্মীরের গ্রামাঞ্চলে অমরসিংহ ও কমলদেবীর বাল্যপ্রণয়ের সৌধ বিদেশী শত্রুর আক্রমণে-বিধ্বস্ত দেশের পরিণতি লাভ করেছিল ; রাজনৈতিক ও সামাজিক কুটিলতার আবর্তে তাদের সুপবিত্র প্রেম কর্দমাক্ত হয়ে সলিল-সমাধি লাভ করে। সন্ন্যাসিনী গল্পের মধ্যেও সরলহৃদয়া রাজপুতকন্যা নলিনীর প্রবঞ্চিত প্রেম, প্রত্যাখ্যাত কুমারসিংহের আত্মবলিদান, শঠশিরোমণি অজয়সিংহের ষড়যন্ত্র প্রভৃতি উজ্জ্বল ঘটনা পরিবেশিত। কালীয়ের বিষনিঃশ্বাসে লখীন্দর-বেহুলার সম্ভাবনাময় জীবন-দীপ নির্বাপিত হয়ে যায় ; সন্ন্যাসিনী গল্পের মধ্যে চক্রান্ত প্রত্যাখ্যান আশাভঙ্গ প্রভৃতি নলিনীর প্রস্ফুটিত কৈশোরে

১৭ বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, পৃ ১১২।

বার্ধক্যের অভিশাপ বর্ষণ করেছে—'নলিনী এখন সন্ন্যাসিনী। শ্মশান তাহার বাসস্থান, কুমারের চিতাভস্ম তাহার একমাত্র উপভোগ্য দর্শনীয় বস্তু।' গল্পটির প্রারম্ভে 'বসুধালিঙ্গন-ধূসরস্তনী বিললাপ বিকীর্ণমূর্দ্ধজা' রতির জীবনাধারে 'আলুলায়িত-কুন্তলা মলিনমুখী' নলিনীকে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ এইসকল রোমান্সের আতিশয্যদুষ্ট কাঁচা লেখার জন্য এবং 'উদ্ধত অবিনয় অদ্ভুত আতিশয্য ও সাড়ম্বর কৃত্রিমতার জন্য লজ্জা' অনুভব করেছিলেন, অথচ বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় হল স্বর্ণকুমারীর মত তিনিও গল্প এবং উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর রচনাদর্শকে অস্বীকার করতে পারেননি ; কেবল ভিখারিনী গল্পটিই নয়, ভারতীর পৃষ্ঠায় ছাপার কালির কালিমায় অঙ্কিত রয়েছে তাঁর প্রথম অসম্পূর্ণ উপন্যাস 'করুণা'।[১৮] মহাকবির বাল্যলীলার 'লজ্জা'কে উজ্জ্বলতর করে তোলা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, আমাদের বিনীত বক্তব্য এই যে রোমান্সের আতিশয্যপূর্ণ আড়ম্বরদুষ্ট এই জাতীয় রচনারীতির অবলম্বনেই রবীন্দ্রনাথ গল্প ও উপন্যাসের ভূমিতে প্রথম পদার্পণ করেন এবং পরবর্তী কালে তাকে একটি শিষ্ট ও বিদগ্ধ-হৃদয়সম্মত রূপ দিয়েছিলেন। ইতিহাসাশ্রিত কিংবা ছদ্ম-ঐতিহাসিক গল্প দালিয়া (সাধনা, মাঘ ১২৯৮), রীতিমতো নভেল (সাধনা, ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৯), জয়পরাজয় (সাধনা, কার্তিক ১২৯৯), ক্ষুধিত পাষাণ (সাধনা, শ্রাবণ ১৩০২), দুরাশা (ভারতী, বৈশাখ ১৩০৫) প্রভৃতির সঙ্গে রোমান্স-আশ্রিত ভিখারিনীর আত্মীয়তা অস্বীকার করা যায় না। স্বর্ণকুমারী সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে সন্ন্যাসিনীর পর কোনো ছদ্ম-ঐতিহাসিক বা রোমান্স-নির্ভর গল্প পাওয়া যায় না বলে এই জাতীয় ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তা ও রুচির পরিণত ছবিটি তেমন স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না, তবে ছোটগল্প রচনায় যেসকল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল লেখিকাকে সেগুলি সম্পর্কে তাঁর ভাবনা পরবর্তী উপন্যাসে আশ্রয় লাভ করেছিল। প্রধানত তিনি ছিলেন ঔপন্যাসিক, তাই স্বাভাবিক কারণে ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে তাঁর মানসিক চিন্তার বিবর্তনসম্মত পরিণাম ভালভাবে লক্ষিত হয়। ইতিহাস কিংবা ইতিহাসের বিভ্রমের মধ্যে রোমান্সের লীলাক্ষেত্র রচনা করেছিলেন লেখিকা প্রথম জীবনের উপন্যাসের মধ্যে ; কিন্তু পরবর্তী রচনাবলীর মধ্যে সাধারণ জীবনের সুখদুঃখের প্রসঙ্গ প্রাধান্য লাভ করেছে। ইতিহাসের ধূসর অতীতচারণা অপেক্ষা পরিচিত প্রাত্যহিক-তাকে কল্পনার রক্তরাগে রঞ্জিত করে তোলার বাসনা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে ; উপন্যাসের মধ্যে দেখা যায় দীপনির্বাণের মধ্যে যার সূচনা ফুলের মালা হুগলীর ইমামবাড়ী প্রভৃতির মাঝখান দিয়ে স্নেহলতা বিচিত্রা স্বপ্নবাণীতে তারই উত্তরণ। ঐতিহাসিক রোমান্সের

১৮ ভারতী, আশ্বিন-পৌষ ও ফাল্গুন-চৈত্র ১২৮৪ ; বৈশাখ-ভাদ্র ১২৮৫।

ধূসর কল্পলোক থেকে সামাজিক রোমান্সের জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন লেখিকা, সন্ন্যাসিনী গল্পটির মধ্যে তারই প্রথম আভাস দেখা যায়। পূর্বেই বলা হয়েছে সন্ন্যাসিনী গল্পটি ইতিহাসভিত্তিক নয়, কেবল মেবারের রাণা ও সেনাপতি, যবন সেনাপতি মহাবুব খাঁ প্রভৃতি কয়েকটি প্রসঙ্গের সহায়তায় লেখিকা একটি ঐতিহাসিক বিভ্রমের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। স্পষ্টই বোঝা যায় লেখিকা ইতিহাসকে মৌলিক ভাবনায় রঞ্জিত করার জন্য সবিশেষ উদ্যোগী হয়ে উঠেছেন। এমনকি যেসকল গল্পের বীজ টডের ভাণ্ডার থেকে সংগৃহীত তার মধ্যেও স্বকীয়তার পরিচয় যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। সন্ন্যাসিনী গল্পটির মধ্যে সেই স্বাতন্ত্র্য সার্থকরূপে বিকশিত হয়েছে এবং স্বর্ণকুমারীর পরবর্তী উপন্যাসের গৌরচন্দ্রিকা এই গল্পটির মধ্যে পরিবেশিত বলে সন্ন্যাসিনী গল্পটির গুরুত্ব অসামান্য।

পরবর্তী গল্প প্রতিশোধ (ভারতী ও বালক, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮) থেকেও এই একই সত্য সমর্থিত হয়। গল্পটি একান্তভাবে গার্হস্থ্য জীবনকেন্দ্রিক পারিবারিক রোমান্স, ইতিহাসের সামান্যতম স্পর্শ কোথাও পাওয়া যায় না। প্রসঙ্গত বলা যায় যে এই শ্রেণীর কাল্পনিক গল্পের সঙ্গে তাঁর গাথা কাব্যের রচনাসমূহের একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে 'সাশ্রু সম্প্রদান' গাথার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা অস্বীকার করা যায় না। গাথার কবিতা এবং পারিবারিক বা ঐতিহাসিক রোমান্সের এই ঐক্য পরোক্ষভাবেও প্রমাণিত হয়। 'খড়্গপরিণয়'-শীর্ষক গাথাটির উপাদান টডের রাজস্থান নামক গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছিল বলে গাথাকাব্যেও সামাজিক এবং ঐতিহাসিক আখ্যান স্থানলাভ করেছে; তাছাড়া সন্ন্যাসিনী প্রতিশোধ প্রভৃতির মধ্যে আখ্যায়িকার গুণ ও বৈশিষ্ট্য অধিক পরিমাণে বর্তমান।

রবীন্দ্রনাথের শৈশবসংগীতের অন্তর্ভুক্ত প্রতিশোধ (ভারতী, শ্রাবণ ১২৮৫) গাথাটির সঙ্গে স্বর্ণকুমারীর একই শিরোনামবিশিষ্ট গল্পটির (ভারতী ও বালক, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮) কাহিনীগত সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। মনুষ্যত্বের কণ্ঠরোধ করে নীতির আত্যন্তিক প্রবৃদ্ধি বড়ই আপত্তিকর, তার ফলে আমাদের জীবনের স্বাভাবিকতা সরলতা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোরের কোমল মনের উপর গুরুভার প্রতিজ্ঞার চাপ এবং তার প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন উভয় লেখকেরই উদ্দেশ্য। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ-গ্রহণেচ্ছু পুত্র এবং অন্যান্য কয়েকটি চরিত্রের ভয়াবহ এবং শোচনীয় পরিণতি-চিত্রণ উভয় রচনার বিষয় হলেও স্বর্ণকুমারীর কবিতায় ঘটনাসংস্থানে কিংবা চরিত্রসৃষ্টিতে মৌলিকতার প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে। ভারতীতে প্রকাশকালে রবীন্দ্রনাথের গাথাটি মোট তিনটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত হয়, কিন্তু অচলিত সংগ্রহ রচনাবলীর মধ্যে ঐ পরিচ্ছেদভাগ বিলুপ্ত। স্বর্ণকুমারীর গল্পটিও তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। স্বর্ণকুমারীর রচনায় দেখা যায় প্রথম দুটি পরিচ্ছেদের স্তিমিত গতি অন্তিম পর্যায়ে নাট্যিক তীব্রতা লাভ করেছে; দ্রুত-ঘটমান কার্যাবলী, পরিণতির বৈচিত্র্যময়

জটিলতা ও শোচনীয়তার মধ্যে ছোটগল্পের আকস্মিকতা দীপ্তি লাভ করেছে; সমগ্র গল্পের শীর্ষ বিন্দুও এই অন্তিম পরিচ্ছেদের মধ্যে আছে বলে গল্পটির নাটকীয় আকস্মিক উপসংহৃতি পাঠকচিত্তে গভীর অভিভব সৃষ্টি করে। স্বর্ণকুমারীর গল্পের মধ্যে চরিত্র-সংখ্যাও বৃদ্ধিলাভ করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে রবীন্দ্রনাথের ঘটনাগত জটিলতা অপেক্ষাকৃত কম, তবে উভয়েরই রচনায় হ্যামলেট নাটকের পরোক্ষ প্রভাব আছে বলে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় দেখা যায় নায়কের বিবাহসভায় নিহত 'জনকের উপছায়া'র আবির্ভাব এবং পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য নির্দেশদান। স্বর্ণকুমারীর নায়ক কালীপ্রসাদ একাধিকবার স্বপ্নাদেশের সঙ্গে অশরীরী প্রেতের নির্দেশ লাভ করেছে। ফলে মনুষ্যত্ব ও ন্যায়নীতির দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে কালীপ্রসাদের চিত্ত; এই অন্তর্দ্বন্দ্বের গভীর অরণ্যে দিগভ্রান্ত নায়কের অসহায়তা লেখিকা সুন্দর সহানুভূতির সঙ্গে অঙ্কন করেছেন। শুভ-পরিণামী সমাধানের সন্ধান না পেয়ে যুবক কালীপ্রসাদ "বিদ্যুদ্‌বেগে মন্দিরে কালীর সম্মুখীন হইয়া তাঁহার হস্তের শাণিত কৃপাণ সজোরে খুলিয়া লইয়া তাঁহাকে ছিন্নমস্তা করিয়া বলিল, 'পাষাণি রক্তপিপাসি, আজ হইতে পৃথিবীর প্রতিশোধ-স্পৃহা, তাহার রক্তপিপাসা নিবৃত্ত হউক।' তাহার পর শাণিত কৃপাণ আমূল নিজবক্ষে সঞ্চালিত করিয়া বালক দেবীপদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। আত্মরক্তে তাহার প্রতিশোধ-বাসনা চরিতার্থ—নির্বাপিত হইল।" উদ্ধৃতাংশের 'প্রতিশোধ-স্পৃহা, তাহার রক্তপিপাসা' এবং 'চরিতার্থ—নির্বাপিত' প্রভৃতি বাক্যাংশের সাহায্যে বিশেষ বিশেষ ভাবনার উপর জোর (emphasis) দেওয়া হয়েছে, প্রায়-সমার্থক অংশের পুনরুক্তির মাধ্যমে ঘনীভূত পরিণামের সুতীব্র শোচনীয়তা আভাসিত হয়ে উঠেছে।

৷৩৷ যেসকল গল্পের মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রভাব কিংবা অপর রচনার সাদৃশ্য বহুল পরিমাণে লক্ষিত হয় সেইসকল ক্ষেত্রে স্বর্ণকুমারীর রচনাবৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যায়। লেখিকা ঐতিহাসিক গল্প রচনায় প্রধানত টডের বিখ্যাত ইতিহাস থেকে উপযোগী উপাদান সংগ্রহ করেছেন, প্রয়োজনবোধে কোনো কোনো স্থানে টডের আক্ষরিক অনুবাদ পর্যন্তও করেছেন; কিন্তু মৌলিকতারও অভাব নেই। বিশেষত কুমার ভীমসিংহের মধ্যে কি কাহিনীবয়নে কি চরিত্রচিত্রণে—অন্তর্দ্বন্দ্বময় ঘটনাবিস্তারে ও ঘটনাবিকারে তাঁর প্রশংসনীয় স্বকীয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক উপন্যাস বা গল্পে ঘটনাবিকারের দ্বারা লেখক অন্ধকার যুগের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে থাকেন। বিশেষত চঞ্চলকুমারীর উপস্থাপনায় কিংবা কমলকুমারীর আবেদনের মধ্য দিয়ে লেখিকা নিপুণভাবে যে বিশ্বাস্য পরিমণ্ডল রচনা করেছেন তা টডের কোনো স্থূল-সূক্ষ্ম সংকেতের অপেক্ষা রাখেনি। ছদ্ম-ঐতিহাসিক গল্পের মধ্যেই এই জাতীয় দক্ষতার অবকাশ সমধিক এবং স্বর্ণকুমারীর রচনা থেকেও তা প্রমাণিত হতে পারে।

ইতিহাসগ্রন্থ কিংবা আকরপুস্তক-নিরপেক্ষ গল্প রচনার ক্ষেত্রে লেখকের মৌলিকতা ও স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ থাকে ; রবীন্দ্রনাথের কবিতার কাহিনী অবলম্বনে রচিত প্রতিশোধ-শীর্ষক গল্পটি যে স্বর্ণকুমারীর স্বীয় ভাবনানুরঞ্জিত, উভয় রচনা পাঠকালে তা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়। একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে তাঁর গল্পের পরিমাণ খুবই কম, তাই গল্পের মধ্যে উপরিলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের বিবর্তন ও পরিণতি তেমন লক্ষিত হয় না। তবে গল্প পরিমাণে স্বল্প হলেও তাদের মধ্যে যেসকল বৈশিষ্ট্যের আভাস পাওয়া যায় তা বিশেষভাবে উপন্যাসের মধ্যে অনুশীলিত হয়েছে। তিনি ছিলেন প্রধানত ঔপন্যাসিক, সেহেতু তাঁকে গল্প-সম্বন্ধীয় যেসকল চিন্তা ও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল সেগুলি সম্পর্কে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন পরবর্তী কালের উপন্যাসের মধ্যে তারই প্রতিফলন ঘটেছে। আরও লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে লেখিকার মন ক্রমশ বস্তুনিষ্ঠ রচনার প্রতি, অতীত থেকে বর্তমানের প্রতি আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছে।

৩

।১। স্বর্ণকুমারীর মৌলিক গল্পসমূহ পাঠকালে দেখা যায় যে তিনি স্বাভাবিক কারণে সামাজিক ও পরিচিত জীবন থেকে প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করেছেন। বিশেষত ঘটনাগত মৌলিকতা প্রদর্শনকালে পরিচিত বর্তমানের উপর নির্ভর করে থাকেন সামাজিক ও সহৃদয় লেখকগণ, স্বর্ণকুমারীর ক্ষেত্রে সেই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় না। অবশ্য তাঁর কোনো কোনো ছদ্ম-ঐতিহাসিক রচনার ঘটনা মৌলিক হতে পারে, কিন্তু স্থান-কাল-পাত্র মনোনয়নে লেখককে সেক্ষেত্রে এমন একটি বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাসাশ্রিত বিভ্রমের সৃষ্টি করতে হয়েছিল যার ফলে বর্তমান কিছুটা উপেক্ষিত হয়েছে।

নবকাহিনীর যমুনার (ভারতী ও বালক, মাঘ ১২৯৩) পরিচয়-লিপি থেকে জানা যায় যে গল্পের কাহিনী 'সত্য ঘটনা হইতে গৃহীত'। প্রকাশকালের দিক থেকে বিচার করলে পূর্ববর্তী গল্পগুলির মধ্যে লেখিকার মানসিক বিবর্তনের ইতিহাসটি ধরা পড়ে। কুমার ভীমসিংহ 'ঐতিহাসিক নাটক', ক্ষত্রিয় রমণী 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' ; এদের মধ্যে ইতিহাস-নির্ভরতা বড়ই স্পষ্ট। পরবর্তী রচনা সন্ন্যাসিনীতে ইতিহাসের বিভ্রম বা ছদ্ম-ঐতিহাসিকতা বর্তমান ; অনুজ রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট গাথা কবিতার অনুসরণে রচিত প্রতিশোধ গল্পটির পাত্র-পাত্রী-ঘটনা-স্থান একান্তভাবে ইতিহাসনিরপেক্ষ। বস্তুত এই গল্পটিই মানসিক প্রবণতা-পরিবর্তনের সন্ধিক্ষেত্র, কারণ পরবর্তী গল্প যমুনা 'সত্য ঘটনা হইতে গৃহীত' এবং বর্তমান কাহিনীর পশ্চাতে পূর্বসূরীর কোনো প্রভাব নেই। এই প্রথম তিনি গল্পের ঘটনানির্বাচনের ক্ষেত্রে

মৌলিক ও বলিষ্ঠ মনোভাবের পরিচয় দিলেন ; লেখিকা এখানেই আত্মনির্ভর এবং স্বয়ং-প্রকাশ।[১৯] আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে কুমার ভীমসিংহের মধ্যে যে অতীত-চারণার সূত্রপাত তা-ই বর্তমানে উপনীত হয়েছে প্রতিশোধ গল্পের মাধ্যমে ; এবং যমুনা থেকে লেখিকার অভিনব আত্ম-আবিষ্কার বলিষ্ঠ প্রত্যয় অর্জন করেছে। অতীত থেকে বর্তমানের অভিমুখে তাঁর মানস সঞ্চরণের এই ইতিহাস বিচারিত হয়েছে প্রধানত গল্পগুলির আশ্রয়ে, তবে এই সূত্র তাঁর অন্যান্য রচনা সম্পর্কেও প্রযুক্ত হতে পারে। বিশেষত উপন্যাসের ক্ষেত্রে অতীত থেকে বর্তমানের মধ্যে আত্মপ্রকাশের উক্ত ধারাবাহিকতাটি সুন্দরভাবে অনুভূত হয়। প্রসঙ্গত বলা যায় যে বর্তমানের প্রতি আকর্ষণ তাঁর প্রথমাবধি ছিল, কালক্রমে সেটি স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। কুমার ভীমসিংহ বা ক্ষত্রিয় রমণীর ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলেও বাস্তব জীবনাকৃতি সমর্পিত হয়েছে—মনের এই প্রবণতা শেষ জীবনের রচনাবলীতে চমৎকারিত্ব লাভ করেছে। আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হল এই বস্তুনিষ্ঠতা ও বস্তুতন্ত্রতা উগ্ররূপে তাঁর সাহিত্যে কখনও দেখা দেয়নি। ছোটগল্পের প্রথম পর্যায়ে ঐতিহাসিক রোমান্সের জগতে যেমন বাস্তবতা ও প্রাত্যহিক জীবনপ্রীতি আভাসিত তেমনি শেষ জীবনের সামাজিক উপন্যাস বা ছোটগল্পের মধ্যেও রোমান্সের উপস্থিতি অনস্বীকার্য। তাই এইপ্রকার মিশ্র বাস্তবতাকে রোমান্স ও বস্তুতন্ত্রের চক্রাবর্তন বলা বোধ করি অধিকতর সঙ্গত ; অর্থাৎ প্রথম পর্যায়ের রচনায় কল্পনাতিশয্য এবং রোমান্সের আধিক্য সত্ত্বেও বাস্তবতার মৃদু উত্তাপ অনুভবনীয়, ক্রমশ এই বাস্তবতা-প্রীতি প্রাধান্য লাভ করেছে এবং পরিণামে বস্তুতন্ত্রের পরিমণ্ডলকে পুনরায় পুষ্টতর করে তুলেছে রোমান্সের প্রবণতা। অনালোচিত গল্পগুলিতে এইসকল সিদ্ধান্তের আনুকূল্য পাওয়া যাবে।

॥২॥ ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত মালতী (মাঘ-ফাল্গুন ১২৮৬) নবকাহিনী গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়নি এবং স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে একসময় প্রকাশিত হয়েছিল।[২০] তাই অনেকে মনে করে থাকেন মালতী উপন্যাসের শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু "ইহা ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে 'মালতী ও গল্পগুচ্ছ' নামে পুনঃপ্রকাশিত হয় ; ইহাতে 'মালতী' ছাড়া জীবন অভিনয়, পেনে প্রীতি, মিউটিনি ও অমরগুচ্ছ— এই গল্পগুলিও স্থান পাইয়াছে।"[২০] এই তথ্য অবলম্বন করে বলা যায়, মালতী উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত হলেও পরবর্তী কালে লেখিকা সম্ভবত তাকে গল্পরূপে স্বীকার করতে চেয়েছিলেন তা না হলে গল্প-সংকলন গ্রন্থের মধ্যে রচনাটিকে স্থান দেওয়ার

১৯ একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে মানসিকতার এই পরিবর্তন-ক্রমটি তুলে ধরা যায়, তা এইরূপ : অতীত কথা বা ইতিহাস > ছদ্ম-ইতিহাস > 'অধুনা' বা বর্তমানের পরিচিত জীবন ও সমাজ।

২০ প্রকাশকাল : ১২৮৬ সাল, ২৫ মার্চ ১৮৮০, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৪৪। দ্র সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, ২৮শ, পৃ ১৩।

অন্য কোনো তাৎপর্য ও যৌক্তিকতা থাকে না। প্রকৃতপক্ষে 'মালতী উপন্যাস নয়, বড় গল্প।'[২১] এর আরম্ভ থেকেই উপন্যাসোচিত বিলম্বিত লয় স্পষ্টীভূত। তাছাড়া প্রকৃতিকে পটভূমিকারূপে ব্যবহারকালে পরিবেশের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা, মনোবিশ্লেষণের প্রতি ঐকান্তিক আগ্রহ, সুদীর্ঘ স্বগত-চিন্তন, সর্বোপরি ঘটনাবৈচিত্র্য সৃজনে কালগত পরিধির বৃহত্ত্ব স্বীকার কাহিনীকে উপন্যাসের মর্যাদা দিয়েছে ; সেদিক থেকে রচনাটিকে উপন্যাসের খসড়া হিসাবেও ধরা যায়। রমেশ ও মালতীর রহস্যময় আত্মীয়তাকে কেন্দ্র করে শোভনার পত্নীসুলভ ঈর্ষ্যার গতিপ্রকৃতি নির্ণয়ে লেখিকার অত্যাগ্রহ ধরা পড়েছে ; তাই আংশিকতার লক্ষণাক্রান্ত ও উপন্যাসের খসড়াজাতীয় দুইবোন-মালঞ্চ (১৯৩৩-৩৪) প্রভৃতির সঙ্গে মালতীর সমগোত্রীয়তা আমাদের সিদ্ধান্তের সমর্থন করে। উপন্যাস ও গল্পের স্বাতন্ত্র্য বিচারে তাদের দৈহিক দৈর্ঘ্য একটি মস্তবড় ব্যাপার এবং সেদিক থেকে মালতীকে উপন্যাস বলা চলে না। বরং দেখা যায় কাহিনীটি শেষ মুহূর্তের পরিণামের দিকে দ্রুতগতিতে ধাবমান। মালতীর এই শোচনীয় পরিণতির জন্য রমেশ ও শোভনার উদ্বেগ চরম শীর্ষে উত্থিত হয়েছে—সমগ্র গল্পটি এই 'নাটকোচিত ক্লাইমেক্স'-এর প্রতি রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে আছে। ছোটগল্প হিসাবে সেখানেই মালতীর সার্থকতা।

গল্পটি সম্বন্ধে একদা বলা হয়েছিল, It is a sweet short story simply told. It is gratifying to see that the talented authoress does not allow her powers to remain idle.[২২] সরল বর্ণনাভঙ্গি স্বর্ণকুমারীর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য সত্য, কিন্তু শোভনার মনোবিশ্লেষণে কিংবা মালতীর স্ত্রীসুলভ আত্মোপলব্ধির বর্ণনায় অথবা অসহায় রমেশের চরিত্রচিত্রণে লেখিকা যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তা যে কোনও জটিল মনস্তত্ত্ববিদ ঔপন্যাসিকের ঈর্ষ্যার বিষয়। মালতী সম্বন্ধে লেখিকা বলেছেন, 'বিংশতিবর্ষীয়া হইলেও মালতী বালিকা, হৃদয়ের সরলতায় সে বালিকা, মনের নবীনতায় সে বালিকা। কিন্তু বালিকা হইলেও মালতী স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকে দুঃখের দুঃখী, ব্যথার ব্যথী না হইয়া থাকিতেই পারে না—আর কিছু বুঝুক না বুঝুক, পরের ব্যথা বুঝিবার সময় স্ত্রীলোকে আর ছেলেমানুষ থাকে না, অন্য সকল বিষয়ে বালিকা থাকিলেও শত বর্ষের বৃদ্ধও তাহার মত হৃদয়ের সহিত অন্য হৃদয়ের কষ্ট বুঝিতে সক্ষম নহে।' স্বর্ণকুমারীর রমণী-হৃদয় উল্লসিত হয়ে উঠেছে মালতীর চরিত্রচিত্রণে। কেবলমাত্র রমণীরূপে তিনি স্ত্রীলোকের চরিত্রবিশ্লেষণই করেননি, মনস্তত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবশত 'মনের নিউটন'-রূপেও তিনি আপনার অজ্ঞাতসারে বর্তমান গল্পের ক্ষেত্রে বিচরণ করেছেন-স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে। তাঁর একটি আক্ষেপোক্তি উল্লেখের

২১ বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, পৃ ১৩০-৩১।

২২ পৃথিবী (১২৮৯) গ্রন্থের পরিশিষ্ট।

অপেক্ষা রাখে : 'কিসে যে হৃদয়ের কি হয়—কি প্রাকৃতিক নিয়মে যে তাহা চলিতেছে, তাহা নির্ণয় করা বড় সহজ নহে। নিউটন গেলিলিও অনেক ভাবিয়া বাহিক জগতের নিয়ম বাহির করিয়াছেন, কিন্তু মনের নিউটন এখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই। আর কবেই বা জন্মাইবে কে জানে।' সাহিত্য-পাঠক মাত্রেই জানেন স্বর্ণকুমারীর এই আক্ষেপমিশ্রিত প্রচ্ছন্ন আকাঙ্ক্ষা দীর্ঘকাল অপূর্ণ থাকেনি, এমনকি তিনি নিজেই সে দায়িত্ব বহুল পরিমাণে পালন করেছেন।

পূর্বে-উল্লিখিত যমুনা-গল্পটি হৃদয়বিশ্লেষণ-জাতীয় রচনার অন্তর্ভুক্ত; তাছাড়া ১২৯৮ সালের ভারতী ও বালক পত্রিকায় প্রকাশিত 'কেন', 'আমার জীবন' প্রভৃতি গল্পও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই গল্পগুলির একটি সাধারণ ধর্ম লক্ষ করা যায় যে সকল ক্ষেত্রেই গল্পগুলি উত্তম পুরুষের বিবৃতিতে রচিত; ফলে নায়ক-নায়িকাগণ আপনাদের হৃদয়-বাসনার গতিপ্রকৃতি ও মানসিক ভাবনার যৌক্তিক পারম্পর্যসমূহ স্থূল-সূক্ষ্মভাবে বিচার-বিশ্লেষণে তৎপর হয়ে উঠেছেন, তাই পাত্রপাত্রীর আত্মবিবরণের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের রীতিও সহজ স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই শ্রেণীর গল্পগুলি সাধারণত দাম্পত্য ও গার্হস্থ্যের পটভূমিকায় রচিত বলে নারীসুলভ সুগভীর অভিজ্ঞতাও এখানে স্বাভাবিকভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। যমুনার জীবনের ভয়াবহ পরিণাম অথবা 'লজ্জাবতী' বধূর অপমৃত্যুর কাহিনী আমাদেরই প্রাত্যহিক ও পরিচিত জীবন এবং অভিজ্ঞতা থেকে সংগৃহীত হয়েছে বলে গল্পগুলি এতই মর্মস্পর্শী। 'আমার জীবন' রচনাটির স্থানগত ঐক্য না থাকলেও কিংবা 'কেন' গল্পটির মধ্যে অতিপ্রাকৃতের বিভ্রম থাকা সত্ত্বেও রচনাগুলির মূল বাঙালি সমাজের হৃদয়ের গভীর স্তর পর্যন্ত প্রসারিত। যমুনা-শীর্ষক গল্পের তৃতীয় পরিচ্ছেদের প্রথম বাক্য 'আমি শ্বশুর বাড়ী যাইব'; এর সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের ইন্দিরা উপন্যাসের প্রারম্ভিক পরিচ্ছেদের শিরোনামের সাদৃশ্য আছে। এই সংক্ষিপ্ত সূত্র থেকেই বলা যায় রচনাটি কি দৃঢ়ভাবে আমাদের সমাজজীবনের উপর সমাশ্রিত। অবহেলিত বনফুলের মত অন্তঃপুরের অবজ্ঞাত 'লজ্জাবতী' বধূর জীবনী অবলম্বনে রচিত গল্পটি (ভা ও বা, ১২৯৮) একটি প্রবাল খণ্ডের মত বেদনায় রক্তিমাভ হয়েও স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল। ঐ বৎসরের ভারতী ও বালকের মাঘ সংখ্যার শেষে 'নবকাহিনী বা ছোট ছোট গল্প' নামক গ্রন্থের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে; তার মধ্যে বলা হয়েছে, 'লজ্জাবতী গল্পটি মহিলা-শিল্পমেলায় নাট্যাকারে অভিনীত হয়।' গল্পের কাহিনী যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল বিজ্ঞাপনের ভাষা থেকে তা অনুমিত হয়। গল্পটির প্রারম্ভে একটি সংকেত প্রদত্ত, 'শুনিতে পাই তাহার আসল নাম লজ্জাবতী নহে। সে ছোটবেলায় নাকি বড় অভিমানী ছিল, কোন দোষ করিলে পিতামাতা যদি তাহাকে তিরস্কার করিতেন অমনি সে লজ্জাবতী লতাটির মত সংকুচিত হইয়া জড়সড় হইয়া পড়িত। তাহার ছোট্ট গৌরবর্ণ মুখখানি লজ্জায় লাল হইয়া

উঠিত, তাহার ডাগর ডাগর হাসি হাসি চোখদুটি জলে ভরিয়া যাইত, হৃদয়ের ভাব লুকাইবার চেষ্টা করিয়া অশ্রুজলে ও ম্লান হাসিতে সে এক অপূর্ব শ্রী ধারণ করিত, তাই তাহার বাপ-মা তাহাকে আদর করিয়া ডাকিতেন লজ্জাবতী।' এইদিক থেকে তার সঙ্গে ছিন্নমুকুল উপন্যাসের কনক ও পালিতা উপন্যাসের স্নেহলতা চরিত্রের সাদৃশ্য আছে। বর্তমান গল্পে নায়িকার মানবীসুলভ মনোভাবের সঙ্গে লজ্জাবতী লতার প্রখর সাধর্ম্য হেতু ব্যক্তিনাম উদ্ভিদনামের অন্তরালে আত্মগোপন করেছে। লজ্জাবতী লতার অপূর্ব আত্মসংকোচন, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভবশক্তি ও স্পর্শকাতরতা নায়িকার প্রতিটি অনুভাবের মধ্যে প্রকাশিত; বালিকা যুবতী বধূ গৃহিণী—নারীজীবনের বিচিত্র স্তরে তার এই অসহায়তা প্রকটিত, এমনকি আপন দুহিতার নিকটেও সে ব্রীড়াকুণ্ঠিত। লজ্জাবতী লতায় সে যেন একটি সার্থক উপমান। তাই তার জীবনের শোচনীয় পরিণাম পাঠকের সহৃদয়তা উদ্বেল করে দেয়। কোনো আহত মূক প্রাণীর আর্তনাদের মতন তার জীবন—গল্পটির মধ্যে সেই আশ্চর্য নির্মমতা আপনার নখদন্ত বিস্তার করেছে।

এই জাতীয় গল্পের অপর নিদর্শন হিসাবে 'নূতন বালা বা গহনা'র (ভা ও বা, অগ্রহায়ণ ১২৯৮) নাম উল্লেখ করা যায়। ভারতীতে প্রকাশকালে গল্পটির নাম ছিল 'গহনা', এমনকি নবকাহিনী গ্রন্থের মধ্যেও ঐ শিরোনাম আছে; অথচ গ্রন্থাবলীতে নাম দেওয়া হয়েছে 'নূতন বালা' এবং গল্পটির ইংরেজি অনুবাদে এই অভিধা ভাষান্তরিত হয়েছে। এই নাম পরিবর্তন প্রসঙ্গে বোঝা যায় তিনি সাধারণ অপেক্ষা বিশেষের (particular) দিকে অধিকতর মনোযোগী হয়েছেন, গল্পের ঝোঁকটিও এই বিশেষের দিকে নত। দরিদ্র কেরানী-পিতার স্তম্ভিত শূন্যময় দৃষ্টি এবং বিলাত-প্রত্যাগত সিভিলিয়ান পুত্রের অবাক্ত অন্তর্জ্বালার উপমানসুলভ পটভূমি হল শোকনিস্তব্ধ আনন্দগৃহ, এই পরিমণ্ডলে সর্বংসহা জননীর সহাস্য আবির্ভাব পুঞ্জীভূত মেঘান্ধকারকে স্পষ্টতর করে দিয়েছে মাত্র; অসংস্কৃতা বালিকাবধূর ক্ষুব্ধ হৃদয় এবং পরাভবের বেদনাকে নূতন বালা কোনো সান্ত্বনা দান করতে পারেনি। সকলের অজ্ঞাতসারে অপমানিত বালিকার আত্মগোপনে শুভময় পরিণামের সম্ভাবনাও তিরোহিত হয়েছে—নিয়তির নির্মম অনুশাসনের স্পর্শ লাভ করায় গল্পটির আবেদন বিশাল ও বিস্তৃত হয়ে উঠেছে। নূতন বালা গল্পটির মধ্যে এমন একটি অপ্রত্যাশিত আঘাত-জনিত তীব্র আকস্মিকতা প্রস্ফুটিত যা এক শ্রেণীর সার্থক ছোটগল্পের শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য। আমার জীবন (ভা ও বা, ভাদ্র ১২৯৮) গল্পটির শেষেও এমন একটি রহস্য উদ্ঘাটিত হয়েছে যা বিশ্বাসযোগ্য হলেও অপ্রত্যাশিত বলে ছোটগল্পোচিত আকস্মিক পরিসমাপ্তির লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কেউ কেউ গল্পটির সঙ্গে আলেকজাণ্ডার পুশকিনের The Snow Storm-এর কাহিনীগত সুদূর-সাদৃশ্য নিরীক্ষণ করেছেন।[২৩]

---

২৩ শিশিরকুমার দাশ, বাংলা ছোটগল্প, ১৯৬৩, পৃ ৭৫।

আকস্মিক পরিসমাপ্তির দিক থেকে 'চাবী চুরি' ও 'রক্তপিপাসু' গল্পের কথাও উল্লেখ করা যায়। প্রথম গল্পটির মধ্যে স্বদেশী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিত রচনা করা হয়েছে, দেশোদ্ধারের উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসবাদীর ডাকাতি এবং শান্তিবাদীর শিল্পস্কুল স্থাপন প্রভৃতি উপায়-বৈচিত্র্যের আলোচনা আছে। সন্ত্রাসসৃষ্টির মিথ্যা অভিযোগে ধৃত সুকুমারের অনুপস্থিতিতে তার বাগদত্তাকে বিয়ে করল যে তার নামও সুকুমার এবং সে নায়কেরই বন্ধু। গল্পটি অধিকতর তীক্ষ্ণতা লাভ করেছে বিবাহের সম্প্রদানপ্রসঙ্গ বর্ণনায়। তখন নায়ক ফিরে এসেছে। বিশ্ববিধানের নিষ্ঠুর পরিহাস কঙ্কালের হাসির মত চতুর্দিকে ভয়াল স্তব্ধতা ছড়িয়ে দিয়েছে। গল্পটির শেষ অধ্যায়টি ক্ষুদ্র কিন্তু বৈশিষ্ট্যহীন নয়। 'বৈশাখ মাস, শুক্লপক্ষ, আকাশে পূর্ণচন্দ্র ভাসিয়া চলিয়াছে, নীলাম্বরে মেঘকণা নাই, দিগ্‌বিদিক শুভ্র জ্যোৎস্নায় প্লাবিত; দিগন্ত বেলায় আঘাত করিয়া দক্ষিণানিল সুখতরঙ্গে ছুটিয়া চলিয়াছে, কোকিল পাপিয়া দ্যুলোক ভূলোক মাতাইয়া কুহু-কুহু পিউ-পিউ তান তুলিয়াছে। বনগ্রামের দুঃখের কথা এখানে যেন আর কাহারও মনে নাই, তাহার অন্তরে বাহিরে দীপ্তি মধুরতা শতধারায় আজি উচ্ছ্বসিত। এই আনন্দ পূর্ণিমায় শুভক্ষণে শুভলগ্নে বর সভায় আসিয়া বসিল। এও সুকুমার—কেবল সে দুর্ভাগ্য নহে। হায়! ক্ষণ কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না, যে তাহাকে ধরিতে পারে সেই সৌভাগ্যবান— যে পারে না সে হতভাগ্য, সকলেরই অবজ্ঞাভাজন, তাহার দুঃখ অধিকক্ষণ কাহারও মনে স্থান পায় না।' নিরাসক্ত নিসর্গ ও নির্মোহ কালপ্রবাহের নির্মমতা গল্পটির পরিণামে বিশাল অভিভবের যবনিকা টেনে দিয়েছে।

কিন্তু এর পরিসমাপ্তির মধ্যে কশাঘাতে স্তব্ধ করে দেওয়ার প্রয়াস নেই; সেই চাবুক-হাঁকড়ানো সমাপ্তি (whip-crack ending) স্পষ্টভাবে লক্ষিত হয় 'ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী, অশ্ব ও তরবারি', 'প্রতিশোধ', 'আমার জীবন', 'নূতন বালা' প্রভৃতি গল্পের মধ্যে। কাহিনী আকস্মিক সমাপ্তি লাভ করেছে বলে নূতন বালায় অপমানিতের আর্তনাদ হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে, তাই বেদনা বরফের সমুদ্রে পরিণত। কিন্তু 'চাবী চুরি' গল্পের মধ্যে বেদনা ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করেছে; 'কেন', 'লজ্জাবতী', 'পেনে প্রীতি' প্রভৃতি গল্পের ক্ষেত্রেও এইরূপ রীতি অনুসৃত। এসকল গল্পের মধ্যেও একটিমাত্র মহামুহূর্ত বা চরম ক্ষণ আছে কিন্তু সেই উত্তুঙ্গ শীর্ষে আরোহণের গতি ধীর-স্বাভাবিক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সান্নিধ্যবশত গল্পসম্রাট মপাসাঁর রচনার সঙ্গে সম্ভবত স্বর্ণকুমারীর পরিচয় ঘটে এবং তার ফলে whip-crack ending-জাতীয় রচনারীতি হয়ত তাঁকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু স্বর্ণকুমারী ছিলেন প্রধানত ঔপন্যাসিক, তাই ধীর-বিকশিত রচনারীতির প্রতি আসক্তি থাকা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক; তবে তিনি ক্রমশ বুঝতে পারছিলেন বৃত্তান্ত বা উপাখ্যান ছোটগল্প নয়। প্রথম জীবনের রচনাগুলির মধ্যে বৃত্তান্তধর্মিতা আছে; তার প্রধান কারণ ঐসকল কাহিনী অনুরচনানির্ভর, তাই

সেখানে উপাখ্যানের প্রভাবও সমধিক। কিন্তু পরবর্তীকালের কাহিনীগুলি যে 'নব'রূপে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল সে সম্বন্ধে তিনি নিজেও ছিলেন সচেতন, গ্রন্থের নামকরণের মধ্যে তার প্রমাণ আছে। এই অভি'নব' রচনাগুলির মধ্যে যাদের পরিণাম আকস্মিকতায় পরিপূর্ণ সেগুলির ক্ষেত্রে একটি চরম ক্ষণ রচিত হয়েছে এবং সেখানেই গল্পের সমাপ্তি। অন্যান্য রচনার মধ্যেও একটি 'ভাব-পরিণামকে মর্মঘাতীরূপে বিদ্ধ' করার উদ্যম আছে—তার গতি ধীর হলেও স্থির লক্ষ্যাভিমুখী। বিকেলের আলোর ধীরে ধীরে নিভে এসে সন্ধ্যার বুকে হারিয়ে যাওয়া, পাপড়িগুলোর আস্তে আস্তে দল মেলে ফুলে পরিণত হওয়া প্রভৃতি নানাবিধ উপমানের সাহায্যে এইজাতীয় গল্পের লক্ষণ বিচারিত হয়েছে। স্বর্ণকুমারীর স্বভাবসিদ্ধ বৃত্তান্ত-ধর্মী রচনা পরবর্তীকালের অনুশীলনের ফলে এভাবে সার্থক ছোটগল্পের শিল্পে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। সমালোচক স্বীকার করেছেন, 'কখনো কখনো বিস্তৃত আখ্যায়িকামূলক গল্পও লেখকের কৃতিত্বে পরিশেষে ব্যঞ্জনাশ্রয়ী হয়ে গোত্রান্তর ঘটিয়ে ছোটগল্পে রূপান্তরিত হতে পারে। তখন তাতে আর কাহিনী-পরিণতি প্রধান থাকে না—তা হয় ইঙ্গিতমুখ্য, তাতে অকস্মাৎ একটি pointing fingure-এর আবির্ভাব হয়। আখ্যায়িকাধর্মী বিবৃতি তার ফলে তির্যক ইঙ্গিতমূলকতায় বিলসিত হয়ে যায়। যেমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "প্রাগৈতিহাসিক"।'[২৪] স্বর্ণকুমারীর 'হাসি', 'ট্যালিসম্যান', 'জীবন-অভিনয়' প্রভৃতিও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কর্ণেল টড সাহেবের আর্দালি পাঞ্জাবী রণবীরের জীবন-অবলম্বনে রচিত ট্যালিসম্যান গল্পটি সম্পূর্ণরূপে আখ্যানধর্মী হয়ে উঠতে পারত; কিন্তু স্থানগত ঐক্যের অভাবাত্মকতা সত্ত্বেও গল্পটির স্থির পরিণাম ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। যুদ্ধভীত মানবসভ্যতার অনৈশ্চিত্য ও অসহায়তাকে পরম কারুণ্যে রঞ্জিত করে দিয়েছে ত্যাগের মহান আদর্শে দীক্ষিত এই সামান্য ট্যালিসম্যানের অপমৃত্যু। এই শ্রেণীর অন্তর্গত পেনে প্রীতি (ভারতী, শ্রাবণ ১৩০৬) গল্পটি গঠন-দৌর্বল্য সত্ত্বেও রসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।[২৫] অমরগুচ্ছ (ভারতী, জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ ১৩১৫) গল্পটি আশ্চর্য বিষণ্ণতায় পূর্ণ। বিধবার যে নিঃশব্দ প্রেম নৈনিতালের পটভূমিকায় অমর পুষ্পের ন্যায় আস্তে আস্তে দলগুলি মেলে দিয়েছিল, ছ-মাস পরে বাঁকিপুর স্টেশনেও তা ম্লান হয়নি; সেই পার্বত্য কুসুম অন্ত-প্রেমের প্রতীকে রূপান্তরিত হয়েছে। স্থানগত কালগত ঐক্য এই গল্পে দুর্লভ হলেও নব-আস্বাদিত প্রেমের কুসুমগন্ধময় প্রতিবেশে বিধবা রমণী আবিষ্কার করেছে আপনার চিরন্তন স্বামীকে, এই আবিষ্কারের দিকেই সমস্ত গল্পটি উন্মুখ হয়ে আছে।

২৪ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সাহিত্যে ছোটগল্প, ১৩৬৫, পৃ ২৬১।

২৫ বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ২৫৩।

৪

লেখিকার বিভিন্ন উপন্যাসের মধ্যে যে 'স্ত্রী-মনোভাবের নিখুঁত প্রতিবিম্ব' পতিত হয়েছে তা সুধী সমালোচকের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছে; কেবল তাই নয়, 'স্বর্ণকুমারী দেবীর দুই একটি ছোটগল্পের— বিশেষতঃ "পেনে প্রীতি" নামক গল্পের মধ্যেও এই গুণ-সমৃদ্ধি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।'[২৬] অপর একজন সমালোচক মন্তব্য করেছেন, 'ছোটগল্পগুলির মধ্যেও যেখানে "আগাগোড়া স্ত্রীলোকের সুর ধ্বনিত" হয়েছে, সেখানেই স্বর্ণকুমারীর রচনার রস-স্বাতন্ত্র্য।...স্বর্ণকুমারীর সকল সার্থক সৃষ্টিই শিল্পীর এই নারীধর্মের ধারা বিভাবিত।'[২৭] নারীমনের বাতাবরণে পুষ্টিলাভ করেছিল বলে মধুর-কোমল-কান্ত গুণান্বিত পদাবলীর মত তাঁর রচনাগুলি নারীত্বে অভিসিঞ্চিত হয়ে উঠেছে। তাই ছোটগল্পের মধ্যে সুকর্ষিত বুদ্ধির দীপ্তির সঙ্গে গৃহিণী-ভাবের সম্মিলন লক্ষিত হয় কারণ রচনাবলীর উপর একটি সুশ্রী-শোভন নারীমনের ছায়া পড়েছিল। নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাবশত অপমানিতা-লাঞ্ছিতার জন্য তাঁর সুতীব্র সহানুভূতি উদ্রিক্ত হয়েছে—অন্নপূর্ণা তখন রুদ্রাণীতে রূপান্তরিত। যমুনা, লজ্জাবতী, গহনা প্রভৃতিতে যে মর্মঘাতী শ্লেষ ও ব্যঙ্গবিদ্রূপের জ্বালা আছে তার হেতু এখানেই প্রচ্ছন্ন। শাবকহারা বাঘিনীর প্রচণ্ডতা বুকে নিয়ে তিনি প্রতিপক্ষের মায়াজাল ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন, অথচ রমণীসুলভ শালীনতার সীমা কোথাও লঙ্ঘিত হয়নি; তাই প্রয়োজনবোধে আহত জননীর ভূমিকা গ্রহণের মধ্যেও তাঁর অপূর্ব সংযমবোধ এবং সামঞ্জস্যজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। গল্প রচনার ক্ষেত্রেই দেখা যায় যেখানে তিনি মপাসাঁধর্মী সেখানেও সুদক্ষ শিল্পী 'মপাসাঁর স্বভাব ও তাঁর ব্যঙ্গ কটাক্ষ আঘাত' প্রভৃতির তিক্ততা নেই বললেও চলে কিংবা যা আছে তা আদৌ স্থূল ব্যক্তিগত বিদ্বেষ অথবা আক্রোশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়নি। তিনি ছিলেন অন্নপূর্ণা নারী, তাই প্রয়োজনবোধে সত্য সুন্দর কল্যাণের সপক্ষে যদিও আয়ুধ ধারণ করেছেন, তবু মহিমায় সর্বমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

মালতী, কুমার ভীমসিংহ, সন্ন্যাসিনী প্রভৃতি রচনার মধ্যে নারীহৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা ভাব-ভাবনাসমূহ অপূর্ব দরদের সঙ্গে বিশ্লেষিত হয়েছে। পুরুষপ্রধান সমাজে যমুনার লাঞ্ছনা, লোলুপতার অবরোধে 'বন্দিনী কমলা'র ন্যায় অন্তঃপুরের অন্তরালে লজ্জাবতী বধূর অপমৃত্যু—সমস্ত কিছুই অকৃত্রিম সহানুভূতিতে রঞ্জিত। নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে রমণীর মূল্য নির্ধারণ, নারীকে তারই জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত অবস্থায় পর্যবেক্ষণ— বাংলা সাহিত্যের আসরে এইসকল

২৬ ঐ।

২৭ ভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, ১৯৬২, পৃ ১৯৩-৯৬।

বিষয় এখনও বড় দুর্লভ, স্বর্ণকুমারীর গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে তারই সূচনা ও বিকাশ দেখা দিয়েছিল। তাঁর গল্পগুলি এক বিস্মৃতপ্রায় যুগের যাদুঘর এবং স্বপ্নরঙীন ভবিষ্যের চিত্রশালা— এবং চিরকালের রমণী সেই জগতেরই অধিবাসী। সর্বকালের সর্বদেশের নারী-জীবনের মৌলিক সমস্যাগুলির উপরেই তিনি আলোক সম্পাত করেছিলেন, 'প্রকৃতপক্ষে অতীত এবং বর্তমানের মধ্যে তিনিই প্রথম যোগসূত্র।'[২৮] নৈনিতালের স্বপ্নপুরী থেকে বাঁকিপুরের স্টেশন পর্যন্ত সেই নিখিল রমণীর যাত্রাপথ বিস্তৃত, অমরগুচ্ছের বিধবা রমণীটির প্রেমের মতই তারও জীবন অবিনশ্বর।

বিয়োগান্ত কাহিনীর প্রতি স্বর্ণকুমারীর একটি বিশেষ আগ্রহ লক্ষ করা যায়, প্রথম গল্পসংকলন গ্রন্থ নবকাহিনীর মধ্যে করুণরসাত্মক গল্পের সংখ্যাধিক্য থেকেই তা প্রমাণিত হয়। নবকাহিনী সম্পর্কে সুকুমার সেন বলেছেন, 'নাটকোচিত ক্লাইম্যাক্স এই গল্পগুলির প্রধান বিশেষত্ব। অধিকাংশ গল্পই ট্রাজিক।' এই শ্রেণীর রচনায় লেখিকার কৃতিত্বের পরিচয়ও পাওয়া যায়। ছোটগল্পের ক্ষেত্রে পূর্বসূরীর কৃতিত্ব বিচারকালে অনুরূপা দেবী বলেছেন, 'সামাজিক চিত্রে এবং বিয়োগান্ত গল্পে তাঁর নৈপুণ্য সবচেয়ে বেশী প্রকাশ পেয়েছে।' এমনকি তাঁর উপন্যাস সম্পর্কেও ঐ একই কথা প্রযুক্ত হতে পারে। এইরূপ ঘটনা নির্বাচনের পশ্চাতে সমকালীন সাহিত্যাদর্শের প্রভাব অবশ্যই ছিল, তাকে সহায়তা করেছে লেখিকার বিশিষ্ট মানসিক গঠন ও নারীসুলভ কোমল ভাবনানুরাগী হৃদয়।

ছোটগল্প হিসাবে স্বর্ণকুমারীর রচনাগুলির শিল্পসৌন্দর্য বিচার প্রসঙ্গে সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন, 'স্বর্ণকুমারী দেবীর কয়েকটি গল্প বেশ মনোহর। ইহার অনেকগুলি গল্পে ছোটগল্পের উপযোগী কাহিনী-সংহতি রক্ষিত হইয়াছে।'[২৯] ঐ একই সমালোচক অন্যত্র বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প-রচনায় হাত দিবার সঙ্গে সঙ্গে...... স্বর্ণকুমারী দেবী "ভারতী" পত্রিকায় অনেকগুলি ছোট বড় গল্প লিখিয়াছিলেন। সেগুলি "নবকাহিনী"তে (১৮৯২) সংকলিত হইয়াছিল। নাটকোচিত ক্লাইম্যাক্স স্বর্ণকুমারীর গল্পের প্রধান বিশেষত্ব।'[৩০] অর্থাৎ তাঁর গল্পের মধ্যে কাহিনীর সংহতি এবং নাট্যিক চরম লগ্ন বা মহামুহূর্ত (climax) বর্তমান, এবং এই দুটি বৈশিষ্ট্য ছোটগল্পে অত্যাবশ্যক। অপর একজন সমালোচক মনে করেন, 'রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা স্বর্ণকুমারী দেবী অনেকগুলি ছোট ছোট গল্প লিখেছিলেন, বৃত্তান্তমূলক এইসব গল্পের নিজস্ব সাহিত্যিক আস্বাদ আছে এবং বাংলা

২৮ অনুরূপা দেবী, সাহিত্যে নারী : স্রষ্টা ও সৃষ্টি, ১৯৪৯, পৃ ১২৮।

২৯ বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, পৃ ১৩১।

৩০ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য়, পৃ ২৬৩।

গল্পসাহিত্যে স্বর্ণকুমারী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়া।'[৩১] আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় একই বিষয় সম্বন্ধে উভয়ের মতামত পরস্পরবিরোধী, কারণ একজন ঘটনা-সংহতির উপর জোর দিয়েছেন এবং অপরে বলেছেন তা বৃত্তান্তমূলক ; প্রকৃতপ্রস্তাবে উভয় মন্তব্যের মধ্যেই সত্য নিহিত। ঘটনা সংহত হলেই ছোটগল্প হয় না ; পক্ষান্তরে বৃত্তান্তমূলক সার্থক ছোটগল্পও রচিত হতে পারে, যেমন শেষোক্ত সমালোচকের মতে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাগৈতিহাসিক। বস্তুত ঘটনা যাই হোক না কেন তা একমুখী হওয়া অত্যাবশ্যক, তাই সংহতির প্রয়োজনীয়তা এত বেশী ; অন্য পক্ষে বৃত্তান্তধর্মিতার মধ্যেও একাগ্রতা থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে সকল ঘটনাস্রোত একটি লক্ষ্যের দিকেই অগ্রসর হতে থাকে। ছোটগল্পে এই একাভিমুখিতাই বড় কথা এবং স্বর্ণকুমারীর কোনো কোনো রচনা সেই দৃষ্টিকোণ থেকে ছোটগল্প।

স্বর্ণকুমারীর ইতিহাসাশ্রয়ী গল্পাবলী একান্তভাবে কাহিনীনির্ভর এবং বিবৃতিসর্বস্ব, 'ছোটগল্পের তীক্ষ্ণতা এখানে নেই—নাটকীয় চরম মুহূর্তেরও অভাব ;'[৩২] কারণ এসকল গল্পের মধ্যে স্থিরলক্ষ্যে একটি ভাব-পরিণামকে মর্মঘাতীরূপে বিদ্ধ করার অবকাশ নেই। লক্ষ্য সন্ধানের পূর্বে অর্জুন পাখির সেই অঙ্গই কেবল দেখেছিলেন যাকে তাঁর সুতীক্ষ্ণ শায়ক বিদ্ধ করতে চায়, সকলপ্রকার ছোটগল্পের পরিণতিতেও একটি প্রতীতির সমগ্রতা (unity of impression) এবং মহামুহূর্তের সন্ধান পাওয়া যায়। সেদিক থেকে ইতিহাসাশ্রয়ী গল্পের বহুপূর্বে প্রকাশিত 'মালতী' উল্লেখযোগ্য। রচনাটি মূলত আখ্যানধর্মী এবং ছোটগল্পের সূক্ষ্ম কারুকার্য অপেক্ষা উপন্যাসোচিত স্থূল তুলিকার বর্ণাহুরঞ্জন এখানে অধিকতর প্রকট। একদা উপন্যাসের শ্রেণীভুক্ত হয়ে স্বতন্ত্র পুস্তকের আকারেও প্রকাশিত হয় মালতী অথচ পরবর্তী কালে তা অন্য একটি গল্পসংকলন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। বস্তুত এটি একটি মিশ্র প্রকৃতির রচনা, বঙ্কিমচন্দ্রের যুগলাঙ্গুরীয়-রাধারাণীর মত 'উপন্যাস নয়, বড় গল্প' ; স্বর্ণকুমারীর আরও কয়েকটি উপন্যাস এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্পসংগ্রহ 'ঘরের কথা'র (১৯১০) ভূমিকায় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই শ্রেণীর গল্প সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'সেগুলি আকারে ছোটমাত্র নচেৎ উপন্যাসেরই লক্ষণাক্রান্ত।'[৩৩] প্রতীতির সমগ্রতা ও মহামুহূর্তের অভাববোধ প্রভাতকুমারকে পীড়িত করেছিল—এদেরই তিনি 'emotion-এর রঙ', 'রসপ্রধান', 'emotion-এর স্বর্ণরেখা', 'এমন একটা কিছু' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছের মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবী এইসকল বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে প্রথম পর্যায়ে ততবেশী সচেতন ছিলেন বলে মনে হয় না, তাঁর নিকট এইসমস্ত সম্ভবত অস্পষ্ট ছিল ;

৩১ সাহিত্যে ছোটগল্প, পৃ ২০৩।

৩২ রথীন্দ্রনাথ রায়, ছোটগল্পের কথা, ১৯৫৯, পৃ ১০৩।

৩৩ সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, ৫ম খণ্ড, ৫৪শ সংখ্যা, পৃ ২৯।

তবে সহজাত বুদ্ধি এবং শিল্পীর সদাসচেতন অনুভব শক্তির বলে তিনি যেন তাকে কতকটা ধরতে পেরেছিলেন। মালতী গল্পের পরিণামে সেই মহামুহূর্ত সৃষ্টির উদ্যম স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, ধারণা বা প্রতীতির সমগ্রতায় গল্পটি ধীরে ধীরে ফুলের মত বিকশিত হয়ে উঠেছে; একটি বিশেষ লক্ষ্যের প্রতি আকৃতি স্পষ্টীভূত বলে গন্তব্য স্থলে উপনীত হওয়ার কচ্ছপ-বাসনা সিদ্ধিলাভ করেছিল। শেষ অনুচ্ছেদের মধ্যে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে বিচিত্র ঘটনার দলগুলি থেমে গিয়েছে স্বাভাবিকভাবে এবং কুসুম আপনার জীবনের চরম সার্থকতায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

মালতীর পর তাঁর ইতিহাসাশ্রয়ী গল্পগুলি রচিত হয় কিন্তু তার মধ্যে লেখিকা আখ্যান রচনায় অধিকতর মনোযোগী, কারণ টডের ঐকান্তিক অনুসরণ। তবে সাহিত্যের কনিষ্ঠ সন্তানরূপে ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তিনি যে হতচেতন ছিলেন তা বলা সঙ্গত নয়। প্রথম গল্পসংকলন গ্রন্থের মধ্যে যেসকল কাহিনী স্থানলাভ করে তা যে অভিনব তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'নবকাহিনী' নামটির মধ্যে এবং এই গল্পগুলি যে 'ছোট ছোট' সেকথাও বলা হয়েছে। ছোটগল্পের ক্ষুদ্রাবয়ব এবং অভিনবত্ব সম্বন্ধে তিনি ছিলেন সদাসচেতন তবে তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ধর্ম কিংবা অন্যান্য প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্ভবত তিনি প্রথমে ধরতে পারেননি, শিল্পীর সহজাত অলৌকিক প্রতিভাবলে তিনি ক্রমশ উৎকর্ষের পরিচয় দান করতে থাকেন। ঐ সময়ের গল্পাবলীর মধ্যে 'ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী, অশ্ব ও তরবারি' একটি সার্থক রচনা। গল্পের সমাপ্তিতেই আকস্মিকতা ও মহামুহূর্ত পরস্পরকে স্পর্শ করেছে বলে কাহিনীটি সার্থক ছোটগল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। অসাধারণ সংযম ছিল বলেই তিনি এক্ষেত্রে যথাস্থানে থেমে গিয়েছেন এবং টডের মত অকারণে অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা করেননি, ফলে ঘটনাস্রোত আকস্মিকভাবে রুদ্ধ হওয়ায় মহামুহূর্তেই (climax) প্রতীতির সমগ্রতা জাগ্রত হতে পেরেছে; ঘটনাস্রোত তীব্রবেগে চরম পরিণামের দিকে ধাবিত হয়েছে, অতি-প্রয়োজনীয় কাহিনীর লঘু ভার ও সাংকেতিক ভাষার সংক্ষিপ্ততা তাকে তীব্রতর করে তুলেছে—ফলে লক্ষ্যটি তীক্ষ্ণভাবেই বিদ্ধ। আখ্যায়িকা-বৃত্তান্ত থেকে সকল দেশের ছোটগল্প বিবর্তনসম্মত উপায়ে আধুনিক রূপ লাভ করেছে, স্বর্ণকুমারীর রচনার মধ্যে সেই ঐতিহাসিক সত্যের সমর্থন আছে। তাই আখ্যানমূলক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর গল্পের মধ্যে ঘটনাসংহতি লক্ষিত হয়ে থাকে এবং বৃত্তান্তমূলক ছোটগল্প যদি আজও রসিকের হৃদয়গ্রাহ্য হতে পারে তবে স্বর্ণকুমারীর রচনাগুলি 'নবকাহিনী বা ছোট ছোট গল্পে'র মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হবে না।

ছোটগল্প সম্বন্ধে লেখিকার ব্যক্তিগত ধারণার পরিচয় প্রদান করা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের পত্রপত্রিকার মধ্যে কিংবা গ্রন্থে গল্প, ক্ষুদ্র গল্প, কথা, ক্ষুদ্র কথা, কাহিনী

প্রভৃতি অভিধার সাহায্যে এই জাতীয় রচনাকে চিহ্নিত করার উদ্যম লক্ষিত হয়। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের (১৮২৫-৯৪) ঐতিহাসিক উপন্যাস (১৯১৯ সংবৎ বা ১৮৬২-৬৩ খৃঃ) গ্রন্থের শিরোনাম সম্ভবত 'রোমান্স অব হিস্টরি—ইণ্ডিয়া' শীর্ষক গ্রন্থের নামানুসরণে প্রস্তুত। পরবর্তীকালে 'উপন্যাস' শব্দটি সাধারণভাবে গল্প বোঝাতেও কখনো কখনো ব্যবহৃত হয়েছে, বিশেষত স্বর্ণকুমারীর ক্ষেত্রে যে এরকম ঘটেছিল তার প্রমাণ আছে। স্বর্ণকুমারী তাঁর ক্ষুদ্রাবয়ব গল্প 'ক্ষত্রিয় রমণী'র পরিচয় দিয়েছেন 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'রূপে; অন্যত্র 'কুমার ভীমসিংহে'র পরিচয় হল 'ঐতিহাসিক নাটক', এবং 'রাজকন্যা' নামক নাটকের নামপত্রে বলা হয়েছে 'নাট্যোপন্যাস'। স্পষ্টই বোঝা যায় তিনি 'উপন্যাস' শব্দটির শিথিল প্রয়োগ যদিও প্রায়ই করেছেন তবু ব্যাপকভাবে তা আখ্যান উপাখ্যান বা কাহিনীকেই বুঝিয়েছে। প্রমাণরূপে উল্লেখ করা যায় যে এক্স্থানে লজ্জাবতী গল্পটিকে উপন্যাসরূপে অভিহিত করা হয়েছে।[৩৪] আপনার গ্রন্থের শিরোনামে লেখিকা একাধিকবার 'গল্প' শব্দটির ব্যবহার করেছেন, যেমন— গল্পস্বল্প (মার্চ ১৮৮৯), মালতী ও গল্পগুচ্ছ (ফেব্রুয়ারি ১৯১০) প্রভৃতি। নবকাহিনী (১৮৯২) নামে যে গল্পসংগ্রহ প্রকাশিত হয় তার মধ্যে কাহিনী শব্দটিকে গল্পের প্রতিশব্দরূপে গ্রহণ করা হয়েছে বলে মনে করা চলে। ১২৯৩ সালের কল্পনা পত্রিকার ষষ্ঠ খণ্ডে প্রকাশিত 'বাঙলার উপন্যাসলেখক' শীর্ষক প্রবন্ধে বলা হয়েছে, 'ইংরাজিতে যাহাকে Novel বা Fiction বলে, আমরা সেই অর্থে এখানে "উপন্যাস" আর Story বা Tale শব্দের পরিবর্তে "গল্প" কথা ব্যবহার করিতেছি।' স্বর্ণকুমারীও এই অর্থে গল্প শব্দটির প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু ইংরেজি Short Story-এর সম্বন্ধে তিনি ক্রমশ সচেতন হয়ে উঠেছিলেন বলে মনে হয়। গল্পস্বল্পের 'বীরেন্দ্রসিংহের রত্নলাভ' (সখা ১৮৮৩)-এর সঙ্গে নবকাহিনীর 'ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী, অশ্ব ও তরবারি' কিংবা 'লজ্জাবতী'র গঠনগত ও চরিত্রগত পার্থক্য আছে, এ সম্বন্ধে তিনি পরোক্ষভাবে আপনার মনোভাব প্রকাশ করেছেন। ১২৯৮ সালের ভারতী ও বালক পত্রিকার মাঘ সংখ্যার শেষে স্বর্ণকুমারীর পুস্তকাবলীর যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় তার একটি অংশে বলা হয়েছিল, 'নবকাহিনী বা ছোট ছোট গল্প।...সামাজিক এবং ঐতিহাসিক অনেকগুলি ছোট ছোট গল্প যাহা ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল।' এই বিজ্ঞাপনের ভাষার মধ্যেই স্বর্ণকুমারীর গল্পের রূপ ও ধর্মের পরিচয় প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। নবকাহিনীর অভিনবত্ব এবং গল্প-অবয়ব সম্পর্কে লেখিকার সচেতনতা যে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে গ্রন্থের নামপত্রের মধ্যেও তার প্রমাণ আছে।

ছোটগল্পের দেহনির্মিতির উপযোগী ভাষা ব্যবহারে লেখিকার উদ্যম প্রশংসনীয়।

৩৪ ভারতী ও বালক, মাঘ ১২৯৮, সংখ্যাশেষে নবকাহিনীর বিজ্ঞাপন দ্র।

ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস ছিন্নমুকুলের (পৌষ ১২৮৫-অগ্রহায়ণ ১২৮৬) সংলাপের প্রায় সর্বত্র চলিতভাষার রীতি ব্যবহৃত হয়েছে, কেবলমাত্র সংলাপের কোনো কোনো অংশে এবং অন্যান্য সকল স্থানে সাধুভাষার ক্রিয়া সর্বনাম প্রভৃতি প্রযুক্ত হয়েছে। কিন্তু স্বর্ণকুমারীর প্রথম বড়গল্প মালতীর (মাঘ-ফাল্গুন ১২৮৬) মধ্যে সংলাপে চলিতভাষার ব্যবহারে কোনো দ্বিধা ছিল না, অর্থাৎ বর্ণনাংশ সাধুনির্ভর হলেও সংলাপে একান্তভাবে চলিত-রীতিই স্বীকৃত হয়।[৩৫] পরবর্তী ইতিহাসাশ্রয়ী বা ঐতিহাসিক গল্পগুলির মধ্যে চলিতরীতি সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হয়েছে ; প্রথম প্রকাশিত রচনা ও ঐতিহাসিক উপন্যাস দীপনির্বাণ (১২৮৩) -এর আদর্শ সম্ভবত এক্ষেত্রে অবলম্বিত হয়েছিল এবং তারও পশ্চাতে ছিল সমকালীন অনুরূপ-শ্রেণীর রচনাদর্শের প্রত্যক্ষ প্রভাব। 'কুমার ভীমসিংহ', 'ক্ষত্রিয় রমণী', 'ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী, অশ্ব ও তরবারি', 'সন্ন্যাসিনী'র মত 'প্রতিশোধ', 'আমার জীবন' প্রভৃতি গল্পের কোথাও চলিতের প্রয়োগ নেই এবং উক্ত গল্পগুলি ১২৯৩ সালের বৈশাখ থেকে ১২৯৮ সালের ভাদ্র মাসের মধ্যে প্রকাশিত হয় ভারতী ও বালক পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায়। কিন্তু এই কালসীমার মধ্যেও এমন কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হয়েছে যার মধ্যে ভাষাব্যবহারের ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। বিশেষত যমুনার বর্ণনাংশে এবং সংলাপে সাধুর প্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও পল্লীর সাধারণ রমণী-গণের মুখে চলিত সংলাপ বসান হয়েছে। কেন-শীর্ষক রচনায় উমিদাসীর চলিত সংলাপে আবার আঞ্চলিক কথ্য রীতির টান পর্যন্ত স্পষ্ট ; অথচ শাশুড়ী ও নায়িকা বধূর সংলাপে ভাষাগত সংগতি নেই কারণ উভয়েই সাধু-চলিতের ইচ্ছামত প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু লজ্জাবতী গল্পটির সংলাপে এজাতীয় কোনোরূপ শৈথিল্য নেই ; দাসী ও সম্ভ্রান্ত রমণী সকলেই চলিতরীতির মাধ্যমে মনোভাব প্রকাশ করেছে ; তবে দাসীর ক্ষেত্রে বিশিষ্ট আঞ্চলিক উচ্চারণ-ভঙ্গি তার চরিত্রকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে— এনু, গেনু, নেগেছে, নেপ প্রভৃতি শব্দব্যবহারের প্রাচুর্যে তার কথাগুলি সকলের থেকে সহজে স্বতন্ত্র হয়ে গেছে। প্রসঙ্গত বলা যায় ইতিপূর্বে যে কালসীমা প্রদত্ত হয়েছে তার মধ্যে লেখিকার রচিত এমন একটি চিঠির নিদর্শন পাওয়া যায় যার ভাষা একান্তভাবে চলিতরীতি-আশ্রয়ী।[৩৬] পরিশেষে বলা যায় যে নবকাহিনীর যে গল্পগুলি উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে তাদের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য প্রধানত এইরূপ : ১. প্রত্যেক গল্পের বর্ণনাংশ একান্তভাবে সাধুরীতির উপর নির্ভরশীল। ২. চলিতরীতি কেবলমাত্র কোনো কোনো গল্পের সংলাপের প্রায় সর্বত্র ব্যবহৃত। ৩. ঐতিহাসিক বা ইতিহাসাশ্রয়ী গল্পগুলিতে বিশেষভাবে

৩৫ ভারতীতে প্রকাশিত গল্পটির কোনো কোনো সংলাপে সাধুভাষার লক্ষণ বর্তমান।

৩৬ দ্র দারজিলিং পত্র, ভারতী ও বালক, বৈশাখ ১২৯৫ ।

সাধুরীতি প্রযুক্ত। ৪. প্রধানত গৌণচরিত্র, অন্তঃপুরিকা, ঝি-দাসী প্রভৃতি সাধারণ পাত্রপাত্রীর সংলাপের চলিতরীতি বিশিষ্ট আঞ্চলিক উচ্চারণভঙ্গি এবং উপভাষার (dialect) সংস্পর্শ লাভ করেছে ; তাঁর কয়েকটি প্রহসন এবং সামাজিক নাটকও এই বৈশিষ্ট্যযুক্ত।

নাটক ও প্রহসন

১

নাট্যকাররূপে স্বর্ণকুমারী দেবী গীতিনাট্য অবলম্বন করে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন এবং এ ব্যাপারে প্রারম্ভিক পর্যায়ে নিজের উপর তিনি সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারেননি। ইন্দিরা দেবী বলেছেন, 'মনে পড়ে রবিকাকা, জ্যোতিকাকা, স্বর্ণপিসিমা অনেক সময় মিলে মিশে গীতিনাট্য রচনা করতেন।'[১] তাঁর বসন্ত-উৎসব, বিবাহ-উৎসব প্রভৃতি গীতিনাট্যের মধ্যে নানা লেখকের বিবিধ রচনা স্থান লাভ করেছে এবং এভাবেই তিনি নাট্যরচনায় উৎসাহিত হয়ে নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে ক্রমশ আস্থা লাভ করতে থাকেন। তাঁর সাহিত্যসাধনার প্রথম পর্বে জ্যোতিরিন্দ্র-প্রতিভার প্রভাব ছিল আত্যন্তিক, স্নেহপ্রবণ অগ্রজের সেই আনুকূল্য লাভ করে তিনি সাহিত্যসৃষ্টিতে আগ্রহী হয়ে উঠেন; কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে তিনি প্রায় প্রথম থেকেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাব অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছিলেন। রবীন্দ্র-প্রতিভা যেমন প্রধানত স্ফূর্তিলাভ করেছিল কাব্যে ও গানে তেমনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রধান বাহন ছিল নাটক; আবার সেই নাট্যোৎসাহের পশ্চাতে সক্রিয় ছিল স্বাদেশিকতা। কিন্তু স্বর্ণকুমারীর কোনো নাটকই স্বদেশী আন্দোলন বা স্বাজাত্যাভিমানকে অবলম্বন করে রচিত হয়নি। স্বর্ণকুমারীর স্বদেশপ্রীতির অভাব কোনোকালেই ছিল না, গল্পে উপন্যাসে প্রবন্ধে কবিতায় গানে অর্থাৎ নাটক ব্যতীত সাহিত্যের সকল শাখাতেই তাঁর স্বাদেশিক মনের প্রকাশ বা প্রতিফলন ঘটেছে। এই বৈশিষ্ট্যও তাঁকে এবং তাঁর নাটককে স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত করেছে।

প্রহসনের ক্ষেত্রে তাঁর সাফল্য সমালোচকগণের সহৃদয় অনুমোদন লাভ করেছে। অন্যান্য নাটকের মধ্যে প্রধানত ঋতু-উৎসব বা সামাজিক উৎসবমূলক নাট্য-আখ্যানই প্রাধান্য পেয়েছে। বিবাহকে কেন্দ্র করে বসন্ত-উৎসব, বিবাহ-উৎসব, দেবকৌতুক প্রভৃতি নাটক যেমন রচিত হয়েছে তেমনি কনেবদল, পাকচক্র প্রভৃতি প্রহসনও লিখিত হয়েছিল। শারাডের (charade) অনুসরণে সেকালে একশ্রেণীর হেঁয়ালিনাট্য রচিত হত, স্বর্ণকুমারীর 'কৌতুক-নাট্য' গ্রন্থের কয়েকটি রচনা সেই আদর্শে পরিকল্পিত। রাজকন্যা, দিব্যকমল ও নিবেদিতা নাটকত্রয়ীর মধ্যে সভ্যতা ও মানবতার সংকট প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ গম্ভীর বিষয় অবলম্বিত হয়েছে। সেদিক থেকে যুগান্তকাব্যনাট্য বা রাজকন্যা কিংবা দিব্যকমল একটি বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত—এখানে লেখিকার সত্যবোধ আদর্শপ্রীতি এবং ন্যায়নিষ্ঠা মানবজীবনের

---

১ রবীন্দ্রস্মৃতি বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, পৃ ১৮৯।

সমূহ দুর্যোগের অবসান কামনা করেছে। তাঁর শেষজীবনের উপন্যাসে যে আদর্শ-প্রীতি পরিস্ফুট এইসকল নাটকের সঙ্গে তাদের সেই সূত্রে আত্মীয়তা আছে।

প্রহসনগুলি ব্যতীত তাঁর অন্যান্য রচনায় নাট্য-গতি মন্থর, চারিত্রিক অন্তর্দ্বন্দ্ব শূন্যপ্রায় এবং সংলাপ কথকতাধর্মী। সেদিক থেকে প্রহসনগুলির উৎকর্ষ সত্যই প্রশংসনীয়। ঘটনার বিদ্যুৎগতি ও সংলাপের দ্রুত লয় পাত্রপাত্রীর হৃদয়ভাবনাকে সুস্পষ্ট করে দিয়েছে। কোথাও কোথাও সংলাপে আঞ্চলিক কথ্যভঙ্গি প্রযুক্ত হয়েছে; বিশেষত দাস-দাসীর মুখে আঞ্চলিক ভাষারীতির সঙ্গে বিশিষ্ট উচ্চারণভঙ্গির মিশ্রণ কৌতুকসৃষ্টির সহায়ক হয়েছে এবং চরিত্রগুলির স্বাতন্ত্র্য এই বিশিষ্ট বাক্‌ভঙ্গিকে আশ্রয় করেই বিকশিত হয়ে উঠেছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে। তাঁর সমাজসচেতন সহৃদয় মন এইসকল সামাজিক নাট্যচিত্র অথবা প্রহসনের মধ্যে বলিষ্ঠভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

২

॥১॥ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় স্বর্ণকুমারী দেবী রবীন্দ্রনাথের পূর্বে গীতিনাট্য রচনা করেন; স্বর্ণকুমারীর প্রথম গীতিনাট্য বসন্ত-উৎসব (নভেম্বর ১৮৭৯) রবীন্দ্রনাথের প্রথম গীতিনাট্য বাল্মীকিপ্রতিভার (ফাল্গুন ১২৮৭) পূর্বেই রচিত। রবীন্দ্রনাথের বিদেশে অবস্থানকালে (সেপ্টেম্বর ১৮৭৮ থেকে ফেব্রুয়ারি ১৮৮০) স্বর্ণকুমারীর এই নাটিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। কন্যা হিরণ্ময়ী দেবী বলেছেন, 'জোড়াসাঁকো হইতেই কাব্যনাট্যের সৃজন প্রথম এই "বসন্ত-উৎসবে"ই। ইংলণ্ডে বইখানি পড়িয়া রবিমামা মাকে যে আনন্দপূর্ণ পত্র লেখেন, বড়ই দুঃখের বিষয়, সে পত্রখানি মা আর রাখেন নাই। রবিমামা বিলাত হইতে বাড়ি ফিরিবার পর আমাদের অন্তঃপুরে বসন্ত-উৎসবের অভিনয়ও হইয়াছিল।'[২] সরলা দেবীর একটি মন্তব্য থেকেও জানা যায়, 'রবীন্দ্রনাথের বিলেতনিবাস কালেই আমার মায়ের রচিত বসন্ত-উৎসব গীতিনাট্যের অভিনয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অধ্যক্ষতায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল।'[৩] অর্থাৎ সরলা দেবীর কথানুযায়ী রবীন্দ্রনাথের প্রবাসকালে নাটকটি কেবল রচিতই হয়নি মঞ্চস্থও হয়েছিল। এমনকি জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরও পূর্বে স্বর্ণকুমারী গীতিনাট্য রচনায় উদ্যোগী হন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম গীতিনাট্য মানময়ী (১৮৮০) বসন্ত-উৎসবের পরে রচিত হয় এবং 'অনেককাল পরে ইহা পুনর্বসন্ত (১৮৯৯) নামে বর্ধিতায়তন হয়।'[৪]

২ কৈফিয়ৎ, ভারতী, বৈশাখ ১৩২৩।

৩ জীবনের ঝরাপাতা, পৃ ২৯।

৪ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য়, পৃ ২৯১।

সাধারণ নাটক রচনায় লেখিকা অগ্রজের প্রভাব অতিক্রম করতে না পারলেও গীতিনাট্য রচনার দিক থেকে নিঃসন্দেহে তিনিই ছিলেন পথিকৃৎ। তবে এই শ্রেণীর নাট্যরচনার পশ্চাতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎসাহ কিংবা পৃষ্ঠপোষকতার কথা অস্বীকার করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি গ্রন্থের গীতচর্চা-অধ্যায় থেকে জানা যায় একসময় 'পিয়ানো বাজাইয়া জ্যোতিদাদা নূতন সুর তৈরি' করতে থাকেন এবং সেই অভিনব সুরকে 'কথা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টায় নিযুক্ত' ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী। স্বর্ণকুমারীও পরবর্তীকালে যে এই দলভুক্ত হয়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি থেকে তা জানা যায়: 'এখন হইতে সংগীত ও সাহিত্যচর্চাতে আমরা তিনজন হইলাম— আমি অক্ষয় ও রবি। পরে জানকী বিলাত যাইবার সময় আমার ভগিনী এখনকার ভারতী-সম্পাদিকা আমাদের বাড়িতে বাস করিতে আসায় সাহিত্যচর্চায় তাহাকেও আমাদের একজন সঙ্গীরূপে পাইলাম।'[৫] এইসময় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে সংগীতচর্চার এইরূপ আয়োজনের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে আশ্রয় করে স্বর্ণকুমারীর সংগীত-অনুশীলন পরিণত হতে থাকে এবং এরই পরিণামে প্রথম গীতিনাট্যের রচয়িত্রীরূপে স্বর্ণকুমারীর আবির্ভাব।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে বলা হয়েছে, 'একদিন আমাদের বারাণ্ডার আড্ডায় কথা উঠিল— সেকালে কেমন বসন্ত-উৎসব হইত। আমি বলিলাম, এসো না আমরাও একদিন সেকেলে ধরণে বসন্ত-উৎসব করি।...একদিন এক বসন্ত-সন্ধ্যায় সমস্ত উদ্যান বিবিধ রঙীন আলোকে আলোকিত হইয়া নন্দন কাননে পরিণত হইয়া উঠিল। পিচকারী আবীর কুঙ্কুম প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সমস্ত সরঞ্জাম উপস্থিত হইয়া গেল। খুব আবীর খেলা হইতে লাগিল। তারপর গানবাজনা আমোদপ্রমোদও কিছুমাত্র বাদ গেল না।'[৬] সম্ভবত বাসন্তী পূর্ণিমার উৎসবকে কেন্দ্র করে বিশুদ্ধ আমোদপ্রমোদের এই আয়োজন থেকে বসন্ত-উৎসবমূলক গীতিনাট্য রচনার প্রয়োজন অনুভূত হয়, কারণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পুনর্বসন্ত (১৮৯৯), বসন্তলীলা (১৯০০), ধ্যানভঙ্গ (১৯০০) প্রভৃতি গীতিনাট্য বসন্ত-উৎসবের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত। তাছাড়া বসন্তলীলার ক্রোড়পত্র থেকে জানা যায় যে এই গীতিনাটিকাটি 'দোলোৎসব-দিবসে ভারত-সংগীত-সমাজে অভিনীত' হয়েছিল। স্বর্ণকুমারীর বসন্ত-উৎসব শিরোনামযুক্ত নাটিকাকেও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

প্রসঙ্গত বলা যায় যে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, 'সংগীত-সমাজের গোড়ার দিকে কবি (রবীন্দ্রনাথ) একটু নিজেকে স্বতন্ত্র রাখিতে ভালোবাসিতেন, স্টেজেও সহসা

৫ ভারতী, কার্তিক ১৩২১।

৬ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, পৃ ৭২।

নামিতে রাজি হইতেন না। কিন্তু ক্রমে আভিজাত্যের সংকোচ কাটিয়া যায় ও স্বর্ণকুমারী দেবীর "পুনর্বসন্ত" নামে গীতিনাট্যের রিহার্সালে কোমরে চাদর বাঁধিয়া হাততালি বাজাইয়া সখিদের নাচ দেখাইয়া দেন।—রবীন্দ্র-কথা পৃ ২২৬।'[৭] প্রভাতকুমার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র-কথা গ্রন্থেরও উল্লেখ করেছেন দেখা যায়। কিন্তু স্বর্ণকুমারীর 'পুনর্বসন্ত' নামক কোনো গীতিনাট্যের সন্ধান আমরা পাইনি এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার সেন প্রমুখ নিষ্ঠাবান গবেষকের গ্রন্থের মধ্যেও বসন্ত-উৎসব ব্যতীত লেখিকার অন্য কোনো ঋতু-উৎসব সম্পর্কিত গীতিনাট্যের উল্লেখ নেই। শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেনের কথা থেকে জানা যায়, 'অশ্রুমতীর পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একটি নিতান্ত ক্ষুদ্র গীতিনাট্য রচনা করেন, "মানময়ী" (১৮৮০)। অনেককাল পরে "পুনর্বসন্ত" (১৮৯৯) নামে বর্ধিতায়তন হয়।'[৮] তাছাড়া পুনর্বসন্তের ক্রোড়পত্র থেকেও জানা যায় এই 'অদ্ভুতরসমিশ্র গীতিনাট্য'টি 'ভারত-সংগীত-সমাজে অভিনয়ার্থ' রচিত হয়। খগেন্দ্রনাথের এই জাতীয় ভুলের কারণ অনুমিত হতে পারে। পরবর্তীকালে স্মৃতিচারণার সময় ইন্দিরা দেবী বলেছেন, 'মানময়ী নাটক জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে আপনা-আপনির মধ্যে অভিনীত হয়। এটি কার রচনা সেকালে আমাদের অনুসন্ধান করবার কোনো প্রবৃত্তি হয়নি, তবে এখন মনে পড়ে রবিকাকা জ্যোতিকাকা স্বর্ণ-পিসিমা অনেক সময় মিলেমিশে গীতিনাট্য রচনা করতেন।'[৯] এই মন্তব্যের মধ্যে সত্যতা আছে। ঠাকুরপরিবারের এই 'ত্রয়ী'র রচনা পরস্পরকে যেমন প্রভাবিত করেছে তেমনি অনায়াসে অপরের রচনার মধ্যে আরেকজনের গান-কবিতা স্থান পেয়েছে। যেমন, পুনর্বসন্তের দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কের প্রথম গান 'আজি কোয়েলা কুহু বোলে'র অনুরূপ একটি রচনা বসন্ত-উৎসবের উদ্বোধনী গীতিরূপে ব্যবহৃত হয়েছিল; ভারতী ও বালক পত্রিকার ১২৯৯ সালের ভাদ্র সংখ্যায় স্বর্ণকুমারীর 'বিবাহ-উৎসব' নামক যে গীতিনাট্যটির প্রথম দৃশ্য মুদ্রিত হয় তার শেষ গান 'নাচ শ্যামা তালে তালে' রবীন্দ্রনাথের রচনা। এই কারণে ইন্দিরা দেবী অনেকের দ্বারা রচিত গ্রন্থকে বিশেষ কোনো লেখকের নামের সঙ্গে যুক্ত করতে দ্বিধা অনুভব করেছেন, এবং হয়ত প্রায় একই কারণে খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্র-কথা গ্রন্থে পুনর্বসন্তের লেখকরূপে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরিবর্তে স্বর্ণকুমারীর নাম ব্যবহার করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে স্বর্ণকুমারীর বসন্ত-উৎসবই হল ঋতু-উৎসব-সংক্রান্ত প্রথম গীতিনাট্য, তার বহু-পরবর্তীকালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতির নামাঙ্কিত এই জাতীয় একাধিক গীতিনাট্য

৭ রবীন্দ্রজীবনী, ১ম, ১৩৬৭, পৃ ৪৪২।

৮ বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য়, পৃ ২৯১।

৯ রবীন্দ্রস্মৃতি, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, পৃ ১৯৬।

রচিত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মনে 'সেকেলে ধরণে বসন্ত-উৎসব' পালন করার যে আগ্রহ উদিত হয় স্বর্ণকুমারীর বসন্ত-উৎসব গীতিনাট্যটি তারই প্রথম ফল। আরও বড় কথা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরই অধ্যক্ষতায় এই গীতিনাট্যটি প্রথম অভিনীত হয় রবীন্দ্রনাথের বিলাতপ্রবাসের কালে। সেই সময়কার কথা পাওয়া যায় সরলা দেবীর স্মৃতিচিত্রণে, 'সংগীতের এক মহাহিল্লোলে হিল্লোলিত হয়ে উঠেছিল বাড়ি তখন। আমাদের শিশুকণ্ঠেও প্রতিধ্বনিত হতে থাকত বড় বড় ভাবের বড় বড় কথায় বড় বড় রাগ— "চন্দ্রশূন্য তারাশূন্য মেঘান্ধ নিশীথে চেয়ে রয়ে রয়ে"— বাগেশ্রীর তানে আমাদের গলা ও মন খেলিয়ে উঠত। "বসন্তোৎসব" বাস্তবিকই একখানি অপূর্ব জিনিস। রবিমামার মত য়ুরোপের দেশবিদেশ ঘুরে বহুদর্শিতায় পুষ্ট প্রতিভার ফল এটি নয়। শুধু ঘরের ভিতরে অন্তঃপুরে বসে বসে অন্তঃপুরিকার রচনা। ভারতবর্ষের পূর্বাপর কেবলমাত্র কল্পনারাজ্যবাসী কবিদেরই শ্রেষ্ঠতম কাব্যরচনার সঙ্গে তুলনীয়। বন্ধুদের যে আনুকূল্য রবীন্দ্রনাথের কৈশোর থেকে দোসর হয়েছিল সেই আনুকূল্যের অভাবে এটা দেশে ছড়িয়ে পড়েনি তবু আগরতলায় ত্রিপুরার রাজপ্রাসাদে যখন বহুবৎসর পরে নিমন্ত্রিত হয়ে যাই, রাজা বীরেন্দ্রমাণিক্যের নিজের অধিনায়কতায় তাঁর কন্যা ভগ্নী ও অন্যান্য রাজ-অন্তঃপুরিকাদের দ্বারা এই গীতিনাট্যটির অভিনয় দেখে-শুনে আশ্চর্য হয়েছিলুম।'[১০] জননীর কৃতিত্বে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের এই শ্রদ্ধানিবেদন ও প্রশংসাজ্ঞাপন একান্তভাবে পক্ষপাতদুষ্ট নয়। সরলা দেবীর সংস্কৃত-জ্ঞান ও সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ অধিকার ঐতিহাসিক স্বীকৃতি লাভ করেছিল, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর পাণ্ডিত্য ও রসবোধের প্রশংসায় ছিলেন পঞ্চমুখ;[১১] অপরদিকে তাঁর সংগীত-বিষয়ক পারদর্শিতাও ছিল ভারত-বিশ্রুত। তাই 'ভারতবর্ষের পূর্বাপর কেবলমাত্র কল্পনারাজ্যবিলাসী কবিদেরই শ্রেষ্ঠতম কাব্যরচনার সঙ্গে' স্বর্ণকুমারীর বসন্ত-উৎসবের তুলনা অনধিকারীর দ্বারা সম্পাদিত হয়নি একথা বলা যায়। এই গীতিনাট্যের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে অনুরূপ রচনা প্রকাশিত হয়নি বলেই সরলা দেবী ভারতীয় কবিগণের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তুলনামূলক বিচারের জন্য।

কেবল আত্মজাই নন, সেকালের পত্র-পত্রিকা এবং বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী সকলেই বসন্ত-উৎসবের সুখ্যাতি করেছেন। ইণ্ডিয়ান মিররে বলা হয়েছিল, We hear the author is a lady of a very respectable Bengali family of Calcutta. It is customary to make some relaxations of strict critical canons in favour of lady writers. We are not inclined to countenance such

১০ জীবনের ঝরাপাতা, পৃ ২৯।

১১ ঐ, পৃ ৪৫।

partiality, nor is there any necessity for it in the present case. Basanta Utsav can stand upon its own merits.... There is no melodrama in Bengali, that we know of, which is so thoroughly chaste and sweet, so rich in charms of poetry, and, therefore, none so well-calculated to improve the taste of the play-going public. We have little hesitation in declaring that it will, at no distant date, revolutionize the existing style of opera-writing in Bengali by giving it healthy tone and moral vigour which it so much wants.[১২] ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজে বলা হয়েছিল, It shows no trace of that indelicacy which only too often disfigures popular Hindoo songs. The plot is very simple, and the dramatic incidents fairly well managed. বসন্ত-উৎসব সম্বন্ধে অন্যত্র বলা হয়, And we are of opinion that its production is a marked indication of a cultivated mind and refined taste rarely to be met with in the ordinary run of Bengali Operas.[১৩] তাছাড়া ক্যালকাটা রিভিউ (জানুয়ারি ১৮৮১) এবং বেঙ্গলি পত্রিকায়ও সপ্রশংস উল্লেখ আছে বসন্ত-উৎসব সম্পর্কে। নববিভাকর পত্রিকার মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য: 'আজকাল বঙ্গভাষায় বিশুদ্ধভাবপূর্ণ গীতিনাট্য অতি বিরল। রাধাকৃষ্ণের প্রেম মানভঞ্জন ইত্যাদি পুরাতন গল্প লইয়া যেসকল গীতিনাট্য রচিত হইয়াছে তাহাতে বঙ্গবাসীদের রুচি যে অত্যন্ত দূষিত হইয়া পড়িয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। বসন্ত-উৎসব এরূপ সুরুচিনিন্দিত গীতিনাট্য নহে। ইহার কবিতাগুলি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ ভাবে পরিপূর্ণ। সখীদের ফুল তোলা, লীলার নৈরাশ্য, শোভার ভালবাসা, উদাসিনীর মন্ত্রতন্ত্র অতি সুচারুরূপে চিত্রিত হইয়াছে। আমরা এই সুন্দর গীতিনাট্যখানির উৎকৃষ্ট অভিনয় দেখিতে অপেক্ষা করিতেছি।'

বসন্ত-উৎসব গ্রন্থের উপহার-পত্রটি এইরূপ:

ভাই বিহঙ্গিনি,
সখি লো জনম ধরে ভাল যে বেসেছি তোরে,
নে লো তার নিদর্শন—এই উপহার,
হৃদয়ের আদরিণি—বিহগি আমার।

১২ ভারতী, কার্তিক ১২৮৬, সংখ্যাশেষের বিজ্ঞাপন দ্র।

১৩ Brahamo Public Opinions, 23 Nov. 1879; ভারতী, পৌষ ১২৮৬, সংখ্যাশেষের বিজ্ঞাপন দ্র।

এই সম্বোধিত মহিলা হলেন স্বর্ণকুমারীর এক পাতান সখী; এটর্নীকবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর পত্নী শরৎকুমারী লেখিকার নিকট এই নামে পরিচিত ছিলেন।[১৪]

গ্রন্থের ক্রোড়পত্রে বসন্ত-উৎসবকে বলা হয়েছে 'গীতিনাট্য'। কবিতা ও গান (১৩০২) নামক সংকলন গ্রন্থের শেষে লেখিকার রচনাবলীর যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে বসন্ত-উৎসব সম্পর্কে বলা হয়েছে 'কবিতা ও গানে নাটক'। বসন্ত-উৎসব অপেরাধর্মী, গানই হল এই অপেরার সর্বস্ব।[১৫] বস্তুত এই গীতিনাট্যের কাব্যগুণ এবং সংগীতের ঐশ্বর্য সকল সমালোচকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। পৃথিবী (১২৮৯) গ্রন্থের শেষে বসন্ত-উৎসবের যে বিজ্ঞাপন আছে তার একস্থানে বলা হয়েছে, **As we read it, its morning freshness and lyrical sweetness steal upon us, and we feel as if we were in a 'bubble of visionary happiness', unruffled by the tempests blowing without.** ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ পত্রিকায় বিশেষভাবে সুন্দর ক্ষুদ্র প্রারম্ভিক গীতি (**pretty little songs with which the work opens**— আজু কোয়েলা কুহু বোলে), লীলার নৈরাশ্যের গান, কবিতা সংগীত রতি মদন বসন্ত প্রভৃতির সমবেত সংগীত ইত্যাদির প্রশংসা করা হয়। প্রসঙ্গত বলা যায় যে প্রারম্ভিক গীতিটির মত দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে কুমার ও শোভার গান— সজনি নেহারো বসন্ত সাজে— ব্রজবুলিতে রচিত। ঊষা ও ইন্দু নাম্নী সখীদ্বয়ের গানের মধ্যে কথ্যভাষার লৌকিক ভঙ্গিও কখনো কখনো ধরা পড়েছে। 'চন্দ্রশূন্য তারাশূন্য' প্রভৃতি গান একদা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল, স্বর্ণকুমারীর একাধিক উপন্যাসে গানটি ব্যবহৃত হয়েছে; বাগেশ্রীতে গেয় এই গানটি সম্বন্ধে সরলা দেবী তাঁর জীবনের ঝরাপাতা গ্রন্থে যা বলেছেন তা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে।

লীলাবতী ও শোভাময়ীর প্রণয়ী যথাক্রমে কিরণ ও কুমার; নাটকের প্রথমেই আভাস দেওয়া হয়েছে তাদের 'বিয়ে হবে কাল' এবং 'বসন্ত-উৎসব কালি'। পুষ্পশোভিত সুন্দর উপবন যথার্থভাবে বসন্ত-উৎসবের পরিপ্রেক্ষিত রচনা করেছে এবং এরই বাতাবরণে তাদের প্রণয় বিকশিত হয়ে উঠেছে; এমনকি ঊষা ইন্দু প্রভৃতি সহচরী যে-পুষ্প চয়ন করেছিল তার দ্বারাই আভরণ রচিত। কিন্তু দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে একটি সংকটের আবির্ভাব হয়েছে; লীলা বলেছে, 'আমি যারে ভালবাসি সে নহে আমার'। এইখানে রবীন্দ্রনাথের মায়ার খেলার ঘটনাংশের সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। যাহোক শোভাময়ী লীলাবতীকে নিয়ে এসেছে মায়াদেবীর মন্দিরে যোগিনী উদাসিনীর নিকট এবং উদাসিনীর সহায়তায় এই সংকটের

১৪ দ্র জীবনের ঝরাপাতা, পৃ ৯৩।

১৫ প্রমথনাথ রায়, অপেরার লক্ষণ, ভারতী, শ্রাবণ ১৩১৭, পৃ ৩৪৪।

অবসান হয়েছে পরিণামে। এই শুভ-পরিণামী গীতিনাট্যের মধ্যে দেখা যায়, মায়াদেবীর মন্দিরে লীলা যখন সুপ্তিমগ্ন তখন দেবতার আশীর্বাদ বহন করে এনেছে রতি মদন বসন্ত কবিতা সংগীত প্রভৃতি পাত্রপাত্রী। পরিবেশ নির্মাণে লেখিকা অগ্রজের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যের (১৮৭৫) দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন; প্রসঙ্গত মায়ার খেলার (১২৯৫) মায়াকুমারীগণের কিংবা বাল্মীকিপ্রতিভার বনদেবীগণের কথাও স্মরণীয়। নায়ক-নায়িকার মিলন-বিরহের ব্যাপারে দেবদেবীর হস্তক্ষেপের প্রসঙ্গে উত্তরচরিত অভিজ্ঞানশকুন্তল প্রভৃতি প্রাচীন নাটক ও মধুসূদনের পদ্মাবতী নাটকের কথা মনে পড়া স্বাভাবিক। শেক্সপীয়রের দি টেম্পেস্ট নাটকের মধ্যে (Act IV, Scene I) বিবাহকে কেন্দ্র করে একটি ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র গীতিনাট্যের অবতারণা করা হয়েছিল, বসন্ত-উৎসবের মধ্যে সে আদর্শও অনুসৃত হতে পারে।

প্রসঙ্গক্রমে সরলা দেবী একস্থানে বলেছেন যে বম্বে প্রেসিডেন্সির সিভিলিয়ানদের এক Fancy-dress Ball-এ মাতুল সত্যেন্দ্রনাথ ও জননী স্বর্ণকুমারীর সঙ্গে তিনি যোগদান করেন। 'মনে পড়ে মা সন্ন্যাসিনীর সাজে গিয়েছিলেন, আমি সরস্বতীর। মাকে এই সন্ন্যাসিনীর বেশ খুব শোভা পেত। বসন্ত-উৎসবের অভিনয়েও তিনি সন্ন্যাসিনীর ভূমিকা নিয়েছিলেন। নতুন মামী হয়েছিলেন উপেক্ষিতা নায়িকা—যতদূর মনে পড়ে সন্ন্যাসিনীর বরে তিনি নায়কের প্রেমে পুনঃপ্রতিষ্ঠিতা হয়েছিলেন।'[১৬] বসন্ত-উৎসব নাটকের অভিনয়ে লেখিকা নিজে যে যুক্ত ছিলেন তার প্রমাণ এবং স্বর্ণকুমারী ও কাদম্বরী দেবীর অভিনয়-ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় এইসকল তথ্য থেকে। ইন্দিরা দেবীচৌধুরানীও এই গীতিনাট্যের অভিনয় সম্পর্কে যা বলেছেন তার কিয়দংশ উদ্ধৃত হল: 'স্বর্ণপিসিমার গীতিনাট্য "বসন্ত-উৎসবে"র (প্রথম প্রকাশ ১৮৭৯) সঙ্গেও আমাদের ছেলেবেলার স্মৃতি জড়িত। তার গোড়ার দিকের গান "ধর্ লো ধর্ লো ডালা এই নে কামিনী ফুল" এখনও কানে বাজে। অন্য গানগুলিও কতক কতক মনে আছে—

লীলা। চন্দ্রশূন্য তারাশূন্য মেঘান্ধ নিশীথ ছেয়ে
দুর্ভেদ্য অন্ধকারে হৃদয় রয়েছে চেয়ে।…

ঢালা বাগেশ্রী রাগিণীতে এই শোকসংগীত নতুনকাকিমা বসে গাইছেন, তাঁর বড় বড় চোখ আর দীর্ঘ ঘন কেশ ছিল বলে তাঁকে বেশ মানিয়েছিল।'[১৭]

॥২॥ 'বিবাহ-উৎসব' গীতিনাট্যটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৯২ সালের মে মাসে। গীতিবিতানের একস্থানে এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'প্রাপ্ত পুস্তিকার মলাট ও আখ্যাপত্র

১৬ জীবনের ঝরাপাতা, পৃ ১০২।
১৭ বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, পৃ ১৯০।

নাই ; প্রকাশকাল প্রভৃতি জানা যায় না।'[১৮] উপরে যে প্রকাশকালের কথা আমরা উল্লেখ করেছি তা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার অন্তর্গত স্বর্ণকুমারী দেবী-সম্পর্কিত গ্রন্থ থেকে গৃহীত। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির ১৯০৯০ সালের ২০ জানুয়ারি তারিখের মোহরযুক্ত গ্রন্থটি আমরা দেখেছি, সেই পুস্তকের 'মলাট ও আখ্যাপত্র' এখানে দেওয়া হল : 'বিবাহ-উৎসব। / (গীতি-নাট্য)। / শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। / কাশিয়াবাগান। /শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। / কাশিয়াবাগান। / কলিকাতা, / বহুবাজার, শ্রীনাথ দাসের লেন, ১৭ নং ভবনে, / বি, কে, দাস এবং কোম্পানির যন্ত্রে,/ শ্রীঅমৃতলাল ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত। / মূল্য। চারি আনা।'

সরলা দেবীর মতে বিবাহ-উৎসব গীতিনাট্যটি হিরণ্ময়ী দেবীর বিবাহ-উপলক্ষে রচিত হয়।[১৯] এই বিবাহ হয় 'রবীন্দ্রনাথের বিবাহ (২৪ অগ্রহায়ণ ১২৯০) হইতে ৩ মাস পরে'।[২০] গীতবিতানের গ্রন্থপরিচয়ে বিবাহ-উৎসব সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার কিয়দংশ উদ্ধারযোগ্য, "১২৯১ সালের ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যা 'ভারতী'তে এই গীতিনাট্যের প্রথম দৃশ্য স্বরলিপি-সহ প্রকাশিত হয়। জানা যায় 'কোনো পারিবারিক বিবাহ-উৎসবোপলক্ষে' ইহার যৌথ রচনা। মোট ৭টি দৃশ্য, ৪৫টি গান ; তন্মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অক্ষয় চৌধুরী ও স্বর্ণকুমারীদেবীর কতকগুলি রচনা থাকিলেও রবীন্দ্রনাথের রচনাই ২৮টি। সর্বশেষে সুর-তালের-উল্লেখ-হীন 'যে তোরে বাসে রে ভালো' ইত্যাদি ছত্র, শ্রীমতী ইন্দিরাদেবী বলেন, আবৃত্তিবিষয় মাত্র ; 'শিশু' কাব্যে পাওয়া যাইবে। সবগুলি গান গীতবিতানে সংকলিত— ১৮টি বর্তমান গুচ্ছে,[২১] আর 'নাচ্ শ্যামা তালে তালে' 'রিম্ ঝিম্ ঘন ঘন রে' 'বুঝি বেলা বহে যায়' 'মনে রয়ে গেল মনের কথা' 'তারে দেখাতে পারি নে কেন' ইত্যাদি ১০টি গান নানা সূত্রে গীতবিতানের অন্য নানা স্থলে। দ্বিতীয় দৃশ্যের অন্তর্গত ও 'ভারতী'র ১৩০০ বৈশাখে মুদ্রিত—'সাধ করে কেন সখা' ও 'তুমি আছ কোন্ পাড়া' যে রবীন্দ্রনাথেরই রচনা ইহা জানাইয়াছেন সরলাদেবী (ভারতী: ফাল্গুন ১৩০১, পৃ ৬৮১-৮২) তাঁহার 'বাঙ্গলার হাসির গান ও তাহার কবি' প্রবন্ধে।"[২২] ইন্দিরা দেবী অন্য একটি বিবাহ-উপলক্ষে গীতিনাট্যটির অভিনয়ের কথা উল্লেখ করেছেন।[২৩] তিনি বলেন, 'দিদুর মা সুশীলাবৌঠান নায়ক সেজেছিলেন। তিনি গান এবং অভিনয় দুইই সুন্দর করতেন। তাঁর একটি গান "ও

১৮ গ্রন্থপরিচয়, গীতবিতান (অখণ্ড), পৃ ৯৭৬।

১৯ জীবনের ঝরাপাতা, পৃ ৫৩।

২০ সমকালীন, ১।১৩৬৪।২০-২১ ; দ্র গীতবিতান, পৃ ৯৭৬, পা. টী.।

২১ গীতবিতানের ৭৭৫ থেকে ৭৮০ পৃষ্ঠার মধ্যবর্তী ২১-২৭ ও ২৯-৩৯ সংখ্যক, মোট ১৮টি গান।

২২ গীতবিতান, পৃ ৯৭৬।

২৩ বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, পৃ ১৯৪-৯৫।

কেন চুরি করে যায়" তখন খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। নায়িকাকে দেখে মোহিত হয়ে তিনি গাইতেন, "ওই জানালার পাশে বসে আছে করতলে রাখি মাথা"।[২৪] সে গানটির একান্ত পর্যন্ত পৌঁছবার সৌভাগ্য হয়েছে। তার উত্তরে সরলাদিদি সখা সেজে তাঁর মোহভঙ্গের উদ্দেশ্যে যে গান করতেন "তুমি আছ কোন্ পাড়া" সেটিও প্রাথমিক হাসির গানের মধ্যে স্থান পাবার যোগ্য' ইত্যাদি।

বিবাহ-উৎসবের আখ্যানবস্তু তেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়। প্রথমদৃশ্যে নায়িকাকে দেখেছেন কবি উপবনের মধ্যে; দ্বিতীয় দৃশ্যে তাঁর চিত্তানুরাগের পরিচয় সুস্পষ্ট। তারপর মান-অভিমানের মধ্য দিয়ে নায়ক-নায়িকার পরিণয়ে গীতিনাট্য সমাপ্তি লাভ করেছে। বিবাহ-উৎসবের প্রথম দৃশ্যটি বসন্ত-উৎসবের প্রথম অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কের অনুরূপ। কবির সখার গানগুলিতে কৌতুকের স্পর্শ আছে। বিশেষত পঞ্চম দৃশ্যের মধ্যে 'বিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষে'র যে গানগুলি পাওয়া যায় তার একটি চমৎকার ইতিহাস আছে। ইন্দিরা দেবী বলেছেন, 'মানময়ীর আগে কি পরে ঠিক মনে নেই, রবিকাকা ও জ্যোতিকাকা দুই ভাইয়ে মিলে অভিজাত বন্ধুবর্গের চিত্তবিনোদনের জন্য বিবাহঘটিত একটি ক্ষুদ্র গীতিনাটিকা অভিনয় করেছিলেন। তাতে তাঁরা দুজনে বিবাহের পক্ষ ও বিপক্ষ অবলম্বন করে গান করেছিলেন।'[২৫] বিবাহের সপক্ষে রবীন্দ্রনাথ এবং বিপক্ষে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে গান করেছিলেন তার কয়েকটি নমুনা ইন্দিরা দেবী দিয়েছেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে গানগুলি বিবাহ-উৎসবের পঞ্চম দৃশ্যে দেওয়া হয়েছে। নায়িকার সঙ্গে কবির বিবাহ স্থিরীকৃত, তাই কবি বিবাহের সপক্ষে গান ধরেছেন, আর তাঁর সখা বিপক্ষতাচরণ করেছেন গানেরই মাধ্যমে।

॥৩॥ ১৩১১ সালের ভারতী পত্রিকার বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যায় 'উর্বশী ও তুকারাম' নামক যে কাব্যনাট্যটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় তা-ই পরবর্তীকালে 'দেবকৌতুক' শিরোনামে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত (১৯০৬) হয়েছিল। দেবকৌতুকের প্রথম সর্গের প্রথম দৃশ্যটি প্রকাশিত হয় ১৩০৯ সালের বৈশাখ সংখ্যার ভারতীতে; তখন তার নাম ছিল 'প্রস্তাবনা' এবং নাটকের নাম 'দেবকৌতুক'। কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে নাটকটির অবশিষ্টাংশ তখন আর প্রকাশিত হয়নি, তারপর ১৩১১ সালের বৈশাখ থেকে 'উর্বশী ও তুকারাম' প্রকাশিত হতে থাকে। গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে লেখিকা পূর্বোক্ত দেবকৌতুক নামটি এবং প্রস্তাবনা-অংশটি গ্রহণ করেন। সমগ্রভাবে বিচারকালে এই নামটির সার্থকতা উপলব্ধ হয়।

২৪ পাঠান্তর: ওই জানালার কাছে। দ্র গীতবিতান, পৃ ৭৭৫।

২৫ বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩, পৃ ১৯১।

দেবকৌতুক নাটকটি চারটি 'সর্গে' বিভক্ত এবং প্রত্যেক সর্গে কয়েকটি 'দৃশ্য' আছে ; কিন্তু ভারতীতে প্রকাশকালে 'সর্গের' পরিবর্তে 'অঙ্ক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল বলে সর্গকে অঙ্কের প্রতিশব্দরূপে গ্রহণ করা প্রয়োজন। গ্রন্থের উপহার-পত্রে বলা হয়েছে —

বিবাহ-কৌতুক।

স্বপন-রতনে গাঁথা অপূর্ব যৌতুক !

নন্দনকুসুমহার আশীর্বাদ দেবতার, চিরফুল্ল গন্ধাকুল অনাদি কৌতুক।

পবিত্র উৎসব-রাতি, লহ দোঁহে কণ্ঠ পাতি, এ বন্ধনে বসুমতী সুধন্য হউক।

বেশ বোঝা যায় কোনো একটি বিবাহকে কেন্দ্র করে গ্রন্থের উৎসর্গপত্রটি রচিত ; নাটকের মধ্যেও বিবাহ-ঘটিত জটিল আখ্যান এবং তার শুভময় মধুর সমাপনের ভাবটি পরিবেশিত। প্রসঙ্গত বলা যায় স্বর্ণকুমারীর অধিকাংশ নাটক-প্রহসনের বিষয় হল বিবাহ-প্রসঙ্গ এবং কোনো-না-কোনো পারিবারিক বা সামাজিক সুহৃদের বিবাহ-উৎসবকে উদ্দেশ্য করে সেগুলি উৎসর্গীকৃত।

প্রস্তাবনার নারদোক্তিতেই নাট্যকথার বীজ বপন করা হয়েছে। নারদ বলেছেন, 'ইন্দ্রাণীর সভাতলে নন্দনকাননে / সমাগত দেবীগণ নিমন্ত্রণে আজি / করিতে মন্ত্রণা সবে, ভব-নাট্যালয়ে / কি নাটক অভিনব হবে অভিনীত / এ নবীন যুগে'। বিদ্যাদায়িনী সরস্বতী স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে দেবতার কল্পনাবিলাসেই সাধারণত অসহায় নরনারী বলিপ্রদত্ত হয়ে থাকে, তাই যদি নবনাট্যাভিনয়ের প্রয়োজন হয়েই থাকে তবে তাতে দেবদেবীরই প্রধান অংশ গ্রহণ করা উচিত। এই সভায় কমলা ও রতির মধ্যে কে শ্রেষ্ঠতর সে বিতর্ক উপস্থিত হয় ; রতির অপমানিত হৃদয় থেকে জ্বালাময়ী প্রশ্ন উত্থিত হয়েছে :

ধরণী কি চলিতেছে ধন-ধান্যে শুধু

প্রেম কি কিছুই নহে ?[২৬]

'শ্রী সৌন্দর্য শোভা ধীরতা শীলতা লজ্জা বিনয় নম্রতা' এবং রূপের দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়েছেন দুই স্বর্গীয় রমণী এবং পরিণামে 'দেবের বিরোধ-ফল' ভোগ করল ধরণী। মঙ্গলকাব্যের মত এভাবে দেবখণ্ড থেকে নরখণ্ডে অবতরণ করেছে কাহিনী ও পাত্রপাত্রী। দেবদেবীর আত্মকলহ বিভিন্ন পুরাণ এবং রামায়ণ-মহাভারত-ইলিয়াড-ওডিসিতে আছে ; নল-দময়ন্তী বা শ্রীবৎস-চিন্তার উপাখ্যানে দেবতার হস্তক্ষেপ লক্ষিত হয়, কিংবা অন্যত্র দেখা যায় আফ্রো-দিতি-পল্লাস-হেরার সৌন্দর্যবিচারে ঈর্ষাদেবী এরিসের আপেল মানুষের ভাগ্যবিপর্যয় বহন

২৬ রবীন্দ্রনাথের বিদায়-অভিশাপ (২৬ শ্রাবণ ১৩০০) কাব্যনাট্যের অন্তর্গত দেবযানীর দুটি উক্তি স্মরণীয় : 'শুধু উপকার ! / শোভা নহে, প্রীতি নহে, কিছু নহে আর ?' এবং 'বিদ্যাই দুর্লভ শুধু, প্রেম কি হেথায় / এতই সুলভ ?'

করে এনেছে। দেবকৌতুকের পূর্বে প্রকাশিত মধুসূদনের পদ্মাবতী নাটকের (১২৬৭) মধ্যেও একই রীতির অনুবর্তন লক্ষিত হয়।

অরুণাবতীর শ্রেষ্ঠী সদাশিবের প্রথমা কন্যা উর্বশী সম্বন্ধে তুকারাম বলেছে, 'রতি দেবী যেন / সাগরললনা বেশে বিরাজেন হেথা / দশ দিক করি পূর্ণ রূপের জ্যোতিতে'। (তৃতীয় সর্গ, তৃতীয় দৃশ্য)। সদাশিবের অপর কন্যা মেনকা যেন 'শাপভ্রষ্টা স্বর্গবালা মর্ত্যে আবির্ভূ'তা'। (তৃতীয় সর্গ, প্রথম দৃশ্য)। এবং ঘটনাস্থলের দেবী অরুণাবতী সম্বন্ধে মদন বলেছে, 'সাক্ষীরূপা দিগ্‌বালা শচীর প্রেরিতা, / শিলারূপে আবির্ভাব রতি-লক্ষ্মী দ্বন্দ্বে'। (শেষ দৃশ্য)। এভাবে নাটকের মধ্যে নানাস্থানে দেবীদ্বয়ের দ্বন্দ্ব-কথাটি আভাসে ইঙ্গিত ব্যক্ত হয়েছে এবং ঘটনাস্রোত যে রতি ও লক্ষ্মীর দ্বারা বিভিন্ন উপায়ে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে তার কথাও জানা যায়; এমনকি দ্বিতীয় সর্গের প্রথম দৃশ্যে মেনকার একটি সংলাপ থেকে বোঝা যায় যে উর্বশী ও মেনকা এই দুই সহোদরা যথাক্রমে রতি ও লক্ষ্মীর প্রতিভূ। দেবতাগণের এই পারস্পরিক কলহের পরিণামে 'বিজাপুর সুলতানের মন্ত্রী ও সামন্তরাজা' বীরযোদ্ধা সাহাজি বরণ করেন মেনকাকে এবং ঘটনাচক্রে সাহাজির খ্যাতিতে মুগ্ধ হওয়া সত্বেও উর্বশী ভ্রমবশত সাহাজির শরীররক্ষক তুকারামের প্রণয়াবদ্ধ হন। পরিশেষে লক্ষ্মী এই দ্বন্দ্বে জয়লাভ করলেও রতি এবং মদনকে সম্মান প্রদর্শন করেছেন, 'লক্ষ্মী নিজে জয়মাল্যে / ভূষিলা দোঁহারে স্বীয় পরাভব মানি'। পুরুষের হৃদয় উর্বশী জয় করতে চেয়েছিল রূপের মাধ্যমে, কিন্তু অবশেষে সে স্বীকার করেছে,

> আজি মোর এ সৌন্দর্য বৃথা মনে হয়,
> ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্র আমি আজি বুঝিয়াছি।
> বিফল মহিমাশূন্য এ রূপ-লাবণ্য। (তৃতীয় সর্গ, প্রথম দৃশ্য)

রূপ অপেক্ষা গুণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের মধ্যেই নাটক সমাপ্তি লাভ করেছে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার (১২৯৯) পরিকল্পনা-কথা স্মরণীয়। নাটকের 'উপসংহারে' স্বর্ণকুমারী বলেছেন,

> স্বর্গে করে দেবীগণ বিবাদ-কৌতুক,
> ধরণী লভিল রঙ্গে যমক-যৌতুক।
> শিবাজী কানুজী দোঁহে ভারতের বীর,
> পুত্ররূপে আবির্ভাব মেনা উর্বশীর।
> ইঙ্গিতে কহিয়া কথা কবি ক্ষান্ত হোল,
> অধিক জানিতে চাহ ইতিহাস খোল।

॥৪॥ 'রাজকন্যা' নামক নাটকটি (১৯১৩) ভারতী পত্রিকার ১৩১৮ সালের বৈশাখ থেকে আশ্বিন সংখ্যার মধ্যে প্রথম প্রকাশিত হয়। নাটকটির উপহার-পত্রে বলা হয়েছে,

এসো এসো ওগো প্রসাদকুমার, এসো কল্যাণি, রূপসী বালা,
শোনাব একটি করুণ কাহিনী—ছুটে এসো কাছে রাখিয়ে খেলা!
তারো নাম ছিল কল্যাণী দেবী—রাজার মেয়ে সে,—গরবী নয়,
রূপ তোর মত অতটা না হোক, গুণে কিন্তু সেরা বলিতে হয়।
বড় হবে যবে ছুটি ভাই বোনে এমনি সত্যে রহিও ধ্রুব,
সার্থক হোক নাম তোমাদের—এই দিদিমার আশিস শুভ।

সমগ্র নাট্যকাহিনীর কথা মনে রাখলে উপহার-পত্রটিকে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয় কারণ রাজকন্যা নাটকের নায়িকার নামও কল্যাণী এবং ধ্রুবকুমার নামক যে চরিত্রটি দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছে সে-ই নিরুদ্দিষ্ট রাজপুত্র এবং রাজকন্যার ভ্রাতা।

আখ্যাপত্রে রাজকন্যা নাটকের পরিচয় দেওয়া হয়েছে 'নাট্যোপন্যাস'রূপে, এর মধ্যে রূপকথার বা উপকথার প্রভাব অধিক বলে লেখিকা নাট্যের সঙ্গে উপন্যাস শব্দটিকে সংযুক্ত করে দিয়েছিলেন। 'উপন্যাস' শব্দটিকে তিনি নভেলের প্রতিশব্দরূপে সর্বদা প্রয়োগ করেননি; কোথাও কোথাও নভেলা, রূপকথা বা আখ্যান অর্থেও শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে। কণ্টরের অনুসরণে ভূদেব মুখোপাধ্যায় 'রোমান্স' শব্দটির পরিভাষা হিসাবে 'উপন্যাস' শব্দটি গ্রহণ করেন, এখানে সে অভিধাও স্বীকৃত হতে পারে। যাহোক, বর্তমান নাটকে রূপকথার ছায়াপাত ঘটেছে। প্রথম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে মাতঙ্গিনীর একটি সংলাপে আছে—'মহারানি, ভয়ে কব না নির্ভয়ে কব?' এই জাতীয় সংলাপ সাধারণত রূপকথাতে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া রূপকথার সুয়োরানী দুয়োরানীর পারস্পরিক সংঘর্ষের পরিণামে মৃত সপত্নীর অসহায় সন্তানের প্রতি সর্বপ্রকারের নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন এই নাট্যকাহিনীর প্রধান উপজীব্য; এমনকি সপত্নী-পুত্রকে হত্যার উদ্যোগ কিংবা নির্বাসনদান ও সর্বশেষে দৈবের সহায়তায় তার উদ্ধারলাভ ও প্রত্যাবর্তন প্রভৃতি রূপকথার উপযোগী ঘটনা এ নাটককে সমৃদ্ধি দান করেছে। রূপকথার এইরূপ অতিশয়িত প্রভাববশত ঘটনাগ্রন্থনে ও চরিত্রচিত্রণে তিনি সুবিচার করতে পারেননি, তাই গতি ও নাট্যিক চরিত্রগুলির অন্তর্দ্বন্দ্ব তেমন ফুটে উঠেনি। বহুকথিত ন্যায়-অন্যায়ের দ্বন্দ্বই বর্তমান নাটকের আখ্যানগুলিকে একসূত্রে গ্রথিত করেছে। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে কল্যাণী ন্যায়ের সমর্থন ও প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন উৎসর্গের ব্রত গ্রহণ করেছেন এবং এই কর্মে তাঁর সহায়তা করেছেন সখী হাসি, নিরুদ্দিষ্ট যুবরাজ বা ধ্রুবকুমার প্রভৃতি; প্রতিপক্ষরূপে মহারানী, মহারাজ, মাতঙ্গিনী, সেনানায়ক প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। কল্যাণী নিপীড়িত প্রকৃতিপুঞ্জকে আশ্রয় দান করেছেন আপনার স্নেহচ্ছায়ায়, অপরদিকে রাজশ্যালকের চক্রান্তে রাজ্যে প্রজাদ্রোহ দেখা দিয়েছে।

এই বিদ্রোহ দমনকালে ধ্রুবকুমার হলেন আহত এবং ষড়যন্ত্রের কারণে বন্দিনী রাজকুমারী কল্যাণীকে বলিদান করা হল চামুণ্ডামন্দিরে। সেই শোচনীয় বীভৎসতার মধ্যে মহারাজ মহারানী মাতঙ্গিনী প্রভৃতি সকলের হৃদয় পরিবর্তিত হয়েছে। এখানে রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটকের পরিণাম-সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

মাতঙ্গিনী চরিত্রটির সঙ্গে রামায়ণের মন্থরার সাদৃশ্য আছে। কার্পণ্য ও নিষ্ঠুরতার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্মীর পরীক্ষার (১৩০৪) ক্ষীরোরই সমগোত্রীয় সে; প্রসঙ্গত উল্লেখ-যোগ্য যে রবীন্দ্রনাথের উক্ত রচনায় রানী কল্যাণী নামক যে চরিত্রটি আছে তার সঙ্গে রাজকন্যা নাটকের রাজকুমারী কল্যাণীর চরিত্রের সুগভীর সাধর্ম্য লক্ষিত হয়। বিসর্জন নাটকের (১৮৯১) গুণবতীর আদর্শে রাজকন্যা নাটকের মহারানীর চরিত্রটি পরিকল্পিত বলে মনে হয়; গুণবতীর মত তিনিও বলেছেন, 'মা চামুণ্ডে, আমি তোর চরণে কি অপরাধ করেছি, এত দিয়েও তুই সন্তান দিলিনে। এহেন ঐশ্বর্যসম্পদ সব যে বৃথা ভবানি! উঃ, আমি যে পাগল হয়ে যাচ্ছি। শত ছাগ, শত মহিষ ও চরণে বলি দেব—নরবলি নরবলি—ঐ কুমারীর রক্তেই তোমার রাঙা চরণ রাঙিয়ে তুলব।' (প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য)

প্রসঙ্গত বলা যায় প্রথম অঙ্কের প্রথম ও চতুর্থ দৃশ্যের 'সাজাব তোমারে আজি মোরা যতনে' গানটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'তোমায় সাজাব যতনে কুসুমে রতনে' গানটির সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

॥৫॥ রাজকন্যার আলোচনা প্রসঙ্গে দিব্য-কমল (এপ্রিল ১৯৩০) নাটকটির কথা স্বভাবত মনে পড়ে কারণ রাজকন্যার আখ্যানবস্তুকেই তিনি উক্ত নাটকের মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে পরিবেশন করেছেন। দিব্য-কমলের মধ্যে ঘটনার পরিবর্তন বা পরিবর্জন-পরিবর্ধন প্রভৃতি খুবই সামান্য। প্রারম্ভিক পর্যায়ের প্রস্তাবনা-অংশটি নব সংযোজন, এখানে সংস্কৃত নাট্যাদর্শ অনুসরণ করে লেখিকা 'রঙ্গমঞ্চে নটনটীর প্রবেশ' এবং তাদের ভারতী-বন্দনার কথা উল্লেখ করেছেন; এমনকি প্রস্তাবনার শেষাংশে দেখা যায় এই ভারতী-বন্দনায় দেবীগণও অংশ গ্রহণ করেছেন। প্রথম অঙ্কের শেষ বা চতুর্থ দৃশ্যটির পরিকল্পনা কেবল অভিনব নয়, বৈচিত্র্যপূর্ণও বটে। পাঞ্জাবী কাশ্মীরী সিন্ধী বাঙালি মহারাষ্ট্রী গুজরাটী পার্শী মাদ্রাজী কর্ণাটী প্রভৃতি নয় শ্রেণীর লোক মিলিত হয়ে রাজকন্যা 'জননী কল্যাণী'র বন্দনা করেছে। নাটকের উপসংহার থেকে জানা যায় ধ্রুবকুমার আরোগ্যলাভ করেছেন। তাঁর শেষ উক্তির মধ্যে নাটকের উদ্দেশ্যমূলকতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, 'তাই হোক—তাই হোক। যে উদ্দেশ্যে তিনি প্রাণপাত করেছেন সে উদ্দেশ্য তাঁর সফল হোক। এ রাজ্য হতে মিথ্যা ধর্ম, আচারের নামে পাপাচার, দেবপূজার উদ্দেশ্যে প্রাণীহত্যা, নরবলি দূর হোক। পুণ্যকল্যাণে শান্তি-শমতায় মর্ত্যলোকে নবযুগ অভ্যুদিত হোক। হে শুভ শক্তিদাতা জ্ঞানস্বরূপ বিধাতাপুরুষ, তোমার পুণ্যশক্তিতে আমাদিগকে জ্ঞানধর্মে প্রবুদ্ধ কর, শুভকর্মে নিযুক্ত কর।'

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, 'স্বর্ণকুমারীর "দিব্য-কমল" জর্মান ভাষায় Princess Kalyani নামে প্রকাশিত হইয়াছে।'[২৭]

১৬। একাঙ্কিকা নিবেদিতা (১৯১৭) 'মহারানী শ্রীমতী সুনীতিদেবীকে' উপহার দেওয়া হয়। উৎসর্গপত্রে বলা হয়েছে,

হাসি অশ্রু দিয়ে গাঁথা এই মালাগাছি
তোমাতে পরাতে হের সখি, আনিয়াছি।
এ নহে রতনগুচ্ছ হীরামুক্তারাশি—
বচন রচন তুচ্ছ, তবু ধর হাসি।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা কুচবিহারের মহারানী সুনীতিদেবীর দুহিতার সঙ্গে স্বর্ণকুমারীর পুত্র জ্যোৎস্নানাথ ঘোষালের বিবাহ হয়, সেই সূত্রে এই উভয় মহিলা প্রীতিসম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। 'মহারানী সুনীতিদেবীর প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, তাঁরই গল্প শুনবার আগ্রহের ফলে রবীন্দ্রনাথের অন্তত তিনটি প্রধান ছোটগল্প রচিত হয়েছিল।'[২৮] সুনীতিদেবীর মর্মস্পর্শী কথকতা একদা লোকবিশ্রুত ছিল। রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে আমন্ত্রণ জানিয়ে মহারানীকে লিখেছিলেন, 'একবার আসুন না—ছেলেদের একবার কথকতা শুনিয়ে যান। আমি ওদের মহাভারত শোনাই, ওরা এত খুসি হয়। আপনার কথকতা শোনবার ইচ্ছা কতদিন থেকে আমার মনে আছে—নিশ্চয় একসময় ইচ্ছা সফল হবে।'[২৯] নিবেদিতা নাটকে সুনীতিদেবীর কথকতার প্রশংসা আছে প্রথম দৃশ্যে তরঙ্গিণী ও মতিমালার কথোপকথনের মধ্যে। তরঙ্গিণী বলেছে, 'মহারানী সুনীতিদেবীর কথকতা কি শুনেছিস ভাই? লেখিকা ত অনেক আছেন—কিন্তু আর ত কাউকে অমন বলতে শুনিনি।' অন্যত্র এই উভয় মহিলার আর একটি কথোপকথন থেকে স্বর্ণকুমারী ও রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। কবিযশঃপ্রার্থী মতিমালাকে তরঙ্গিণী বলেছে, 'ইনি যে আমাদের রবিঠাকুর। এমনতর খাতা লেখার সৃষ্টি আর কোথাও দেখিনি। ওর ঘরময় দেখবি যেখানে সেখানে কেবলি খাতা ছড়ান।

মতি। আজকাল মেয়ে-লেখকের অভাব আছে নাকি যে আমাকে রবিঠাকুর বলছিস? বরঞ্চ বলতে পারতিস তাঁর—

তর। অভাব নেই বলেই ত ভয় হয় কার নাম ছেড়ে কার নাম করব, আর শেষে সাধ্বীবৃন্দ কানায় ঘুষোয় সেকথা শুনে আমাকে জবাবদিহির দায়ে ফেলবেন?'

২৭ সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, ২৮শ, পৃ ১৭।

২৮ দেশ—সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৭১, পৃ ২০।

২৯ শান্তিনিকেতন, ১ ভাদ্র ১৩২৩ তারিখের পত্র, বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত।

স্বর্ণকুমারীর পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হিরণ্ময়ী বিধবা-শিল্পাশ্রমের কথা বলা হয়েছে চতুর্থ দৃশ্যে কয়েকজন গরীব বিধবার কথোপকথনে :

দ্বিতীয়া। শুনেছি নাকি ভদ্রলোকের মেয়েরা বিধবাদের দুঃখ নিবারণ করবার জন্য একটা আশ্রম করেছেন, কোন উপায় না পাই সেইখানে যাব।

প্রথমা। হাঁা, শুনেছি বটে।

দ্বিতীয়া। সেখানে লেখাপড়া শিখব, শিল্প শিখব, শিখে আবার অন্যদেরও শেখাব।

প্রথমা। সে ত ভাই বেশ, নিজেরও উপায় হবে আর পরেরও উপকার করতে পারব। বিধবাদের পক্ষে সে ত খুব সুখের জীবন।

এই একই দৃশ্যে 'পাড়ার একজন বৈষ্ণবকন্যা ওরফে কীর্তনী দিদির' পরিচয় পাওয়া যায়। বহুপূর্বে ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরের মধ্যে যে বৈষ্ণবীর আগমন হত বর্তমান চরিত্রটিতে তার ছায়া পড়েছে। এককথায় বলা যায়, নিবেদিতা নাটক নয়, নাট্যচিত্র। নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাত অথবা তীব্র গতিবেগ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব এ নাটকের মধ্যে তেমন ফুটে উঠেনি, অন্তঃপুরিকাগণের জীবনচিত্রই এখানে প্রাধান্য লাভ করেছে। নাটকটি প্রায় পুরুষ-ভূমিকা বর্জিত—কেবলমাত্র বিবাহসভায় (ষষ্ঠ দৃশ্য) বর থাকলেও তার সংলাপ সর্বসাকুল্যে একটি এবং চরিত্রটিও একান্তভাবে গৌণশ্রেণীর।

নির্দোষের বিড়ম্বনা প্রদর্শনে স্বর্ণকুমারী ছিলেন সিদ্ধহস্ত, লজ্জাবতী গল্পের মধ্যে (ভারতী, ১২৯৮) তার প্রমাণ আমরা পূর্বে পেয়েছি এবং ঐ গল্পটিও নাটকাকারে একদা অভিনীত হয়েছিল। বর্তমান সামাজিক নাটকের শেষ দৃশ্যে নায়িকা সুমঙ্গলার শোচনীয় বিড়ম্বনা অনুভব করে 'সহসা জ্যোতির্মণ্ডলীর বিকাশ এবং তন্মধ্যে ধরণীদেবীর আবির্ভাব ও দৈববাণী', 'অন্তরীক্ষে পুষ্পবৃষ্টি এবং দিগ্‌বালাগণের প্রবেশ ও গান' প্রভৃতি রসাভাস সৃষ্টি করেছে। অবশ্য চরম আত্মনিবেদনের ভাবটি পরিস্ফুট করার জন্যই এরকম অলৌকিকতার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে। নাটকের প্রথমে নায়িকা সুমঙ্গলা বলেছিল, 'আমি সাজব ভাই মাটি, পৃথিবী। আর তোরা সবাই আমার বুকে ফুটে থাকবি। সত্যি বলছি দিদি, আমার বড় "মা" হতে ইচ্ছা করে! গরুটা যখন তার বাচ্চাকে চাটে, হাঁস দুটি যখন তার বাচ্চাগুলি নিয়ে জলে ভেসে বেড়ায়, আমার ইচ্ছা হয়, আমিও ঐরকম করে ছোট ছেলেদের আমার ডানার নীচে, আমার বুকের ছায়ায় ঢেকে রাখি। নক্ষত্রভরা আকাশে যখন চাঁদ ভেসে ওঠে আমার মনে হয় চাঁদটি যেন মা আর তারাগুলি তার সন্তান।' তারপর বৈধব্যের ভয়াবহ অভিশাপ তার জীবনকে দগ্ধ করে দিয়েছে; তৃতীয় দৃশ্যের মধ্যে দেখা যায় স্ত্রী-আচারের ক্ষেত্রে সে অনধিকার প্রবেশ করে নিজের বাড়িতেই হয়েছে লাঞ্ছিত। ঊর্ধ্বমুখে কাতরকণ্ঠে সে বলেছে, 'আমি বিধবা। কোন শুভ কাজে

আমি যোগ দিলে অশুভ হয়ে যাবে। আমি যাকে ছোঁব সেই অপবিত্র হবে। ভগবান, কি দোষ করেছি তোমার পায়? কি পাপে আমাকে এক মুহূর্তে এরকম হেয় মলিন অস্পৃশ্য করে দিলে? এ কষ্ট কোথায় রাখব? এ মলিনতা কি করে ঘোচাব, উপায় দাও দেব! সকলে তোমার সন্তান—আর আমি কি তোমার সন্তান নই, বিশ্বপিতা! তবে আমার প্রতি কেন এ নিদারুণ অভিশাপ—কেন এ অকারণ দণ্ড!' এই জাতীয় সংলাপ তাকে প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্রের মহিমা দান করেছে বলে নাটকটি বহুল পরিমাণে সেকালের সামাজিক সমস্যামূলক নাট্যচিত্রের শ্রেণীভুক্ত হয়ে পড়েছে।

॥ ৭ ॥ যুগান্ত-কাব্যনাট্যটি (১৯১৮) সম্ভবত পুত্র জ্যোৎস্নানাথের নামে উৎসর্গীকৃত, কারণ উপহারপত্রে বলা হয়েছিল,

> বৎস,
> তরুণ অরুণ তব মধুর আলোকে
> অন্তর-বাহির পূর্ণ আনন্দ পুলকে!
> এমনি কল্যাণ ছটা বিতরিয়া তুমি
> চিরধন্য হও, ধন্য কর জন্মভূমি।
> মাতৃহৃদয়ের এই আশীষ বচন
> বরমাল্য দেবতার—কর হে ধারণ।

কলিকালে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অন্যায় আধিপত্য বিস্তার করেছে, 'ন্যায় আজ জরজর মরমর অন্যায় আঘাতে' এবং ন্যায়-পত্নী শান্তিও অশান্তির আলয়ে দাসীবৃত্তি করতে বাধ্য হয়েছে; আবার 'সর্বস্বান্ত নিপীড়িত প্রেম কলিরাজ-সেনাপতি অপ্রেমের করে' ও প্রেমের পত্নী করুণা অপ্রেমের গৃহে বন্দিনী। চতুর্দিকের এই অশুভ লক্ষণ যুগান্তরকে ত্বরান্বিত করে দিয়েছে। মহাদেবকে কন্যা লক্ষ্মী বলেছেন, 'শোভাহীন লক্ষ্মীহীনা আজি লক্ষ্মী তব'। সরস্বতী বলেন, 'মোর শুদ্ধ জ্ঞানবানী শিখিয়া লইয়া / দুর্বাণী রচিয়া তাহে ভরি ঈর্ষ্যানল / আমারি উপর তারা করেছে পরীক্ষা— / হের অস্ত্রাঘাত'। প্রিয় দুহিতাগণের এবং দেবদেবীর অসহায়তা ও অবমাননা সন্দর্শনে মহেশ্বরের হৃদয় সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে, এরই পরিণামে যুগপ্রলয়ের জন্য মহেশ্বর রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছেন। মহাপ্রলয়ের সমুন্নত পরিকল্পনাটি মহাকাব্যোচিত বিশালতা ও গম্ভীর মহিমামণ্ডিত হয়েছে। পরিশেষে স্নেহপরায়ণা জগজ্জনীর কাতরতাপূর্ণ অনুরোধে রুদ্র প্রশান্ত হয়েছেন এবং ধ্বংসের অবসানে নবযুগের অভ্যুদয় ঘটেছে। সমাপ্তি-সংগীতের মধ্যে লেখিকার কাঙ্ক্ষিত আদর্শ জগতের বন্দনা রচিত হয়েছে—

> হের, ঐ নবযুগ উদীয়মান।
> প্রীতিদীপ্তিময় দিব্য আলোকে ঈর্ষ্যা-তিমির অবসান।
> সুর নর গাহে জয়গান।

এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে নাটকটির মধ্যে ঘটনাগত সংঘাত, চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রভৃতি নেই। শিব শিবানী যম লক্ষ্মী সরস্বতী বিষ্ণু ন্যায় প্রেম শান্তি করুণা ইন্দ্র ব্রহ্মা প্রভৃতি পাত্রপাত্রীর পরিবেশনে স্বর্গীয় পরিমণ্ডল প্রস্ফুটিত করার প্রয়াস থাকলেও নন্দী-ভৃঙ্গীর প্রমত্ততা এবং অসৌজন্য ও হাস্যকর আচরণাদি রসাভাস সৃষ্টি করেছে।

৫

॥১॥ একশ্রেণীর নাটক রচনায় স্বর্ণকুমারী বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সেগুলির সাধারণ নাম 'হেঁয়ালিনাট্য'— পরবর্তীকালে 'কৌতুকনাট্য ও বিবিধ কথা' (১৯০১) নামক গ্রন্থে সংকলিত হয় এসমস্ত রচনা। এই শ্রেণীর নাট্যরচনার প্রসারে প্রথম উদ্যোগী হয়েছিলেন বালক পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলী এবং বালকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবসহ প্রথম যে হেঁয়ালিনাট্যটি প্রকাশিত হয় তা-ই পরবর্তীকালে 'রোগের চিকিৎসা' এই শিরোনামে কবির হাস্যকৌতুক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।[৩০] প্রস্তাবের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ হেঁয়ালিনাট্যের যে পরিচয় দিয়েছেন তার কিয়দংশ উদ্ধৃত হল: 'বিশুদ্ধ আমোদপ্রমোদ মাত্রকেই আমরা ছেলেমানুষী জ্ঞান করি— বিজ্ঞ লোকের— কাজের লোকের পক্ষে সেগুলি নিতান্ত অযোগ্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ইহা আমরা বুঝি না যে যাহারা বাস্তবিক কাজ করিতে জানে তাহারাই আমোদ করিতে জানে। যাহারা কাজ করে না তাহারা আমোদও করে না। ইংরাজেরা কাজ না করিয়া থাকিতে পারে না, আমোদ নহিলেও তাহাদের চলে না।...ইংরেজদের "শারাড" নামক একপ্রকার খেলা আছে, আমরা বাঙ্গালায় তাহাকে হেঁয়ালিনাট্য বলিলাম। তাহার মর্মটা বলিয়া দিই। দুই তিনজন লোকে ষড়যন্ত্র করিয়া এমন একটা কথা বাহির করিতে হইবে যাহা দুই তিন ভাগে ভাঙ্গিয়া ফেলা যাইতে পারে। প্রত্যেক ভাগের একটা অর্থ থাকা চাই। মনে কর "পাগোল" শব্দ। এই শব্দকে পা এবং গোল এই দুইভাগে ভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগের একটা অর্থ পাওয়া যায়। তারপর উপস্থিতমত মুখে মুখে একটা নাটক বানাইয়া লইতে হইবে; সেই নাটকের মধ্যে কোন স্থানে কথায় কথায় পা শব্দ এবং গোল শব্দ, এবং পাগল শব্দের সমস্তটা ব্যবহার করিতে হইবে, পরে শ্রোতারা আন্দাজ করিয়া বলিয়া দিবেন কোন শব্দ অবলম্বন করিয়া এই নাট্যাভিনয় করা হইল। না বলিতে পারিলে তাঁহাদের হার হইল।'[৩১] এর পর রবীন্দ্রনাথ 'হেঁয়ালিনাট্যের

৩০ হাস্যকৌতুক, ১৩৬১ সং, গ্রন্থপরিচয়, পৃ ১০১-০২।

৩১ বালক, জ্যৈষ্ঠ ১২৯২, পৃ ৮৮-৮৯।

একটা উদাহরণ' দিয়েছেন এবং পরিশেষে মন্তব্য করেছেন, 'এইত আমার হেঁয়ালিনাট্য ফুরাইল। এবার প্রথম বলিয়া খুব সহজ করিয়া দিয়াছি। কথাটা কি, আন্দাজ করিয়া বল দেখি?' বেশ বোঝা যায় দৃশ্য নাটককে পাঠ্যরূপে ব্যবহার করা হয়েছে এবং তার উত্তরও চাওয়া হয়েছে অল্পবয়সী বালক-বালিকার নিকট থেকে।

মাত্র এক বৎসর প্রকাশিত হওয়ার পর ১২৯৩ সালের বৈশাখ থেকে ভারতীর সঙ্গে বালক যুক্ত হয়ে যায়; ফলে ভারতী ও বালক পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় যে হেঁয়ালিনাট্যটি প্রকাশিত হয় তার স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন পুনরায় দেখা যায় কারণ ব্যাপারটি সম্বন্ধে ভারতীর পাঠক-পাঠিকা কিছুই জানেন না একথা ধরে নেওয়া হয়েছিল। ভারতী ও বালকে হেঁয়ালিনাট্য সম্বন্ধে যে পুনরালোচনা মুদ্রিত হয় সম্ভবত স্বর্ণকুমারী তা লেখেন, অন্তত সম্পাদিকা হিসাবে এই ব্যাপারে তাঁর দায়িত্ব অস্বীকার করা চলে না। সেখানে বলা হয়েছে, 'হেঁয়ালি বাহির করিবার নিয়ম এই: সমস্ত হেঁয়ালিনাট্যটার মধ্যে এমন একটা কথা রাখা হয় যাহা দুই তিন ভাগে ভাগ করিলেও প্রত্যেক ভাগের একটা অর্থ পাওয়া যায়। যেমন—মনে কর, পাগোল শব্দ। এই শব্দকে পা এবং গোল এই দুই ভাগে ভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগে একটা অর্থ থাকে। এখন হেঁয়ালিনাট্যের মধ্যে স্থানে স্থানে কোথাও পা শব্দ কোথাও গোল শব্দ, এবং কোথাও বা পাগল শব্দের সমস্তটা ব্যবহার করা যায়। ইহা হইতে আসল কথাটি আন্দাজ করিয়া পাঠকদের বুঝিয়া লইতে হইবে।'[৩২] লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবেও একই শব্দ উদাহরণরূপে ব্যবহৃত হয়েছিল এবং বর্তমান উদ্ধৃতির উপর রবীন্দ্রপ্রভাব আত্যন্তিক, কোনো কোনো বাক্য প্রায় অবিকল পুনর্বার লিখিত। বাংলায় প্রথম হেঁয়ালিনাট্য প্রবর্তনের কৃতিত্ব যে রবীন্দ্রনাথেরই তার পরোক্ষ প্রমাণ এখান থেকে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, যদিও বালক পত্রিকা নিতান্ত বালকপাঠ্য ছিল না 'কারণ "বালক" নামেমাত্র বালক ছিল—প্রকৃতপক্ষে ইহা বয়স্ক পাঠকদিগেরই উপযোগী হইয়া উঠিয়াছিল', তবু বলা যায় যে এর পর থেকে ভারতী পত্রিকার সক্রিয় সহানুভূতি লাভ করে হেঁয়ালিনাট্য স্পষ্টত বয়স্কগণেরও সহৃদয় অনুমোদন লাভ করতে থাকে।

হেঁয়ালিনাট্য সম্বন্ধে লেখিকার নিজস্ব ধারণা অন্যত্র পরিবেশিত হয়েছে। একটি পত্র-প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, 'হেঁয়ালিখেলা বোধ হয় তুমি জান। অভিনয়ের মধ্য হইতে দর্শকদিগের হেঁয়ালিটি বাহির করিতে হয়। যেমন ধর, কথাটি পাহাড়; একজন সাজিলেন রোগী—তাঁহার পায়ের হাড় ভাঙ্গিয়াছে; ডাক্তার আসিয়া তাঁহার পা টিপিয়া টুপিয়া দেখিতে লাগিলেন, দর্শকেরা বুঝিলেন পাহাড়।'[৩৩] এই রচনারই মধ্যে লেখিকা তাদের ক্যাওাল,

৩২ ভারতী ও বালক, বৈশাখ ১২৯৩, পৃ ৪১, পা. টী.।

৩৩ পত্র, ভারতী ও বালক, আষাঢ় ১২৯৯, পৃ ১৬৯। লক্ষণীয় যে রবীন্দ্র-রচিত প্রথম শারাড—খা ১২৯২

মিউজিক্যাল চেয়ার প্রভৃতি আমোদজনক খেলার পরিচয় দিয়েছেন। ১৩১৭ সালের ভারতীর আশ্বিন সংখ্যায় মুদ্রিত 'ইংরাজদিগের ক্রীড়াকৌতুক' প্রবন্ধেও লেখিকা উক্ত নাটকের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, 'হেঁয়ালিনাট্যাভিনয়ে কোন একটি বা দুইটি কথা অভিনয়ের মধ্যে বারবার কৌশলে উল্লেখ করিতে হয়। তাহা হইতে দর্শকগণ কথাটি বাহির করেন। এ খেলাটি বড় কৌতুকজনক। পুরাতন ভারতীতে বহু হেঁয়ালিনাট্য প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ আর একটি হেঁয়ালিনাট্য রচনা করিয়া দিলাম।' এর পর হেঁয়ালিনাট্যটি প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রবন্ধ থেকে প্রমাণিত হয় যে এইজাতীয় রচনা ইংরেজিপ্রভাব-সঞ্জাত। লেখিকাও স্বীকার করেছেন যে ইংরেজদের সামান্য কাজটিও উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হওয়ায় এবং 'ছোট বড় সকল নিমন্ত্রণেই অতিথিদিগের মনোরঞ্জনার্থে কোন-না-কোনরূপ আমোদপ্রমোদের আয়োজন' রাখার জন্য এরকম ক্রীড়াকৌতুক তাঁরা করে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ স্বর্ণকুমারী প্রভৃতি সেই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এরকম হেঁয়ালি-নাট্যাভিনয় প্রবর্তন করেছিলেন।

মূল শারাড-এর সঙ্গে হেঁয়ালিনাট্যের সম্পর্কের কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রস্তাবে উল্লেখ করেছিলেন। এইজাতীয় রচনা সম্বন্ধে অন্যত্র বলা হয়েছে, Charade is an amusement which consists in dividing a word into its component syllables or letters, predicating something of each and of the whole, and asking the reader or listener to guess the word.[৩৪] এইজাতীয় নাট্যখেলা যে অনেকটা ধাঁধার মত তারও ইঙ্গিত অন্যত্র পাওয়া যায় এবং কখনো কখনো যে এর অভিনয় করা যেতে পারে এমন কথাও স্বীকৃত হয়েছে, Charade, a kind of riddle… .. in which a word of two or more syllables is divined by guessing and combining into one word (the answer) the different syllables, each of which is described as an independent word, by the giver of the charade. Charades may be either in prose or in verse . The most popular form of this amusement is the acted charade, in which the meaning of the different syllables is acted out, the audience being left to guess each syllable and thus, combining the meaning of all the syllables, the whole word.[৩৫]

সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় বালকে প্রথম মুদ্রিত হয় এবং হাস্যকৌতুকে যার শিরোনাম 'রোগের চিকিৎসা'—তার মধ্যে সম্ভবত 'পাহাড়' শব্দটি সংগুপ্ত ছিল। স্বর্ণকুমারীর এই বর্ণনার সঙ্গে উক্ত রবীন্দ্র-রচনার ঘটনা-সাদৃশ্য বর্তমান।

৩৪ The Illustrated Chambers's Encyclopaedia, 1930, Vol III, pp 108-09.

৩৫ Encyclopaedia Britannica, 1961, Vol V, p 243.

বঙ্কিমচন্দ্রের লোকরহস্তের (১৮৭৪) রচনাবলী থেকে এই সকল শারাডের গঠনগত পার্থক্য সহজেই উপলব্ধ হয়। এইসকল রচনার মধ্যে হেঁয়ালি বা ধাঁধার ভাবটিই প্রধান, তাছাড়া এদের জন্ম সান্ধ্য ভোজসভায় আমোদসৃষ্টির প্রয়োজনে। শব্দকে বিশ্লেষণ করে তার কোনো কোনো বা প্রত্যেকটি অক্ষর (Syllable) নিয়ে কৌতুকনাটিকা বা হেঁয়ালিনাট্যের দৃশ্য রচনার জন্য লোকরহস্তের সৃষ্টি হয়নি। আবার প্রখর সমাজসচেতন মন ও অভিভাবকসুলভ সুগভীর সহানুভূতি এবং প্রবল উদ্দেশ্যমূলকতা বা সুতীক্ষ্ণ শ্লেষের শায়ক এইসকল হেঁয়ালি-নাট্যের মধ্যে পাওয়া যায় না। তাই পরবর্তীকালে গ্রন্থাকারে সংকলিত হওয়ার ফলে নিহিত হেঁয়ালি বা ধাঁধার ভাবটি সাধারণ পাঠকের নিকট অপ্রধান হয়ে উঠেছে ; রবীন্দ্রনাথের হাস্যকৌতুকের মত স্বর্ণকুমারীর কৌতুকনাট্যের রচনাগুলিও পরবর্তী পর্যায়ে সাধারণ কৌতুকনাটিকারূপে গৃহীত হয়েছে। অথচ কেউ কেউ বঙ্কিমচন্দ্রের লোকরহস্তের সঙ্গে এই নক্সানাটিকাগুলির একটি আত্মিক সম্পর্ক লক্ষ করেছেন।[৩৬]

এই শারাডজাতীয় রচনাগুলি স্বর্ণকুমারী দেবীর কৌতুকনাট্য ও বিবিধ কথা (১৯০১) নামক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়, আবার গ্রন্থাবলীতে কৌতুকনাট্য নামক স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি গ্রন্থের মধ্যেও এগুলি পরিবেশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এইজাতীয় রচনার সংকলন-গ্রন্থের নাম রাখেন হাস্যকৌতুক (১৩১৪)। হেঁয়ালিনাট্য অভিধাটি শারাডের প্রতিশব্দরূপে পরবর্তীকালে যে আর ব্যবহৃত হয়নি হাস্যকৌতুকের ভূমিকা থেকে তা অনুমিত হয় : 'এই ক্ষুদ্র কৌতুকনাট্যগুলি হেঁয়ালিনাট্য নাম ধরিয়া "বালক" ও "ভারতী"তে বাহির হইয়াছিল। য়ুরোপে শারাড (charade)-নামক একপ্রকার নাট্য-খেলা প্রচলিত আছে, কতকটা তাহারই অনুকরণে এগুলি লেখা হয়। ইহার মধ্যে হেঁয়ালি রক্ষা করিতে গিয়া লেখা সংকুচিত করিতে হইয়াছিল—আশা করি সেই হেঁয়ালির সন্ধান করিতে বর্তমান পাঠকগণ অনাবশ্যক কষ্ট স্বীকার করিবেন না। এই হেঁয়ালিনাট্যের কয়েকটি বিশেষভাবে বালকদিগকেই আমোদ দিবার জন্য লিখিত হইয়াছিল।' হাস্যকৌতুক গ্রন্থের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ হেঁয়ালিকে গৌণভাবে গ্রহণ করতেও অস্বীকার করেছেন। এই বিষয়ে স্বর্ণকুমারীর মনোভাবটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। হাস্যকৌতুক গ্রন্থটি প্রকাশের প্রায় ছয় বৎসর পূর্বে লেখিকার কৌতুকনাট্য প্রকাশিত হয়। স্বর্ণকুমারীর সম্পাদনাকালে ভারতী এবং ভারতী ও বালক পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা (বৈশাখ ১২৯৩) থেকে শারাড বা 'হেঁয়ালিনাট্য' প্রকাশিত হতে থাকে। স্বরচিত প্রবন্ধের নানা

৩৬ দ্র রথীন্দ্রনাথ রায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৪শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, পৃ ৩৫০। কিন্তু লোক-রহস্তের প্রথম সংস্করণের (১৮৭৪) আখ্যাপত্রে 'কৌতুক ও রহস্ত' এরূপ উল্লেখ ছিল। সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ স্বর্ণকুমারী প্রভৃতির শারাড বা হেঁয়ালিনাট্যের সঙ্গে এদের মৌলিক প্রভেদটুকু এখানেই বর্তমান।

স্থানে এইজাতীয় রচনার পরিচয় প্রদানকালে যদিও তিনি হেঁয়ালিনাট্য শব্দগুচ্ছটিকে শারাডের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করেছেন তবু প্রথম থেকেই তাঁর মনে এ সম্পর্কে একটা দ্বিধা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ১২৯২ সালের ভাদ্র সংখ্যার ভারতীতে প্রকাশিত এইজাতীয় রচনার নাম দেওয়া হয়েছিল 'নক্সা', একই বৎসরের মাঘ সংখ্যায় মুদ্রিত রচনার নামও 'নক্সা'; ১২৯৮ সালের ভারতী ও বালক পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যার রচনাটির পরিচয় হল 'রহস্যনাট্য'; 'হেঁয়ালি-নাট্য'ও তিনি ব্যবহার করেছেন ১২৯৪ ও ১২৯৫ সালে প্রকাশিত রচনাগুলির ক্ষেত্রে; সর্বশেষে গ্রন্থনামে ব্যবহৃত হয়েছে 'কৌতুকনাট্য'। এই নামপরিবর্তনের ক্রমগুলি এইরূপ: হেঁয়ালিনাট্য, নক্সা, রহস্যনাট্য, কৌতুকনাট্য। বোঝা যায় যে রচনাগুলি হেঁয়ালি বা ধাঁধার সংকীর্ণ ক্ষেত্র থেকে ধীরে ধীরে উন্নত শ্রেণীর সাহিত্যে পরিণত হতে চলেছে। গ্রন্থের মধ্যে কোথাও হেঁয়ালির নামগন্ধ না থাকায় পরিণামে কৌতুকনাট্যরূপে রচনাগুলি সুখপাঠ্য ও সহজপাঠ্য হয়ে উঠেছে।

কৌতুকনাট্য গ্রন্থটি দুহিতা হিরণ্ময়ীর নামে উৎসর্গ করা হয়। উপহার-পত্রে আছে—

ধর স্নেহ-উপহার স্নেহময়ি রাণি!
রূপ বা নিরূপ মন্দ গন্ধ কিবা হীনগন্ধ
সুর বা বেসুর ছন্দ আমার যা বাণী,
সকলি তোমার কাছে আদরের জানি।

কৌতুকনাট্যের মধ্যে লজ্জাশীলা, বৈজ্ঞানিক বর, লোহার সিন্দুক, ষষ্ঠীর বাছা, চাক্ষুষ প্রমাণ, সৌন্দর্যানুরাগ, গানের সভা, ব্যাঘ্র-সভা, সুস্বার্থ, তত্ত্বজ্ঞানী, নিজস্ব সম্পত্তি, বিরহ-বেদনা, সুস্থ ডাক্তারি—এই মোট তেরটি রচনা আছে। লজ্জাশীলা রচনাটির পাদটীকায় বলা হয়েছে, 'উক্ত নক্সাটি ১২৯২ সালের ভারতীতে প্রকাশিত হয়। এই অল্পদিনের মধ্যেই বঙ্গমহিলার পরিচ্ছদের বিস্তর উন্নতি হইয়াছে। বাহিরে যাইতে হইলে শাড়ির সহিত একটি সুদর্শন জ্যাকেট এবং অন্তরাবরণ পরিধান এখন আর লজ্জার কথা নহে। কিন্তু তখন যিনি দুঃসাহসী হইয়া উক্তরূপ সুরুচিসংগত শোভন বেশভূষার অঙ্গাবরণে প্রয়াসী হইতেন তাঁহাকে বিলক্ষণ হাস্যভাজন হইতে হইত।' লজ্জাশীলা প্রথম প্রকাশিত হলে (ভারতী, ভাদ্র ১২৯২)[৩৭] জনৈক লেখক লজ্জাশীলার 'উত্তররূপে নিতান্ত রঙ্গচ্ছলে' আরেকটি নক্সা ঐ পত্রিকায় প্রকাশ করেন।[৩৮] ব্যাঘ্র-সভা রচনাটি পাঠকালে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল-এর কথা মনে পড়ে। শিক্ষাবিভ্রাট-শীর্ষক হেঁয়ালিনাট্যটির (ভারতী, বৈশাখ ১৩১৯) কাহিনীর সঙ্গে মহিলা-মজলিস প্রবন্ধের[৩৯] একটি কাহিনীর সাদৃশ্য আছে।

---

৩৭ রবীন্দ্রনাথের প্রথম শারাড রোগের চিকিৎসার প্রকাশকাল: বালক, জ্যৈষ্ঠ ১২৯২।
৩৮ দ্র ভারতী, ১২৯২, পৃ ৩৪২, পা. টী.।
৩৯ ভারতী, বৈশাখ ১৩১৯, পৃ ৩৩।

।২। এই প্রসঙ্গে তাঁর প্রহসনগুলিরও আলোচনা করা যায়। মাত্র দুটি প্রহসনগ্রন্থ রচনা করেছিলেন স্বর্ণকুমারী—কনে-বদল (বৈশাখ ১৩১৩, ১৯০৬) ও পাকচক্র (ফেব্রুয়ারি ১৯১১)। কিন্তু এইজাতীয় স্বল্প পরিমাণ রচনার মধ্যে এমন অবিসংবাদিত মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায় যার বলে তাঁকে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম প্রহসন-রচয়িতাগণের সমগোত্রীয় জ্ঞান করা চলে।

কনে-বদল (ভারতী, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩১২) গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে বলা হয়েছে,

বৎস !
কর কাজ চিরোৎসাহে, অশ্রান্ত অটল ;
ধন্য কর, ধন্য হও, সাধ সুমঙ্গল।
হাসি-খুসী এ কৌতুক ক্ষণিকের খেলাটুক,
বিশ্রাম-আরাম শুধু—শুধু নব বল।

লেখিকার প্রহসন রচনার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য এর মধ্যে নিহিত— নব বল সঞ্চয়ের জন্য বিশ্রাম-আরাম প্রয়োজনীয়, 'হাসি-খুশী এ কৌতুক ক্ষণিকের খেলাটুক'-এর মধ্যেও তদ্রূপ প্রত্যেকে শক্তি-সামর্থ্য সঞ্চয়ের অবকাশ লাভ করে থাকেন।

দুটি অঙ্কের মোট দশটি দৃশ্যে কনে-বদলের কাহিনীটি পরিবেশিত। শ্রীধর গড়গড়ি ও শশিনাথ পাকড়াশির পূর্বমনোনীত পাত্রী মালতী ও চন্দ্রাবতীর মধ্যে রসমঞ্জরী বা ক্ষেপির আবির্ভাব ঘটনাকে সমস্যাকণ্টকিত করে তুলেছে ; শ্রীধরের জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়া ললিতা ও চন্দ্রাবতীর জ্যেষ্ঠা সহোদরা প্রভাবতী এবং ক্ষেপির মা সমস্যাকে জটিলতর করে দিয়েছে। শেষ মুহূর্তে ভোলানাথ বা দাদাঠাকুর নামক নির্বিরোধ এক ভদ্রলোকের হস্তক্ষেপে কহিনী মিলনাত্মক পরিণতি লাভ করেছে। কাহিনীবিন্যাসের কৌশল যে প্রহসন রচনায় অন্যতম প্রয়োজনীয় ব্যাপার কনে-বদল থেকে তা সমর্থিত হয়। ভ্রান্ত ধারণা থেকে যে সমস্যা ও অসঙ্গতির উদ্ভব হয়ে থাকে বর্তমান প্রহসনের মধ্যে তারই প্রয়োগ লক্ষিত হয়। ভোলানাথ চরিত্রের সঙ্গে চিরকুমার-সভার[৪০] রসিকদাদার সাদৃশ্য অনুভূত হয়। কথায় কথায় আবৃত্তি, ছড়াকাটা এবং কৌতুক-গীতির অবতারণায় চরিত্রটি স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। পরিশেষে রসনাসর্বস্ব ক্ষেপি বা রসমঞ্জরীর যোগ্যপাত্ররূপে তাঁর আবির্ভাব কৌতুকের বাঁধ-ভাঙা প্লাবনকে অনিবার্য করে তুলেছে।

প্রহসনটিতে চলিতভাষার প্রয়োগ ও হ্রস্ব সংলাপের ব্যবহার সার্থকতা অর্জন করেছে,

---

৪০ ভারতীর বৈশাখ ১৩০৭ থেকে জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮ সংখ্যার মধ্যে উপন্যাসাকারে প্রথম মুদ্রিত ; প্রজাপতির নির্বন্ধ (১৩১৪) নামে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত। নাট্যাকারে চিরকুমার-সভা পরে (চৈত্র ১৩৩২) প্রকাশিত।

প্রহসনের তীক্ষ্ণ-তীব্র গতিবেগসৃষ্টির সহায়তা করেছে এই শ্রেণীর ভাষা ও সংলাপরীতি। লেখিকার উপভাষা (dialect)-প্রীতির প্রমাণ পাওয়া যায় হাবীদাসীর সংলাপে। অবশ্য 'উন্থুন ধরিয়ে এস্থক মা, কি হবেক সব বলেক দাও, বাম্‌মুনকে দিয়েক আসি' (প্রথম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য) প্রভৃতি সংলাপে উপভাষার বিকৃতি এবং প্রয়োগশৈথিল্য ধরা পড়েছে। ক্ষেপির উচ্চারণজাড্য ও লোলুপতা ঈষৎ সহানুভূতিবর্জিত বলে মনে হয়। গৃহিণী ললিতা ও তেইশ বছরের ক্ষেপির কথোপকথনের কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত হল :

ল। দেখ ক্ষেপি, তোর বর আসছে।

ক্ষে। (একমুখ হাসিয়া) আমি বল ভায়োবাসি।

ল। বর ভালবাসিস—তা আমি তোকে দেব।

ক্ষে। চাত্তে চাত্তে বল—

ল। আচ্ছা চারটে বরই দেব—আমি যা বলব, তাই করবি ?

ক্ষে। কলব কলব।

ল। দেখ, তোর নাম জিজ্ঞাসা করলে কি বলবি বল দেখি।

ক্ষে। অস—মিছলি।

ল। না, রসমঞ্জরী না—বলবি প্রাণকান্ত, আমি তোমারি।

ক্ষে। পান—পান—তোমাল পান খাব।

ল। না, আমি যা বলি, ঠিক বল! প্রাণকান্ত, আমি তোমারি।

ক্ষে। পান কাঁদত, আয়ি তোয়ারি পান।

ল। আচ্ছা, ওতেই চলবে,—তারপর তোকে যদি জিজ্ঞাসা করে, কি বই পড়িস—ত কি বলবি বল দেখি ?

ক্ষে। পালম শাক।

ল। কেবল খেতেই জন্মেছে—প্রথম ভাগখানা তোমার পালম শাক হয়ে পড়েছে। না, পালম শাক নয়। বলবি, তোমা বই আমি জানিনে।

ক্ষে। তোয়া বই আনিনে। (প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য)

অন্তঃপুরের পুঙ্খানুপুঙ্খ জীবনচিত্র ও স্ত্রী-আচারাদির পরিবেশন প্রহসনটির ঐতিহাসিক মূল্য বর্ধিত করেছে। কৌতুক-গীতিগুলি—বিশেষত ভোলানাথ, ঘটকী এবং নর্তকীর গানগুলি এ প্রহসনের মূল্যবান সম্পদ। পাকচক্র প্রহসনের মধ্যে ঘটকীর ভূমিকা আরও বিস্তৃতিলাভ করেছে, কনে-বদলের মধ্যে তার স্থান নিতান্তই গৌণ।

পাকচক্র একাঙ্ক প্রহসন। উপহারপত্র থেকে জানা যায় গ্রন্থখানি 'স্নেহাস্পদ শ্রীযুত অসিতকুমার হালদারকে বিবাহ-যৌতুক' হিসাবে প্রদত্ত হয়। পাকচক্রে কাহিনীর

বিশালতা-বিস্তৃতি নেই, অন্তত ঘটনাগত জটিলতা অথবা সংকটপূর্ণ পরিস্থিতি কনে-বদলের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অধিক। এর কারণ হিসাবে এই বলা যায় যে কনে-বদলে প্রথমাবধি প্রহসনোপযোগী সুতীব্র গতিবেগ অনুভূত হয়; পাকচক্রের মধ্যে সেই নাটকীয় গতিবেগ ঈষৎ মন্দীভূত, তার পরিবর্তে প্রতিনিধিস্থানীয় কিংবা type-চরিত্র সৃষ্টির প্রতি নাট্যকারের মনোযোগ বেশী হয়ে পড়েছে। দ্বিজেন্দ্রলাল-কথিত অসঙ্গতি ও বৈষম্য অসামঞ্জস্য ও বিকৃতি এবং 'প্রাকৃত-বৈষম্য'[৪১] এই নাটকের মধ্যে অধিক পরিমাণে দেখা যায়; বিশেষত বিভিন্ন চরিত্রের ব্যঙ্গাত্মক অনুকৃতি (caricature) কৌতুকসৃষ্টির প্রধানতম উপায়রূপে নাটকের প্রথমে গৃহীত, এই কারণে ঘটনার বিকাশ বা পরিণতির দিকে দ্রুত-ধাবমান নাট্যিক গতি কিছু পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হয়েছে, অন্তত প্রথম দুটি দৃশ্যে ঘটনার তেমন অগ্রগতি দেখা যায় না।

প্রথম দৃশ্যের শ্রেষ্ঠতম আকর্ষণ ঘটকী চরিত্রটি। কনে-বদলের ঘটকী চরিত্র নাটকের মধ্যে অপরিহার্য ছিল না, কিন্তু পাকচক্রে তার ভূমিকাটি প্রয়োজনীয় বলে তার স্থানটিও সুচিহ্নিত। সংস্কৃতজ্ঞানের অভিমান চরিত্রটিকে বিশিষ্টতা দান করেছে; 'বানরাণাং কণ্ঠে গজমতিবৎ তরলং', 'মহাজনস্ত যঃ পন্থা স গতা' প্রভৃতির মাধ্যমে প্রসিদ্ধ প্রবাদবাক্যের অশুদ্ধ এবং বিকৃত প্রয়োগের দ্বারা সে অনায়াসে অশিক্ষিত অন্তঃপুরিকার হৃদয়ে সম্ভ্রম উদ্রেক করেছে। এমনকি ন্যায়শাস্ত্র ও ব্যাকরণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জটিল তত্ত্বের অপপ্রয়োগও হাস্যরসের ফোয়ারাকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। বরদাপিসী ও ঘটকীর কথোপকথন বড়ই উপভোগ্য :

বরদা। সত্যি ঘটকঠাকরুণ যে রকম বিদ্বান—

ঘটকী। না না—বিদুষী—

বরদা। ছাই, মনেও থাকে না— বি-বি-বিলাসী।

ঘটকী। মহাভারত—মহাভারত!

বরদা। ওটা বুঝি মস্ত ভুল হোল—বি-বি-বিদ্যা—হ্যাঁ হ্যাঁ বিদ্যাগজি— এবার ত ঠিক হয়েছে! বিদ্যাগজি ঠাকরুণ—তুমি ঘটকালি না করে পড়াও না কেন?

ঘটকী। তা, ও সম্বোধনটা করতে পারেন—নিতান্ত অশুদ্ধ হবে না। আমার স্বামীর পদবী হচ্ছে— বিদ্যাদিগ্‌গজ, সংক্ষেপে স্ত্রীলিঙ্গে আমাকে বিদ্যাগজি বলা যেতে পারে।

---

৪১ প্রহসনের মাধ্যমে কৌতুকরসসৃষ্টি সম্পর্কে একদা দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছিলেন, 'সকলবিষয়েরই দুটি দিক আছে—একটি গম্ভীর, অপরটি লঘু।......হাস্য দুইপ্রকারে উৎপাদন করা যাইতে পারে। এক, সত্যকে প্রকৃত পরিমাণে বিকৃত করিয়া, আর এক, প্রকৃতিগত অসামঞ্জস্য বর্ণনা করিয়া। যেমন, এক, কোনো ছবিতে অঙ্কিত ব্যক্তির নাসিকা উল্টাইয়া আঁকা, আর এক, তাহাকে একটু-আধটু দীর্ঘ করিয়া আঁকা। একটি প্রাকৃত, অপরটি প্রাকৃত-বৈষম্য।'—দ্র উৎসর্গপত্র, বিরহ, ১৩০৪।

বরদা। আঃ, বাঁচলুম।—তা দিগ্‌গজি মহাশয়!

ঘটকী। মহাশয় না, মহাশয়া—

এই ঘটকীর মুখের ছুটি গানে হাস্যরসসৃষ্টির উত্তম উদ্দামতা লাভ করেছে। তাছাড়া কর্তা ও গৃহিণীর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মান-অভিমানের পালা এবং শশিমুখী ও চন্দ্রকান্তের কৌশলে মানভঞ্জনাদি ব্যাপারসমূহ নাটকটিকে প্রাণচাঞ্চল্য দান করেছে। কর্তা ও গৃহিণীর একান্ত নির্ভরস্থল যথাক্রমে চন্দ্রকান্ত ও শশিমুখী, তাদের পরিচয় গৃহিণীর সংলাপেই পাওয়া যায়: 'চন্দ্রকান্ত হোল ওঁর ভগ্নীপোতের শালার পোষ্যপুত্র—আর শশী হোল আমার বোনের শাশুড়ীর সই-এর পাতান মেয়ে' (পঞ্চম দৃশ্য)। এদের মধ্যে কে বেশি আপনার জন সেই বিষয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে এবং তার সদুত্তর লাভের জন্য দম্পতি বরদাপিসীর শরণাপন্ন হয়েছেন। কিন্তু বরদা বলেন, 'তাই ত—আমি ঠিক বলতে পারছিনে—সমস্যা বটে! টোলের মত নেও।' বলাবাহুল্য এজাতীয় সমস্যার এরূপ সমাধান ব্যতীত আর কিই বা হতে পারে? ঋষিশ্রাদ্ধ এবং অজাযুদ্ধের মত এই দাম্পত্যকলহ হাস্যোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে কর্তার কয়েকটি বিরহসংগীতে। পুত্র বিনোদের বিবাহকে কেন্দ্র করে যে জটিলতার সূত্রপাত হয়েছিল তা আদৌ গৌণ ব্যাপার নয়, এই সূক্ষ্ম সূত্রই বিক্ষিপ্ত সমস্যাগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে দিয়েছে। নাটকের চরম সংঘাত দেখা দিয়েছে সপ্তম বা শেষ দৃশ্যে, এবং সন্দেশওয়ালি খাজাওয়ালি রসগোল্লা-ওয়ালি বাজীওয়ালি প্রভৃতির ঐকতান সংগীতে তার মধুর সমাপ্তি।

স্বর্ণকুমারীর প্রহসনের মধ্যে ব্যঙ্গবিদ্রূপ অপেক্ষা সহজ কৌতুক ও বুদ্ধিদীপ্ত হাসির অবকাশ সুপ্রচুর এবং সেদিক থেকে তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথেরই সমগোত্রীয়। স্বর্ণকুমারীর প্রথম প্রহসন কনে-বদল (১৯০৬) ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৩১২ সালে। তার পূর্বেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কিঞ্চিৎ জলযোগ (১৮৭২), এমন কর্ম আর করবো না (১৮৭৭), হিতে বিপরীত (১৮৯৬), অলীকবাবু (১৯০০) প্রভৃতি মৌলিক প্রহসন এবং হঠাৎ নবাব (১৮৮৪), দায়ে পড়ে দার পরিগ্রহ (১৩০৯) প্রভৃতি অনূদিত প্রহসন রচিত হয়। রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ প্রহসন গোড়ায় গলদ (১৮৯২), বৈকুণ্ঠের খাতা (১৮৯৭), বশীকরণ (বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ ১৩০৮) এবং প্রজাপতির নির্বন্ধ (১৯০১) প্রভৃতি রচনা স্বর্ণকুমারীর প্রহসনগুলির পূর্বে রচিত হয়। দেখা যায় স্বর্ণকুমারী দেবী অসংগতি ও অসামঞ্জস্যকেই হাস্যরসসৃষ্টির প্রধান উপায় হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি প্রকৃতের বিকৃতিকে রক্তাক্ত করে তুলেননি, ঘটনাবিন্যাসের কৌশলেই জটিলতা সৃষ্টি করেছেন। বিশুদ্ধ কৌতুকের প্রতি আগ্রহ পরিস্ফুট হয়েছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৌতুক-নাটিকাগুলিতে, সেখানেও ব্যঙ্গের জ্বালা বা বিদ্রূপের কশাঘাত অপেক্ষা অনাবিল কৌতুকের মধ্যে মার্জিত রুচি ও অভিজাত মানসিকতার পরিচয় স্পষ্টতর।

কবিতা

বঙ্গললনার কাব্যচর্চা সম্পর্কে বলা হয়েছে, "আধুনিক কালে বাঙ্গালী মহিলা কবি প্রথম দেখা দিয়াছিলেন সংবাদপ্রভাকরের পৃষ্ঠায়, কিন্তু তাঁহাদের নাম ছাপা হইত না বলিয়া ধরিবার উপায় নাই। মহিলার লেখা প্রথম বই কৃষ্ণকামিনী দাসীর 'চিত্ত-বিলাসিনী' (১৮৫৬)। 'কবিতামালা' (১৮৬৫) অজ্ঞাতনামা লেখিকার। তাহার পর কৈলাসবাসিনী দেবীর 'বিশ্বশোভা' (১৮৬৯), অন্নদাসুন্দরী দেবীর 'অবলাবিলাপ' (১৮৭২), ইন্দুমতী দাসীর 'দুঃখমালা' (১৮৭৪), অজ্ঞাতনাম্নীর 'কুসুমমালিকা' (১৮৭১), বিরাজমোহিনী দাসীর 'কবিতাহার' (১৮৭৬), ভুবনমোহিনী দেবীর 'স্বপ্নদর্শনে অভিজ্ঞান' (১৮৭৮), নবীনকালী দেবীর 'শ্মশানভ্রমণ' (ভবানীপুর ১৮৭৯), কামিনীসুন্দরী দাসীর 'কল্পনাকুসুম' (১৮৮১), ইত্যাদি। মুসলমান মহিলার লেখা প্রথম বাঙ্গালা বই, ফৈজুন্নিসা চৌধুরাণীর 'রূপ জালাল' (ঢাকা ১৮৭৬) গদ্যে-পদ্যে লেখা প্রণয়মূলক আখ্যায়িকা।"[১] স্বর্ণকুমারীর প্রথম কবিতা 'বাল্যসখী' ১২৮৪ সালের ফাল্গুন সংখ্যার ভারতীতে মুদ্রিত হয়, এবং প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'গাথা' ১২৮৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। সেদিক থেকে তিনি উপর্যুক্ত মহিলা কবিগণের ঈষৎ-পরবর্তী অথবা প্রায়-সমসাময়িক; তথাপি তাঁর কাব্যে পূর্ববর্তী মহিলা কবিগণের রচনার প্রভাব অপেক্ষা সমকালীন প্রতিনিধিস্থানীয় কবিকুলের কাব্যাদর্শের সাধর্ম্য পরিলক্ষিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য স্বর্ণকুমারীর রচিত কতিপয় খণ্ডকবিতার একটি সংকলন 'কবিতা ও গান' নামে পরবর্তীকালে (১৩০২) আত্মপ্রকাশ করে। তাঁর কবিকৃতিত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে কথিত কাব্যগুলিতে অনুপ্রবেশের প্রয়োজনীয়তা আছে।

গাথাকবিতা

॥১॥ বিগত শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে হ্রস্বদীর্ঘ আয়তনবিশিষ্ট বিবিধ শ্রেণীর কাহিনীকাব্য বাংলা ভাষায় রচিত হয়, তারপর মধুসূদনের অনুকরণে আলঙ্কারিক মহাকাব্য রচনার বহুল প্রয়াস দেখা যায়। বৃহদায়তন কাহিনীকাব্য সৃষ্টির পাশেপাশে ক্ষুদ্র অবয়বের গাথাজাতীয় কবিতাও তৎকালে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। সাহিত্যের ইতিহাসের অনুসরণে বলা যায়, ঠাকুরপরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী (১৮৫০-৯৮) ছিলেন রোমান্টিক আখ্যায়িকাকাব্য এবং আধুনিক রীতিসম্মত গাথা-

---

১ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ ১৭১।

কবিতার অন্যতম প্রবর্তক।[২] তাঁর উদাসিনী (১৮৭৪) কাব্য সেযুগের আখ্যায়িকাকাব্য বা 'কাব্যোপন্যাস' তথা গাথাকাব্যের আদর্শস্থানীয় ছিল। রবীন্দ্রনাথের বনফুল[৩] প্রভৃতি কাব্যের রচনারীতি ও আখ্যানবস্তুতে বিহারীলাল অপেক্ষা অক্ষয়চন্দ্রের প্রভাব স্পষ্টতর।

ইতিপূর্বে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের ললিতাকে (১৮৫৬) আধুনিক রীতির গাথাকাব্যরূপে কোনো কোনো সমালোচক গ্রহণ করেননি।[৪] মাত্র দুটি সর্গে রচিত হলেও ললিতার আয়তন ঈষৎ দীর্ঘ, তাছাড়া কাহিনীর মধ্যে নাট্যিক গতির তীব্রতা ও পরিণামমুখিতা এবং প্রগাঢ় ঔৎসুক্যের সৃষ্টি প্রভৃতির অভাব আছে; এর শুরু থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত উপকথার ঐকান্তিক প্রভাব লক্ষিত হয়, আর পরিণামে অতিপ্রাকৃতের আতিশয্য কাহিনীটিকে অবাস্তব এবং অবিশ্বাস্য করে তুলেছে। 'উপকথা শিশুমানসের রোমান্স। বয়স হইলেও মানুষের শিশুত্ব কখনোই সম্পূর্ণরূপে ঘোচে না বলিয়া উপকথার মহার্ঘ্যতা কখনো কমে না। উপকথায় রূপেরই প্রাধান্য রসের নয়, রস যেটুকু আছে সেটুকু একান্তভাবে রূপকেই আশ্রয় করিয়া। উপকথায় বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার বাধ্যবাধকতা নাই। কল্পনা সেখানে বাস্তবের অনুগত নয়, বাস্তবই কল্পনার অনুগত। তাই অভিজ্ঞতার কার্যকারণ-সম্বন্ধ উপকথায় শিথিল।'[৫] ললিতা উপকথার লক্ষণাক্রান্ত। বঙ্কিমচন্দ্র এই কাব্যকে 'ভৌতিক গল্প' নামেও চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু বুদ্ধিগ্রাহ্য নয় এমন বস্তুকে পর্যন্ত কাব্যে পরিবেশনকালে লেখক যে বিশ্বাসযোগ্য পরিমণ্ডল রচনা ও যৌক্তিক পারম্পর্য রক্ষা করেন তাও এই গল্পটির মধ্যে নেই। ১৮৫৬ সালের সংস্করণের আখ্যাপত্রে বলা হয়েছিল 'ললিতা। পুরাকালিক গল্প। তথা মানস।' কিন্তু এই পুরাকথায় রূপকথার বৈশিষ্ট্যগুলিও বহুলভাবে আশ্রয় লাভ করেছে। যদিও কবিতাটি পরবর্তীকালে 'বঙ্গীয় কাব্যরচনারীতি-পরিবর্তনের এক পরীক্ষা'রূপে পরিগণিত হয় তবু এর রচনার পশ্চাতে সক্রিয় ছিল 'স্বীয় মানসমাত্র রঞ্জনাভিলাষ'। আবার পরিবর্তিত এবং পরিমার্জিত হয়ে ললিতা পরে প্রকাশিত হলেও প্রতিনিধিস্থানীয় রচনারূপে গ্রন্থকার

২ বহ্নিকুমারী ভট্টাচার্যের বাংলা গাথাকাব্য (১৯৬২) গ্রন্থের ২৬৮ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, 'আধুনিক গাথার সর্বপ্রথম রচয়িতা কুচবিহারের মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ (১৭৮৩-১৮৩৩)।' কিন্তু হরেন্দ্রনারায়ণের যে দুটি গাথার পরিচয় প্রসঙ্গত পরিবেশিত সেগুলি যে কেবল 'উপকথা' নামে একদা চিহ্নিত ছিল তা নয়, কাহিনী দুটিতে রূপকথার প্রবল প্রভাব এবং কাহিনীর বিন্যাসে ও পরিবেশনে মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি আখ্যায়িকার সাধর্ম্য লক্ষিত হয়। লেখিকা ক্ষেত্রান্তরে তা স্বীকারও করেছেন।

৩ "ধারাবাহিক প্রকাশ 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় (১২৮২-৮৩, ১৮৭৬)। গ্রন্থাকারে ১২৮৬ (১৮৮০)।"—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য়, ১৩৬৮, পৃ ৩০, পা. টী. ১।

৪ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য়, পৃ ৩১৬-১৭।

৫ ঐ, পৃ ১৭৪।

একে গ্রহণ করেননি। রচনাটির স্রষ্টা কিশোর বঙ্কিমচন্দ্রের চাপল্যই এই দ্বিধার একমাত্র কারণ নয়। মধ্যযুগীয় বিদ্যাসুন্দর কিংবা অন্যান্য আখ্যানকাব্য-ধারার অনুবর্তনে ললিতা রচিত হয়েছিল; তাছাড়া পঞ্চদশবর্ষীয় বালক বঙ্কিমচন্দ্রের কবিমানসে কেবলমাত্র সংবাদ-প্রভাকর-প্রবর্তিত কবিতার গঠনগত আদর্শই প্রভাব বিস্তার করেনি, কাব্যবস্তুর নির্বাচনে এবং অবলম্বনে কাহিনীকাব্য রচনাকালে তিনি প্রধানত বিদ্যাসুন্দরকথা ও ইসলামী কাহিনীর সঙ্গে রূপকথার সংমিশ্রণ সাধন করেছিলেন। অবশ্য ললিতায় ইংরেজি কাহিনীকাব্যরীতিরও ছায়া-পাত ঘটেছে; কোলরিজ প্রভৃতির অতিপ্রাকৃতবিষয়ক কবিতাবলীর প্রভাব ছাড়াও ললিতার প্রারম্ভে উদ্ধৃত ইংরেজিবচনের ব্যবহারের সামান্য সূত্র অবলম্বন করে একথা বলা চলে। বস্তুত প্রাচীন এবং পশ্চিমাগত আধুনিক কাব্যধারণার সমন্বয়সাধনের প্রয়াস এই কবিতায় লক্ষিত হলেও পরবর্তীকালে রচিত 'সংযুক্তা'[৬] কবিতাটির মধ্যে আধুনিক গাথাকবিতার যে বৈশিষ্ট্যাদির পরিচয় পাওয়া যায় তা ললিতার মধ্যে নেই।

ফলকথা, আধুনিক বাংলা গাথাকাব্যের ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্রের ললিতা বিশেষ কোনো ধারাবাহিকতা প্রবর্তন বা ঐতিহ্য রচনা করতে পারেনি। ঈষৎ-পরবর্তীকালে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর রচনা সে কার্য সম্পাদন করে এবং অক্ষয়চন্দ্রের অনুসরণে স্বর্ণকুমারী রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ এইজাতীয় কাব্যরচনায় হস্তক্ষেপ করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহপাঠী এবং অন্তরঙ্গ সুহৃদ অক্ষয়চন্দ্র সম্ভবত ঠাকুরপরিবারের মধ্যে সাহিত্যিক আবহাওয়া সৃষ্টির অন্যতম সহায়ক ছিলেন। বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-৯৪) ও অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর প্রভাব অন্তঃপুরেও ফলপ্রসূ হয়ে উঠেছিল: 'স্বর্ণকুমারী দেবীর কাব্যরচনায় অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর ও বিহারী-লালের প্রভাব দেখা যায়। ইঁহার "গাথা" (১২৮৭ সাল) কাব্যে যে চারিটি কবিতা সংকলিত আছে তাহা অক্ষয়চন্দ্রের অনুসরণে লেখা। বিহারীলালের অনুসরণ শুধু ছন্দে।'[৭] অক্ষয়চন্দ্রের রচনার যে দুটি প্রধান গুণ স্বর্ণকুমারীর কবিতায় পাওয়া যায় তা হল 'অনায়াস-সারল্য ও স্বচ্ছতা'; এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে 'গীতিকাব্যোচিত অনুভূতি এবং তাহার অকৃত্রিম প্রকাশ'। এই অকৃত্রিম প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে তিনি অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ কিংবা বিহারীলালের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। বিহারীলালের ষণ্মাত্রিক পর্ববিশিষ্ট ছন্দ-রীতিটি তাঁর গাথাকাব্যের প্রধান আশ্রয়; কিন্তু ঐরূপ পরিমাপের পর্বগঠনকালে বিশিষ্ট কলামাত্রিক বা তানপ্রধান ধীর লয়ের অক্ষরবৃত্ত ছন্দ-রীতির প্রাধান্য স্বীকারের মধ্যেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য সূচিহ্নিত, কারণ বিহারীলালের কবিতা প্রধানত সরল কলামাত্রিক

৬ প্রথম প্রকাশ: বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১২৮৪, পৃ ৫২৯-৩৩।

৭ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য়, পৃ ৪৭৫।

ধ্বনিপ্রধান বিলম্বিত লয়বিশিষ্ট মাত্রাবৃত্তাশ্রয়ী। আবার ভারতবর্ষীয় ইতিহাস অবলম্বনে রচিত অক্ষয়চন্দ্রের 'ভারতগাথা' (১৮৯৫) একান্তভাবে বর্ণনাত্মক, সম্ভবত পাঠ্যগ্রন্থরূপে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে রচিত বলে গ্রন্থটির কবিতাগুলি বর্ণনাময়; কিন্তু ইতিহাসের অবলম্বনে স্বর্ণকুমারীর যেসকল গাথাকবিতা রচিত হয় তার মধ্যে সরল সাধারণ বর্ণনা অপেক্ষা কাহিনী-বিন্যাসগত জটিলতা, চরিত্রচিত্রণকালে মনোবিশ্লেষণের প্রাধান্য, সুবিপুল ঔৎসুক্য এবং নাটকীয় গতির তীব্রতা উপলব্ধ হয়ে থাকে। এভাবে গাথাকবিতার ক্ষুদ্র পরিসরে আখ্যায়িকা-লেখক অক্ষয়চন্দ্র থেকে ঔপন্যাসিক স্বর্ণকুমারীর স্বাতন্ত্র্য সহজেই নির্ণীত হতে পারে।

॥ ২ ॥ 'কলিকাতা বাল্মীকিযন্ত্রে শ্রীকালিকিঙ্কর চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত' হয়ে স্বর্ণকুমারীর গাথা-শীর্ষক কাব্যটি ১২৮৭ সালে (২০ ডিসেম্বর ১৮৮০) প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে একটি ক্ষুদ্র কবিতা আছে :

ছোট ভাইটি আমার,
যতনের গাথা হার কাহারে পরাব আর? স্নেহের রবিটি, তোরে আয় রে পরাই,
যেন রে খেলার ভুলে ছিঁড়িয়ে ফেলো না খুলে, দুরন্ত ভাইটি তুই—তাইতে ডরাই।

এই স্নেহমণ্ডিত উপহার-কবিতাটি নানাদিক থেকে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের বনফুল কাব্যের প্রথম সর্গের 'দীপ নির্ব্বাণ' শিরোনামটি[৮] স্বর্ণকুমারীর প্রথম উপন্যাসের নামেরই অনুরূপ; একদা একই কাহিনীর অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ প্রতিশোধ নামে একটি গাথা (ভারতী, শ্রাবণ ১২৮৫) এবং স্বর্ণকুমারী সদৃশ নামেরই একটি গল্প (ভারতী ও বালক, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮) রচনা করেন; উভয়ের গাথাকবিতার মধ্যে 'প্রণয়ে অচরিতার্থতা এবং মিলনে আত্মকৃত অথবা দৈবঘটিত বাধা ও হতাশা' দেখা যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ-বিরচিত প্রথম পর্যায়ের কয়েকটি গাথার মধ্যে[৯] যে অতিনাটকীয়তা বর্তমান—বনফুল এবং কবিকাহিনীর মধ্যে এর প্রাচুর্য লক্ষণীয়—স্বর্ণকুমারীর তৎকালীন রচনায় তা প্রায় অনুপস্থিত। লেখিকা বয়োজ্যেষ্ঠা বলে স্বাভাবিকভাবে তাঁর মানসিক পরিণতির বিকাশ ঘটেছিল এক্ষেত্রে; অগ্রজ সহোদরার এই স্নেহসিক্তি উৎসর্গ-পত্রের সাবধান-বাণীতে যে অভিভাবকসুলভ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় তা এইরূপ মন্তব্যের আনুকূল্য করে।

৮ জ্ঞানাঙ্কুর, অগ্রহায়ণ ১২৮২, পৃ ৩৫।— বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য়; ৩০শ পৃষ্ঠার পর মুদ্রিত জ্ঞানাঙ্কুরের প্রতিলিপি দ্রষ্টব্য।

৯ শৈশব সঙ্গীতের (১২৯১) অন্তর্গত কয়েকটি গাথার প্রকাশকাল— প্রতিশোধ : ভারতী, শ্রাবণ ১২৮৫; লীলা : ভারতী, আশ্বিন ১২৮৫, অপ্সরা-প্রেম : ভারতী, ফাল্গুন ১২৮৫; ভগ্নতরী : ভারতী, আষাঢ় ১২৮৬ ইত্যাদি। ভারতী পত্রিকায় এবং শৈশব সঙ্গীত গ্রন্থের মধ্যে (রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ—১ম) কবিতাগুলিকে 'গাথা'রূপে অভিহিত করা হয়েছিল।

সাশ্রুসম্প্রদান (ভারতী, বৈশাখ ১২৮৭), সাধের ভাসান (ভারতী, পৌষ ১২৮৬), খড়্গ-পরিণয় (ভারতী, চৈত্র ১২৮৬) এবং অভাগিনী নামক চারটি কবিতা গাথা গ্রন্থে স্থানলাভ করেছে। এছাড়া আরও দুটি কবিতাকে বর্তমান পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। ঐদুটি কবিতা— উপকথা ও জাপানী বীর—যথাক্রমে ১৩০২ ও ১৩১০ সালের ভারতীতে প্রথম প্রকাশিত হয়। এভাবে প্রকাশকালের দিক থেকে কবিতাগুলির পুনর্বিন্যাস করা যায়: সাধের ভাসান, খড়্গ-পরিণয়, সাশ্রুসম্প্রদান, উপকথা, জাপানী বীর। বিশেষ কারণে অভাগিনী-শীর্ষক কবিতাটিকে এই তালিকাভুক্ত করা হয়নি। প্রথম কারণ, এর প্রকাশকাল অজ্ঞাত।[১০] তবে কবিতাটি যে 'গাথা' কাব্য প্রকাশের পূর্বে রচিত হয়েছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, যতদূরসম্ভব এই কাব্যেই কবিতাটি প্রথম মুদ্রিত হয়েছে। ফলত কবিতাটির রচনাকালরূপে ১৮৮০ সালের ডিসেম্বরের পূর্ববর্তী কোনো সময়কে গ্রহণ করা যেতে পারে। দ্বিতীয় কারণটি বিস্তৃততর আলোচনাসাপেক্ষ। মনে হয়, রচনাটি লেখিকার প্রারম্ভিক পর্যায়ের গাথাকবিতা এবং রবীন্দ্রনাথের গাথা বা গীতিকাজাতীয় যে-কোনো রচনার আগে অভাগিনী জন্মলাভ করে। অবশ্য এমনও হতে পারে যে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের অনতিপূর্বে এই কবিতাটি রচিত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল বলে লেখিকা অন্য কোথাও কবিতাটির মুদ্রণের বা প্রকাশের প্রয়োজন অনুভব করেননি, এরকম অনুমানের সপক্ষে আরও বলা যায় যে সর্বশেষে রচিত হয়েছিল বলে গাথা গ্রন্থে সকলের শেষে বর্তমান কবিতাটি পরিবেশিত হয়েছে।

এবারে আমাদের বক্তব্যগুলি ধীরে ধীরে পরিবেশন করা দরকার। প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে বক্ষ্যমাণ কবিতাটি গাথা কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের অনতিকাল পূর্বে এবং অন্যান্য কবিতাগুলি অপেক্ষা পরবর্তীকালে রচিত বলে কাব্যের শেষে স্থানলাভ করেছে এরকম অনুমান যথেষ্ট যুক্তিনির্ভর নয়, কারণ গাথার যে অপর তিনটি কবিতার প্রকাশকাল জানা যায় এবং সম্ভাব্য রচনাকাল অনুমান করা যায় সেগুলির বিচার প্রসঙ্গে উপলব্ধ হয় যে গ্রন্থের প্রথম তিনটি কবিতা প্রকাশের কালানুক্রমে বিন্যস্ত হয়নি। সাময়িক-পত্রে সর্বশেষে প্রকাশিত কবিতাটি গ্রন্থের মধ্যে সর্বপ্রথমে, প্রথমে প্রকাশিত গাথাটি কাব্যের দ্বিতীয় পর্যায়ে স্থানলাভ করেছে এবং এই উভয় কালের (পৌষ ১২৮৬ ও বৈশাখ ১২৮৭) মধ্যবর্তী সময়ে প্রকাশিত কবিতাটি কাব্যের তৃতীয় কবিতা। অতএব একথা সহজেই বোঝা যায় যে কাব্য-সংকলন-

১০ সুকুমার সেনের একটি মন্তব্য থেকে মনে হতে পারে যে অন্যান্য গাথাগুলির মত 'অভাগিনী'ও ভারতীতে প্রথম প্রকাশিত হয়।— দ্র বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য়, পৃ ৪৭৫, পা. টী. ৫। কিন্তু তিনি এই প্রকাশকালের কোনো স্পষ্ট নির্দেশ দেননি।

কালে কবিতাবিন্যাসের ব্যাপারে লেখিকা কবিতার রচনাকাল বা প্রকাশকালের প্রতি বিশেষ দৃক্‌পাত করেননি কিংবা সাময়িকীতে প্রকাশিত তারিখের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেননি। তাই কিছুতেই জোর করে বলা যায় না যে গ্রন্থের চতুর্থ বা শেষ গাথাটি সর্বশেষে রচিত। বরং এর বিকল্পে এমন ধারণাও অসমীচীন নয় যে বর্তমান কবিতাটি তাঁর প্রথম দিকের রচনা যা ইতিপূর্বে অন্যত্র প্রকাশিত হয়নি। প্রথম পর্যায়ের রচনার প্রতি শিল্পীর অবহেলা-ঔদাসীন্য স্বাভাবিক ব্যাপার বলে কাব্যের শেষেই এক স্থান দেওয়া হয়েছে। অভ্যন্তরীণ বিচারেও দেখা যায় যে মুদ্রণের পূর্বেকার স্বাভাবিক সংশোধন এবং মার্জনা সত্ত্বেও প্রাথমিক রচনাগত দ্বিধাদুর্বলতা কবিতাটির মধ্যে সুপ্রচুর।

উপরের সিদ্ধান্তটি প্রমাণসাপেক্ষ বলে এখন সেই প্রসঙ্গটির বিস্তৃত আলোচনার অথবা অবতারণার অবকাশ আছে। স্বর্ণকুমারীর এই কাব্য সম্বন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনী-গ্রন্থের রচয়িতা একস্থানে বলেছেন, '১২৮৭ সালে তাঁহার "গাথা" প্রকাশিত হয়। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, স্বর্ণকুমারীই বঙ্গসাহিত্যে সর্বপ্রথম গাথা রচনা করেন। গাথা-রচনায় রবীন্দ্রনাথও তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর পদানুসরণ করিয়াছেন।'[১১] জীবনীকারের এই মন্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ তিনি তাঁর মন্তব্যের যাথার্থ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন, নচেৎ শেষ বাক্যটির উপর এতখানি জোর (emphasis) কখনো দিতেন না। এই গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় উক্ত জ্যোতিরিন্দ্র-জীবনী রচনায় স্বর্ণকুমারীর প্রশংসনীয় সহায়-তার কথা স্বীকার করেছেন। তাই এরূপ সুদৃঢ় মত প্রকাশের মধ্যে অকারণ স্তুতি অপেক্ষা প্রচ্ছন্ন সত্য-উদ্ঘাটনের প্রয়াসটি অনুভূত হয়। ভারতী পত্রিকার প্রথম দিকের কয়েকটি সংখ্যা সন্ধান করলে দেখা যায় যে ১২৮৫ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের প্রতিশোধ-নামক প্রথম গাথাটি প্রকাশিত হয়, তাছাড়া ১২৮৫ সালের ভারতীতে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচিত গাথা-কবিতার সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। বসন্তকুমারের উল্লেখ অনুসারে মনে হয়, যদি গাথা রচনায় স্বর্ণকুমারীই প্রথম উৎসাহী হয়ে থাকেন তবে তাঁর কোনো কোনো গাথাকবিতা নিশ্চয়ই ১২৮৫ সালের শ্রাবণ মাসের পূর্বে রচিত হয়েছিল। স্বর্ণকুমারীর অভাগিনী কবিতাটিকে ঐরূপ একটি রচনা বলে চিহ্নিত করা যায়; এবং এভাবে রবীন্দ্রনাথের পূর্বে স্বর্ণকুমারী গাথা রচনা করেছিলেন এরকম একটি পরীক্ষামূলক (tentative) অনুমান প্রাথমিকভাবে গৃহীত হতে পারে। অভাগিনী তাঁর জীবনের অন্যতম প্রাথমিক গাথাকবিতা—এর সপক্ষে কোনো বলিষ্ঠ তথ্য-প্রমাণ নেই সত্য, তথাপি উক্ত অনুমান সমর্থিত হবে কবিতাটির আভ্যন্তরিক বিচারকালে।

উপর্যুক্ত প্রয়োজনের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রেখে লেখিকার প্রথম দিকের কয়েকটি

১১ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি, ১৩২৬, পৃ ১২০, পা. টী. দ্র।

রচনার প্রকাশকাল পরিবেশন করা হল : দীপনির্বাণ (গ্রন্থাকারে—১২৮৩, ডিসেম্বর ১৮৭৬); ছিন্নমুকুল (পত্রিকায় প্রকাশারম্ভ— পৌষ ১২৮৫, গ্রন্থাকারে—নভেম্বর ১৮৭৯); মালতী (১২৮৬, মার্চ ১৮৮০); গাথা (১২৮৭, ডিসেম্বর ১৮৮০)। অর্থাৎ গাথাকাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পূর্ববর্তীকাল পর্যন্ত তাঁর রচনাগুলি প্রধানত আখ্যানাশ্রিত। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম খণ্ডকবিতা বাল্যসখী (ভারতী, ফাল্গুন ১২৮৪)-এর মধ্যে প্রাক্তন স্মৃতিমূলক ঘটনার ক্ষীণ অস্তিত্ব অনুভব করা যায়, যদিও কাহিনী-নিরপেক্ষ হৃদয়ভাবনাই এখানে মুখ্য; এর পরবর্তী প্রকাশিত কবিতা অশ্রুজলও (ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯) একান্তভাবে কাহিনী-নিরপেক্ষ এবং বাল্যসখী-ধর্মী। গাথার প্রথম তিনটি কবিতা ১২৮৬ সালের পৌষ থেকে ১২৮৭ সালের বৈশাখের মধ্যে প্রকাশিত হয়, আর এগুলির মধ্যে কাহিনীকবিতা এবং গীতিকবিতার সংমিশ্রণ কোথাও কোথাও লক্ষ করা যায়। সম্ভবত দীপনির্বাণ রচনার কালে লেখিকা কাহিনীপ্রধান কবিতা রচনায়ও আগ্রহী হন যার পরিণাম গাথাকাব্যের কবিতাবলীর মধ্যে সম্পূর্ণতা তথা সার্থকতা লাভ করেছিল; এবং হয়ত অভাগিনী-শীর্ষক কবিতাটি সেই নির্ঝর থেকে প্রথম উৎসারিত হয়েছিল।

যা হোক, গাথাকাব্য প্রকাশিত হওয়ার পর সেকালের প্রতিনিধিস্থানীয় সংবাদপত্রসমূহে এর সপ্রশংস সমালোচনা মুদ্রিত হয়। ১৮৮০ সালের ২৯ ডিসেম্বর তারিখে সানডে মিরর লিখেছিলেন, This little book of poetical tales is a novelty in Bengali literature, and a novelty the charms of which challenge our sincere admiration. The poetry is the poetry of genuine heart-felt pathos—powerful from its sublimity and affecting from its tenderness. There is not a word or image in the *Gathas* to disturb the placid tenor of sacred melancholy that pervades it, nor an idea or conception to break our dream of a soft communion with something holy and far removed from earth. ভারতী পত্রিকার ১২৮৭ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যার শেষে গাথার যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার সুদীর্ঘ প্রশংসাপূর্ণ মন্তব্য ব্যবহৃত হয়; বস্তুত গ্রন্থটি হিন্দু প্যাট্রিয়টের মাদ্রাজ প্রদেশীয় 'নিজস্ব প্রতিনিধি'র সপ্রশংস সহানুভূতি অর্জন করেছিল।

॥৩॥ বৈদিক ভাষায় 'গাথা' শব্দের অর্থ গান, এই অর্থেই পরবর্তীকালের সংস্কৃতেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সমালোচকগণ পাশ্চাত্ত্য গাথা বা ব্যালাডের মধ্যেও তার গোত্রত্ব লক্ষ করেছেন। আবার সংস্কৃতে কেবল গান অর্থেই নয়— আর্যাজাতীয় মাত্রাবৃত্ত রীতির ছন্দবিশেষ, বিশিষ্ট স্তবকবদ্ধ, একপ্রকার ধর্মমূলক কবিতা, এমনকি 'সংস্কৃতান্যভাষা'[১২] প্রভৃতি

১২ Sanskrit-Wörterbuch, Vol II, 1858, p 731.

বোঝাতেও শব্দটি নানা ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়েছে। অথচ ব্যালাডের মধ্যে যে আখ্যানধর্মিতা বা কাহিনীপ্রাধান্য লক্ষিত হয় সেই বৈশিষ্ট্যও গাথা শব্দটির মাধ্যমে কখনো কখনো প্রকাশ লাভ করেছে, কারণ কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে গাথা হল, a verse not belonging to the Vedas, but to the epic poetry of legends or Ākhyānas, such as the Śunaḥśepa-Ākhyāna or the Suparṇ.[১৩] আবার 'Legend, History (আখ্যান)' এই অর্থেও গাথা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে দেখা যায়।[১৪] এসমস্ত বিচার করে বলা যায় যে ব্যালাডের প্রতিশব্দরূপে আখ্যানমূলক গীতি বা খণ্ডকবিতাকে গাথা শব্দের দ্বারা চিহ্নিত করে স্বর্ণকুমারী সুবিবেচনারই পরিচয় দিয়েছেন, কারণ ইতিহাস পুরাকথা কিংবা কাহিনী তাঁর এইজাতীয় রচনায় প্রাধান্য লাভ করেছিল।

সাধারণভাবে ব্যালাড বা গাথা তথা গীতিকাজাতীয় রচনার পরিচয় হল, In literary usage a ballad is a simple narrative lyric, a song of known or unknown origin that tells a story.[১৫] অন্যতর ক্ষেত্রে ব্যালাড বা গাথার যথার্থ স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে: Ballad, the name given to a type of verse of unknown authorship, dealing with episode or simple motif rather than sustained theme, written in a stanzaic form more or less fixed and suitable for oral transmission, and in its expression and treatment showing little or nothing of the fineness of deliberate art.[১৬] গীতিকা স্বল্পায়তন এবং গীতোপযোগী; কাহিনীবিন্যাস এবং ছন্দ-রীতিতে এর সারল্য অনস্বীকার্য। সেদিক থেকে মৈমনসিংহ-গীতিকা বা পূর্ববঙ্গীয় গীতিকাগুলিকে আমরা প্রাচীন রীতির পর্যায়ভুক্ত করতে পারি। কিন্তু সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মত আধুনিক কালের গীতিকার লেখক আর অজ্ঞাতনামা থাকেন না; লোকসাহিত্যের বিশিষ্ট ধর্ম হল তা হবে গোষ্ঠীমানসের সৃষ্টি, পক্ষান্তরে বিশিষ্ট ব্যক্তির লেখনী-নিঃসৃত ও ব্যক্তিভাবনা-নিয়ন্ত্রিত রচনাকে আধুনিক সাহিত্যের লক্ষণাক্রান্ত বলে মনে করা হয়ে থাকে। প্রাচীন ও আধুনিক গীতিকার প্রধান প্রভেদ এই যে আধুনিক গাথা বা গীতিকা ব্যক্তির রচনা, লোকসাহিত্যের মত সমষ্টির সৃষ্টি নয়; আলংকারিক বা সাহিত্যিক মহাকাব্যের মত আধুনিক গীতিকার এই স্বাতন্ত্র্য কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। ভাবাগত অথবা শব্দপ্রয়োগজনিত স্বাতন্ত্র্যও দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে উঠে

১৩ M. Monier-Williams, A Sanskrit-English Dictionary, 1956, p 352.

১৪ Prin. V. S. Apte's The Practical Sanskrit-English Dictionary, part II, 1958, p 671.

১৫ Encylopedia Americana, Vol III, p 94B.

১৬ Encyclopaedia Britannica, Vol II, p 995.

আধুনিক গাথার মধ্যে ; সাধারণভাবে বলা চলে যে আধুনিক কালের গীতিকার ভাষায় এবং শব্দচয়নে কোনো আঞ্চলিকতার বা উপভাষা-বিভাষার অবকাশ নেই। প্রাচীন গাথা বা গীতিকার মধ্যে কাহিনীর সঙ্গে গীত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিল (It is incomplete without music, music of a repetitive kind.—Robert Graves), কিন্তু আধুনিক গাথার গেয় মূল্য সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হয়েছে। তবু স্বর্ণকুমারী রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কয়েকজনের গাথাকবিতার মধ্যে স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ গীত পরিবেশিত হয়েছে, কিংবা কোনো কোনো অংশের গেয় মূল্য সম্বন্ধে তাঁরা যে সচেতন ছিলেন তারও প্রমাণ আছে। আধুনিক গাথা থেকে প্রাচীন গীতিকার এই বৈশিষ্ট্যটুকু তাই সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি, রূপান্তরের মাধ্যমেই তা নবজন্ম লাভ করেছিল।

সরাসরিভাবে কাহিনীবর্ণনা গাথাকবিতার প্রধান ধর্ম বলে একে সাধারণত আখ্যানমূলক বস্তুনিষ্ঠ সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। অথচ কবির বিশিষ্ট জীবনদর্শন সাহিত্যের মধ্যেই পাওয়া যায় ; আবার কাব্য-ভাবনাসমূহ কবির বাসনালোক থেকে উত্থিত হয় বলে সাহিত্যে-সমর্পিত বিভাবিত বস্তু কখনও একান্তভাবে সাহিত্যিকের মনন-নিরপেক্ষ হতে পারে না। এইজন্য বিশুদ্ধ বস্তুনিষ্ঠতা সাহিত্যে বা শিল্পে কখনও দেখা যায় না, তথাকথিত যে বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি তা ব্যক্তিমনের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত কারণ কবি বাহ্য জগতের বিষয়কে বিভাবিত করার সময় আপনার রুচি-অনুযায়ী প্রয়োজনমত গ্রহণ-বর্জন এমনকি সংযোজনও করে থাকেন। অতএব গীতিকা বা গাথাও যে কবি-মনের বিশিষ্ট আশা-আকাঙ্ক্ষা-সম্পৃক্ত হবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে গীতিকাব্যে প্রাতিস্বিকতার যে অতিশয়িত প্রভাব দেখা যায় তা এইজাতীয় কবিতায় তত সোচ্চার নয়। অবশ্য গীতিকাব্যের মত গাথারও অবয়ব-গত সংকীর্ণতা স্বীকৃত হয়ে থাকে এবং ক্ষুদ্র পরিসরের নিমিত্ত কাহিনীটি নাটকীয় দ্রুতগতিতে পরিণামের অভিমুখে অগ্রসর হয়। নাটকোচিত অন্যান্য উপাদানের মধ্যে ঔৎসুক্য এবং চরম মুহূর্তও এর মধ্যে দুর্লক্ষ্য নয়, নাটকের মধ্যে নাট্যকারের অনুপস্থিতির মত শিল্পীর আপাত-নিরপেক্ষতা এক্ষেত্রেও অনুভূত হয়। আবার আধুনিক গীতিকা অথবা গাথাকবিতাকে ছন্দে রচিত ছোটগল্পও বলা যায়, একটি নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টির জন্যই লেখকের চিন্তারাজি সংহত হয়ে উঠে এই জাতীয় রচনার মধ্যে।[১৭]

প্রাচীন ও আধুনিক রীতির গীতিকার স্বাতন্ত্র্য নির্ণয়কালে সমালোচকে বলেছেন যে আধুনিক রীতির ব্যালাড বা গাথা হল প্রাচীন রীতিরই একটা বিবর্তনসম্মত উন্নততর শিল্পরূপ।[১৮] স্বর্ণকুমারীর গাথাগুলির আভ্যন্তরিক বিচারকালে দেখা যায় প্রাচীন গীতিকা বা

---

১৭ আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোক-সাহিত্য, ১ম, ১৯৬২, পৃ ৩৫২-৫৬।

১৮ The modern ballad may be defined as a literary development of the traditional form...while it clearly owes much to the inspiration of early poetry, and preserves its best

ব্যালাডের আদর্শানুযায়ী সেগুলি গঠিত হলেও এর মধ্যে আধুনিক কালোচিত ভাব ভাষা ও রচনারীতি একটি সুন্দর সঙ্গতি ও সার্থক রাসায়নিক সংমিশ্রণ লাভ করেছিল। এইজাতীয় রচনার মধ্যে লেখকের একটি বিশিষ্ট মনোভাবও আত্মপ্রকাশ করেছে; তাঁর সমাজদর্শন, জগৎ ও জীবনের প্রতি কুণ্ঠাহীন সম্ভ্রমবোধ এবং বিচিত্র প্রকৃতির লোকচরিত্র সম্বন্ধীয় সুগভীর ও ব্যাপক অভিজ্ঞতা যে একটি পরিচ্ছন্ন সম্পূর্ণতা লাভ করেছিল কবিতাগুলি পাঠকালে বারংবার সেই কথাটি মনে পড়ে। এইসকল কবিতার মধ্যে প্রাচীন গাথাসুলভ প্রণয়ে ব্যর্থতাজনিত গ্লানিবোধই বর্ণাঢ্যতা লাভ করেছে। সেকালের কবিসাধারণ বিয়োগান্ত কাব্যকথার প্রতি ছিলেন বিশেষ পক্ষপাতী, ঐরূপ কাহিনীর অবলম্বনে উপন্যাস রচনায়ও দেখা যায় অত্যুৎসাহ; এমনকি গাথাকাব্যের পূর্বে প্রকাশিত স্বর্ণকুমারীর দীপনির্বাণ, ছিন্নমুকুল প্রভৃতি উপন্যাসের মধ্যেও প্রণয়মূলক রোমান্টিক বিষণ্ণতাসর্বস্ব ঘটনার প্রাধান্য লক্ষিত হয়। বস্তুত ব্যর্থ প্রণয়ের জ্বালায় ও দীর্ঘশ্বাসে গাথাকাব্যের পরিমণ্ডল উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। আরও লক্ষণীয় যে কোনো ভৌগোলিক আঞ্চলিকতাই তাঁর কবিমনের অবাধ গতিবিধির বিরুদ্ধতা করেনি, রাজস্থানের বিশ্রুত লোককথার অবলম্বনে রচিত খড়্গ-পরিণয়-শীর্ষক গাথাটি তারই প্রমাণ; দীপনির্বাণ ছিন্নমুকুল প্রভৃতি উপন্যাসের মধ্যেও সেই বিশাল পটভূমিকা অবলম্বনের পরিচয় পাওয়া যায়। রঙ্গলাল-মধুসূদনের নির্দেশিত পন্থানুসরণে ভারতবর্ষের পশ্চিম ভূখণ্ডে উপনীত হয়ে লেখিকা লক্ষ করেছিলেন জগৎ ও জীবনের মধ্যবর্তী একটি পারস্পরিক অখণ্ড সংযোগ; বাংলা দেশের নরনারীর সুখদুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা আনন্দ-বেদনার সহিত তিনি রাজপুতের জীবন-ভাবনার সাদৃশ্য নিরীক্ষণ করেছেন অপূর্ব সহানুভূতির বলে, অথচ এর নায়ক-নায়িকা পাত্র-পাত্রী আদৌ রূপকথার কল্পলোকচারী নয়। বাংলা দেশের সমতল ভূমির শস্যশ্যামল পটভূমিকায় এবং রাজস্থানের অনুর্বর ও পার্বত্য-কঠিন বন্ধুর অঞ্চলে একদা লেখিকা যে এক প্রাণদায়িনী স্রোতস্বিনীর সন্ধান পেয়েছিলেন সকল যুগের সকল দেশের প্রাণকথার মধ্যেই রয়েছে তার অস্তিত্ব, তারই নাম জীবনবোধ। ভৌগোলিক সংকীর্ণতা অতিক্রম করে ভারত-আবিষ্কারের কালে লেখিকা এই সত্যের সম্মুখীন হয়েছিলেন যে সাধের ভাসানের বঙ্গদেশীয় নায়ক-নায়িকা এবং খড়্গ-পরিণয়ের রাজস্থানী পাত্র-পাত্রীর জীবন দেশকালনিরপেক্ষ মানুষেরই জীবন।

॥৪॥ কোনোরকম উপক্রমণিকা পরিবেশবর্ণনা বা চরিত্র-পরিচিতি ব্যতিরেকে নায়কের

traditions, it shows the powerful influences of a later age in its tendency to greater elaboration, the enlargement of description and psychological interest, and a more finished style of art. The really characteristic modern ballad, therefore, represents the natural expansion, not the artificial reproduction, of the primitive type.—W. H. Hudson, An Introduction to the Study of Literature, 1955, p 105.

উক্তির মাধ্যমে অভাগিনী-শীর্ষক কবিতার সূত্রপাত হয়েছে, অথচ ব্রাউনিংয়ের কবিতাসুলভ সেই জটিল নাটকীয় স্বগতোক্তি বা চরিত্রবিশ্লেষণ কিংবা সুতীব্র গতিশীলতা কবিতাটির মধ্যে নেই। অবশ্য নায়ক বিপিন অপেক্ষা নায়িকা দামিনীর মনের বিচিত্র গতিবিধির পুঙ্খানুপুঙ্খ যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা প্রচলিত গাথাকাব্যে একপ্রকার দুর্লভ বললেও চলে। যুবক বিপিন দারিদ্র্যদুঃখ মোচনের জন্য প্রবাসগমনে উৎসুক। জন্মভূমি প্রিয়পরিজন ছাড়তে হবে তাকে, তাই পত্নী দামিনীর সনির্বন্ধ অনুরোধে কাতর হলেও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিপিন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে চলেছে। এস্থলে তার উক্তির মাধ্যমে প্রাত্যহিক জীবনের কড়চা কবিতায় রূপান্তরিত হয়েছে। বাস্তব জগতের একটি সুকঠিন সমস্যাকে বর্তমান কবিতায় সমর্পণ করা হয়েছিল যা তৎকালীন গাথাকাব্যের আসরে আকস্মিকতারই মত। রোমান্সের অত্যাশ্চর্য কল্পলোক নয়, ইতিহাসের বিস্ময়-উদ্রেককারী ধূসরতা নয়, লেখিকার সাহিত্যসাধনার উষালগ্নে রচিত এই কবিতার মধ্যে মর্তের মৃত্তিকা এবং দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতাকে পরিবেশন করা হয়েছিল। সাধের ভাসান-শীর্ষক পরবর্তী কবিতায় মানব-মানবীর জীবনে সমাসন্ন ব্যর্থতার মূলে সামাজিক চক্রান্ত কিংবা সমাজ-শাসনের উৎকট হস্তক্ষেপের কথা বিবৃত হয়েছে। বর্তমান কবিতায়ও উন্মূলিত জীবনের পশ্চাতে দারিদ্র্যের অভিশাপ এবং দুরাত্মা প্রতিবেশীর ব্রীড়াহীন নিষ্ঠুরতাকে সক্রিয় করে তোলা হয়েছে।

নায়িকার পূর্বস্মৃতিচারণার মাধ্যমে লেখিকা দাম্পত্যজীবনের একটি উজ্জ্বল-মধুর চিত্র অঙ্কন করেছেন। মঙ্গলকাব্যের কিংবা পূর্ববঙ্গ-মৈমনসিংহ-গীতিকার নায়িকার মুখে ঐরূপ নিরলঙ্কৃত ভাষায় নারীমনের কামনা-বাসনার পরিচয় ইতিপূর্বেই আমরা লাভ করেছি। আধুনিক যুগের কাব্যসাহিত্যে স্বর্ণকুমারী উক্ত রীতিরই অনুসরণকারী। জীবনের যেসকল সমস্যা চিরন্তন, যুগান্তরে যার কেবল রূপান্তর হয় মাত্র, তার প্রকাশের রীতিও তাই সনাতন; শাশ্বত জীবনবেদ রচনায় তাই প্রত্যেক সাহিত্যিককে সেই একই পন্থা অনুসরণ করতে হয়। মৈমনসিংহ তথা পূর্ববঙ্গের লোকভাষা অথবা রাঢ়ীয় জানপদী সময়োচিত রূপান্তরের মাধ্যমে আধুনিক সাহিত্যের সংলাপে বা বর্ণনায় নানাভাবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে; মানবদরদী জীবনাশ্রয়কারী লেখকগণ সেই সরল অনাড়ম্বর অথচ স্বাভাবিক প্রকাশভঙ্গির প্রতি কখনও বিমুখ হননি, অকারণ সংস্কার বা পরিমার্জনা সেই জীবন-উৎসের স্বতঃস্ফূর্ত ধারা নিয়ন্ত্রণ করেনি। অবশ্য আধুনিক স্বর্ণকুমারীর রচনায় রাঢ়ীয় স্বতোনাসিক্যীভবনের প্রাধান্য কিংবা বঙ্গালী অপনিহিতির প্রাদুর্ভাব থাকা সঙ্গত অথবা স্বাভাবিক নয়, অথচ তাঁর নায়িকার বক্তব্যের সঙ্গে গ্রামীণ সরলতা ও সাহিত্যিক স্বভাবোক্তির কেমন সুন্দর মিলন সাধিত হয়েছে। স্বর্ণকুমারী শিল্পীসুলভ অনায়াস ও স্বতঃসিদ্ধ সহানুভূতির বলে একটি বিড়ম্বিত রমণী-হৃদয়ের ভাষাকে ভাবের স্বর্গে উন্নীত করেছেন, বাণীর বিদ্যুৎ-বিদ্ধ করে

সারস্বত-সত্রে তাকে সমর্পণ করেছেন। এবং এভাবে প্রোষিতভর্তৃকা দামিনীর হৃদয়ার্তি মধ্যযুগীয় নায়িকার ব্যথা-বেদনার সহিত অভিন্নতা লাভ করেছে।

হৃদয়ের গভীরে যে শোকের উদ্ভব তা-ই শ্লোকত্ব প্রাপ্ত হয়। দামিনীর নিঃসঙ্গতা থেকে অভিমানাহত হৃদয়ের বাণী সঞ্জাত হয়েছে সর্বপ্রথম, তারপর সেই পুঞ্জীভূত শোক শ্লোক বা বেদনার গানে রূপান্তরিত। দ্বিতীয় পর্যায়ে এই সীমাহীন ব্যথা সান্ত্বনাহীন শোক ও অতলান্ত নৈরাশ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অতীত কথা স্মরণে এবং অতীতের তুলনায় বর্তমানের প্রখর বৈষম্য উপলব্ধিতে দীর্ঘশ্বাসের কণ্টকশয্যা লাভ করেছে দামিনী। 'ভীষণ নিশীথে বিষাদ-প্রতিমা-পারা' দামিনীর শূন্যময় দৃষ্টি নক্ষত্রের দিকে নিবদ্ধ :

পাংশু বদনে অমানুষী ভাব জীবন নাহিক তায়,
প্রশান্ত নয়নে নাহিক পলক জ্যোতিও নাহিক তায়।
হাতটির পরে রয়েছে কপোল এলোমেলো চুলগুলি
নিরাশার ছবি পাথরে কে এঁকে ফেলে গেছে যেন ভুলি।

নিবাতনিষ্কম্প চিতাগ্নি-শিখার মত শোকস্তম্ভিত দামিনীর চরিত্রে একটি অতিপ্রাকৃতের স্পর্শ লেগেছে, প্রাণহীন জ্যোতিহীন প্রস্তরীভূত নৈরাশ্যের সঙ্গে অতিপ্রাকৃতের এই সংযোগ ভয়াল সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। যেসকল উপযোগী উপমার সাহায্যে নায়িকার এই চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তন্মধ্যে নিরাশার ছবি পাথরে, পাষাণ-বালা, বাল্যের নিরাশা-সাগরে যাতনা-ঢেউ, রোগীর অন্তিম হাসির মতন, মেঘেতে বিজলী মত, রোগীর অনন্ত কালের মত, চোখে বহিল কেবল জলন্ত অনল-নীর, হৃদয় শ্মশান-পারা প্রভৃতি এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ; বিশিষ্ট বিরোধাভাসের মাধ্যমেও দামিনীর বিপর্যস্ত জীবনের শোচনীয় পরিণামের চিত্রটি ফুটে উঠেছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে ঘন অশ্রুবাষ্পে-ঢাকা এই গাথাকবিতাটি কোনো সুলভ দুঃখ-বিলাসের সাধারণ নিদর্শন নয়, নিয়তি-কবলিত মানবজীবনের মর্মান্তিক বিপর্যয় পাঠকের মানসিক ভারসাম্যকে বিচলিত করে দেয়। একদা হিন্দু প্যাট্রিয়টে কবিতাটি সম্বন্ধে বলা হয়েছিল, the best piece in the book is certainly that with which it concludes....The feeling and situation of the unfortunate wife are beautifully conceived and skilfully delineated. The richness of imagination with which the picture of final Catastrophe is drawn cannot be sufficiently admired and reminds us of some Byron's vigorous touches.[১১]

১১ ভারতী, অগ্রহায়ণ ১২৮৭, সংখ্যাশেষের বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য।

একমাত্র নায়িকা চরিত্রের সর্বৈব প্রাধান্য কবিতাটিকে অন্যান্য গাথাগুলি থেকে স্বতন্ত্র করে দিয়েছে। খড়্গ-পরিণয় ঘটনাপ্রধান, সাশ্রুসম্প্রদানেও ঘটনাগত জটিলতা প্রবল। অবশ্য সাধের ভাসানের মত অভাগিনীতে মাত্র দুটি চরিত্রেরই অস্তিত্ব আছে, কিন্তু বর্তমান কবিতায় দামিনীর মনের জটিল অবস্থা ও বিচিত্র গতিকে লেখিকা সহানুভূতির সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেছেন। বিচ্ছেদের সম্ভাবনায় আশঙ্কা, অনুরোধের আকুলতা, প্রতীক্ষায় উদ্বেগ, মিলন-আশায় উদ্বেলতা এবং চরম হতাশা ও নৈরাশ্যে গ্লানি প্রভৃতি বিচিত্র ও জটিল মানসিক পর্যায়গুলি একটিমাত্র নারীর জীবনের অবলম্বনে লেখিকা ফুটিয়ে তুলেছেন ; পক্ষান্তরে অন্যতর চরিত্র বিপিন কেন্দ্রীয় চরিত্র নায়িকাকে স্ফুটতর করার কাজে সহায়কমাত্র। কাহিনীর প্রথমে তার আশা-আকাঙ্ক্ষার যে পরিচয় পাওয়া যায় পরিণামে এই ভাগ্যান্বেষী যুবকের জীবনে সেগুলি কতদূর সফল হয়েছিল তার কোনো সংবাদ লেখক পরিবেশন করেননি। পার্শ্বচরিত্রের প্রতি এই অমনোযোগিতা দেখা দিয়েছে সম্ভবত রচনাগত দ্বিধার জন্য। খণ্ড মুহূর্তকে মহিমান্বিত করে তোলার ব্যাপারে গীতিকবির অখণ্ড মনোযোগ ও বাসনা একান্তভাবে নায়িকার চিত্তসংকটকে কেন্দ্র করে পুনঃপুনঃ আবর্তিত হয়েছে, তাই নায়িকার জীবনের গতি-প্রকৃতি ও বিচিত্র সন্ধিগুলি আলোকে উদ্ভাসিত ; প্রতিতুলনায় বিপিন উপেক্ষিত, নেপথ্যোচিত। কবিতাটির নামকরণও এক-কেন্দ্রিকতার লক্ষণাক্রান্ত ; অন্যান্য কবিতার নামে ঘটনাগত দিকটি প্রাধান্য লাভ করেছে, কিন্তু 'অভাগিনী' বিশেষণটি একটিমাত্র স্ত্রীচরিত্র দামিনী তথা স্ত্রীলিঙ্গান্ত বিশেষ্য পদের গুণপ্রকাশক। এই নামকরণের ব্যাপারে লেখিকার একাগ্রচিত্ততা মোটেই বিক্ষিপ্ত হয়নি, কোথাও কোনোরকম অস্পষ্ট সাংকেতিকতা কিংবা জটিল রূপকানুরক্তির পরিচয় নেই ; অথচ অপর তিনটি কবিতার নামের মধ্যে শেষোক্ত রীতিরই অনুসরণ দেখা যায়।

ফলত কাহিনীকাব্যোচিত ঘটনাগত জটিলতার অভাবাত্মকতা অথবা ঘটনার স্বল্পতা, একটিমাত্র চরিত্রের অব্যাহত প্রাধান্য এবং তার ঘটনাবহুল জীবন অপেক্ষা চিন্তাজটিল মনের স্বরূপসন্ধানে লেখকের পক্ষপাতিত্ব—এর প্রতিটি বৈশিষ্ট্য অভাগিনী কবিতাকে বস্তুনিষ্ঠ গীতিকাজাতীয় রচনার ক্ষেত্র থেকে অপসারিত করে মানবমনের ভাব-ভাবনাকেন্দ্রিক মন্ময় কবিতার জগতে পুনরায় স্থাপিত করেছে। কবিতাটি রচনার পূর্বে লেখিকা ঘটনাপ্রধান ও চরিত্রবহুল উপন্যাস দীপনির্বাণ রচনা করেছিলেন ; কিন্তু ঘটনাপ্রধান কবিতার জগতে প্রথম পদক্ষেপের কালে হয়ত এমন একটি দ্বিধা এসেছিল যার ফলে কেন্দ্রীয় চরিত্র ব্যতীত আর সমস্তকিছুই অস্পষ্ট বা ধূসর হয়ে রয়েছে। অন্যান্য গাথাকবিতার সঙ্গে তুলনামূলকভাবে আলোচনা করলেও দেখা যায় যে রচনাকালের দিক থেকে অভাগিনীর পরবর্তী কবিতা সাধের ভাসানের মধ্যে কবি অপেক্ষাকৃত সহজ এবং সাবলীল হয়ে উঠেছেন, কাহিনীগত জটিলতা

এবং তজ্জনিত চরিত্রসংখ্যা-বৃদ্ধি প্রভৃতি ব্যাপারে লেখিকা যেন অধিকতর সাহসী ; আরও পরবর্তী রচনা খড়্গ-পরিণয়ে সেই আত্মবিশ্বাস অন্ধকারাচ্ছন্ন ইতিহাসের বিস্তৃততর ক্ষেত্রে অধিকতর সার্থকতা বা স্পষ্টতা লাভ করেছে, এবং সাশ্রুসম্প্রদানে তারই চরম বিকাশ। ইতিহাসের অনালোকিত রন্ধ্রপথে যাতায়াত করে লেখিকা অতীত ও বর্তমানের সেতুবন্ধ রচনা করেছেন, এবং এভাবে দীপনির্বাণের পর খড়্গ-পরিণয়ের নির্মাণকালে নিজের কল্পনার প্রতি অধিকতর আস্থা স্থাপন করেছেন। সাধের ভাসানের নায়ক-নায়িকা পরস্পরের জীবনের পূর্ণতা অর্জনের সহায়করূপে সেখানে সক্রিয় হয়ে উঠেছে, তাদের সার্থকতা-ব্যর্থতার পরিধি তারাই রচনা করেছে ; সমগ্র জীবনবৃত্তের যে ব্যাস কল্পনা করা যায় এই চরিত্রদ্বয় তারই দুটি প্রান্তবিন্দু। কিন্তু অভাগিনী কবিতাটি একান্তভাবে নায়িকাসর্বস্ব বলে কবিতাটি বিবৃতিপ্রধান, নাটকীয় নয়—স্বগতোক্তিপ্রধান, সংলাপময় নয়—বিশ্লেষণমূলক, ইঙ্গিতধর্মী নয়। গীতিকবির মর্মকোষে যে মধু সঞ্চিত হতে থাকে তা-ই অভাগিনী কবিতার আধারে পরিবেশিত হয়েছিল, বিশালতা বা বিস্তৃতি তার ধর্ম নয়। গাথাকবিতা রচনার প্রথম পর্বে সংকীর্ণ সীমার মধ্যে কবি আপনার সৃষ্টির সার্থকতা আস্বাদ ও আত্মবিশ্বাস অর্জন করার পর বিস্তৃততর জটিলতার জগতে পদবিন্যাস করবেন সেটাই স্বাভাবিক। এইরূপ আভ্যন্তরিক বিচার থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যে অভাগিনী কবিতাটি তাঁর প্রথম গাথাকবিতা যেখানে দ্বিধা-দুর্বলতা সত্ত্বেও সম্ভাবনাপূর্ণ প্রতিশ্রুতির অভাব ছিল না ; এই কবিতাই কাহিনীকাব্য রচনার সেই আদিপীঠ যেখানে প্রকাশের আকুলতার সঙ্গে সংকোচ অপরিহার্যরূপে আবির্ভূত হয়েছে। অপিচ লক্ষণীয় যে এই সংকোচ কেবল বিষয়গত নয়, রূপ বা প্রকরণগতও বটে। যদিও দামিনীর স্বগতোক্তিতে মধ্যযুগীয় ক্লাসিক্যাল কাব্যোচিত অনুপম সারল্য এবং আধুনিক কবিতাসুলভ সূক্ষ্ম সাংকেতিকতা দুর্লভ নয় তথাপি ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা কাব্যের রোমান্টিক বেদনাবিলাসের আতিশয্য ও অস্বাভাবিকতা তথা কৃত্রিমতা[২০] বর্তমান কবিতাকে স্পর্শ করেছে ; এমনকি অনুভূতির কৃত্রিমতা শব্দচয়ন বা ছন্দোবন্ধকেও দুর্বল বা শিথিল করে দিয়েছে, বিশেষত কাব্যভাষাসৃষ্টির দিক থেকে কবিতাটি প্রাথমিক স্তরের। বলাবাহুল্য এই দ্বিধা ও সংকোচের বিহ্বলতাকে তিনি পরবর্তী পর্যায়ে জয় করেছিলেন।

॥৫॥ 'সাধের ভাসান' কবিতাটিতে দেখা যায় যে নায়িকা সরলা ও নায়ক বিনোদের প্রেমে এমন একটি প্রতিবন্ধকতা দেখা দিয়েছিল যার ফলে উভয়েই উন্মাদপ্রায়। কিন্তু উভয়ের

২০ একে Wertherism-রূপে চিহ্নিত করা অনুচিত। ওয়ের্দারের দুঃখ অকারণ-জাত নয়, এক অসাধারণ জীবনপ্রীতি তার বেদনা ও ব্যর্থতাকে মর্যাদামণ্ডিত করে তুলেছিল। সেহেতু বিগত শতাব্দীর বাংলা কবিতার প্রবল দুঃখোচ্ছ্বাস এই ওয়ের্দারিজমের যথার্থ বিকল্প হতে পারে না।

আগ্রহাতিশয্যে মিলন হল ঝটিকাক্ষুব্ধ নদীর বুকে ভাসমান ক্ষুদ্র তরণীতে, পরিণামে তারা সলিল-সমাধি লাভ করল। বর্তমান কাহিনীটি তিনটি পর্বে বিভক্ত। নদীতীরে উদ্দেশ্যহীন-ভাবে ভ্রমণরত উন্মাদিনী সরলার চিত্রটি বড়ই মর্মস্পর্শী, বিপর্যস্ত জীবনের পরম শূন্যময়তা চরিত্রটির মানসিক ভারসাম্য বিচলিত করে দিয়েছিল। এই পক্ষাঘাতগ্রস্ত জীবনের ধ্বংসাবশেষ থেকে কেবলমাত্র 'ভুলে যাও ভুলে যাও ভুলে যাও দুখিনীরে' গানটি উত্থিত হয়েছে, রমণীজীবনের অরুন্তুদ ব্যর্থতা ও চরম লাঞ্ছনা হৃদয়ের সুগভীর স্তরে শোকসংগীতের আকার ধারণ করেছে; নায়িকার এই আত্মবিস্মৃতি পাঠকের হৃদয়েও সুগভীর বেদনা বিস্তার করে। অনুতাপে জর্জর বিনোদ উন্মাদিনী সরলাকে গ্রহণ করল, 'সাক্ষী রবিশশী সাক্ষী দেবতারা সাক্ষী এ পবিত্র জনমভূমি'; তারপর বিক্ষুব্ধ জীবন-নদীতে দাম্পত্যের মধুময় নৌবিহার। নদীবক্ষে ঝটিকার আবির্ভাব এবং তার ধ্বংসলীলা বর্ণনায় লেখিকা যদিও বিহারীলাল-পন্থী তবু স্বাতন্ত্র্যাশ্রিত সামর্থ্যের পরিচয়েরও অভাব নেই। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, চন্দ্র অস্তমিত; কেবল এই ভয়াবহ নিস্তব্ধতাকে আরও ভীষণ করে তুলেছে তরুণ-তরুণীর নৌবিহার। পরিণামে সরলা ও বিনোদ লাভ করেছে নদীগর্ভের নিস্তরঙ্গ সুশীতল শয্যা যেখানে বহির্জগতের কোনো জ্বালা-যন্ত্রণা সামান্যতম আলোড়নও সৃষ্টি করতে পারে না। এ যেন সৃষ্টির প্রথম দম্পতির জীবনে নেমে-আসা বিধাতার রুদ্ররোষ। দুঃসহ যন্ত্রণাবিদ্ধ ক্রৌঞ্চ-ক্রৌঞ্চীর এই জীবনালেখ্য আমাদের সমূহ শুভ বোধবুদ্ধিকে মুহূর্তে স্তম্ভিত করে দেয়। নিয়তি-কবলিত মানবজীবনের এই অসহায়তার সঙ্গে অনিবার্য মৃত্যুর বিরুদ্ধে জীবন-সংগ্রামের মহিমা মিশ্রিত হয়ে কাহিনীকে এক মহাকাব্যোচিত ভাব-বিশালতা দান করেছে। উপসংহারে মল্লারে গেয় একটি গানের মধ্যে শান্তিপাঠ করা হয়েছে দীর্ঘশ্বাসে পরিপূর্ণ কাব্যবস্তুটির সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষার জন্য।

এই গাথাটির মধ্যে রাগরাগিণীর উল্লেখ সহযোগে দুটি গানের ব্যবহার করা হয়েছে, ফলে সীমিত আয়তনের এই গাথা বা গীতিকাটির মধ্যে একাধিক গানের অন্তর্ভুক্তি সুতীব্র নাটকীয় গতিবেগের প্রবল অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কবিতাটিতে গীতিকবিতার রূপ ও স্বরূপ যেন বেশি পরিমাণে ধরা পড়েছে। মানবমনের বিশিষ্ট একটি ভাবনার ঐকান্তিক প্রাধান্য হয়ত এখানে নেই, তবে ব্যর্থ প্রেমের অন্তর্জ্বালায় নায়ক-নায়িকার চিত্তবৃত্তিসমূহের বিশৃঙ্খল অবস্থা যেন একাগ্র হয়ে অন্য সমস্ত কিছুকে অতিক্রম করেছে। ঘটনার গৌণ ভঙ্গিও লক্ষণীয়, সমস্ত কাহিনীটি যেন নেপথ্যে ঘটিত। গীতিকবিতা বা ছোটগল্পের মধ্যে একটি খণ্ড ক্ষুদ্র মুহূর্তের অভিজ্ঞতা আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে মহিমান্বিত হয়ে থাকে, সাধের ভাসান কবিতার মধ্যে সেই প্রয়াসের সার্থকতা দেখা যায়। নেপথ্যের কাহিনী এবং কবিতায় বর্ণিত সামান্য ঘটনাটুকু নায়ক-নায়িকাকে তীর থেকে তরীতে

এনে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ প্রলয়ের নদীগর্ভে নিক্ষেপ করেছে বিসর্জনের প্রতিমার মত। তাদের স্বগতোক্তি, পারস্পরিক আনুগত্যপ্রকাশ, আত্মনিবেদন প্রভৃতি জীবনের দুর্বল মুহূর্তগুলি কবিতার মধ্যে চকিতে আত্মপ্রকাশ করেই ক্ষণপ্রভার মত মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গেছে। জীবনের পূর্ণতা অর্জনের জন্য সুদীর্ঘ সাধনার পর যে মুহূর্তে তারা সিদ্ধিলাভ করল ঠিক তখনই আকস্মিকভাবে ঝটিকা প্লাবন ভূকম্প জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক অন্ধ শক্তি তাদের স্ফুটনোন্মুখ জীবনের উপর উপসংহারের মসীকৃষ্ণ যবনিকা টেনে দিল। নৈসর্গিক শক্তির হৃদয়হীনতা তথা বিরূপ নিয়তির প্রতিকূল আচরণের নিকট মানবজীবনের আনন্দময় ক্ষণগুলি কতই না অকিঞ্চিৎকর! এই বৃহৎ সত্যের সুর সমগ্র কবিতার প্রতিটি সন্ধিস্থলে অনুরণিত হয়ে উঠেছে।

॥৬॥ 'সাশ্রু সম্প্রদান' গাথাকাব্যের প্রথম কবিতা যার মধ্যে একটি সুগভীর কারুণ্যপূর্ণ মিলনকথা আশ্রয় লাভ করেছে। ত্রিকোণ-সংঘর্ষ-বিশিষ্ট বক্ষ্যমাণ প্রণয়-কাহিনীটিতে প্রেমনিবেদন ও তার প্রত্যাখানের সংকট উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত। কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়ে লেখিকার কালজয়ী প্রতিভা এক অনুকূল বাতাবরণ লাভ করেছে। প্রত্যাখ্যাতা নলিনী সংসারের প্রতি বিরাগী হয়ে সন্ন্যাসিনীর বেশে সাগরতীরে মহেশের নির্জন মন্দিরে উপস্থিত। এস্থলে বেলাভূমির আরণ্যক সৌন্দর্য এবং সমুদ্রের ভয়াল রূপবর্ণনায় কবির লেখনী দ্বিধাহীন : 'বিশাল তমাল তাল, বিছায়ে বিমানে ডাল, আটকি রেখেছে হেথা শশাঙ্ক তপন ;/ নাহি যেন শব্দ-লেশ, গভীর নিস্তব্ধ দেশ, ভীষণ গভীর যেন শ্মশান মতন। / কেবল বায়ুর স্বনে মর্মরিছে বৃক্ষগণে, গরজিয়া সিন্ধু-বুকে খেলিছে তুফান ; / দিগন্তের সীমা ঢাকি, নিবিড় নীলিমা মাখি, অনন্তে অসীম সিন্ধু ঢেলেছে পরাণ। / হেথায় মন্দিরমাঝে যৌবনে-যোগিনী-সাজে শিবের সম্মুখে বালা উমার সমান, / বদ্ধ কর দুটি যেন শোভে পদ্মকলি হেন, মুদিত রয়েছে দুটি নলিনী নয়ান।' মানবচরিত্র-জিজ্ঞাসায় লেখিকার কৌতূহল ছিল সুগভীর। ঔপন্যাসিকের এই অন্যতম প্রধান কর্তব্যবোধ তাঁর চিত্তে যে সর্বদা জাগ্রত ছিল তার প্রমাণ এ কবিতাটির সর্বত্র বিদ্যমান। তপস্বিনী অপর্ণার উপমান উপমেয় নায়িকা নলিনীর চরিত্রকে গৌরবান্বিত ও মহিমাদীপ্ত করে তুলেছে, বিশেষত পরিণামে তার সাধনায় সিদ্ধিলাভও ব্যঞ্জিত হয়েছে এই উপমারই মাধ্যমে। মিলন-প্রত্যাশায় বিক্ষুব্ধ অসীম সিন্ধু দিগ্বলয়ের নিবিড় নীলিমার বুকে বিলীন হয়ে যায়, নায়িকার জীবনেও মিলনের সেই সুন্দর ক্ষণটি আসন্নপ্রায়। যার জন্য অজিতের প্রণয় সে উপেক্ষা করেছে সেই হতাশপ্রেমিক যুবকের অন্তর্দাহের কথাও এই অংশে পাওয়া যায়। বিচ্ছেদজনিত বেদনার মধ্যে নলিনী ও যুবক তাদের প্রেমের গভীরতা ও মহিমা উপলব্ধি করতে পেরেছে।

তৃতীয় পর্বে তাদের মিলন বিবাহের মধ্যে সার্থকতা লাভ করলেও একটা উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসের

মধ্যে কাহিনীটি পরিসমাপ্ত। উপসংহারে দেখা যায় প্রত্যাখ্যাত অজিত ইতিপূর্বে মহামায়ার চরণে আত্মনিবেদন করেছিল, এখন সে-ই তার প্রিয়পাত্রী নলিনীকে মহাকালীর মন্দিরের মধ্যে যুবকের হস্তে সম্প্রদান করল :

মন্ত্র পাঠ করি পরাইয়ে মালা বালার হাতটি স্বহাতে নিয়ে
সম্প্রদান তাহা করিল যুবারে, বিধিমতে দিল তাদের বিয়ে।
একবার শুধু আটকিল কথা, একবার হিয়া কাঁপিল তাতে,
এক ফোঁটা তার আঁখিজল শুধু পড়িল বালার হাতে।

এই সাশ্রু সম্প্রদানের মধ্যে যে মানবিক দুর্বলতাটি অজিতকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়েছে তা সত্যিই অপূর্ব। সমগ্র কবিতায় অজিতের চরিত্রগত পারম্পর্য সুন্দরভাবে সুরক্ষিত, হৃদয়ের উদ্বেলতা ও চিত্তের সুকঠিন সংযমের ভারসাম্যটুকু এক্ষেত্রে লক্ষণীয় ; প্রণয়-নিবেদনের দিনে যে প্রত্যাখ্যান এসেছিল তাকে সে যেমন সহজভাবে গ্রহণ করেছে পরম ত্যাগের মুহূর্তে সুকঠোর কর্তব্য পালনেও সে তেমনি দ্বিধাহীন। নম্রচিত্তে ভবিতব্যতাকে স্বীকার করে নিয়ে সে সহিষ্ণুতা ও তিতিক্ষার বেদীতে প্রতিষ্ঠিত। সাশ্রু সম্প্রদান পাঠকালে টেনিসনের 'এনক আর্ডেনে'র (১৮৬৪) কথা প্রসঙ্গক্রমে সহৃদয় পাঠকের মনে পড়া স্বাভাবিক।

গাথাকবিতার স্বমিতায়তনে প্রত্যেকটি চরিত্রের ধারাবাহিক উন্মেষ ও পরিণতি প্রদর্শনের অবকাশ স্বল্প, লেখিকাও ঔপন্যাসিকের সেই মহৎ উদ্দেশ্যের যথাযথ অনুসরণ করেননি ; তথাপি চরিত্রগুলির বিকাশ এবং পরিণতির স্তরসমূহ আদৌ অস্পষ্ট নয়। নলিনী কর্তৃক অজিতের প্রত্যাখ্যান-দৃশ্যটি অপর যুবকের জীবনকে কেবল রক্তাক্ত করে দেয়নি, বৈষম্যবোধের প্রতিক্রিয়া যুবকটির ঔদাস্যকে প্রবল করে তুলেছে ; এতৎসঙ্গে ঘটনাস্থলে অজিতের উপস্থিতি তার অন্তরে ঈর্ষামিশ্রিত বেদনার উদ্রেক করেছে। মনের এই বিশৃঙ্খল অবস্থায় মৃত্যু তার নিকট পরম রমণীয় বলে মনে হল, অথচ যখন সে সমুদ্র-উপকূলের অরণ্যে 'যৌবনে-যোগিনী' নলিনীর সাক্ষাৎ লাভ করল তখনই তার চিত্তের পূর্ব-প্রতিকূলতা আবেগময় প্রসন্নতায় পর্যবসিত হয়েছে। ক্ষোভের আতিশয্যে সে যতটা নির্মম হয়ে উঠেছিল, অনুরাগের আত্যন্তিকতায় সে ততোধিক অনুকূল হয়ে উঠল ; সুতীব্র বেদনার মত সুগভীর আনন্দও সে প্রবলভাবে অনুভব করে থাকে। তার চরিত্রের এই স্বাতন্ত্র্য সমগ্র কাহিনীর মধ্যে ইতস্তত বর্তমান এবং কখনো তা অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক হয়ে উঠেনি।

কাহিনীটির মধ্যে রোমান্সের পরম আশ্চর্যময়তার সঙ্গে রূপকথার রহস্যের সঙ্গম ঘটেছে। নলিনীর ভাবী পতির নাম কাহিনীর মধ্যে একান্তভাবে উহ্য, অনুচ্চারিত ; কেবল তাই নয়, প্রত্যেকটি চরিত্রের পূর্ব-ইতিহাসের অভাবও লক্ষণীয় এবং নলিনী অজিত যেন কোনো

ব্যক্তিচরিত্র বা ইনডিভিজুয়্যাল নয়। ত্রিভুজ-প্রেমের (the eternal triangle) আখ্যানকাব্য রচনার যে রীতি উনবিংশ শতাব্দীতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল বর্তমান গাথাটি সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। তাঁর অন্যান্য রচনায়ও এই রীতি বিচিত্রভাবে অনুসৃত হয়েছে।

॥৭॥ স্বর্ণকুমারীর 'খড়্গ-পরিণয়ে'র ঘটনাগত উপাদান টডের রাজস্থান থেকে গৃহীত। ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত এই কবিতা যখন ভারতীতে প্রথম প্রকাশিত হয় (চৈত্র ১২৮৬) তখন তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের একটি গান পরিবেশিত হয়, গাথাকাব্য সংকলনকালে লেখিকা ঐ গান বর্জন করে কবিতাটির প্রয়োজনীয় সংশোধন করেন।[২১] পার্নেল বা পোপের অনুসরণে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর বিবিধ কাব্য রচিত হলেও 'ভারত-গাথা'য় (১৮৯৫, ২য় সং ১৯০০) বিশুদ্ধ ইতিহাস-বর্ণনার ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য প্রদর্শন করেছিলেন লেখক। স্বর্ণকুমারীর খড়্গ-পরিণয়ের সঙ্গে উক্ত গাথাকবিতাগুলির সাধর্ম্য থাকা স্বাভাবিক, তথাপি লেখিকার স্বতন্ত্র রুচির স্পর্শ বর্তমান কবিতাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। প্রসঙ্গত বলা আবশ্যক যে একান্ত বর্ণনাসর্বস্বতার মধ্যেও যে দুর্লভ কবিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় সেদিক থেকে লেখিকাকে আধুনিক কাহিনীকাব্যকার কোলরিজের সমধর্মী মনে করা অসঙ্গত কিছু নয়, যদিও ভাষার সেই সুতীক্ষ্ণ সংকেতময়তা বা অতিপ্রাকৃতের স্পর্শযুক্ত রহস্যজটিল মানবমনের স্বরূপ-উদ্ঘাটন-প্রয়াস এই কবিতায় বিশেষ প্রাধান্যলাভ করেনি ; বরং এক্ষেত্রে আখ্যায়িকা ও গীতিকবিতার রূপ-রীতির সমন্বয়সাধনের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখিকার কৃতিত্ব নির্ণয়কালে ভিক্টোরীয় যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি আলফ্রেড টেনিসনের কথা মনে পড়া স্বাভাবিক। গাথাকাব্য সমালোচনা প্রসঙ্গে ক্যালকাটা রিভিয়ু সঙ্গত কারণে মন্তব্য করেছিল, The stories are told in a half-lyrical half-narrative style, of which the fair writer seems to be a perfect master. Her versification is sweet, smooth,

২১ ঐ গানের প্রথম ছত্র : 'তারে দেহ গো আনি'।—দ্র গীতবিতান, পৃ ৯৯৬। ভারতীতে প্রকাশের কালে খড়্গ-পরিণয়ের তৃতীয় পর্যায়ের শেষটি ছিল নিম্নরূপ :

> 'কুসুম-বিছানা টেনে ফেলি দূরে কঠিন ভূতলে সঁপিয়া কায়,
> আপনার মনে গুণগুণ স্বরে কাতর পরাণে গানটি গায়,—
> তারে দেহ গো আনি'……ইত্যাদি।

কাব্যসংকলনের সময় ঐ গানটি বর্জন করে উক্ত অংশে লেখিকা যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করেন তা এইরূপ :

> 'কুসুম-বিছানা টেনে ফেলি দূরে কঠিন ভূতলে সঁপিয়া কায়,
> জনমের শোধ দেখিতে রতনে পথ-পানে বালা কাতরে চায়।'

musical and eloquent. She appeals strongly to her reader's feelings. She describes the minds of lovers with great skill, and she has also a fine pencil for extenal objects.[২২]

খড়্গ-পরিণয় কবিতাটির সূচনায় লেখিকা টডের রাজস্থান থেকে সামান্য অংশ উদ্ধৃত করেছিলেন, মূল গ্রন্থে এর বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।[২৩] স্বর্ণকুমারীর কবিতায় কাহিনী ঈষৎ পরিবর্তিত হওয়ার ফলে ঘটনাপ্রবাহ নাটকীয় তীব্রতা লাভ করেছে। লেখিকা মেবারের রাণা রতন এবং 'বিখ্যাত সুরজ বুন্দি-নরপতি'র চরিত্র অঙ্কনে টডের অনুসরণ করেছেন। 'অম্বরের রাজা পৃথ্বীরাজ-বালা'র নাম টডে উল্লিখিত না হলেও কবিতায় সে অলকা, ফলে টডের গ্রন্থে বর্ণিত ওই চরিত্রটির মধ্যে যে অপরিচয়ের রহস্য ছিল খড়্গ-পরিণয় শীর্ষক কবিতায় তা দৃঢ়মূল এবং বিশ্বাস্য বাস্তবতা লাভ করেছে। চপলা চরিত্রটি স্বর্ণকুমারীর নিজস্ব সৃষ্টি; টডের গ্রন্থে তার কোনো অস্তিত্ব ছিল না, যে আভাস ছিল তাও অনির্দিষ্ট এবং অস্পষ্ট, কিন্তু কবিতার মধ্যে চরিত্রটি বড়ই জীবন্ত। অলকার সখী চপলা বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহের নির্মলকুমারীর[২৪] মত এমন সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল যার পরিণামে ঘটনাবৈচিত্র্য অধিকতর মনোহর হয়ে উঠেছে। রতনের সঙ্গে অলকার গোপন-বিবাহের কোনো কারণ টড উল্লেখ করেননি, কিন্তু স্বর্ণকুমারীর কবিতায় তার একটি বিশ্বাসযোগ্য কারণের সন্ধান পাওয়া যায়; এবং এভাবে লেখিকা কাহিনীর প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করে চমৎকারিত্ব আনয়ন করেছেন। দুর্ভাগ্যবশত এই বিবাহের কথা গোপন রাখার ফলেই কাহিনীগত জটিলতা উপস্থিত হয়েছে। বিবাহকথা গোপন রাখার ব্যাপারে মেবাররাজের আদেশপালনে অলকার নিষ্ঠা এবং রতনের শুভকামনায় তার আত্যন্তিক আগ্রহ পরিণামে বিষাদময় অবস্থার সৃষ্টি করেছে, ট্রাজিক চরিত্রের মত নিয়তির বিরুদ্ধে তার অসহায়তা তাই সহৃদয় পাঠকের হৃদয়ে ভীতিমিশ্রিত শ্রদ্ধা জাগ্রত করে। মেবারের সিংহাসন লাভের পরও রাণা রতনসিংহ অলকাকে স্বগৃহে আনয়নের কোনো আয়োজন করেননি, টডের বর্ণনা থেকে এর কারণ অনুমান করা যায়। টড বলেছেন, রতন ইতিপূর্বে সুরজের ভগ্নীকে বিবাহ করেছিলেন, তাই অলকার প্রতি দুষ্মন্তসুলভ এই উপেক্ষা তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। স্বর্ণকুমারী এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করেছেন। তাই চপলা যখন অলকার প্রতি রতনের এই অবহেলার জন্য অভিযোগ এনেছে তখন রাজকুমারী সেই অভিযোগের প্রতিবাদ করে জানিয়েছে যে রাজব্রত বা রাজনৈতিক ব্যাপারই এই বিলম্বের

২২ পৃথিবী (১২৮৯) গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রদত্ত গাথার বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য।

২৩ Rajasthan, 1950, Vol I, pp 247-48.

২৪ বঙ্গদর্শনে রাজসিংহ অংশত প্রকাশিত—১২৮৪-৮৫; খড়্গ-পরিণয়ের প্রথম প্রকাশ: ভারতী, চৈত্র ১২৮৬।

প্রত্যক্ষ কারণ। স্বর্ণকুমারীর এই ব্যাখ্যায় নায়ক-নায়িকা উভয়েরই প্রতি আমরা সম্ভ্রমশীল হয়ে উঠি।

কয়েকটি বর্ণনার মধ্যে স্বর্ণকুমারীর বিস্ময়কর কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। রতনের বিবাহের সংবাদ শ্রবণে অলকার হৃদয় বিষণ্ণ, শরীর নীহার-পীড়িত শ্বেতপদ্মের মত অবসন্ন, নয়নের জ্যোতি প্রভাতকালীন চন্দ্রের মত প্রভাহীন, 'মরম ভেদিয়া উৎসের মত নয়নে উথলি উঠিল জল' ইত্যাদি। উপমা মৌলিক না হলেও প্রয়োগকৌশল প্রশংসনীয়। সুরজের রাজধানী বুন্দির বিবাহবাসরে মৃতকল্প অলকার বর্ণনা আমাদের সমূহ মূল্যবোধকে বিপর্যস্ত করে দেয়:

নেত্রে নাহি জ্যোতি, না পড়ে পলক, স্তব্ধ শোণিত বালার বুকে,
নিশ্বাস-প্রশ্বাস পড়ে না তো—কই? অমানুষী শ্বেত-বরণ মুখে।
কি ঘোর বিষণ্ণ আনত মুখানি দেখিয়ে পরাণ শিহরে তায়!
উৎসব আমোদ উথলে চৌদিকে সে সবে বালিকা মৃতের প্রায়।
মুখানি শুকানো ফুলের মতন তবু সে মুখের নাহিক তুল,
অঙ্গের কুসুম কি করিবে আর—ফুলের সমাধি করিছে ফুল।

অভাগিনী কবিতায় দামিনীর 'পাংশু বদনে অমানুষী ভাব' বর্ণনায় লেখিকা প্রাণের জগতে একটা অতিপ্রাকৃতের অভিভব সৃষ্টি করেছিলেন; খড়্গ-পরিণয়ে সেই বর্ণনা অধিকতর সার্থক ও ব্যঞ্জনাগর্ভ, বিশেষত উদ্ধৃতির শেষ চরণাংশ তুলনারহিত। 'চপলা-নয়নে জ্বলিল চপলা' প্রভৃতির মধ্যে সাশ্রু সম্প্রদানের 'নলিনী নলিনী-মেয়ে' অংশের উপমা-গঠনরীতি অনুসৃত হয়েছে; বর্তমান কবিতার তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদের মধ্যে উপমেয় সখী চপলার আকস্মিক আবির্ভাব অন্তর্ধান এবং রহস্যময় আচরণগুলি উপমান চপলার সঙ্গে চরিত্রটির নিকট-সাদৃশ্য প্রকাশ করে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রতনের প্রতীক্ষায় উদ্বিগ্ন অলকার মনের যে বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে মধুসূদনের বীরাঙ্গনা কাব্যের (১৮৬২) প্রভাব লক্ষ করা যেতে পারে, মধুসূদনের শকুন্তলার মত স্বর্ণকুমারীর অলকাও দিগন্তের ধুলির ঝড়ের মধ্যে মহারাজের প্রেরিত অশ্বারোহী সৈন্যের অস্তিত্ব সন্ধান করেছে।[২৫] খড়্গ-পরিণয়ের পঞ্চম

[২৫] 'ও কিসের গোল? আসিছে কি সেনা?
ঐ না বিষম উড়িছে ধূলি?' ইত্যাদি। (খড়্গ-পরিণয়, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—গাথা)
'হেরি যদি ধূলারাশি, হে নাথ, আকাশে;
পবন-স্বনন যদি শুনি দূর বনে,
অমনি চমকি ভাবি,—মদকল করী,
বিবিধ রতন অঙ্গে, পশিছে আশ্রমে,
পদাতিক, বাজীরাজী, সুরথ, সারথি,
কিঙ্কর, কিঙ্করী সহ!' ইত্যাদি। (দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা—বীরাঙ্গনা কাব্য)

পরিচ্ছেদের প্রথম কয়েকটি চরণ ('কে ওই ললনা শান্ত জ্যোতির্ময়ী দাঁড়ায়ে প্রাসাদ-শিখরোপরি ?' ইত্যাদি) পাঠকালে বিহারীলালের 'ওই গো আগুন লেগেছে হোথায়'[২৬] প্রভৃতি বর্ণনা প্রসঙ্গত মনে পড়ে। এই পরিচ্ছেদে যুদ্ধের যে বর্ণনা আছে বাংলা সাহিত্যে তা একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন ; বিশেষত মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক জীবনসুলভ প্রণয়-প্রতিদ্বন্দ্বিতার দ্বৈরথ-সমরের যে বর্ণনা এখানে পাওয়া যায় তা দুর্গেশনন্দিনীর (১৮৬৫) প্রভাবমুক্ত না হলেও বিশেষত্বহীন নয়।

॥৮॥ সাময়িকপত্রে প্রকাশিত অন্যান্য গাথাকবিতার মধ্যে 'উপকথা' শীর্ষক রচনাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কবিতাটির শিরোনাম থেকেই বোঝা যায় রূপকথার প্রভাব লেখিকা অতিক্রম করতে পারেননি এই আখ্যানধর্মী কবিতা রচনাকালে। নিখিলকর্মার প্রিয় শিষ্য বিশ্বখ্যাত ভাস্কর এবং তাঁর শিষ্যদ্বয়, জনৈক যুনানী যুবক ও একটি মাত্র রমণী—এঁদের কোনোরকম ব্যক্তিনাম কবিতার মধ্যে কোথাও উচ্চারিত হয়নি এবং স্থান-কালেরও কোনো স্পষ্ট নির্দেশ নেই ; এই চরিত্রপঞ্চক ব্যক্তিত্বময় ত নয়ই বরং একান্তভাবে প্রতিনিধি-স্থানীয়। এইরূপে সকল রকমের নির্বিশেষত্ব কাহিনীকে অনায়াসে রূপকথার পর্যায়ভুক্ত করে তুলেছে।

রাজপুত্র ও মুনিপুত্র—এই প্রধান শিষ্যদ্বয়ের গুণগত বৈশিষ্ট্য এবং পারস্পরিক বিদ্বেষ লক্ষ করেছিলেন গুরু। ব্যথিতহৃদয় আচার্যের নির্দেশক্রমে উভয় শিষ্য পরিশেষে পরস্পরের মিত্রতা অর্জন করেছিল। প্রীত হয়ে গুরু তাদের বরদানের অভিপ্রায় প্রকাশ করলে রাজপুত্র আনন্দিত হয়ে প্রার্থনা করল এমন বিদ্যা যার বলে 'কঠোর পাথর-মূরতি কোমল সুতনু' হয়ে উঠে, এবং মুনিপুত্র কামনা করল প্রাণহীন নির্জীব গঠনে ভাবময় কান্তির মধ্যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠার শক্তি। গুরু উভয়কে সানন্দে আশীর্বাদ করে সাবধান করে দিলেন,

> দিয়ে তনুদান দিয়ে প্রাণদান অনুতাপ কর যদি
> এই গুপ্ত বিদ্যা লুপ্ত হয়ে যাবে মর্ত্য হতে নিরবধি।

কেবল তাই নয়, রাজপুত্র অনুতপ্ত হলে 'ক্ষত্রিয়-বীরত্ব দেশে হবে শেষ' এবং মুনিপুত্রের অপরাধে 'ব্রাহ্মণের তেজ ভারত হইতে নিমেষে বিলুপ্ত হবে' ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে শিল্প ও শিল্পীর সম্পর্ক সম্বন্ধে নন্দনতত্ত্বের অবতারণা করা হয়েছে। সৃষ্টির ক্ষেত্রে শিল্পীমাত্রেই বিধাতার সমকক্ষ, 'ধাতার আসনে বসিসে তোমরা জড়ে দেবে তনু-মন'। এর পর তৃতীয় পরিচ্ছেদের মধ্যে দেখা যায় ভাস্করাচার্যের অপর শিষ্য যুনানী যুবকের উপস্থিতিতে রাজপুত্র এবং মুনিপুত্র আপন আপন ক্ষমতার পরিচয় দিলেন অর্জিত বিদ্যার প্রয়োগকৌশলে। এবং এর পর থেকে

২৬ করুণাসুন্দরী—বঙ্গসুন্দরী, ৫ম সর্গ ; দ্র বিহারীলালের কাব্যসংগ্রহ, ১৯৬০, পৃ ৬৬।

সংকটের শুরু। মর্মর মূর্তি মানবীতে রূপান্তরিত হয়ে প্রাণচঞ্চল হল। নিমেষের মধ্যে গুরুর নির্দেশ বিস্মৃত হয়ে উভয় শিল্পী জীবন্ত শিল্পের উপর অধিকার বিস্তারের জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে উঠল, আত্মহারা হল। প্রসঙ্গত বলা যায় যে এই ভয়াবহ সংকটজনক পরিস্থিতি আদৌ আকস্মিক বা পারম্পর্যহীন নয়; ইতিপূর্বে যে পারস্পরিক বিদ্বেষ জাগ্রত হয় গুরুর সুধামৃত বর্ষণে এতদিন তার বিষক্রিয়া ছিল প্রশমিত, আজ তা উগ্র নির্লজ্জতার সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করল। অতঃপর য়ুনানী যুবকের পরামর্শে উভয়েই প্রণয় জ্ঞাপন করল জীবন্ত শিল্পোপম রমণীর নিকট। রাজপুত্রের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল সেই অলৌকিক রমণী, ক্ষত্রিয়কুমার তখন মদমত্ত হয়ে শক্তির প্রয়োগ করলে বরনারী ঘৃণার সহিত তার সান্নিধ্য বর্জন করল; মুনিপুত্র ব্রাহ্মণসুলভ যুক্তিজাল বিস্তার করেছিল, কিন্তু সেও হল প্রত্যাখ্যাত কারণ রমণী এই প্রস্তাবের মধ্যে প্রেমহীনতা এবং রূপলালসা অনুভব করেছে। উভয় শিল্পীর প্রস্তাবভাবনা-গুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় উভয়েরই মনোভাব প্রকটিত হয়েছে বর্ণাশ্রমের শ্রেষ্ঠ বর্ণদ্বয়ের আপন আপন স্বভাবধর্ম এবং বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে। স্বর্ণকুমারীর লোকচরিত্রজ্ঞান এই অংশে সূক্ষ্ম কারুকার্য রচনা করেছে। পরিশেষে বেদনায় ক্ষোভে আক্ষেপে নারী আত্মহননে প্রবৃত্ত হলে প্রাক্তন য়ুনানী যুবক তাতে বাধা দান করে বলল,

> নাশিও না দেবি! মর্ত্য হতে চির এ সৌন্দর্য-সুধারাশি,
> চিরদুঃখী এই ভূলোকবাসীর অনন্ত আনন্দ-হাসি।
> হে বরসুন্দরি! দাও অধিকার, দাও এই ভিক্ষা মোরে,
> তোমারি পূজায় সঁপিব জীবন চিরপ্রেম ভক্তিভরে।

শ্রী ও সুন্দরের পাদমূলে উৎসর্গীকৃত উদ্যোগী পুরুষসিংহের জীবনকেই আশ্রয় করেন কলালক্ষ্মী, য়ুনানী যুবকের এই ভক্তিপূর্ণ আত্মনিবেদনে মুগ্ধ হয়ে সেই রমণী পরিণামে তাকেই বরণ করেছিল।

উপকথা তথা রূপকথার মধ্যে রূপকগত তাৎপর্য প্রচ্ছন্ন থাকে, বর্তমান ক্ষেত্রে রূপকথার সেই প্রধান বৈশিষ্ট্যটি অনুসৃত। ভারতীয় বর্ণাশ্রমধর্মের শ্রেষ্ঠ দুই ধারক ও বাহকের যে সার্বিক অধঃপতন লেখিকা বেদনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তারই রূপক-কথা এই কবিতার মধ্যে আশ্রয় লাভ করেছে। বিদেশীয়ের হস্তে ভারতবর্ষীয় স্বাধীনতার বিপন্নতার কথা ইতিপূর্বে দীপনির্বাণে অপূর্ব সহানুভূতির সঙ্গে অঙ্কিত হয়। স্বদেশপ্রেমে দীক্ষিত কবির বাসনালোকে এইজাতীয় ভাবনা আরও পরিণতি লাভ করেছিল, বর্তমান কবিতাটি তার প্রমাণস্থল।

॥১॥ বিহারীলাল স্বর্ণকুমারী ও রবীন্দ্রনাথের কাব্যরচনার সমকালীন মহিলা কবিগণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, "এ সময়ের মহিলা কবিদের পদ্যলেখায় যে হাত খুলিয়াছিল তাহা স্বীকার করিতে হয়। 'প্রমীলা' (১৮৯১) ও 'তটিনী' (১৮৯২) কাব্যের লেখিকা প্রমীলা নাগ (?—১৮৯৬) অল্প বয়সে লোকান্তর গমন করায় বাঙ্গালা কাব্যের ক্ষতি হইয়াছে। সরোজকুমারী (গুপ্তা) দেবী (১৮৭৫-১৯২৬) 'হাসি ও অশ্রু' (১৮৯৫), 'শতদল' (১৩১০ সাল) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থেরও 'কাহিনী বা ক্ষুদ্র গল্প' এর (১৩১৫ সাল) রচয়িত্রী। মাইকেল মধুসূদনের জ্ঞাতিভ্রাতুষ্পুত্রী মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩) 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি', 'কনকাঞ্জলি' (১৮৯৬), 'বীরকুমার-বধ' (১৩১০ সাল) প্রভৃতি কাব্য লিখিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রথম রচনা দুইটি গদ্য—স্বামীর অকালমরণে ভাবোচ্ছ্বাস 'প্রিয়-প্রসঙ্গ', ও 'বনবাসিনী' (১৮৮৮)। অপর কবিতারচয়িত্রী হইতেছেন—ষোড়শীবালা দাসী, জ্ঞানেন্দ্রমোহিনী দত্ত, শ্রীমতী মৃণালিনী, নগেন্দ্রবালা (মুস্তফী) সরস্বতী, সুরমাসুন্দরী ঘোষ, অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা, কুসুমকুমারী রায়চৌধুরী, নিস্তারিণী দেবী, অনঙ্গমোহিনী দেবী, বিনয়কুমারী বসু, লজ্জাবতী বসু ইত্যাদি।"[২৭] সমকালীন মহিলা কবিগণের সঙ্গে স্বর্ণকুমারীর ছিল অকৃত্রিম সৌহার্দ্য; তন্মধ্যে বিনয়কুমারী বসু, সরোজকুমারী দেবী, প্রমীলা বসু, প্রিয়ম্বদা দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, শরৎকুমারী চৌধুরানী, সরলাবালা দাসী, মৃণালিনী সেন, লজ্জাবতী বসু, কামিনী রায়, গিরীন্দ্রমোহিনী দেবী প্রভৃতি অনেকে স্বর্ণকুমারী-সম্পাদিত ভারতী পত্রিকার সঙ্গে নানাভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং এঁদের অনেকেই আত্মপ্রতিষ্ঠায় তাঁর বিশেষ আনুকূল্য লাভ করেন।[২৮]

ভারতীকে কেন্দ্র করে এই অন্তরঙ্গতা দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল বলে একটি মহিলা-কবিগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল তৎকালে। স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ যে অভিনব সুর এঁদের কাব্যে শোনা যায় তৎসম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, 'বাংলা কাব্য-সাহিত্যে স্বর্ণকুমারী দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, কামিনী রায় ও মানকুমারী বসুর অভ্যুদয় বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছে। পুরুষ-প্রধান সাহিত্যে ইঁহারা ভাষার এবং ভঙ্গির বিবিধ বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে বাংলা ভাষায় নারীহৃদয়ের গোপন বার্তা প্রচার করিয়া ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দ্বার

২৭ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য়, পৃ ৪০৯।

২৮ স্বর্ণকুমারী স্বয়ং কয়েকজন কবির কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। গিরীন্দ্রমোহিনীর কাব্য সম্পর্কিত প্রবন্ধ 'অশ্রুকণা-রচয়িত্রী' (ভারতী, আশ্বিন ১৩১৭), সরোজকুমারীর কবিতা সম্বন্ধীয় আলোচনা 'শতদল-রচয়িত্রী' (ভারতী, চৈত্র ১৩১৭) প্রভৃতি প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য।

ইহারাই উদ্ঘাটন করিয়াছেন।'[২৯] আবার ব্যক্তিগত তথা পারিবারিক জীবন নানাভাবে বিড়ম্বিত হওয়ায় কিংবা কোনো কোনো স্থলে চরম অপঘাতের সম্মুখীন হওয়ায় অধিকাংশ লেখিকার সৃষ্টিশক্তির স্ফুরণ হয়েছিল, তাই তাঁদের রচনাবলীতে একটা বিষাদকরুণ ভাব পৌনঃপুনিক প্রকাশ লাভ করেছে; প্রসন্নময়ী দেবী (১৮৫৭-১৯৩৯), গিরীন্দ্রমোহিনী (১৮৫৮-১৯২৪), মানকুমারী, প্রিয়ম্বদা দেবী (১৮৭১-১৯৩৫) প্রভৃতি মহিলা কবি সান্ত্বনা সন্ধানের নিমিত্ত সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন বলে তাঁদের রচনায় একটা নৈরাশ্য-নৈঃসঙ্গ্যের ছায়া সমাপতিত হয়েছে।[৩০] বস্তুতপক্ষে গার্হস্থ্যজীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থানের জন্য চিরন্তন বাঙালি রমণীসুলভ সহজাত মমত্ব-কারুণ্য তাঁদের ক্রমপরিণামী মানসিকতাকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটা স্বাভাবিক উত্তরণ তথা সিদ্ধি দান করেছিল; এমতাবস্থায় কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩) প্রমুখ অনেকেই জীবনের অতলান্ত নৈরাশ্যকে কমনীয় স্নিগ্ধতায় রূপান্তরিত করতে সমর্থ হন।[৩১] আবার যদিও অধিকাংশ লেখিকার কবিতা উৎসারিত হয়েছিল সেকালের বঙ্গীয় রমণীর একান্ত নির্ভরস্থল দাম্পত্য-স্বর্গসুখ থেকে আকস্মিকভাবে বঞ্চিত হওয়ার ফলে, তথাপি এই অকালবৈধব্য-সঞ্জাত নৈরাশ্যকে অনেকেই যুগোচিত রোমান্টিক গীতিকবিতাসুলভ বেদনাবোধের সঙ্গে সংমিশ্রিত করে নিতে প্রয়াস লাভ করেন।[৩২] তদুপরি কামিনী রায়, প্রিয়ম্বদা দেবী প্রভৃতি কোনো কোনো কবি অধঃপতিত বর্তমানের পটভূমিকায় গৌরবময় উজ্জ্বল অতীত, নিপীড়িত স্বজাতি ও পরাধীন স্বদেশের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে উঠেন। আধ্যাত্মিক চিন্তা এবং ঈশ্বরাকূতি ছিল মানকুমারীর সান্ত্বনার শ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থল। প্রিয়ম্বদার 'চম্পা ও পাটল' (১৯৩৯) কাব্যের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'বিশ্বপ্রকৃতির

---

২৯ গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী—সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, ৫৫শ, ১৩৬৯, পৃ ১৮।

৩০ দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা-সাহিত্যে বঙ্গমহিলার দান—বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৮ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, পৃ ২৬৪-৮০।

৩১ কামিনী রায়ের কোনো কোনো কবিতা সম্বন্ধে বলা হয়েছে, Some of the poems are tinctured with the youthful pessimism of the poet—she felt lonely and she expressed her sense of loneliness in more poems than one,...But, in some other poems also, we find the authoress struggling out pessimism into optimism,..death comes and intervenes and takes her companion in life away to the other world; and she remains all alone behind. But she does not feel the pain of separation, for she knows that her marriage is endless matrimony and she believes that her beloved is always with her, ইত্যাদি।—Kalipada Mukherjee, Studies in Bengali Literature, 1938, pp 29-39.

৩২ কামিনী রায়ের 'আলো ও ছায়া' (১৮৮৯) কাব্য সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মন্তব্য দ্রষ্টব্য।—New Essays in Criticism, 1903, p 101-05.

সংশ্রবে প্রিয়ম্বদার স্পর্শসচেতন মন যে আনন্দ পেয়েছিল কাব্যে সে প্রতিফলিত হয়েছে জলের উপরে যেন আলোর বিচ্ছুরণ, আর জীবনে যত সে পেয়েছে দুঃসহ বিচ্ছেদ-বেদনা কাব্যে তার একান্ত আবেগ দেখা দিয়েছে নারীর অবারণীয় অশ্রুধারার মতো।' এবং 'বেদনাকে শিল্পের শাণযন্ত্রে চড়াইয়া কাটিয়া-কুটিয়া ছাঁটিয়া-ছুটিয়া একেবারে তাহার সূক্ষ্মতম রূপে লইয়া গিয়া তবে তিনি' রচনা করিয়াছেন এইসকল সহজ অনাড়ম্বর এবং 'বিধবার দেহের মত নিরলংকার' কবিতা।[৩৩] সুতীক্ষ্ণ স্পর্শকাতর অনুভূতিকে কাব্যবস্তুরূপে গ্রহণ-কালে প্রমীলা বসু (নাগ) ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অপেক্ষা তৎকালোচিত রোমান্টিক বাংলা কবিতার গতানুগতিক দুঃখবিলাস অথবা বিষাদভাবনানুসারী লিরিক আর্তির দ্বারস্থ হয়েছিলেন বহুলপরিমাণে।[৩৪] অস্তি ও নাস্তির মধ্যে ভাব-ভাবনার সেতুবন্ধনির্মাণে ব্যর্থতা, অপ্রাপনীয়কে প্রাপ্তির দুর্নিবার প্রয়াস এবং পরিশেষে অপ্রাপ্তিজনিত ও মোহভঙ্গবশত বিষণ্ণতা, একান্তভাবে পরস্পরবিরোধী আদর্শ ও বাস্তবের সমন্বয়সাধনে সুবিপুল আগ্রহ ও অরুন্তুদ অসামর্থ্য এই বেদনাবোধের জনয়িত্রী। ফলত বেদনাঘন আনন্দ অথবা আনন্দময় বেদনার অতিশয়িত চর্চা এবং কখনো কখনো অকারণ দুঃখাসক্তির সঙ্গে বিড়ম্বিত বিপন্ন জীবনের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার সমন্বয় বাঙালি মহিলা কবিগণের কাব্যাকাশকে অশ্রুসজল ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল। এবংবিধ বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচারকালে স্বর্ণকুমারীর সঙ্গে তৎকালীন মহিলা কবিগণের ভাব-ভাবনাগত আত্মীয়তা অথবা জীবনদর্শন-অভিজ্ঞতা-সংক্রান্ত স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হতে পারে।

গিরীন্দ্রমোহিনী দত্ত এবং স্বর্ণকুমারী ঘোষাল ছিলেন পরস্পরের সমবয়সী অন্তরঙ্গ, তাঁদের উভয়ের জীবনের অনেক ঘটনারও সাদৃশ্য পাওয়া যায়। স্বর্ণকুমারীর ন্যায় গিরীন্দ্রমোহিনীও বাল্যকালে পিতার নিকট স্বল্প-পরিমাণে বিজ্ঞানচর্চা ও বিবাহোত্তরকালে স্বামীর সহায়তায় ইংরেজি ভাষা শিক্ষা করেন; অল্প বয়স থেকে সাহিত্যানুরাগী হয়ে উঠার ফলে বাল্যকাল থেকে উভয়েই সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। উভয়েরই প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থে লেখকের কোনো নাম ছিল না এবং স্বর্ণকুমারীর দীপনির্বাণের মত গিরীন্দ্রমোহিনীর প্রথম গ্রন্থ 'জনৈক হিন্দু মহিলার পত্রাবলী'ও (১৮৭২) প্রকাশিত হওয়ার পরই পাঠকসমাজে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। ভারতী ও জাহ্নবী পত্রিকার দ্বিতীয় সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে স্বর্ণকুমারী ও গিরীন্দ্রমোহিনী (১৩১৪-১৬)। উভয় কবির সখিত্ব ছিল সুদৃঢ় এবং জীবনে নানাভাবে

৩৩ প্রমথনাথ বিশী, প্রিয়ম্বদা দেবীর কবিতা—বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৯ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, পৃ ১২৮।

৩৪ সম্ভবত অভিজ্ঞতা-বহির্ভূত এই দুঃখপ্রীতি ও বেদনাতিরেক নিরীক্ষণ করে দেবেন্দ্রনাথ সেন 'নবতপস্বিনী' কবিতায় (সাহিত্য, আষাঢ় ১২৯৮) কবিকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'কল্পনার শিল্পশালা নিরালায় বসি / মধ্যাহ্নে ধরেছ কেন পূরবী রাগিণী?'

তাঁরা পরস্পরকে সাহায্য করেছেন ; এই অন্তরঙ্গতার নিদর্শনস্বরূপ স্বর্ণকুমারীর 'স্নেহলতা' গিরীন্দ্রমোহিনীর নামে এবং গিরীন্দ্রমোহিনীর 'শিখা' স্বর্ণকুমারীর নামে উৎসর্গীকৃত হয়। স্বর্ণকুমারীর সখিসমিতি-মহিলাশিল্পমেলা-বিধবাশ্রম প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গিরীন্দ্রমোহিনী যুক্ত ছিলেন ; পক্ষান্তরে 'গিরীন্দ্রমোহিনীর শ্বশুরালয়ে সাবিত্রী লাইব্রেরীকে কেন্দ্র করিয়া যে সাহিত্যগোষ্ঠী জমিয়া উঠিয়াছিল' তার সঙ্গে স্বর্ণকুমারী রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। গিরীন্দ্রমোহিনীর কাব্য-কবিতার যেসকল উৎকৃষ্ট আলোচনা সেকালে প্রকাশিত হয় তন্মধ্যে ১৩১৭ সালের আশ্বিন সংখ্যার ভারতীতে মুদ্রিত 'অশ্রুকণা-রচয়িত্রী' শীর্ষক প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য. সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার ৫৫ সংখ্যক পুস্তিকায় (পৃ ৬) ব্রজেন্দ্রনাথ উক্ত প্রবন্ধটি স্বর্ণকুমারীর রচিত বলে মন্তব্য করেছেন ; এতদ্ব্যতীত স্বর্ণকুমারীর সম্পাদনায় প্রকাশিত ১২৯৪ সালের আশ্বিন সংখ্যার ভারতী ও বালক পত্রিকায় অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর 'অশ্রুকণার প্রকৃত সমালোচনা' নামক একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়েছিল। গিরীন্দ্রমোহিনী ব্যতীত অন্যান্য কবির মধ্যে স্নেহলতা (১৮৯০) উপন্যাস-রচয়িত্রী কুসুমকুমারী দেবী (?-১৩২২) ছিলেন জমিদারগৃহিণী এবং তিনিও স্বর্ণকুমারীর ন্যায় 'স্বামীর নিকট উৎসাহ লাভ করিয়া স্বীয় অবসরকাল মাতৃভাষার সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন।'[৩৫] অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তার (১৮৭০-১৯৪৬) সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'বিদ্যোৎসাহী স্বামীর সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার কবিপ্রতিভা বিকশিত হয় ও তিনি বিদ্যাচর্চা করিবার সুযোগ লাভ করেন।' বিবাহের পরে আরও যাঁরা লেখাপড়া করে সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সরোজকুমারী সেন, নগেন্দ্রবালা মুস্তফী (১৮৭৮-১৩১৩) প্রভৃতি। কুমারীজীবনে স্বর্ণকুমারী অশিক্ষিতা ছিলেন না সত্য, তবে বিবাহের পরেই তাঁর শিক্ষা পূর্ণতা লাভ করে এবং তিনিও সাহিত্য-চর্চায় মনোযোগী হয়ে উঠেন।

উনবিংশ শতাব্দীর মহিলা কবিগণের মধ্যে অনেকেই অকালবৈধব্যকে আশ্রয় করে ব্যর্থ জীবনের বেদনাটি কাব্যে সঞ্চারিত করে দেন। প্রতিনিধিস্থানীয় কবিগণের মধ্যে প্রসন্নময়ী দেবীর জীবনে বজ্রাঘাত নেমে আসে মাত্র দ্বাদশ বর্ষ বয়সে কারণ 'বিবাহের দুই বৎসর পরেই স্বামী উন্মাদরোগগ্রস্ত হন।' গিরীন্দ্রমোহিনীর জীবনে বৈধব্যের অভিশাপ দেখা দেয় মাত্র ছাব্বিশ বৎসর বয়সে (১৮৮৪) এবং ১৮৮৭ খৃস্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত কাব্য 'অশ্রুকণা' জন্মলাভ করে। মানকুমারী বসুর দশ বৎসর বয়সে বিবাহ হলেও 'উনিশ বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতেই তাঁহার বৈধব্য ঘটে। বিধবা হইবার পর সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক

৩৫ দ্র বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৮ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, পৃ ২৭২।

কার্যে মানকুমারীর মন বসিত না, তিনি শেষে সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করেন।' মৃণালিনী সেনও বিবাহের অল্পকাল পরে বিধবা হন এবং স্বামী-বিয়োগবিধুর অবস্থায় ইনি কাব্যচর্চায় প্রবৃত্ত হন।' প্রিয়ম্বদা দেবীর বিবাহের পাঁচ বৎসর পরে ১৮৯৫ খৃস্টাব্দে বৈধব্য ঘটে। অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মহিলাগণ কাব্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন দাম্পত্যজীবনে পরাভূত ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পর। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও পরিলক্ষিত হয়। বিবাহের পনর বছর পরে ১৯০৯ খৃস্টাব্দে অর্থাৎ পরিণত বয়সে কামিনী রায় যখন বৈধব্যে অভিশপ্ত হন তখনই তিনি বাংলা কাব্যজগতের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক; তাহলেও 'দৈব-হৃত অথবা প্রিয়বিড়ম্বিত নারীপ্রেমের সশঙ্ক কুণ্ঠা এবং আত্মলোপী ব্যক্তিনিরপেক্ষ নিঃস্বার্থতা ইহার কাব্যের বিশিষ্ট সুর।'[৩৬] সাধারণভাবে বলা চলে যে অকালবৈধব্যের যন্ত্রণাবিদ্ধ মহিলা কবিগণের কাব্যে সকরুণ বিষণ্ণতা এবং বেদনার সুরটি ধরা পড়েছে, বৈধব্যের পর কাব্যরচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন বলে সাহিত্যানুশীলনকে সান্ত্বনাদায়ক অবলম্বনরূপে কেউ কেউ গ্রহণ করেন; অন্যত্র নারীমনের স্বাভাবিক কোমলতা বিষাদ ও বৈরাগ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে বলে জীবনে ব্যর্থতা না থাকা সত্ত্বেও তথাকথিত রোমান্টিক নৈরাশ্যপ্রীতি সেক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। তাই বলা যায় সমকালীন মহিলা কবিগণের রচনায় প্রাত্যহিক জীবনের অতিপরিচিত রূপের সঙ্গে বিষাদ-করুণ ভাবের একটা চমৎকার রাসায়নিক সংমিশ্রণ সম্ভব হয়েছিল। স্বর্ণকুমারীর কবিতা এদেরই সমগোত্রীয়।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে কবিত্বের উত্তরাধিকার সৃষ্টি অথবা ঐতিহ্য প্রবর্তনে স্বর্ণকুমারীর কৃতিত্ব অসামান্য। লক্ষণীয় যে তাঁর সমসাময়িক কিংবা পরবর্তী পর্যায়ের মহিলা সাহিত্যিকগণ তাঁর অব্যবহিত পূর্ববর্তীকালের রমণীকুলের রচনার দ্বারা মোটেই নিয়ন্ত্রিত হননি, তাঁর নিজের কবিতায়ও পূর্ববর্তী সমশ্রেণীর শিল্পীর সৃষ্টিকর্মের কোনো প্রভাব নেই। মানকুমারী বসু তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন, 'পরবর্তীকালে তিনি (স্বামী বিবুধশংকর বসু) আমার নিকটে—যিনি আমাদের বঙ্গ-মহিলাকুলের শীর্ষস্থানীয়া সেই দীপনির্বাণ-ছিন্নমুকুল-রচয়িত্রী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রভৃতি বিদুষী মহিলাগণের আদর্শ রচনাশক্তি আমার সম্মুখে ধারণ করিতেন।'[৩৭] স্বর্ণকুমারীর কবিতায় যে রোমান্টিক ভাবনার অনুসরণ পরিলক্ষিত হয় তারই সাদৃশ্য পাওয়া যায় উত্তরসূরীর কাব্যে। প্রমীলা নাগের কবিতার 'করুণ কোমল বিষাদ-বাণী নিশীথে-শ্রুত এস্রাজের বিষাদ রাগিণীর ন্যায় চিত্তকে অবসাদগ্রস্ত' করে দেয়। 'সন্ধ্যার

৩৬ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য়, পৃ ৪৮৩।

৩৭ বঙ্গের মহিলা কবি, পৃ ১২৮।

তারকা' সন্দর্শনে সরোজকুমারীরও 'দুইটি নয়ন' অকারণে ছলছল করতে থাকে, এবং নাইটিঙ্গেলের গানের প্রতিক্রিয়ায় কীটসের drowsy numbness-এর মত এই মহিলা কবির 'আঁখি স্বপ্নে ভোর' হয়ে আসে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে স্বর্ণকুমারীরই তত্ত্বাবধানে সরোজকুমারীর 'হাসি ও অশ্রু' কাব্য (১৮৯৫) প্রকাশিত হয়; ১৩১৭ সালের চৈত্র সংখ্যায় ভারতীতে মুদ্রিত স্বর্ণকুমারীর রচিত 'শতদল-রচয়িত্রী' প্রবন্ধটি থেকে জানা যায় যে হাসি ও অশ্রু কাব্যের কয়েকটি কবিতা স্বর্ণকুমারীর উপন্যাসের কতিপয় চরিত্র অবলম্বনে রচিত হয়েছিল। স্বর্ণকুমারীর কবিতায় যে বোধাতীত অনির্বচনীয় বেদনার প্রসঙ্গ আছে বিনয়কুমারী ধরের 'কে বুঝিবে' প্রভৃতি কবিতায়ও তার সন্ধান পাওয়া যায়; তাঁর 'শারদ জ্যোৎস্নায়', 'বসন্ত-জ্যোৎস্নায়', 'জ্যোৎস্নায় নদীকূলে' প্রভৃতি কবিতার মত বিনয়কুমারীর 'বাসন্তী নিশায়' কবিতাটিতে রোমান্টিক বেদনা স্থানলাভ করেছে।

গিরীন্দ্রমোহিনীর ন্যায় সেকালের অন্যতম প্রসিদ্ধ কবি কামিনী রায়ের সঙ্গেও স্বর্ণকুমারীর অন্তরঙ্গতা ছিল একান্ত নিবিড়। 'অযোধ্যার বেগমে'র (১৮৮৬) লেখক চণ্ডীচরণ সেনের কন্যা কামিনী ছিলেন উচ্চশিক্ষিতা। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার নিয়ে ১৯২৩ সালে যে আন্দোলন হয়, ভাইসরয় লর্ড লিটনের নিকট তা নিয়ে দরবার করার জন্য তিনি দলনেত্রী নির্বাচিত হন; ১৯৩০ সালে ভারতবর্ষে যে লেবার কমিশন আসে, সরকারের অনুরোধে ভারতীয় রমণীসমাজের মুখপাত্ররূপে তিনি সেই কমিশনের নিকট আপনাদের অভাব-অভিযোগ পেশ করেন। ফলত স্বর্ণকুমারীর ন্যায় তিনিও নানাবিধ জনহিতকর কর্মের সঙ্গে আজীবন জড়িত ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই এতদুভয়ের কবিপ্রতিভার স্ফূর্তি ঘটে। সহৃদয় সমালোচক কামিনী রায়ের কবিতায় Sweetness of lyric measures, a beautiful mode of expressing poetical thought, an elusive gracefulness, the first hopes of early youth and its doubts, desires that were great and lovely at the same time, love of country and of God, sympathy for fallen humanity, love of Nature, and the early experience of growing womanhood প্রভৃতি নিরীক্ষণ করেছেন।[৩৮] কামিনী রায়ের কয়েকটি সনেট অনুবাদ করেন জেসি ডানকান ওয়েস্টব্রুক।[৩৯] তাঁর 'আলো ও ছায়া' কাব্যটি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৯০৩) প্রশংসাপূর্ণ ভূমিকা শিরোধার্য করে নিয়ে ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত হয়, কাব্যটির মধ্যে নব্য-রোমান্টিকতার সন্ধান

৩৮ Kalipada Mukherjee, Studies in Bengali Literature, p 26.

৩৯ Sonnets from the Bengali—The Modern Review, November 1929, pp 497-99.

পেয়েছিলেন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল।[৪০] কোনো কোনো সাহিত্যরসিক কামিনী রায়ের কবিতায় এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিংয়ের কবিতার নিঃসঙ্গতাজনিত বেদনা ও যৌবনোচিত নৈরাশ্যের পরিচয় পেয়েছেন। চিরন্তন রমণীহৃদয়ের প্রকাশসাধনে কামিনী রায় বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত ছিলেন, তাই স্বামীর পরলোকগমনের পর বৈধব্যের রিক্ততা তাঁর কবিতাবলীতে স্বভাবত পরিবেশিত ও সমর্পিত হয়েছিল। স্বর্ণকুমারীর মত এই পর্যায়ে তিনি যে পরম নৈরাশ্যকে অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছিলেন তার প্রমাণও দুর্লভ নয়। জীবনবোধের পরিবর্তন ও পরিণতির দিক থেকে উভয় কবির এই সাধর্ম্য লক্ষিতব্য ব্যাপার। স্বর্ণকুমারীর সম্পাদনাকালে ভারতী পত্রের ১৩১৭ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'আলো ও ছায়া-রচয়িত্রী' নামক যে লেখকনামহীন প্রবন্ধটি মুদ্রিত হয় তা সম্পাদিকার রচনা বলে কেউ কেউ অনুমান করেন।[৪১] উক্ত প্রবন্ধে বলা হয়েছে, "কবিবর হেমচন্দ্র একদিন যাঁহার কবিতাবলী পাঠ করিয়া আনন্দিতচিত্তে বলিয়াছিলেন, 'কবিতাগুলির ভাবের গভীরতা, ভাষার সরলতা, রুচির নির্মলতা এবং সর্বত্র হৃদয়গ্রাহিতা গুণে আমি নিরতিশয় মোহিত হইয়াছি',…কামিনীদেবীর কবিতাগুলির প্রধান গুণ তাহার কোনখানে অস্পষ্টতা দোষ নাই, ভাবের জটিলতা নাই, ছন্দের আড়ষ্ট ভাব নাই—তাহা অবান্তর চিন্তাতরঙ্গে পাঠকের চিত্তপীড়ার উদ্রেক করে না, তাহা লঘু স্বচ্ছ নির্মল। চটুলতা বা অসংলগ্নতা দোষ হইতে মুক্ত।" সাধারণভাবে এরূপ মন্তব্য সেকালের মহিলা কবিগণের রচনা সম্বন্ধেও প্রয়োগযোগ্য।

স্বর্ণকুমারী সম্পাদিত ভারতী এবং ভারতী ও বালকের প্রথম পর্যায়ের (১২৯১-১৩০১) বিভিন্ন লেখিকার মধ্যে হিরণ্ময়ী দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, প্রতিভাসুন্দরী দেবী, সরলা দেবী, সরোজকুমারী দেবী, কৃষ্ণভাবিনী দাস, সরলাবালা সরকার, ইন্দিরা দেবী, প্রমীলা বসু, শরৎকুমারী চৌধুরানী, উমাশশী দেবী, ধনদামোহিনী দেবী, সরলাবালা দাসী প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রমীলাসুন্দরী (আশ্বিন ১২৯৩), প্রিয়ম্বদা দেবী (কার্তিক ১২৯৩), বিনয়কুমারী বসু (মাঘ ১২৯৫) প্রভৃতির নামের পর 'বালিকার রচনা' এরকম মন্তব্য পাওয়া যায়। গিরীন্দ্রমোহিনীর নামের পরিবর্তে কখনো কখনো 'কবিতাহার-রচয়িত্রী প্রণীত' (জ্যৈষ্ঠ ১২৯১), 'কবিতাহার-রচয়িত্রী' (অগ্রহায়ণ ১২৯২) প্রভৃতির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

প্রথমাবধি গিরীন্দ্রমোহিনী দেবী মনীষী সমালোচকগণের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে

৪০ Brajendranath Seal, New Essays in Criticism, p 101.

৪১ "কামিনী রায়ের জীবদ্দশায়, ১৩১৭ সালের জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা 'ভারতী' পত্রিকায় 'আলো ও ছায়া-রচয়িত্রী' নামে একটি সুলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ; ইহা সম্ভবতঃ সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনা।"—সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, ৫৮শ, পৃ ৫।

এসেছেন। 'অনেক হিন্দুমহিলা প্রণীত' কবিতাহার (১৮৭০) গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে (জ্যৈষ্ঠ ১২৮০) লিখেছেলেন, 'শ্রুত আছি, এখানি পঞ্চদশবর্ষীয়া বালিকার প্রণীত। ইহা পূর্ণবয়স্কা কোন স্ত্রীর প্রণীত হইলেও, প্রশংসনীয় হইত। প্রৌঢ়বয়ঃ কোন পুরুষের লিখিত হইলেও, প্রশংসনীয় হইত। ইহার অনেক স্থান এমন, যে তাহা কোন প্রকারেই অল্পবয়স্কা বালিকার রচনা বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না।'[৪২] স্বর্ণকুমারী দেবী অশ্রুকণা-রচয়িত্রী নামক প্রবন্ধে (ভারতী, আশ্বিন ১৩১৭) গিরীন্দ্রমোহিনীর কবিপ্রতিভা সম্বন্ধীয় উপরোক্ত বঙ্কিম-প্রশস্তিরও সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি আরও বলেছেন, 'গীতিকবিতার আধুনিক যুগে অনুকরণের ধূম লাগিয়া গিয়াছে। পুরুষ ও মহিলা কবির কাব্যে নূতন ভাবের পরিচয়-লাভ যে দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছে সে কথা সত্য এবং আজ এমন দিনও আসিয়াছে যখন মহিলারচিত বলিয়াই নিরপেক্ষ সমালোচনার হাত হইতে সাহিত্য অব্যাহতি পাইবে না।...কঠোর এবং সূক্ষ্ম পর্যালোচনায় গিরীন্দ্রমোহিনীর কাব্যগুলি যে বঙ্গীয় সমালোচকের মতে বিশিষ্ট উচ্চাসন লাভ করিবে সে বিষয়ে সংশয় নাই।' দীনবন্ধু মিত্র, মেরি কার্পেন্টার প্রভৃতি মনীষীও গিরীন্দ্রমোহিনীর কাব্য সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। অশ্রুকণা পাঠ করে সুকবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী তার সমালোচনা করে লিখেছিলেন, 'তাঁহার কাব্য পড়িতে পড়িতে এমন মনে হয় না যে তিনি কাগজ কলম লইয়া কখনো কবিতা লিখিতে বসিয়াছিলেন ; যেমন শিশিরকণা দূর্বাদলে পড়িয়া মুক্তারূপে ফুটিয়া উঠে সেইরকম গিরীন্দ্রমোহিনীর কাব্যে তাঁহার কল্পনার উচ্ছ্বাসগুলি যেন অক্ষররূপে পরিণত হইয়াছে।...কল্পনা স্নিগ্ধ বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল অথচ তীব্র নহে, লীলাময়ী অথচ দুরন্ত নহে, মুগ্ধকরী অথচ মর্মভেদী নহে।'[৪৩] মনস্বী চন্দ্রনাথ বসু বলেছিলেন, This is poetry in life and as expression of that poetry Asrukona is the history of the soul of a noble Hindu woman.[৪৪]

প্রাগুক্ত প্রবন্ধে স্বর্ণকুমারী গিরীন্দ্রমোহিনীর কবিতায় 'সহজ করুণ সুর' এবং অনাড়ম্বর অকৃত্রিমতা, একান্ত ব্যক্তিগত অনুভব ও ভাবনা, আর সরল ভক্তি এবং স্বদেশপ্রেমের আয়াসহীন সংমিশ্রণ নিরীক্ষণ করেছেন। ভারতী ও বালকের প্রথম পর্যায়ের সম্পাদনা-কালে স্বর্ণকুমারী নানাভাবে গিরীন্দ্রমোহিনীর প্রতিভাবিকাশে আনুকূল্য করেছেন। এই পর্বে শেষোক্ত কবির সরসী জলে শশী, গ্রাম্যছবি বা জন্মভূমি, গার্হস্থ্য চিত্র, বাদল বা চাষার ভাষা, খুকুরাণী, পথে কে চলেছে গায়ি, জাগো, স্বপ্ন, গোধূলি, পাড়াগাঁ,

৪২ সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, ৫৫শ, পৃ ১৩।

৪৩ দ্র অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী রচিত 'অশ্রুকণার প্রকৃত সমালোচনা'—ভারতী ও বালক, আশ্বিন ১২৯৪।

৪৪ ভারতী, আশ্বিন ১৩১৭, পৃ ৫২৪।

বসন্তসংগীত, আক্ষেপ, আমি, বসন্তপঞ্চমী, বসন্তরাগ, বসন্তযামিনী, বর্ষা, বাদল, শুকতারা, সরস্বতী-বন্দনা প্রভৃতি কবিতা মুদ্রিত হয়; পল্লীজীবন এবং সহজ সরল দৈনন্দিন জগতের অকিঞ্চিৎকরত্বের প্রতি মমত্বপূর্ণ আগ্রহ এইসকল কবিতায় প্রকটিত। ধীরে ধীরে, আক্ষেপ, আমি, কারাগার, জগতের মৃত্যু প্রভৃতি কবিতায় তাঁর ব্যক্তিজীবনের ছায়া পতিত হয়েছে। গিরীন্দ্রমোহিনী রচিত 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র (ভারতী ও বালক, ভাদ্র ১২৯৪) কথাও এস্থলে প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। 'তৃপ্তি' এবং 'ভোগ' শিরোনামাঙ্কিত সংক্ষিপ্তাকৃতি প্রবন্ধদ্বয়ে কবির জীবনজিজ্ঞাসা এবং জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত বিশিষ্ট ধারণাদি পরিবেশিত হয়েছে। তৃপ্তি-শীর্ষক প্রবন্ধে গিরিন্দ্রমোহিনী বলেছেন, 'যাহা কিছু সুন্দর তাহার মধ্যেই অতৃপ্তি বিরাজিত।... তাই যাহা কিছু সুন্দর তাহাই অনন্ত। তৃপ্তি সুখ নহে, উহা পার্থিব বস্তু; অতৃপ্তিই সুখ, অতৃপ্তি আনন্দের সোপান। আবার সুন্দর অনন্ত, অনন্তই সুন্দর!... প্রেম সুন্দরের মধ্যে সুন্দর, প্রেম অনন্ত। সেইজন্যই প্রেমে এত অতৃপ্তি!' ভোগ-নামক প্রবন্ধটিতে সুখের স্বল্পতার তুলনায় দুঃখের আধিক্য সত্ত্বেও পরম কারুণিকের নিকট ঐকান্তিক আনুগত্য-স্বীকার তথা ঈশ্বরাস্থা ধ্বনিত। এই প্রবন্ধেই ধারাবাহিক বিরাট বিপুল জীবন-স্রোতের পরিপ্রেক্ষিতে নশ্বরতার বেদনাকে একটা স্নৈগ্ধ্য দানের উদ্যম পরিলক্ষিত হয়। সম্ভবত এই বোধের অবলম্বনে গিরিন্দ্রমোহিনী জীবন-সমুদ্রমন্থন-সঞ্জাত গরলকে অমৃতে রূপান্তরিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

স্বর্ণকুমারীর দুহিতা হিরণ্ময়ী (১৮৬৮-১৯২৫) প্রধানত বিচিত্র বিষয়সর্বস্ব প্রবন্ধকার, তবে তাঁর কবিতা গল্প অনুবাদ গানও ভারতীতে মুদ্রিত হয়েছিল। তাঁর কবিতা সম্বন্ধে সহোদরা সরলা বলেছেন, 'তাঁর মৌলিক রচনা ছিল তাঁর স্বলিখিত সনেট। তাঁর কবিতাগুলির মধ্যে সরল মাধুর্য ছিল; যেমন কারো কারো গানের গলা মিষ্টি ও করুণ অথচ সে বড় গাইয়ে নয়—তাঁর কবিতা সেইরূপ ছিল।'[৪৫] ভারতী ও বালক পত্রিকার ১২৯৮ সালের মাঘ সংখ্যায় মুদ্রিত 'নিজের কথা', 'পরের কথা', 'কবিতার জন্ম' নামক তিনটি কবিতায় কবির কাব্যবোধ এবং কাব্যসাধনকৌশল প্রভৃতির পরিচয় বর্তমান। কাব্যে সমর্পিত কবির হৃদয়বেদনা সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্ত: 'প্রতিপত্রে প্রতিছত্রে আমার হৃদয়কথা, আমার আনন্দ খেলা আমার যাতনা ব্যথা।' হৃদয়াবেগের প্রকাশ কিরূপে সম্ভব সেই জিজ্ঞাসায় কবিচিত্তের কৌতূহল অগাধ, এরই পরিপ্রেক্ষিতে 'কবিতার জন্ম' বিচার্য: 'কবিতা কি বিলাপের তান? কবিহৃদি ভেদ করে উঠেছে আকুল স্বরে যাতনার সঙ্গীত মহান।...অথবা কবিতা শুধু আনন্দেরি গান? হেরি চারু মনোলোভা মধুর বিশ্বের শোভা বাজে শুধু পুলক মহান।' বিশ্বের মাধুর্য-সৌন্দর্য সন্দর্শনে আনন্দিতচিত্ত বিহগের কণ্ঠে যেমন গীতোচ্ছ্বাস জাগে, তদ্রূপ ঈশ্বরের মহাপ্রেমের আস্বাদলাভ করে কবিহৃদয়েরও ব্যুত্থান ঘটে।

৪৫ দ্র সরলা দেবী রচিত 'হিরণ্ময়ী দেবী'—ভারতী, ফাল্গুন ১৩৩২।

পূর্বে-পরিবেশিত বিবিধ তথ্য থেকে উপলব্ধ হয় যে দ্বিতীয় পর্বের বিশেষত ১৩১৭ সালের ভারতী সম্পাদনাকালে স্বর্ণকুমারী তাঁর সমকালীন কবিগণের জীবনী ও কাব্যকর্ম সম্পর্কে বিধিবদ্ধ আলোচনা প্রকাশের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন। জ্যৈষ্ঠ এবং আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত 'আলো ও ছায়া-রচয়িত্রী' এবং 'অশ্রুকণা-রচয়িত্রী'-শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয়ের কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। বৈশাখের ভারতীতে 'রেণু-রচয়িত্রী' প্রিয়ম্বদা দেবীর জীবন ও কাব্য সম্বন্ধীয় সমালোচনা বর্তমান। সূচীপত্রে উল্লিখিত লেখক গোলোকবিহারী মুখোপাধ্যায় প্রবন্ধের মধ্যে প্রিয়ম্বদার কাব্যের বিশেষত্ব নির্ণয়কালে তাঁর কবিতার অবয়বগত 'ক্ষুদ্রত্ব', করুণ-মধুর-স্নিগ্ধ ভাব, অনায়াসহৃদয়গ্রাহ্যতা প্রভৃতি বিষয়ের সন্ধান লাভ করেছিলেন; কবিতাগুলির মধ্যে 'অসমাপ্তি', 'সুদূর অতৃপ্তি' এবং 'নিষ্ফল ব্যাকুলতা'র সঙ্গে 'পূত সংযম', 'তপস্যার ভাব', 'মহিমা', 'অনাড়ম্বর ঐশ্বর্য', 'কোমল মাধুর্য' ওতপ্রোত-বিজড়িত। উক্ত বৎসরের চৈত্র সংখ্যায় 'শতদল-রচয়িত্রী' সরোজকুমারী দেবীর কাব্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে 'কবিতাগুলিতে সুমধুর বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য আছে, একঘেয়ে নহে। বিধাতার করুণার উপর অটল নির্ভর স্থাপন করিয়া, জগতে সকল কাজের মধ্যে বিধাতার করস্পর্শ অনুভব' করেছেন সরোজকুমারী; এতদ্ব্যতীত 'ভক্ত্যুচ্ছ্বাসের আন্তরিকতা', 'হৃদয়ের উদারতা ও ভাবের বিশালতা' এবং 'বিমল সহানুভূতির রসে সুস্নিগ্ধ' ভাবনাদি তাঁর কবিতায় সমুপস্থিত। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় এই লেখকনামহীন রচনাটি সম্পাদিকার দায়িত্বে পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। শ্রাবণ সংখ্যায় 'কবি রজনীকান্ত' শিরোনামযুক্ত প্রবন্ধটিও লেখকনাম-বিহীন বলে সম্পাদিকার দায়িত্বে এটি প্রকাশিত হয়েছিল এরূপ মনে করা সঙ্গত। উক্ত প্রবন্ধে বলা হয়েছে, 'স্বচ্ছতা ও মুক্তপ্রাণতা আজকালের কবিতায় বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া যে কথা উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে কিছু-না-কিছু সত্য নিহিত আছে। ভাবের স্পষ্টতা কবিতার প্রাণ···রজনীকান্ত খাঁটি বাঙালী কবি। বহুদিন পরে এমন অনাড়ম্বর গীতিময় স্বচ্ছ সরল ভাবোন্মাদনা প্রকৃতপক্ষেই আমাদিগকে বিশিষ্ট আনন্দ দান করিয়াছে।··· শুধু ভাবের স্বচ্ছতা কেন, রজনীকান্তের ভাষা ও ছন্দের মধ্য দিয়া এমন একটি তরঙ্গ বহিয়া গিয়াছে যে পাঠকের চিত্ত নাচিয়া নাচিয়া ভাবের অনুসরণ করে।' ঐ বৎসরেরই অগ্রহায়ণ সংখ্যার ভারতীতে মুদ্রিত হেমেন্দ্রলাল রায়ের 'কবি রজনীকান্ত সেন' প্রবন্ধটিতে বলা হয়েছিল, 'কান্ত কবির বিশেষত্ব এই যে তাঁহার কবিতা বিশেসজ্ঞ এবং সাধারণ, ভক্ত এবং রসিক সকলেরই সমান আদরের বস্তু।' ফলকথা স্বর্ণকুমারীর সমকালীন যে মহিলাগণের কাব্যে ও বিবিধ রচনায় প্রসাদগুণ এবং প্রাঞ্জলতা প্রাধান্য অর্জন করেছিল তাঁদের কবিকৃতি সম্পর্কিত আলোচনায় সম্পাদিকা সবিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করেছিলেন কারণ তাঁর কবি-মানসের বিশিষ্ট প্রবণতাই ছিল অনুরূপ। স্বর্ণকুমারী অশ্রুকণা-রচয়িত্রীতে আক্ষেপ করে

বলেছিলেন, 'গীতিকবিতার আধুনিক যুগে অনুকরণের ধুম লাগিয়া গিয়াছে। পুরুষ ও মহিলা কবির কাব্যে নূতন ভাবের পরিচয়-লাভ যে দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছে সে কথা সত্য।' তাই গিরীন্দ্রমোহিনীর অনাড়ম্বর অকৃত্রিমতা ও 'সহজকরুণ সুর,' কামিনী রায়ের স্পষ্টতা ও সারল্য, প্রিয়ম্বদার করুণ-মধুর-স্নিগ্ধ 'সুদূর অতৃপ্তি' ও 'নিষ্ফল ব্যাকুলতা' তাঁকে তীব্রভাবে আকৃষ্ট করেছে। এই আগ্রহ ও নতি তাঁর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মানসিকতাকে উজ্জ্বলতর করে তোলে।

॥২॥ স্বর্ণকুমারীর খণ্ডকবিতাবলীর সম্পূর্ণ তালিকা প্রণয়ন করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। লেখিকার জীবদ্দশায় প্রকাশিত বসুমতী-সংস্করণ গ্রন্থাবলীর তৃতীয় ভাগের শেষে বলা হয়েছিল, "'ভারতী'র পৃষ্ঠায় তাঁহার বহু বিক্ষিপ্ত রচনা আজও সংগৃহীত হইয়া একত্রে প্রকাশিত হয় নাই।" সুতরাং গ্রন্থাবলীতে তাঁর সমূহ কবিতা যে পরিবেশিত হয়নি একথা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। ভারতীতে নামহীন লেখকের প্রভূত পরিমাণ কবিতা বর্তমান এবং সেগুলির মধ্যে স্বর্ণকুমারীর কবিতা যে নেই সেকথা জোর করে বলা যায় না। আবার ভারতী ব্যতীত সমকালীন অন্যান্য পত্র-পত্রিকায়ও তাঁর কোনো কোনো কবিতা মুদ্রিত হয়েছিল, এবং তাদের নিঃসংশয় পরিচয় সংগ্রহ করা অনায়াসসাধ্য নয়। তাই বর্তমান প্রস্তাবে কেবলমাত্র গ্রন্থাবলী-ধৃত ও ভারতীতে প্রকাশিত কবিতাবলীর পরিচয় প্রদত্ত হল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বর্তমান গ্রন্থের পরিশিষ্টে স্বর্ণকুমারীর কবিতাবলীর যে তালিকাটি দেওয়া হয়েছে তা যথেষ্ট পরিমাণে সংস্কারসাপেক্ষ যদিও তালিকাটি নির্মাণে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রমাণাদি অবলম্বিত হয়েছে।

স্বর্ণকুমারীর একটি কবিতা-সংকলন গ্রন্থ 'কবিতা ও গান' নামে ১৩০২ সালের কার্তিক মাসে (১ ডিসেম্বর ১৮৯৫) প্রকাশিত হয়। এই সংকলনের অন্তর্গত অতৃপ্তি (ভারতী, ১২৯৫) নাট্যকাব্যবিশেষ। গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত জাতীয় সংগীত, ধর্ম-সংগীত, প্রেম-পারিজাত, প্রভাত-সংগীত, মধ্যাহ্ন-সংগীত, সন্ধ্যা-সংগীত, নিশীথ-সংগীত প্রভৃতির মধ্যে তাঁর খণ্ডকবিতাবলী স্থানলাভ করেছে। এইসকল গ্রন্থের মধ্যে কবিতার সঙ্গে গানও সংকলিত হয়েছিল। মহীশূর থেকে ১৩০২ সালের ভাদ্র মাসে 'কবিতা ও গান' গ্রন্থের যে 'বিজ্ঞাপন'টি লিখিত হয় তার কিয়দংশ এইরূপ : "কবিতাগুলির মধ্যে অতি অল্পই ইতিপূর্বে 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং দুই চারিটি আমার বাল্যরচনা। গানের অধিকাংশই আমার অপরাপর গ্রন্থাদি হইতে সংকলিত, কেবল 'বসন্ত-উৎসবে'র সমস্ত গান ইহাতে স্থান পায় নাই; প্রসঙ্গহানি ব্যতিরেকে যে কয়েকটি উদ্ধার করা যায়, সেই কয়েকটি মাত্র ইহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে। দুই একটি গান ইংরাজী ভাব লইয়া রচিত।"

বস্তুতপক্ষে স্বর্ণকুমারীর কবিতাকে গান থেকে একান্তভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায়

না। প্রকৃতপ্রস্তাবে স্বরনিরপেক্ষ গানের ভাষার এবং কবিতার কথার পাঠমূল্য সম্পর্কে আলোচনাকালে দেখা যায় যে এতদুভয়ের মধ্যে বিশেষ কোনো প্রভেদ নেই। স্বর্ণকুমারীর কবিতার মধ্যে সংগীতে-ব্যবহার্য আহা-উহু-হায় প্রভৃতি অব্যয় ব্যবহৃত হয়েছে প্রভূত পরিমাণে। তাছাড়া প্রেম-পারিজাতের মত কোনো কোনো কাব্যগ্রন্থে একই সঙ্গে গান ও কবিতা যে সন্নিবেশিত হয়েছিল সেকথা কাব্যের ক্রোড়পত্রে স্বীকৃত। স্বর্ণকুমারীর গান এবং কবিতার এই পারস্পরিক অবিভাজ্যতার প্রমাণস্বরূপ আরও কয়েকটি তথ্যের অবতারণা করা চলে। কবিতা পারিজাতহার কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় কবিতার শিরোনাম 'নমামি ত্বাং'; ভারতীবন্দনা-বিষয়ক এই কবিতাটির প্রারম্ভে রাগ ও তালের নির্দেশ আছে এবং গীতিগুচ্ছের মধ্যে গানটির স্বরলিপিও পাওয়া যায়। গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় ভাগের নবকবিতাবলী-পর্যায়ে 'বাউলের গান'-শীর্ষক যে কবিতাটি বর্তমান তাকে প্রচলিত অর্থে গান বলা যায় না, কেবল-কবিতারূপে রচনাটি গৃহীত হতে পারে। প্রভাত-সংগীতের অষ্টম কবিতার নাম 'মায়াবিনী : তরুর গান'। সন্ধ্যা-সংগীতের দশম কবিতা 'প্রজাপতির মৃত্যুগান' প্রভৃতি রচনার কথাও প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়। প্রভাত-সংগীত, সন্ধ্যা-সংগীত, নিশীথ-সংগীত প্রভৃতি কাব্যের নামের ক্ষেত্রে 'সংগীত' শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের শৈশব সংগীত সন্ধ্যাসংগীত প্রভাতসংগীত প্রভৃতি কাব্যের নামে ব্যবহৃত 'সংগীত' শব্দটির তাৎপর্য আলোচনা প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, "সংগীত অর্থে সাধারণত গানই বুঝায়; কিন্তু আলোচ্য কাব্যগুলির মধ্যে কণ্ঠগেয় গীত নাই। অথচ তাহাদিগকে সংগীত বলা হইয়াছে।... বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ লিরিকের অনুবাদ 'সংগীত' করিলেন।"[৪৬] কবিতা যে বহুলাংশে সংগীতধর্মী, অন্তত গীতিকবিতার মধ্যে সংগীতের দিকটি যে ঈষৎ মর্যাদা লাভ করে থাকে তা অস্বীকার করা চলে না। এপ্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি মন্তব্য স্মরণযোগ্য, 'গীত হওয়াই গীতিকাব্যের আদিম উদ্দেশ্য; কিন্তু যখন দেখা গেল যে, গীত না হইলেও কেবল ছন্দোবিশিষ্ট রচনাই আনন্দদায়ক, এবং সম্পূর্ণ চিত্তভাবব্যঞ্জক, তখন গীতোদ্দেশ্য দূরে রহিল; অগেয় গীতিকাব্য রচিত হইতে লাগিল। / অতএব গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।"[৪৭]

সম্ভবত স্বর্ণকুমারী ছন্দোবদ্ধ বিষয়ের রচনাকৌশল প্রথম আয়ত্ত করেছিলেন সংগীত রচনার মাধ্যমে, কারণ তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'বাল্যসখী' বেশ পরিণত বয়সের রচনা।[৪৮] কোনো কোনো সমালোচক তাঁর কবিতায় ছন্দের কারুকার্যের অভাব এবং

৪৬ রবীন্দ্রজীবনী ১ম, পৃ ১৫৫।

৪৭ গীতিকাব্য—বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম খণ্ড; দ্র বঙ্কিম রচনাবলী, ২য়, সাহিত্য সংসদ সং ১৩৬১, পৃ ১৮৭।

৪৮ ভারতী, ফাল্গুন ১২৮৪।

ছন্দপতনগত ত্রুটি লক্ষ করেছেন। মনে হয় গীত রচনার মাধ্যমে ছন্দ-কলার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন বলে কবিতার ক্ষেত্রে এরকম শৈথিল্য ধরা পড়েছে ; অথবা তৎকাল-প্রচলিত সংগীতের ছন্দ-শৈথিল্য তাঁর কাব্যদেহ-নির্মিতির এই বিশিষ্ট অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপারটিকে স্পর্শ করেছিল। অবশ্য একথা সত্য যে তাঁর প্রারম্ভিক পর্যায়ের অধিকাংশ গান যৎকালে স্বীকৃতি লাভ করেছিল সেই সময়কার বিশেষ কোনো সার্থক কবিতা পাওয়া যায় না। এই সূত্র থেকে প্রতীয়মান হয় যে হয়ত গীতিরচনায় সিদ্ধহস্ত হওয়ার পর যে আত্মবিশ্বাস তিনি অর্জন করেছিলেন তার ফলে তিনি কাব্যরচনায় আকৃষ্ট ও মনোযোগী হয়ে উঠেন।

॥৩॥ স্বর্ণকুমারীর সান্নিধ্য-ধন্য প্রখ্যাত জীবনী-রচয়িতা ও সাহিত্যরসিক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁর 'বঙ্গের মহিলা কবি' নামক গ্রন্থে লেখিকার কবিপ্রতিভার উন্মেষ সম্বন্ধে বলেছেন, 'ছেলেবেলা হইতেই স্বর্ণকুমারী প্রকৃতিদত্ত স্বাভাবিক প্রতিভাবলে সাহিত্যানুরাগিণী হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার যখন অতি শৈশব, তখন তিনি ছড়া বাঁধিয়া কবিতার ছন্দে কথা বলিতেন এবং সে ছন্দের মিল অতি সহজ সরলভাবে সম্পন্ন করিতেন' ইত্যাদি। শৈশবে সহজাত কবিত্ব শক্তির যে স্বাভাবিক স্ফুরণ বা বিকাশ ঘটে তার মধ্যে ছড়াজাতীয় কবিতা রচনার প্রয়াসটি সিদ্ধ হয় বটে, তবে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে 'কবিতার ছন্দে কথা' বলার সময় 'ছন্দের মিল অতি সহজ সরলভাবে সম্পন্ন' করার প্রশংসনীয় ব্যাপারটিও এস্থলে আদৌ উপেক্ষণীয় নয়। ছন্দের আবেদন শ্রবণেন্দ্রিয়ের নিকটে প্রধান বলে প্রখর শ্রুতিচৈতন্য থেকে ছন্দের শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠে, স্বর্ণকুমারীর সেইরূপ অনুশীলনের কথা পরোক্ষভাবে জানা যায় যোগেন্দ্রনাথের উক্ত মন্তব্য থেকে।

কোনো কোনো কবিতায় স্বর্ণকুমারীর কবিজীবনের ইতিহাস পরিবেশিত হয়েছে। প্রেম-পারিজাত কাব্যের 'লিখিতেছি দিনরাত' কবিতার মধ্যে তিনি বলেছেন যে যদিও সাহিত্যসাধনায় তিনি সর্বদাই ব্যাপৃত এবং গান কবিতা উপন্যাস গল্প প্রভৃতি রচনায় যদিও তিনি নিরলস প্রয়াসকামী, তথাপি একটা ব্যর্থতাবোধ তাঁর হৃদয়কে নিরন্তর পীড়িত করে চলেছে ; জীবন-খাতার লিপিবদ্ধ পাতাগুলি শ্রান্তক্লান্ত চিত্তে যদি কোনো একদিন তিনি পড়তে বসেন তাহলে একটা অসম্পূর্ণতা ও অসার্থকতা তৎক্ষণাৎ স্পষ্টতর হয়ে উঠে। আবার এই নৈরাশ্য-পীড়িত হয়েও তিনি ব্রতচ্যুত হতে পারেন না অথবা আপনার সৃষ্টিকে ধ্বংস করতে পারেন না, বস্তুত স্নেহপরায়ণা জননীর মত অক্ষম সন্তানতুল্য দুর্বল রচনাগুলির প্রতি একটা সকরুণ বাৎসল্য তিনি পোষণ করেন হৃদয়ের অভ্যন্তরে ; তাই মাতার পক্ষপাতিত্ব দেখা যায় স্বর্ণকুমারীর চিত্তে, রুগ্ন সন্তানের কল্যাণকামনায় উদ্যোগী হয়ে উঠেন জননী। খ্যাতি-অখ্যাতির কথা চিন্তা না করে সাহিত্যসাধনায় সর্বদা নিযুক্ত থাকার বাসনা বর্তমান কবিতায় সুপ্রকট। শিল্পের বেদীমূলে নিষ্ঠাবতী পূজারিণীর মত তিনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। 'ভারতীর ভিটা'

নামক প্রবন্ধে শরৎকুমারী চৌধুরানী বলেছেন যে তিনি যখনই জানকীনাথের রামবাগানস্থ বাড়িতে যেতেন তখনই দেখতে পেতেন স্বর্ণকুমারী 'সেক্সপীয়ার পড়িতেছেন, আবার কখন দেখিতাম সেতার শিক্ষা করিতেছেন'। দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে থেকেও এবং তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তুর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন না করেও তিনি সাহিত্যশিল্প-সাধনার ব্যাপারে ছিলেন একান্ত আগ্রহী। কবির জীবনসাধনার এই ইতিহাস কবিতা পারিজাতহার কাব্যের একাধিক কবিতায় ছড়িয়ে আছে। সংস্কৃত-বাংলা বা মিশ্রভাষায় রচিত সরস্বতীবন্দনামূলক কবিতাটিতে ভক্তের অঞ্জলি নিবেদিত হয়েছে। হৃদয়কমলদলবাসিনী, রাগরাগিণী-বিকাশিনী, নন্দন-নন্দিত সুরনরবন্দিত বীণাপাণি, বাগ্‌বাদিনী, ভক্তচিত্তে দিব্যজ্যোতির্বিভাসিনী প্রভৃতি তাৎপর্যপূর্ণ বিশেষণে ভূষিত দেবীই ছিলেন শিল্পীর পরম আরাধ্য। একই কাব্যের অন্তর্গত নববর্ষে-শীর্ষক কবিতায়ও তিনি ভারতীর নিকট হৃদয়াঞ্জলি দান করেছেন, সেখানে ভারতী 'হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী রাণী'রূপে অভিহিত হয়েছেন। স্বর্ণকুমারীর গান সম্বন্ধে আলোচনাকালে দেখা যায় যে ব্রহ্মসংগীত ব্যতীত অন্যত্র তিনি কেবল ভারতীরই বন্দনা করেছেন; ধর্মসংগীতে অন্যান্য দেবদেবীর প্রসঙ্গ আছে সত্য, কিন্তু ভক্ত-হৃদয়ের আকুলতা সেখানে স্বতন্ত্রভাবে উৎসারিত হয়েছে বলে বিশুদ্ধ দেবদেবী-বন্দনামূলক রচনার মধ্যে উক্ত গানগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। তদ্রূপ কবিতার মধ্যেও সরস্বতী ব্যতীত অন্য কোনো দেবদেবীর নিদিধ্যাসন নেই। প্রসঙ্গত বলা যায় যে স্বর্ণকুমারীর কবিতায় কলালক্ষ্মী সরস্বতীর পৌরাণিক মহিমা লঙ্ঘিত হয়নি। বিহারীলালের সারদা-পরিকল্পনায় স্বানুভূত চিন্তার সন্ধান পাওয়া যায় বলে পৌরাণিক সরস্বতীর সঙ্গে সারদার স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রারম্ভিক পর্বে কাব্যপ্রেরণা-শক্তিরূপে কখনো কখনো সরস্বতী গৃহীত হয়েছেন সত্য, তবে পরবর্তীকালে তাঁর মানসীতত্ত্বের অভিনবত্ব সরস্বতীর পৌরাণিক পরিমণ্ডলকে প্রায় আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

॥৪॥ স্বর্ণকুমারী দেবীর বিভিন্ন রচনায় কাব্যতত্ত্ব সম্বন্ধে যেসকল চিন্তা-ধারণা পরিবেশিত হয়েছে সেগুলি আলোচনাকালে দেখা যায় যে তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি ও উৎকৃষ্ট কবিতা, বা কবি ও কবিতার সম্পর্ক, কিংবা বহির্জগৎ এবং বিভাবনা-কৌশল প্রভৃতি দুরূহ প্রসঙ্গ বিচক্ষণতার সঙ্গে উত্থাপিত হয়েছে। এক্ষেত্রে তিনি কেবলমাত্র পূর্বসূরীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেননি, পূর্বতন চিন্তার স্বীকরণে এবং প্রকাশভঙ্গির মৌলিকতায় তাঁর সাহিত্যতত্ত্ব সম্বন্ধীয় আলোচনা বিশিষ্টতার গৌরব অর্জন করেছে।

সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকার শাখার মধ্যে কাব্যের স্বরূপ ও স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে তিনি ছিলেন সচেতন, 'কাব্য ও উপন্যাসের বিশেষ প্রভেদ—প্রধানতঃ একের ভাষা গদ্যময়, অন্যের ভাষা ছন্দময়। কবিত্ব-কল্পনা ও মনুষ্য-চরিত্রজ্ঞান উভয়ের মধ্যেই আছে। সুতরাং উভয়ের মধ্যে

সৃজন-শক্তির রূপভেদ থাকিলেও ক্ষমতার বিকাশে কেহ হীন নহে।'[৪৯] আবার শ্রেষ্ঠ কবি সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'ছন্দোবন্ধে যিনি পুস্তক লিখিতে পারেন তিনিই কবি নহেন, যিনি যতই ভাবুক তিনিই তত কবি। প্রকৃত ভাবুক হইতে গেলে একটি অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি থাকা চাই যাহা দ্বারা তিনি জগৎসংসারের অন্তর্নিহিত ভাবটি গ্রহণ করিতে পারেন।'[৫০] অন্যত্র তিনি এসম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট করে দিয়েছেন, 'ছন্দোবন্ধে কথা সাজাইতে পারিলেই কবি হওয়া যায় না, কবিত্ব একটি অতীন্দ্রিয় শক্তি—যাঁহার এই শক্তি যত অধিক তিনিই তত উচ্চ কবি, তিনিই তত অধিক পরিমাণে জগতের অন্তর্নিহিত ভাব চয়ন করিয়া জগতের স্থায়ী উপকার করিতে সক্ষম।'[৫১] ছন্দোবদ্ধ রচনামাত্রই শ্রেষ্ঠ কবিতা না হলেও কবিতার শ্রুতি-সুখকর ধ্বনিস্পন্দনকে তিনি আদৌ অস্বীকার করেননি। অবশ্য এইজাতীয় বিশিষ্ট আঙ্গিক পারিপাট্য তাঁর কাব্যে লক্ষিত হয় না সত্য, তথাপি কবিতা-আস্বাদনকালে সেই ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রবল অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি ; কোথাও কোথাও শব্দচয়নে কিংবা শব্দনির্বাচনে অসতর্কতা থাকলেও রসাস্বাদনব্যাপারে এবংবিধ দুর্বলতা বিশেষ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি। সমকালীন সকল শক্তিমান কবির কাব্যে এরূপ শৈথিল্য প্রায়ই পরিলক্ষিত হয়, এবং উক্ত প্রতিনিধিস্থানীয় কবিগণের রচনাদর্শের দ্বারা তিনি কিয়ৎপরিমাণে নিয়ন্ত্রিতও হয়েছিলেন, বিশেষত অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের দুঃসাহসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার বশবর্তী হয়েছিলেন। বিষয়টি অন্যবিধ দৃষ্টিকোণ থেকেও বিচার্য। স্বর্ণকুমারীর স্বরলিপিপুস্তক বা সংগীতগ্রন্থে বিভিন্ন তালের সার্থক প্রয়োগ পাওয়া যায় বলে তথাকথিত ছন্দ-শৈথিল্য থেকে কবির ছন্দশাস্ত্রীয় অগভীর জ্ঞান প্রমাণিত হয় না। সম্ভবত সংগীতপ্রীতির জন্য এবংপ্রকার অসতর্কতায় তাঁর কাব্যশরীর আক্রান্ত হয়েছিল। সংগীতে তানবিস্তারের প্রভূত অবকাশ থাকায় সেক্ষেত্রে কথার তথাকথিত তাল-মাত্রা-লয়ের সংগতি রক্ষা সর্বদা অত্যাবশ্যকীয় নয় ; কবিতার ছন্দোবন্ধ নির্মাণকালে লেখিকা উক্ত বিস্তারকে হয়ত বিশেষ স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলেন। তাই ছন্দের গঠনবিচারে বা তাল-লয়ের মাত্রাবিচারে বহিরঙ্গগত দুর্বলতা লক্ষিত হলেও কবিতাংশের আবৃত্তিকালে এইজাতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি একান্তভাবে প্রধান হয়ে উঠে না। আবার ছন্দ-ব্যাপারটি দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়, শ্রুতিসম্মত। তাই যে কাব্যাংশের আবৃত্তিকালে শ্রবণেন্দ্রিয় পীড়িত হয় না তাকে ত্রুটিহীন বলা যেতে পারে। প্রকৃতপ্রস্তাবে স্বর্ণকুমারীর কবিতার ছন্দ-প্রকরণে সংগীত-রচনারীতির বিশিষ্ট কৌশলের প্রভাবটি প্রতিফলিত হয়েছিল, কবিতা ও গানের অবিভাজ্যতাই তার সম্ভাব্য কারণ।

৪৯ রমাবাই—ভারতী ও বালক, শ্রাবণ ১২৯৬, পৃ ২৪৪।

৫০ কবি, নাস্তিকতা ও সেলি—ভারতী ও বালক, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৪, পৃ ১১৪।

৫১ কবিতা ও কবি—ভারতী ও বালক, ভাদ্র ১২৯৩, পৃ ২৫৭।

যাহোক, শ্রেষ্ঠ কবিতা সম্পর্কে তিনি যে মনোভাব পোষণ করতেন তা এইরূপ: 'জীবের যেমন প্রাণ কবিতায় তেমনি ভাব, ভাবময় কবিতাই কবিতা,…যে ভাব মধুর সুন্দর আদর্শস্বরূপ, যে ভাব দ্বারা প্রকৃতির প্রাণের সহিত আমাদের প্রাণের, সসীমের সহিত অসীমের মিলনলাভ ঘটে, অন্তত সেই মিলনপথে আমাদের লইয়া যাইতে যে ভাবের চেষ্টা—তাহাই কবিতার ভাব। যে কবিতায় এইরূপ ভাবের যত আধিক্য সেই কবিতাই তত শ্রেষ্ঠ।' অন্যত্র ভাবসমৃদ্ধ কবিতার সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'যে কবিতায় হৃদয় যত অভাবের ভাবে পূর্ণ করে, সেই কবিতা তত ভাবময়, তত শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ একটি কবিতাই পড়িয়া যাহা পড়ি নাই, এমন শত শত ভাবে যখন হৃদয় ভরিয়া উঠে, তাহার সেই দৃশ্যত অভাবের সহিত অদৃশ্য ভাবের বন্ধনে হৃদয় এক হইয়া যায়, তখনই কবিতা পড়িয়া তৃপ্তি হয়, নহিলে যে কবিতায় সেই কবিতাটুকু মাত্র পড়ি, তাহা হইতে আর কোন অভাব হৃদয়ে জাগে না,—তখন সেই অভাবের অভাবে কবিত্বেরই অভাব দেখা যায়।…অভাবের মধ্যেই ভাব বিরাজমান।'[৫২] 'ভাবময় কবিতা' নির্মিতির উপযোগী অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিক্ষমতাটি হল সেই বহুশ্রুত অপূর্বসৃষ্টিনির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা। লক্ষণীয় যে প্রত্যক্ষদৃষ্ট বিশ্ব কিংবা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ সম্বন্ধে আগ্রহী হওয়া সত্ত্বেও 'জগৎসংসারের অন্তর্নিহিত ভাবটি'র প্রতি তাঁর কৌতূহল ছিল অপরিসীম। তিনি বলেছেন, সাধারণ লোকে একটি ফুল দেখে ক্ষণিকের জন্য আনন্দিত হয়ে সেকথা বিস্মৃত হয়ে যায়; 'কিন্তু একটি ফুলের সঙ্গে কবির চিরন্তন সম্পর্ক জন্মিল, তাহার মধ্যে কবি আজীবন আত্মহারা হইলেন, সে সৌন্দর্যের মধ্যে তিনি বিশ্বের অমর আত্মাখানি প্রত্যক্ষ করিলেন, সেই সৌরভের মধ্যে এক অনন্ত জীবনের অনন্ত প্রেমকাহিনী শুনিতে পাইলেন।…কবির দিব্য দৃষ্টির সম্মুখে মিথ্যার মধ্যে যাহা সত্য, জড়ের মধ্যে যাহা প্রাণ, শরীরের মধ্যে যাহা আত্মা, স্থূলের মধ্যে যাহা সূক্ষ্ম, জগতের মধ্যে যাহা জগদতীত, অসংবদ্ধতা-অশোভনতা-বৈষম্যের মধ্যে যাহা সুন্দর-সুশোভন-সাম্য তাহা প্রকাশিত হয়। কবি তাঁহার সেই স্বতোলব্ধ সত্য কল্পনায় সাজাইয়া ভাষায় ফুটাইয়া লোককে সজ্ঞান করিতে প্রয়াস করেন।' কবি লোকশিক্ষক, সত্যসুন্দরমঙ্গলের উপাসক এবং সত্যদ্রষ্টা ঋষি; তাই তিনি 'জগতের স্থায়ী উপকার করিতে সক্ষম' এবং সচেষ্ট। কবিতা ও কবি নামক প্রবন্ধের একস্থলে দেখা যায় স্বর্ণকুমারী নীতিশাস্ত্র ও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের পরম উদ্দেশ্যের মধ্যে কোনো প্রভেদ খুঁজে পাননি। একদা উত্তরচরিত প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রও বলেছিলেন, 'কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে—কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য।'

১২৯১ সালের ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত ভূমিকা-শীর্ষক প্রবন্ধে কবি ও বৈজ্ঞানিকের

৫২ অভাব—গ্রন্থাবলী, ৫ম, পৃ ৭৭।

কল্পনাশক্তি সম্বন্ধে তিনি যা বলেছিলেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ: 'পদ্যে কল্পনাশক্তির বিলক্ষণ প্রয়োগ হইয়া থাকে, তবে পদ্য প্রভৃতির কল্পনা আর বিজ্ঞানের কল্পনা এই দুয়ে একটি প্রধান প্রভেদ এই যে বিজ্ঞানে সাধারণত দ্রব্যগুণের সামান্য গুণগুলি অর্থাৎ যেসকল গুণ কতকগুলি দ্রব্যের মধ্যে সাধারণ সেইসকল গুণ ঐ দ্রব্যগুলি হইতে স্বতন্ত্র করিয়া কল্পনা করিতে হয়, আর কবিতা প্রভৃতিতে সত্য ন্যায় বীরত্ব ইত্যাদি কোন বিশেষের চিত্র অঙ্কিত করার অভিপ্রায় থাকিলেও তাহা উদাহরণে দেখাইবার নিমিত্ত আমরা রূপরসগন্ধস্পর্শাদি সর্বগুণবিশিষ্ট কোন বিশেষ দ্রব্যের কল্পনা করি।···আমরা কাব্যে যাহা কল্পনা করি না কেন তাহা রূপরসগন্ধস্পর্শাদি গুণযুক্ত একটি বিশেষ পদার্থমাত্র। সুতরাং এক অর্থে বিজ্ঞানের কল্পনা কাব্যের কল্পনা অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর, কেননা বিজ্ঞানের উচ্চতর কল্পনায় প্রত্যক্ষ পদার্থ হইতে পৃথকীকৃত সামান্য গুণসমষ্টি মনের মধ্যে উপস্থিত করার চেষ্টা করিতে হয়, আর কাব্যের কল্পনায় সমুদয় গুণযুক্ত বিশেষ কোন একটি দ্রব্য উপলব্ধি করিতে হয়' ইত্যাদি। এর প্রায় তিন বৎসর পরে প্রকাশিত কবি, নাস্তিকতা ও সেলি (ভারতী ও বালক, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৪) প্রবন্ধেও তাঁর এইজাতীয় ভাবনা পুনরুচ্চারিত হয়েছে, 'যিনি যত উচ্চ কবি তিনি তত শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, কেননা ইন্দ্রিয়াতীত দিব্য সত্য তিনি তত অধিক আয়ত্ত করিতে পারেন।' এইরূপ সিদ্ধান্ত যে আকস্মিকতাপ্রসূত ও অসতর্কতামিশ্রিত তা বলা চলে না। বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষতা তাঁর নিকট একদা প্রীতিকর হয়ে উঠে, বিজ্ঞানচর্চায়ও তাঁর অভিনিবেশ লক্ষিত হয়ে থাকে। উপরিলিখিত মন্তব্যগুলি সেই সময়কার যখন তিনি জ্যোতির্বিদ্যা ভূবিদ্যা পদার্থতত্ত্ব প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিবিধ বিষয় অনুশীলনে ছিলেন বিশেষভাবে মনোযোগী। পরবর্তীকালে লেখিকা বিজ্ঞানের খণ্ডতাবোধ লক্ষ করে কাব্যের সমগ্রতা-ভাবনার প্রতি অধিকতর আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেন ; তখনই তিনি 'মিথ্যার মধ্যে যাহা সত্য, জড়ের মধ্যে যাহা প্রাণ, শরীরের মধ্যে যাহা আত্মা, স্থূলের মধ্যে যাহা সূক্ষ্ম, জগতের মধ্যে যাহা জগদতীত' তাকেই অনুভব করছেন। এক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ কবি এবং শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের মধ্যে পরিণামে তিনি কোনো ভিন্নতা সহ্য করেননি, কারণ 'অণু হইতে অণুর অন্তরে প্রবেশ করাই কবির আকাঙ্ক্ষা, অন্ত হইতে অনন্তে মিলন লাভ করাই কবির বাসনা। সুতরাং সংসারের ক্ষুদ্র সুখ ঐশ্বর্য লইয়াই কবি সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না ; কবির হৃদয় অণুর অণু, প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা অনুসন্ধান করিতেই ব্যস্ত। তাঁহার দিব্যদৃষ্টি তাঁহাকে উচ্চজ্ঞানের উচ্চানন্দের যে সমুদ্র দেখাইয়াছে তিনি অতৃপ্ত হৃদয়ে তাহার মধ্যে ডুবিয়া তলাইয়া যাইতে ব্যগ্র।' অন্বেষণ ও সৃজনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ আবিষ্কারের ব্যাপারে এবং বস্তুর নবীকরণের স্থলে বিজ্ঞানী ও কবি উভয়েই সমানধর্মা। স্বর্ণকুমারীর উদার ও প্রসন্ন সাহিত্যবোধের নিকট এতদুভয়ের কোনো প্রবল বিরোধিতা স্বীকৃতি পায়নি।

॥৫॥ রোমান্টিক বিষণ্ণতা ও কারুণ্য স্বর্ণকুমারীর মনোভূমিতে ছিল বিরাজমান। বিশিষ্ট মানসিক গঠনের মধ্যেই যে কেবল এই বিষাদের দিকটি প্রাধান্য লাভ করেছিল তা নয়, সমকালীন বাংলা কাব্যেও এই বেদনা ও বৈরাগ্যের আতিশয্য লক্ষিত হয়।[৫৩] কাব্যস্বরূপ নির্ণয়কালে লেখিকা বলেছেন, 'যে কবিতায় হৃদয় যত অভাবের ভাবে পূর্ণ করে সেই কবিতাই তত ভাবময়, তত শ্রেষ্ঠ।'[৫৪] আবার না-পাওয়া অপেক্ষা পেয়ে-হারাবার বেদনা কিংবা অপ্রাপণীয়ের পশ্চাদ্ধাবনজনিত বেদনাবোধ রোমান্টিক কবিতার বাতাবরণকে ঘন অশ্রুবাষ্পে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে, 'সৌন্দর্যের প্রতি যে আমাদের এত আকর্ষণ, তাহার অর্থ—আমরা সৌন্দর্য পাইতে চাই—তাহার সহিত মিলিত হইয়া নিজে সুন্দর হইতে চাই।...এ কেবল অপূর্ণ মানবের অদৃশ্য অগোচর কল্পনাময় পরিপূর্ণতার জন্য আকাঙ্ক্ষা—The desire of the moth for the star. যে আকাঙ্ক্ষা সম্যক পূর্ণ হইবার আমাদের কখনো আশা-ভরসা নাই, তাহার অস্পষ্ট ছায়াময় ছবি ধরিবার জন্যই আমরা ব্যগ্র। ভালবাসার সঙ্গে, সন্ধ্যার সঙ্গে, জ্যোৎস্নার সঙ্গে আমরা যে সাদৃশ্য দেখিতে পাই, তাহার কারণ, ইহাদের সৌন্দর্য ছায়াময়, ভালবাসার আকাঙ্ক্ষার মত ইহাদের ধরাছুঁয়া যায় না। যে কবিতা, যে কল্পনা যত অপার্থিব, তাহাই তত এইরূপ ছায়াময় আকাঙ্ক্ষা-উদ্দীপক।'[৫৫] দুঃখানুভূতি ও সুতীব্র বাসনা, সুদূরের আহ্বান ও আকর্ষণ, অপ্রাপণীয়ের সন্ধান ও ব্যর্থতা প্রভৃতি রোমান্টিক কবিতার বিষয়ধর্ম। বিপুল মানবজীবন এবং বিশাল বিশ্বজগৎ যে বেদনা-সিক্তি হয়ে রোমান্টিক সাহিত্যে সমর্পিত হয় সমালোচকগণ তা স্বীকার করেছেন।

স্বর্ণকুমারীর কোনো কোনো কবিতায় এই বিষণ্ণতা ও কারুণ্যের সন্ধান মেলে। নব-কবিতাবলীর 'কেন গো শুধাও' কবিতাটিতে অকারণ বেদনার পরিচয় বর্তমান—

> কাঁদিতে দাও গো একা একা, শুধায়ো না কারণ কি সখা।
> কেন হৃদে জ্বলিছে অনল, কেন বহে নয়নেতে জল,
> কেন যে গো সারা রাতদিন এ হৃদয় গায় দুখ-গান,
> জানে না তা জানে না পরাণ।

সুগভীর সুখের মধ্যেও এই বেদনার উদ্বোধন ঘটে, নিশীথ-সংগীত কাব্যের 'সুখের

৫৩ প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত একটি পত্রে (২৯ জানুয়ারি ১৮৯৮) রবীন্দ্রনাথ মানসী-পর্বের ভাব-বৈশিষ্ট্য আলোচনাকালে এই বেদনা ও বৈরাগ্যের ('despair এবং resignation-এর') প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। দ্র পরিশিষ্ট—মানসী, ১৩৬১, পৃ ২৫৫।

৫৪ অভাব, বিবিধ কথা—গ্রন্থাবলী, ৫ম, পৃ ৭৭; দ্র বিবিধ প্রসঙ্গ—ভারতী ও বালক, আষাঢ় ১২৯৫, পৃ ১৭৯।

৫৫ প্রেম—ভারতী ও বালক, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮, পৃ ৮৭; দ্র গ্রন্থাবলী, ৫ম, পৃ ৭৭।

অবসাদ' কবিতায় লক্ষিত হয় জ্যোৎস্নাময়ী বসন্ত-রজনীর সুখসম্ভোগের মধ্যেও দুঃখার্ত হয়ে উঠেছে কবিচিত্ত। প্রকৃতপ্রস্তাবে রোমান্টিকগণ এই দুঃখবিলাসের প্রতি একান্ত আগ্রহী।[৫৬]

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র কলালক্ষ্মী সারদার উপস্থিতি অনুভব করেছিলেন বিহারীলাল; স্বর্ণকুমারীর কোনো কোনো কবিতায় সেই প্রবণতা সুপ্রকট। প্রভাত-সংগীতের 'কোথায় কোথায়' কবিতাটিতে দেখা যায়, 'সবিতার জ্যোতির্ময় রূপে, চন্দ্রমার সুস্নিগ্ধ কিরণে, নক্ষত্রের কনকবিভায়, বিজুলির চমক বরণে, পর্বতের অভ্রভেদী দৃশ্যে, সমুদ্রের মহান শোভায়, বনানীর গভীর সৌন্দর্যে', নির্ঝরের তানে, তটিনীর মৃদুল কল্লোলে, বিহগের সুললিত গানে, বসন্তের সুমন্দ হিল্লোলে, নিশীথের বংশীধ্বনিতে, প্রস্ফুটিত কুসুমের মধ্যে তথা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতা ও ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতির জগতের সর্বত্র সৌন্দর্যের পূর্ণ মহিমার সেই অনুসন্ধানটি প্রসারিত; বিশ্বের বস্তুরাজির অন্তরালবর্তী যে সাধারণ সৌন্দর্য-সম্পর্ক নিরন্তর প্রবহমান তাকে আবিষ্কার এবং অবলম্বন করে সমূহের সঙ্গে কবি আপনার ভাবনার যোগসূত্র রচনা করেছেন। জগৎ এবং জীবনের তথা নিসর্গের সঙ্গে কবিহৃদয়ের এই একাত্মীভবনের কথা রোমান্টিক কবিগণের কাব্যে পুনঃপুনঃ উচ্চারিত হয়েছে। কবিতা ও কবি নামক প্রবন্ধে স্বর্ণকুমারী দেবী বলেছেন, 'আলোক যেমন ইথরের আন্দোলন, জগতের সহিত মিলনজনিত কবিহৃদয়ের যে আন্দোলন তাহাই তাঁহার কবিতার ভাব।...বিশ্বসংসারের সহিত নিজের যেখানে যতই ঘনিষ্ঠ মিলন সেইখানেই এই ভাবের তত গভীরতা।' ঐ একই প্রবন্ধে 'প্রকৃতির প্রাণের সহিত আমাদের প্রাণের, সসীমের সহিত অসীমের মিলন লাভে'র কথাটিও ব্যক্ত হয়েছে। এভাবেই রোমান্টিক কবিগণ অপূর্ব কল্পনাবলে পরিচিত বস্তুকে অভিনব তাৎপর্যে মণ্ডিত করে তুলেন, এবং ফলত পরিচিত অকিঞ্চিৎকর বস্তুও বিস্ময়কর হয়ে উঠে।[৫৭]

প্রকৃতিবিষয়ক কবিতায়ও নিসর্গের বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনার সঙ্গে গীতিকবির আত্মভাবনাকে সংমিশ্রিত করে দিয়েছেন স্বর্ণকুমারী। রোমান্টিক ভাবনাশ্রয়ী গীতিকবিগণ এভাবে বাস্তব জগতের সঙ্গে আপনার হৃদয়ের সেতুবন্ধ রচনা করে থাকেন। রোমান্টিক, গীতিকবি সাধারণত markedly subjective ; they saw very much what they wished to see, and distorted, blurred—in short, 'romanticized'—the world of physical appearances so as to obtain a projection of their own inner world of fantasy and dreams, and not the almost photographically accurate depiction of actuality which realistically inclined artists strive to achieve.[৫৮] আধুনিক বঙ্গীয় গীতিকাব্য রচয়িতাদের সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য

৫৬ Irving Babbit, Rousseau and Romanticism, 1947, p 126.

৫৭ C. M. Bowra, The Romantic Imagination, 1949, p 292.

৫৮ Ralph Tymns, German Romantic Literature, 1955, p 26.

করেছেন, 'বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে মানবহৃদয়ের নিত্যসম্বন্ধ, সুতরাং কাব্যেরও নিত্য সম্বন্ধ ;··· কাব্যে অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ এই যে, উভয়ে উভয়ের প্রতিবিম্ব নিপতিত হয়। অর্থাৎ বহিঃপ্রকৃতির গুণে হৃদয়ের ভাবান্তর ঘটে, এবং মনের অবস্থাবিশেষে বাহ্য দৃশ্য সুখকর বা দুঃখকর বোধ হয়—উভয়ে উভয়ের ছায়া পড়ে।'[৫৯] বাহ্য বস্তু এবং কবিপ্রকৃতির এই পরস্পরনির্ভরতা রোমান্টিকগণের ঐকান্তিক কৌতূহলেরই পরিণাম ; তাই তাঁদের কাব্যে একদিকে যেমন প্রাকৃতিক জগৎ এবং প্রাত্যহিক তুচ্ছতা-মহত্বসহ সাধারণ জীবন কল্পনা-স্পৃষ্ট হয়ে মহিমামণ্ডিত হয়ে উঠে তেমনি তা বিশিষ্ট কবি-ভাবনার দ্বারাও সংমিশ্রিত হয়। সার্থক গীতিকবিতায় কবিমনের উপস্থিতি লক্ষিত হয়, The majority of lyrics consists of thoughts and feelings uttered in the first person, and the one readily available character to whom these sentiments may be referred is the poet himself.[৬০]

স্বর্ণকুমারীর নিসর্গবিষয়ক কবিতায় বস্তুনিষ্ঠ চিত্রলতার সঙ্গে কথিত কবিভাবনা ওতপ্রোত-ভাবে বিজড়িত। সন্ধ্যা-সংগীত কাব্যের সন্ধ্যা-শীর্ষক কবিতায় উত্তমপুরুষের ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত। আসন্ন সন্ধ্যায় আকাশে উজ্জ্বল তারকা, মৃদুমন্দ বায়ুপ্রবাহ, চাঁপার মধুর গন্ধ—দর্শন-স্পর্শ-ঘ্রাণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার বাতাবরণে তাঁর কবিচিত্ত উল্লসিত :

নিভৃত নিকুঞ্জ-বাটী বসে আছি একেলাটি,
নয়নে আঁধার জাগে স্নিগ্ধ অভিরাম,
নভঃপটে ছায়া ছায়া, স্পন্দহীন তরুকায়া,
ধ্যেয়ায় একাগ্রচিত্তে কি রহস্য নাম।···
সুদূরে মন্দির মাঝে পূরবী রাগিণী বাজে,
তুলিয়া প্রাণের প্রাণে অনন্তের তান !

এস্থলে রহস্যময়ের নিদিধ্যাসন-তৎপর জগৎ-চরাচরের অন্তরালস্থিত 'অনন্তের তান'-প্রবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন লেখিকা। এই সেই mighty Being যাকে কোনো এক সামুদ্রিক সন্ধ্যায় অনুভব করেছিলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ, টিনটার্ন এবির পটভূমিকায় একেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন একটি সর্বব্যাপী জীবন্ত সত্তারূপে।[৬১]

৫৯ বিদ্যাপতি ও জয়দেব—বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম ; দ্র বঙ্কিম রচনাবলী, ২য়, সাহিত্য সংসদ, পৃ ১৯১-৯২।
৬০ M. H. Abrams, The Mirror and the Lamp, 1953, p 85.
৬১ তুলনীয় : Listen ! the mighty Being is awake, ... (By the Sea).
And I have felt / A presence that disturbs me with the joy / Of elevated thoughts ; a sense sublime / Of something far more deeply interfused, / Whose dwelling is the light of setting suns, / And the round ocean and the living air, / And the blue sky, and in the mind

নিশীথ-সংগীত কাব্যের 'বসন্ত-জ্যোৎস্নায়' নামক কবিতার মধ্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে কবিচিত্তের স্পন্দন ধ্বনিত হয়েছে 'প্রাণে জাগে আকুল পিয়াস' অংশটিতে। মধ্যাহ্ন-সংগীত কাব্যের 'সিন্ধুর বিলাপ' কবিতায়ও গীতিকবিতাসুলভ মন্ময়তারই প্রাধান্য। বিহারীলালের 'সমুদ্রদর্শনে'[৬২] সমুদ্রের দৃশ্যময় রূপ বা 'প্রকাণ্ড কাণ্ডে'র তরঙ্গবিক্ষেপে কবির আশা-আকাঙ্ক্ষা আন্দোলিত হয়েছে; কিন্তু সমুদ্র-হৃদয়ের অবিরাম নিভৃত ক্রন্দন শুনতে পেয়েছেন স্বর্ণকুমারী, মানবজীবনের নানাবিধ জটিলতার ক্ষেত্রে সমুদ্রকে সংস্থাপিত করে আবার আত্মজিজ্ঞাসার তৃপ্তিবিধানেরও প্রয়াসী তিনি। প্রচণ্ড সমুদ্রের পরিদৃশ্যমান উল্লাসের অন্তরালে যে বেদনা বিদ্যমান তার সঙ্গে আপন চিত্তের 'অজ্ঞাত ব্যথা', 'অচেনা প্রত্যাশা' এবং 'অলক্ষ্য সুদূরে'র প্রতি আকর্ষণজনিত বিষণ্ণতার সাধর্ম্য লক্ষ করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর সোনার তরীর 'সমুদ্রের প্রতি' (চৈত্র ১২৯৯) কবিতায়; কিন্তু স্বর্ণকুমারীর কবিতায় সমগ্র মানবজাতির ব্যর্থতা-বেদনার কথাটিও উচ্চারিত, সেই সীমাহীন নৈরাশ্যের নিকট সমুদ্র-বিলাপ নিষ্প্রভ। ফলকথা, সুবিশাল বিশ্বপ্রকৃতির পটভূমিকায় সুবিপুল মানবজীবনের উপস্থাপনা এবং বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির ও আত্মভাবনার সম্বন্ধবিচারের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখিকার 'সিন্ধুর বিলাপ' কবিতাটি বাংলা রোমান্টিক গীতিকাব্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

'অতৃপ্তি' নাট্যকাব্যের (ভারতী, ১২৯৫) বিষয়বস্তু বা কাব্যভাবনা ও নাট্যগুণ অকিঞ্চিৎকর হলেও কাব্যসম্পদে গ্রন্থটি স্বর্ণকুমারীর শ্রেষ্ঠ রচনাবলীর অন্যতম; অতৃপ্তির পূর্বে স্বল্পতম ঘটনার অবলম্বনে লিখিত তাঁর এবংবিধ বৃহদায়তন সার্থক কাব্য আর পাওয়া যায় না। বনবালা, ললিত ও সখী—এই তিনটি পাত্র-পাত্রীকে কেন্দ্র করে এর ঘটনাগুলি আবর্তিত হয়েছে। কাব্যের প্রথম সর্গের নাম 'ঘুমঘোর'। সখীর উক্তি থেকে অবগত হওয়া যায়—পরস্পরের প্রতি প্রীতিপরায়ণ দম্পতি ললিত ও বনবালা সুমধুর গীতিময় পরিবেশে ভ্রমণরত; পরিশেষে 'কুসুম-শয়নে ধীরে ধীরে দুজনে বিভোর ঘুমাইয়া' পড়েছে। কিন্তু নিদ্রিতাবস্থায় একটি অশুভ প্রভাব পড়েছে তাদের মনের উপর, 'কি জানি একি মায়ার ঘোরে সহসা স্তম্ভিত মন-প্রাণ'। দ্বিতীয় সর্গে তাই জেগেছে 'সন্দেহ', ললিত ও বনবালা পরস্পরের প্রতি বিমুখ। তৃতীয় সর্গের শিরোনাম 'আকুলতা'; নায়ক ললিতের আকুতি দিয়ে এর সূত্রপাত, পরিণামে নায়ক-নায়িকা উভয়েরই চিত্তে সংশয়-অভিমান-অবিশ্বাস পুঞ্জীভূত হয়েছে। চতুর্থ সর্গে তার অনিবার্য পরিণতি 'নৈরাশ্যে'। পঞ্চম সর্গে নায়কের 'চেতনা'

of man, / A motion and a spirit, that impels. / All thinking things, all objects of all thought, / And rolls through all things. (Lines Written A Few Miles Above Tintern Abbey).

৬২ দ্র নিসর্গসন্দর্শন; প্রথম প্রকাশ—অবোধবন্ধু, ১২৭৬।

হয়েছে। 'অপরিচিত কাননতলে ঘুমভঙ্গে'র পর ললিত উপলব্ধি করেছে, যে 'মানস-দেবী'র জন্য সে সমস্ত প্রেম-প্রীতি-মমতাকে অস্বীকার করেছিল ধরা-ছোঁয়ার জগতে তা একান্ত দুর্লভ। সেই জ্যোতির্ময়ীর হাসি ছড়িয়ে থাকে গোলাপে গোলাপে, মধুকর গুঞ্জনে তার কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত; পদ্মের মত তার মুখ, আর সন্ধ্যার তারকার মত তার চোখ। এই মায়া দেবী বা মানসীর রূপায়ণে স্বর্ণকুমারী বিহারীলালের ভাবনা এবং শব্দসংযোজনার দ্বারস্থ হয়েছেন—

তুমি নয়নের কান্তি হৃদয়ের শান্তি,
পলায় মনের ভ্রান্তি পাইলে তোমায়,
আত্মার নির্বাণমুক্তি তুমি এ ধরায়! (অতৃপ্তি, পঞ্চম সর্গ)

এই অধরাকে ধরার জন্য, অপ্রাপণীয়াকে প্রাপ্তির নিমিত্ত যে ঐকান্তিক প্রয়াস তা পরিশেষে নৈরাশ্যের সম্মুখীন। রোমান্টিক কবিভাবনার সঙ্গে ললিতের চিন্তাসাদৃশ্য অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হয় পাঠকের। যাহোক, ষষ্ঠ সর্গে বিপ্রলব্ধ নায়িকা বনবালারও ক্ষোভ ধ্বনিত হয়েছে এবং তার পরিণামও ভয়াবহ। বনবালার জীবনের শোচনীয় ব্যর্থতা ললিতের প্রত্যাবর্তনকে যেন ধিক্কৃত করেছে, তার সমস্ত উদ্যমকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে দিয়েছে। উপসংহারের 'যাত্রা-অবসানে'র মধ্যে সে কাতর হৃদয়ে এই অপরিসীম শূন্যতা ও অন্তহীন অশান্তির অবসান কামনা করেছে। গৃহলক্ষ্মী ও স্বর্লোকবাসিনীর প্রতি মানবমনের আকর্ষণ-বিকর্ষণের লীলাবৈচিত্র্য ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা রোমান্টিক কাব্যে বিশেষ মর্যাদা পেয়েছিল; বিহারীলাল চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, অক্ষয়কুমার বড়াল, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির কবিতায় সেই মানসিক দোলাচলতার ইতিহাসটি বিধৃত। দেবী ও মানবীর প্রতি রোমান্টিক কবিগণের এবংবিধ দ্বিধাপূর্ণ প্রবণতা স্বর্ণকুমারীর অতৃপ্তি নাট্যকাব্যেও অবলম্বিত হয়েছিল।

॥৬॥ মধ্যাহ্ন-সংগীতের কোনো কোনো কবিতায় মধুসূদনের বীরাঙ্গনাকাব্যের (১৮৬২) রচনারীতি অনুসৃত। 'কি দোষ তোমার' কবিতায় অর্জুনের প্রতি উলুপী, 'থাক ভোর' কবিতায় গোবিন্দলালের প্রতি ভ্রমর এবং 'চুপ চুপ' কবিতায় কচের প্রতি দেবযানী আপনাদের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। নাটকীয় একোক্তির মত এই কবিতাগুলিতে অবশ্য মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের ওজস্বিতা কিংবা বীরাঙ্গনাকাব্যোচিত জটিল চরিত্রসৃষ্টির নৈপুণ্যের অভাব লক্ষিত হয়; তবে রোমান্টিক প্রণয়মূলক আখ্যানকাব্যের নায়িকারূপে এইসকল চরিত্রসৃষ্টিতে লেখিকার প্রতিভার স্বাক্ষর আছে। উলূপীর প্রবঞ্চিত জীবনের অন্তরালে মধুর আনুগত্য ফল্গুধারার ন্যায় নিরন্তর প্রবহমান, অথচ এই মর্মন্তুদ আনুগত্যের মধ্যেও ক্ষীণপ্রাণ কপোতের হৃৎস্পন্দনের ন্যায় একটা ভীরু অনুযোগের সুর প্রতিধ্বনিত। 'চুপ চুপ' কবিতাটিতে দেবযানীকে অভিনবরূপে চিত্রিত করেছেন স্বর্ণকুমারী; বিদায়-অভিশাপ (শ্রাবণ ১৩০০) নামক রবীন্দ্র-নাট্যকাব্যের সেই বিদ্যুদ্‌গর্ভ তেজস্বী রমণী এস্থলে প্রশান্ত এবং আত্মনিবেদনপরায়ণ।

বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইল (বঙ্গদর্শন, ১২৮২) উপন্যাসের ন্যায় 'থাক ভোর' কবিতায়ও ভ্রমরের ঐকান্তিক আনুগত্যের মধ্যে পরম ঔদাস্যটি প্রকাশিত।

সন্ধ্যা-সংগীতের 'স্মরিও আমায়' কবিতাটি যে 'মূর হইতে অনুবাদ' তা উল্লেখ থেকেও জানা যায়। বিদেশ-গমনোন্মুখ প্রিয়তমের প্রতি নায়িকার অনুযোগমিশ্রিত অনুরোধ গাথাকাব্যের অভাগিনী কবিতায় স্থানলাভ করেছিল, বর্তমান কবিতাটিতেও অনুরূপ ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। প্রসঙ্গত বলা যায়, তাঁর কবিতায় ও গানে ইংরেজি কাব্যভাবনাদর্শের প্রভাবের কথা স্বর্ণকুমারী দেবী কবিতা ও গান গ্রন্থের ভূমিকায় স্বীকার করেছেন। নিশীথ-সংগীত কাব্যের 'একা আমি যাত্রী' কবিতা পাঠকালে লেখিকার 'শীতল শান্ত বেলা' গানটির কথা মনে পড়া স্বাভাবিক, উভয় রচনায় যে বিদায়ের কারুণ্য ফুটে উঠেছে তা বড়ই মর্মস্পর্শী। ভারতী-সম্পাদনা থেকে চিরতরে অবসরগ্রহণের কালে (১৩২২) তিনি বলেছিলেন, 'আজ আমি বড়ই একাকী, বড় অসহায়; আজ শ্রান্তক্লান্ত দেহমন একান্তই নিবৃত্তি-লোলুপ।' বর্তমান কবিতাটিতেও সেই ক্লান্তি ও নিঃসঙ্গতা ঔদাস্য ও নির্বেদের করুণ ঐকতান শ্রুত হয়। এছাড়া কৌতুকগীতির মত কয়েকটি প্রসন্ন হাসির কবিতাও রচনা করেছেন লেখিকা। প্রভাত-সংগীতের 'কলিকালে কালো রূপ' এবং মধ্যাহ্ন-সংগীতের 'বলি শোন খুলে' সুনির্বাচিত শব্দপ্রয়োগের ফলেই হাসির কবিতার শ্রেণীভুক্ত হয়ে পড়েছে; কেবলমাত্র শব্দচয়নের সতর্কতাই কবিতাটিকে গুরুগম্ভীর ধ্রুবপদী ভাবময় কাব্যে রূপান্তরিত করতে পারত। এইজাতীয় কবিতায় আঞ্চলিক উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য পর্যন্ত সমর্পিত হয়েছিল।

॥৭॥ স্বর্ণকুমারী দেবীর কবিতায় নারীমনের প্রতিফলন একটি লক্ষণীয় ব্যাপার। ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে স্নিগ্ধসুন্দর রমণীয়তা-রমণীত্ব বাগর্থের মত সম্পৃক্তি লাভ করে সমকালীন মহিলা কবিগণের কাব্যে সমর্পিত হয়েছিল, স্বর্ণকুমারীর কবিতার মধ্যে সে অভিজ্ঞতারও অভাব নেই। অনেকে তাঁর কবিতাবলী সহৃদয়তার সঙ্গে বিচার না করে তাঁকে 'পুরুষালি' ভাবনাশ্রয়ী মহিলা কবিরূপে উল্লেখ করেছেন; কিন্তু তেজস্বিতার কঠিন আবরণের অন্তরালে সৌকুমার্য ও কোমলতা যে আত্মগোপন করে থাকতে পারে স্বর্ণকুমারীর কবিতাই তার প্রমাণস্থল।

বাল্যসখী (ভারতী, ফাল্গুন ১২৮৪) তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা। শৈশবের সখ্য প্রাপ্তবয়স্ক রমণীর কবিচিত্তে কেবলমাত্র স্মৃতির সঞ্চয়রূপেই নিঃশেষিত হয়ে যায়নি। বস্তুত কুমারীমনের স্নিগ্ধ প্রীতি এবং অপর একজন সমবয়সী বাল্যসখীর ভালবাসাকে কেন্দ্র করে সখ্যের এমন একটি গভীরতা প্রস্তুত হয়েছিল যার স্মৃতি সম্প্রতি তাঁর হৃদয়কে আলোড়িত করে চলেছে। একজনের অভাবে অপরের বাসনালোক তাই উদ্বেল:

> এইত সুরম্য নন্দনকাননে কত যে করেছি খেলা,
> দেখিতে দেখিতে জানিনে কেমনে কাটিয়া গিয়াছে বেলা।...

সেইত হোথায় বীণা আছে পড়ে ছুঁইতে পারিনে আর,
কত দিন হতে কি বলিব, সখি, নীরব আছে ও তার!
দুই দিনে, বালা, সকলি ফুরালো, ঘুচিল কি ছেলেবেলা!
ফুরাইল সুখ, ফুরাইল দুখ, ফুরালো সাধের খেলা!

গিরীন্দ্রমোহিনীর সঙ্গে স্বর্ণকুমারীর ছিল সুনিবিড় সখ্য, তাঁদের এই পারস্পরিক প্রীতি-সম্পর্কের নাম ছিল 'মিলন-বিরহ'। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বলেছেন, 'এমন সখিভাব সাহিত্য-জগতে বিশেষতঃ প্রতিদ্বন্দ্বিতা-ক্ষেত্রে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যতদিন গিরীন্দ্রমোহিনী জীবিতা ছিলেন ততদিন তাঁহাদের উভয়ের সখিভাব অটুট ছিল।'[৬৩] একদা উভয় কবিই পরস্পরের জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাকে অবলম্বন করে কবিতা রচনা করতেন, ভারতীর পৃষ্ঠায় তার চিহ্ন বর্তমান। কোনো একসময় গিরীন্দ্রমোহিনী স্বর্ণকুমারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে মাথার চুলের কাঁটা ফেলে যান; তা লক্ষ করে স্বর্ণকুমারী 'বিরহ' নামক যে কবিতাটি রচনা করেন তারই প্রত্যুত্তরে গিরীন্দ্রমোহিনীর 'অভাব' কবিতাটি লিখিত হয়। এতদুভয় কবিতাই ভারতী ও বালক পত্রিকার ১২৯৪ সালের কার্তিক সংখ্যায় পরপর মুদ্রিত হয়েছিল। সখির অনুপস্থিতিতে স্বর্ণকুমারীর হৃদয় বিষণ্ণ:

সন্ধ্যা করে দিয়ে গেছে নিয়ে গেছে সন্ধ্যাতারা,
আঁধার পড়িয়া আছে সুষমা হইয়া হারা।
ফুলটি সে নিয়ে গেছে ফেলে গেছে কাঁটা দুটি
বিরহ কাঁদিয়া সারা নয়ন মেলিয়ে উঠি।

প্রভাত-সংগীতের 'খুকুরানী' কবিতায় তাঁর পরিণত স্নেহপ্রবণ মনের ভাবনাগুলি বিধৃত। কবিতাটির শব্দচয়নে যে সারল্য ও আন্তরিকতা লক্ষিত হয় তা বাৎসল্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলে মনে হয়; ছড়ার আদর্শে দ্রুত লয়ের শ্বাসাঘাত ছন্দে রচিত কবিতাবলীর মধ্যে বর্তমান রচনাটি এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। ১২৯৫ সালের বৈশাখ সংখ্যার ভারতী ও বালকে মুদ্রিত 'আশীর্বাদ'-শীর্ষক কবিতাচতুষ্টয় তার অপত্যস্নেহের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এস্থলে সন্তানের কল্যাণ-কামনায় উদ্বিগ্ন মাতৃহৃদয়ের কবোষ্ণ স্নেহোত্তাপটুকু অনুভূত হয়; মমত্বে-আশীর্বাদে-শুভকামনায় কবিতাগুলি বাৎসল্যের রক্ষাকবচে পরিণত।

দাম্পত্যজীবনের অবলম্বনে সম্ভবত কতিপয় কবিতা রচিত হয়েছিল। এক্ষেত্রে লেখিকা ব্যক্তিগত সম্পর্কের অতিপরিচিত অভিজ্ঞতাকে ভগবৎ-প্রেমের আবরণ দান করেছেন, ফলে সাধারণ দাম্পত্যকথা আত্মভাবনানুরঞ্জিত প্রেমকবিতায় রূপান্তরিত ও অসাধারণত্বে মণ্ডিত

৬৩ বঙ্গের মহিলা কবি, পৃ ৬৮

হয়ে উঠেছে। মধ্যাহ্ন-সংগীতের 'নহে অবিশ্বাস' কবিতাটি তার উপযুক্ত প্রমাণস্থল। অশ্রুমিশ্রিত অভিমান, বেদনার গান, 'বুক-ফাটা দুরন্ত নিঃশ্বাস' এবং অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার কথা কবিতাটিতে সুব্যক্ত। পরিশেষে তিনি বলেন :

তব পুণ্য প্রেমে যদি করিব সংশয়,
কোথায় নির্ভর কোথা এ নিখিলময় ?
ঈশ্বরের অনুরূপ সত্য সুমহান
তোমার ও সুনীরব আত্ম-প্রেম দান।

নিশীথ-সংগীতের 'নহে তিরস্কার' অথবা 'বল বারবার' কবিতায়ও দাম্পত্যপ্রেম এবং ঈশ্বরাকৃতির সম্পৃক্তি লক্ষিত হয়ে থাকে। সম্ভবত ঐ কাব্যের 'ভুলে যেতে গিয়াছি ভুলিয়া' রচনাটিতে লেখিকার বৈধব্য-বিড়ম্বিত জীবনের ছায়াপাত ঘটেছিল।

॥৮॥ উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা কাব্যের প্রধান দুটি রীতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, "বঙ্কিম-চন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা বস্তুগত কাব্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠায় যেমন সহায়তা করেছে, ঠাকুরপরিবারের 'ভারতী' পত্রিকা তেমনি সহায়তা করেছে বিহারীলাল-প্রবর্তিত ভাবমূলক কবিতার প্রতিষ্ঠায়।"[৬৪] পূর্বসূরীগণের মধ্যে একদিকে মধুসূদন এবং অপরদিকে বিহারীলালের কাব্যভাবনাদর্শ স্বর্ণকুমারীর কবিমানসকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে, নব্য-ক্লাসিকতন্ত্র এবং আধুনিক আত্মভাবনাপ্রধান রীতির সঙ্গমে তাঁর কাব্যভূমির উদ্ভব। অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ, পারিবারিক বন্ধু অক্ষয়চন্দ্র-বিহারীলাল, অনুজ রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির যে সান্নিধ্য তিনি অর্জন করেন তার পরিণামে উক্ত সমন্বয়মূলক কাব্যরীতির অনুশীলন ক্রমশ সার্থকতার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কিংবা মানবজীবন-কথা বর্ণনাকালে তাই লেখিকার স্বীয় ভাব-ভাবনা আত্মপ্রকাশ না করে পারেনি। কাব্যশরীরের দিক থেকেও ব্যাপারটি প্রণিধানযোগ্য।

কাব্যদেহনির্মিতিতে তিনি কখনো কখনো দ্বিজেন্দ্রনাথের দুঃসাহসিকতার বশবর্তী হয়েছিলেন, তবু সেই প্রভাবের আত্মীকরণ বা অতিক্রমণের শক্তি যে তাঁর ছিল না তা বলা চলে না। প্রেম-পারিজাত কাব্যের 'লিখিতেছি দিনরাত' শীর্ষক কবিতার শেষ স্তবকটি প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। মধ্যাহ্ন-সংগীতের 'কেউ চাহে না আপন পানে' রচনায় ছিদ্রান্বেষী সমালোচকের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে,

বাকি কিছু রাখ না ত পেলে পরের খুঁটিনাটি !
তখন পদদাপে আঁৎকে উঠে ঘরের মধ্যে পাষাণ-মাটি।

৬৪ জয়ন্তোষ দত্ত, বাংলা কাব্যে দুই রীতি—বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭০, পৃ ৩৫৪।

তারা বুঝি গরীব দুঃখী, কর্মের ফল তাদের বেলা!
নবাবের আর কে দেয় জবাব, আপনি কর লীলা-খেলা।
সবাই পাপী সবাই তাপী, অপরাধী বিশ্বজোড়া;
তুমিই কেবল মাঝখানেতে দাঁড়িয়ে আছ ফুলের তোড়া!

বাচনভঙ্গি লঘুপ্রকৃতির হলেও উদ্দেশ্য মর্মভেদী। কুলীন ও অপাঙ্‌ক্তেয় শব্দের বিস্ময়কর সহাবস্থানের ফলে বন্ধুরতা সৃষ্টি হয়েছে সত্য, কিন্তু বিশিষ্ট শব্দগুচ্ছ, বাক্যাংশ ও উপবাক্য, সভঙ্গ বাগ্বিধি, চতুর্মাত্রিক পর্ববিশিষ্ট দ্রুত লয়ের শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ-শৈলী প্রভৃতির মাধ্যমে বক্তব্যটি জ্যামুক্ত শায়কের ন্যায় অনিবার্যভাবে লক্ষ্যটিকে বিদ্ধ করেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির কবিতা ও কৌতুকগীতির রচনাভঙ্গিটি প্রসঙ্গত মনে পড়া স্বাভাবিক।

সাহিত্যের দেহ ভাষাশ্রিত বলে কাব্যনির্মিতির ব্যাপারে কবির শব্দসাধনা একটা অত্যাবশ্যকীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। শব্দ সর্বদাই অনুভূতি সঞ্চারের প্রধান বাহনরূপে পরিগণিত হয়, সার্থক শব্দচয়ন ও শব্দসংযোজনার মাধ্যমেই ভাব একটি অনুভবগ্রাহ্য ব্যাপাররূপে পরিণত হতে পারে। আবার যে শব্দ কবির উদ্দিষ্ট অর্থ-ভাবনাকে পাঠকের চিত্তে সংক্রমণের সামর্থ্য রাখে তা-ই সার্থক এবং When words are selected and arranged in such a way that their meaning either arouses, or is obviously intended to arouse, aesthetic imagination, the result may be described as *poetic diction*.[৬৫] শব্দনির্বাচন এবং শব্দবিন্যাসের ব্যাপারটি প্রধানত ব্যঞ্জনাসৃষ্টির উপযোগিতার দিক থেকেই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে; এক্ষেত্রে কবি আধুনিক বা প্রাচীন, মৃত কিংবা জীবিত, প্রসিদ্ধ অথবা অপ্রচলিত যথোপযুক্ত শব্দটি গ্রহণ ও প্রয়োগ করে থাকেন। বিশ্লেষণের প্রয়োজনে মধ্যাহ্ন-সংগীত কাব্যের 'চুপ চুপ' কবিতা থেকে কচের প্রতি দেবযানীর অভিযোগের কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত হল:

অন্তর-নিভৃতে
গিরি-গর্ভে জ্বালামুখীসম উদ্গীরিয়া
প্রচণ্ড অনল, চলিছে যে আলোড়ন
তরঙ্গিয়া ইথরের অণু-পরমাণু—

এস্থলে 'জ্বালামুখী' শব্দটির নির্বাচন প্রশংসনীয় হলেও 'ইথর' শব্দটির প্রয়োগ আপত্তিকর; কচ-দেবযানী-পুরাণে ইথর শব্দটি কালবিরোধ-দোষদুষ্ট বলে পাঠকের ঔচিত্যবোধ এখানে বিপর্যস্ত। 'জ্বালামুখী' শব্দটির যে ইতিহাস লেখিকা তাঁর পৃথিবী (১২৮৯) গ্রন্থের ভূমিকায় পরিবেশন করেছেন তা পাঠকালে বোঝা যায় যে একটি মৃতকল্প প্রাচীন শব্দকে তিনি

৬৫ Owen Barfield, Poetic Diction, 1952, p 41.

পুনর্জীবন দান করেছিলেন। দেবযানীর হৃদয়-জ্বালার সার্থক উপমানরূপে শব্দটি সুপ্রযুক্ত, এবং ঐ শব্দসংগ্রহের পশ্চাতে দীর্ঘ কালের চিন্তাও সক্রিয়; ফলত উক্ত শব্দটিকে কেন্দ্র করে একটি পরিণত চিন্তার উদয় হয়েছিল বলা চলে। পক্ষান্তরে 'ইথর' শব্দগ্রহণে দুঃসাহসিকতা থাকলেও তা কবিতাটির আবহের সাঙ্গীকৃত হয়নি, বহিরাগত অর্বাচীন শব্দকে প্রাচীন ও পৌরাণিক পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত করা অসাধ্য ব্যাপার বলে এর সমূহ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে।

সাহিত্যে কিংবা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অপপ্রয়োগ বা অতিব্যবহারের ফলে কোনো কোনো শব্দ ক্ষীণপ্রাণ হয়ে যায়, অথবা শব্দটির তাৎপর্যঘটিত গুরুত্ব ও মর্যাদা হ্রাস পায় অবিরল ঘর্ষণপ্রাপ্ত পাষাণখণ্ডের মত; সেহেতু প্রত্যেক সচেতন কবি সেই ভয়াবহ অপমৃত্যুর হাত থেকে শব্দকে রক্ষা করার জন্য তার মৃতকল্প দেহে নূতন অভিধার শোণিতপ্রবাহ এবং ব্যঞ্জনার প্রাণ সঞ্চারিত করে থাকেন। তখন সংবেদনশীল চিত্তের নিকট হৃতমান শব্দ কেবল প্রাক্তন অর্থগৌরব লাভ করে না, অভিনব অর্থমহিমার দ্বারা তা অন্বিতও হয়ে উঠে; তখনই অতিপরিচিত ভাষা 'ভাবের স্বর্গে' উন্নীত হয়। শব্দের শক্তি ও মহিমা উপলব্ধির ব্যাপারে স্বর্ণকুমারী ছিলেন সদাসতর্ক। জীবন-অভিনয় (ভারতী, আশ্বিন ১৩১২) নামক ছোট-গল্পের মধ্যে প্রসঙ্গচ্ছলে তিনি বলেছিলেন, 'শব্দেরও মাহাত্ম্য আছে বইকি।' অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের কবিতায় শব্দব্যবহারের ক্ষেত্রে তথাকথিত স্বেচ্ছাচারিতা লক্ষিত হলেও অভিজাত ও ব্রাত্য শব্দের মধ্যে সমন্বয়সাধন বা সৌষম্যবিধানের একনিষ্ঠতাই সেখানে লক্ষিতব্য। লেখিকা দ্বিজেন্দ্রনাথের দুঃসাহসিকতার অনুবর্তী, বিহারীলালের অন্যমনস্কতা-অমনোযোগিতার নয়। নিসর্গসন্দর্শন (১৮৭০) কাব্যের ষষ্ঠ সর্গের অন্তর্গত 'ঝটিকাসম্ভোগে' বিহারীলাল ঝড়ের প্রচণ্ড গতিকে ধ্বনিময়তার মাধ্যমে প্রকাশের উপায় অনুসন্ধান করেছিলেন বলে সেখানে ধ্বন্যুক্তিরই প্রাধান্য। উপযোগী এবং উদ্দিষ্ট ব্যঙ্গ্যবোধের নিমিত্ত ধ্বন্যাত্মক বা অনুকারক অব্যয়ের ব্যবহার অবাঞ্ছিত নয়। ভাষাতত্ত্ববিদগণও এই আদিম সাংকেতিক শব্দরূপের (Symbolic Forms) মধ্যে আবিষ্কার করেছেন a connotation of somehow illustrating the meaning more immediately than do ordinary speech-forms...to the speaker it seems as if the sounds were especially suited to the meaning[**] প্রভৃতি। কিন্তু এদের অতিশায়িত প্রয়োগ রসাভাস সৃষ্টি করে বলে এদের ব্যবহার কোনো কোনো সময় বিপজ্জনক হয়ে উঠতেও পারে। নিশীথ-সংগীতের 'ঝটিকা' কবিতাটিতে স্বর্ণকুমারীও ঝড়ের চিত্রময় বর্ণনা করেছেন, কিন্তু স্বতন্ত্র পন্থায়। অন্ধ প্রাকৃতিক শক্তির প্রচণ্ডতা পরিস্ফুটনে তিনি বিহারীলালের ধ্বন্যুক্তি-আতিশয্য পরিহার করেছেন; ইতস্ততবিক্ষিপ্ত দুএকটি লোকায়ত ধ্বন্যাত্মক অব্যয় ব্যবহৃত

** Leonard Bloomfield, Language, 1956, p 156.

হয়েছে ঠিকই, তবে তার পরিমাণ অত্যল্প। বস্তুতপক্ষে অতিসাধারণ আটপৌরে শব্দপ্রয়োগে বেপরোয়া মনোভাবের সঙ্গে সতর্ক পরিমাণবোধের সমন্বয়টুকু এক্ষেত্রে একান্ত দৃষ্টিগ্রাহ্য।

মূলত প্রসাদগুণ এবং সরল অনাড়ম্বর বাগভঙ্গি স্বর্ণকুমারীর কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য, কিন্তু এই সারল্য দীনতার পরিচায়ক নয়। মধ্যাহ্ন-সংগীতের 'বঙ্গের বিধবা' শীর্ষক রচনায় বিধবার স্বাভাবিক সৌন্দর্য সম্বন্ধে তিনি যা মন্তব্য করেছেন তা তাঁর কবিতা সম্পর্কেও প্রযোজ্য; বিধবারই মত সে কবিতা হল 'পবিত্রতা মূর্তিমতী,' 'শুভ্র সুবিমল যেন প্রভাতের ফুল', 'নাহি সাজসজ্জা কোন, মনি রত্ন আভরণ', 'আপন রূপেতে তবু আপনি অতুল', 'ছিন্ন বৃন্তে বিকশিত সৌন্দর্য-তরুণা' এবং 'স্বর্গের গরিমা'। স্বর্ণকুমারীর কবিতা একান্তভাবে নিরাভরণ না হলেও প্রখর আলংকারিক চাকচিক্য সেখানে অনুপস্থিত, বস্তুতপক্ষে পারিপাট্য অপেক্ষা পরিচ্ছন্নতা এবং অনায়াসসম্ভব সহজাত স্বভাবোক্তি এ কাব্যের প্রধান সম্পদ। অনিবার্যতা বা অপরিহার্যতা শ্রেষ্ঠ কাব্যালংকারের একমাত্র পরিচয়; তাই উৎকৃষ্ট কাব্যের অলংকার কেবলমাত্র কবিতার বহিরঙ্গের সৌষ্ঠব বর্ধন করে না তা কাব্যভাবনাকেও বিকশিত করে তুলে, তখন 'প্রসাধনকলা' এমনভাবে 'সাধনবেগে'র অঙ্গীভূত হয়ে যায় যে তাকে আর মোটেই বাহ্যিক ব্যাপার বলে মনে করা যায় না। স্বর্ণকুমারীর কবিতায় এইরূপ স্বতঃস্ফূর্ত অলংকরণ-শৈলীর পরিচয় পাওয়া যায়।

সন্ধ্যা-সংগীত কাব্যের 'মাঘ-মেলা' নামক কবিতাটিতে গঙ্গাতীরে উৎসবমুখর সন্ধ্যার আবির্ভাব বর্ণিত। নদীকূলে জ্বলন্ত প্রদীপের সারি এবং নদীবক্ষে ভাসমান দীপাবলী একটি অলৌকিক দৃষ্টিবিভ্রম সৃষ্টি করেছে, যেন 'জলে স্থলে আলোকের ফুল ফোটাফুটি'। এক্ষেত্রে সাদৃশ্যমূলক কোনো অলংকারের কথা প্রথমে মনেই আসে না, অথচ 'ফুল ফোটাফুটি'র মাধ্যমে সততসঞ্চরমাণ প্রদীপশিখা ও জলে-প্রতিফলিত আলোকমালার চিত্রটিই ব্যক্ত হয়েছে; ফলে কবিভাষার সঙ্গে অলংকরণ-কৌশলও একটা অত্যাশ্চর্য উপায়ে একাত্মীভূত হয়ে পড়েছে। নিশীথ-সংগীতের 'ভাই-বোন' কবিতায় 'সরল হরিণ-কান্তি জোছনার হাসি' প্রভৃতিতে ইমেজ-রচনার প্রয়াস লক্ষণীয়। অনির্বচনীয়কে আভাসে-ইঙ্গিতে-ব্যঞ্জনায় প্রস্ফুট করার অন্যতম উৎকৃষ্ট উপায় হল ইমেজ বা চিত্রকল্পের ব্যবহার। ভাষাকে রূপময়ী করে তুলবার জন্য লেখক যেসকল পন্থা অবলম্বন করেন তন্মধ্যে এইজাতীয় উপমাই প্রধান; এবং এতদবলম্বনে ভাব যখন বস্তুকে অতিক্রম করে যায় অর্থাৎ বস্তুর রূপকল্পনায় যখন তা বৃহত্তর হয়ে উঠে তখনই এইরূপ উপমাসৃষ্টি সার্থকতা মণ্ডিত হয়।[৩৭] এইপ্রকার ইঙ্গিতময় উপমাও পরিচিতের সঙ্গে অজ্ঞাতের ও অভাবনীয় সাদৃশ্য-উদ্ভাবনে সহায়তা করে থাকে, ইমেজ বা চিত্রকল্পের মাধ্যমেই

৩৭ C. Day Lewis, The Poetic Image, 1955, p 18.

জ্যোৎস্নার হাসির সঙ্গে সরল হরিণের কান্তির সাদৃশ্যটুকু উপলব্ধ হতে পারে। বলাবাহুল্য স্বর্ণকুমারীর কবিতায় প্রচলিত উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষাদির অপ্রতুল না থাকলেও এবংপ্রকার ইমেজ বা চিত্রকল্পের প্রাচুর্য তেমন পরিলক্ষিত হয় না।

তাঁর কবিতার ভাষায় সাধু কিংবা সাধু-চালত রীতির সংমিশ্রণ দেখা যায়। কবিতায় বিশুদ্ধ চলিত ভাষা-রীতির প্রয়োগে সাধারণভাবে তাঁর আগ্রহের অভাব থাকলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাধু ভাষাকে অস্বীকার করে তিনি চলিত রীতি-সম্মত কথ্যভঙ্গিকে কাব্যে সমর্পণ করেছেন। প্রভাত-সংগীতের 'খুকুরানী' কবিতাটির কিয়দংশ উল্লেখযোগ্য:

অমন মধুর হাসি মধুর মুখে কোথায় আছে কার,
চাঁদা মামা ঢেলে গেছে সুধা যত তার।
অমন নরম নরম, বাধো বাধো আধো কথাগুলি,
কোথা থেকে শিখে এলি বোনটি বল শুনি।

এইজাতীয় শিশুচিত্তহারী ছড়ার মধ্যে বাৎসল্যের আধিক্যবশত প্রসিদ্ধ শব্দগুলি পর্যন্ত বিকৃতি লাভ করেছে কিংবা মৌখিক উচ্চারণভঙ্গি ও কথ্য রীতি কাব্যভাষার গৌরবে অম্বিত হয়ে পড়েছে। মধ্যাহ্ন-সংগীতের 'বঙ্গের বিধবা'কে চলিত রীতি-প্রধান কবিতা বলা যেতে পারে; যদিও এর মধ্যে নাহি-নাই-তব-গেহ প্রভৃতির প্রয়োগ বর্তমান তথাপি ভাষাভঙ্গিতে চলিতের ঝোঁক স্পষ্টতর। সন্ধ্যা-সংগীতের 'শিশু হরি', নিশীথ-সংগীতের 'অধরে অধরে', 'লজ্জাবতী,' 'কি যেন নেই' প্রভৃতি রচনায় সাধু-চলিতের মিশ্রণ সত্ত্বেও কথ্য রীতির প্রাধান্য লক্ষণীয়। পক্ষান্তরে স্বর্ণকুমারীর কাব্যে গদ্যে-অব্যবহার্য-অথচ-কবিতায়-প্রযোজ্য প্রথানুগ শব্দের অস্তিত্ব সুরক্ষিত; যেমন—রাজে, ভাতে, নাহি, নেহারি, টুটে, হেরি, দেখিনু, বুঝিনু, কাঁদিনু, উদিবেক, নিরখিয়ে, হেরিয়ে, রাখিয়ে, ছুটিয়ে, টুটিয়া, রে, হায়, গো, ওগো, সখা গো, তরে, যবে, পরে, পানে, তোমা, আমা, তব ইত্যাদি। তাই শব্দ কিংবা ভাষারীতি নির্বাচনের এই দ্বিধা, প্রচলিত বা প্রথাগতকে গ্রহণ-বর্জনের উক্ত সংকোচ যে কিছুটা পরিমাণে বর্তমান সেকথা অস্বীকার করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে পূর্বসূরী এবং সমকালীনের কাব্যেও এইজাতীয় ত্রুটি-শিথিলতা বিদ্যমান, এমনকি পরবর্তীকালের অনেক কবিও কথিত দুর্বলতা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন না।

ছন্দের ক্ষেত্রেও এইজাতীয় দ্বিধা-দুর্বলতার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বর্ণকুমারীর কবিতা ও গান (১৮৯৫) প্রকাশের পূর্বে রবীন্দ্রনাথের একাধিক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়, বিশেষত ছন্দ-বিষয়ক নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার আদর্শ গ্রন্থ মানসী প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৯০ সালে। সমালোচক লক্ষ করেছেন, 'প্রধানতম তিনটি আধুনিক ছন্দরীতিই ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের হাতে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছে। লক্ষ করবার বিষয় হল, স্বর্ণকুমারীর পক্ষে রবীন্দ্র-প্রভাব

প্রায় কিছুই পড়েনি। বিশ্লিষ্ট উচ্চারণের ছন্দে রুদ্ধদল ব্যবহারে সেই পূর্বযুগের দ্বিধা তাঁর কবিতায়ও রয়ে গেছে।'[৬৮] মানসী কাব্যের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'এই গ্রন্থের অনেকগুলি কবিতায় যুক্তাক্ষরকে দুই অক্ষর-স্বরূপ গণ্য করা হইয়াছে। সেরূপ স্থলে সংস্কৃত ছন্দের নিয়মানুসারে যুক্তাক্ষরকে দীর্ঘ করিয়া না পড়িলে ছন্দ রক্ষা করা অসম্ভব হইবে।...আমার বিশ্বাস, যুক্তাক্ষরকে দুই অক্ষর-স্বরূপ গণনা করাই স্বাভাবিক এবং তাহাতে ছন্দের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে; কেবল বাঙ্গালা ছন্দ পাঠ করিয়া বিকৃত অভ্যাস হওয়াতেই সহসা তাহা দুঃসাধ্য মনে হইতে পারে। শব্দের আরম্ভ-অক্ষর যুক্ত হইলেও তাহাকে যুক্তাক্ষর-স্বরূপে গণনা করা যায় নাই—পাঠকেরা এইরূপ আরো দুই-একটি ব্যতিক্রম দেখিতে পাইবেন।'[৬৯] এর মধ্যে ধ্বনিপ্রধান বিলম্বিত লয়ের মাত্রাবৃত্ত বা সরল কলামাত্রিক ছন্দের প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু স্বর্ণকুমারীর এইশ্রেণীর কবিতায় যৌগিক স্বর-ব্যঞ্জন কিংবা রুদ্ধদলের (closed syllable) বিশ্লিষ্ট উচ্চারণভঙ্গি স্বীকৃত হয়নি। প্রধানত তিনি ছিলেন গল্পশিল্পী, সম্ভবত এই কারণে ছন্দের তৎকালোচিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রতি তত মনোযোগী ছিলেন না; আবার এইরূপ পরীক্ষামূলক প্রয়াসের সাফল্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া সত্ত্বেও অনেকের নিকট এই ব্যাপারটি যে 'দুঃসাধ্য মনে হতে পারে' স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তা স্বীকার করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ছন্দ-বিষয়ক অভিনব চিন্তার প্রয়োগে কিংবা তার বৈচিত্র্যসাধনে স্বর্ণকুমারী বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন না বলে এক্ষেত্রে প্রথানুবর্তনকেই শিরোধার্য করে নিয়েছেন। তথাপি কোনো কোনো রচনায় ধ্বনিপ্রধান সরল কলামাত্রিকের প্রভু ও নব্যরীতির সন্ধান পাওয়া যায়; যেমন—'ওগো কমল-আসনা রঙ্গিনী' (গীতিগুচ্ছ), 'এমন বারি ঝরে' (কবিতা ও গান) ইত্যাদি।

প্রধানত বিশিষ্ট কলামাত্রিক বা তানপ্রধান অক্ষরবৃত্তে তাঁর অধিকাংশ কবিতা রচিত; গানের ক্ষেত্রে ধ্বনিপ্রধান মাত্রাবৃত্ত বা সরল কলামাত্রিকের সার্থক প্রয়োগ লক্ষিত হয়। আবার কোনো কোনো বিশিষ্ট কলামাত্রিকের রচনাকে সরল কলামাত্রিক বলে মনে হতে পারে, কিংবা বলা যায় তানপ্রধান অক্ষরবৃত্ত যেন অনধিকার প্রবেশ করেছে ধ্বনিপ্রধান মাত্রাবৃত্তের জগতে। বলাবাহুল্য এক্ষেত্রেও সেকালের মিশ্র প্রকৃতির দ্বিধাযুক্ত ছন্দ-রীতির আনুগত্য স্বীকার সুস্পষ্ট। যেমন—

এমন যামিনী, মধুর চাঁদিনী, সে শুধু গো যদি আসিত!
পরাণে এমন আকুল পিয়াসা, যদি সে শুধু গো ভালবাসিত!

৬৮ নীলরতন সেন, আধুনিক বাংলা ছন্দ, ১৯৬২, পৃ ১৯৭।

৬৯ দ্র গ্রন্থপরিচয়—রবীন্দ্র-রচনাবলী, ২য়, ১৩৩০, পৃ ৫৩০।

এ মধু বসন্ত, এত শোভা হাসি, এ নব যৌবন এত রূপরাশি,
সকলি উঠিত পুলকে বিকাশি, সে শুধু গো যদি চাহিত!

সংগীত-শতকের এই গানটিতে বর্ণমাত্রিক পর্ববিশিষ্ট পঙ্‌ক্তিগুলির মধ্যে যেখানে যুগ্ম ব্যঞ্জন (বসন্ত) বা যৌগিক স্বর (যৌবন) ব্যবহৃত সেখানে আবৃত্তিগত দ্বিধা দেখা দিয়েছে, যেন বিশিষ্ট কলামাত্রিক অক্ষরবৃত্ত অতর্কিতে সরল কলাবৃত্তের মসৃণতাকে বন্ধুর করে দিয়েছে। পক্ষান্তরে অক্ষরবৃত্তাশ্রয়ী কবিতার কোনো কোনো চরণে বা পঙ্‌ক্তিতে রুদ্ধদল বা যৌগিক ধ্বনি বিশ্লিষ্টভাবে উচ্চারিত হয়েছে সরল কলামাত্রিক মাত্রাবৃত্তের মত। যেমন—'হৃদি বড় দুরবল তাহাতে সঁপিছ বল' (সন্ধ্যার স্মৃতি, সন্ধ্যা-সংগীত); 'আজি এ সাগরতীরে মহেশের মনদিরে' (সাশ্রুসম্প্রদান, গাথা); 'অতি বিয়াকুল আসিতে নিকটে' (যেন আমার দুখে, সন্ধ্যা-সংগীত), 'দিগন্ত বেয়াপী বিকট শ্মশানে' (খড়্গ-পরিণয়, গাথা); 'শইবাল পরে শতদল সম' (সাধের ভাসান, গাথা); 'নাহি ভ্রুক্ষেপ সেদিকে তাহার' (ঝটিকা, নিশীথ-সংগীত) প্রভৃতি। এক্ষেত্রে প্রধানত সম্প্রসারণ কিংবা স্বরভক্তি-বিপ্রকর্ষের সাহায্যটুকু গৃহীত। ছন্দের প্রয়োজনে বিশ্লিষ্ট উচ্চারণের উপর লেখিকা এতই গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে তজ্জন্য তিনি দুরবল, বিয়াকুল, শইবাল প্রভৃতিতে বিকৃত বর্ণরূপ পর্যন্ত স্বীকার করতেও দ্বিধা করেননি।

সংশ্লিষ্ট বা বিশ্লিষ্টভাবে রুদ্ধদল ব্যবহারের এই ত্রুটি-বিচ্যুতি সমকালীন মহিলাগণের কাব্যেও দুর্লভ নয়; মানকুমারী বসু, প্রমীলা নাগ, সরোজকুমারী দেবী, কামিনী রায় প্রভৃতি কবি তাঁদের রচনায় এইজাতীয় দুর্বলতা সর্বত্র অতিক্রম করতে পারেননি। উচ্চ-শিক্ষিতা কামিনী রায় রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হওয়া সত্ত্বেও[৭০] কাব্যরচনা-কালে ছন্দের গঠনভঙ্গিতে 'পিতৃপ্রতিম ভক্তিভাজন কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ে'র পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে হেমচন্দ্রের খণ্ডকবিতাবলীতে ক্ষেত্রবিশেষে রুদ্ধদলের সংশ্লিষ্ট বা বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ-সম্পর্কিত শৈথিল্য লক্ষিত হয় এবং কামিনী রায়ের কবিতাকেও এই দোষ স্পর্শ করেছে। এমনকি রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের রচনায় কোনো কোনো স্থানেও এইপ্রকার দ্বিধা দেখা গিয়েছিল। ফলকথা স্বর্ণকুমারীর সমকালীন কবিগণের কাব্য কথিত দোষ থেকে যে মুক্ত ছিল না সেকথা সাধারণভাবে বলা চলে।

৭০ দ্র কামিনী রায়ের পত্রাবলী—সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, ৮৮শ, পৃ ১৮-২২।

॥১॥ স্বর্ণকুমারী দেবীর জন্মপূর্বকাল থেকে ঠাকুরপরিবারের মধ্যে সংগীতানুশীলনের আয়োজন ছিল যেমন বিপুল তেমনি বৈচিত্র্যপূর্ণ। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে হিন্দুমুসলমান ওস্তাদগণের উচ্চাঙ্গ সংগীতের যে আসর বসত সেখানে বরোদা গোয়ালিয়র অযোধ্যা দিল্লি আগ্রা মোরাদাবাদ প্রভৃতি ঘরানার নিখিলভারতীয় গুণীজনের সমাবেশ হত। আবার উত্তর ভারতীয় সংগীতপদ্ধতির ধ্রুবপদ খেয়াল প্রভৃতি গীতিরীতি-বিশেষজ্ঞ বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী (১৮১৯-১৯০০) ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের একজন বিদগ্ধ সংগীতশিক্ষক কলাবৎ; বাংলা দেশের নিজস্ব গীতিসম্পদ বাংলা-টপ্পা কীর্তন শ্যামাসংগীত প্রভৃতিতেও তাঁর আগ্রহ ছিল অসামান্য এবং অধিকার ছিল সুগভীর। ঠাকুরপরিবারের অন্তর্ভুক্ত এই সুকণ্ঠ শিল্পীর গানের মধ্যে তানের বিস্তার-বাহুল্য অপেক্ষা হৃদয়ভাবনার স্পর্শাধিক্য বিশেষ সংবেদনশীলতা সৃষ্টি করত। তদুপরি 'রায়পুরের সিংহপরিবারের শ্রীকণ্ঠ সিংহ মহাশয়' ছিলেন মহর্ষিদেবের 'ভক্তবন্ধু', অনেকসময় তিনি তাঁর 'অন্তরতর অন্তরতম'[১] দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ধর্ম-সংগীতেরও অনুশীলন করতেন। এতদ্ব্যতীত ভারতবিখ্যাত যদুভট্ট বা যদুনাথ ভট্টাচার্যের প্রসন্ন-গম্ভীর ধ্রুবপদ ও ভজন সংগীতের এই পারিবারিক আসরকে বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে। প্রসঙ্গত মৌলা বক্সের নামও উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। ফলত জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়ির এই সাংগীতিক পরিবেশে হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সংগীত-কলার আঙ্গিক-অলংকার-গমক অথবা হ্রস্বলঘু সংযত তান-মীড় এমন একটি অপূর্ব রাসায়নিক সংমিশ্রণ বা অভিনবত্ব অর্জন করে যার পরিণামে শাস্ত্রীয় রাগরাগিণীর আভিজাত্য ও লঘুভাবের গীতিরীতি পার্শ্বিক সহাবস্থান লাভ করে।[২] এবং এই বিশিষ্ট সংগীতানুশীলনের বাতাবরণে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বর্ণকুমারী রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ প্রতিভাধর সুরকার গীতিকার উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিলেন।

বলাবাহুল্য বহির্মহলের এই আয়োজন অন্তঃপুর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। অন্দরমহলে সংগীতচর্চার সূত্রপাত সম্পর্কে স্বর্ণকুমারী মন্তব্য করেছেন, 'একণে সেজদাদা (হেমেন্দ্রনাথ) মহাশয় তাঁহার পত্নীকে ওস্তাদের নিকট গানশিক্ষা দিতে লাগিলেন। বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা গানবাজনা লেখাপড়া সর্বরকমে বেশ ভাল করিয়া শিক্ষা পাইতে লাগিল।'[৩] ইতিপূর্বেকার অন্তঃপুরের সংগীতানুরাগ সম্পর্কে লেখিকা বলেছেন যে তাঁর জন্মের পূর্ববর্তীকালে প্রত্যহ প্রভাতে জনৈক বহিরাগত বৈষ্ণবী অন্তঃপুরে এসে কথকতা পুরাণপাঠ এবং কীর্তন

১ দ্র রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতির পাণ্ডুলিপি; অপিচ দ্র শ্রীকণ্ঠবাবু—জীবনস্মৃতি।

২ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান—শারদীয় জনসেবক, ১৩৭০, পৃ ৮৪।

৩ দ্র জীবনের ঝরাপাতা, পৃ ২১৩।

পরিবেশন করতেন।[৪] যাহোক, বাল্যকাল থেকেই সংগীতের প্রতি একটা সহজাত আকর্ষণ অনুভব করেন স্বর্ণকুমারী। স্বরচিত সাহিত্য-স্রোত গ্রন্থের একটি প্রবন্ধে তিনি স্বীকার করেছেন যে অতি প্রত্যুষে তিনি বাগানে যেতেন পিতার জন্য পুষ্পচয়ন করতে। 'যত রকম দেশীয় সুগন্ধ পুষ্পে বাগান ভরিয়া থাকিত। ভোরের বেলা মৌমাছির দল তাহার উপর গুনগুন করিয়া বেড়াইত। সেই অস্পষ্ট ঊষালোকে এই সুন্দর দৃশ্য আমার মনের মধ্যে ভারী একটা সুখের মোহ রচনা করিত।' এবং বাল্যকালেই এভাবে তাঁর মনে সংগীতের প্রভাব মুদ্রিত হয়ে যায় বলে তিনি স্বীকৃতি জ্ঞাপনও করেছেন। আরও জানা যায়, 'সংগীতের প্রতি অনুরাগ ছিল তাঁহার সকলের চেয়ে বেশি, কেহ বাঁশী বাজাইতেছে শুনিলে তিনি তন্ময় হইয়া পড়িতেন—তখন তাঁহার প্রাণে আপনা হইতেই কল্পনার বিচিত্র সুন্দর ছবি ফুটিয়া উঠিত, আপনা হইতেই গানের সুর কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়া আসিত। কাহারও শিক্ষা এবং উপদেশ ব্যতিরেকেই তিনি গাহিতে পারিতেন এবং নব-প্রচলিত হারমোনিয়াম বাজাইতেও শিখিয়াছিলেন। একদিন তিনি আপনার মনে সম্পূর্ণ অতর্কিতভাবে গান গাহিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ সেখানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—স্বর্ণ! তুমি এমন সুন্দর গাইতে পার তা ত জানতাম না।'[৫] সংগীতে সহজাত প্রতিভার প্রমাণ এবং তার স্বীকৃতির কথা এখানে জানা যায়। বাঁশি শোনার সঙ্গে প্রাণে কল্পনার ছবি ভেসে উঠত এবং গানের সুরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আত্মপ্রকাশ করত সেই ভাববস্তু, অথচ এসকলই সম্ভব হয়েছিল 'শিক্ষা এবং উপদেশ ব্যতিরেকেই'। পরবর্তীকালের অনুশীলন এই সম্ভাবনাকেই নিয়ন্ত্রিত এবং মার্জিত বৈদগ্ধ্যে মণ্ডিত করেছে।

হিতাকাঙ্ক্ষী অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহায়তায় সংগীতের ক্ষেত্রে তিনি ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করতে থাকেন। জানকীনাথের বিলাত গমনের ফলে স্বর্ণকুমারী পিত্রালয়ে চলে আসেন এবং এইসময় থেকে তিনি ঠাকুরপরিবারের সাহিত্যচর্চায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'একজন যোগ্য সঙ্গীরূপে' পরিগণিত হতে থাকেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর গীতরচনা সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, 'এইসময়ে আমি পিয়ানো বাজাইয়া নানাবিধ সুর রচনা করিতাম।...সুরের অনুরূপ গান তৈরী হইত। স্বর্ণকুমারীও অনেক সময় আমার রচিত সুরে গান প্রস্তুত করিতেন। সাহিত্য এবং সংগীতচর্চায় আমাদের তেতলা মহলের আবহাওয়া তখন দিবারাত্রি সমভাবে পূর্ণ হইয়া থাকিত।'[৬] সরলা দেবী তাঁর আত্মস্মৃতির একস্থলে বলেছেন

৪ আমাদের গৃহে অন্তঃপুরশিক্ষা ও তাহার সংস্কার—প্রদীপ, ভাদ্র ১৩০৬; দ্র সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, ২০শ, পৃ ৩।

৫ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বঙ্গের মহিলা কবি, প ৪১।

৬ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি. ১৩২৬, প ১৪৫-৪৬। এবংপ্রকার গীতরচনা-পদ্ধতি সম্পর্কে খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, 'ইঁহাদের এই গান রচনার পদ্ধতিটি লক্ষ করিবার বিষয়।

যে পিতা জানকীনাথের বিদেশ গমনের পর জননী স্বর্ণকুমারী সপরিবারে জোড়াসাঁকোর বাড়ির 'বাইরের তেতালার অর্ধেকটায়' থাকতেন এবং 'একটা পিয়ানো বাজনা বাইরের তেতালায় মায়েরই বসবার ঘরে থাকত'; মাতার ব্যবহৃত এই পিয়ানোতেই পরবর্তীকালে দুহিতা সরলাও সংগীতানুশীলন আরম্ভ করেন।[৭] বলেন্দ্রনাথের জননী প্রফুল্লময়ী দেবী বলেছেন যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'গানে ঝোঁক খুব ছিল ও গান বড় পছন্দ করিতেন, একদিন আমার গান তাঁর শুনিবার খুব ইচ্ছা হইল। স্বর্ণকুমারী— তাঁরও এসব বিষয়ে খুব উৎসাহ ছিল, তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁর কাছে লইয়া গেলেন।'[৮] প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে এই দুই রমণীর মধ্যে অন্তরঙ্গতা ছিল সুনিবিড়, বীরেন্দ্রনাথের বধূরূপে প্রফুল্লময়ীকে স্বর্ণকুমারীই মনোনয়ন করেন। 'ভারতীর চল্লিশ বৎসর পদার্পণ উপলক্ষ্যে'-লিখিত একটি প্রবন্ধে শরৎকুমারী চৌধুরানী স্বর্ণকুমারীর সংগীতনিষ্ঠার কথা স্বীকার করেছেন। স্বর্ণকুমারীর রামবাগানস্থ বাড়িতে 'আমি যখনই যাইতাম অধিকাংশ সময়ই দেখিতাম তিনি সেক্সপিয়ার পড়িতেছেন, আবার কখন দেখিতাম সেতার শিক্ষা করিতেছেন, কখন বা মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতেছেন বা ভাঁড়ার দিতেছেন।'[৯] গার্হস্থ্যজীবনকে অস্বীকার না করেও যে সাহিত্য সংগীত প্রভৃতি চারুকলার অনুশীলন করা সম্ভব স্বর্ণকুমারী তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল, গৃহলক্ষ্মীর মাধুর্যের সঙ্গে কলালক্ষ্মীর শ্রীর একটি অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছিল তাঁর জীবনে।

॥২॥ সংগীতরসিক ও সুরকার স্বর্ণকুমারী গীত রচনাতেও ছিলেন সিদ্ধহস্ত। সাধারণত তাঁর গানগুলির আরম্ভে সংগীতশাস্ত্রীয় রাগরাগিণী ও তালের নির্দেশ পাওয়া যায়, অবশ্য এর যে কোনো ব্যতিক্রম নেই তাও নয়। কোথাও হয়ত রাগরাগিণীর উল্লেখসহ তালের নির্দেশ আছে, কোথাও বা তালের প্রসঙ্গ নেই, আবার কোথাও রাগ বা তালের কোনোটিরই উল্লেখ নেই; কোথাও কোথাও 'বাউলের সুর', 'কীর্তনের সুর' কিংবা 'রামপ্রসাদী সুর' এইরকম নির্দেশ আছে মাত্র। কোনো কোনো গান বিবিধ উৎসব-উপলক্ষে রচিত, কোনোটি বা উপন্যাস অথবা নাটকের মধ্যে পরিবেশিত হয়েছে অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে; লেখিকার উপন্যাসে, বিশেষত প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসে গানের বহুল ব্যবহার লক্ষণীয় ব্যাপার। তাছাড়া স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বয়ংনির্ভর গানও পাওয়া যায়, অর্থাৎ এগুলি তাঁর অন্য কোনো রচনায় পাওয়া যায় না, বিশুদ্ধ গান হিসাবেই তাদের সৃষ্টি।

সাধারণত আগে গানের কথা রচিত হয়, পরে তাহাতে সুর সংযোগ হয়; ইঁহারা উল্টা দিকে আরম্ভ করিলেন। আগে গৎ বা সুর প্রস্তুত হইত, তারপর সেই সুরের উপযোগী ভাষা রচনা করিয়া গান রচিত হইত। শুনেছি ইহা পশ্চিম ভারতের অনুমোদিত প্রথা।—দ্র রবীন্দ্রকথা, পৃ ৮৫।

৭ জীবনের ঝরাপাতা, পৃ ১৭।

৮ আমাদের কথা—প্রবাসী, বৈশাখ ১৩১৭, পৃ ১১২।

৯ ভারতীর ভিটা—বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, পৃ ১১২।

তাঁর গানের যে তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া হল তা নিতান্তই অসম্পূর্ণ। মূলত বসুমতী সংস্করণের গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত গানের বইগুলি এবং আরও কতিপয় গ্রন্থ অবলম্বনে যদিও বর্তমান তালিকাটি প্রস্তুত তথাপি বলা আবশ্যক তাঁর রচিত সমূহ গানের উল্লেখ এর মধ্যে নেই। ভারতী বা সমকালীন অন্যান্য পত্রিকায় যেসকল লেখক-নামহীন গান পাওয়া যায় তন্মধ্যে অনেক রচনা স্বর্ণকুমারীর হতে পারে, বলাবাহুল্য বর্তমান তালিকায় এদের স্থান দেওয়া হয়নি। এই কারণে পরিশিষ্টের তালিকাটি একটি পরীক্ষামূলক প্রয়াস হিসাবেই গ্রহণ-যোগ্য। উপন্যাস নাটক প্রহসন কাব্য প্রভৃতি গ্রন্থে এমন অনেক গান পরিবেশিত হয়েছে যেগুলি তাঁর কোনো গানের বইতে স্থান পায়নি কিংবা গানের বইগুলি প্রকাশিত হওয়ার পর এইসকল গীত রচিত হয়েছিল। গ্রন্থাবলীর মধ্যে জাতীয় সংগীত (৬), ধর্ম-সংগীত (১৪), প্রেম-পারিজাত : কবিতা ও গান (১৩) ও সংগীত-শতকের (৮৬) গানগুলির সংখ্যা সর্বমোট একশ উনিশ। সংগীত-শতক গ্রন্থের 'চোখের আড়াল হলে সব ভুলে যায়' গানটির দুবার উল্লেখ পাওয়া যায়; গানের কথা উভয় ক্ষেত্রে এক হলেও রাগের স্বাতন্ত্র্য আছে, যেহেতু গানটি বেহাগে কিংবা ঝিলকে গীত হতে পারে যদিও উভয় স্থলেই তাল আড়া। গ্রন্থাবলীর তৃতীয় ভাগের অন্তর্গত প্রেম-পারিজাতের প্রথম পাঁচটি রচনাকে উপরোক্ত তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, কারণ আখ্যাপত্র থেকে জানা যায় যে উল্লিখিত গ্রন্থ কয়েকটি কবিতা ও গানের সমষ্টি এবং উক্ত পাঁচটি রচনার কোনো রাগ বা তালের নির্দেশ নেই এবং প্রত্যেকটিরই শিরোনাম দেওয়া হয়েছে। মনের সাধে, কাঁটার ব্যথা, মহাযাদু, গিয়াছে তৃষা, লিখিতেছি দিনরাত—এই পাঁচটি শিরোনামযুক্ত রচনার পরই রাগ-তালের উল্লেখসহ তেরটি গান মুদ্রিত হয়েছে। আখ্যাপত্রোক্ত লেখিকার প্রত্যক্ষ নির্দেশানুযায়ী এস্থলে কবিতা ও গানের এইরূপ প্রভেদ নিরূপিত হয়েছে, নচেৎ কবিতার সংগীতমূল্য কিংবা গানের পাঠমর্যাদা অস্বীকার করা বর্তমান আলোচনার তাৎপর্য নয়।

পরিশিষ্টে প্রদত্ত গানের তালিকাটি অনুধাবনকালে বোঝা যায় তিনি গানের সুর-পরিকল্পনায় অর্ধশতাধিক শুদ্ধ বা মিশ্র রাগরাগিণীর আশ্রয় নিয়েছেন। এদের মধ্যে ভৈরবী, বেহাগ, সিন্ধুভৈরবী প্রভৃতি বিশেষ প্রাধান্য অর্জন করেছে; তাছাড়া আলাইয়া, জয়জয়ন্তী, মল্লার, সাহানা প্রভৃতিও উল্লেখযোগ্য। দশেরও অধিক তাল ব্যবহৃত হয়েছে গানগুলিতে; তন্মধ্যে আড়া, কাওয়ালি, একতালা, যৎ প্রভৃতি প্রধান। সংগীত-গ্রন্থগুলিতে যে ছয়টি গানের কোনো রাগ বা তালের নির্দেশ পাওয়া যায় না সেগুলির প্রথম ছত্রের সূচী দেওয়া হল: আমি কি কর বল সহচরি (কীর্তনী সুর, সংগীত-শতক); ও প্রাণ মোর গঙ্গাজল (কীর্তনী সুর, সংগীত-শতক); তবু তারা হাসে (জাতীয় সংগীত); বল ভাই বল (বাউলের সুর, জাতীয় সংগীত); মা বলে আর ডাকব না (মিশ্র রামপ্রসাদী সুর, ধর্ম-সংগীত);

সই লো মোর গঙ্গাজল (কীর্তনী সুর, সংগীত-শতক)। লক্ষণীয় যে এগুলির রাগ-তালের কোনো স্পষ্ট পরিচয় না পাওয়া গেলেও প্রাসঙ্গিক-ক্ষেত্রে-ব্যবহার্য বাংলা দেশের অতি-পরিচিত গানের সুরগুলির উল্লেখ পাওয়া যাবে, কেবল 'তবু তারা হাসে' গানটিতে এসম্বন্ধে কোনো কিছুর বিশেষ নির্দেশ নেই।

॥৩॥ গীতিকারের কয়েকটি গান সম্বন্ধে এবারে কতগুলি আবশ্যকীয় তথ্যের অবতারণা করা যায়। সংগীত-শতকের 'এখনো এখনো প্রাণ সে নামে শিহরে কেন' গানটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অশ্রুমতী নাটকে (১৮৭৯) স্থানলাভ করেছে।[১০] জাতীয় সংগীত গ্রন্থের 'কি আলোক জ্যোতি আঁধার মাঝারে' গানটির রাগ ও তাল হল যথাক্রমে প্রভাতী ও একতালা ; অন্যত্র ঐ গানটির রাগ-নির্দেশে বলা হয়েছে গুজরাটী ভজন।[১১] একই গ্রন্থের 'তবু তারা হাসে' গানটির যে রাগ বা তালের কোনো নির্দেশ নেই সেকথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, গানটির উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য হল এই যে এর একটি শিরোনামও লেখিকা দিয়েছেন। স্বর্ণকুমারীর কবিতা ও গান যে কতটা ওতপ্রোত এবং পরস্পরনির্ভর তার প্রামাণিক নিদর্শন এখানে বর্তমান। ধর্ম-সংগীতের 'মা বলে আর ডাকব না' গানটিতে রাগ বা তালের উল্লেখ নেই, কেবলমাত্র বলা হয়েছে 'মিশ্র রামপ্রসাদী সুর' ; অথচ ঐ গানেরই পরবর্তী এমন দুটি শ্যামাসংগীত আছে ('দয়াময়ী নামে তোর' এবং 'ওগো তারা দয়াময়ি') যাদের রাগ বা তালের স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়। সংগীত-শতক গ্রন্থের 'সই লো মোর গঙ্গাজল' এবং 'ও প্রাণ মোর গঙ্গাজল' গান দুটি পরস্পরনির্ভর হলেও এতদুভয়ের স্বাতন্ত্র্য অনস্বীকার্য, কারণ প্রথম গানটি প্রশ্ন এবং শেষোক্তটি তার উত্তর ; এই প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে গানে নাটকীয়তা অর্পিত হয়েছে, তাছাড়া গানের লঘু ভাব ও চপল ভঙ্গির মধ্যে কবি-লড়াইয়ের ছায়াপাত ঘটেছে বলে মনে হয়। প্রসঙ্গচ্ছলে বলা আবশ্যক যে স্বর্ণকুমারীর একাধিক নাটকে কোনো রসিকা রমণী কিংবা সখীর মুখে এই গান দুটি বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল।

স্বর্ণকুমারী-রচিত 'এক সূত্রে গাঁথিলাম সহস্র জীবন' গানটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন'-এর প্রবল ভাবসাদৃশ্য বর্তমান ; সম্ভবত অগ্রজা স্বর্ণকুমারী অনুজ রবীন্দ্রনাথের গানটির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন ; কারণ স্বরূপ বলা যায় রবীন্দ্রনাথের বর্তমান গানটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পুরুবিক্রম নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণে (১২৮৬) প্রথম মুদ্রিত

১০ দ্র জ্যোতিরিন্দ্র-গ্রন্থাবলী, বসুমতী সং, ৫ম ভাগ, পৃ ২১৬। পক্ষান্তরে স্বর্ণকুমারীর গাথাকাব্যের খণ্ড-পরিণয় কবিতায় রবীন্দ্রনাথের গান 'তারে দেহ গো আনি' পরিবেশিত।—দ্র ভারতী, চৈত্র ১২৮৬।

১১ দেশ, ১৫ এপ্রিল ১৯৪৪, পৃ ২৭৮।

হয়,[১২] অথচ স্বর্ণকুমারীর বক্ষ্যমাণ গানটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১২৯৬ সালের ভারতী ও বালক পত্রিকায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত 'মিলে সবে ভারতসন্তান' ইত্যাদির (১৮৬৮ সালের হিন্দু মেলায় গীত) সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন' এবং স্বর্ণকুমারীর 'এক সূত্রে গাঁথিলাম সহস্র জীবন' প্রভৃতির বিষয়-ভাবনার এবং কোথাও কোথাও সুরের সাদৃশ্য বর্তমান।[১৩] হয়ত সুরটি তৎকালীন স্বদেশী সংগীতের একটি জনপ্রিয় সুররূপে পরিগণিত হতে থাকে। আরও বলা যায় যে সত্যেন্দ্রনাথের গানটি পুরুবিক্রম নাটকের প্রথম সংস্করণে (জুলাই ১৮৭৪) প্রথম অঙ্কে ব্যবহৃত এবং কথিত রবীন্দ্রসংগীতটি যে ঐ নাটকেরই দ্বিতীয় সংস্করণে পঞ্চম অঙ্কে প্রথম মুদ্রিত হয় সেকথা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। নিজস্ব কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত না হলেও 'এক সূত্রে বাঁধিয়াছি' গানটি যে রবীন্দ্রনাথেরই রচনা সে সম্পর্কে সজনীকান্ত দাস, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিদেব ঘোষ প্রভৃতি দৃঢ় মনোভাব পোষণ করেন।[১৪] প্রসঙ্গত বাল্মীকিপ্রতিভা গীতিনাট্যের (১২৮৭) 'এক ডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে' গানটির কথাও উল্লেখযোগ্য।[১৫] যাহোক, স্বর্ণকুমারীর বর্তমান

১২ দ্র গ্রন্থপরিচয়—গীতিবিতান (অখণ্ড), পৃ ৯৮৫। সজনীকান্ত দাস মনে করেন, সম্ভবত ১৮৭৭ সালে সঞ্জীবনী সভা প্রতিষ্ঠার কালে গানটি রচিত হয়।—দ্র রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য, ১৩৬৭, পৃ ২২১।

১৩ সত্যেন্দ্রনাথের 'মিলে সবে ভারতসন্তান' এবং রবীন্দ্রনাথের 'এক সূত্রে বাঁধিয়াছি' গানের সুর খাম্বাজ-ভিত্তিক। হিন্দু মেলার বার্ষিক প্রতিবেদনে সত্যেন্দ্রনাথের গানটি 'রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়াঠেকা'-রূপে উল্লিখিত। সরলা দেবীর শতগানেও খাম্বাজ স্বীকৃত যদিও তালের নির্দেশে ভিন্নতা ('একতালা ছন্দ') লক্ষিত হয় ; বলাবাহুল্য আড়াঠেকা (১৬ মাত্রার) এবং একতালা (১২ মাত্রার) সম্পূর্ণ পৃথক। যাহোক, দেখা যাচ্ছে যে সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ ও স্বর্ণকুমারীর বর্তমান গানগুলি খাম্বাজ-নির্ভর বলে এদের মধ্যে সুরের সাধর্ম্য লক্ষিত হয়। আবার 'অখণ্ডসূচী-সহ একত্র প্রকাশ' গীতবিতানের (১৩৬৭) গ্রন্থপরিচয়ে রবীন্দ্রনাথের সুর-দেওয়া অপরের গানের যে তালিকাটি রয়েছে (পৃ ১০১৮) তন্মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের 'মিলে সবে ভারতসন্তান' বর্তমান। ফলত সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের গানের সুর-সাদৃশ্যের কারণটি এখানেও নিহিত। কিন্তু গীতবিতানের পূর্বোক্ত পৃষ্ঠার (পৃ ১০১৮) ১৯ সংখ্যক পাদটীকায় আবার বলা হয়েছে, 'শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী বলেন, রবীন্দ্রনাথের সুর নয়।' কিন্তু এরূপ মন্তব্য মূল সিদ্ধান্তকে বিচলিত করে না।

১৪ 'গানটি যে রবীন্দ্রনাথেরই রচনা বহু আলোচনা করিয়া ও আনুষঙ্গিক প্রমাণ দেখাইয়া তাঁহাকে দিয়াই তাহা কবুল করাইয়া লইয়াছি।'—সজনীকান্ত দাস, রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য, পৃ ২২০।

'এই গানটি যে রবীন্দ্রনাথেরই রচনা, ইহা আমরা কবির নিজের মুখেই শুনিয়াছি।'—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়, ১৩৪৯, পৃ ৬৩। অপিচ : দ্র শান্তিদেব ঘোষ, রবীন্দ্রনাথের একটি গান (আলোচনা), দেশ, ২৬ চৈত্র ১৩৫০, পৃ ২৫৭-৫৮।

জীবনস্মৃতির 'স্বাদেশিকতা' অধ্যায়ে গানটির প্রথম দুটি ছত্র ব্যবহৃত। এটি একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

১৫ শান্তিদেব ঘোষ বলেছেন, 'পাশাপাশি দুটি গান ('এক সূত্রে বাঁধা আছি' এবং 'এক ডোরে বাঁধা আছি') শুনলে দেখবো উভয় গানের মূল ভাবার্থ এক, কেবল ভিন্ন আবেষ্টনের উপযোগী করতে গিয়ে তার রূপের খানিকটা বদল হয়েছে। উভয়েরই সুর এক।'—দ্র দেশ, ১১শ বর্ষ ২২শ সংখ্যা, পৃ ২৫৭।

গানটি সম্বন্ধে গীতবিতানের গ্রন্থপরিচয়ে বলা হয়েছে, "'ভারতী ও বালক' পত্রের ১২৯৬ কার্তিক-সংখ্যায়, ৩৬৫ পৃষ্ঠায়, 'স্নেহলতা' গল্পে 'সঞ্জীবনী-সভা'র মতোই একটি সভার বর্ণনায় এই গানটি আছে—

এক সূত্রে গাঁথিলাম সহস্র জীবন
জীবন মরণে রব শপথ বন্ধন
ভারত মাতার তরে সঁপিনু এ প্রাণ
সাক্ষী পুণ্য তরবারি সাক্ষী ভগবান
প্রাণ খুলে আনন্দেতে গাও জয় গান
সহায় আছেন ধর্ম কারে আর ভয়।

গীতবিতানে-সংকলিত রচনার সহিত ভাবে ও ভাষায় ইহার কতটা সাদৃশ্য, তাহা ছাড়াও লক্ষ করিবার বিষয় যে উক্ত কাহিনী-অনুসারে গানটির রচয়িতা 'চারু এখন ষোড়শবর্ষীয় বালক' অথচ বন্ধুপরিজনপ্রশংসিত কবি, তাহাকে 'গুপ্তসভার মেম্বর করিয়াছে—সেখানকার সে Poet Laureate', এবং 'যখন সকলে একসঙ্গে ইহা (সংকলিত গানটি) গাহিয়া উঠিল, চারুর আপনাকে সেক্সপিয়ারের সমকক্ষ বলিয়া মনে হইতে লাগিল।' উল্লিখিত 'সঞ্জীবনী-সভা'র সহিত রবীন্দ্রনাথের যোগ, সেই মণ্ডলীতে কবি হিসাবে তাঁহার সমাদর, তাঁহার তখনকার বয়স এবং কৈশোরোচিত উৎসাহ, এমন-কি 'জীবনস্মৃতি'তে বর্ণিত (স্বাদেশিকতা অধ্যায় : শেষ অংশ) বৃদ্ধ রাজনারায়ণবাবু আর তরুণ সকল সভ্য মিলিয়া সমবেত গান গাওয়ার দৃশ্য—স্নেহশীলা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবী গল্পচ্ছলে প্রায় সব কথাই বলিয়াছেন ও সবটারই একটি বাস্তব ছবি আঁকিয়াছেন দেখা যায়।"[১৬] স্বর্ণকুমারীর গানটির যে পাঠ গীতবিতানের গ্রন্থপরিচয়ে এবং ভারতী ও বালকের মধ্যে পাওয়া যায় তার প্রথম দুটি চরণের পাঠান্তর দেখা যায় গ্রন্থাবলীর মধ্যে, সেই চরণদ্বয় এইরূপ :

আজি হতে এক সূত্রে গাঁথিনু জীবন ;
জীবনে মরণে রবে শপথ বন্ধন।[১৭]

১২৯৯ সালের ভারতী ও বালক পত্রিকার ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায় (পৃ ২৪৪-৫২) 'বিবাহ-উৎসব' নামক একটি গীতিনাট্যের প্রথম দৃশ্য ও তার স্বরলিপি মুদ্রিত হয়েছিল। ২৪৭ পৃষ্ঠা থেকে ঐ দৃশ্যের গানগুলির যে স্বরলিপি দেওয়া হয়েছে তা প্রস্তুত করেছিলেন স্বর্ণকুমারী-

১৬ গ্রন্থপরিচয়—গীতবিতান, পৃ ৯৮৬-৮৭। এক্ষেত্রে প্রবন্ধ লেখিকার গানটির সঙ্গে ভারতী ও বালক এবং স্নেহলতার গ্রন্থাবলী সংস্করণের পাঠের বিশেষ প্রভেদ লক্ষণীয়।

১৭ প্রথম প্রকাশ : ভারতী ও বালক, কার্তিক ১২৯৬, পৃ ৩৬৪-৬৫। দ্র স্নেহলতা, ১ম ভাগ, ১৮শ পরিচ্ছেদ—গ্রন্থাবলী, ৩য় ভাগ (বসুমতী সং), পৃ ৫৩-৫৪।

দুহিতা সরলা দেবী। ইন্দিরা দেবী বলেছেন, 'রবিকাকা, জ্যোতিকাকা, স্বর্ণপিসিমা অনেক সময় মিলেমিশে গীতিনাট্য রচনা করতেন।'[১৮] বিবাহ-উৎসব সেইরূপ একটি যৌথ রচনা। স্বর্ণকুমারীর প্রথম সন্তান হিরণ্ময়ীর বিবাহ-উপলক্ষে এই গীতিনাট্যটি রচিত হয়।[১৯] এই প্রসঙ্গে ইন্দিরা দেবী বলেছেন, 'বিবাহ-উৎসব নামে আরেকটি ঘরোয়া গীতি-নাটক আমাদের সময় চলিত ছিল। নামেই তার বিষয়বস্তুর প্রকাশ।'[২০] 'কোনো পারিবারিক বিবাহ-উৎসবোপলক্ষে' যৌথভাবে রচিত এই বিবাহ-উৎসবের 'মোট ৭টি দৃশ্য, ৪৫টি গান; তন্মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অক্ষয় চৌধুরী ও স্বর্ণকুমারী দেবীর কতকগুলি রচনা থাকিলেও, রবীন্দ্রনাথের রচনাই ২৮টি।'[২১] ভারতী ও বালকে মুদ্রিত বিবাহ-উৎসবের প্রথম দৃশ্যের কেবল শেষ গানটি ('নাচ শ্যামা তালে তালে') রবীন্দ্রনাথের রচিত এবং 'ভগ্নহৃদয়ে'র গান;[২২] অবশিষ্ট গানগুলি স্বর্ণকুমারীর বসন্ত-উৎসব থেকে সংগৃহীত; অর্থাৎ বসন্ত-উৎসবের প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্ক থেকে কয়েকটি গান নিয়ে এবং সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথের 'নাচ শ্যামা তালে তালে' গানটি দিয়ে বিবাহ-উৎসবের প্রথম দৃশ্যটি রচিত হয়। ভারতী ও বালকে মুদ্রিত সরলা দেবীর স্বরলিপির প্রারম্ভে বলা হয়েছিল, 'গীতিনাট্যে একটি গানের অব্যবহিত পরেই তার পরের গানটি ধরা হয়। অনেক সময় পূর্ব গানের তালের মাত্রার সহিত পরের গানের যোগ থাকে।' প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ১২৯৯ সালের ভারতী ও বালকের ৫২৬ পৃষ্ঠার একটি পাদটীকায় মুদ্রিত উপেন্দ্রনাথ সেনের মন্তব্যের সারাংশ থেকে জানা যায় যে ২৪৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত 'এই মল্লিকাটি পরাইব চুলে' গানটির তালে যৎ-এর পরিবর্তে একতালা এবং ২৪৬ পৃষ্ঠার 'কেমন সখি আমার সাথে' গানটির খেমটার স্থলে কাওয়ালি তাল হবে। আবার পরে ঐ একই পাদটীকায় তালগুলি সংশোধিত হলেও গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় ভাগের অন্তর্গত বসন্ত-উৎসব গীতিনাট্যে এই দুটি গানের তাল সংশোধিত হয়নি, বর্তমান প্রসঙ্গে তা বলা আবশ্যক।[২৩]

১৮ রবীন্দ্রস্মৃতি—বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, পৃ ১৮৯।

১৯ জীবনের ঝরাপাতা, পৃ ৫৬-৫৭।

২০ বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩, পৃ ১৯৪।

২১ গ্রন্থপরিচয়—গীতবিতান, পৃ ৯১৬।

২২ গীতবিতান, পৃ ৭৭১ এবং পৃ ৯১৫ দ্রষ্টব্য।

২৩ ভারতী ও বালকের ১২৯৯ সালের পৌষ সংখ্যার ৫২৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত উক্ত পাদটীকার কিয়দংশ উদ্ধৃত হল: "গত কার্তিক মাসের 'ভারতী'তে 'বিবাহ-উৎসব' নামক গীতিনাট্যের যে কয়েকটি গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে তিনটি গানের তালের নামকরণ সম্বন্ধে বাবু উপেন্দ্রনাথ সেন নিম্নলিখিতরূপ বক্তব্য লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'তোমারি তরে, মা, সঁপিনু এ দেহ' গানটি (ভারতী, আশ্বিন ১২৮৪) ঈষৎ পরিবর্তিতরূপে এবং সংক্ষেপে স্বর্ণকুমারীর বিচিত্রা (১৩২১) উপন্যাসের সপ্তম পরিচ্ছেদে (গ্রন্থাবলী, ৬ষ্ঠ, পৃ ১২৪) ব্যবহৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথেরই আর একটি গান 'তারে দেহো গো আনি' স্বর্ণকুমারীর খড়্গ-পরিণয় নামক কবিতায় পরিবেশিত হয় (ভারতী, চৈত্র ১২৮৬, পৃ ৫৫৫); পরে কবিতাটিকে গাথা কাব্যগ্রন্থে 'সংকলন-কালে মূল কবিতায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন-পূর্বক গানটি বর্জিত হয়।'[২৪] রবীন্দ্রসংগীতের স্মৃতিচারণাকালে স্বর্ণকুমারীর বসন্ত-উৎসবের 'ধর্ লো ধর্ লো ডালা' এবং 'চন্দ্রশূন্য তারাশূন্য মেঘান্ধ নিশীথ চেয়ে' গান দুটির খ্যাতির প্রসঙ্গ অবতারণা করেছেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী (বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩, পৃ ১৯০)। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের 'গহন কুসুমকুঞ্জ-মাঝে' গানটির অংশবিশেষ লেখিকার স্নেহলতা উপন্যাসের প্রথম ভাগের পঞ্চম পরিচ্ছেদে (ভারতী ও বালক, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬, পৃ ১১১-১২) এভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল: "জগৎ বাবু তাহার ফরমাসি গানটা একটু গাহিবার পর বলিলেন—'এটা থাক, একটা নূতন গান গাই, শোন্—

গহন কুসুম কুঞ্জমাঝে, মৃদুল মধুর বংশী বাজে,
বিসরি ত্রাস লোক লাজে, সজনি আওয়ে আওয়ে লো।'

গৃহিণী বলিলেন—'এ যে অশ্রুমতীর গান?'[২৫] জগৎ বাবুর অপেক্ষা না করিয়া ইহার

(১) একটি গানের উপর সুর ও তাল লেখা আছে 'কাফী—যৎ', কিন্তু তাহার ছেদবিভাগ (অর্থাৎ এক-একটি তালবিভাগ যে কয়মাত্রা অধিকার করিয়া থাকে) করা হইয়াছে তিন মাত্রা করিয়া; আমাদের অল্প জ্ঞানে এইরূপ জানা আছে যে 'যৎ' তালের প্রত্যেক তালিবিভাগ সাত মাত্রা অধিকার করিয়া থাকে।...(২) দুইটি গানের তাল লেখা আছে 'খেমটা', তাহাদের ছেদবিভাগ করা হইয়াছে চার মাত্রা করিয়া। এখানেও আমার মতের সহিত স্বরলিপির ছেদবিভাগের অনৈক্য ঘটিতেছে।

উপেন্দ্রবাবুর আপত্তি সঙ্গত। নিতান্ত অনবধানতাবশতঃ ঐ তিনটি গানের তালে ভুল নামকরণ হইয়া গিয়াছে। মহিলাশিল্পমেলার অভিনীত হইবার উদ্দেশ্যে 'বিবাহ-উৎসব' পুস্তক ছাপাইবার পূর্বে পূজনীয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্তৃক গানের পাশে পাশে তালের নাম লিখিয়া দেওয়া হয়। তখন রীতিমত ছেদবিভাগ করিয়া না দেখা প্রযুক্ত, শুধু মুখে মুখে গান শুনিয়া ভুলক্রমে একতালাকে যৎ, এবং কাওয়ালিকে খেমটা বলিয়া বোধ হইয়াছিল। স্বরলিপি করিতে বসিয়া প্রকৃত ছেদবিভাগ ধরা দিলেও, অনবধানতাবশতঃ তালের নামান্তর করা হয় নাই। সেজন্য আমাদের ত্রুটি স্বীকার করিতেছি।

'যৎ'-এর পরিবর্তে 'একতালা' হইবে, এবং 'খেমটা'র পরিবর্তে 'কাওয়ালি' হইবে।"

২৪ দ্র গ্রন্থপরিচয়—গীতবিতান, পৃ ৯৯৬। বর্তমান গ্রন্থের 'কবিতা' শীর্ষক অধ্যায়ের ২১ সংখ্যক পাদটীকা (পৃ ৩৪৩) দ্রষ্টব্য।

২৫ দ্র অশ্রুমতী, ৩য় অঙ্ক ৩য় গর্ভাঙ্ক— জ্যোতিরিন্দ্র-গ্রন্থাবলী, বসুমতী সং, ৫ম ভাগ, পৃ ১৮৮। ভারতী ও বালক (১২৯৬), স্বর্ণকুমারীর গ্রন্থাবলী এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলীতে গানটির ঈষৎ পাঠভেদ লক্ষিত হয়।

আগেই একদিন গৃহিণী অশ্রুমতীর অভিনয় দেখিয়া আসিয়াছিলেন।" প্রসঙ্গক্রমে আরও উল্লেখযোগ্য স্বর্ণকুমারীর 'সাজাব তোমারে আজি মোরা যতনে' গানটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'তোমায় সাজাব যতনে কুসুমে রতনে'র সাদৃশ্য আছে। স্বর্ণকুমারীর গানটি তাঁর রাজকন্যা (১৭ এপ্রিল ১৯১৩) নাটকে ব্যবহৃত, আর রবীন্দ্রসংগীতটি শাপমোচনের অন্তর্গত এবং এর রচনাকাল ১৯৩৩ সাল।[২৬] স্বভাবত মনে হতে পারে যে স্বর্ণকুমারীর রচনাটি রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল।

বঙ্গের মহিলা কবি গ্রন্থের লেখক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত স্বর্ণকুমারীর গান সম্বন্ধে বলেছেন, "তাঁহার বিরচিত 'এখনো এখনো প্রাণ সে নামে শিহরে কেন' একটি সর্বজন-পরিচিত সংগীত।[২৭] নিম্নোদ্ধৃত সংগীতটি কি ভাবে, কি ভাষায়, কি গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রেম-সংগীতসমূহের সহিত স্থান পাইতে পারে।" এবং অতঃপর 'এমন যামিনী মধুর চাঁদিনী' গানটি উদ্ধৃত হয়েছে। ঐ একই সমালোচক 'নিঃঝুম নিঃঝুম গম্ভীর রাতে' গানটিকেও 'সর্বজনবিদিত ও সর্বজনপ্রিয়' বলে দাবি করেছেন। বঙ্গের মহিলা কবি গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে, 'জীবনের অপরাহ্নে স্বর্ণকুমারী বিষাদকরুণ সুরে গাহিয়াছিলেন—

শীতল শান্ত বেলা
পান্থ আমি অতি শ্রান্ত বড় একেলা।
বাতাস গাহিছে মর্মকাহিনী
পাতায় পাতায় হৃদয়দাহিনী
করুণ হতাশ দোলা।
পান্থ আমি অতি শ্রান্ত একেলা বড় একেলা।
তলায় তলায় তরুবীথিকার ঘন কজ্জল ছায়া
তার মায়া নাই তবু, মায়া নাই তার গো
অসহন দুঃখ-জ্বালা।
বড় একেলা আমি বড় একেলা।'[২৮]

২৬ দ্র গীতবিতান, পৃ ৯৮২। শাপমোচনের প্রথম অভিনয়ে (পৌষ ১৩৩৮) বা প্রথম সংস্করণে গানটি ছিল না, পরবর্তীকালের অভিনয়ে (পৌষ ১৩৪০) গানটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।—দ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী, ২২শ, পৃ ৫০৬-০৮। বলাবাহুল্য ইতিমধ্যেই গানটি রচিত হয় (১৯৩৩)।

২৭ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অশ্রুমতী নাটকের (১৮৭৯) মলিনার গান। ডোয়ার্কিন এণ্ড সন লিমিটেডের পক্ষ থেকে প্রকাশিত এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রচিত স্বরলিপি গীতিমালার (৩য় সং ১৩৪৮) তৃতীয় খণ্ডে এই গানটির স্বরলিপি রয়েছে। গানটির খ্যাতির কারণগুলি এখানেই নিহিত।

২৮ অন্যত্র এর পাঠান্তর পাওয়া যায়।—স্বর্ণকুমারী দেবীর গীতিগুচ্ছ ১ম ভাগের ৭১ সংখ্যক গান দ্রষ্টব্য।

ভারতী-সম্পাদনা থেকে চিরতরে অবসর গ্রহণকালে (১৩২২) 'বিদায় গ্রহণে'র মধ্যে তিনি যা বলেছিলেন তার অংশবিশেষ বর্তমান প্রসঙ্গে উদ্ধৃতব্য : 'যখন এই সম্পাদন-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলাম তখন ফলাফল লাভক্ষতি গণনা করিয়া ইহাতে প্রবৃত্ত হই নাই। কর্মের আনন্দই কর্মে উত্তেজিত উৎসাহিত করিয়াছিল। আজ সে উৎসাহ উত্তেজনার দিন ফুরাইয়া গিয়াছে, আজ আমি বড়ই একাকী, বড় অসহায়, আজ শ্রান্তক্লান্ত দেহমন একান্তই নিবৃত্তি-লোলুপ।' এই একই ভাবনায় নিশীথ-সংগীত কাব্যের 'একা আমি যাত্রী' কবিতাটি রচিত হয়েছিল। শেষ জীবনের এই নিঃসঙ্গতা ও করুণ আর্তি এখানে দীর্ঘশ্বাসে-ভরা স্বগতোক্তির রূপ লাভ করেছে।

॥৪॥ স্বর্ণকুমারীর স্বরলিপি-রচনা সম্বন্ধীয় আলোচনার প্রারম্ভে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য পরিবেশনযোগ্য : 'স্বর্ণকুমারী-রচিত গানের দুইখানি স্বরলিপি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। স্বরলিপিকার— শ্রীব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী। অধিকাংশ গানের সুর-সংযোজনা করিয়া দিয়াছেন— গীত-রচয়িত্রী স্বয়ং।'[২৯] গীতিগুচ্ছের প্রথম ভাগের মধ্যে (১৮ জানুয়ারি ১৯২৩) প্রথম খণ্ডে ৫১টি ও দ্বিতীয় খণ্ডে ২০টি একুনে ৭১টি গানের স্বরলিপি দেওয়া হয়েছে, তন্মধ্যে অন্যূন ৩০টি গানের সুর স্বয়ং গীতিকারেরই রচনা। স্বর্ণকুমারী ও ব্রজেন্দ্রলাল ব্যতীত ইন্দিরা দেবী, সরলা দেবী, প্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ প্রভৃতি প্রখ্যাত সংগীতরসিক অবশিষ্ট গানগুলির স্বরলিপি রচনা করেছেন। উক্ত গীতিগুচ্ছ গ্রন্থের প্রথম ভাগের প্রারম্ভে 'কৃতজ্ঞতা প্রকাশে'র মধ্যে স্বর্ণকুমারী বলেছিলেন, 'গীতিগুচ্ছের প্রকাশক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় বঙ্গসমাজের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ গায়ক। এই পুস্তকের গানগুলি স্বরলিপি করিবার কালে যত্নের সহিত তিনি তাল-লয় বিশুদ্ধ করিয়া লইয়াছেন এবং অনেকগুলি গানে সুরসংযোগও তিনিই করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার যত্ন-পরিশ্রমেই যে গানের এই বইখানি সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে, লেখনীমুখে আজি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া তাঁহাকে আমার পরিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। অন্য যাঁহারা গীতিগুচ্ছের কোনো কোনো গান সুর-তানে শ্রুতিমধুর করিয়া দিয়াছেন তাঁহারা সকলেই আমার আত্মীয় এবং সংগীতজ্ঞ গুণী। তাঁহাদের নাম গানের সুরের সঙ্গেই এই পুস্তকে সংযুক্ত আছে। তাঁহাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ্যে নিবেদন অনাবশ্যক হইলেও তাহা কিছু কম আন্তরিক বা গভীর নহে।' গ্রন্থটির 'প্রকাশকের নিবেদনে' ব্রজেন্দ্রলাল বলেছেন, 'এই গ্রন্থে জাতীয় সংগীত ও ব্রহ্ম-সংগীতের সংখ্যাই অধিক। অন্যান্য ভাবের গান যাহা আছে তাহাও যৌবনসুলভ উচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রেম-সংগীত নহে, অতএব এই স্বরলিপি গ্রন্থ নিঃসংকোচে

২৯ সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, ২৮শ, পৃ ১৬।

বালক-বালিকার হাতে দেওয়া যায়। দ্বিতীয় ভাগে দেবীর অন্যান্য সংগীতের সহিত তাঁহার গ্রন্থাবলী হইতে খাটি প্রেমভাবের ও হাস্যকৌতুক রসাত্মক সংগীতাদি সংগ্রহপূর্বক স্বরলিপি প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল। এ গ্রন্থের অধিকাংশ গানই রচয়িত্রীর নব রচনা।' প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে গান ও সুরের রচনার কালানুক্রমে গ্রন্থে গানগুলি সন্নিবেশিত হয়েছিল, ফলে 'ভাবের ধারাবাহিকতা অনুসারে গানগুলি পরে পরে ক্রম-সংবদ্ধ হইতে পারে নাই।' প্রস্তাবিত গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগটি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বহু অন্বেষণ করেও পাননি; সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার মধ্যে স্বর্ণকুমারীর রচিত 'প্রেম-গীতি' নামক অন্য একটি স্বরলিপি গ্রন্থকে তিনি গীতিগুচ্ছের দ্বিতীয় ভাগ বলে মনে করেছেন। 'প্রকাশকের নিবেদন' থেকে এরূপ ধারণা সমর্থিত হয়, কারণ ঐ গ্রন্থে জাতীয় সংগীত বা ধর্ম-সংগীত নেই অথচ 'প্রেমভাবের ও হাস্যকৌতুক রসাত্মক সঙ্গীতাদি' আছে। গ্রন্থটির পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৭২।

গীতিগুচ্ছের প্রথম ভাগের মূল বিষয় শুরু করার পূর্বে 'আকারমাত্রিক স্বরলিপি-পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা' দেওয়া হয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রণীত এবং ডোয়ার্কিন এণ্ড সন লিমিটেডের পক্ষ থেকে প্রকাশিত 'স্বরলিপি গীতিমালা' গ্রন্থের প্রথমে প্রদত্ত স্বরলিপি-ব্যাখ্যার কথাও প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। সংগীতের স্বরলিপি প্রবর্তনের ইতিহাস আলোচনাকালে অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন স্বর্ণকুমারী, 'সংগীতের স্বরলিপি তিনিই প্রথমে আরম্ভ করেন, পরে পূজনীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার উন্নতি সাধন করিয়াছেন।'[৩০] অন্যত্র এসম্বন্ধে অন্যবিধ তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে: 'অধুনা প্রচলিত সাংকেতিক স্বরলিপির প্রথম প্রবর্তক ৺ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর।… জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই স্বরলিপি-প্রথার কিছু পরিবর্তন করিয়া সরল ও আধুনিক স্বরলিপি-প্রথার সৃষ্টি করেন। শৌরীন্দ্রমোহনের পদ্ধতিকে দণ্ডমাত্রিক পদ্ধতি বলা যাইতে পারে। যথা, র্স র্র র্গ। মাথায় দণ্ড দিয়া মাত্রার চিহ্ন দেওয়া হইত। পরে শূন্যমাত্রিক স্বরলিপি-প্রথা প্রবর্তিত করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ।[৩১] যথা, স ০০০ র০ গ০। সংখ্যামাত্রিক স্বরলিপি-প্রথা প্রবর্তন করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। যথা, স১ র২ গ৩। এই প্রথা বেশ সরল, শিক্ষার্থীর পক্ষে সহজবোধ্য। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরে শ্রীমতী প্রতিভা দেবী, শ্রীমতী সরলা দেবী ও শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী এবং পরে অনেকেই এই প্রথার অনুসরণ করিয়াছেন।'[৩২] প্রসঙ্গত বলা যায় যে ১২৯৫ সালের ভারতী ও বালকের

৩০ সাহিত্য-স্রোত, পৃ ২৮২।

৩১ কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে বলেছেন যে দ্বিজেন্দ্রনাথ 'অঙ্ক দিয়ে এক এক রাগিণীতে গানের সুর মেপে' নিতেন।—দ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী, ২৬শ, পৃ ৬২৫।

৩২ ভারতী, মাঘ ১৩১৮, পৃ ৯১৩-১৪।

পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের একটি স্বীকারোক্তি থেকে অনুমিত হয় ইতিপূর্বে তিনি সংখ্যামাত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন, 'ইতিপূর্বে বালকে যে স্বরলিপি-প্রণালী প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া নিম্নলিখিত সংকেত অনুসারে আমরা পুনর্বার ভারতীতে গানের স্বরলিপি প্রকাশ করিবার সংকল্প করিয়াছি।'[৩৩] এবং এইটিই হল পূর্বগৃহীত সংখ্যামাত্রিক প্রণালীর পরিবর্তনসম্মত রূপ বা 'আকারমাত্রিক রীতি', স্বর্ণকুমারীর গীতিগুচ্ছ কিংবা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বরলিপি গীতিমালা গ্রন্থে এই রীতিই অনুসৃত হয় ; পূর্বপ্রচলিত দ্বিজেন্দ্রনাথের শূন্যমাত্রিকতা ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সংখ্যামাত্রিকতার সমন্বয়ে এই মার্জিত আকারমাত্রিক প্রণালীর উদ্ভব ঘটে। এপ্রসঙ্গে ১২৮৭ সালের ভারতী পত্রিকার শ্রাবণ থেকে মাঘ মাসের কোনো কোনো সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'স্বররহস্য' নামক প্রবন্ধটির উল্লেখের অবকাশ আছে। প্রবন্ধটি পাঠকালে বোঝা যায় যে স্বরলিপির নির্মাণকৌশলের প্রতি ভারতী-গোষ্ঠী প্রথমাবধি বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন। স্বরলিপি সম্পর্কে স্বর্ণকুমারীর আগ্রহ ছিল প্রশংসনীয়, সুরকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তুলবার এই আধুনিক বৈজ্ঞানিক রীতির প্রতি তিনি আদৌ উদাসীন ছিলেন না। স্বরলিপিচর্চা প্রসঙ্গে একদা তিনি বলেছিলেন, 'পূর্বে বালকে গান অভ্যাসের সংকেত বিস্তারিতভাবে প্রকাশ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ভারতীর পাঠকগণ সম্ভবত সে সংকেত পড়েন নাই, তাই তাঁহাদের সুবিধার জন্য সেই বিস্তারিত সংকেত সংক্ষেপে এইখানে এবার সমাবিষ্ট হইল। যদি তাঁহাদের বুঝিবার পক্ষে এ সংকেত সুস্পষ্ট হয় নাই এমন বুঝিতে পারি ত অন্যবারে বালক হইতে সেই বিস্তারিত সংকেতটি পুনঃ প্রকাশিত করা যাইবে।'[৩৪] স্বরলিপির প্রচারকল্পে তাঁর এই প্রচেষ্টা একান্তভাবে নিষ্ঠাপূর্ণ। কেবলমাত্র পরিমার্জিত সর্বাধুনিক স্বরলিপি-পদ্ধতির প্রচারেই নয়, উত্তরকালে সেই প্রণালী অনুযায়ী কয়েকটি গানের স্বরলিপি রচনা করে বিষয়টিকে তিনি যেমন মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠা দিতে পেরেছিলেন তেমনি উক্ত ব্যাপারটি সম্বন্ধে আপনার উৎসাহ এবং অধিকারও প্রমাণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতির পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে পিয়ানো বাজিয়ে একদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অভিনব ও বিবিধ সুরের ইন্দ্রজাল রচনা করতে থাকেন, ঐ সময় 'তাঁহার সেই সদ্যোজাত সুরগুলিকে কথা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টায় নিযুক্ত' ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী।[৩৫] রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণার মধ্যে স্বর্ণকুমারীর কোনো উল্লেখ না থাকলেও এভাবে গানের কথা রচনার কাজে তিনিও সুরকারের স্বীকৃতিলাভ

৩৩ ভারতী ও বালক, পৌষ ১২৯০, পৃ ৪৮৩।

৩৪ ঐ, ১২৯৩, পৃ ৪৬, পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৩৫ গীতচর্চা, জীবনস্মৃতি—দ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৭শ, পৃ ৩৪১।

করেছিলেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে তার সপ্রশংস উল্লেখ রয়েছে। সম্ভবত অশ্রুমতী নাটকে ব্যবহৃত স্বর্ণকুমারীর 'এখনো এখনো প্রাণ' গানটি এই সময়ে রচিত হয়। এবংবিধ অনুমানের অনুকূলে বলা যায় যে স্বরলিপি গীতিমালার মধ্যে উক্ত গানের কথা-রচয়িত্রী রূপে স্বর্ণকুমারীর এবং সুরকার হিসাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাম পাওয়া যায়। বোধ হয় পরবর্তীকালে গানটিতে রচয়িত্রী তাল-সুরগত কিঞ্চিৎ স্বাতন্ত্র্য সঞ্চার করেছিলেন; জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বরলিপি গীতিমালা এবং সরলা দেবীর শতগানে (১৩৩০) গানটির তালে 'মধ্যমান' ব্যবহৃত, কিন্তু স্বর্ণকুমারীর সংগীতশতকে এর তাল হল 'আড়া'। এখানে বলা দরকার যে মধ্যমান এবং আড়ার মাত্রাবিভাগ এক হলেও এদের মধ্যে আঙ্গিকগত সূক্ষ্ম পার্থক্য বর্তমান। 'জনমের মত সখা' গানটিতেও অনুরূপ ব্যাপার লক্ষণীয়, স্বরলিপি গীতিমালায় এর তাল 'ঝাঁপতাল', অথচ সংগীতশতকে তা হল 'আড়া'। প্রসঙ্গক্রমে বলা আবশ্যক স্বরলিপি গীতিমালার তৃতীয় খণ্ডে স্বর্ণকুমারীর 'এখনো এখনো প্রাণ সে নামে শিহরে কেন' এবং 'জনমের মত সখা বিদায় দেহ গো মোরে' এই দুটি গানের যে স্বরলিপি পাওয়া যায় তা প্রস্তুত করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ; তাছাড়া স্বর্ণকুমারীর গীতিগুচ্ছের অন্তর্গত কোনো কোনো গানের কথার সুরও জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরই প্রদত্ত।[৩৬]

সরলা দেবীর শতগানে স্বর্ণকুমারীর নয়টি গানের স্বরলিপি আছে, গানগুলির সুর-তালগত পরিচয়-জ্ঞাপক একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল :

১ এখনো এখনো প্রাণ। 'সুর—প্রচলিত'। ভৈরবী, মধ্যমান (সংগীতশতকে আড়া)

২ এমনি করে তারো কি। সুর—সরলা দেবী। কীর্তন, কাওয়ালি (অন্যত্র মিশ্র একতালা)

৩ এ হৃদি নিভাতে চাহে। বেহাগড়া, ঝাঁপতাল (অন্যত্র আড়া)

৪ ওহে পরাণপ্রিয়। সুর—স্বর্ণকুমারী। মিশ্র কানাড়া, একতালা (অন্যত্র কাওয়ালি)

৫ কি আলোকজ্যোতি। সুর—গুজরাটী। প্রভাতী, একতালা

৬ নিঃঝুম নিঃঝুম গম্ভীর রাতে। সুর—স্বর্ণকুমারী। মল্লার, কাওয়ালি

৭ বহুক ঝটিকা ঝড়। সুর—হিন্দুস্থানী। ইমনকল্যাণ, আড়াঠেকা

৮ সখি নব শ্রাবণ মাস। সুর—সরলা দেবী। মল্লার, কাওয়ালি

৯ সে কেমনে চলে যায়। সুর—রসিকলাল ঘোষ। মিশ্র বেলাওল, একতালা

যেসকল গানের রাগ বা তালের ভিন্নতা দেখা যায় বর্তমান তালিকায় তার উল্লেখ আছে, প্রধানত শতগান ও সংগীতশতকের মধ্যে এই পার্থক্যটি লক্ষিত হয়েছে। সরলা দেবীর এই

---

৩৬ যেমন—'আয় রে ভাই'; দ্র গীতিগুচ্ছ, ১ম, পৃ ২৫-২৬।

স্বরলিপির কোনো কোনোটি সাময়িকপত্রে প্রথম প্রকাশিত হয়। যেমন—'এ হৃদি নিভাতে চাহে' গানের স্বরলিপি ১৩০২ সালের ভারতীর বৈশাখ সংখ্যায় মুদ্রিত হয় এবং এর সুর 'ধীরি ধীরি প্রাণে আমার এস হে' গানের সুরের অনুরূপ বলে মন্তব্য করা হয়েছে; 'সখি নব শ্রাবণ মাস'-এর স্বরলিপি ১৩০২ সালের ভারতীর শ্রাবণে প্রকাশিত হয়।

॥৫॥ সুরনিরপেক্ষ গানের কথার পাঠমূল্য বা গীতিকথার গীতিকবিতাসুলভ মর্যাদা অস্বীকার করা চলে না। ১২৮৮ সালের ৮ বৈশাখ তারিখে বেথুন সোসাইটিতে পঠিত 'সংগীত ও ভাব' নামক রচনায় (ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮) রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'সংগীত মনোভাব প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম উপায়মাত্র। আমরা যখন কবিতা পাঠ করি, তখন তাহাতে অঙ্গহীনতা থাকিয়া যায়, সংগীত আর কিছু নয়, সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে কবিতা পাঠ করা।' ঐ বৎসরেরই মাঘ মাসের ভারতীতে মুদ্রিত 'সংগীত ও কবিতা' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, 'আমরা যখন একটি কবিতা পড়ি, তখন তাকে আমরা শুদ্ধমাত্র কথার সমষ্টি স্বরূপে দেখি না—কথার সহিত ভাবের সম্পর্ক বিচার করি। ভাবই মুখ্য লক্ষ্য। কথা ভাবের আশ্রয়স্বরূপ। আমরা সংগীতকেও সেইরূপে দেখিতে পাই। সংগীত সুরের রাগরাগিণী নহে, সংগীত ভাবের রাগরাগিণী।' তাছাড়াও গীতবিতানের দ্বিতীয় সংস্করণের 'বিজ্ঞাপনে' রবীন্দ্রনাথ সুরনিরপেক্ষ গীতিকথার পাঠমূল্যকে সুস্পষ্ট স্বীকৃতি দিয়েছেন, 'গীতবিতান যখন প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তখন সংকলন-কর্তারা সত্বরতার তাড়নায় গানগুলির মধ্যে বিষয়ানুক্রমিক শৃঙ্খলা বিধান করতে পারেননি। তাতে কেবল যে ব্যবহারের পক্ষে বিঘ্ন হয়েছিল তা নয়, সাহিত্যের দিক থেকে রসবোধেরও ক্ষতি করেছিল। সেইজন্যে এই সংস্করণে ভাবের অনুষঙ্গ রক্ষা করে গানগুলি সাজানো হয়েছে। এই উপায়ে, সুরের সহযোগিতা না পেলেও, পাঠকেরা গীতিকাব্যরূপে এই গানগুলির অনুসরণ করতে পারেন।' স্বর্ণকুমারীর পূর্বোল্লিখিত একটি স্বীকৃতি থেকে জানা যায় যে বংশীধ্বনি শ্রবণে তাঁর তন্ময় চিত্তভাবনালোকে 'কল্পনার বিচিত্র সুন্দর ছবি ফুটিয়া উঠিত, আপনা হইতেই গানের সুর কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়া আসিত।' ভাব ও সুর, কবিতা ও গীতের এই অবিভাজ্যতা অনিবার্য। গান অবশ্যই সুরনির্ভর কথা, তাই গানের কথার স্বাতন্ত্র্য আদৌ উপেক্ষণীয় নয়; এবং একই কারণে গীতের কথাবস্তুও গীতিকবিতারূপে পাঠযোগ্য। স্বর্ণকুমারীর কবিতা যেমন সংগীতের লক্ষণাক্রান্ত তেমনি তাঁর গানের কথায়ও কবিত্বের স্পর্শ রয়েছে। তাঁর কোনো কোনো গান কবিতা-সংকলন গ্রন্থে স্থান পেয়েছিল, 'কবিতা ও গান' নামক গ্রন্থটি তার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। কোনো কোনো গানের শিরোনাম দেওয়া হয়েছে; আবার সংগীতে-ব্যবহার্য ওগো, হায়, আহা প্রভৃতি বিশিষ্ট অব্যয় কবিতায়ও ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে সাহিত্যের প্রাথমিক স্তরে কবিতা ও গান ছিল দ্বৈতাদ্বৈতের মত অবিচ্ছিন্ন। গীতের এই আতিশয্যিত প্রভাব থেকে পরবর্তীকালের গীতিকাব্য মুক্তিলাভ

করে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। এসকল বিষয় বিবেচনা করে স্বর্ণকুমারীর গীতিকথাকে বিশুদ্ধ কবিতারূপে আস্বাদন করলে এর স্বতন্ত্র মর্যাদা-মূল্য উপলব্ধ হতে পারে।

সংস্কৃত এবং বাংলা ভাষার সংমিশ্রণে রচিত গানগুলিতে ঐতিহ্যানুবর্তন পরিলক্ষিত হয়। পিত্রালয়ে বা জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে অনুষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের প্রচলিত উপাসনা-গীতি বা ব্রহ্মসংগীতগুলি সম্ভবত লেখিকার মনে একটা মোহাবেশের সঞ্চার করেছিল ; মিশ্র ভাষা-রীতি-আশ্রিত গীতিকথা রচনার পশ্চাতে তারই সক্রিয় প্রভাবটি অনুভূত হয়। প্রেম-পারিজাতহার কাব্যের 'নমামি ত্বাং' গানটি এর অন্যতম নিদর্শন ; মিশ্র বেহাগে রচিত এই গানটির সুরকার ছিলেন স্বয়ং স্বর্ণকুমারী, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' গানটির ভাষা ও আঙ্গিকের সাদৃশ্য এখানে দেখা যায়। তাছাড়া ভৈরবীতে 'শারদে শুভঙ্করি শঙ্করি দুঃখহারিণি' এবং 'ওহে কাল ত্রিলোকপাল', ভৈরোঁতে 'নমস্তে সতে তে সনাতন নূতন', মিশ্র ভৈরোঁতে 'তুমি স্বয়ম্ভু সুন্দর ভূমা ভয়ঙ্কর' প্রভৃতি গানগুলিও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই গানগুলিতে সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের বাহুল্য এবং সুদীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদসমষ্টি ভাবের গাম্ভীর্য ও সমুন্নত মহিমা সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। লক্ষণীয় যে একমাত্র দেববন্দনা বা প্রার্থনা-সংগীত ব্যতীত অন্য কোথাও এই প্রকরণ প্রযুক্ত হয়নি। আরও বলা যায় যে এইজাতীয় গান ব্যাপকতর অর্থে শিববাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় স্বাভাবিক কারণে সাধারণভাবে ভৈরোঁ বা ভৈরবী ঠাটে রচিত। 'শৈবধর্মের বহুল প্রচারের যুগে ভৈরব বা শিবানীর ভজনগীতির প্রয়োগে ব্যবহৃত হইয়া ভৈরব ও ভৈরবী রাগিণী শিবপূজার ভক্তিবাদে বিজড়িত হইয়া সম্মান ও গৌরবের আসন প্রাপ্ত হইয়া তাহাদের প্রাচীন কালের অনার্য জাতি হইতে উৎপত্তির ইতিহাস বিস্মৃতির যবনিকার অন্তরালে লুপ্ত করিয়াছে।'[৩৭] ফলত এক্ষেত্রে ভক্তিমার্গাশ্রিত করুণ আত্মনিবেদন ও আরাধনার আকৃতিই প্রধান বলে স্বর্ণকুমারীর উপরোক্ত গানগুলি উপযুক্ত আধারে পরিবেশিত হয়েছিল বলা যায়।

বাংলা সাহিত্যের শ্যামাসংগীতের উদার সুশীতল ছায়ায় তাঁর কয়েকটি আগমনী-বিজয়া ও রামপ্রসাদী সুরের গান আশ্রিত। ঐতিহ্যের অনুসরণে এগুলি রচিত হয়েছে সত্য, তথাপি তাঁর মৌলিকতাও নিষ্প্রভ নয়, বরং প্রথার আনুগত্য সত্ত্বেও তাঁর প্রাতিস্বিকতার উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষিত হয় প্রধানত সুরনির্বাচনে ও ভাবানির্মাণে। জাতীয় সংগীতে জন্মভূমিকে জননীরূপে বারংবার সম্বোধন করা হয়েছে ; দেবী-বন্দনামূলক গানেও মাতৃচেতনা প্রখর এবং একাধিক ভারতী-বন্দনা বা শ্যামা-বিষয়ক গানের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ নয়। শ্যামাকে জাগতিক নিয়মসমূহের নিয়ন্ত্রণকারী ও সৃজনশীল মহামায়ারূপে পরিকল্পনার মধ্যে তন্ত্রভাবনার

৩৭ অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, রাগরাগিণীর নামরহস্য, ১৩৬০, পৃ ১৫।

প্রভাবটি সুস্পষ্ট। আবার অন্যায়-তিমির হননকারী সবিতার মত, ন্যায়মহিমা প্রতিষ্ঠাকারী দেবতার মত শ্যামা বন্দিত হয়েছেন তাঁর কাব্যে ও গানে। ফলে এই নবপুরাণসৃষ্টিতে দেবীভাবনাটি সম্প্রসারিত। জগজ্জননীর স্নেহকরুণ ও বজ্রকঠিন মহিমাকে স্থাপন করা হয়েছে যুগোপযোগী চিন্তার পটভূমিকায়:

দয়াময়ী নামে তোর কলঙ্ক দিসনে শ্যামা।
নিরীহ নির্দোষের পানে নয়ন তুলে বারেক চা মা।
অত্যাচারের পাষাণ-পায় দুর্বলে প্রাণ হারায়,
এ সংকটে দয়াময়ি, দিসনে মা তোর দয়ায় সীমা।

শ্যামাসংগীতের আধারে ঐতিহ্যানুগ আধ্যাত্মিক সংকট এবং নবজাগ্রত জাতীয় চেতনা-সঞ্জাত ক্ষোভ সংমিশ্রিত। আধুনিক শিল্পে-সাহিত্যে পুরাণ-প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমসাময়িক জীবনচেতনা অনিবার্যভাবে এসে পড়ে, এভাবে মিথ বা পুরাণ-প্রসঙ্গের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদিত হয়। প্রাচীন শ্যামাসংগীত থেকে স্বর্ণকুমারী রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ আধুনিক গীতিকবির রচনার স্বাতন্ত্র্য এরূপে নিরূপিত হতে পারে। জগৎব্যাপী অশুভ ও অশিবের দৌরাত্ম্যকে আধ্যাত্মিকতার মধ্যযুগীয় অবরোধ থেকে মুক্তি দান করে তাঁরা মানবজাতির চিরন্তন সমস্যা বা সমকালীন প্রতিবন্ধসমূহকে সেই শূন্যস্থানে পরিবেশন করেছেন যুগোপযোগী বিকল্পরূপে। এই একই সূত্র অবলম্বন করে লেখিকার জাতীয় সংগীতগুলিও জন্মলাভ করেছিল। প্রসঙ্গত তাঁর রচিত 'মা বলে আর ডাকব না মা', 'ওগো তারা দয়াময়ি', 'এতদিনে পড়িল কি মনে', 'আজি মঙ্গল শঙ্খ বাজে', 'হায় দেখিতে দেখিতে নিমেষে চকিতে', 'বিদায় দেব কেমনে আজি' গানগুলি উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত গীতিচতুষ্টয় আগমনী-বিজয়া-বিষয়ক; এতৎসঙ্গে 'দাঁড়াও গো রানি', 'নন্দন-আনন্দ-আভা ছড়াইয়ে দিয়ে' প্রভৃতি সংযোজিত হতে পারে।

বাংলা দেশের নিজস্ব সম্পদ কীর্তন বা বৈষ্ণব-পদাবলীর প্রতি গীতিকারের একটি সুগভীর মমত্ব লক্ষিত হয়। কোনো কোনো গানের রাগ বা তালের নির্দেশ না দিয়ে শুধু 'কীর্তন' বা 'কীর্তনী সুর' অথবা 'কীর্তনের সুর' বলে তাদের উল্লেখ করা হয়েছে। মিশ্র ভৈরবীতে রচিত 'দোষ করেছিনু সখা' বা 'জানি হে বঁধু জানি', মিশ্র বাহারে 'আমার গীতিকুসুম', মিশ্র খাম্বাজে 'ওহে সুন্দর প্রেমময়' প্রভৃতি গীতিতে বৈষ্ণব-পদাবলীর বহু-পরিচিত effect চমৎকারভাবে বিধৃত; বঁধু, সখা, হিয়া, ধৈরয প্রভৃতি পদাবলীর বিশিষ্ট বাণীভঙ্গিটুকু পর্যন্ত এখানে স্বীকৃত। রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়প্রসঙ্গ কোথাও কোথাও মানবিক প্রেমের বিচিত্র অনুভূতি-অনুরাগে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে, অথবা একে অপরের স্থান অধিকার করে নিয়েছে:

এসো কাছে, আরো কাছে,—আরো—আরো
তোমার দানে পূর্ণ কর।
ঘুচুক সব ব্যথা, আকুলতা, ধর হে তুলে ধর।

দাও দখিন পাণি।
ধন্য মানি, বঁধু হে আমি ধন্য মানি,
তোমার হয়ে আপনারে ধন্য মানি।

দয়িতের নিবিড় সান্নিধ্য অনুভব করে চলেছেন কবি। আন্তরিক আকূতি, আত্মনিবেদন ও ভাবসম্মিলনের বিচিত্র দিকগুলি যেন কীর্তনের আখরের মাধ্যমে প্রকটিত হবে বলে হৃদয়ভাবনার মত চরণগুলিও বিস্রস্ত-বিহ্বল হয়ে উঠেছে।

চতুঃষষ্টি কলাধিষ্ঠাত্রী সরস্বতীর নিদিধ্যাসন-উদ্দেশ্যে রচিত ইমন-ভূপালীতে 'ওগো কমল-আসনা' এবং পূর্বোল্লিখিত 'নমামি ত্বাং' প্রভৃতি স্মরণযোগ্য। হৃদয়-কমলদলবাসিনী রাগরাগিণী-বিকাশিনী বীণাপাণির বন্দনায় তিনি বলেছেন,

তব প্রেম-পরশ-রস-রাগে
পুলকিত মোহিত চিত নিত জাগে
গীত-অনুরাগে।

এই সারদাই 'ভক্তচিত্তে দিব্যজ্যোতির্বিভাসিনী'; ভক্তিনম্র চিত্তে উপাসিকার ন্যায় তিনি এই প্রেরণাদায়িনী শক্তির নিকটই ঐকান্তিক আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। সারস্বত চিন্তা-সম্পৃক্ত উৎসবমূলক 'আজি মঙ্গল পঞ্চমী' কর্ণাটী খাম্বাজে গেয়, গানটিতে বিদ্যাদায়িনী সরস্বতীতে আহ্বান করা হয়েছে কারণ 'স্বভাব-সংগীত বন্যা-সরিতে' ভারতের 'দুর্নীতি-দুর্গতি-দুষ্কৃতি-অভিমান' দূরীকরণে শ্রীপঞ্চমীর দেবী সমর্থা। অন্যান্য মাঙ্গলিক গীতের মধ্যে 'ঐ বিশ্বলোকে আনন্দরাগিণী', 'কর নূতন বর্ষে তোমার স্পর্শ দান' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

মানব-মানবীর পারস্পরিক রহস্যময় সম্পর্কচিন্তা অনেকগুলি গানের প্রাণ; নরনারীর মান-অভিমান আক্ষেপ-অনুরাগ আসক্তি-ঔদাসীন্য অনুযোগ-অনুরোধ প্রভৃতি মানসিক ভাববৈচিত্র্য গানগুলিতে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। কোনো কোনো গান লেখিকার উপন্যাস কাব্য বা নাটকের অন্তর্গত পাত্রপাত্রীর জীবনের বিবিধ সমস্যা অবলম্বনে রচিত, কোথাও বা প্রাকৃতিক প্রতিবেশে মানবজীবনের জটিলতা আস্বাদিত হয়েছে। শুধু 'গাথা' কাব্যের মাত্র চারটি কবিতায় এগারটি গান পরিবেশিত হয়েছিল এতদুদ্দেশ্যে। যেমন—'চেয়ে আছি কবে হইবে সেদিন', 'ভুলে যাও দুখিনীরে', 'ঘোষে বজ্র কড়মড়', 'উথলিত অশ্রুবারি এ পোড়া নয়নে', 'আকাশের পটে মধুর মূরতি', 'চলিলে প্রবাসে তবে হৃদয়ের ধন', 'যাতনার এই দুখময় সুখ', 'ফোটা ফুলগুলি আনিয়াছি তুলি', 'জনমের মত সখা বিদায় দেহ গো মোরে', 'কেমনে বিদায় দেব', 'শুকাইতে রেখে একা ফেলিয়া চলিলে' ইত্যাদি। বলাবাহুল্য খড়্গ-পরিণয়ে ব্যবহৃত রবীন্দ্রসংগীত 'তারে দেহো গো আনি' (ভারতী, ১২৮৬) এ তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

কোনো কোনো গানে প্রকৃতির বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা প্রাধান্য পেয়েছে। মল্লারে গেয় 'নিঃঝুম-নিঃঝুম গম্ভীর রাতে' গানটিতে ব্যবহৃত যুগ্মব্যঞ্জনাদি বর্ষার ধ্বনিময় রূপের আভাস দান করে। স্বর্ণকুমারীর উপন্যাসে এর প্রয়োগ (ছিন্নমুকুল, ৪র্থ পরিচ্ছেদ) লক্ষিত হয়।[৩৮] মিশ্র আসোয়ারীতে রচিত 'শারদ সমীরে পাগলভোলা' শরতের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনাসমৃদ্ধ একটি স্ফূর্ত্যোজ্জ্বল গীতিকবিতা বিশেষ। বেহাগে 'বসন্ত জেগেছে আজি প্রাণে' এবং মিশ্র মল্লারে 'আজি কোয়েলা কুহু বোলে' একান্তভাবে বসন্ত ঋতু-বিষয়ক; শেষোক্তটি বিবাহ-উৎসব ও বসন্ত-উৎসব গীতিনাট্যে ব্যবহৃত হয়েছিল। আবার মিশ্র খাম্বাজের একটি রচনায় কবিমনের দর্পণরূপে বর্ষাপ্রকৃতি প্রতিভাত :

তোমার ছড়িয়ে পড়া ধারার মাঝে
ওহে শ্রাবণ, ওহে গায়ন, আমি পেয়েছি খুঁজে
আমার হারিয়ে-যাওয়া স্বপ্নসুরের সকল কথা যে।

বাহ্যপ্রকৃতির সৌন্দর্যবর্ণনায় সচরাচর বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়, স্বর্ণকুমারীর গানে তৎসঙ্গে মন্ময়তা প্রকটিত। বারোয়াঁ-খাম্বাজে গেয় ব্রজবুলিতে রচিত নিম্নোক্ত গানটি তার নিদর্শন :

মধু বসন্ত সখি রে!
যৌবন আকুল, ফুল্ল কুসুমকুল,
উলসিত ঢলঢল শশিকর মাখি রে!
সমীরণ চঞ্চল, যমুনা কলকল,
কুহরত কুহুকুহু নিকুঞ্জে পাখী রে!
সুহাসিত যামিনী, সচকিত কামিনী,
কম্পিত হিয়া পর ঝর ঝর আঁখি রে!
কাঁহা বৃন্দাবন, হরি, কাঁহা মধু বাঁশরী,
বাজিল না আজু, মরি, রাধা রাধা ডাকি রে!

ব্রজবুলিতে রচিত এই গানগুলি উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে রচিত বৈষ্ণবভাবাপন্ন কবিতার সগোত্র। 'বৈষ্ণব-কবিতার ভাষা, ছন্দ এবং রসলোকের ভিতরে এমন একটি অনির্বচনীয়তা আছে,—এমন একটি অনিবার্য হৃদয়াবেগ আছে যে, রসিক চিত্তকে তাহা মুহূর্তে আলোড়িত করিয়া তোলে। তাহার অভিনব সৌকুমার্য এবং চমৎকারিত্ব, তাহার লোকোত্তর রমণীয়তা অন্ততঃ কিছুকালের জন্য মনকে আলোড়িত করিয়া তোলে।··· তাই

৩৮ ভারতীর ১২৮৫ সালের মাঘ সংখ্যার পাঠ, গ্রন্থাবলীর পাঠ ও গীতিগুচ্ছের পাঠের সঙ্গে সুকুমার সেনের বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রদত্ত (পৃ ৪৭৬) পাঠের কিছু বৈসাদৃশ্য দেখা যায়।

পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার প্রবলতম যুগ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও আমরা দেখিতে পাই সেই বৈষ্ণব-কবিতার পুনরাবির্ভাব।'[৩৯] অগ্রজ মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণে স্বর্ণকুমারী দেবী সহোদর রবীন্দ্রনাথেরও পূর্বে এইজাতীয় গান- রচনা করেন। এদের মধ্যে বৈষ্ণব-অনুষঙ্গ লুপ্তপ্রায়, তবে পদাবলী সাহিত্যের ভাবনার উত্তরাধিকার থেকে রচনাগুলি একেবারে বঞ্চিত নয়; এমনকি বৈষ্ণব-কবিতায় বহু-অনুশীলনগ্রাহ্য ও বিশিষ্ট ভাবদ্যোতনাশ্রিত শব্দ বা বাগ্বিধি-ভঙ্গি তাঁর গানগুলিতে গৃহীত হয়েছে।

জাতীয় সংগীত রচনার ক্ষেত্রে স্বর্ণকুমারী বিস্ময়কর শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের দিনে বঙ্গীয় মহিলা কবিগণের বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণের কথা পরবর্তী-কালের সমালোচক শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন, 'দেশ-প্রীতির পবিত্র বহ্নি স্বদেশী যুগে পুরুষ ও নারীর হৃদয়ক্ষেত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।...... আমাদের জাতীয় জীবনের সেই প্রথম যুগে উষার পবিত্র দীপ্তির ন্যায় যে এক উজ্জ্বল আভা সাহিত্যের উপর প্রতিভাত হইয়াছিল তাহার স্মৃতি আজ আমাদের কাছে বাঁচিয়া আছে কাব্য ও সাহিত্যের অপূর্ব পরিবেশের মধ্য দিয়া— দেশভক্তির প্রকাশক সেযকল সরল ভাষায় লিখিত কবিতা ও সংগীত পাঠে আমাদের মন আনন্দে ও দেশভক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠে।'[৪০] হিন্দু মেলা বা চৈত্র মেলার (প্রথম অধিবেশন: ১২ এপ্রিল ১৮৬৭) সময় থেকেই প্রকৃতপক্ষে দেশানুরাগের গান রচিত হতে থাকে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ঠাকুরবাড়ির সক্রিয়তা বিচারিত হয়েছে, 'সাহিত্য এবং ললিত কলায় তাঁহাদের উৎসাহের সীমা ছিল না। বাংলার আধুনিক যুগকে যেন তাঁহারা সকল দিক দিয়াই উদ্বোধিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।... বাংলায় দেশানুরাগের গান ও কবিতার প্রথম সূত্রপাত তাঁহারাই করিয়া গিয়াছেন।'[৪১] উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশে সদ্যোজাত জাতীয়তাবোধ এবং স্বদেশিকতার পটভূমিকায় স্বর্ণকুমারীর এইজাতীয় গানগুলি বিচার্য। 'স্বদেশপ্রেমই স্বর্ণকুমারীর সাহিত্যসাধনার উৎস'[৪২] হলেও সুতীব্র স্বাজাত্যাভিমান বা অত্যুগ্র সাম্প্রদায়িকতা তাঁর উদারপ্রসন্ন দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে দেয়নি; জাতিদেশনিরপেক্ষ উন্নত মানবতাবোধ এবং সর্বব্যাপী প্রবল সহানুভূতি তাঁর মানসিকতাকে একটি পরিণতি ও উত্তরণ দান করেছিল। 'অত্যাচারের পাষাণ-পায় দুর্বলে প্রাণ হারায়' বলে শ্যামাসংগীতের মধ্যে অন্যায় দুঃশাসন ও অবিচারের অবসান কামনা

৩৯ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, বাঙলা-সাহিত্যের নবযুগ, ১৩৫৯, পৃ ৬৬।

৪০ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বঙ্গের জাতীয় কবিতা ও সংগীত; দ্র দেশ, ২৯ জুলাই ১৯৪৪, পৃ ৩৩১।

৪১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনস্মৃতির খসড়া; দ্র বিশ্বভারতী পত্রিকা, ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা। তুলনীয়: স্বাদেশিকতা, জীবনস্মৃতি।

৪২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, ২৮ শ, পৃ ২৮।

করেছেন তিনি জগজ্জননী মহামায়ার নিকট ; ব্রহ্মসংগীতগুলির মাধ্যমেও পরম পিতার নিকট একই আকৃতি প্রেরিত হয়েছে।

গীতিগুচ্ছের প্রথম গানে জন্মভূমিকে জননীরূপে সম্বোধন করা হয়েছে সত্য, কিন্তু সেই জননী বা জন্মভূমি আদৌ সংকীর্ণ অর্থে বাংলা দেশ নয় ; ভারতবর্ষের অতীত গরিমা কীর্তনে গীতিকারের হৃদয় উল্লসিত, এমনকি ভারতবর্ষ দেবীত্বের মহিমায় মর্যাদায় উন্নীত ও প্রতিষ্ঠিত। আবার দ্বিতীয় গান 'ধরণি গো, মানবজনম যদি'র মধ্যে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতাও অপসৃত, জগৎ ও জীবনের সর্বস্তরে চিত্ত প্রসারিত। মাতৃভূমি বাংলা দেশ তথা ভারতবর্ষের পীঠস্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছে জননী ধরণী এবং পৃথিবীর সন্তানরূপে পীড়িত ও বঞ্চিত মানবতার প্রতিনিধিরূপে স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন লেখিকা। বিশেষকে অবলম্বন করে এভাবে নির্বিশেষ বা সাধারণে (from particular to general) উপনীত হতে পেরেছিলেন বলে তাঁর নিকট ভারতবর্ষের অপমান বিশ্বমানবতার অসহায়তার অন্তর্ভূত ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল। অবশ্য সাময়িক প্রয়োজনকেও তিনি কদাপি অস্বীকার করেননি, বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত বন্দেমাতরম্-প্রভাবিত স্বর্ণকুমারীর 'বন্দেমাতরম্ বলে আয় রে ভাই' গানটিতে যথেষ্ট পরিমাণে সমকালীন স্বাধীনতা-আন্দোলনের উত্তাপ অনুভূত হয়। আত্মভ্রষ্ট উন্মার্গগামী এবং বিদেশীর পদলেহনতৎপর দেশভ্রাতার স্বপ্নভঙ্গের পর সহোদরা লেখিকা সেই অনুতপ্ত সন্তানের জন্য দেশমাতৃকার ক্ষমাসুন্দর স্নেহভিক্ষা করেছেন 'দেখ চেয়ে কে এসেছে ফিরে' প্রভৃতি গানে ; আবার দেখা যায় 'সাত সমুদ্র তের নদী' অতিক্রম করে যে পুত্র 'দানবরাজার পুরে' স্বদেশের 'হারান মণি বিজ্ঞান-রতন'-এর সন্ধান লাভ করে ফিরে এল জননী তাকেও সাদরে আপনার বুকে তুলে নিয়েছে। 'বাঙ্গালী পল্টনের যুদ্ধযাত্রা-সংগীত' নামক গানে ('ঐ আহ্বান-গীতি বাজে') তাঁর আশাবাদী দৃপ্ত মানসিকতার সন্ধান পাওয়া যায়, এটি একটি উৎকৃষ্ট রণসংগীত।

রামমোহনের পন্থানুসরণে সেকালের যেসকল ভক্ত গীতিকার ব্রহ্মসংগীত রচনায় আত্ম-নিয়োগ করেন স্বর্ণকুমারী তাঁদের অন্যতম। যাঁকে তিনি শ্রেয়স্ক প্রেয়স্ক জ্ঞান করেছিলেন সেই 'সনাতন নূতন অরূপ কাল-রূপ অণীয়ান মহীয়ান' হলেন 'কভু প্রেম-জ্যোতি কভু রুদ্র তিমির-ঘন' ; এঁরই নিকট তিনি প্রার্থনাপরায়ণ। সূর্য-বন্দনার সঙ্গে পরম পুরুষের ধ্যান সংমিশ্রিত হয়ে গেছে মিশ্র কানাড়ায় গীতোপযোগী 'এস হে এস সুন্দর, ওহে নব তপন'। মিশ্র খাম্বাজে রচিত 'সফল কর জীবন মম' একটি উৎকৃষ্ট প্রার্থনাসংগীত।

স্বর্ণকুমারীর কৌতুকগীতিগুলি বাংলা হাস্যরসাত্মক গানের ভাণ্ডারে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন ; এগুলি মূলত কৌতুকনাট্য বা প্রহসনের মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টির প্রয়োজনে। 'সাগর-ছেঁচা মাণিক আমার', 'সই লো মোর গঙ্গাজল', 'ও প্রাণ মোর

গঙ্গাজল' প্রভৃতি গান সংগীতশতক নামক সংকলন-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'ছি ছি কেমন জামাই' পাঠকালে স্বভাবত ভারতচন্দ্রের 'আই আই ওই বুড়া কি' মনে পড়ে।

স্বর্ণকুমারীর এমন কয়েকটি গান আছে যেগুলি 'বাউলের সুরে' গীত হতে পারে বলে রচয়িত্রী নির্দেশ দিয়েছেন। বাউলের বোধ-বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর আধ্যাত্মিক চিন্তার সাদৃশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে লক্ষিত হয়; তাছাড়া বাউলগীতির গঠনবৈশিষ্ট্য যে তাঁর গানে ফুটে উঠেছে তা বলা চলে। 'কে তুমি প্রেমিক বাদক', 'আমার মনের সাথে দিনে রাতে', 'তোমার আপনার জন আপনি হল না' প্রভৃতি এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য; মিশ্র ঝিঁঝিটে গেয় 'মনটি ওরে ভাল করে' প্রভৃতি একটি প্রশংসনীয় প্রয়াসের নিদর্শন।

১৩০২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে (৬ মে) লেখিকা কলিকাতা থেকে নীলগিরির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। নীলগিরিতে অবস্থানকালে লিখিত দিনলিপির একাংশ এইরূপ: 'প্রতিদিন উষাকালে এখানে বেড়াইতে বেড়াইতে আমার নয়নের উপর নীল পাহাড়ের আড়াল দিয়া তরলতার মধ্য হইতে ক্রমে মুক্তাকাশে সূর্যের সুবর্ণ গোলক ভাসিয়া উঠে, মেঘকান্তিময় দিগ্‌দিগন্ত তাহার কিরণ-ছটায় উদ্‌ভাসিত বিকশিত হইয়া উঠে, চারিদিকে নয়নপথে কোথাও ফুল নাই, কিন্তু পথিপার্শ্বস্থ নীলনির্যাস পত্রের মৃদুমন্দ সুগন্ধ হিল্লোলে চারিদিক তরঙ্গিত হইতে থাকে। বৃক্ষপত্র সূর্য আকাশ বায়ু সকলে মিলিয়া স্তব্ধ প্রাতঃকাল জগৎ-পিতার মহিমাস্তুতিতে আনন্দপ্লাবিত করে। এই আনন্দরাজ্যের পাশ দিয়া যখন এক একটি মলিনবেশ দীনহীনা রমণী কাষ্ঠভার মস্তকে বা শতছিন্ন চিরখণ্ডাবরিত শিশুক্রোড়ে চলিয়া যায় তখনি কেবল যেন এই সুখের স্রোত সহসা বন্ধ হইয়া যায়। এই আনন্দময় সুপ্রভাতে প্রাণীজগতে কত হিংসাদ্বেষ জীবনসংগ্রাম চলিয়াছে, মনুষ্যাবাসে কত ঘরে শোকদুঃখ হাহাকার চলিয়াছে তাহা মনে পড়িয়া যায়—নৈরাশ্যব্যথিত হৃদয় তখন দেখিতে পায়, বিধাতা পুরুষ অমিশ্রিত পরিপূর্ণ আনন্দ কেবল তাঁহার জড় সন্তানের মধ্যেই বিতরণ করিয়াছেন; আর জ্ঞানবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখতাপ তাঁহার অনিবার্য দান। তখন কাতর প্রাণ হইতে এইরূপ প্রার্থনাসংগীত ধ্বনিত হইতে থাকে—

এ মধু প্রভাতে মধুর রবি, মধুরূপময়ী ধরণী-ছবি,
মধুর মিলনে আলোকিত সবি, দশদিকে প্রেমপুলক বয়।
লতাপাতাফুল ঢালিছে সুগন্ধ, পবন বহিছে শীতল সুমন্দ,
নির্ঝর তটিনী গাহিছে আনন্দ, তব নামে বিভু উঠিছে জয়।
এত সুখ-ভরা এই নিকেতন, দ্যুলোক ভূলোক প্রেমে অচেতন;
কেন, পিতা, তবে এ সন্তানগণ দীনদুখী শুধু তোমার ঘরে?...

দিলে যদি জ্ঞান কেন এই মোহ, কেন ঈর্ষাদ্বেষ দিলে যদি স্নেহ ;
এ আনন্দরাজ্যে কেন প্রভু দেহ এত অমঙ্গল বেদনা ক্লেশ।'[৪৩]

অমূল্য মানবজীবনের ব্যর্থতা এবং অপচয় তাঁর চিত্তে দিব্য বেদনাকে জাগ্রত করেছিল। গীতিগুচ্ছে প্রদত্ত বর্তমান গানের স্বরলিপি থেকে জানা যায় এটি মিশ্র ললিতে গেয় ; ললিত রাগিণীর পরিকল্পনায় অবমাননার বেদনা ও অভিযোগের দীর্ঘশ্বাস প্রাধান্য পেয়ে থাকে, গানটির বাচ্যার্থের সঙ্গে তাই তার সুন্দর সঙ্গতি রক্ষিত হয়েছে।

স্বানুভূত আনন্দ-বেদনাশ্রিত অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে জীবন-সায়াহ্নে উপনীত হয়ে গীতিকার স্বাভাবিক কারণে পশ্চাৎমুখী হয়ে পড়েছেন, কারণ অস্তায়মান সূর্যের শেষ রশ্মিচ্ছটা তাঁর অতীত জীবনের পূর্ব দিগন্তকে বেদনায় রঞ্জিত করে দিয়েছিল। 'তারা চললো ভেসে হেসে হেসে' এই পর্যায়েরই গান ; বর্ষীয়সী কবির আর্তি ও দীর্ঘশ্বাস এখানে যেন শোকনম্র। তাছাড়া মিশ্র ভীমপলশ্রীতে 'আমার ডাক পড়েছে', মিশ্র ভৈরবীতে 'আমি বাঁধিলাম গান হল না। ও গান গাওয়া', মিশ্র সারঙে 'শীত-শান্ত বেলা' প্রভৃতি গানের মধ্যে দিবাবসানের সেই ব্যথা-বেদনা পুঞ্জীভূত। জীবনের অন্তিম বেলায় মৃত্যুচিন্তার ঘনকৃষ্ণ মেঘমালাকে বিদীর্ণ করে দিয়ে বেদনার সূর্যকিরণগুলি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেও পরম বিদায়ের ক্ষণে নিঃসঙ্গতা তাঁর চিত্তকে অভিভূত করে দিয়েছিল। সাহিত্য-জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে রচিত 'চেয়ে আছি কবে হইবে সেদিন' গানটিতে শেষ বিদায়ের রাগিণী ধ্বনিত ; মৃত্যুচিন্তা-বিষয়ক গানগুলির মধ্যে এটি সম্ভবত প্রথম, সাশ্রুসম্প্রদান কবিতায় (ভারতী, বৈশাখ ১২৮৭) ব্যবহৃত। মৃত্যুর জন্য নিঃসঙ্গ হৃদয়ের প্রতীক্ষা পরবর্তীকালে রচিত নিম্নোদ্ধৃত গানটির পরিমণ্ডলকে যেন বেদনার্দ্র করে দিয়েছে—

শীত-শান্ত বেলা!
শাল-শ্যামল নদী-সৈকত অম্বর মেঘমেলা!
পান্থ আমি অতি শ্রান্ত একেলা বড় একেলা।...
তলায় তলায় তরুবীথিকার ঘন কজ্জল ছায়া,
হৃদয়-অতলে ঘূর্ণিত বেগে তপ্ত স্মৃতির মায়া ;
তার মায়া নাই তবু, মায়া নাই তার গো!
হায়! অসহন দুঃখজ্বালা!
বড় একেলা আমি বড় একেলা।[৪৪]

---

৪৩ নীলগিরি—ভারতী, পৌষ ১৩০২, পৃ ৫১৮-১৯।

৪৪ দ্র গীতিগুচ্ছ, ১ম, পৃ ১২৩। পাঠান্তর দ্রষ্টব্য : বঙ্গের মহিলা কবি, পৃ ৫২-৫৩। বর্তমান পরিচ্ছেদের ২৮ সংখ্যক পাদটীকা (পৃ ৩৮৮) দ্রষ্টব্য।

।১। স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রবন্ধের একটি বড় অংশ প্রধানত বিজ্ঞানবিষয়ক। প্রবন্ধগুলি আলোচনাকালে মনে রাখা প্রয়োজন যে এক্ষেত্রে তাঁর প্রবন্ধবিষয় মূলত ভূতত্ত্ব ও জ্যোতির্বিদ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান আলোচনার প্রথম পর্বে (১৮১৭-৩৩) উপরোক্ত দুটি বিষয় বিশেষ সমাদর লাভ করে। অবশ্য প্রাকৃতিক ভূগোল বা ভূবিদ্যা কিংবা জ্যোতিষশাস্ত্রকে অবলম্বন করে কোনো পূর্ণাঙ্গ পুস্তক ঐ সময়ে রচিত হয়নি, কেবল অবিচ্ছিন্নভাবে কোনো কোনো গ্রন্থে স্থান পেয়েছিল মাত্র। স্বর্ণকুমারীর বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় একমাত্র পুস্তক 'পৃথিবী'র (১২৮৯) মধ্যেও কথিত বিষয়াবলী ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রধানত ইউরোপীয়গণের সহায়তায় বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাত হয়। হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার সময় থেকে (জানুয়ারি ১৮১৭) বিজ্ঞান অধ্যয়ন-অধ্যাপনার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপিত হয়; কলেজের নিয়মকানুন প্রণয়নের নিমিত্ত ১৮১৬ খৃস্টাব্দে যে উপসমিতি গঠিত হয় তার আগস্ট মাসের রিপোর্টে বলা হয়েছিল, The primary object of this institution is the tuition...it the literature and science of Europe and Asia. বিজ্ঞানের মধ্যে ভূগোল আর জ্যোতির্বিদ্যাকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রস্তাব আসে কলেজের অন্যতম হিতৈষী স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইস্টের নিকট থেকে।[১] আবার কলেজের বীক্ষণাগারের জন্য লণ্ডনস্থ বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি কর্তৃক প্রেরিত জ্যোতির্বিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধীয় যন্ত্রপাতি ১৮২৩ সালের এপ্রিলে এসে পড়ল। তখন ঐ যন্ত্রপাতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক প্রণয়নের জন্য স্কুলবুক সোসাইটি (জুলাই ১৮১৭) কলেজ-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হন। ফলত জ্যোতির্বিদ্যা প্রথমাবধি উৎসাহিত হয় এদেশে; আবার জ্যোতির্বিদ্যার সঙ্গে ভূতত্ত্বের একটা পরোক্ষ সম্পর্ক থাকায় বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনাকালে ঐ দুটি বিষয় বিশেষ মর্যাদা পেতে থাকে। ইতিপূর্বে শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত দিগদর্শন (১৮১৮) পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকেই ভূগোল ও অন্যান্য বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়েছে; প্রসঙ্গত পশ্বাবলী (১৮২২), বিজ্ঞান সেবধি (১৮৩২), বিজ্ঞানসার,

---

১ জে. এইচ. হ্যারিংটনকে লিখিত কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টের চিফ জাস্টিস স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইস্টের ১৮ মে ১৮১৬ তারিখের পত্র দ্রষ্টব্য। Brajendra Nath Banerjee, Rammohun Roy as an Educational Pioneer—Journal of the Bihar and Orissa Rsearch Society, Vol. XVI, Pt. II. Jogesh Chandra Bagal, The Hindu College—Modern Review, July 1955, p 57.

সংগ্রহ (১৮৩৩) প্রভৃতিও উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। স্কুলবুক সোসাইটির উদ্যোগে প্রকাশিত প্রথম বিজ্ঞানগ্রন্থ হল রবার্ট মে কর্তৃক লিখিত মে-গণিত বা অঙ্কপুস্তকং (১৮১৭) ; উইলিয়ম হপকিন্স পিয়ার্সের ভূগোল বৃত্তান্তও (১৮১৯) সোসাইটির উৎসাহে প্রকাশিত হয়। সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ ও বিভিন্ন গ্রন্থ মুদ্রণের ফলে বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার পথ ক্রমশ প্রশস্ত হতে থাকে। জন ক্লার্ক মার্শম্যানের জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায়ে (২য় সং ১৮১৯) জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রাধান্য না পেলেও পাশ্চাত্য রীতিতে রচিত গ্রন্থটি একটি প্রশংসনীয় প্রয়াস ; জন পিয়ার্সনের ভূগোল এবং জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয়ক কথোপকথন (১৮২৪) গ্রন্থটির বিষয়-বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। উইলিয়ম ইয়েটস-অনূদিত ও সোসাইটি কর্তৃক ১৮৩৩ সালে প্রকাশিত জেমস ফার্গুসনের জ্যোতির্বিদ্যা (An Easy Introduction to Astronomy for Young Persons) পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে বাংলায় লিখিত তৎকালীন সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় গ্রন্থ ; এর মধ্যে আহ্নিক ও বার্ষিক গতি, দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি, ঋতুপরিবর্তন, জোয়ার-ভাঁটা, গ্রহাদির দূরত্ব ও দীপ্তি, সৌর আকর্ষণ প্রভৃতি বিষয় স্থান পায়। পরবর্তীকালের আরও কতিপয় উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ ও গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হল : অক্ষয়কুমার দত্তের ভূগোল (১৮৩১) এবং চারুপাঠ (১ম থেকে ৩য় খণ্ড, ১৮৫৩-৫৯) ; ভূতত্ত্ববিদ্যা (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ ১৭৮৪ শক) ; ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র (ঐ, জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৫ শক) ; বুধের গতি-ব্যতিক্রম (ঐ, ভাদ্র ১৮০৫ শক) ; কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্যাকল্পদ্রুম (৩য় ও ৮ম খণ্ড) ; বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিজ্ঞানরহস্য (১৮৭৫) ; গিরিশচন্দ্র বসুর ভূতত্ত্ব (১ম ভাগ, ১২৮৮) ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ ভূবিজ্ঞান গ্রন্থ হল গিরিশচন্দ্র বসুর ভূতত্ত্ব প্রথম ভাগ। কেবল বিষয়বিন্যাসে নয় পরিভাষা ব্যবহারেও লেখকের কৃতিত্ব প্রশংসনীয় ; ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে তথ্যনির্ভর তত্ত্বালোচনার একটি সুপরিকল্পিত প্রয়াসের প্রমাণ পাওয়া যাবে গ্রন্থটিতে। স্বর্ণকুমারীর 'পৃথিবী' গ্রন্থটি এর অব্যবহিত পরবর্তীকালে প্রকাশিত, অবশ্য এর মধ্যে কেবল ভূবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনাই স্থান পায়নি। ১৭৮৪ শকের বৈশাখ সংখ্যা থেকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় 'ভূতত্ত্ববিদ্যা' নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে, এই বৃহদাকার রচনাটি বৈশাখ আষাঢ় কার্তিক ও পৌষ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল ; ইতিপূর্বে এবংবিধ বিশালায়তন তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ অন্য কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। ভূত্বকের স্তরবিভাগ, পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ অবস্থা, ভূত্বকের পরিবর্তন ও বিভিন্ন স্তরের গঠনপ্রকৃতি, স্তরসমূহের অন্তর্গত উদ্ভিদ ও প্রাণী ইত্যাদির পরিচয় নানা প্রসঙ্গে রচনাটিতে সন্নিবেশিত। প্রায় সদৃশ বিষয় অবলম্বনে স্বর্ণকুমারীর 'ভূপঞ্জর' এবং 'ভূগর্ভ' নামক দুটি বড় প্রবন্ধ রচিত হয় (ভারতী, ১২৮৭)। লেখিকার জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় রচনায় সম্ভাব্য আদর্শ হল ১৭৯৫ শকের

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা থেকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র' প্রবন্ধটি। রচনাটিতে দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তার প্রতিফলন আছে।[২] পৃথিবীর পরিণাম (ভারতী, ১২৮৭) নামক প্রবন্ধের মধ্যে অক্ষয়কুমারের চারুপাঠের উল্লেখ আছে, "শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তৃতীয় ভাগ চারুপাঠের ১২৭ পৃষ্ঠায় জোয়ার-ভাঁটা শীর্ষক প্রস্তাবে বলিয়াছেন, 'চন্দ্র অবশ্যই পৃথিবীর স্থলজল উভয় ভাগই আকর্ষণ করে কিন্তু স্থলভাগ কঠিন ও দৃঢ়, এ নিমিত্ত বিচলিত হয় না। জলভাগ অতিশয় তরল এইজন্য চন্দ্রের আকর্ষণে চালিত ও স্ফীত হয়।' ওই পুস্তকের ১২৯ পৃষ্ঠায় তিনি আবার বলিয়াছেন, 'পৃথিবীর কেন্দ্র…চন্দ্র কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া চন্দ্রের দিকে উত্থিত হয়।' এই দুইটির অর্থ পরস্পরবিরোধী, বোধ হয় কেবল ভাষা সংক্ষেপ করিবার জন্যই ওরূপ অর্থের বৈপরীত্য হইয়াছে। তবে অক্ষয়বাবু যে বলিয়াছেন চন্দ্রের আকর্ষণে জল চালিত হয় ইহা ঠিক নহে।' পরমত অনুসরণ-স্বীকরণ বা বাদ-প্রতিবাদের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট স্থান অধিকার করে নিয়েছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী, এবং তাঁর এবংপ্রকার অনুশীলন আদৌ আকস্মিকতাপ্রসূত নয়।

॥২॥ পুত্রকন্যাগণের বিজ্ঞানচর্চার ব্যাপারে মহর্ষিদেবের পর্যাপ্ত উৎসাহ দানের কথা স্বীকার করেছেন দুহিতা স্বর্ণকুমারী, 'তিনি মধ্যে মধ্যে অন্তঃপুরে আসিয়া আমাদিগকে সরল ভাষায় জ্যোতিষ প্রভৃতি বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। তিনি যাহা শিখাইতেন তাহা আমাদিগকে নিজের ভাষায় লিখিয়া তাঁহারই নিকট পরীক্ষা দিতে হইত। ছাত্রদিগের মধ্যে আমিই ছিলাম সর্বাপেক্ষা ছোট নগণ্য ব্যক্তি। সেইজন্য পরীক্ষাতে সকলের সমান হইবার জন্যও আমার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মিত। কিন্তু পরীক্ষার নম্বর আমরা কেহ জানিতে পারিতাম না।' দেবেন্দ্রনাথের এইজাতীয় শিক্ষাদানপদ্ধতি সম্বন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছেন, 'তাঁহার তেতলার বসিবার ঘরে দিনকতক তিনি আধুনিক জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে আমাদিগকে ধারাবাহিকরূপে মৌখিক উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন।'[৩] পরবর্তীকালে হিমালয়-ভ্রমণের সময় বালক রবীন্দ্রনাথকেও 'তিনি প্রকটরের লিখিত সরলপাঠ্য ইংরেজি জ্যোতিষগ্রন্থ হইতে অনেক বিষয় মুখে মুখে' বুঝিয়ে দিতেন, আবার কখনো বা আকাশের 'গ্রহতারকা চিনাইয়া দিয়া জ্যোতিষ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন।'[৪] ভূতত্ত্বেও দেবেন্দ্র-নাথের একটা গভীর অধিকার ছিল, এ সম্পর্কে একজন অথরিটি বা 'গুরু'রূপে তিনি আনন্দ-

২ সজনীকান্ত দাস, রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য, পৃ ১৯৫।

৩ পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবনস্মৃতি—প্রবাসী, মাঘ ১৩১৮, পৃ ৩৮৭।

৪ দ্র হিমালয়যাত্রা—জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ।

মোহন বসুর নিকট একদা আত্মপরিচয় প্রদান করেন। শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন, 'মহর্ষি যে আপনাকে ভূতত্ত্ব বিষয়ে গুরু বলিয়াছেন এই ঠিক কথা। কারণ তাঁহার কন্যা স্বর্ণকুমারী নিজের রচিত পৃথিবী নামক গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে লিখিয়াছেন যে মহর্ষির ক্রোড়ে বসিয়াই তিনি ভূতত্ত্ববিদ্যায় অনুরাগিণী হইয়াছেন।'[৫] অবশ্য পৃথিবী গ্রন্থের মধ্যে এরূপ কোনো স্পষ্ট উল্লেখ নেই, তবে উপহারপত্রে 'পরমারাধ্য শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর / পিতৃদেব শ্রীচরণকমলেষু' ইত্যাদি লিখিত আছে। অতঃপর তিনি বলেছেন—

বিজ্ঞান-জগৎ-মাঝে স্খলিতচরণ
ক্ষীণ হস্ত বাড়াইয়ে কি পাইনু কুড়াইয়ে দেখ, দেব, একবার মেলিয়ে নয়ন।
মা আমার নাই আর, ছুটে যাব কাছে যাঁর, জনক জননী, দেব, তুমিই আমার,
পূজিতে চরণ তব আজিকে আগ্রহ নব এসেছি পিতা গো নিয়ে এই উপহার।

গ্রন্থের বিষয়গত অভ্যন্তরীণ প্রমাণ থেকেও বোঝা যায় যে ভূতত্ত্ব জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি আলোচনাকালে লেখিকা পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন।

ব্যক্তিগতভাবে দেবেন্দ্রনাথ একটি মহদুদ্দেশ্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে এইজাতীয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হন। মহর্ষির সান্নিধ্যধন্য দেরাদুন-মুসৌরী সার্ভে অফিসের কম্পিউটার কালীমোহন ঘোষ ১৮৭৫ সালের একটি অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে বলেছিলেন, 'মহর্ষি কেবল ধার্মিক ও দার্শনিক ছিলেন না। জ্যোতির্বিদ্যাদি বিজ্ঞানে ভগবানের মহিমা ও তত্ত্বজ্ঞান বর্ণিত আছে বলিয়া তিনি একজন বিজ্ঞানপিপাসু ছিলেন।'[৬] বিজ্ঞানরহস্য এবং পরমার্থজিজ্ঞাসা তাঁর নিকট ছিল বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় একদা 'ঈশ্বরের মহিমা' এই শিরোনামাঙ্কিত পর্যায়ে বিজ্ঞানের বিচিত্র প্রসঙ্গ পরিবেশিত হত। অজিতকুমার চক্রবর্তী দেবেন্দ্র-জীবনীতে বলেছেন, '১৮৯৩ সালে পার্কস্ট্রীটের বাড়ীতে থাকিবার সময় বাড়ীর ছেলেমেয়েদের কাছে গল্প বলার ছলে জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি সম্বন্ধে তিনি ধারাবাহিকভাবে যে উপদেশগুলি দিয়াছিলেন তাহা পড়িলে তাঁহার মনের প্রসার দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া যাইতে হয়।' 'জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি' গ্রন্থের উপদেশমালা পাঠকালে জ্যোতি-বিজ্ঞান ভূতত্ত্ব নৃতত্ত্ব জীবতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথের সুগভীর অধিকার এবং 'এই সমস্ত ধারাটির ভিতর দিয়া ঈশ্বরের বিধান কেমন করিয়া মানুষের জগতে কাজ করিতেছে এবং মানুষ কেমন করিয়া উন্নতি হইতে উন্নতির সিঁড়িতে উঠিতেছে তাহা' উপলব্ধ হয়।[৭]

---

৫ শিবনাথ শাস্ত্রী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, ১৩১৭, পৃ ২৩।

৬ দ্র অজিতকুমার চক্রবর্তী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯১৬, পৃ ৫৮৫।

৭ ঐ, পৃ ৬৩০-৩৪। 'জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি' (বৈশাখ ১৮১৫ শক) গ্রন্থে 'চৌদ্দটি উপদেশ আছে। প্রথমটি ১১ ফাল্গুন ১৮১২ এবং সর্ব্বশেষটি ৮ আষাঢ় ১৮১৩ শকে প্রদত্ত হয়।'— দ্র সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা,

কি উপায়ে মানুষের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি বিচিত্রভাবে সার্থকতা লাভ করে চলেছে এবং কিভাবে বিজ্ঞানের ভিতর দিয়ে বিধাতার সৃষ্টির অভিপ্রায় ক্রমশ সুন্দর পরিণামের অভিমুখে ধাবমান 'জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি' গ্রন্থে তা প্রদর্শিত। আবার বিজ্ঞান সভ্যতা ও ধর্মের অভিব্যক্তিমূলক ইতিহাসরচনা বা তাদের সমন্বয়সন্ধান গ্রন্থটির একমাত্র প্রতিপাদ্য ছিল না, গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ঈশ্বরের মঙ্গলময় বিধান কি উপায়ে জগতের মধ্যে কাজ করে চলেছে তা নির্ণয় করা এবং সেদিক থেকে সমূহ ইতিহাসের পর্যালোচনা ও পুনর্বিচার করা। শেষ বয়সে দেবেন্দ্রনাথের চিত্তে এই বাসনাটি সুতীব্র হয়ে উঠে। প্রকৃতপ্রস্তাবে বিজ্ঞানের মাধ্যমে পরম সত্য ও বিশ্বরহস্য উপলব্ধির আকাঙ্ক্ষাই ছিল দেবেন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচর্চার প্রধান লক্ষ্য।

বস্তুবিজ্ঞান ও অধ্যাত্মদর্শনকে সমন্বিত করার এই দুরূহ অভিপ্রায়টি স্বর্ণকুমারীর প্রবন্ধাবলীতেও লক্ষিত হয়। 'পৃথিবীর উৎপত্তি' নামক প্রবন্ধের (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮০২ শক) প্রারম্ভে তিনি বলেছিলেন, 'না ছিলে এসব কিছু, আঁধার ছিল অতি ঘোর দিগন্ত প্রসারি / ইচ্ছা হইল তব ভানু বিরাজিল, জয় জয় মহিমা তোমারি। / এই চিন্তা দ্বারা মনুষ্যের মনুষ্যত্ব উত্তেজিত হইয়া উঠে, এ চিন্তা দ্বারা এই ক্ষুদ্র পৃথিবীবাসী ক্ষুদ্রতম মনুষ্য সৌরজগৎ অতিক্রম করিয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে উপস্থিত হয়। এ বিষয় চিন্তা করিবার সময় কেবলমাত্র উপরোক্ত বাক্য কয়েকটি অন্ধভাবে হৃদয়স্থ করিয়াই যে আমাদের উদ্দীপিত কৌতুহল নিবারিত হয় তাহাও নহে, আমরা সাধ্যমত এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও উৎপত্তির প্রণালী বুদ্ধির আয়ত্তাধীন করিতে চেষ্টা করিব।' বুদ্ধির আশ্রয়ে ও বৈজ্ঞানিক উপায়সম্মত বিশ্লেষণের দ্বারা পরমার্থ উপলব্ধির প্রয়াস এবং বিশ্বরহস্য সমাধানের বাসনা উল্লিখিত সাধারণ নির্বচনের (general statement) নির্যাস। 'পৃথিবীর পরিণাম' প্রবন্ধের মধ্যে তিনি বলেছেন, যদিও ক্রমাগত উত্তাপ বিক্ষেপের ফলে সূর্যের আয়তনের ক্রমহ্রাসমানতার আশঙ্কা পার্থিব বস্তুসমূহ তথা মানবজাতির ভবিষ্যৎকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলেছে, তথাপি 'প্রকৃতপক্ষে এই মঙ্গলময় ঈশ্বরের রাজ্যে কিছুই একেবারে বিনষ্ট হয় না, রূপান্তরিত হয় মাত্র'। এক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বচর্বণার সঙ্গে সঙ্গে সমূহ নৈরাশ্যময় পরিণামের মধ্যেও তিনি পরম কারুণিকের স্নেহস্পর্শের সন্ধান করে চলেছেন। পৃথিবী গ্রন্থের ক্রোড়পত্রে ঋগ্বেদের যে শ্লোকটি উদ্ধৃত হয় তার অর্থ এইরূপ : 'সর্বপ্রথমে অন্ধকারের

৪৫শ, পৃ ১১২। এর প্রথম উপদেশে (সৃষ্টি) গ্রহনক্ষত্র প্রসঙ্গ, দ্বিতীয়টিতে (পৃথিবী) পৃথিবীর উদ্ভবরহস্য, তৃতীয়ে (অন্নময় কোষ) জড় জগতের কথা, চতুর্থটিতে (প্রাণময় কোষ) উদ্ভিদ জগতের কথা, পঞ্চমে (মনোময় কোষ) প্রাণীজগৎ, ষষ্ঠে (বিজ্ঞানময় কোষ) মানুষ ও মনস্তত্ত্বপ্রসঙ্গ বর্তমান। অবশিষ্ট অধ্যায়গুলিতে মনুষ্যজাতির ইতিহাস বিবৃত।

দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্নবর্জিত ও চতুর্দিকে জলময় ছিল। অবিদ্যমান বস্তুদ্বারা সেই সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন।'[৮] এর তাৎপর্য এই যে বিজ্ঞানচিন্তা ও বিশ্বরহস্যজিজ্ঞাসা লেখিকার নিকট ছিল অপৃথক। মহর্ষির ব্যক্তিগত ভাবনা ও বিজ্ঞানচিন্তা-প্রণালীর সান্নিধ্য-সংস্পর্শ লাভ করে স্বর্ণকুমারীর এরূপ মানসিকতা গঠিত ও সুপরিণত হয়ে উঠেছিল।

পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের আলোচনার ব্যাপারে কন্যা হিরণ্ময়ী ও জামাতা ফণিভূষণ লেখিকাকে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করেন। হিরণ্ময়ী 'মাতৃদেবীর সাহায্যার্থে তাঁহার অন্তরালে থাকিয়া ভারতীর সেবা আরম্ভ' করার সময় 'পাস্তরের ইনস্টিটিউট প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক বিষয়ের অবতারণা' করে যুগপৎ সেকালের সাময়িকপত্রকে এবং বাংলায় বিজ্ঞানচর্চাকে সমৃদ্ধ করে তুলেন।[৯] বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র ও অধ্যাপক ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৬০-১৯২৭) লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮৮১ সালে উদ্ভিদবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্রে অনার্স এবং রসায়নে স্বর্ণপদকসহ বি. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; স্বর্ণকুমারীর পদার্থতত্ত্ববিষয়ক কয়েকটি রচনার সঙ্গে ভারতীতে মুদ্রিত ফণিভূষণের কতিপয় প্রবন্ধের চিন্তা-সিদ্ধান্তের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। দেবেন্দ্রনাথের অন্যতম অনুগ্রহভাজন ও ভারতীতে হিন্দু-তড়িৎজ্ঞান সম্বন্ধীয় গবেষণামূলক প্রবন্ধাবলীর লেখক সীতানাথ ঘোষের সঙ্গে লেখিকার বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। গণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ কালীমোহন ঘোষের সম্বন্ধে লেখিকা তাঁর পৃথিবী গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, 'ডেরাডুনের ভারতবর্ষীয় সর্বে অফিসের সুযোগ্য গণিতজ্ঞ এবং জ্যোতিষী শ্রীযুক্ত বাবু কালীমোহন ঘোষ মহাশয় এই পুস্তকের প্রথম দুই অধ্যায়ের প্রুফ সংশোধন করিয়া যে সাহায্য করিয়াছেন সে নিমিত্ত এই স্থলে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।' কেবল সমকালীন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকবৃন্দের সান্নিধ্যলাভ নয়, এই শাস্ত্র-অনুশীলনে তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যম ও অধ্যবসায়ের কথাও স্মরণযোগ্য। বঙ্গমহিলাগণের মধ্যে তিনি সম্ভবত সর্বপ্রথম 'বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ' রচনা করেন।[১০] এই ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ যে কি পরিমাণ তীব্র ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় একটি প্রসঙ্গ থেকে। ১২৯৯ সালের ভারতী ও বালকের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় মুদ্রিত ইথর-শীর্ষক প্রবন্ধের শেষে লেখক শ্রীপতিচরণ রায় বলেছিলেন, 'ইথর সম্বন্ধে ভিন্নমত প্রচলিত থাকিলেও ইহার অস্তিত্ব অবিসংবাদিত।' পাদটীকায় ভারতী-সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী মন্তব্য করেন, 'সম্প্রতি শুনা যাইতেছে যে স্যার

৮ দ্র ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১১শ অনুবাকের ১২৯ শ সূক্তের ৮ম অষ্টকের ৭ম অধ্যায়ের ১৭শ বর্গের অন্তর্গত শ্লোক ('তমআসীত্তমসা গূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতং' প্রভৃতি)। বর্তমান প্রবন্ধে রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদটি ব্যবহৃত।

৯ দ্র ভারতী, ফাল্গুন ১৩৩২, পৃ ৩৭৩।

১০ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী দেবী—দ্র সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, ২৮ শ, পৃ ১৩।

গ্যাবরিয়েল স্টোকস নাকি কতকগুলি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফল দেখিয়া ইশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দিহান হইয়াছেন। ভাং সং।' বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিকতম আবিষ্কৃত বিষয় সম্বন্ধে লেখিকার উৎসাহ ও ঔৎসুক্য ছিল ব্যাপক এবং গভীর এবং এই উত্তম অধ্যবসায় ও এষণা পরবর্তীকালে পুরস্কৃত হয়েছিল।

।৩। পৃথিবী গ্রন্থের আখ্যাপত্র থেকে জানা যায় যে 'দীপনির্বাণ প্রভৃতি রচয়িত্রী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত' এই গ্রন্থ ১২৮৯ সালের আশ্বিন মাসে (২৭ সেপ্টম্বর ১৮৮২) 'কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীকালিদাস চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত' হয়; দীপনির্বাণের (১২৮৩) প্রায় ছয় বৎসর পরের এই পুস্তকটি তাঁর একমাত্র বিজ্ঞানগ্রন্থ। পাশ্চাত্ত্যে প্রচলিত আদর্শানুসারে বিজ্ঞানের বিচিত্র দুরূহ বিষয়কে সাধারণগ্রাহ্য করার উদ্দেশ্যেই গ্রন্থটি পরিকল্পিত হয়েছিল: 'পৃথিবী সম্বন্ধে আমাদের মনে প্রধানত যেসকল প্রশ্ন উদিত হইতে পারে তাহারি মীমাংসাস্বরূপ প্রচলিত বিজ্ঞানের উপদেশ অনুযায়ী সাধারণের পাঠোপযোগী কতকগুলি প্রবন্ধ গত দুই বৎসরের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ও ভারতীতে প্রকাশিত হয়। সেইগুলি পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করিয়া এক্ষণে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।'

গ্রন্থনিবদ্ধ প্রবন্ধগুলির সাময়িকপত্রের প্রকাশকাল পরিবেশিত হল, গ্রন্থের কোথাও প্রকাশের স্থানকালের কোনো উল্লেখ নেই—উপক্রমণিকা: বিজ্ঞান-শিক্ষা (ভারতী, শ্রাবণ ১২৮৯); সৌরপরিবারবর্তী পৃথিবী (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ ১৮০৩ শক); পৃথিবীর গতিপ্রণালী (ঐ, আষাঢ়-আশ্বিন ১৮০৪ শক); পৃথিবীর উৎপত্তি[১১] (ভারতী, কার্তিক ১২৮৭—পুনঃপ্রকাশ: তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, পৌষ ১৮০২ শক); ভূপঞ্জর: প্রথম-চতুর্থ প্রস্তাব (ভারতী, পৌষ-চৈত্র ১২৮৭); ভূগর্ভ (ভারতী, আশ্বিন ১২৮৭); পৃথিবীর পরিণাম[১১]

১১ প্রবন্ধ দুটি ('পৃথিবীর উৎপত্তি' এবং 'পৃথিবীর পরিণাম') সম্ভবত Our Place among Infinities (Richd. A. Proctor, London, 1875) গ্রন্থের Past and Future of the Earth প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত। ১৮৭৪ সালের ৩ এপ্রিল তারিখে নিউইয়র্কে প্রদত্ত একটি বক্তৃতার সারাংশ এই প্রবন্ধ; এর মধ্যেও প্রকটরের কবিত্ব ও ভাগবতচেতনার সুন্দর সমন্বয়টি পরিলক্ষিত হয়। প্রকটরের একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য: The wave of life which is now pasing over our earth is but a ripple in the sea of life within the solar system ; this sea of life is itself but as a wavelet on the ocean of eternal life throughout the universe,... Utterly incomprehensible how Infinite Purpose can be associated with endless material evolution. But it is no new thought, no modern discovery that we are thus utterly powerless to conceive or comprehend the idea of an Infinite Being, Almighty, All-knowing, Omnipresent, and Eternal, of whose inscrutable purpose the material universe is the unexplained manifestation.—P 34.

(ভারতী, ভাদ্র ১২৮৭) ইত্যাদি। অর্থাৎ পৃথিবী গ্রন্থের রচনাগুলি ১২৮৭ সালের ভাদ্র থেকে ১২৮৯ সালের আশ্বিনের মধ্যে ভারতী ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। যতদূর জানা যায় স্বর্ণকুমারীর বিজ্ঞানবিষয়ক প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ হল 'পৃথিবীর পরিণাম'। লক্ষণীয় যে বিষয়ের পারম্পর্য ও সঙ্গতি রক্ষার জন্য প্রবন্ধটি গ্রন্থের শেষে মুদ্রিত; পক্ষান্তরে মাসিক পত্রিকায় সর্বশেষে প্রকাশিত 'বিজ্ঞান-শিক্ষা' গ্রন্থের উপক্রমণিকারূপে ব্যবহৃত। এসম্বন্ধে লেখিকা বলেছেন, 'অগ্রে মূল গ্রন্থখানি পড়িয়া পরে উপক্রমণিকাটি পড়িলে ভাল হয়, কারণ মূল গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের সহিত উপক্রমণিকাটি এমন বিশেষরূপে জড়িত যে অগ্রে উপক্রমণিকা পড়িলে তাহার স্থানের স্থানের যথার্থ অর্থ সহজে বোধগম্য না হইতে পারে।' বর্তমান গ্রন্থের ভূমিকায় স্বর্ণকুমারী আপনার বিজ্ঞানবিষয়ক রচনার পদ্ধতি এবং তার উপযোগিতা সম্বন্ধে বলেছেন, 'গণিতশাস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত বিজ্ঞানের অন্তরে প্রবেশ করা অত্যন্ত কঠিন, নানা কারণবশত অঙ্কশিক্ষাও সকলের পক্ষে ঘটিয়া উঠে না, বিজ্ঞান এইরূপ কষ্টসাধ্য বলিয়া ইহা বিশ্ববিদ্যালয়েই একরূপ আবদ্ধ। বিজ্ঞানের এই দুরূহ পথ সুগম করিবার জন্য ইউরোপে ও আমেরিকা দেশে গণিতের সাহায্য ব্যতীত যেরূপ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থসকল প্রচার হইতেছে এই পুস্তকখানি সেই প্রকার গ্রন্থের আদর্শানুসারে রচিত।' সর্বজনগ্রাহ্য বিজ্ঞানমূলক রচনার অনুরোধে গণিতের সাহায্য ব্যতিরেকে তিনি কয়েকটি জটিল তত্ত্বের অবতারণাও করেছেন, 'অঙ্কবিদ্যার সাহায্য ছাড়িয়া কোন ইংরাজী গ্রন্থে ক্রান্তিপাতের গতি বুঝান হইয়াছে এরূপ দেখিতে পাই নাই। এ পুস্তকে সে বিষয়ে যত্ন করা হইয়াছে, কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি বলিতে পারি না।'

উপক্রমণিকার বিজ্ঞান-শিক্ষা প্রবন্ধে স্বর্ণকুমারী বলেছেন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পার্থিব বস্তুর তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা থেকেই বিজ্ঞানের সৃষ্টি এবং বস্তুরাজির প্রাকৃতিক তত্ত্ব নিরূপণই বিজ্ঞানের কার্য। 'বিজ্ঞানের উন্নতি না হইলে প্রকৃত জাতীয় উন্নতি হইতে পারে না, বিজ্ঞানের কার্যগত শিক্ষার অভাবেই ইউরোপীয় জাতি হইতে আমরা অনেক বিষয়ে পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছি। যাহাতেই উন্নতি করিতে চাও বিজ্ঞানের জ্ঞান আবশ্যক হইবেই। ·· এই প্রয়োজনের গুরুত্ব যতদিন না ভারতবর্ষীয়গণের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিবে ততদিন আমাদের দেশের যথার্থ উন্নতির আশা নাই। দরিদ্রতাই আমাদের উন্নতির পথের প্রধান কণ্টক। বিজ্ঞানের ক্ষমতাবলেই একমাত্র সে দারিদ্র্যের মোচন হইতে পারে।' বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে যন্ত্রবিদ্যা ও শিল্পের প্রসার ঘটলে আর্থিক উন্নতি অনিবার্য, এর ফলে জাতি অনন্যনির্ভর হতে পারবে; অর্থনৈতিক পরাধীনতার সঙ্গে রাজনৈতিক আনুগত্য ও পরনির্ভরতা অবিচ্ছেদ্য, তাই দেশের সামগ্রিক উন্নতিকল্পে বিজ্ঞান অপরিহার্য। প্রবন্ধের প্রথমাংশে প্রাচীন ভারতবর্ষের অঙ্কশাস্ত্র বীজগণিত জ্যামিতি চিকিৎসাবিদ্যা রসায়ন প্রভৃতি চর্চার ইতিবৃত্ত

উল্লেখিত। আর্যগণের জ্যোতির্বিদ্যানুশীলন প্রসঙ্গে আর্যভট্টের আলোচিত আহ্নিক-বার্ষিকগতি ও ক্রান্তিপাতের বক্রগতির কথা উত্থাপিত; মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতায় solar spots বা সূর্যবিম্ব বা সৌরকলঙ্কের উল্লেখ পাওয়া যায়; ভাস্করাচার্যের মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য। বিষ্ণুর দশাবতারের মধ্যে প্রচ্ছন্ন সৃষ্টিরহস্যের রূপকগত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন স্বর্ণকুমারী; স্মরণীয় যে সমসাময়িককালে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) দশমহাবিদ্যা (১৮৮২) কাব্যে পুরাকথার অন্তরালে মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশের সূত্রসংকেত অনুসন্ধান করেছিলেন। প্রাচীন ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানচিন্তার এই সংক্ষিপ্ত অথচ প্রামাণিক ইতিহাস রচনায় লেখিকা আকর গ্রন্থের উল্লেখসহ প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন এবং এ বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ। অতঃপর ইউরোপীয় আধুনিক বিজ্ঞানচর্চা সম্বন্ধে লেখিকা বলেছেন, 'আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম ইউরোপে।... গ্রীকদিগের বহুকাল অধিকৃত বৈজ্ঞানিক সিংহাসন ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপের অন্যান্য জাতি অধিকার করিয়া লইলেন।' প্রাচীন বিদ্যার পুনর্বিচারের জন্য এই যুগের পণ্ডিতগণকে সংগ্রাম করতে হয়েছিল, কোপার্নিকাস কেপলার ও গেলিলিও এঁদের নেতৃস্থানীয়। তত্ত্বানুসন্ধানে তাঁরা প্রধানত যে আরোহ বা induction-কে স্বীকার করেছিলেন সে সম্পর্কে লেখিকা মন্তব্য করেছেন, 'আরোহী প্রণালী যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসিয়া ক্ষান্ত হয় তাহাতেই অবরোহী প্রণালীর আরম্ভ।'

গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রবন্ধের শিরোনাম 'সৌরপরিবারবর্তী পৃথিবী'; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশকালে এর নাম ছিল 'সৌরপরিবার', পত্রিকায় মুদ্রিত প্রবন্ধের অংশবিশেষ সংশোধিত হয়েছিল গ্রন্থের মধ্যে। সৌরমণ্ডলের স্বরূপ চিন্তাকালে বহুদূরবর্তী বিভিন্ন সূর্য ছায়াপথ এবং তারকাবলীর তুলনায় পৃথিবীর ক্ষুদ্রতাটি তুলে ধরা হয়েছে। এর পর জ্যোতিষ্কের শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ের অবলম্বনে। মহাকাশের জ্যোতিষ্কগুলির পারস্পরিক আকর্ষণ-বিকর্ষণের উল্লেখ প্রসঙ্গে নিউটনের সূত্রাবলী আলোচিত। প্রসঙ্গক্রমে দুটি চিত্র ব্যবহার করে ও চিত্রবিবরণ দিয়ে বিষয়টিকে সহজবোধ্য করে তোলা হয়েছে। লক্ষণীয় যে প্রথমাবধি লেখিকার ব্যক্তিগত ভাবনা আদৌ আচ্ছন্ন ছিল না, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার উপযোগী এই চিন্তামূলক প্রবন্ধটিতে তাঁর ঈশ্বরানুভূতি স্পষ্টীভূত; পক্ষান্তরে লেখিকার স্বানুভূত ভাবনারাজির মধ্যে নিরপেক্ষ যুক্তিনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের এবং প্রবন্ধকারের পরিচয়ও বর্তমান। প্রবন্ধের প্রথমাংশ কবিত্বময়, এমনকি কবিতাংশ দিয়েই এর সূত্রপাত: 'তারকাকনকরুচি জলদ-অক্ষররুচি গীত লেখা নীলাম্বর পাতে। / নিস্তব্ধ নিশীথে অসংখ্য তারকামালা-খচিত অনন্তনীল নভোমণ্ডল দেখিলে সকলেই রোমাঞ্চিত হয়। এমন অসাড়চেতা কেহই নাই যে তাহার মনশ্চক্ষু তারকাপূর্ণ আকাশে পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বরের হস্তাক্ষর-লিখিত অনন্ত

জীবনের অনন্ত কাব্য না পড়ে।' লেখিকার জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার মূলে ছিল এই পরম বিস্ময়বোধ ও বিশ্বজিজ্ঞাসা, সমগ্র সৃষ্টির অভ্যন্তরস্থ এক জ্যোতির্ময় সত্তার অনুসন্ধানে ও অনুভবের মধ্যে সম্ভবত সেই বিশ্বজিজ্ঞাসা তৃপ্ত হয়েছিল।

'পৃথিবীর গতিপ্রণালী' প্রবন্ধে তিনটি চিত্রের সাহায্যে আহ্নিক ও বার্ষিকগতি বোঝান হয়েছে ; তাছাড়া ক্রান্তিপাতের বক্রগতি (Precession of the Equinoxes) ও মেরুলক্ষ্য পরিবর্তনগতির (Nutation) ব্যাখ্যার প্রয়োজনে আরও পাঁচটি চিত্র ব্যবহৃত। 'অঙ্কবিদ্যার সাহায্য ছাড়িয়া' এই শেষোক্ত গতিদ্বয় বিশ্লেষণ দুঃসাধ্য হলেও লেখিকা যথাসাধ্য মনোহর-ভাবে বিষয়টিকে উপস্থাপিত করেছেন। 'পৃথিবীর উৎপত্তি' প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৮৭ সালের কার্তিক সংখ্যার ভারতীতে, এর অল্পকাল পরে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (পৌষ ১৮০২ শক) প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। যদিও '৪র্থ ভাগ ৭ সংখ্যক ভারতী হইতে উদ্ধৃত' এই কয়েকটি কথা তত্ত্ববোধিনীর প্রবন্ধারম্ভে ব্যবহৃত হয়েছে তথাপি উভয় পত্রিকার পাঠের মধ্যে কোনো কোনো স্থলে পার্থক্য বর্তমান। কিন্তু তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও পৃথিবী গ্রন্থের পাঠসাদৃশ্য লক্ষণীয়। ভারতী-পাঠের একস্থলে পাওয়া যায়, 'এখনকার বাষ্পময় সূর্য একেবারে শীতল হইয়া যতদিন ঘন না হইবে ততদিন এই নিয়মানুসারে সে উত্তাপ দিবে, ঘন হইয়া গেলে এ নিয়ম তাহাতে সম্পূর্ণরূপ আর খাটিবে না।' এরূপ বক্তব্যের সমর্থনে তিনি পাদটীকায় একটি অঙ্কশাস্ত্রসম্মত সমীকরণের (equation) অবতারণা করেন ; পরবর্তীকালে অর্থাৎ তত্ত্ববোধিনীতে এবং গ্রন্থে ঐ অংশটুকু বর্জিত হয়েছে। মূল প্রবন্ধে পৃথিবীর উদ্ভব-সম্বন্ধীয় প্রচলিত যাবতীয় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অবতারণা করেছেন লেখিকা, প্রসঙ্গত কাণ্ট হার্শেল প্রভৃতির মতবাদ পরিবেশন করা হয়েছে। প্রবন্ধের শেষাংশ দেখে বোঝা যায় লেখিকা জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে ক্রমশ ভূতত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠছেন, এর পরবর্তী প্রবন্ধগুলি থেকেও তা সমর্থিত হয়।

পৃথিবীর ত্বক ও তার গঠনবিপর্যয়ের বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায় 'ভূপঞ্জর' প্রবন্ধের চারটি প্রস্তাব পাঠকালে। ভূপঞ্জরের উপাদানের শ্রেণীভাগ করা হয়েছে প্রথমে, আবার পৃথিবীর পরিবর্তনের যুগভাগ ও পৃথিবীর জীবনকালের পর্যায়বিশ্লেষণও প্রদত্ত ; অতঃপর বিস্তৃতভাবে প্রত্যেকটি শ্রেণী-যুগ-পর্যায়ের বিবরণ দিয়েছেন লেখিকা। 'ভূগর্ভ' শীর্ষক রচনায় পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগের স্বরূপ উদ্ঘাটনকালে বিভিন্ন মত বিশ্লেষিত। গ্রন্থের সর্বশেষ প্রবন্ধ 'পৃথিবীর পরিণাম'। যতদূর জানা যায় পত্রিকায় মুদ্রিত তাঁর প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এইটি, প্রবন্ধটির বহু তথ্য সংশোধিত ও মার্জিত হয়েছিল গ্রন্থপ্রকাশের কালে।

॥৪॥ ভারতী পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় যে কয়েকটি পদার্থবিদ্যা জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় অথচ যেগুলি ইতিপূর্বে কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়নি তন্মধ্যে

উল্লেখযোগ্যগুলি এইরূপ : প্রলয় (ভারতী, আশ্বিন ১২৮৯) ; অন্যান্য গ্রহগণ নিবাসভূমি কি না (ঐ, জ্যৈষ্ঠ ১২৯১) ; পদার্থের চতুর্থ অবস্থা বা কিরন্ত পদার্থ (ঐ, শ্রাবণ ১২৯১) ; সৌর জগতে কত চাঁদ (ভারতী ও বালক, আষাঢ় ১২৯৩) ; তারকা-জ্যোতি (ঐ, পৌষ ১২৯৪) ; তারকারাশি (ঐ, মাঘ ১২৯৪) ; যমক এবং বহুসঙ্গিক তারকা (ঐ, ফাল্গুন ১২৯৪) ; পরিবর্তনশীল তারকা (ঐ, চৈত্র ১২৯৪) ; তারকাবর্ণ ও তারকার নির্মাণ-উপাদান (ঐ, বৈশাখ ১২৯৫) ; তারকাগুচ্ছ (ঐ, আষাঢ় ১২৯৫) ; নীহারিকা (ঐ, শ্রাবণ ১২৯৫) ; সূর্য (ঐ, আশ্বিন ১২৯৫) ; সূর্য (ঐ, অগ্রহায়ণ ১২৯৫) ইত্যাদি। এই তালিকার অন্তর্গত নক্ষত্রজগৎ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলির উৎস হল প্রকটরের হাফ আওয়ার্স উইথ দি টেলিস্কোপ (১৮৬৮) গ্রন্থটি। একই লেখকের আওয়ার প্লেস অ্যামং ইনফিনিটিজ (১৮৭৫) গ্রন্থের নিউ থিওরি অফ লাইফ ইন আদার ওয়ার্লডস নামক প্রবন্ধটি অবলম্বনে স্বর্ণকুমারীর 'অন্যান্য গ্রহগণ নিবাসভূমি কি না' রচিত। বিষয়বস্তুর দিক থেকে 'পদার্থের চতুর্থ অবস্থা বা কিরন্ত পদার্থ' বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ; সম্ভবত পদার্থবিদ্যা সম্পর্কিত অন্য কোনো প্রবন্ধ স্বর্ণকুমারী রচনা করেননি।

'তারকা-জ্যোতি' প্রবন্ধে বিভিন্ন তারকার ঔজ্জ্বল্য বা বর্ণবৈষম্যের কারণ নির্দেশিত। সমায়তন তারকারাজির মধ্যে দূরত্বের ভিন্নতা, সমদূরত্ববিশিষ্ট তারকাগুলির আয়তনের পার্থক্য, কিংবা অসম আয়তন ও অসম দূরত্ব এই বর্ণস্বাতন্ত্র্যের কারণ ; বলাবাহুল্য এই ত্রিবিধ হেতুর উপর নির্ভর করে তিনি তারকার শ্রেণীবিভাগ করেছেন। পৃথিবী গ্রন্থের 'সৌরপরিবারবর্তী পৃথিবী' প্রবন্ধেও ইতিপূর্বে জ্যোতিষ্কবিন্যাস করা হয়েছিল। 'তারকারাশি' প্রবন্ধ রচনায় যে কালীমোহন ঘোষের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল সেকথা স্বীকার করা হয়েছে। 'যমক এবং বহুসঙ্গিক তারকা'য় দুটি, 'তারকাগুচ্ছে' একটি ও 'নীহারিকা' প্রবন্ধে একটি চিত্র ব্যবহৃত ; সূর্য-বিষয়ক প্রবন্ধের প্রথম প্রস্তাবেও একটি চিত্র বর্তমান। ভারতী ও বালকে (১২৯৫) সূর্য-বিষয়ক যে দুটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হয় তা পূর্বে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৮০৩ শকের ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে "সূর্য" নামক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল,—এ প্রবন্ধটি তাহারি দ্বিতীয় সংস্করণ।'[১২] ভারতী ও বালকের আশ্বিন সংখ্যার প্রবন্ধটি সংশোধিত ও পরিমার্জিত হয়েছিল সত্য, কিন্তু অগ্রহায়ণে মুদ্রিত অংশটুকু তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত রচনার প্রায় পুনর্মুদ্রণ ; এখানে যে একটিমাত্র চিত্র পরিবেশিত হয় তা তত্ত্ববোধিনীতে ছিল না। তত্ত্ববোধিনীর প্রবন্ধের 'সূর্যের দূরত্ব আয়তন ও ভার' নামক অধ্যায়টি ভারতী ও বালকে পৃথকভাবে

১২ ভারতী ও বালক, আশ্বিন ১২৯৫, পৃ ৩২৫, পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

পাওয়া যায় না, এ সম্পর্কে যেটুকু বিবরণ আছে তাও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ; পক্ষান্তরে ভারতীর 'সৌরকলঙ্ক' অধ্যায়টি প্রভূত তথ্যসহকারে বিস্তৃততরভাবে রচিত। উভয় পত্রিকায় মুদ্রিত প্রবন্ধের মধ্যে যে তারতম্য লক্ষিত হয় তার তুলনামূলক আলোচনাকালে দেখা যায় যে ভারতীর অংশটুকুতে বিস্ময়াবেগ অপেক্ষাকৃত স্তিমিত বা সংযত; প্রায় সাত বৎসরের পরবর্তীকালের রচনাংশে যুক্তিশাসিত বিস্ময়বোধ ও তথ্যসমৃদ্ধ কল্পনার মর্যাদাকেই স্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়েছিল।

প্রলয়[১৩] নামক প্রবন্ধটি নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। প্রভূত কৌতুককর তথ্য অবতারণা এবং নীরস বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে সরসভাবে পরিবেশন করার এবংবিধ প্রয়াস ইতিপূর্বে আর কোনো প্রবন্ধে লক্ষিত হয় না। বিভিন্ন সময়ে ধূমকেতুর আবির্ভাবের ফলে পৃথিবীর যে বিনাশের সম্ভাবনা বারবার দেখা দিয়েছিল সে সম্পর্কে বহুবিধ কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ দিয়েছেন লেখিকা, এর ফলে তৎকালীন মানবসমাজে যে চাঞ্চল্য ও প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তারও কৌতুকপ্রদ অনেক ঘটনা এ প্রবন্ধে পাওয়া যায়। প্রস্তাবনাটি চমৎকার : 'পৃথিবীর বুঝি একটি পুঁটিমাছের প্রাণ, তাই হাতের টিপে সকলে এক-একবার ইহার প্রাণ পরীক্ষা করিতে যান। কখন যে ইহাকে কার হাতে মরিতে হয়, বেচারা সদাই ভয়ে ভয়ে সারা! একেবারে মরিয়া গেলে ছাই বিপদ চুকিয়া যায়—তাহাও হইবে না। কাপুরুষের মৃত্যু-ভয়ের ন্যায় সদাসর্বদা ভয়ে ভয়েই পৃথিবী মরিতেছেন। কেননা লোকের কথায় ইহার মৃত্যু, লোকও অগণ্য, কথা ফেলিতেও মূল্য লাগে না, সুতরাং পৃথিবীর আর নিস্তার নাই। তা যদি পৃথিবীর একার ঘাড়ের উপর দিয়াই চুকিয়া যাইত তো কোন গোলযোগ ছিল না। দিনের মধ্যে সহস্রবার করিয়া মারিয়া পোড়াইতে গেলেও আমরা কথা কহিতাম না। দুঃখের মধ্যে পৃথিবী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও টানেন। আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবনের মধ্যেই যে কতবার আমরা পৃথিবীকে মরিতে মরিতে বাঁচিয়া উঠিতে দেখিলাম, পৃথিবীর কত ফাঁড়াই যে উতরিয়া গেল তাহার ঠিক নাই। মাদার শিপটন, ন্যায়চাঁদ পরামানিক, গোবর্ধন দাস প্রভৃতি বাজে লোকের কথায় তো অসংখ্যবার পৃথিবীকে ত্রাহি ত্রাহি করিতে হইয়াছে ; তাহার পর বৈজ্ঞানিক বড় বড় লোকের দোহাই দিয়াও অনেকে অনেকবার ইহার প্রতি অস্ত্র তুলিতে ক্রটি করেন নাই। এইরূপে এক ধূমকেতু হইতে কতবার যে পৃথিবীর প্রলয়-আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে তাহার ঠিক নাই।' কথ্যভঙ্গি-আশ্রিত এই রচনারীতির অন্তরালে আত্মগোপন করে আছে বৈজ্ঞানিক তথ্যপ্রবণ যুক্তিনিষ্ঠ মানসিকতা।

১৩ এর সম্ভাব্য উৎস হল প্রকটরের Familiar Science Studies (1881) গ্রন্থের A Menacing Comet প্রবন্ধটি।

চলিত বাগ্‌ভঙ্গি, বিশেষত বাগ্বিধি এবং বাংলা ভাষার নিজস্ব ঐশ্বর্য সেকসপীয়রীয় প্রবাদ-বাক্যকে পর্যন্ত আত্মসাৎ করে নিয়েছে; বিষয়বস্তুর উপর অগাধ অধিকারবশত প্রবল আত্মবিশ্বাস, বক্তব্য পরিস্ফুটনে কুণ্ঠাহীনতা এবং মানসিক প্রসন্নতাটুকুও লক্ষণীয়। বর্তমান প্রবন্ধে ১৭৭৩, ১৮৩২ ও ১৮৭২ খৃস্টাব্দের ধূমকেতুর আবির্ভাবের তথ্য দেওয়া হয়েছে। কোনো একটি প্রলয়াশঙ্কায় ভলতেয়ার একদা যে ক্ষুরধার ব্যঙ্গ করেন তার অংশবিশেষের অনুবাদ প্রবন্ধে ব্যবহৃত এবং প্রয়োজনমত ভলতেয়ার থেকে উদ্ধৃতিও দেওয়া হয়েছে। যেমন, "ce qui est defféré n'est past perdu—একটি ঘটনা ঘটিতে বিলম্ব হইল বলিয়া যে তাহা একবারেই ঘটিবে না তাহা নহে" ইত্যাদি। ধূমকেতুর আবির্ভাবজনিত প্রলয়াশঙ্কা দূরীকরণে বৈজ্ঞানিকগণের ব্যর্থ প্রয়াসকে ঠাট্টা করা হয়েছে প্রবন্ধে। ধূমকেতু সম্পর্কিত প্রকটরের প্রবন্ধ যে ভীতি সঞ্চার করে এবং 'আমার বন্ধু চন্দ্রশেখরবাবু', ম্যানচেস্টারের বিশপ, স্পেক্টেটর পত্রিকা প্রভৃতিতে তার যে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় তারও সরস বর্ণনা আছে। পরে প্রকটরের মূল বক্তব্য বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করে লেখিকা দেখিয়েছেন যে বৈজ্ঞানিকের প্রবন্ধটির অপব্যাখ্যার দ্বারা মানুষকে কতখানি বিভ্রান্ত করা হয়েছিল। বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহারে লেখিকা বলেছেন, 'স্যার ওয়ালটর রলি কারাগারে বসিয়া পৃথিবীর ইতিহাস লিখিতে লিখিতে বাহিরে দুইজন মিস্ত্রিকে ঝগড়া করিতে দেখিয়াছিলেন। সেইদিনই অমনি প্রতিজনের মুখে ঐ এক ক্ষুদ্র ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন কারণ শুনিয়া তিনি আশ্চর্য হইলেন—তাঁহার ইতিহাস লিখিবার উৎসাহ ভঙ্গ হইল। ভাবিলেন, তাঁহার চক্ষের সামনে যাহা ঘটিল তাহারি যখন কারণের ঠিক নাই তখন অতীত কথায় সত্যতার প্রমাণ কোথায়? রলি যদি তাহাতেই আশ্চর্য হইয়া থাকেন তো বৈজ্ঞানিকদিগের লিখিত একটি কথার মধ্য হইতে আর একটি কথা উঠিতে দেখিয়া কে না অধিক আশ্চর্য হইবে?' বস্তুত স্বর্ণকুমারীর প্রবন্ধটি আগাগোড়া তাঁর মানসিক আভিজাত্য বৈদগ্ধ্য ও প্রসন্নতার পরিচয় বহন করছে যা তৎকালীন বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধের ক্ষেত্রে একান্তই বিরল ছিল।

'প্রলয়' প্রবন্ধে প্রকটরের মিথস এণ্ড মার্ভেলস অফ এষ্ট্রনমি নামক গ্রন্থের উল্লেখ আছে।[১৪] প্রকটরের প্রবন্ধের মত স্বর্ণকুমারীর রচনায়ও বিজ্ঞানচিন্তা এবং ঈশ্বরানুগত্যের যে সংমিশ্রণ লক্ষিত হয় তা পূর্বে বলা হয়েছে। 'অন্যান্য গ্রহগণ নিবাসভূমি কি না' প্রবন্ধে লেখিকা প্রকটরের এরূপ একটি উদ্ধৃতির অনুবাদ ব্যবহার করেছেন, 'ইহা অতি আশ্চর্য যে আমরা মুখে বলিবার সময় ঈশ্বরের মঙ্গলময় ভাব তাঁহার সৃষ্ট বস্তুমাত্রেতেই অর্পণ করি এবং তাঁহাকে অসীম জ্ঞানবান অসীম ক্ষমতাবান বলিয়া থাকি, অথচ অন্য লোকে প্রাণী আছে কি না এবিষয়

১৪ দ্র ভারতী, আশ্বিন ১২৮৯, পৃ ২৯৬।

মীমাংসা করিতে গেলেই তখন সেই অসীম ক্ষমতাশীল ঈশ্বরের ক্ষমতা ও জ্ঞান সীমাবদ্ধরূপে ধরিয়া লই।' জ্যোতির্বিশাস্ত্রীয় আলোচনা উপলক্ষে সৃষ্টিরহস্যানুভবজনিত প্রগাঢ় বিস্ময়বোধের সঙ্গে ঈশ্বরপ্রসঙ্গ-অবতারণার রীতিটি স্বর্ণকুমারীর কোনো কোনো প্রবন্ধেও লক্ষিত হয়। সূর্য-সম্বন্ধীয় আলোচনায় তিনি লিখেছেন, 'পৃথিবীর প্রায় সমস্ত প্রাচীন জাতিই কোন-না-কোন-এক সময়ে এই সূর্যকে সুখদুঃখের নিয়ন্তাজ্ঞানে পূজা করিত। আদিম অজ্ঞান মনুষ্যগণ এই অসীম প্রভাশালী সূর্যের গূঢ় রহস্য ভেদে অক্ষম হইয়া ভয়-বিস্মিত চিত্তে যে তাহাকে পূজা করিবে ইহাতে আর আশ্চর্য কি? কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতি সহকারে আমাদের হৃদয় একদিকে সেই অন্ধ ভয়-বিস্ময়ের ভাব হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আর একদিকে এই সূর্যকে সেই জ্যোতির জ্যোতি অনাদি কারণের মহিমারূপে দেখিয়া উত্তরোত্তর আরো বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়িতেছে।'

॥৫॥ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বালোচনাকালে স্বর্ণকুমারী দেবী যেসকল পরিভাষা সৃষ্টি বা ব্যবহার করেছেন তা সঙ্গত কারণে বিদগ্ধ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ ব্যাপারে তাঁর পূর্বসূরীগণের উল্লেখযোগ্য প্রয়াসের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হল:

১৭৭৬ নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেডের A Code of Gentoo Laws-এর মধ্যে যে গ্লসারি আছে (পৃ ৭-২৩) তন্মধ্যে ২৬৩টি সংস্কৃত ফার্সী ও বাংলা শব্দ বর্তমান; এদের অনেকগুলি আইনসংক্রান্ত পরিভাষা।

১৮০১ হেরাসিম লেবেডেফের A Grammar of the Pure and Mixed East Indian Dialects গ্রন্থের A Description of a Man's Form, which may be of great use to Anatomists, Doctors, to Surgeons and to Searchers অধ্যায়ে (পৃ ৬৮-৭২) মোট ১০৮টি শব্দ পাশাপাশি তিন কলমে বিন্যস্ত এবং এদের পর্যায়ক্রম—The Mixed Indian Dialect, The English Tongue, The Civil Shamscrit Bengal Language.

১৮৪৪ আনুমানিক ১৮৩৩ সালের পরিকল্পনানুসারে প্রস্তুত ও ১৮৪৪ সালের ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অবজারভারে পুনঃপ্রকাশিত ডবলিউ. মর্টনের ইংরেজি-বাংলা শব্দসূচী (Renderings, with extended observations thereupon, of some of the important Biblical and Theological Terms).

১৮৪৫ মর্টনের A Biblical, Theological Vocabulary; পাদ্রী লং-এর মতে মোট ৩১ পৃষ্ঠায় ৮০০ বিদেশাগত পরিভাষা (exotic terms) বা বাইবেল ও খৃষ্টধর্মতত্ত্ব বিষয়ক শব্দ সংকলিত।

১৮৪৮ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্যাকল্পদ্রুম (১ম-১৩শ খণ্ড, ১৮৪৬-৫১)। নবম খণ্ডের 'অনুবন্ধে'র 'শব্দ-সূচী'।

১৮৫১ অক্ষয়কুমার দত্তের বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, প্রথম ভাগ (১৭৭৩ শক)। তৃতীয় সংস্করণের শেষে (১৭৭৮ শক, পৃ ২২৮-৩১) 'সঙ্কলিত শব্দ সমুদায়ের ইংরেজি অর্থে'র মধ্যে মোট ৭৬টি শব্দ।

১৮৫৩ ঐ, দ্বিতীয় ভাগ (১৭৭৪ শক)। দ্বিতীয় সংস্করণের শেষে (১৭৭৭ শক, পৃ ২৩১) প্রদত্ত 'সঙ্কলিত শব্দ সমুদায়ের ইংরেজি অর্থে' মাত্র ১৬টি শব্দ ইংরেজি প্রতিশব্দসহ মুদ্রিত।

১৮৫৪ জে. রবিনসনের Dictionary of Law and Other Terms. আইনগ্রন্থে এবং আদালত ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত প্রায় ৪৫০০ শব্দ সংকলিত।

১৮৫৪ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'প্রাকৃত-ভূগোল' (১৭৭৬ শক) গ্রন্থের মধ্যে (পৃ ১৫৫-৬১) 'পারিভাষিক শব্দের নির্ঘণ্ট' আছে।

১৮৫৬ ভুবনমোহন মিত্র ও গোপাললাল মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত রসায়নবিদ্যা বিষয়ক 'কৌতুকতরঙ্গিণী'র শেষে প্রদত্ত 'টীকা'র (১২৬৩, পৃ ৮৩-৮৬) ৬০টি পরিভাষা।

১৮৬০ রাজকৃষ্ণ রায়চৌধুরীর 'নরদেহনির্ণয়' (১২৬৬) গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রদত্ত ১৮৯টি শব্দ।

১৮৬২ গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গোলকের উপযোগিতা'র (১২৬৯) পরিশিষ্টে প্রদত্ত 'ইংরেজী প্রতিশব্দ সহিত পারিভাষিক শব্দে'র সংখ্যা ৯৪।

১৮৬২ গিরিশচন্দ্র তর্কালঙ্কারের 'জীবতত্ত্বে'র শেষে (পৃ ২৫৩-৫৪) 'দুরূহ ও সঙ্কলিত নূতন শব্দের অর্থে'র শব্দ-সংখ্যা মোট ৪৯।

১৮৬২ রাধানাথ বসাকের 'শরীরতত্ত্বসারে'র (১২৭০) শেষ কয়েকটি পৃষ্ঠায় (পৃ ১০৯-২৭) রসারি দেওয়া হয়েছে দুটি পর্যায়ে বা বাংলা-ইংরেজি ও ইংরেজি-বাংলা পর্যায়ে, প্রায় ৩৭৫টি শব্দ।

১৮৬২-৬৩ সোমনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'সোলন ও পাব্লিকোলার জীবনচরিত' (১৯২০ সংবৎ) গ্রন্থের শেষ আট পৃষ্ঠায় যে 'টিপ্পনী' আছে তন্মধ্যে ২৮টি নাম ও শব্দের ব্যাখ্যা প্রদত্ত।

১৮৬৪ গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শিক্ষাপ্রণালী'র (১২৭০) শেষে 'ইঙ্গরেজি প্রতিশব্দ সহিত পারিভাষিক শব্দে'র তালিকায় মোট ৬০টি বাংলা শব্দ প্রদত্ত।

১৮৬৫ লালমোহন ভট্টাচার্য প্রণীত 'কাব্যনির্ণয়ে'র বর্তমান সংস্করণের (পৃ ২০৭-১৫) 'অ-কারাদিক্রমে সূচীপত্রে' প্রায় ২০০ শব্দ ইংরেজি প্রতিশব্দসহ তালিকাবদ্ধ।

১৮৬৫ ক্ষেত্রমোহন দত্তের 'চিকিৎসা প্রকরণে'র 'বিভাগতত্ত্বে' প্রদত্ত পরিভাষা তালিকা।

১৮৬৬ নবীনচন্দ্র দত্তের 'খগোল বিবরণ' (১২৭৩); 'ইঙ্গরেজী প্রতিশব্দ সহিত পারিভাষিক শব্দে'র (পৃ ২৮৩-৯৪) সংখ্যা প্রায় ২৫০।

বিজ্ঞান আলোচনার উপযোগী পরিভাষা নির্মাণে এবং তার প্রয়োগে অক্ষয়কুমার দত্তের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য হলেও সেই প্রচেষ্টা একেবারে সমালোচনার ঊর্ধ্বে বা ত্রুটিমুক্ত নয়; প্রধানত দুর্বোধ্যতা এবং আড়ষ্টতা, সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্র ও ব্যুৎপত্তির প্রতি আত্যন্তিক অনুরাগের ফলে এই বিপত্তি উদ্ভূত হয়েছে। 'অক্ষয়কুমার এমন কিছু পরিভাষা ব্যবহার করিয়াছেন যাহা পরবর্তীকালে অপরিগৃহীত অথবা পরিত্যক্ত।'[১৫] 'বহুদিন পূর্বে তিনি বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক শব্দের উপযুক্ত পরিভাষা সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, আজিকার দিনে ইহা অল্প বিস্ময়ের বিষয় নহে।...তাঁহার এই পরিভাষা হয়তো যথোপযুক্ত হয় নাই।... তথাপি তাঁহার এই চেষ্টা প্রশংসনীয়। তাঁহার পূর্বে ফেলিকস কেরী "ব্রিটিন দেশীয় বিবরণ সঞ্চয়" (১৮১৯) নামক গ্রন্থের পরিশিষ্টে যে সমস্ত পরিভাষা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা অধিকতর জড়তাগ্রস্ত।'[১৬] অখাত (bay), কোল (lagoon), গোমসূর্যাধান (vaccination), ডমরুমধ্য (isthmus), রাজবিপ্লব (revolution), রূঢ় পদার্থ (elements), লোকযাত্রাবিধান (political economy), হিন্দী মহাসাগর (Indian Ocean), মুণ্ডতত্ত্ববিবেক (phrenology) প্রভৃতি আপত্তিকর হলেও আত্মাদর (self-esteem), ক্ষিপ্তনিবাস (lunatic asylum), জড় (idiot), নির্মিমিৎসা (constructiveness), মনোবিজ্ঞান (mental philosophy), মেস্মরতত্ত্ব (mesmerism), শিল্পযন্ত্র (machine), সমসংস্থান (equilibrium) প্রভৃতি রচনায় অক্ষয়কুমারের নৈপুণ্য পরিস্ফুট। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ফেলিকস কেরির বিদ্যাহারাবলী প্রথম খণ্ডের (১৮১৯, সম্পূর্ণত ১৮২০) মধ্যে পরিভাষা ও সংজ্ঞা সম্পর্কিত উৎকৃষ্ট আলোচনা বর্তমান; পরিভাষা ব্যবহারে তিনি শ্রীকান্ত বিদ্যালঙ্কারের বিশেষ সাহায্য পেয়েছিলেন। সতর্কতার সঙ্গে সর্বপ্রথম পরিভাষা প্রয়োগ করেন সম্ভবত রাজেন্দ্রলাল মিত্র; তাঁর A Scheme for the Rendering of European Scientific Terms into the Vernaculars of India নামক প্রস্তাবটির কথা (জুন ১৮৭৭) প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা আবশ্যক।

নূতন পরিভাষা সৃষ্টিকালে প্রতিশব্দের শ্রুতিমাধুর্য ও অনায়াসবোধ্যতার প্রতি স্বর্ণকুমারীর আগ্রহ ছিল সদাসতর্ক, প্রয়োজনবোধে ব্যাকরণগত জটিলতাকে পরিহার না করে বরং তার সমূহ অনুশাসন যতদূরসম্ভব স্বীকার করে নিয়ে সদ্যোজাত শব্দটিকে একটি আভিজাত্যের মর্যাদা দান করেছেন লেখিকা। তৎকালে ক্ষেত্রটি বহুকর্ষিত ছিল না, ব্যাপারটি বহু-

১৫ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য়, পৃ ৪৯৩।

১৬ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য, ১৯৫৯, পৃ ২৮৬-৮৭।

অনুশীলিত ছিল না ; সেকথা স্মরণ রেখে বলা চলে যে পরিভাষা সৃষ্টিতে কিংবা তার প্রয়োগে তিনি যে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা সমকালীন বিশিষ্ট চিন্তাবিদগণের সপ্রশংস অনুমোদন লাভ করেছিল। অক্ষয়কুমারের গোমসূর্যাধান-জুগোপিষা-প্রতিবিধিৎসা জাতীয় শব্দের বিভীষিকা তাঁর শব্দভাণ্ডারে নেই বললেও চলে ; কিংবা অনুরূপ অভিপ্রায় যেখানে অনিবার্য সেখানে শ্রুতিসুখকরতার প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব সুস্পষ্ট। পূর্বসূরীর মৈস্মরতত্ত্ব (mesmerism) পরবর্তীর ক্ষেত্রে 'শক্তিচালনা'য় পরিণত। অবশ্য প্রতিশব্দ বা পরিভাষার দিক থেকে শক্তিচালনা শব্দটি অসার্থক, তথাপি এই বিকল্পটির বিষয়োপযোগিতা ও সারল্য বা সরলীকৃত রূপ বিশিষ্ট মানসিকতা-প্রসূত। যথার্থ প্রতিশব্দ রচনার এই প্রবণতা যে কোথাও জয়যুক্ত হয়নি তা নয় ; পর্ণীতরু (fern), বালখিল্য (pygmy), মোহিস্ফু (sensitive) প্রভৃতিতে তাঁর কৃতিত্বের বিভিন্ন দিক প্রোজ্জ্বল। আগ্নেয়গিরির পরিবর্তে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের 'জ্বালামুখী' শব্দটি ব্যবহৃত। এ সম্পর্কে ১২৮৭ সালের ভারতীর ভাদ্র সংখ্যায় তিনি বলেছেন, 'সচরাচর বাংলা ভাষায় আগ্নেয়গিরি এই নূতন সৃষ্ট কথাটি volcano-র প্রতিশব্দ বলিয়া গৃহীত হয়। কিন্তু সংস্কৃত শকুন্তলায় জ্বালামুখী শব্দ যখন ঐ অর্থে ব্যবহৃত দেখা যায় তখন তাহার পরিবর্তে কোন নূতন কথা সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন নাই।' আবার পৃথিবী গ্রন্থের ভূমিকায় লেখিকা মন্তব্য করেছেন, 'সচরাচর অগ্ন্যুদ্গারী পর্বতসকল আগ্নেয়গিরি বলিয়া উল্লিখিত হয় ; কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের জ্বালামুখী শব্দে যখন ঐ অর্থটি আরো সুস্পষ্ট হয় তখন সে কথাটিও বা বঙ্গভাষায় চলিবে না কেন?' পরে পাদটীকায় জানিয়েছেন, 'বোধ হয় এ কথাটি অসঙ্গত হয় নাই। আশ্বিন (?) মাসের ভারতীতে "পৃথিবীর পরিণাম" শীর্ষক প্রবন্ধে ইহা প্রথম ব্যবহার করা হয়। তাহার পর মাসে দেখিলাম চট্টগ্রামের ইতিবৃত্ত-লেখক শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহও ঐ অর্থে উহা ব্যবহার করিয়াছেন।' নূতন পরিভাষা রচনা অপেক্ষা পুরাপ্রচলিত যথার্থ প্রতিশব্দ আবিষ্কার করে তাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যে পরিভাষা-চিন্তা সম্পর্কিত নিষ্ঠার পরিচয় বিদ্যমান।

প্রতিশব্দের একার্থকতার উপর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯) একদা যে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন[১৭] স্বর্ণকুমারীর পরিভাষায় সেই আদর্শ অনুসৃত হলেও তার ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। যেমন, substance ও matter শব্দদ্বয় কেবল 'পদার্থ' শব্দটির দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে ; পক্ষান্তরে মস্তিষ্করেণু-তরঙ্গাঘাত ও মস্তিষ্করেণু-তরঙ্গ, উত্তপ্ত ধাতুদ্রব ও ধাতুস্রোত, গ্র্যানিট প্রস্তর ও গ্র্যানিট যথাক্রমে brain-wave, lava এবং granite-এর

১৭ রামেন্দ্রসুন্দরের নির্দেশ স্মরণীয় : 'একটি নির্দিষ্ট শব্দ একটি নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করিবে, সেই শব্দটি আর দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার করিবে না, এবং সেই অর্থে দ্বিতীয় শব্দের সৃষ্টি করিবে না, এই হইল বৈজ্ঞানিক পরিভাষার মূলসূত্র।' দ্র বৈজ্ঞানিক পরিভাষা—সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, ১ম ভাগ ২য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩০১, পৃ ৮২।

প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত। প্রয়োগের এই বিকল্প-পদ্ধতি থেকে প্রমাণিত হয় যথার্থ শব্দটির অভাবাত্মকতা; অপরদিকে সার্থকতর শব্দসন্ধানের প্রয়াসটিও এর মধ্যে নিহিত রয়েছে। অবশ্য একথাও স্বীকার করা উচিত যে পরিভাষা-চিন্তার সেই অপরিণত স্তরে এবংবিধ প্রয়োগ তেমন কোনো বিভ্রান্তিকর অসুবিধার সৃষ্টি করেনি।

পৃথিবী গ্রন্থে পরিভাষা ব্যবহারের পদ্ধতি বিশ্লেষণকালে পুস্তকের ভূমিকায় লেখিকা যে মন্তব্য করেছেন তন্মধ্যে তাঁর পরিভাষা-চিন্তার প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। স্বর্ণকুমারী বলেছেন, 'বাংলায় বৈজ্ঞানিক পুস্তক সঙ্কলন সম্বন্ধে প্রধান অসুবিধা পারিভাষিক শব্দের অভাব। এ পুস্তকে পূর্ববর্তী লেখক-মহাশয়দিগের ব্যবহৃত শব্দ প্রায়ই গ্রহণ করা হইয়াছে, তবে দু-একটি প্রচলিত শব্দের স্থানে অন্য শব্দও ব্যবহৃত হইয়াছে।...যে যে স্থানে পারিভাষিক শব্দের অপ্রতুল হইয়াছে সেই সেই স্থানে নূতন শব্দ রচনা করিতেও কুণ্ঠিত হই নাই। সকল নূতন রচিত কথাগুলিই যে গৃহীত হইবে তাহা প্রত্যাশা করি না। জীবজগতেও যেমন শব্দজগতেও তেমনি, যাহা যোগ্য তাহাই জীবিত থাকিবে। যদি বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দগুলি সকল ভাষায় একই রাখা যায় তাহাতে ক্ষতি নাই, বরং ভাষার উন্নতি হয় দেখিয়া যেস্থানে মনোমত প্রতিশব্দ না পাওয়া গিয়াছে সেস্থানে ইংরাজী মূল শব্দই রাখা হইয়াছে।' স্বর্ণকুমারীর এই বক্তব্যের মধ্যে তাঁর পরিভাষা প্রয়োগের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আভাসিত হয়ে উঠেছে: ১. প্রয়োজনবোধে ঈষৎ পরিবর্তনসহ প্রচলিত পরিভাষা গ্রহণ; ২. নূতন পরিভাষা সৃষ্টি; ৩. অসুবিধাবোধে মূল শব্দ স্বীকার। লেখিকার ব্যবহৃত প্রাচীন সাহিত্যের জ্বালামুখী-পুষ্যা-তড়িৎ-তীর-জিজ্ঞাসা প্রভৃতি এবং পূর্ববর্তী লেখকগণের কেন্দ্রানুগ-কেন্দ্রাতিগ-বৃত্তাংশ ইত্যাদি শব্দকে প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। আগ্নেয়গিরি বা অগ্ন্যুদ্গারী পর্বত অপেক্ষা লেখিকা জ্বালামুখী শব্দটির প্রতি অধিকতর আগ্রহান্বিত ছিলেন, শব্দটির গঠনগত সরলতা শ্রুতিমাধুর্য সংক্ষিপ্ততা ও তজ্জনিত সংকেতময়তাই এই আগ্রহের সম্ভাব্য হেতু। arc-এর পরিভাষা-প্রতিশব্দরূপে বৃত্তাংশ শব্দ ব্যবহারের একটি কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য অবতারণা করা যেতে পারে। ১২৮৭ সালের কার্তিক সংখ্যার ভারতীতে মুদ্রিত 'পৃথিবীর উৎপত্তি' প্রবন্ধে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে কেবল arc প্রযুক্ত; কিন্তু তত্ত্ববোধিনীতে (পৌষ ১৮০২ শক) এর পুনর্মুদ্রণকালে arc স্থলে বৃত্তাংশ পরিভাষা গৃহীত হয়েছে এবং পৃথিবী গ্রন্থে arc ও বৃত্তাংশ এতদুভয়ের প্রয়োগ দেখা যায়। মনে হয় ১২৮৭ সালের, কার্তিক থেকে অগ্রহায়ণের মধ্যে এই পরিভাষাটি মনোনীত হয়। উপরোক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিভাষা বা প্রতিশব্দ উদ্ভাবনা প্রসঙ্গে এটুকু বলা চলে যে নির্মিত পরিভাষা সম্বন্ধে তিনি ছিলেন সর্বাংশে মোহমুক্ত; যে উদ্যম ও অধ্যবসায় তিনি শব্দৈষণায় বিনিয়োগ করেছেন তার ব্যর্থতা-সার্থকতার নেপথ্যে এমন একটা ধারাবাহিক সতর্ক সহিষ্ণুতা ক্রিয়াশীল ছিল যার ফল-

পরিণামে কয়েকটি উৎকৃষ্ট প্রতিশব্দ আবির্ভূত হয়েছে। উল্লেখ্য যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৭৮৪ শকের কার্তিক সংখ্যা থেকে ক্রমশ-প্রকাশিত 'ভূতত্ত্ববিদ্যা' নামক প্রবন্ধটির এক স্থলে প্রবন্ধে-ব্যবহৃত কতিপয় বৈজ্ঞানিক পরিভাষার প্রতিশব্দ ও পরিচিতি প্রদত্ত হয়; প্রবন্ধ-বিষয় স্বর্ণকুমারীকে গভীরভাবে প্রভাবিত করলেও পরিভাষা-ব্যাপারে লেখিকার স্বাতন্ত্র্য ও সাফল্য স্পষ্টত লক্ষণীয়। যেমন, তত্ত্ববোধিনীর 'সৌধশিলা' (limestone) স্বর্ণকুমারীর রচনায় 'চুনপাথরে' পরিণত। পরিভাষা সৃষ্টি এবং তার যথাযথ প্রয়োগের দৃষ্টিকোণ থেকে শেষোক্তটির আধিপত্য অনস্বীকার্য। উপরিলিখিত তৃতীয় পর্যায়ের পরিভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে অনায়াসে বিদেশী শব্দকে অবিকৃতভাবে স্বীকার করে নিয়ে তিনি আধুনিক মনোভাবের পরিচয় দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধন ও জ্ঞানভাণ্ডারকে পূর্ণতর করার জন্য এই অতিসাহসিকতা দেখা গিয়েছিল; সঠিক প্রতিশব্দ নির্বাচনের প্রখর দায়িত্ববোধের তাড়নাও ছিল অন্তরে নিহিত। ১২৯৮ সালের ভারতী ও বালকের শ্রাবণে মুদ্রিত গোপালচন্দ্র সোমের 'অহংজ্ঞান' প্রবন্ধটিতে দর্শনশাস্ত্রীয় কোনো পরি-ভাষার ত্রুটি নিরীক্ষণ করে সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী পাদটীকায় মন্তব্য করেন, 'কোন দার্শনিক পদ ভাষান্তরিত করার পক্ষে অনেক প্রত্যবায় আছে। অহংজ্ঞান শব্দকে ইংরাজী self-consciousness পদের দ্বারা অনুবাদ করিলে যথার্থ ভাব-প্রকাশক হয় না। অহংজ্ঞান মানবের প্রকৃত সত্তাসম্বন্ধীয় জ্ঞানকেই বোঝায়, কিন্তু ইংরাজী self-consciousness পদটি তাহা নহে।' কঠোর ভাষায় এর সমালোচনা করে তিনি এ সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত স্পষ্ট মতামত প্রকাশ করেছেন। বলাবাহুল্য পরিভাষা প্রণয়নের ব্যাপারে কোনোরকম শিথিলতার প্রশ্রয় তিনি কোথাও দেননি।

পূর্বপ্রচলিত শব্দগ্রহণ অথবা শব্দসৃজন ব্যতীত অন্যান্য উপায়েও পরিভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করে দিয়েছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী: ১. মূল শব্দ ইংরেজিতে লিখিত, পাশে বাংলা উচ্চারণ, কোনো প্রতিশব্দ নেই; মনোমত প্রতিশব্দের অভাবে মূল শব্দ অবিকৃতভাবে গৃহীত। যেমন, marsupial মারস্যুপিয়াল, elk এল্ক, ziphius জিফিউস, granite গ্র্যানিট ইত্যাদি। এই রীতি সম্বন্ধে দিকনির্দেশ করেন জন ম্যাক। ১৮৩৪ খৃস্টাব্দে শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত Principles of Chemistry বা প্রথম খণ্ড 'কিমিয়া বিদ্যার সার' গ্রন্থের ভূমিকায় রসায়নবিদ্যার শব্দের বাংলা নামান্তরীকরণ সম্পর্কে তিনি বলেন, I have preferred, therefore, expressing the European terms in 'Bengalee' characters, and merely changing the prefixes and terminology so as decently to incorporate the new words into the language. ভারতীয় ভাষায় অপরিচিত এবং ইউরোপীয় ভাষা থেকে আগত পরিভাষাকে যথাসম্ভব

অবিকৃত রেখে কিংবা ঈষৎ বিকৃত করে গ্রহণ করার এই প্রচেষ্টাটি সম্পর্কে তিনিই প্রথম সচেতনভাবে আলোচনা করেন। স্বর্ণকুমারীর পরিভাষা-চিন্তা এই পদ্ধতিতে পরিপুষ্ট। ২. বহিরাগত মূল শব্দের বাংলা উচ্চারণসহ সম্ভাব্য প্রতিশব্দ ব্যবহার। যেমন, brachiopoda ব্র্যাকিওপোডা বা বাহুপদী, carboniferous কার্বনিফেরাস বা অঙ্গারজনক, trilobites ট্রাইলোবাইটিস বা ত্রিকুণ্ডলী, orthociratites অর্থসিরেটাইটিস বা ঋজুশৃঙ্গ ইত্যাদি। ৩. মূল শব্দের উচ্চারণ কেবল বাংলায় লিখিত, তৎসহ বাংলা প্রতিশব্দ প্রয়োগ। যেমন, অমোনাইট—মেষশৃঙ্গের ন্যায় বক্রাকার, বেলেমনাইট—তীরবৎ সূক্ষ্মাগ্র, লায়াস—কর্দমময় চুনস্তর, ব্রেনওয়েব থিওরি—মস্তিষ্করেণু-তরঙ্গাঘাত মত ইত্যাদি। ৪. মূল শব্দটির সংক্ষিপ্ত প্রতিশব্দ বা পরিভাষা ব্যবহার না করে তৎপরিবর্তে ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতি গ্রহণ, কখনো মূলের উচ্চারণ বাংলায় লিখিত। যেমন, stalagmite—'উপর হইতে জল চুয়াইয়া পড়িয়া গুহা-অভ্যন্তরে যে চুনেমাটি উৎপন্ন হয় তাহার নাম স্ট্যালাগমাইট'; মাশটডন—'হস্তীজাতীয় আর একরূপ স্থূলচর্মীকে মাশটডন (অর্থাৎ স্তননিভাকার দন্তবিশিষ্ট) কহা যায়'; marsupial—'মাতার উদরের নিকটস্থ একটি চর্মের থলিয়ায় অবস্থিতি করে এবং সেইখান হইতে স্তন্য পান করিয়া বড় হইলে বাহির হয়, যেমন আধুনিক কাঙ্গারু। এইরূপ স্তন্যপায়ী জীবকে মারস্যুপিয়াল (marsupial) জাতি কহে।' এগুলিকে যথার্থ প্রতিশব্দ বা পরিভাষা বলা যায় না, অধিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য পরিভাষার সংক্ষিপ্ততা-সংকেতময়তা একান্তভাবে উহ্য বলে এগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংজ্ঞাবাচক; যেন বাংলায় গ্রহণের পূর্বে সেগুলির সুস্পষ্ট অর্থ নির্দিষ্ট করে দিয়ে তার সীমারেখা এখানে বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় যে স্বর্ণকুমারীর ব্যবহৃত পরিভাষা বা প্রতিশব্দের একটি পরীক্ষামূলক তালিকা বর্তমান গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রদত্ত হল, পরিভাষা সৃষ্টির উপায়-বৈচিত্র্য এবং তার গুণ-পরিমাণ উক্ত তালিকা থেকে নির্ণীত হতে পারে।

॥৩॥ সহজাত কৌতূহলবশত পৈতৃক রিক্থ অর্জন করে স্বর্ণকুমারী বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছেন; বিজ্ঞানচর্চায় বা বিজ্ঞান-অনুমোদিত প্রণালীতে চিন্তার ফলে বুদ্ধিবৃত্তির ক্রমমার্জনা ও পরিণতি এসেছিল তাঁর। সর্বোপরি ব্যাপক বিজ্ঞানজিজ্ঞাসার মাধ্যমে অনন্ত রহস্য-উপলব্ধির প্রবল বাসনাটিও অনুভূত হয়, 'যদি জগৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভ করিতে চাও,ত বিজ্ঞানের ধ্যান কর। বিজ্ঞান প্রকৃতির রহস্য-ভাণ্ডারের চাবিস্বরূপ।' এই একই উদ্দেশ্যের তাড়নায় তাঁর পূর্বসূরীগণও বিজ্ঞানানুশীলন করেছিলেন। ১৭৭৫ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র' প্রবন্ধের প্রারম্ভে বলা হয়, 'পূর্বকালে এদেশে যতপ্রকার বিজ্ঞানশাস্ত্রের পর্যালোচনা হইয়াছিল তন্মধ্যে জ্যোতিষশাস্ত্রই প্রধান। জ্যোতিষ যেমন বিমল জ্ঞান ও আনন্দ জনক তেমনি

আবার পরমার্থ প্রতিপাদক। এই নিমিত্ত পূর্বকালের ঋষিদিগের মধ্যে অনেকেই ধর্মশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষশাস্ত্রেরও সাধ্যানুরূপ অনুশীলন করিতেন। তাঁহারা জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি এতদূর অনুরাগ প্রকাশ করিতেন যে তাহাকে পরম পুরুষার্থের একমাত্র সাধনস্বরূপ বেদের এক অঙ্গ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন।' পৃথিবী গ্রন্থের 'উপক্রমণিকা'র অন্তর্গত 'বিজ্ঞান-শিক্ষা' প্রবন্ধের প্রথম পর্যায়ে লেখিকা প্রাচীন ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষচর্চার সংক্ষিপ্ত প্রামাণিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন বিবিধ আকর গ্রন্থের যথোপযোগী অংশের অবলম্বনে। বিষ্ণুর দশাবতার-কথার ভূতত্ত্বগত ও নৃতত্ত্বমূলক বিশ্লেষণ করে পুরাকথার রূপকের অন্তরালে বৈজ্ঞানিক সত্যের সন্ধান করেছেন। পুরাণের মধ্যে এইজাতীয় বিজ্ঞানতত্ত্ব অনুসন্ধানের দিক থেকে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের ভূতত্ত্ববিচার (১৭৯৪ শক), গোবিন্দমোহন রায়ের মৃন্ময়ী (১৭৯৯ শক), হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দশমহাবিদ্যা (১৮৮২) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুদয়ের ফলে এসকল প্রবণতার উদ্ভব হলেও স্বর্ণকুমারীর বিজ্ঞানচিন্তা তদ্দ্বারা গ্রস্ত হয়নি, স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ হৃদয়ভাবনা নবজাগরণের যুক্তি-বুদ্ধি দ্বারা পরিমার্জিত হওয়ায় এরূপ ঐতিহ্যচর্চা শুভপরিণামী হয়ে উঠেছে। প্রাচীন ভারতীয়গণের বিজ্ঞানকীর্তির ইতিবৃত্ত সংকলনকালে পরাঙ্মুখ হৃতসর্বস্ব স্বজাতীয়ের শোচনীয়তা তাঁর চিত্তে বেদনা উদ্রেক করেছে, 'একসময়ে ভারতবর্ষে যে জ্যোতিষশাস্ত্রের বিশেষ চর্চা হইয়াছিল তাহার আর সন্দেহ নাই। তথাপি দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষ এজন্য যশস্বী হইতে পারিল না।'

১২৯১ সালের ভারতী পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত 'ভূমিকা'র[১৮] মধ্যে বিজ্ঞান-শিক্ষার আবশ্যকতা আলোচিত। জনসাধারণের মানসিক উৎকর্ষবিধানই মাসিক পত্রিকার উদ্দেশ্য এবং তন্নিমিত্ত 'জ্ঞান অনুভূতি ও উদ্যমন এই তিন প্রকার মানসিক ঘটনার নিমিত্ত মনে যে তিনটি বৃত্তি আছে সে তিনটি বৃত্তিরই উন্নতি হওয়া আবশ্যক।' বিজ্ঞান আলোচনায় প্রত্যক্ষ জ্ঞানশক্তির উন্নতি হয় এবং কাল্পনিক জ্ঞানশক্তি বা কল্পনাশক্তি পরিমার্জিত হয়ে উঠে। দর্শন কবিতা উপন্যাসাদির প্রয়োজনও অনস্বীকার্য, 'তবে আমরা এখন হইতে বিজ্ঞানের মাত্রা বাড়াইতে ইচ্ছা করি। আমাদের মতে বিজ্ঞানশক্তির বিশেষ উপকারিতা আছে এবং আজকাল এদেশে বিজ্ঞান আলোচনার কতক অনুরাগও দেখা যাইতেছে। ভারতবর্ষীয় মহিলাগণ আজকাল বিদ্যানুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অথচ তাঁহাদের মধ্যে

১৮ পত্রিকার সূচীপত্রে বা প্রবন্ধের কোথাও লেখক-নাম নেই। সম্ভবত এটি স্বর্ণকুমারীর রচনা, কারণ ঐসময় থেকে তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথের পরিবর্ত-সম্পাদকরূপে ভারতী-পরিচালনার কার্যভার গ্রহণ করেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে ভারতীর প্রথম সংখ্যায় (শ্রাবণ ১২৮৪) 'ভূমিকা'য়ও পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনাকালে বিজ্ঞানচর্চার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছিল, এর রচয়িতা সম্ভবত সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ।

অনেকের ইউরোপীয় কোন ভাষার সহিত বিশেষ পরিচয় না থাকায় তাঁহারা বর্তমান কালের বিজ্ঞানশিক্ষা করিতে অপারক ; তাহা ছাড়া ইংরাজী জানিয়াও অনেক স্ত্রীপুরুষ অধিক সময় বা অর্থ দিয়া বিজ্ঞান আলোচনা করিতে পারেন না, সেইজন্য ভারতীতে সহজ ভাষায় বিবিধ প্রকার বৈজ্ঞানিক বিষয় আলোচনার বিশেষ রূপে ইচ্ছা রহিল।' অবশ্য একথাও মনে রাখা দরকার যে পশ্বাবলী বা বিজ্ঞান সেবধির মত ভারতী একান্তভাবে বিজ্ঞানসর্বস্ব হয়ে উঠেনি। স্বর্ণকুমারীর তত্ত্বাবধানে ১২৯১ সাল থেকে এভাবে বিশিষ্ট মর্যাদা লাভ করতে থাকে ভারতী, লেখিকার উদ্যম-অধ্যবসায় ও সুপরিকল্পিত অভিপ্রায় এর পশ্চাতে ছিল সক্রিয়, বিশেষত ১২৯৩ সাল থেকে পত্রিকায় জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার প্রাধান্য লক্ষিত হয় এবং এই পর্যায়ের অধিকাংশ রচনাই স্বর্ণকুমারীর। বিষয়বৈচিত্র্যে ও প্রকাশের সরলতায় তিনি প্রবন্ধগুলিকে সাধারণ পাঠকের নিকটও চিত্তাকর্ষক করে তুলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিজ্ঞানরহস্যের 'বিজ্ঞাপনে' (১ম সং ১৮৭৫) একই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন, 'লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, আলোচিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসকল সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক, বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীর বালকেরা, এবং আধুনিক শিক্ষিতা বাঙ্গালী স্ত্রী, বুঝিতে পারেন।' ফলকথা লেখিকার বিজ্ঞানচর্চার মূলে ছিল জনসাধারণের উপযোগী বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব পরিবেশন ; বয়স্ক বুধমণ্ডলীর জন্যও তা অনুপযুক্ত ছিল না, অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত ক্রান্তিপাতের বক্রগতি এবং মেরুলক্ষ্য পরিবর্তনগতি (Precession of the Equinoxes and Nutation) বিশ্লেষণ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণস্থল।

পৃথিবী গ্রন্থটিতে জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূতত্ত্ব সংক্রান্ত প্রবন্ধ সন্নিবেশিত, অন্যান্য প্রবন্ধের মধ্যেও জ্যোতির্বিজ্ঞানের অগ্রাধিকার লক্ষণীয়। 'বিজ্ঞান-সমাজে জ্যোতিষিক বিজ্ঞানই সর্বাপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে' বলিয়া এবং 'পৃথিবী সম্বন্ধে আমাদের মনে প্রধানত যেসকল প্রশ্ন উদিত হইতে পারে তাহারি মীমাংসাস্বরূপ প্রচলিত বিজ্ঞানের উপদেশ অনুযায়ী' তিনি এইজাতীয় প্রবন্ধ রচনা করেছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে ভূতত্ত্ব বা পৃথিবীর গোপনীয়তা এবং জ্যোতির্বিদ্যা বা বিশ্বাকাশের রহস্যময়তার প্রতি তাঁর চিন্তা একান্তভাবে নিবদ্ধ। পূর্বসূরী বঙ্কিমচন্দ্র এবং অনুজ রবীন্দ্রনাথও বিজ্ঞানের এতদুভয় শাখার প্রতি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিশাল পটভূমিকায় কল্পনাশক্তির মুক্তপক্ষ অবাধ বিহারের যে অবকাশ আছে তৎপ্রতি কবিকল্পনাধিকারী ব্যক্তিগণ স্বভাবত আকৃষ্ট হয়ে পড়েন, আবার পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ অস্পষ্টতা রহস্যময়তার প্রতিও এই ঔৎসুক্য স্বাভাবিক। একদিকে সীমাহীন মহাকাশ, অপরদিকে অজ্ঞাতপরিচয় অদৃশ্য ভূগর্ভ— উভয়েই আমাদের মনে সুদূরের আহ্বানজনিত বিপুল বিস্ময় ও অতিপরিচিতের অত্যাশ্চর্য রহস্যময়তা সৃষ্টি করে। রোমান্টিক কল্পনাবিলাসের এই বাধাবন্ধহারা ক্ষেত্রদুটিতে স্বর্ণকুমারীর মানসচারণা তাই সঙ্গত ও স্বাভাবিক।

যেসকল গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকার সাহায্য অবলম্বনে স্বর্ণকুমারীর বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ রচিত হয় 'পৃথিবী'র ভূমিকায় তার একটি উল্লেখ পাওয়া যাবে। তিনি বলেছেন, 'প্রধানত নর্মান লকিয়ার, গডক্রে, নিউকাম, ব্যালফোর স্টুয়ার্ট ও ফিগুয়ের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া ইহা রচিত, অপরাপর যেসকল গ্রন্থ হইতে সাহায্য পাওয়া গিয়াছে তাহা যথাস্থানে স্বীকৃত হইয়াছে।' বিজ্ঞানরহস্যের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রধানতঃ হক্সলী, টিণ্ডল, প্রকটর, লকিয়র, লায়েল প্রভৃতি লেখকের মতাবলম্বন' করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বিজ্ঞানরহস্যের প্রবন্ধের মত স্বর্ণকুমারীর রচনাগুলির 'কোনটিই অনুবাদ নহে', উভয়েই মূল রচনার সার-সংকলন করেছিলেন। স্বর্ণকুমারীর 'ভূপঞ্জর' প্রবন্ধে মেডলিকট ও ব্লানফোর্ড রচিত ম্যানুয়েল অফ দি জিওলজি অফ ইণ্ডিয়া গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল; লণ্ডন থেকে প্রকাশিত ফিলসফিক্যাল ট্রানজাকসান নামক পত্রিকার ১৭২৬ সালের একটি সংখ্যার উল্লেখ পাওয়া যায় ঐ প্রবন্ধে। 'পৃথিবীর পরিণাম' প্রবন্ধে প্রকটরের একটি গ্রন্থ উল্লিখিত হয়েছে; তাছাড়া নিউটনের প্রিন্সিপিয়া ম্যাথেম্যাটিকা (১৬৮৭), লাপ্লাসের মেকানিক সেলেস্ত (১৭৯৯) এবং শুকসারের দুটি গ্রন্থের নামও ব্যবহৃত। কেবল পৃথিবী গ্রন্থটিতে অন্তত অর্ধশতাধিক বৈজ্ঞানিকের মতামত বিশ্লেষিত। বরাহ-মিহিরের বৃহৎসংহিতা, ভাস্করাচার্যের সিদ্ধান্ত শিরোমণি, আর্যভট্টের রচনাবলী থেকে তিনি কোনো কোনো অংশ ব্যবহার করেছেন প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে। এ সম্বন্ধে তাঁর একটি স্বীকৃতি উদ্ধৃত হল: 'আমাদের দেশের প্রাচীন জ্যোতিষিক উন্নতি সম্বন্ধে যে কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহার অধিকাংশ শ্লোকই আমাদিগের অনুরোধে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় অনুসন্ধান করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার সেই পরিশ্রমের নিমিত্ত তাঁহার নিকট উপকৃত রহিলাম।'

১২৯১ সালের ভারতীর পৌষ মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যায় 'ইন্দ্রিয়ের সাহায্য বিনা মনের কথা জানা' নামক বৃহৎ প্রবন্ধটি মুদ্রিত হয়, মাঘ সংখ্যায় কয়েকটি চিত্রও ব্যবহৃত। 'মনের কথা যে মনে মনে চালিত হইতে পারে একথা আমাদের দেশের কাছে নূতন কথা নহে।... কিন্তু কেবলি আমাদের দেশে নহে, বিজ্ঞান-আলোক-প্রোজ্জ্বলিত সভ্যতাভিমানী গর্বিত ইয়োরোপেও এ বিশ্বাসের একেবারে অভাব নাই।' এই বিশ্বাসের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সন্ধানের জন্য ১৮৮২ সালে ইংলণ্ডে মানসিক শক্তি-অনুসন্ধান সভা বা Society for Psychical Research স্থাপিত হয়; মনের কথা পাঠ, দিব্যদর্শন, ইচ্ছাশক্তি সঞ্চালন প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করা ছিল সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। সভার পৃষ্ঠপোষকরূপে সেকালের কয়েকজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক ও বুদ্ধিজীবীর নাম পাওয়া যায় স্বর্ণকুমারীর প্রবন্ধে। প্রথম অধিবেশনের সভাপতি অধ্যাপক হেনরি সিজউইকের বক্তৃতার অংশবিশেষ Proceedings of the

Society for Psychical Research (Vol. I) থেকে উদ্ধার করে লেখিকা প্রবন্ধের বিষয় বিশ্লেষণ করেছেন ; প্রয়োজনবোধে অন্যান্য সদস্যের বক্তব্য অনুবাদ করে দিয়েছেন মূল প্রবন্ধে বা পাদটীকায়। ১২৯২ সালের ভারতীর অগ্রহায়ণ মাঘ ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত 'মেসমেরিজম বা শক্তিচালনা' প্রবন্ধের প্রারম্ভে লেখিকা বলেছেন, "গত বৎসর ভারতীতে 'মনের কথা জানা' নামক প্রবন্ধে ইংলণ্ডের মানসিক শক্তি-অনুসন্ধান সভার বিবরণ—অর্থাৎ কিরূপ দরের ব্যক্তিগণ তাহার সভ্য, কিরূপ প্রণালীতে এই সভার কার্যাদি নির্বাহ হইয়া থাকে—ইত্যাদি সংক্ষেপে একরূপ বলা হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা সে প্রবন্ধ পড়েন নাই তাঁহাদের জন্য এখানে আর একবার উক্ত সভা সম্বন্ধে কিছু বলিয়া আলোচ্য বিষয়টির অবতারণা করিব।" সম্পূর্ণ প্রবন্ধ পাঠের পর বোঝা যায় মনস্তত্ত্বের প্রতি তাঁর ঔৎসুক্য ও জিজ্ঞাসা কি গভীর ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশের থিয়সফি আন্দোলনের সঙ্গে লেখিকা নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন, প্রসঙ্গত সেকথা স্মরণীয়। যা হোক, বিষয়টি তাঁর বিজ্ঞানচিন্তাকে যে বৈচিত্র্যমণ্ডিত করেছিল তা অস্বীকার করা চলে না।

লেখিকার অন্যান্য রচনার মত বিজ্ঞানবিষয়ক প্রায় সমূহ প্রবন্ধ ভারতীতে প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞানসম্পর্কিত এইরূপ আলোচনা যে তৎকালে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল স্বর্ণকুমারীর একটি উক্তি থেকে তা জানা যায়। ১৩১৫ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার ভারতীতে মুদ্রিত দীনেশচন্দ্র সেনের 'মাসিক পত্রের ত্রুটি' নামক প্রবন্ধের উত্তরে যে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয় তন্মধ্যে বলা হয়েছে, 'আমার মনে আছে ভারতীতে জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধীয় সহজ বিজ্ঞানের কথা পড়িয়াই বৃদ্ধ বৃদ্ধ পাঠকগণ তখন কিরূপ আনন্দ লাভ করিতেন।' সেকালের অন্তঃপুরিকাগণও এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী তাঁর পূর্বস্মৃতিচারণা প্রসঙ্গে বলেছেন, "পিতৃদেবও স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর 'পৃথিবী' ও 'দীপনির্বাণ' পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন, আমাদের দেশের স্ত্রীলোক এমন লিখিতে পারিয়াছেন ইহা বিশেষ গৌরবের কথা। তিনি মেয়েদের বিজ্ঞানশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন এবং স্বয়ং আমাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রভৃতি পুস্তক পড়াইয়াছিলেন।"[১৯] বৈজ্ঞানিক তত্ত্বালোচনাকে সর্বজনগ্রাহ্য 'সহজ বিজ্ঞানের কথা'য় রূপান্তরিত করার সাফল্য যে তিনি অর্জন করেছিলেন উপরোক্ত তথ্য থেকে তা প্রমাণিত হয়।

বিজ্ঞানচিন্তা তাঁর অন্যান্য সাহিত্যকর্মকে প্রভাবিত করেছে। বিভিন্ন রচনায় নানা প্রসঙ্গে বিজ্ঞান কখনো উপমানরূপে কখনো বা বিষয়রূপে উপস্থিত হয়েছে। তদ্রূপ কয়েকটি দৃষ্টান্ত পরিবেশিত হল:

১৯ ঐ মিলনকথা—ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩।

১ আরও চারি বৎসর অতীত হইল। নানা ঘটনাবলী বহন করিয়া সময় অপর চারিটি পদাঙ্ক রাখিয়া গেল। তাহার পরে চারিবার গ্রীষ্ম বর্ষা শীত বসন্ত পৃথিবীকে অধিকার করিয়াছে। তাহার পরে চারিবার পৃথিবী সূর্যকে পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছে।—দীপনির্বাণ (১৮৭৬), ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

২ ইথরের আন্দোলন যে স্থলে যতই ঘনঘন, আলোকও যেমন সেই স্থলে ততই বহুদূর-ব্যাপী এবং উজ্জ্বল—সেইরূপ বিশ্বসংসারের সহিত নিজের যেখানে যতই ঘনিষ্ঠ মিলন সেখানেই এই ভাবের তত গভীরতা।—কবিতা ও কবি (ভারতী ও বালক, ভাদ্র ১২৯৫)।

৩ জাহাজ ছাড়িয়া দিলে আমরা ছাতে আসিয়া তীরের গতিশালী বিচিত্র শোভা দেখিতে লাগিলাম। বিজ্ঞান-বিচক্ষণ পাঠিকা আমার ভ্রমসংশোধন করিবেন সন্দেহ নাই—কিন্তু তাহার উত্তরে আমি বলিতে পারি, পৃথিবী সূর্যকে অনবরত ঘুরিয়া মরা সত্বেও যদি সূর্যকেই আমরা গতিশীল আখ্যা দিতে পারি তাহা হইলে তীরের এই দৃশ্যতঃ গতি হইতে তাহাকেই বা গতিশীল না বলিব কেন? অন্ততঃ আমি না বলিলেই যে এইরূপ উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে চাপান রহিত হইয়া যাইবে তাহা নয়।—সমুদ্রে (ভারতী, ভাদ্র ১৩০২)।

২

সাহিত্যতত্ত্ব সংক্রান্ত আলোচনায় স্বর্ণকুমারীর স্বকীয়তা ও দক্ষতা সহৃদয় সমালোচকের সহানুভূতি আকর্ষণে সমর্থ। ১২৯১ সালের বৈশাখ সংখ্যার ভারতীতে মুদ্রিত ভূমিকা-নামক প্রবন্ধের শেষাংশে কবির কল্পনাশক্তির প্রসঙ্গে লেখিকা বলেছেন, 'পদ্যে কল্পনাশক্তির বিলক্ষণ প্রয়োগ হইয়া থাকে। তবে পদ্য প্রভৃতির কল্পনা আর বিজ্ঞানের কল্পনা এই দুয়ে একটি প্রধান প্রভেদ এই যে বিজ্ঞানে সাধারণত দ্রব্যগুণের সামান্য গুণগুলি হইতে স্বতন্ত্র করিয়া কল্পনা করিতে হয়। আর কবিতা প্রভৃতিতে সত্য ন্যায় বীরত্ব ইত্যাদি কোন বিশেষের চিত্র অঙ্কিত করার অভিপ্রায় থাকিলেও তাহা উদাহরণে দেখাইবার নিমিত্ত আমরা রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শাদি সর্বগুণবিশিষ্ট কোন বিশেষ দ্রব্যের কল্পনা করি।...আমরা কাব্যে যাহা কল্পনা করি না কেন তাহা রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শাদি গুণযুক্ত একটি বিশেষ পদার্থমাত্র। সুতরাং এক অর্থে বিজ্ঞানের কল্পনা কাব্যের কল্পনা অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর; কেননা বিজ্ঞানের উচ্চতর কল্পনায় প্রত্যক্ষ পদার্থ হইতে পৃথকীকৃত সামান্য গুণসমষ্টি মনের মধ্যে উপস্থিত করার চেষ্টা করিতে হয়, আর কাব্যের কল্পনায় সমুদায় গুণযুক্ত বিশেষ কোন একটি দ্রব্য উপলব্ধি করিতে হয়।' এইজাতীয় সিদ্ধান্ত যুক্তিশাসিত ও বুদ্ধিভিত্তিক হলেও পরবর্তীকালে এই চিন্তা

পরিবর্তিত হয়, এবং তখন তাঁর ভাবনা কাব্যকে আর খণ্ডভাবে না বিচার করে তার সামগ্র্য-মূল্যায়নে তৎপর হয়ে উঠতে থাকে। বৈষ্ণব-কাব্য সম্পর্কিত বলেন্দ্রনাথের মন্তব্য বিচারের ব্যাপারে সেই সমগ্রতাবোধের পরিচয় সুস্পষ্ট। এমনকি বর্তমান প্রবন্ধে যে বিজ্ঞান তার প্রত্যক্ষতার জন্য তাঁর নিকট আদৃত এবং যে পরোক্ষতাকে তিনি মর্যাদা দেননি সেই পরোক্ষতাকেও স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল পরবর্তী পর্যায়ে শেলি ও টেনিসনের কাব্যালোচনা প্রসঙ্গে। অবশ্য বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের তথাকথিত পারস্পরিক বৈর-কথা প্রাধান্য পায়নি; পক্ষান্তরে লেখিকার বক্তব্য ছিল যে এতদুভয়ের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য থাকলেও প্রবল বিরোধ নেই। সম্ভবত সমকালীন চিন্তায় বিজ্ঞানচর্চার অতিরেক হেতু কাব্যের কল্পনা অপেক্ষা বিজ্ঞানের কল্পনার প্রতি লেখকমানস অধিকতর আগ্রহান্বিত।

বিজ্ঞান ও সাহিত্যের পরস্পরসাপেক্ষতা নির্ণয়ে তাঁর মৌলিকতা সুপ্রকট। 'কবি, নাস্তিকতা ও শেলি' প্রবন্ধে (ভারতী ও বালক, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৪) তিনি বলেছিলেন, 'যিনি যত উচ্চ কবি তিনি তত শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, কেননা ইন্দ্রিয়াতীত দিব্য সত্য তিনি তত অধিক আয়ত্ত করিতে পারেন।...অণু হইতে অণুর অন্তরে প্রবেশ করাই কবির আকাঙ্ক্ষা, অণু হইতে অনন্তে মিলন লাভ করাই কবির বাসনা। সুতরাং সংসারের ক্ষুদ্র সুখ ঐশ্বর্য লইয়াই কবি সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না, কবির হৃদয় অণুর অণু, প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা অনুসন্ধান করিতেই ব্যগ্র। তাঁহার দিব্যদৃষ্টি তাঁহাকে উচ্চানন্দের যে সমুদ্র দেখাইয়াছে তিনি অতৃপ্ত হৃদয়ে তাহার মধ্যে ডুবিতে তলাইয়া যাইতে ব্যগ্র।' একটি বিশেষ বোধ ও উপলব্ধির জগতে কবি ও বিজ্ঞানী যে সমানধর্মা সেই সত্যে লেখিকা কালক্রমে উপনীত হয়েছিলেন; সৃষ্টির ক্ষেত্রে উভয়ের যোগ্যতা এবং অলৌকিক ক্ষমতা স্বীকার করে তিনি স্বীয় চিন্তারাজির পরিণতির প্রমাণ দিয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে শেলির কুইন ম্যাব (১৮১৩) কাব্য অবলম্বন করে লেখিকা কবির প্রতিভা-বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করেছেন; এক্ষেত্রে শেলির বলিষ্ঠ আশাবাদ, মানবমাহাত্ম্যকীর্তন এবং জগতের মহান আত্মার (the world's Supremest Spirit) সঙ্গে প্রকৃতির আত্মার (spirit of Nature) সম্পর্ক প্রভৃতি তত্ত্ব আপনার বক্তব্যের অনুকূলে প্রযুক্ত হয়েছে।

একই প্রবন্ধে কবির ধর্ম সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'ছন্দোবন্ধে যিনি পুস্তক লিখিতে পারেন তিনিই কবি নহেন; যিনি যতই ভাবুক তিনিই তত কবি। প্রকৃত ভাবুক হইতে গেলে একটি অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি থাকা চাই যাহা দ্বারা তিনি জগৎসংসারের অন্তরনিহিত ভাবটি গ্রহণ করিতে পারেন।...কবির দিব্যদৃষ্টির সম্মুখে মিথ্যার মধ্যে যাহা সত্য, জড়ের মধ্যে যাহা প্রাণ, শরীরের মধ্যে যাহা আত্মা, স্থূলের মধ্যে যাহা সূক্ষ্ম, জগতের মধ্যে যাহা জগদতীত, অসংবদ্ধতা-অশোভনতা-বৈষম্যের মধ্যে যাহা সুন্দর-সুশোভন-সাম্য তাহা প্রকাশিত হয়। কবি

তাঁহার সেই স্বতোলব্ধ সত্য কল্পনায় সাজাইয়া ভাষায় ফুটাইয়া লোককে সজ্ঞান করিতে প্রয়াস করেন।' এ বিষয়ে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য রচনা 'কবিতা ও কবি' (ভারতী ও বালক, ভাদ্র ১২৯৫)। যদিও কাব্যতত্ত্বালোচনা এর প্রধান লক্ষ্য তথাপি প্রসঙ্গচ্ছলে বায়রন এবং শেলির মনোভঙ্গির তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। বায়রন শেলির তুলনায় 'নিম্নদরের কবি কেননা তাঁহার কবিতা প্রাণময়, শেলির আত্মাময়।...বায়রন সুনিপুণ চিত্রকর, সংসারে যাহা দেখিয়াছেন তাহাই জলন্ত ভাষায় চিত্রিত করিয়াছেন, বায়রন সংসারের কঠোর সমালোচক।...কিন্তু শেলির দৃষ্টি আর একরূপ। তিনি সংসারের অতীত হইয়া সংসার দেখিয়াছেন, অসীমতার মধ্য দিয়া সংসারকে নিরীক্ষণ করিয়াছেন।' এতদ্ব্যতীত সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক যেসকল কথা এই প্রবন্ধে বলা হয়েছে তা এইরূপ : 'জীবের যেমন প্রাণ কবিতার তেমনি ভাব। ভাবময় কবিতাই কবিতা।· যে ভাব মধুর সুন্দর আদর্শস্বরূপ, যে ভাব দ্বারা প্রকৃতির প্রাণের সহিত আমাদের প্রাণের, সসীমের সহিত অসীমের মিলন লাভ ঘটে, অন্তত সেই মিলন-পথে আমাদের লইয়া যাইতে যে ভাবের চেষ্টা তাহাই কবিতার ভাব। যে কবিতায় এইরূপ ভাবের যত আধিক্য সেই কবিতাই তত শ্রেষ্ঠ।··আলোক যেমন ইথরের আন্দোলন, জগতের সহিত অন্তরের মিলনজনিত কবিহৃদয়ের যে আন্দোলন তাহাই তাঁহার কবিতার ভাব।...বিশ্বসংসারের সহিত নিজের যেখানে যতই ঘনিষ্ঠ মিলন সেইখানেই এই ভাবের তত গভীরতা।' অর্থাৎ ছন্দোবদ্ধ বাক্যই কাব্য নয়; কবিত্ব এমন একটি অলৌকিক শক্তি যার সাহায্যে জগতের অন্তর্নিহিত ভাব চয়ন করে কবিগণ জগতের স্থায়ী উপকারসাধনে সক্ষম। বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির নিগূঢ় সম্বন্ধ বিচার, জীবনের সর্বস্তরে সহানুভূতিপূর্ণ আগ্রহ প্রকাশ, প্রকৃতির সঙ্গে কবিমনের একাত্মীভবন এবং জগৎ-চরাচরের অন্তরালবর্তী একটি অখণ্ড প্রাণপ্রবাহের স্বরূপসন্ধানের তৎপরতা প্রভৃতি এ প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

শ্রেষ্ঠ কবিতার ধর্ম সম্পর্কে অন্যত্র বলা হয়েছে, 'যে কবিতায় হৃদয় যত অভাবের ভাবে পূর্ণ করে, সেই কবিতাই তত ভাবময়, তত শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ একটি কবিতাই পড়িয়া যাহা পড়ি নাই, এমন শত শত ভাবে যখন হৃদয় ভরিয়া উঠে, তাহার সেই দৃশ্যত অভাবের সহিত অদৃশ্য ভাবের বন্ধনে হৃদয় এক হইয়া যায়, তখনই কবিতা পড়িয়া তৃপ্তি হয়, নহিলে যে কবিতায় সেই কবিতাটুকু মাত্র পড়ি, তাহা হইতে আর কোন অভাব হৃদয়ে জাগে না, তখন সেই অভাবের অভাবে কবিত্বেরই অভাব দেখা যায়।'[২০] বিক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত এই ক্ষুদ্রাবয়ব প্রবন্ধগুলিতে যেসকল সাহিত্যতত্ত্ব স্থানলাভ করেছে সেগুলি লেখিকার ব্যক্তিগত উপলব্ধি-সঞ্জাত, তাঁর সাহিত্যকৃতির মধ্যেই এদের প্রতিফলন লক্ষিত হয়।

২০ দ্র বিবিধ প্রসঙ্গ, ভারতী ও বালক, আষাঢ় ১২৯৫, পৃ ১৭৯।

৩

দিনলিপি, পত্র-প্রবন্ধ বা ভ্রমণসম্পর্কিত পত্রাকার নিবন্ধ রচনায় তাঁর কৃতিত্ব অসামান্য। নিসর্গের রূপবৈচিত্র্য সন্দর্শন এবং বিভিন্ন সমাজ ও মানবজাতির প্রত্যক্ষ পরিচয় অর্জন তথা প্রকৃতি ও মানবসমাজের নিবিড় সান্নিধ্যলাভের অভিজ্ঞতা রচনাগুলিতে পরিবেশিত; সর্বোপরি লেখিকার ব্যক্তিগত হৃদয়োত্তাপ এবং মানসিক প্রসন্নতা ও কৌতুকস্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়গুলিকে আস্বাদ্যমানতা দান করেছে।

দারজিলিং থেকে লিখিত পত্রাবলীর প্রথমটিতে (ভারতী ও বালক, বৈশাখ ১২৯৫) চলিত ভাষারীতি স্বীকৃত হলেও পরবর্তী চিঠিগুলিতে প্রায় সাধু ভাষাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। ১২৯৪ সালের শরৎকালে স্বর্ণকুমারী দারজিলিং গমন করেন;[২১] রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে এই যাত্রার কৌতুকপূর্ণ বর্ণনার পরিচয় পাওয়া যায়।[২২] দারজিলিং বাসের প্রথম দিকে লেখিকা অসুস্থ হয়ে পড়েন, 'দার্জিলিং এলেম।...এসেই শয্যাগত।' চিঠিগুলি পড়লে বোঝা যায় কোনো একজন অন্তরঙ্গ মহিলা কবিকে এগুলি লেখা হয়েছিল, ১২৯৫ সালের কার্তিক সংখ্যার ভারতীতে মুদ্রিত পত্রটি প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার চিঠিতে দারজিলিং নামের উৎপত্তি ও ইতিবৃত্ত অবতারণা করা হয়। শ্রাবণ সংখ্যার চিঠিটিতে জনৈক লিম্বুকন্যার সৌন্দর্যবর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁর কৌতুকপূর্ণ মন্তব্য উদ্ধৃত হল, 'আমার ভ্রাতৃজায়াটি তখনি আস্তে আস্তে বাংলায় বলিলেন, আমাদের গোয়ালিনী ইহার চেয়ে ঢের ভাল দেখিতে। তবে এ সম্বন্ধে তাঁর কথাটা ঠিক ধর্তব্যের মধ্যে নহে। কি শুভক্ষণে যে তিনি গোয়ালিনীকে দেখিয়াছেন জানি না, তার রূপে তিনি নিতান্তই মুগ্ধ। সে আসিলেই তাহাকে দেখিতে তাঁহার সময় কাটে, সে না আসিলে তাহার রূপের প্রশংসায় তাঁহার অন্য কাজ করিবার অবসর থাকে না। অন্য গোয়ালার দুধের দর আর গোয়ালিনীর জলের দর সমান, কিন্তু বৌঠাকুরানীর হাসি দেখিবার আশায় সেই জলই অমৃত বলিয়া আমাদের হাসিমুখে পান করিতে হয়।' এই পত্রেরই শেষাংশে শরৎচন্দ্র দাস-কৃত একটি ভুটিয়া গানের ইংরেজি তর্জমার স্বকৃত বাংলা অনুবাদ পরিবেশন করেছেন লেখিকা।

একটি পত্র থেকে জানা যায় যে দারজিলিঙের কাসলটন হাউসে থাকার সময় সন্ধ্যাকালীন পড়ার মজলিসে রবীন্দ্রনাথ টেনিসন ব্রাউনিং প্রভৃতির কবিতা পাঠ করে শুনাতেন তাঁদের। স্বর্ণকুমারী বলেছেন, 'টেনিসনের লেখা কোমল-মধুর, বসন্তের বাতাসের মত

২১ 'দার্জিলিং-এর পত্র প্রায় এক বৎসর আগে লেখা'—দ্র ভারতী ও বালক, ভাদ্র ১২৯৫, পৃ ২৫০, পাদটীকা।

২২ ছিন্নপত্র, ১৩৬৭: ৯ম পত্র, দার্জিলিং ১৮৮৭।

তাতে একটা মৃদু-উল্লসিত ভাব। টেনিসন শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে যখন কান্না পায় তখন শিশিরের মত দু-এক ফোঁটা জল ধীরে ধীরে চোখে দেখা যায়। কিন্তু ব্রাউনিং-এর লেখা কি জোরাল! শুনতে শুনতে হৃদয়ের মধ্যে একটা কারখানা হতে থাকে।· ব্রাউনিং-এর লেখা অনেকটা জর্জ এলিয়টি ধরণের। এক একটা কার্যের অনিবার্য ফল, মনুষ্যহৃদয়ের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাবের খেলা তিনি জলন্তরূপে চিত্রিত করেছেন। পাপের প্রতি তাঁর কি ঘৃণা! কোন কোন কবি অন্যায় কাজকেও এমন কোমল তুলি দিয়ে আঁকেন যে সেই অন্যায়ের প্রতিও তখনকার মত কেমন একটা মমতা জন্মে। কিন্তু পাপের অনিবার্য ভীষণ ফলের প্রতি ব্রাউনিং-এর মর্মগত বিশ্বাস দেখা যায়। ব্রাউনিং পড়তে পড়তে যে কান্না পায় সে যেন জমাট বরফ গলতে আরম্ভ হয়, সে কান্না হঠাৎ থামান যায় না। তাঁর Blot on the 'Scutcheon একবার পড়ে দেখ। এমন সুন্দর কাব্যনাট্য আর পড়েছি মনে হয় না।'[২৩] প্রসঙ্গান্তরে লেখিকা স্বীকার করেছেন যে ইতিপূর্বে তিনি ব্রাউনিং পড়েননি। লক্ষণীয় যে ইতিমধ্যে তাঁর কোনো কাব্যনাট্যও প্রকাশিত হয়নি। টেনিসন ব্রাউনিং এলিয়ট— ভিক্টোরীয় যুগের এই তিন প্রধানের সাহিত্যকর্মের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ক্রমশ নিবিড় থেকে নিবিড়তর হয়ে উঠতে থাকে, স্বর্ণকুমারীর গীতিকবিতা-নাট্যকাব্য-উপন্যাসের মধ্যে ছড়িয়ে-থাকা নানাবিধ নিদর্শন থেকেই তা প্রমাণিত হয়।

দারজিলিং থেকে বিদায়গ্রহণের কালে তাঁর চিত্ত বিচ্ছেদ-বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে, 'সৌন্দর্যের পূর্ণ অনুভবই যদি ভালবাসা হয়, আর সুন্দরের সহিত মিলনলাভই যদি ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা হয়, তবে এমন সুন্দর এমন মধুর যে দৃশ্য তাহার নিকট হইতে বিদায় লইতে যদি প্রাণ না কাঁদিবে ত কাঁদিবে কিসে?· এখানকার দৃশ্য দেখিয়া আমার এখনো আশা মিটে নাই। গাছপালা মেঘ পর্বত যা দেখি তাহাতেই ভোর হইয়া থাকি, আর নূতন প্রেমিকের মত মনে হয়, চিরদিন এই দৃশ্যের মধ্যে থাকিলেও আমার নিকট ইহা পুরাতন হইবে না।'[২৪]

গাজিপুর থেকে লিখিত তিনটি পত্র ভারতী ও বালকের ১২৯৬ সালের জ্যৈষ্ঠ শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রথম পত্রটি থেকে জানা যায় ১৮৮৮ সালের শ্রাবণ মাসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি গাজিপুর যাত্রা করেন, 'তিনজনে ত আমরা রাত্রে হাবড়ার মেলট্রেনে উঠিলাম। একজন কাশীধামে শ্বশুরালয়ে যাইবেন আর আমরা দুই ভাইবোনে গাজিপুরের যাত্রী।' আগে থেকে মৃণালিনী দেবী গাজিপুরেই ছিলেন। স্বর্ণকুমারী তাই লিখেছেন, 'বেলু-

২৩ ভারতী ও বালক, বৈশাখ ১২৯৫, পৃ ২৪।

২৪ ঐ, কার্তিক ১২৯৫, পৃ ৩৭৩-৭৪।

রানীর টুকটুকে মুখখানি ফুলের মত আমাদের চোখে ফুটিয়া উঠিল, তাহার হাত ধরিয়া আমার ভ্রাতৃজায়া' অভ্যর্থনা করলেন সমাগতদের। এই পর্যায়ের তৃতীয় পত্রটি থেকে বোঝা যায় যে এইসময় তাঁরা একবার গাজিপুর থেকে কাশী গমন করেন। যা হোক, সস্নেহ কৌতুকের সঙ্গে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ পরিবেশিত হয়েছে গাজিপুর পত্রাবলীতে; পথপরিক্রমার বিভ্রাট ও গাড়ির মধ্যে দুজনের কথোপকথনের একটি অন্তরঙ্গ চিত্র এখান থেকে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের স্বকপোলকল্পিত গাজিপুরের এক উদ্ভট ইতিহাস দ্বিতীয় পত্রে পাওয়া যাচ্ছে। এই ইতিহাসের সম্পাদক ও ভাষ্যকাররূপে লেখিকার সংযোজনটি উদ্ধৃতিযোগ্য: 'গাজিপুর যে গাধিপুরের অপভ্রংশ, অন্য কথায় গাধিরাজ যে গাজিপুরের স্থাপয়িতা তাহার ভূরিভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, আমার ভ্রাতৃপ্রবর এই প্রসঙ্গে তাঁহার নামও উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, শ্যামবাবুর মুখে ইহা আমরা শুনিয়াছি। তৃতীয়তঃ, শ্যামবাবুর বিশ্বাস দেশের লোকের মধ্যে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত। চতুর্থতঃ, আমরা এ সম্বন্ধে দ্বিরুক্তি করিলেই তাঁহার কথার অকাট্য প্রমাণস্বরূপ তিনি আমাদিগকে সহরের মধ্যে লইয়া গিয়া গাধিদুর্গের ভগ্নাবশিষ্ট দেখাইতে উদ্যত।' উপযুক্ত ইতিহাসের উপযুক্ত ব্যাখ্যা, এর টীকা নিষ্প্রয়োজন। কল্পনার এই বল্গাহীন স্বেচ্ছাচারের পর লেখিকা গাজিপুরের প্রকৃত ইতিহাস দিয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে বিদেশীয়ের ভারতবর্ষীয় ইতিহাসরচনাবৈশিষ্ট্যের প্রতি তিনি অঙ্গুলিসংকেত করেছেন, 'ইতিহাসের যাহা প্রধান বিষয় অর্থাৎ দেশের সাধারণ লোক এবং তাহাদের অবস্থা—তাহার সহিত ইহার কোনই সম্পর্ক নাই, ভারতবর্ষের কোন ইতিহাসেরই নাই। রাজারাজড়ায় যুদ্ধ বাধিয়াছে, তাহারা উলুখড়ের দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহা হইবারই কথা, সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে কিছু বলা ইতিহাস-লেখকগণ বাহুল্য বিবেচনা করিয়াছেন।' এক্ষেত্রে স্বর্ণকুমারীর ব্যঙ্গ ক্ষুরধার। পাশ্চাত্ত্য ঐতিহাসিকের ভারতবর্ষীয় ইতিহাস প্রণয়নের অসৎ উদ্দেশ্য ও অসাধু উপায়কে বঙ্কিমচন্দ্র লোকরহস্যের মধ্যে (১৮৭৪) যেমন শ্লেষের কশাঘাতে জর্জরিত করেছেন তেমনি বিবিধ প্রবন্ধের কোনো কোনো রচনায় সেই ইতিহাস রচনার প্রকৃত মানদণ্ড নিরূপণ করে দিয়েছেন। স্বর্ণকুমারীর দায়িত্বও কটাক্ষপাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না বা নিঃশেষিত হয়ে যায়নি, গাজিপুরের দ্বিতীয় পত্র এবং ঐতিহাসিক উপন্যাসাবলীর ভূমিকা বা উপসংহার তার সাক্ষ্য প্রদান করে।

'সোলাপুর, শ্রাবণ ১৮৯২' তারিখে লিখিত 'ভাই'-সম্বোধনযুক্ত পত্রটি (ভারতী ও বালক, ১২৯৮) থেকে জানা যায় এর 'দুই বৎসর আগে' অর্থাৎ ১৮৯০ সালে তিনি আরেকবার সোলাপুরে গিয়েছিলেন; এবার ১৮৯২ সালের শ্রাবণে বা তার অনতিপূর্বে পুনর্বার সোলাপুর গমন করেন এবং বর্তমান পত্রটি এই সময়ে লিখিত হয়। পত্রে সত্যেন্দ্রনাথের 'স্নেহময় সহাস্য মুখে'র কথা উল্লিখিত; রিপ ভ্যান উইঙ্কলের বিপন্ন অবস্থা, নির্জন হ্রদে চন্দ্রালোকে

নৌভ্রমণ বর্ণনাপ্রসঙ্গে স্কটের লেডি অফ দি লেকের কথা উত্থাপিত। ভাদ্র মাসে লিখিত অপর একটি চিঠিতে বলা হয়েছে, 'সম্প্রতি পুণায় একটা Fancy-Dress Ball হইবে, আমাদের যাইবার কথা আছে। আমি ভাবিতেছিলাম এদেশী রাণী সাজিলে হয়। তাই এখানকার একজন ভদ্রলোককে কতকগুলি গহনা জোগাড় করিয়া দিতে বলায় তিনি বলিলেন, তাহা হইলে নাকে বড় বড় মুক্তার নথ আর পায়ে মণ খানেক আন্দাজ মল পরিতে হইবে। তাহা শুনিয়া ভাবিলাম, কাজ নাই আমার রাণী সাজার। যাহা আছি বেশ আছি।' ১২৯৮ সালের পৌষ সংখ্যার চিঠি থেকে জানা যায় তাঁদের পুণা গমনের কথা, এবং ১২৯৯ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার চিঠিতে সেই ফ্যান্সি-ড্রেস বলের বিস্তৃত ও কৌতুকপূর্ণ বর্ণনা আছে। আষাঢ় সংখ্যার চিঠিতে 'হেঁয়ালিখেলা'র উল্লেখ পাওয়া যায়; এ চিঠিতেই একটি ইংরেজি কবিতার বাংলা অনুবাদ আছে। ১২৯৭ সালের মাঘ সংখ্যায় মুদ্রিত পুণার চিঠি থেকে জানা যায় যে রাণাডে, পণ্ডিতা রমাবাঈ প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় ঘটেছিল; লেখিকা রমাবাঈর শারদাসদনের ইতিহাস এবং বিধবাশ্রম পরিচালনার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন ঐসময়। বস্তুত সোলাপুর ও পুণার চিঠিগুলিকে কেবল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনা অথবা বিদেশী উৎসব-অনুষ্ঠানের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আচ্ছন্ন করে রাখেনি, বিচিত্র প্রকৃতির মানবসমাজ ও জন-কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ফলে তাঁর মানসিকতা-অভিজ্ঞতা যে পরিণততর হয়ে উঠছিল তার পরিচয়ও এখানে বর্তমান।

১৩০২ সালের ভাদ্র সংখ্যার ভারতীতে 'সমুদ্রে' নামক যে ভ্রমণকথা প্রকাশিত হয় তা অনেকটা দিনলিপি-জাতীয় রচনা। মে মাসের ৬ তারিখে নীলগিরির উদ্দেশ্যে তাঁর ষ্টীমারযাত্রা শুরু হয়। 'এই আমার প্রথম সমুদ্রযাত্রা নহে। প্রায় ১২ বৎসর পূর্বে প্রথমে বম্বে হইতে তিন দিনের সমুদ্রপথে কারোয়ার যাই, এবার যাইব নীলগিরি।' পৌষে প্রকাশিত 'নীলগিরি' প্রবন্ধ থেকে জানা যায় ১১ মে তারিখে তাঁরা মাদ্রাজে উপনীত হন। সমুদ্রের মহিমান্বিত সৌন্দর্যবর্ণনা আছে ভাদ্রের রচনাটিতে, 'আমরা এখন প্রকৃতই অকূল পাথারে চলিয়াছি। সমুদ্রের জল আর সবুজও নয়, অতি সুন্দর গাঢ় নীল জলরাশির তরঙ্গে তরঙ্গে শ্বেতোচ্ছ্বাস ফেনা উঠিয়া উঠিয়া আবার সুনীলে মিলাইয়া পড়িতেছে। যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল অতল অকূল সুনীল বিশাল জলস্রোত। অথচ ইহাতে সে অকূল দুস্তর ভয়াবহ ভাব নাই, সমুদ্রের সঙ্গে সঙ্গে আজন্মকাল যে অসীমতা কল্পনা করিয়াছি তাহাও নাই। একদিকে ব্রহ্মাণ্ড-কটাহ আপনার সুবিশাল বাহুদ্বয়ের প্রসারণে উভয় পার্শ্ব হইতে সিন্ধুকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া তাহার দিগন্তব্যাপী অসীমতাকে সীমা প্রদান করিয়া শিশুর মত ক্ষুদ্র করিয়া ফেলিয়াছে, অন্যদিকে এই ক্ষুদ্র জাহাজ স্বকৌশলপ্রভাবে বিশাল সমুদ্রপ্রভাবকেও আয়ত্ত বন্দী করিয়া তাহার দুস্তর অকূল ভাব হরণ করিয়াছে।' নিসর্গসৌন্দর্যভাবনা ও

আধ্যাত্মিক চিন্তার সমন্বয়ে স্বর্ণকুমারীর 'এ মধু প্রভাতে মধুর রবি' গানটির উদ্ভব-ইতিহাস ব্যক্ত হয়েছে 'নীলগিরি' প্রবন্ধে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকটও নিসর্গানুভূতি এবং ঈশ্বরচেতনা অভিন্নাকার ছিল। রবীন্দ্রজীবনে সদর স্ট্রীটের প্রভাত-উৎসবের মত স্বর্ণকুমারীর অভিজ্ঞতা-উপলব্ধির জগতে নীলগিরির এই বিশিষ্ট সূর্যোদয়টিও সুচিহ্নিত হয়ে রয়েছে।

নীলগিরি ভ্রমণের অভিজ্ঞতা অবলম্বনে 'নীলগিরির টোডা জাতি' (ভারতী, মাঘ ১৩০২) রচিত। ১৩১৭ সালের পৌষ সংখ্যায় একই শিরোনামে যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় তার ভূমিকায় লেখিকা বলেছেন, 'বহুদিন পূর্বে ভারতীতে নীলগিরি সম্বন্ধে একাধিক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। কিন্তু সে সঙ্গে তখন চিত্র ছিল না। টোডাদিগের ছবি দেখাইবার জন্যই প্রধানত পুনরায় সংক্ষিপ্তাকারে এই প্রবন্ধটি লিখিত হইল।' মাত্র দুটি চিত্র সংযোজিত হয়েছিল নূতন প্রবন্ধে। পত্র-প্রবন্ধ বা দিনলিপি কিংবা ভ্রমণকাহিনীর আকারে এটি রচিত হয়নি; নৃতত্ত্ব জাতিতত্ত্ব এবং আদিবাসীর জীবনযাত্রা-কেন্দ্রিক সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রবন্ধটি বিচার্য। ভ্রমণরচনার মধ্যে 'খুসি' (ভারতী, পৌষ ১৩১৮) চিত্রসর্বস্ব, মাত্র নয় পৃষ্ঠার প্রবন্ধে আটটি চিত্র আছে। প্রবন্ধারম্ভে লেখিকা বলেছেন, 'অনেক বৎসর পূর্বে প্রায় ছয় মাস কাল আমরা এলাহাবাদে বাস করিয়াছিলাম। সেই সময়ই খুসি দেখিতে যাই।' প্রয়াগ-সম্বন্ধীয় একাধিক প্রবন্ধ ভারতীতে প্রকাশিত হয়েছিল। 'প্রয়াগের দুয়েকটি দৃশ্যে'র আরম্ভে (ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯) বলা হয়েছে, 'বহুদিন পূর্বে একবার ভারতীতেই আমার প্রয়াগ দর্শনের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলাম।[২৫] কিন্তু ভারতীর সে সংস্করণ এখন নিঃশেষিত, পাঠকশ্রেণীও অধিকাংশ নূতন, সুতরাং আর একবার চিত্রাবলী সংযোগে সেইসকল পুরাতন কথাই নূতন আকারে লিখিলে বোধ করি অপাঠ্য হইবে না।' প্রধানত এই ত্রিবিধ কারণে প্রবন্ধটি অভিনবত্ব লাভ করে। জ্যৈষ্ঠে গঙ্গাযমুনা-সঙ্গম ও অক্ষয়বট, আষাঢ়ে 'খসরুবাগ', শ্রাবণে 'সুজানদ্বীপ' এবং ভাদ্রে 'প্রয়াগের কয়েকটি মন্দির' মুদ্রিত হয়; এদের চিত্র-সংখ্যা যথাক্রমে ছয়, এক ও তিন। শেষ প্রবন্ধের একটি মন্তব্য গুরুত্বপূর্ণ, 'প্রয়াগতীর্থ মন্দিরে মন্দিরে পরিপূর্ণ।...আমার মনে হয় সৌন্দর্যপূজার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতেই প্রথমত এরূপ স্থলে দেবাবির্ভাব কল্পনা করা হইয়াছে। বলিতে কি, আমাদের দেশের লোকের মত প্রকৃতি-পূজা করিতে, স্বভাবসৌন্দর্যে দেবত্ব আরোপ করিতে আর দ্বিতীয় জাতি নাই।'

২৫ বোধ হয় ১২৯৩ সালের ভারতী ও বালকে প্রকাশিত নামহীন লেখকের প্রয়াগ-বিষয়ক রচনাগুলির কথা এখানে বলা হয়েছে।

৪

পরিমাণে অল্প হলেও ব্যক্তিগত প্রবন্ধ রচনায় স্বর্ণকুমারীর কৃতিত্ব অসামান্য। তথাকথিত রীতিসম্মত বা ফর্মাল প্রবন্ধের তুলনায় এইজাতীয় অন্তরঙ্গ বা ফেমিলিয়ার রচনায় বিশ্লেষণ বা বিষয়গৌরব আপাতদৃষ্টিতে ন্যূনতর বলে মনে হয়। এলোমেলো ভাবনা কিংবা অসংলগ্ন আকস্মিক চিন্তা ও যুক্তিবন্ধনগত শৈথিল্যের জন্য এইজাতীয় নিবন্ধকে লঘু প্রকৃতির মনে হলেও এর অন্তরালস্থিত নিয়মরাজি নিতান্ত দুর্লক্ষ্য নয়। 'অবলীলাক্রমে রচনা করা আর অবহেলাক্রমে রচনা করা' বস্তুত এক জিনিস নয় কারণ 'খেয়ালের স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খল হলেও যথেচ্ছচারী নয়' এবং সেক্ষেত্রে তালচ্যুত বা রাগভ্রষ্ট হওয়ার কোনো অবকাশ নেই।[২৬] খেয়ালী রচনায় যৌক্তিক পারম্পর্যগত বিশ্লেষণসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রত্যক্ষ প্রয়াস নেই, তথাপি লেখকের ব্যক্তিত্ব বা জীবনদর্শনের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখলে তাঁর চিন্তার একটা বিবর্তন চোখে পড়বেই; এবং এই সূত্র অবলম্বন করে উপক্রমণিকা থেকে উপসংহার পর্যন্ত একটি অন্তর্নিহিত শৃঙ্খলারও সন্ধান পাওয়া যায়। এর সবচেয়ে উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য হল কবিব্যক্তিত্বের আশ্রয়টুকু। রবীন্দ্রনাথের মতে 'ইহার যদি কোনো মূল্য থাকে তাহা বিষয়বস্তুগৌরবে নয়, রচনারসসম্ভোগে'; কিন্তু তিনিও স্বীকার করেছেন যে এইরূপ খেয়ালী চিন্তা বা তথাকথিত 'বাজে কথা নিজের মতো করিয়াই বলিতে হয়।'[২৭] ছোট্ট একটি নুড়িকে ঘিরে জলের আবর্ত রচনার মত অকিঞ্চিৎকর বিষয়কে কেন্দ্র করে এই বিচিত্র প্রকৃতির প্রবন্ধের রচয়িতার ব্যক্তিত্ব ক্রমাগত প্রকাশের বৃত্ত গঠন করতে থাকে।

স্বর্ণকুমারীর এইজাতীয় খেয়ালী রচনা বা 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র মধ্যে স্বানুভূত আনন্দবেদনা আশাআকাঙ্ক্ষা প্রকাশ লাভ করেছে। গীতিকবিতার মত মন্ময়তাপ্রধান এই ক্ষুদ্রাবয়ব রচনাগুলি ভারতীতে 'বিবিধ প্রসঙ্গ' ও গ্রন্থাবলীতে 'বিবিধ কথা' আখ্যা লাভ করেছিল। ভারতী পত্রিকায় 'বিবিধ প্রসঙ্গ' অধ্যায়ে বিভিন্ন লেখকের নানা আত্মনিষ্ঠ ভাবনা প্রথমাবধি প্রকাশিত হয়, স্বর্ণকুমারীও এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। পূর্বালোচিত 'সমুদ্রে' নামক ভ্রমণমূলক দিনলিপি বা ডায়েরির অনুরূপ এই বিবিধ প্রসঙ্গ। একটি প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, 'জীবনের বাকি কখনো পুরে না। বাকিতেই জীবন। মুহূর্তের বাকি পুরাইতে দিবস, দিবসের বাকি পুরাইতে মাস, মাসের বাকি পুরাইতে বৎসর চলিয়া যায়। এইরূপে ক্ষুদ্র বাকির স্থলে কেবল অসংখ্য বাকি জমা হইতে থাকে— জীবনের বাকি পুরাইতে শেষে

২৬ প্রমথ চৌধুরী, বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ—প্রবন্ধসংগ্রহ, ১ম, ১৯৫২, পৃ ৩১; খেয়ালখাতা— প্রবন্ধসংগ্রহ, ২য়, ১৯৬৪, পৃ ২০০।

২৭ বিচিত্র প্রবন্ধের 'ভূমিকা' ও 'বাজে কথা' দ্রষ্টব্য।

জীবনটাই বাকি পড়িয়া যায়। সে-ই ভাগ্যবান যাহার জীবনের মুহূর্তও বাকি পড়ে নাই।'[২৮] এ যেন স্বগতোক্তি, নির্জন অবকাশে স্মৃতিচারণার মত; এই নির্জন মনের চিন্তাপ্রবাহ অবলম্বন করে ভাবনাশ্রিত ব্যক্তিত্বের উৎসে আমরা উপনীত হতে পারি। 'অসুখ কাহাকে বলে? অর্থাৎ অভাব। শারীরিক অসুখ অর্থাৎ শরীরের স্বাস্থ্যের অভাব। মনের অসুখ, অপরিতৃপ্তিজনিত অভাব।...কেবল হাহাকার! কি যে চাই কিছু বুঝিনে! মমতা, করুণা, সহানুভূতি, প্রেম—একি আকৃতিময় বস্তু, যে তাকে ধরতে চাওয়া? সে ত সমস্ত বিশ্বে পরিব্যাপ্ত; তবে কেন? শুধু কটাক্ষের জন্য, শুধু কথার জন্য, শুধু ভাষার জন্য, শুধু প্রকাশিত ভাবের জন্য ব্যাকুলতা।'[২৯] এক্ষেত্রে বাক্যের দৈর্ঘ্য বড়ই হ্রস্ব, চিহ্নপ্রকরণ-শব্দযোজনা-গঠনরীতিও সভঙ্গ বা অসম্পূর্ণ, কারণ ব্যাপারটি একান্ত ব্যক্তিগত। প্রসঙ্গের দ্রুত পটপরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তার যে ধারাবাহিক পরিবর্তন বা বিবর্তন ঘটতে পারে তার নির্ভরযোগ্য নিদর্শনস্থল সিদ্ধি (ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৯২), প্রেম (ভারতী ও বালক, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮) প্রভৃতি; এইজাতীয় রচনাতে লেখিকার ব্যক্তিত্ব-হৃদয় সর্বাধিক পরিমাণে সমুপস্থিত।

৫

স্বর্ণকুমারী দেবীর কতিপয় প্রতিনিধিস্থানীয় প্রবন্ধ সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচনার আবশ্যকতা রয়েছে। স্ত্রীশিক্ষা ও বেথুন স্কুল (ভারতী ও বালক, শ্রাবণ ১২৯৪) লেখিকার দূরদর্শিতা ও দরদী মনোভাবের পরিচয় বহন করে। স্ত্রীলোকের বিবিধ অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকল্পে রামমোহনের ভাবনারাজি[৩০] পরবর্তীকালের বুদ্ধিজীবীর মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। লঘু প্রকৃতির কৌতুক কবিতায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করলেও অন্যত্র তিনি এর অত্যাবশ্যকীয়তা অস্বীকার করতে পারেননি।[৩১] বেথুন স্কুলের সহায়তায় সেকালের অন্তঃপুরিকা বিদ্যাশিক্ষার মাধ্যমে বহির্জগতের সঙ্গে আত্মার সংযোগ অনুভবে সমর্থ হন, লেখিকার প্রসন্ন কল্যাণী দৃষ্টি বিদ্যালয়ের এই পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্যের

২৮ ভারতী ও বালক, আষাঢ় ১২৯৫, পৃ ১৭৮।

২৯ ঐ, মাঘ ১২৯৮, পৃ ৫৫০।

৩০ Brief Remarks regarding Modern Encroachments on the Ancient Rights of Females, 1822, Essay on the Rights of Hindoos over Ancestral Property according to the Law of Bengal, 1830.

৩১ সংবাদ প্রভাকর, ৭ আগষ্ট ১৮৫০। অপিচ দ্রষ্টব্য: স্ত্রীবিদ্যা বিষয়ে দুইজন স্ত্রীলোকের কথোপকথন—সংবাদ সাধুরঞ্জন, ২৮ মে ১৮৪৯।

উপর পতিত হয়েছে। 'মহিলাগণ সুশিক্ষিত হইলে পুরুষদিগেরই যে সুখ-সন্তোষ বৃদ্ধি হইবে, স্ত্রীলোকে মার্জিতরুচি মার্জিতবুদ্ধি মার্জিতজ্ঞান হইলে নিজের কর্তব্য যে সুচারুরূপে পালন করিতে পারিবেন, উপযুক্ত গৃহিণী উপযুক্ত সঙ্গিনী উপযুক্ত মাতা হইতে পারিবেন'—এই বোধ তাঁর নিকট অগ্রাধিকার লাভ করে। শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষার মাধ্যম স্বীকারের অভিপ্রায়টিও বর্তমান প্রবন্ধে ব্যক্ত হয়েছে। এ সম্বন্ধে তিনি বেথুন স্কুল-কমিটি ও সমগ্রভাবে বঙ্গসমাজের নিকট প্রবন্ধের শেষে আবেদন জানিয়েছেন, সংবাদপত্র-সম্পাদকগণকেও অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়েছে বিষয়টিকে জাতীয় সমস্যার রূপদানের জন্য। স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে এবং রমণীসমাজের উন্নতিসাধনকল্পে ইতিপূর্বে গৃহীত মহিলা-সম্মিলনের 'একটি প্রস্তাব' ভারতীর ১২৯২ সালের বৈশাখে মুদ্রিত হয়, সম্ভবত এর থেকেই স্বর্ণকুমারীর সখিসমিতির (১২৯৩) উদ্ভব।

যদিও তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার মূলে ছিল স্বাদেশিকতা তথাপি যে স্বদেশকল্যাণভাবনা জীবনের শ্রেষ্ঠ ও শাশ্বত নীতির পরিপন্থী তাকে তিনি কদাপি সমর্থন করেননি ; সন্ত্রাসবাদের আত্মঘাতী দিকের প্রতি কিংবা মানবসমাজের প্রচলিত মূল্যবোধের বিপর্যয়কারী ভাবনার প্রতি তাঁর ধিক্কার উচ্চারিত।[৩২] 'আমাদের কর্তব্য কোন পথে' (ভারতী, ১৩১৫) প্রবন্ধে জিঘাংসাবৃত্তিকে মূঢ়তা বলে অভিযুক্ত করা হয়েছে। অন্যায়-অত্যাচারকে কার্যোদ্ধারের উপায়রূপে গ্রহণ করলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল আসে না, কারণ 'অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি। ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।' অন্যায়-উচ্ছৃঙ্খলতা পরিণামে কাণ্ডজ্ঞানহীন সংক্রামক উন্মত্ততায় পর্যবসিত হয়, তখন স্বদেশ-উদ্ধার বা স্বদেশরক্ষা অথবা তার উন্নতিসাধনের পরিবর্তে তার হৃদয় আমরা শতধাদীর্ণ করে দিয়ে থাকি, We murder to dissect. 'হত্যাকার্যই অমঙ্গলজনক, বোমা নিক্ষেপে হত্যার প্রয়াস ঘোরতর অমঙ্গলের সংঘটয়িতা। একদিকে দোষী-নির্দোষ-নির্বিভেদে নরহত্যা ইহাতে অনিবার্য, অন্যদিকে এইরূপ গুপ্তহত্যায় জনসাধারণের মনে যেরূপ বিভীষিকাময় অশান্তি বিস্তার করে তাহা অতিশয় শোচনীয়। দেশের হিতসংকল্পী বালকদিগকে এই কার্যে ব্রতী দেখিয়া আমরা যার-পর-নাই সন্তপ্ত হইয়াছিলাম। এখন শুনিতেছি, কেবল ইহাই নহে—ডাকাতি লুটপাট করিয়া অর্থসঞ্চয় করা ইহাদের আর একটি উদ্দেশ্য ছিল। ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে দেশের আশাভরসা কোথায়!'[৩৩] সন্ত্রাসবাদের মধ্যে ফরাসীবিপ্লব-প্রসূত আতঙ্করাজ্যের সম্ভাবনা সংগুপ্ত ছিল বলে সেকালের চিন্তাবিদগণ এর প্রবল বিরোধিতা করেন। স্বর্ণকুমারীর নব-ডাকাতের ডায়েরী, মিলনরাত্রি, স্বপ্নবাণী প্রভৃতি রচনার মধ্যেও উপরোক্ত ভাবনাচিন্তা

৩২ দ্র গান্ধীপন্থীর সম্বর্ধনা—ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২।

৩৩ রাজনৈতিক প্রসঙ্গ—ভারতী, শ্রাবণ ১৩১৫।

বাণীবিগ্রহ লাভ করেছিল। প্রসঙ্গক্রমে ভারতী পত্রিকার ১৩১৫ সালের জ্যৈষ্ঠে মুদ্রিত 'লর্ড কর্জন ও বর্তমান অরাজকতা', ভাদ্রের 'আমাদের কর্তব্য' প্রভৃতি প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। ঐসকল প্রবন্ধে সুশাসক ইংরেজের তিনি যেমন পক্ষপাতী তেমনি তার দুঃশাসনের বিরোধিতায়ও তিনি উচ্চকণ্ঠ। স্বাধীনতা অর্জনের উপায়রূপে ঐক্য একান্ত কাম্য, 'ইংরাজ শাসনই আমাদের প্রকৃত হীনতার কারণ নহে। যদি কখনও সত্য সত্য জাতিবর্ণ-নির্বিচারে আমরা সমগ্র ভারতবাসী দৃঢ়গ্রথিত প্রাচীরের ন্যায় এক হইতে পারি, তখনই সহস্র ঝটিকা-ঘাতে অটল থাকিয়া আমরা একটা মহৎ জাতি হইতে পারিব।'

ভারতী-সম্পাদিকারূপে প্রয়োজনবোধে পত্রিকার অন্যান্য রচনার সমালোচনা করেছেন তিনি বিভিন্ন সময়ে। 'নব্যবঙ্গের আন্দোলন'[৩৪] নামক রচনাটি সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেন, 'লেখক আমাদের এখনকার পলিটিকাল আন্দোলন যেরূপ অসার মনে করেন একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখিবেন তাহা নহে। এই আন্দোলনের মধ্যেই কাজ করিবার একটি ইচ্ছা, জাতীয় মহত্বলাভের দিকে অগ্রসর হইবার একটি উদ্যম প্রকাশ পাইতেছে। তবে লেখক একদিনেই যদি আমাদের শত শত বৎসরের অবনতির বিনাশ দেখিতে চান তবে কি করিয়া পাইবেন?' ইত্যাদি। ১২৯৭ সালের ভারতী ও বালকের শ্রাবণ সংখ্যায় বলেন্দ্রনাথের 'রাধা' এবং অগ্রহায়ণে 'যশোদা' প্রকাশিত হয় এবং 'উভয় প্রবন্ধ সম্বন্ধেই সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী কিছু বিরুদ্ধ মন্তব্য করেন।'[৩৫] এই বিরুদ্ধতার উত্তরে বলেন্দ্রনাথের 'কৈফিয়ৎ' প্রকাশিত হয় ঐ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় এবং পরিশেষে এই 'কৈফিয়তে'র উপরেও মন্তব্য করা হয়েছিল। এই বাদ-প্রতিবাদ থেকে লেখিকার ধ্যানধারণার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। বলেন্দ্রনাথের রচনায় যে অস্পষ্টতা ও পরস্পরবিরোধিতা লক্ষিত হয় লেখিকা তারই প্রতিবাদ করেন, কোথাও কোথাও বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যার মাধ্যমে লেখিকা বলেন্দ্র-বক্তব্যকে স্পষ্ট করে তুলেছেন। প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যানুশীলনের ফলে পরিমার্জিত মন এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা অবলম্বন করে বলেন্দ্রনাথ প্রাচীন সাহিত্য বিশ্লেষণে তৎপর; পক্ষান্তরে রক্ষণশীল না হয়েও এবং পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যাদর্শ সম্পর্কে সচেতন থেকেও লেখিকার মন ঐতিহ্যানুসারী। টর্কিটো ট্যাসোর (ভারতী, পৌষ ১২৮৯) জীবন ও কাব্য আলোচনা এবং বিভিন্ন সময়ে শেলি-ব্রাউনিং টেনিসন-এলিয়টের রচনাবলী বিশ্লেষণ করেছেন স্বর্ণকুমারী। আবার সমকালীন বাংলা সাহিত্যের সমালোচনায়ও তিনি আদৌ পরাঙ্মুখ ছিলেন না। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য

৩৪ ভারতী ও বালক, আশ্বিন ১২৯৬। প্রবন্ধের লেখক সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ। ৩৪০ পৃষ্ঠার পাদটীকায় স্বর্ণকুমারীর মন্তব্য পরিবেশিত।

৩৫ বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী, সাহিত্য-পরিষৎ সং, ১৩৬৪, পৃ ৩৬৫।

সম্পর্কেও তাঁর পরিণত চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায় সীতা ও শকুন্তলা চরিত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটন-কালে (ভূমিকা : ভারতী, বৈশাখ ১২৯১)। যা হোক বলেন্দ্র-প্রবন্ধ সম্বন্ধে স্বর্ণকুমারীর বক্তব্য পরোক্ষত সমর্থিত হয় মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের 'মন্তব্য' (ভারতী ও বালক, শ্রাবণ ১২৯৭) নামক প্রবন্ধে। ঐ প্রবন্ধে লেখক বলেছিলেন, 'বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী কবি-রচিত রাধাকৃষ্ণের লীলা ও চরিত্র বুঝিতে হইলে উহার আধ্যাত্মিক ভাব সর্বত্র স্মরণ রাখিতে হইবে এবং বিশেষ কারণ না থাকিলে আধ্যাত্মিক ভাবেই উহাকে গ্রহণ করিতে হইবে।… যদি সমালোচিত কবিতাসকলে আধ্যাত্মিক ভাব না থাকিত ও যদ্যপি ঊনবিংশতি শতাব্দীতে ইয়ুরোপে ক্রমগঠিত সমাজ-সম্মত স্ত্রীপুরুষের প্রণয়ের আদর্শ রাধাকৃষ্ণের প্রণয়ের আদর্শ হইত তাহা হইলে প্রবন্ধদ্বয়[৩৬] নির্দোষ হইত।' বৈষ্ণব-সাহিত্যের আধ্যাত্মিকতা-বর্জিত বিশুদ্ধ কাব্যসৌন্দর্য আলোচনা সম্বন্ধেও লেখিকার আপত্তি উত্থাপিত। বলেন্দ্রনাথের সর্বশেষ মন্তব্যের নোটে সম্পাদিকা বলেন, 'লেখক যদি বৈষ্ণব কবির রচনায় আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য স্বীকার করেন তাহা হইলে আর আমাদের উত্তর দিবার বিশেষ কিছুই নাই। কেননা উদ্দেশ্যকে স্বতন্ত্র করিয়া কোন বিষয়ের প্রকৃত সমালোচনা হইতে পারে না।…লেখক যদি বৈষ্ণব কবির রচনায় আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য অস্বীকার না করেন তাহা হইলে সেই উদ্দেশ্য কাব্যে কিরূপ প্রকাশ পাইয়াছে তাহা না দেখিয়া বিশুদ্ধ কাব্য হিসাবে ইহার সমালোচনা করিলে কি ইহা নির্দোষ সমালোচনা বলা যাইতে পারে ?' দেখা যায় প্রতিপক্ষের মত খণ্ডনে ও স্বীয় বক্তব্য উপস্থাপনে-প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত হয়েছে সমালোচকের অপূর্ব যুক্তিনিষ্ঠা ও সূক্ষ্ম রসবোধ।

ভারতী পত্রিকায় মুদ্রিত বলেন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আরও অনেকের প্রবন্ধের উপর সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত বা টীকা সংযোজিত হয়েছে। কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়ের 'পঠদ্দশায় বিবাহ' (জ্যৈষ্ঠ ১২৯৩), বিজয়লাল দত্তের 'রাজনৈতিক কার্যসমিতি' (অগ্রহায়ণ ১২৯৫), দীনেশচন্দ্র সেনের 'মাসিক পত্রের ত্রুটি' (জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫), বিপিনচন্দ্র পালের 'ভারত ও বিলাত' (আশ্বিন ১৩১৭), মৈমুদ্দীন হোসেনের 'হিন্দুমুসলমানের একতা' (মাঘ ১৩১৭) প্রভৃতি তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

'বেঙ্গলি' জাহাজের নামকরণ-অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণসহ স্বর্ণকুমারীর একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হয় ১৩২২ সালের আষাঢ় সংখ্যার ভারতীতে। লেডি জেনকিন্সের নিমন্ত্রণে 'নানা দেশের নানা বেশের মহিলাগণ কেবল সমবেত' হয়েছিলেন একটি ভোজ-উৎসবে ; 'কল্পবেশ সম্মিলন' শীর্ষক সচিত্র প্রবন্ধে (ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭) তার হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা বর্তমান। 'ইংরাজদিগের ক্রীড়াকৌতুক' রচনার (ঐ, আশ্বিন ১৩১৭) আরম্ভে লেখিকা বলেছেন,

---

৩৬ প্রমথ চৌধুরীর 'জয়দেব' (ভারতী ও বালক, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭) এবং বলেন্দ্রনাথের 'রাধা'।

'সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্টের কোন জজপত্নীর বাড়ি মহিলাগণের প্রবাদ সাজিয়া যাইবার নিমন্ত্রণ ছিল। সকলেই কোন একটা প্রবাদ বাছিয়া তাহার চিহ্ন ধারণ করিয়া গিয়াছিলেন।' এই প্রবন্ধটিতে প্রশ্নোত্তর-খেলা, ছন্দমিলের খেলা, বারোয়ারি উপন্যাস রচনা, হেঁয়ালিনাট্য-অভিনয় প্রভৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। মূলত সমসাময়িক ঘটনার তথ্য বা সংবাদ পরিবেশন এই প্রবন্ধগুলির বৈশিষ্ট্য বলে এগুলি বহুল পরিমাণে সাংবাদিকতার লক্ষণাক্রান্ত। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস রচনাকালে তিনি গ্রন্থের ভূমিকায় অথবা পরিশিষ্টে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সত্যতা বিচার বা স্বরূপ সন্ধান করেছেন। দীপনির্বাণের উপক্রমণিকা কিংবা মিবাররাজের উপসংহার এই-জাতীয় রচনার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। যেসকল আকর গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা থেকে তিনি উপযোগী তথ্য আহরণ করেন তার উৎসও নির্দেশিত হয়েছিল প্রবন্ধের পাদটীকায়। ১২৯৪ সালের ভারতী ও বালকের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় মুদ্রিত হয় 'রাণাবংশে ইরানীত্ব আরোপ'; পরে মিবার-রাজের পরিশিষ্টরূপে এটি ব্যবহৃত হয়। ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি রচনাকালে তিনি প্রধানত ব্রিগস-এলিয়ট-মেটকাফ-হিবর-বেগলাল-কানিংহাম-টড-হালহেডের রচনাবলীর দ্বারস্থ হন; কবিচন্দ্রের কাব্য, এলফিনস্টোনের হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া এবং জার্নাল অফ দি এসিয়াটিক সোসাইটি ফর বেঙ্গল প্রভৃতিও বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছিল। লক্ষণীয় যে লেখিকার তথ্যপ্রীতি ও সত্যনিষ্ঠা আবেগ ও উদ্দেশ্যমূলকতাকে অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছিল।

পরিশিষ্ট

ব্রাহ্মবিবাহ প্রসঙ্গ ও স্বর্ণকুমারীর বিবাহবিবরণ[১]

॥১॥ বঙ্গদেশে প্রচলিত বিবাহ-ব্যবস্থার ইতিহাস পর্যালোচনাকালে গবেষক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, 'রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক "ব্রাহ্মধর্ম্ম" প্রবর্ত্তিত হইলেও তাঁহার সময়ে এবং তাঁহার পরবর্ত্তী আচার্য্য মহর্ষি ৺দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময়েও ব্রাহ্মসমাজের নরনারী হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত বর্ণ এবং জাতির ভেদ এবং প্রাচীন বিবাহ-ব্যবস্থা মানিয়া চলিতেন। কলিকাতাস্থিত আদি ব্রাহ্মসমাজে এখনও আমাদের পুরাতন বিবাহ-পদ্ধতিই চলিতেছে; কেবল বৈদিক সংস্কৃত ভাষার মন্ত্রগুলির বাঙ্গালা অনুবাদ পড়া হয়, এইমাত্র প্রভেদ আছে।'[২] বঙ্গদেশীয় বিবাহ-অনুষ্ঠানরীতি দেবেন্দ্রনাথের (১৮১৭-১৯০৫) মনঃপূত না হওয়ায় পরবর্তী কালে তাঁর নেতৃত্বে ও উৎসাহে ব্রাহ্মবিবাহে অভিনব ব্যবস্থাদি অবলম্বিত হতে থাকে; এবং মহর্ষির তৃতীয় কন্যা বা অষ্টম সন্তান সুকুমারী দেবীর (? ১৮৫০-৬৪) বিবাহ (১২ শ্রাবণ ১৭৮৩ শক, ২৬ জুলাই ১৮৬১) ব্রাহ্মধর্মের এই নববিধানানুযায়ী প্রথম বিবাহরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে। মহর্ষির চিঠিপত্র পাঠে বোঝা যায় যে এই বিবাহের বেশ কিছুকাল আগে থেকেই ব্রাহ্মগণের উপনয়ন বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি উৎসব-অনুষ্ঠানের পদ্ধতি ও জাতিভেদ প্রথার সংস্কার সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে চিন্তা করতে থাকেন।[৩] সুকুমারীর বিবাহ সম্পর্কে পিতা দেবেন্দ্রনাথ বলেছেন, 'পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যবস্থানুসারে আমার কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তিনি আমার আশার অতীত ফল প্রদান করিয়াছেন। আমি যে জীবন্ত থাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্যবস্থার অনুযায়ী অনুষ্ঠান দেখিলাম, ইহাতেই আমার জীবন সার্থক বোধ হইতেছে।...আমার নিজ পরিবারে আর পৌত্তলিকতার গন্ধও রহিল না। ইহাতে আমার আর আর জ্ঞাতিকুটুম্ব সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। গণেন্দ্র পর্য্যন্ত সেই বিবাহের দিনে উপস্থিত ছিলেন না। কত লোক কত কথাই বলিতেছে।'[৪]

উপর্যুক্ত বিবাহের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ও অনতিপরবর্তী কালে লিখিত মহর্ষির পত্রাবলী পাঠে অবগত হওয়া যায় যে তিনি রাজনারায়ণ বসুর (১৮২৬-৯৯) কন্যা স্বর্ণলতাকে নবপ্রচলিত ব্রাহ্মবিধান অনুসারে সম্প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। এই শুভকর্মে প্রধান অন্তরায় ছিলেন রাজনারায়ণের পিতামাতা। ২৫ সংখ্যক পত্রে (৭ আষাঢ় ১৭৮৩ শক)

১ বর্তমান গ্রন্থের 'বিবাহ ও বিবাহপরবর্তী কয়েকটি ঘটনা' অধ্যায় (পৃ ৫৮-৬০) দ্রষ্টব্য।

২ বিজয়ভূষণ ঘোষচৌধুরী, আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধতি, ১৩৪৮, পৃ ১৩১।

৩ দ্র পত্রাবলী : সংখ্যা ৩৮, ৮ মাঘ ১৭৭৫ শক, পৃ ৪৮-৪৯; সংখ্যা ৩৯, ১৫ মাঘ ১৭৭৫ শক, পৃ ৫০-৫১।

৪ ঐ, সংখ্যা ২৬, ২৫ ভাদ্র ১৭৮৩ শক, পৃ ৩০।

মহর্ষি বলেছেন, 'স্বর্ণলতার বিবাহ যেমন বংশের সহিত প্রচলিত ব্যবহার মত হইতে পারে তাহাই কর্ত্তব্য। তুমি যথার্থ লিখিয়াছ যে, রাজনিয়ম প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে জাতিভঙ্গ করিলে বিশৃঙ্খল হইবার সম্ভাবনা। রাজনিয়ম দ্বারা যাহাতে শঙ্কর বর্ণে বিবাহ সিদ্ধ হইতে পারে এমত চেষ্টা করা এইক্ষণে বিহিত বোধ হইতেছে।' স্মরণীয় যে এই চিঠির প্রায় মাসাধিক কাল পরে স্বকুমারীর বিবাহ সম্পন্ন হয় এবং তখনও ব্রাহ্মবিবাহ আইন প্রচলিত হয়নি। ২৭ সংখ্যক পত্রে (৩১ ভাদ্র ১৭৮৩ শক) বলা হয়েছে, 'যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের ব্রত কি কঠিন ব্রত। তোমার পিতা মনেও করেন নাই যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলে এমন "শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম পথে" তোমায় চলিতে হইবে।… তোমার হৃদয়ের ব্রহ্মাগ্নি যখন আমি মনে করি, তখন বুঝিয়া উঠিতে পারি না যে, তুমি কেমন করিয়া সম্প্রদানশালাতে সর্ব্বস্রষ্টা পরব্রহ্মের স্থানে ক্ষুদ্র অযোগ্য সৃষ্ট বস্তু আনিয়া পবিত্র হৃদয়ে প্রাণ-প্রতিমা স্বর্ণলতার শুভবিবাহ সম্পন্ন করিবে।…সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের সাক্ষাতে কন্যা সম্প্রদান করিলে সে বিবাহ সিদ্ধ হইবে না, আর কীটাবাস শিলাকে পূজা করিয়া বিবাহ দিলে তাহা সিদ্ধ হইবে ইহা হইতে বিপরীত কথা আর কি আছে? ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যবস্থা প্রচলিত জন্য রাজনিয়মের সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইবে, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু যদি সে প্রার্থনা সিদ্ধ না হয়, তাহাতেই বা কি?' ১৩ মাঘ ১৭৮৪ শকে লিখিত ২৯ সংখ্যক চিঠিতে দেবেন্দ্রনাথ বলেছেন, 'তোমার কন্যার বিবাহে তুমি ব্রাহ্মধর্ম্মকে অতিক্রম করিবে না।…বিবাহের সময় জামাতাকে মধুপর্ক, অঙ্গুরী, আসন, বস্ত্র দিয়া যে অভ্যর্থনা করা হয়, তাহাতে কিছু মধুপর্ক অঙ্গুরী আসন বস্ত্রাদির পূজা হয় না কিন্তু সেই সকল সামগ্রীর দ্বারা বরের অর্চ্চনা ও অভ্যর্থনা করা হয়। কিন্তু ব্রাহ্মবিবাহে বরকে অঙ্গুরী আদি দিয়া অভ্যর্থনা না করিলেই যে সে বিবাহ সিদ্ধ হইবে না, এমত নহে। যদি তুমি বরকে অভ্যর্থনা না করিয়া তাহাকে কেবল কন্যা সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা কর, তাহা করিবে, তাহাতে কোন ব্রাহ্মের আপত্তি নাই।' দেবেন্দ্রনাথের ১০, ১৪ এবং ১৫ সংখ্যক পত্র পাঠে (তারিখ যথাক্রমে ২৩ বৈশাখ ১৭৯৩ শক, ৮ পৌষ ১৭৯৩ শক এবং ৩ বৈশাখ ১৭৯৪ শক) বোঝা যায় ব্রাহ্মবিবাহ-আন্দোলন সে সময় কি পরিমাণ সাড়া তুলেছিল। খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রকথা' গ্রন্থে (পৃ ২৫-৩৩) এবং অজিতকুমার চক্রবর্তীর 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' গ্রন্থে (পৃ ৪৯৯-৫৩০) ব্রাহ্মবিবাহ-আন্দোলনের কথা সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ১৭৮৩ শকের শ্রাবণ সংখ্যায় (পৃ ৬৭-৬৮) 'ব্রাহ্মবিবাহ' শিরোনামে একটি সংবাদ পরিবেশিত হয়। এর সর্বশেষ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'সমাজ ভঙ্গ হইলে সকল ব্রাহ্মের মুখেই সন্তোষের লক্ষণ লক্ষিত হইল। ঈশ্বরের নিকটে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত প্রার্থনা যে তিনি ব্রাহ্মগণের মনে এ প্রকার বল ও বুদ্ধি প্রেরণ করুন যাহাতে তাঁহারা

ব্রাহ্মধর্মকে মধ্য স্থলে রাখিয়া সংসারের তাবৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারেন।' ঐ বৎসরের ভাদ্র সংখ্যায় (পৃ ৮১-৮৪) সুকুমারীর বিবাহের যে বিস্তৃত বিবরণ মুদ্রিত হয় তার কিয়দংশ এইরূপ: 'ব্রাহ্মবিবাহ। গত ১২ শ্রাবণ শুক্রবার ব্রাহ্মধর্মের ব্যবস্থানুসারে শ্রীযুক্ত রাজারাম মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কন্যার শুভবিবাহ অতি সমারোহপূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মানুযায়ী বিবাহের এই প্রথম সূত্রপাত হইল। বিবাহসভায় লোকের বিস্তর সমারোহ হইয়াছিল। আহ্লাদের বিষয় এই যে প্রায় দুই শত ব্রাহ্ম সভাস্থ হইয়া যথাবিধানে কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাহা যেরূপ পদ্ধতিক্রমে নির্ব্বাহ হইয়াছে অবিকল তাহা নিম্নে প্রকটিত করা গেল।' অতঃপর মঙ্গলবাচন, অভ্যর্থনা, ব্রহ্মোপাসনা, সম্প্রদান ও উপদেশাদি পর্যায়ে ক্রিয়াকলাপের সমূহ পরিচয় দেওয়া হয়েছে; বৈদিক মন্ত্র এবং তার বাংলা-ভাষ্যগুলিও বর্জিত হয়নি। অভ্যর্থনা-পর্যায়ে স্ত্রী-আচারের উল্লেখ আছে। আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, বেচারাম চট্টোপাধ্যায়, অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় অনুষ্ঠান-সম্পাদনে সহায়তা করেন। ব্রহ্মোপাসনার পূর্বে একটি ব্রহ্মসংগীত গীত হয়। সর্বশেষে উপাচার্য শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ দম্পতিকে উপদেশ প্রদান করেন বাংলায়।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৮৫৪ শকের ফাল্গুন সংখ্যায় খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রথম ব্রাহ্মবিবাহের বিবরণ—বিলাতী সংবাদপত্রে' নামক একটি রচনা মুদ্রিত হয় (পৃ ৩০১-০৫)। পাদটীকা থেকে জানা যায় চার্লস ডিকেন্সের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'অল দি ইয়ার রাউণ্ড' নামক সাপ্তাহিক পত্রের একটি সংখ্যায় (৫ এপ্রিল ১৮৬২) প্রকাশিত হয়েছিল উক্ত 'বিবরণ'; খগেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মবিবাহ-বিবরণের যে ইংরেজি অংশটি তাঁর প্রবন্ধে পরিবেশন করেন তা ডিকেন্সের ঐ পত্রিকা থেকেই গৃহীত। সেই ইংরেজি প্রবন্ধটির লেখক হলেন রাখালদাস হালদার (১৮৩২-৮৭)। 'রবীন্দ্রকথা' গ্রন্থের মধ্যেও (পৃ ২৮) খগেন্দ্রনাথ রাখালদাসের এই অনুবাদের উল্লেখ করেছেন। যা হোক তত্ত্ববোধিনীর প্রবন্ধের প্রারম্ভে খগেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন, 'সকলেই জানেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার কন্যা সুকুমারী দেবীর বিবাহের সময় পৌত্তলিকতা-বর্জ্জিত অনুষ্ঠানপদ্ধতি রচনা করিয়া সেই অনুসারে বিবাহ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তখন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মদিগের গার্হস্থ্য জীবনের কোনও কার্য্যের স্বতন্ত্র অনুষ্ঠানপদ্ধতি প্রস্তুত হয় নাই।' তিনি আরও বলেছেন যে দেবেন্দ্রনাথ বাংলায় এই বিবাহের অনুষ্ঠানপদ্ধতি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন এবং সেই পুস্তিকা অবলম্বনেই রাখালদাসের ইংরেজি প্রবন্ধটি রচিত হয়েছিল। 'যখন সুকুমারী দেবীর বিবাহ হয় তখন ব্রাহ্ম-আন্দোলনে প্রসিদ্ধ ২৪পরগণা জগদ্দলনিবাসী রাখালদাস হালদার বিলাতে ছিলেন। তিনি বিলাতের প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্স সম্পাদিত "All the Year Round" নামক সপ্তাহিক পত্রের

১৮৬২ খৃঃ ৫ই এপ্রেল তারিখের সংখ্যায় (Vol. vii, p 80) এই বিবরণ লেখেন। বিবরণটি সূচীপত্রে "Brahma Marriage, A" বলিয়া উল্লিখিত ; কিন্তু বিবরণের হেডিং-এ আছে "A Curious Marriage Ceremony".'

মহর্ষির তৃতীয় পুত্র বা চতুর্থ সন্তান হেমেন্দ্রনাথের (১৮৪৪-৮৪) বিবাহও ব্রাহ্মধর্মের নববিধান অনুযায়ী সম্পন্ন হয়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৭৮৫ শকের পৌষ সংখ্যায় (পৃ ১৪৭) বলা হয়েছে, 'ব্রাহ্মবিবাহ। পাঠকবর্গ ইতিপূর্ব্বেই শ্রুত হইয়া থাকিবেন যে, গত ১১ অগ্রহায়ণ ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভবিবাহ ব্রাহ্মধর্ম্মমতে সাত্রাগাছী গ্রামে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কন্যাকর্ত্তার নাম শ্রীযুক্ত হরদেব চট্টোপাধ্যায় এবং কন্যাটির নাম শ্রীমতী নীপময়ী দেবী। এই বিবাহোপলক্ষে প্রায় ২০০ কলিকাতাস্থ ব্রাহ্ম বরের অনুযাত্র হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতিরেকে সাত্রাগাছীরও কোন কোন ব্রাহ্ম উপস্থিত ছিলেন। বিবাহ-রাত্রিতে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৪৫০।৫০০ লোকের সমাগম হইয়াছিল। ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান প্রারম্ভাবধি একাল পর্য্যন্ত বিবাহ বিষয়ে দুইটি কার্য্য সম্পন্ন হইল।' স্পষ্টই বোঝা যায় ব্রাহ্মবিবাহের এটি দ্বিতীয় অনুষ্ঠান, আবার মহর্ষির পুত্রগণের দিক থেকে এটি প্রথম ব্রাহ্মবিবাহ। যা হোক ঐ একই সংখ্যায় হেমেন্দ্রনাথের বিবাহের পূর্ণ বিবরণ পরিবেশিত হয়েছে 'বিগত ১১ অগ্রহায়ণে যে ব্রাহ্মবিবাহ হইয়া গিয়াছিল তাহার বিবরণ' (পৃ ১৫৬-৫৮) এই শিরোনামে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে '৩৭৪ নং আপার চিৎপুর রোড, জোড়াসাঁকো, কলিকাতা, "পুণ্যযন্ত্রে" এবাদত খাঁ কর্তৃক মুদ্রিত/সন ১৩১০ সাল ৭ই আষাঢ়' এই তারিখ-ঠিকানায় প্রকাশিত 'আমার বিবাহ' নামক পুস্তিকায় হেমেন্দ্রনাথ এই বিবাহের বর্ণনা দিয়েছেন।

।২। স্বর্ণকুমারীর বিবাহবিবরণ প্রকাশিত হয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৭৮৯ শকের পৌষ সংখ্যায় (পৃ ১৭৭-৮০)। এই বিবাহ সম্পর্কে অজিতকুমার চক্রবর্তী মন্তব্য করেছেন, 'হিমালয়ে যাইবার পূর্ব্বে ১৭৮৯ শকে, ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি (মহর্ষি) একটুখানি নূতন ধরণের দুইটি সামাজিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। একটি তাঁহার সাম্বৎসরিক পিতৃশ্রাদ্ধ, শুক্লা নবমী ২৪ শ্রাবণ তারিখে তাহা সম্পন্ন হয়। আর একটি তাঁহার চতুর্থ কন্যা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর বিবাহ, ২রা অগ্রহায়ণ তারিখে তাহা সম্পন্ন হয়। নূতন ধরণের মধ্যে এই যে, এই দুই অনুষ্ঠানেই হিন্দুসমাজের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং ব্রাহ্মণপণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন।...কন্যার বিবাহের অনুষ্ঠানে সপ্তপদীগমন এক নূতন অঙ্গ পদ্ধতিতে যোগ করা হইয়াছিল।'[৫] এই বিবাহের আরও স্বাতন্ত্র্য ছিল। সরলা দেবীর জীবনের

অজিতকুমার চক্রবর্তী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ ৪৭৩।

ঝরাপাতা (১৮৭৯ শক) গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে জানকীনাথ ঘোষাল ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত না হয়েও এই ব্রাহ্মবিবাহ করেন, এবং পরে ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য জামাতার মত তিনি গৃহজামাতা ছিলেন না।* আরও বলা যায় যে, 'অনুষ্ঠানপদ্ধতি' নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়, 'বিবাহের পর ভর্তা সস্ত্রীক স্বালয়ে আগমন করিলে সপ্তাহের মধ্যে' উদীচ্য কর্ম সম্পন্ন হওয়া উচিত; কিন্তু বিবাহের 'তৃতীয় দিবসে উদীচ্য কর্ম্ম যথাবিধি' সম্পাদিত হলেও তা জানকীনাথের 'স্বালয়ে' হয়নি।

যা হোক, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা থেকে এই বিবাহবিবরণের প্রয়োজনীয় অংশ নিয়ে মুদ্রিত হল:

ব্রাহ্মবিবাহ।

গত ২ অগ্রহায়ণ রবিবার ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ কন্যার সহিত কৃষ্ণনগরের অন্তঃপাতী জয়রামপুর নিবাসী শ্রীযুক্তবাবু জানকীনাথ ঘোষালের ব্রাহ্মবিধানানুসারে শুভবিবাহ হইয়া গিয়াছে। বরের বয়ঃক্রম ২৭ বৎসর। কন্যার বয়ঃক্রম ১৩ বৎসর। এই বিবাহ উপলক্ষে দেশবিদেশ হইতে বহুসংখ্য ভদ্রলোক ও ব্রাহ্মণপণ্ডিত উপস্থিত হইয়াছিলেন। উক্ত দিবস রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় এই শুভকার্য্য আরম্ভ হইল।

সম্প্রদাতা শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্প্রদান-ভূমিতে বেদীর সম্মুখে আসনে উপবেশন করিয়া প্রথমত জ্যেষ্ঠ জামাতৃগণকে বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা যথাক্রমে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। তৎপরে পাত্র সম্প্রদাতার সম্মুখস্থ আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

* ঊনবিংশ শতাব্দীর কলিকাতায় অন্যান্য অভিজাত পরিবারের মত ঠাকুরপরিবারেও কন্যা-জামাতাকে পোষণ করা হত; সাধারণত দরিদ্র সন্তান এভাবে গৃহজামাতারূপে শ্বশুরপরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়তেন। দ্রষ্টব্য: (1) Census Report, 1931, Bengal—Part I; Appendix I to Chapter XI, p 255. (2) Calcutta Weekly Notes—XV, p 205; Govind Rani Dasi *versus* Radha Ballav Das. দীনবন্ধু মিত্রের জামাইবারিকে (১৮৭২) গৃহজামাতার জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা ও স্বাতন্ত্র্যহীনতার বেদনা স্পষ্টীকৃত। প্রধানত ঐ সকল কারণে জানকীনাথ আপত্তি করেন এবং সমাজসংস্কারক দেবেন্দ্রনাথও তা স্বীকার করে নেন। সরলা দেবী বলেছেন, 'বাড়ির বাঁধা নিয়মের একটির কিন্তু আমার মায়ের বেলায় ব্যতিক্রম হয়েছিল। তিনি ঘরজামাই-হওয়া স্বামিসহ পিতৃগৃহবাস করেননি। বিবাহের পূর্বে আমার পিতার সর্ত ছিল ঘরজামাই হয়ে শ্বশুরগৃহে থাকবেন না।...বড় মাসিমা সৌদামিনী দেবীর বিবাহ অনেক কাল আগে সনাতনী রীতিতেই হয়ে গেছে, কিন্তু মেজ মাসিমা সুকুমারী দেবীর সময় থেকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা দিয়ে জামাইদের বিবাহমন্ত্র উচ্চারণ করান হত, এবং পূর্বাপর প্রথামত কন্যাসহ জামাইরা শ্বশুরগৃহেই স্থায়ী বাসিন্দা হতেন। আমার পিতা এই দুটি রীতিই মানতে অস্বীকৃত হলেন।...দাদামহাশয় তাঁর এই দুই সর্তই মেনে নিলেন।'—দ্র জীবনের ঝরাপাতা, পৃ ১-২। ঐ গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রদত্ত হিরণ্ময়ী দেবীর স্মৃতিকথার মধ্যেও সরলার বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়।—দ্র ঐ, পৃ ২০৯।

জামাতৃবরণ।

সম্প্রদাতা ঈশ্বরকে স্মরণ করিলেন, যথা —ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং। ধীরেরা আকাশে প্রসারিত চক্ষুর ন্যায় যে বিশ্বব্যাপী পরমাত্মাকে সর্ব্বদা দর্শন করেন তাঁহার পবিত্র সন্নিকর্ষ উপলব্ধি করি।

অনন্তর স্বস্তিবাচন করিলেন।…অনন্তর অর্ঘ্যাদি দ্বারা পাত্রকে অর্চ্চনা করিলেন।… ওঁ তৎসৎ অদ্য মার্গশীর্ষে মাসি বৃশ্চিক-রাশিস্থে ভাস্করে শুক্লে পক্ষে সপ্তম্যাং তিথৌ বাৎস্য-গোত্রস্য ঔর্ব্ব চ্যবন-ভার্গব-জামদগ্ন্য-আপ্লুবৎ-প্রবরস্য রামহরি দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রং বাৎস্য-গোত্রস্য ঔর্ব্ব-চ্যবন-ভার্গব-জামদগ্ন্য-আপ্লুবৎ-প্রবরস্য কালীপ্রসাদ দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রং বাৎস্য-গোত্রস্য ঔর্ব্ব-চ্যবন-ভার্গব-জামদগ্ন্য-আপ্লুবৎ-প্রবরস্য শ্রীজয়চন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ পুত্রং বাৎস্য-গোত্রং ঔর্ব্ব-চ্যবন-ভার্গব-জামদগ্ন্য-আপ্লুবৎ-প্রবরং শ্রীজানকীনাথ দেবশর্ম্মানং শাণ্ডিল্য-গোত্রস্য শাণ্ডিল্য-আসিতদেবল-প্রবরস্য রামলোচন দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং শাণ্ডিল্য-গোত্রস্য শাণ্ডিল্য-আসিতদেবল-প্রবরস্য দ্বারকানাথ দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং শাণ্ডিল্য-গোত্রস্য শাণ্ডিল্য-আসিতদেবল-প্রবরস্য শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবীং শুভবিবাহেন দাতুং এভিঃ অর্ঘ্যাদিভিঃ অভ্যর্চ্চ্য ভবন্তমহং বৃণে।…অনন্তর স্ত্রী-আচার হইল। তৎপরে সম্প্রদাতা বেদীর অভিমুখীন হইয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহার বাম হস্তের সম্মুখে চিত্রিত কাষ্ঠাসনে পাত্র ও দক্ষিণ হস্তের সম্মুখে তাদৃশ আসনান্তরে কন্যা বেদীর অভিমুখীন হইয়া উপবেশিত হইলেন। অনন্তর আচার্য্যগণ বেদীতে উপবেশন করিয়া সর্ব্বকর্ম্ম-সাধারণী ব্রহ্মোপাসনা ও বৈবাহিক প্রার্থনা করিলেন। তৎপরে সম্প্রদাতা কন্যা সম্প্রদান করিলেন।

সম্প্রদান।

পাত্র ও কন্যা পরস্পর সম্মুখীন হইয়া বসিলেন। তৎপরে সম্প্রদাতা পাত্রের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিলেন।…তৎপরে সম্প্রদাতা পাত্র ও কন্যার দক্ষিণ হস্ত স্বীয় দক্ষিণ হস্তোপরি স্থাপন করিয়া সম্প্রদান করিলেন।…সম্প্রদাতা কাঞ্চন-দক্ষিণা প্রদান করিলেন, যথা— ওঁ তৎসৎ অদ্য মার্গশীর্ষে মাসি বৃশ্চিক-রাশিস্থে ভাস্করে শুক্লে পক্ষে সপ্তম্যাং তিথৌ শাণ্ডিল্য-গোত্রঃ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা কৃতৈতৎ শুভ-কন্যাসম্প্রদান-কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং বাৎস্য-গোত্রায় ঔর্ব্ব-চ্যবন-ভার্গব-জামদগ্ন্য-আপ্লুবৎ-প্রবরায় শ্রীজানকীনাথ দেবশর্ম্মণে ব্রহ্মনিষ্ঠ-ব্রাহ্মায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে। জামাতা 'ওঁ স্বস্তি' এই বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর গ্রন্থিবন্ধন হইলে জামাতা পাঠ করিলেন। ওঁ বধ্নামি সত্যগ্রন্থিনা মনশ্চ হৃদয়ঞ্চ তে। ওঁ যদেতৎ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব। যদস্তু হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম। ওঁ ধ্রুবা দ্যৌ ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ। ধ্রুবা সঃ পর্ব্বতা ইমে ধ্রুবা পতিকুলে ইয়ং।

পাণিগ্রহণ।

অনন্তর ভর্ত্তা ও বধূ পরস্পর সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং ভর্ত্তা আপন অঞ্জলির অভ্যন্তরে বধূর অঞ্জলি গ্রহণ করিয়া পাঠ করিলেন।...তৎপরে বধূ স্বামিগোত্রে আপনার উল্লেখ করিয়া ভর্ত্তাকে অভিবাদন করিলেন; যথা, বাৎস্য-গোত্রা শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী অহং ভো অভিবাদয়ে। ভর্ত্তা 'ওঁ আয়ুষ্মতী ভব' এই বলিয়া প্রত্যভিবাদন করিলেন। তৎপরে ভর্ত্তার আসনে বধূ ও বধূর আসনে ভর্ত্তা বেদীর অভিমুখে উপবেশন করিলে আচার্য্য এই উপদেশ প্রদান করিলেন: অদ্য মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বরের প্রসাদে তাঁহার পবিত্র সন্নিধানে তোমরা উদ্বাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলে। এতদিন স্বীয় স্বীয় উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া একাকী জীবনপথে বিচরণ করিতেছিলে, এক্ষণে তোমারদের পরস্পরের সম্বন্ধজনিত গুরুতর ভার তোমাদের হস্তে সমর্পিত হইল। অদ্য তোমরা সংসারের প্রথম সোপানে পদনিক্ষেপ করিতেছ, সাবধান হইয়া অগ্রসর হইবে। ইহার পথসকল অতি দুর্গম; ইহার প্রলোভন রাশি রাশি; ইহার বিঘ্ন-বিপত্তি তোমারদিগকে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। সাবধান যেন সংসারের মোহপাশে জড়িত না হও, যেন ইহার সুখসম্পদে সর্ব্বসুখদাতাকে বিস্মৃত না হও। সত্যস্বরূপের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া পরস্পরের উন্নতিসাধন ও সুখবর্দ্ধনে যত্নশীল থাকিবে, তাবৎ গৃহকর্ম্ম ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য বলিয়া সাধন করিবে এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের এই মহান্ উপদেশ সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগ্রৎ রাখিবে—"ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণঃ। যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।" গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণ হইবেন; যে কোন কর্ম্ম করুন তাহা পরব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন। তোমারদিগের যাহা কিছু সকলি তাহাতে সমর্পণ কর; তিনি তোমারদিগকে রোগশোক, ভয়বিপত্তি, পাপতাপ হইতে উদ্ধার করিবেন। শ্রীমান্ জানকীনাথ! তুমি নিয়ত তোমার পত্নীর মঙ্গলসাধনে যত্নশীল থাকিবে; অদ্য তোমার হস্তে জগদীশ্বর সংসারের গুরুতর ভার অর্পণ করিলেন, সংযতেন্দ্রিয় ও সৎকর্ম্মশীল হইবে এবং সাংসারিক সকল অবস্থাতে শান্তচিত্তে থাকিবে। যেরূপ আপনার আত্মাকে রক্ষা করিতে ও উন্নত করিতে চেষ্টা করিবে সেই প্রকার তোমার পত্নীর আত্মাকেও পবিত্র ধর্ম্মপথে উন্নত করিতে চেষ্টা করিবে। উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহাকে

সাংসারিক শুভকার্য্যে নিয়ত প্রবৃত্ত রাখিবে, যেন সত্যের পথে ধর্ম্মের পথে মঙ্গলের পথে তিনি তোমার অনুগামিনী হয়েন। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী! যাহাতে তোমার স্বামীর মঙ্গল হয় কায়মনোবাক্যে সেই কর্ম্ম করিবে। তাঁহার উপর একান্তমনে নির্ভর করিবে ও তোমার হিতের জন্য তিনি যাহা আদেশ করিবেন তাহা প্রতিপালন করিবে। পতিপ্রাণা ও সদাচারা হইবে, অপরিমিত ব্যয় বা কাহারও সহিত বিবাদ করিবে না। মন এবং বাক্য ও কর্ম্ম পরিশুদ্ধ রাখিবে এবং স্বামীর সাহায্যে সর্ব্বদা আত্মার উন্নতিসাধনে যত্নশীলা থাকিবে। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।...

অনন্তর দম্পতি ভক্তিনতচিত্তে ঈশ্বরকে প্রণিপাত করিলেন। তৎপরে আচার্য্য আশীর্ব্বাদ করিলেন। যথা, করুণাময় পরমেশ্বর তোমাদিগের উভয়ের মঙ্গলসাধন করুন এবং তোমারদিগকে তাঁহার আনন্দময় অমৃতধামের অধিকারী করুন। ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সপ্তপদীগমন।

অনন্তর সম্প্রদান-স্থান হইতে বাসগৃহগমনের পথে সাতখানি আসন প্রদত্ত হইলে বধূ ক্রমান্বয়ে তাহাতে পদনিক্ষেপ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন এবং ভর্ত্তা সেই সপ্তপদে ক্রমান্বয়ে স্নাতটি উপদেশ দিলেন ;...অনন্তর বধূ ও ভর্ত্তা বাসগৃহে গমন করিলেন। তৃতীয় দিবসে উদীচ্য কর্ম্ম যথাবিধি সম্পন্ন হইল।

পরিশিষ্ট : দুই

সখিসমিতির বিবরণ

সখিসমিতির (১২৯৩)[১] এই বিবরণী ভারতী ও বালক পত্রিকার ১২৯৮ সালের পৌষ সংখ্যা থেকে অংশত উদ্ধৃত হল :

সখিসমিতি।

কি ধনশালিনী কি গৃহস্থপত্নী কি কৃতবিদ্যা কি অশিক্ষিতা কি স্বদেশীয়া কি বিদেশীয়া সম্ভ্রান্ত রমণীগণের সম্মিলন দ্বারা যাহাতে তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতি সংস্থাপিত হয় ও তাঁহারা একপ্রাণা হইয়া রমণী-স্বভাবসিদ্ধ পরোপকার ধর্মানুষ্ঠানে উদ্যমবতী হইতে পারেন এই অভিপ্রায়ে প্রায় ৫ বৎসর হইল সখিসমিতি নামক একটি মহিলাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা বোধ করি অনেকেই জানেন। আর এই অন্তঃপুর-প্রথাযুক্ত বঙ্গদেশের পক্ষে এইরূপ সমিতির আবশ্যকতা ও উপকারিতা কেহই বোধ হয় অস্বীকার করিবেন না।

এইরূপ সম্মিলনে যে কেবল রুচির উৎকর্ষসাধন, ভাবের উৎকর্ষসাধন, পরিবারের প্রতি পরিবারের, সম্প্রদায়ের প্রতি সম্প্রদায়ের অকারণ বিদ্বেষভাবের অপনয়নে মনের উদারতা বৃদ্ধি— সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকা বশত মহিলাদিগের মধ্যে সাধারণত যে গুণটির অভাব দেখা যায়—প্রভৃতি সুফল হইবে এমন নহে, মহিলাজাতির স্বাভাবিক দয়াবৃত্তি—যাহার জন্য মহিলাজাতির মহিলাত্ব, তাঁহাদিগের গৌরব, তাহার বিকাশ সাধনে সংসারের প্রকৃত উন্নতিসাধন হইবে। এখন একটি কথা উঠিয়াছে—একালের মেয়েরা সেকালের মেয়ের মত মহৎহৃদয়া নহেন, তাঁহাদের তেমন দয়াধর্ম নাই, সদনুষ্ঠানে তাঁহাদের তেমন প্রবৃত্তি দেখা যায় না ইত্যাদি।

কিন্তু কথাটা কি ঠিক? ভিখারী ভিক্ষা লইতে আসিলে কি তেমনি আগ্রহভরে ইঁহারা ভিক্ষাদান করেন না? অনাহারীকে অন্নদান করিয়া কি ইঁহারা তেমনি সুখানুভব করেন না? প্রকৃতপক্ষে রমণী-স্বভাব আগেও যা ছিল এখনো তাই আছে, কেবল অবস্থার পরিবর্তনে পূর্বে যেরূপ স্থলে দয়াপ্রকাশের আবশ্যক হইত এখন আর ঠিক সেরূপ হয় না এইমাত্র প্রভেদ। একটা সামান্য দৃষ্টান্ত দিই, আগে রেল ছিল না, যাত্রীদিগের সদা সর্বদা গৃহস্থের বাড়ী আশ্রয় লইতে হইত, এখন সে প্রয়োজন নাই,

১ বর্তমান গ্রন্থের 'জনহিতকর কার্যাবলী' অধ্যায় (পৃ ১০১-৩) দ্রষ্টব্য।

সুতরাং সেরূপ আতিথ্যও উঠিয়া গিয়াছে। এরূপ আরো অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু এস্থলে তাহা বাহুল্য।[২]

অবস্থার পরিবর্তনে সমাজের যেমন কোন কোন অভাব দূর হইতেছে তেমনি কোন কোন অভাবের বৃদ্ধি এবং নূতন সৃষ্টিও হইয়াছে। সুতরাং দানের আধারেরও পরিবর্তনের আবশুক। যেমন, একান্নবর্তী প্রথা নানা কারণে ক্রমিকই এখন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, আগে একজনের উপার্জন পরিবারের অন্ন দশজনে ঠিক সমভাবে উপভোগ করিত, এখন অবস্থার গুণে ঠিক আর সেরূপটি হওয়া সম্ভব নহে। বিধবাগণ আগেকার অপেক্ষা অধিক কষ্টে পড়িতেছে, কুমারীদিগের বিবাহ বহুব্যয়সাধ্য হইয়া উঠিতেছে—ভদ্র গৃহস্থ পরিবারের মধ্যে দিন দিনই অন্নকষ্ট বাড়িতেছে—কাজেই সঙ্গতিহীনার সংখ্যা এখন পূর্বাপেক্ষা বহু অধিক, দয়াশীলা রমণীগণের করুণাদৃষ্টি এইদিকে পড়িলে যথার্থ উপকার হইবার সম্ভাবনা। সখিসমিতি এই সদনুষ্ঠান ব্রত ধারণ করিয়াছে। সখিসমিতির উদ্দেশ্য—সঙ্গতিহীনা কুমারী ও বিধবা বালিকাদিগকে প্রতিপালন শিক্ষাদান ও স্থলবিশেষে অর্থ সাহায্য করা,—এবং পরে অবস্থা অনুকূল হইলে অর্থাৎ অর্থের সুবিধা হইলে সেই শিক্ষিত বালিকাদিগকে বেতন দিয়া অন্তঃপুরের শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা। ইহাতে একসঙ্গে অনেকগুলি ভাল ফল হইবার কথা—সঙ্গতিহীনাগণ নিজ নিজ সম্ভ্রমরক্ষা ও পরান্নজীবিকার উপর নির্ভর না করিয়া আপনাকে প্রতিপালন করিতে সক্ষম হইবে; অনাথা বিধবাগণ এইরূপে সৎকার্যে জীবন নির্বাহের সুবিধা পাইলে পুনর্বিবাহ না করিয়াও তাঁহারা সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবেন; এইরূপে হিন্দুধর্মানুমোদিত বৈধব্যাচরণের প্রতিও তাঁহাদের আস্থা জন্মিবে, আর সঙ্গে সঙ্গে ইহাদিগের দ্বারা দেশে স্ত্রীশিক্ষাবিস্তার হইবে, মিশনারী রমণীগণ আজকাল যে কাজ করিতেছেন আমাদের দেশীয় নারীগণের দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইবে। মিশনারী রমণীগণ আমাদের মঙ্গলের জন্য যেরূপ যত্নবতী সেজন্য আমরা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না। কিন্তু তাঁহাদিগের এই শুভ ইচ্ছা সত্বেও নানা কারণে তাঁহারা অন্তঃপুরের শিক্ষাকার্য যেরূপ সুচারুভাবে করিতে অক্ষম দেশের নারীগণ সেকার্যে হস্তক্ষেপ করিলে সহজে তাহা সাধিত হইবে। কিন্তু সেজন্য বহু অর্থের প্রয়োজন এবং তৎপূর্বে অনেকগুলি রমণীকে সুশিক্ষিত করিতে হইবে। আপাতত ছয়টি মাত্র বালিকা সমিতির অধীনে

২ এস্থলে তারকা-চিহ্ন দিয়ে পাদটীকায় বলা হয়েছে, 'গত আশ্বিন-কার্ত্তিকের ভারতীতে "একাল ও একালের মেয়ে" নামক একটি সুনিপুণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা সেইটি সকলকে পড়িতে অনুরোধ করি।'—দ্র ভারতী ও বালক, পৌষ ১২৯৮, পৃ ৫০৫। ঐ প্রবন্ধের লেখক শরৎকুমারী চৌধুরানী। উল্লেখযোগ্য যে আশ্বিন-কার্ত্তিক সংখ্যার (পৃ ৩৮৮-৯৩) পর মাঘ সংখ্যার (পৃ ৫৩৩-৩৭) এর অবশিষ্টাংশ মুদ্রিত হয়।

আছে এবং একটির পাঠ সমাপন হইয়াছে, সমিতি ইচ্ছা করিলেই এখন তাহাকে এই বৈশাখ হইতে শিক্ষাদান কার্যে নিযুক্ত করিতে পারে। কিন্তু বালিকাদিগকে ভরণ-পোষণ ও শিক্ষাদান করা অপেক্ষা তাহাদিগের দ্বারা শিক্ষাকার্য সম্পাদন করা সমধিক ব্যয়সাধ্য। তাহাদিগের পঠদ্দশায় তাহারা কোন স্কুলে থাকিতে পারে, কিম্বা যাহার তাহাতে আপত্তি আছে সে কোন ভদ্রমহিলার আশ্রয়ে থাকিয়া স্কুলের গাড়ীতে স্কুলে যাতায়াত করিতে পারে; কিন্তু পাঠ সমাপ্তে তাহাদিগকে শিক্ষয়িত্রীরূপে পুরমহিলা-দিগের নিকট পাঠাইতে হইলে সেজন্য গাড়ী চাই, তাহাদিগের থাকিবার আশ্রয়বাটী চাই, আপাতত একজন বালিকা বলিয়া সমিতি যেন তাহার আশ্রয়ের জন্য বন্দোবস্ত করিতে পারে, কিন্তু দুই-চারিজন হইলেই তাহাদের স্বতন্ত্র আবাসগৃহ এবং ভরণ-পোষণ-ব্যয় বা বেতন চাই, এসকল ছাড়া তাহাদের কার্যের তত্ত্বাবধারণ এবং তাহাদের রক্ষকস্বরূপ একজন সুশিক্ষিতা সচ্চরিত্রা বয়স্কা রমণী চাই, অল্প বেতনে সেরূপ রমণী মিলিবার কথা নহে। এক কথায়, একটি অনাথাশ্রম হইলেই একার্য সুসঙ্গতরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। সেই আশ্রমই তাহাদের আবাসবাটী হইবে, সেইখানে আশ্রয়লাভ করিয়া ভবিষ্যতে তাহারা পরোপকার কার্যে জীবনযাপন করিবে।

বুদ্ধির প্রবণতা অনুসারে এইখানে তাহারা শিক্ষা পাইতে পারিবে। যাহাদের লেখাপড়ার বুদ্ধি অধিক তাহাদের মধ্যে কেহ বা উচ্চশিক্ষা পাইতে পারেন কেহ ডাক্তারি শিখিতে পারেন; অন্যরূপ হইলে কাহাকেও বা সেলাই কাহাকেও বা চিত্রবিদ্যা কাহাকেও বা গানবাজনা শেখান যাইতে পারে। ইহার ফল পুরমহিলারা পরে লাভ করিবেন। কিন্তু এরূপ একটি অনাথ-আশ্রমের জন্য অন্ততঃ মাসে ৫০০্ টাকার আবশ্যক। সমিতির সেরূপ অর্থবল কোথায়? এতৎসঙ্গে সমিতির যে আয়ব্যয়-হিসাব প্রদত্ত হইতেছে তাহা দেখিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন—আপাতত সমিতি যে ছয়টি বালিকাকে প্রতিপালন করে তাহার ব্যয়ভার বহন করাই তাহার আয়ের পক্ষে একটু অতিরিক্ত। সমিতির আয় বৃদ্ধি করিয়া বৎসর বৎসর অধিক সংখ্যক বালিকাকে আশ্রয় প্রদানের ইচ্ছাতেই প্রধানত সখিসমিতি হইতে শিল্পমেলা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, কিন্তু এইরূপে যে অর্থ সঞ্চিত হয় তাহাতে একটি কিম্বা দুইটি বালিকার শিক্ষাব্যয় সঙ্কুলান হইলেই যথেষ্ট। অবশ্য এক-একটি বালিকার প্রতিপালন ও শিক্ষাভার বহন যেরূপ ব্যয়সাপেক্ষ তাহাতে ছয়টি বালিকার উপকারে সমর্থ হইয়া এই ক্ষুদ্রপ্রাণ সমিতি কম আহ্লাদিত নহে, তবে এইখানেই তাহার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নহে। তাহার ক্ষুদ্রপ্রাণ, কিন্তু অপরিমিত আশা, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা। বোম্বাই বিভাগে পণ্ডিতা রমাবাই যেরূপ বিধবাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন, যে কোন বিধবা ইচ্ছা করিলেই যেমন সেখানে আশ্রয় পাইতে পারেন, সেই অনুকরণে এখানেও একটি অনাথাশ্রম স্থাপন করা সমিতির

প্রাণগত আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু দুঃখ এই; এখনো পর্যন্ত সমিতি তাহাতে অপারক। তথাপি আমরা নিরাশ নহি। এই শিশুসমিতির সাহায্যে আমরা যেরূপ দানপ্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতে আমরা দানশীল মহোদয়-মহোদয়াগণের নিকট কৃতজ্ঞ এবং ভবিষ্যতে তাঁহাদের মুক্তহস্ততায় সমিতির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে এইরূপ প্রত্যাশা করিতেছি।

পণ্ডিতা রমাবাই আমেরিকা হইতে ভিক্ষা আনিয়া প্রায় অর্ধলক্ষ টাকায় বিধবাশ্রম বাটী ক্রয় করিয়াছেন, আর এ দেশের ধনাঢ্য মহাজনগণের মধ্যে এমন কি কেহ নাই যিনি দেশের অনাথাদিগের সাহায্যে একটি আশ্রয়বাটী প্রদান করিয়া চিরকীর্তিমান হইবেন? আমেরিকাবাসীগণ এ দেশের বিধবাদিগের সাহায্যে রমাবাইকে মাসিক ১০০০৲ হাজার টাকা দান করেন—আর আমাদের দেশের সহৃদয়গণ দেশের অনাথাদিগের প্রতি করুণা বিতরণ করিয়া কি দেশের কার্য করিবেন না! দীনবৎসলা রানি, মহারানি, বেগমগণ, তোমরা এই সদনুষ্ঠানে মুক্তহস্ত হইয়া রমণী-নামের মান ও রমণী-হৃদয়ের মাহাত্ম্য রক্ষা কর; আর করুণহৃদয় রাজা, মহারাজা, নবাব, জমীদারগণ ও সহৃদয় দেশবাসী নরনারীগণ, তোমাদের যাহার যেমন সাধ্য এই সৎকার্যে দান করিয়া হিন্দুর দানশীল নাম রক্ষা কর। আমরা তোমাদের দেশের রমণী, ভিক্ষাপাত্র লইয়া তোমাদের দ্বারে দাঁড়াইয়াছি—রমণীর প্রতি সম্মান, রমণীর প্রতি করুণা প্রদর্শন করিয়া ভারতের অক্ষয় কীর্তি স্থাপন কর; আর বিদেশীয়গণ তোমরা বিশ্বজনীন উদারতা-প্রভাবে বিদেশের প্রতি করুণা করিয়া স্বদেশের গৌরব বর্ধন কর। এই প্রার্থনা, করুণাময় জগদীশ্বর আমাদের এই মঙ্গলজনক উদ্দেশ্য সফল করুন।

সখিসমিতির উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী।

উদ্দেশ্য।

১। সম্ভ্রান্ত মহিলাদিগের সম্মিলন ও সদ্ভাববর্ধন।

২। যে কোন সঙ্গতিহীনা, কি বিধবা কি কুমারী—সখিসমিতির উদ্দেশ্যানুমোদিত সদনুষ্ঠান ব্রত পালনে ইচ্ছুক তাহাকে আশ্রয় ও শিক্ষা প্রদান; অন্যত্র অনাথাদিগকে সাধ্যমত অর্থ সাহায্য করা।

৩। সমিতির পালিতাগণ সুশিক্ষিতা হইলে তাহাদিগকে বেতন দিয়া অন্তঃপুরের শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার।*

* এর পর পাদটীকায় বলা হয়েছে, 'তবে যদি কোন কারণে কোন বালিকা ভবিষ্যতে এ কার্য করিতে না চাহেন তবে তাঁহাকে ভরণ-পোষণ ও শিক্ষাদান করিতে সমিতির যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে তিনি তাহা ফিরাইয়া দিতে বাধ্য। সেই অর্থে সমিতি অন্য এক বালিকার উপকারে সক্ষম হইবে।'

নূতন নিয়মাবলী।

১। সম্ভ্রান্ত মহিলামাত্রেই এই সমিতির সখী হইতে পারিবেন।

২। কেহ নূতন সখী হইতে চাহিলে কোন বিশেষ কারণে অন্য সখীগণ আপত্তি না করিলেই তিনি সখীরূপে গৃহীত হইবেন।

৩। মাসিক এক টাকা করিয়া সখীদিগের চাঁদা দিতে হইবে। অধিক দান করিলে আরও ভাল। তবে মাতা এবং বালিকা কন্যা দুইজনে সখী হইলে বালিকার ন্যূনপক্ষে বৎসরে তিন টাকা দিলেও চলিবে।

৪। অভিভাবকের অভিমত ব্যতিরেকে কোন বালিকার ভার সমিতি গ্রহণ করে না।

৫। যে পুরমহিলা সমিতিতে মিলিত হইবার অভিপ্রায়ে সখী না হইয়া দানের ইচ্ছায় সখী হইতে চাহেন তিনি সমিতির নিয়ন্ত্রণে আসিতে বাধ্য নহেন।

৬। সখীগণ লক্ষ্য রাখিবেন যেন টাকার বিল শোধ করিতে দেরী না হয়; কেননা এই চাঁদার উপরেই পালিতাগণের প্রতিপালন কার্য নির্ভর করিতেছে।

৭। বিদেশেই থাকুন বা কলিকাতায় থাকুন—যাঁহারা সমিতির প্রতিষ্ঠাত্রী কিম্বা শিল্পমেলার কর্তৃত্বভার যাঁহাদের হস্তে তাঁহাদিগের দ্বারা সমিতির কর্ত্রীসভা গঠিত।

৮। কলিকাতাবাসী উৎসাহী সখীগণের মধ্যে হইতে বাছিয়া বৎসরে বৎসরে আট কিংবা দশজনের একটি ক্ষুদ্র সভা গঠিত হয়, সমিতির বালিকাগণের সম্বন্ধে তত্ত্বাবধারণ করা, নূতন কোন আশ্রয়প্রার্থী বালিকাকে লওয়া না লওয়া প্রভৃতি সমিতির অনুষ্ঠিত কার্যকলাপ ইঁহাদের পরামর্শ দ্বারা স্থির হইয়া থাকে।

সখিসমিতি ও শিল্পমেলার কর্ত্রীসভার সখীগণ।

শ্রীমতী স্বর্ণলতা ঘোষ	Mrs. M. Ghose.	শ্রীমতী বসন্তকুমারী দাস	Mrs. G. N. Dass.
„ বরদাসুন্দরী ঘোষ	„ L. Ghose.	„ চন্দ্রমুখী বসু	Miss. C. M. Bose.
„ ললিতা রায়	„ P. L. Roy.	„ গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	Mrs. N. N. Dutt.
„ মনোমোহিনী দত্ত	„ R. C. Dutt.	„ মৃণালিনী দেবী	„ R. Tagore.
„ সৌদামিনী গুপ্তা	„ B. L. Gupta.	„ বিধুমুখী রায়	„ R. N. Ray.
„ থাকমণি মল্লিক	„ O. C. Mullick.	„ প্রসন্নময়ী দেবী	„ Bagchi.
„ সরলা রায়	„ P. K. Ray.	„ সুরবালা দেবী	„ T. N. Mukharji.
„ প্রসন্নতারা গুপ্তা	„ K. G. Gupta.	„ স্বর্ণকুমারী দেবী	„ J. Ghosal.
„ হিরণ্ময়ী দেবী	„ P. Mukherji.	সম্পাদিকা।	
„ সৌদামিনী দেবী	„ S. P. Ganguli.		

১২৯৫ সালের (ইং ১৮৮৮) মহিলাশিল্পমেলার দানপ্রাপ্তি স্বীকার। * * *

আয়।

দানপ্রাপ্ত*	...	...	২৪৫৬৲
দানপ্রাপ্ত শিল্প বিক্রয় ও অন্যান্য বাবদে মেলার আয়		...	৪৩৪৻১৫
মোট			২৮৯০৻১৫

১২৯৬ সালের (ইং ১৮৯০) মহিলাশিল্পমেলার দানপ্রাপ্তি। * * *

দানপ্রাপ্ত	...	...	১৩৭৬৲
দানপ্রাপ্ত দ্রব্যাদি বিক্রয় ও মেলার অন্যান্য আয়	...	...	৫৪৬৶৫
			১৯২২৶৫

* ভারতী ও বালকের ১২৯৫ সালের পৌষ সংখ্যার শেষে (পৃ ৫০৮) ঐ বৎসরের শিল্পমেলার যে হিসেব দেওয়া হয়েছে তার প্রাসঙ্গিক স্থলে লেখা আছে '২৩৬২' টাকা। এই গ্রন্থের ১০৫ পৃষ্ঠার ১৭৯ সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

দানপ্রাপ্ত শিল্প, ১২৯৫ সাল। * * * ইহার মধ্যে আন্দাজ ১৫০ টাকা মূল্যের জিনিষ বিক্রয় হইয়াছে।

দানপ্রাপ্ত শিল্প, ১২৯৬ সাল। * * * ইহার সমস্ত বিক্রয় হয় নাই। ১০০ আন্দাজ বিক্রয় হইয়াছে।

১২৯৫ সালের মেলায় আয়	...	...	২৮৯০ ৵১৫
১২৯৬ সালের মেলায় আয়	...	...	১৯২২৵ ৫
	মোট	...	৪৮১২৶০

পাঠক-পাঠিকাগণ দেখিবেন যে এক বৎসরের দান ও মেলার আয়ে আমাদিগের মূলধন মোট ৪৮১২৶০ টাকা হইবার কথা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এক্ষণে আমাদিগের মূলধন ৫০৫০৲ টাকা। গত বৎসর পর্যন্ত সখিসমিতির তত্ত্বাবধানে চারিটি বালিকা ছিল; উল্লিখিত মূলধন ৪৮১২৶০ টাকার সুদ এবং সখীগণের দত্ত মাসিক চাঁদা দ্বারা উক্ত বালিকা চারিটির ভরণ-পোষণ ও বিদ্যাশিক্ষার ব্যয় নির্বাহিত হইয়া যাহা উদ্বৃত হইয়াছে তাহা ঐ মূলধনে যুক্ত হইয়া ৫০৫০৲ টাকা এক্ষণে মূলধন হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান মাস হইতে সমিতি ছয়টি বালিকার ভরণ-পোষণ ও বিদ্যাশিক্ষার ভার গ্রহণ করায় সমিতির আয় অপেক্ষা এখন হইতে ব্যয় অধিক হইতে চলিল। নিম্নে প্রদত্ত আয়ব্যয় হিসাবের তালিকা দর্শনে পাঠক-পাঠিকাগণ তাহা বুঝিতে পারিবেন।

বর্ত্তমান মাস হইতে সখিসমিতির মাসিক আয়ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব।

আয়।

চাঁদা খাতে মাসিক	...	...	৩২৷০
সুদ মূলধন ৫০৫০ টাকার মধ্যে ২০০০ হাজারের শতকরা বাৎসরিক ১২ টাকা হিসাবে ও ৩০০০ হাজারের শতকরা বাৎসরিক ৯ টাকা হিসাবে ৪২৷০ টাকা এবং ব্যাঙ্কে আমানতি ৫০ টাকার ৵১০ আনা হিসাবে মোট সুদ	...	...	৪২৷৶১০
	মোট	...	৭৫ ৵১০

ব্যয়।

চাঁদা আদায়ের দ্বারোয়ানের মাহিয়ানা	...	...	৭৲
কাগজ কলম খাতা ও ডাকমাশুল ইত্যাদি ...		...	২৲
খাতা লেখার জন্য	...	... ...	৫৲
খুচরা দান	...	... ...	৪৲
শশিপদ বাবুর স্কুলে দেওয়া দুইটি বালিকার মধ্যে একটির জন্য মাসিক ব্যয় ১০৷৹ ও অপরটির ১০৲ মোট		...	২০৷৹
ঐ বালিকাদের ঔষধ খরচ গড়ে		...	১৲
বেথুন স্কুলে দেওয়া ৪টি বালিকার মধ্যে দুইটির বোর্ডিং ফি মাহিয়ানা কাপড় পুস্তকাদি মোট	...	...	৩৪৲
অপর দুইটির (Day Scholar) স্কুলের মাহিয়ানা কাপড় পুস্তকাদি মোট	...	... ...	১০৲
বালিকাদের আসা-যাওয়ার গাড়ী ভাড়া ইত্যাদি		...	২৲
		মোট ...	৮৫৷৹

মোট ব্যয় ...	... ৮৫৷৹
মোট আয় ...	... ৭৫৶/১০
অকুলান ...	... ১০৷/১০

ইহা দেখিয়া আশা করি করুণ-হৃদয় ব্যক্তিগণ সমিতির আনুকূল্য যৎকিঞ্চিৎ করিয়া দান করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

উপসংহারে আমরা নিতান্ত আহ্লাদ সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে আমাদের দেশের রমণীগণের নিকট কেবল নহে—লেডী ল্যান্সডাউন, লেডী বেলী প্রমুখ বিদেশীয় সম্ভ্রান্ত মহিলাদিগের নিকটে এবং স্বদেশীয় ও বিদেশীয় পুরুষদিগের নিকট পর্যন্ত সমিতি যথেষ্ট সহানুভূতি ও সহায়তা লাভ করিয়াছে।

ভিক্টোরিয়া নর্শারির সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত এস. পি. চট্টোপাধ্যায়, এ্যাসিয়াটিক সোসাইটির অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, পুলিস কমিশনার শ্রীযুক্ত জে. ল্যাম্বার্ট, কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত জে. কাউই, ল্যাজারাস কোম্পানীর শ্রীযুক্ত লারমুর, ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত নর্টন, উইলসন হোটেলের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত শার্লী ট্রেমেয়ারেন, মিরার-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন, সময়-সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস, ম্যাহামিডান লিটারেরী সোসাইটীর সম্পাদক নবাব আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর, রায় প্রসন্নচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বাহাদুর, কাশীপুর হর্টিকলচারেল সোসাইটীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রকৃষ্ণ বসু, তাঁহারই কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায়, লক্ষ্ণৌয়ের ডাক্তার শ্রীযুক্ত রামলাল চক্রবর্ত্তী, আগ্রা কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিদাস গড়গড়ি, জয়পুর শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত হরিদাস শাস্ত্রী, চুনারের শ্রীযুক্ত হনুমান প্রসাদ, বেথুন কলেজের অধ্যক্ষসভা, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত নীতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্নানাথ ঘোষাল, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র, ও শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ঘোষাল—ইঁহারা সকলেই কোন না কোন রূপে মেলানুষ্ঠানের সহায়তা করিয়া সমিতির আন্তরিক কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন।

কাশিয়াবাগান, বাগানবাটী
আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী,
সম্পাদিকা, সখিসমিতি।

ভারতীর কয়েকটি রচনা

ভারতী পত্রিকার কয়েকটি লেখক-নামহীন রচনা সম্ভবত স্বর্ণকুমারীর। এই রচনাগুলির শেষে বা পত্রিকার সূচীপত্রে লেখকের কোনো নাম দেওয়া হয়নি এবং এগুলি স্বর্ণকুমারীর গ্রন্থাবলীরও অন্তর্ভুক্ত হয়নি। বলাবাহুল্য পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ প্রমাণের সাহায্যে সেগুলিকে লেখিকার রচনা বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রসঙ্গত বলা উচিত, পরোক্ষ প্রমাণও পাওয়া যায় না এরূপ কোনো রচনাকে বর্তমান আলোচনার মধ্যে ধরা হয়নি; অথচ একথা মনে করার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে যে লেখক-নামহীন অন্যান্য রচনার মধ্যেও বেশ কয়েকটি স্বর্ণকুমারীর। এইজাতীয় অনেক রচনাই যে রবীন্দ্রনাথের, গবেষকগণ যথাস্থানে সুনিপুণ বিশ্লেষণ ও উল্লেখসহ তার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। সবদিক বিবেচনা করে বোধ হয় ভারতীর বিবিধ উৎকৃষ্ট রচনার লেখকগণ চিরকালের জন্য প্রচ্ছন্ন রয়ে গেলেন।

১২৮৯ সালের পৌষ সংখ্যার 'টর্কিটো ট্যাসো' প্রবন্ধের শেষে শুধু লেখা আছে 'স্বঃ—'। রচনাটি স্বর্ণকুমারীর, রচনা-শেষে লেখিকার নামের আদ্যক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে। ভারতীতে প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'বাল্যসখী'র (ফাল্গুন ১২৮৪) শেষে লেখিকার নামের আদ্যক্ষর 'স্ব' ব্যবহৃত, কবিতাটি তাঁর গ্রন্থাবলীর চতুর্থ ভাগের অন্তর্গত সন্ধ্যা-সংগীত কাব্যের তৃতীয় রচনা। লক্ষণীয় যে কেবল স্বর্ণকুমারীর নয়, অন্যান্য রচনার ক্ষেত্রেও কোথাও কোথাও লেখকের নামের আদ্যক্ষর প্রযুক্ত হয়েছিল ভারতীতে।

ভারতীর ১২৯১ সালের বৈশাখ সংখ্যার প্রারম্ভে মুদ্রিত 'ভূমিকা'টি সম্ভবত স্বর্ণকুমারীর। ঐ সংখ্যা থেকেই তাঁর ভারতী-সম্পাদনার প্রথম পর্যায়ের সূত্রপাত, তাই প্রবন্ধশেষে লেখকের কোনো নামনির্দেশ না থাকলেও এটি যে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এর সূচনা থেকেও সিদ্ধান্তটি সমর্থিত হতে পারে: 'আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর দাদামহাশয় বর্তমান বৎসর হইতে এই পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পরিবর্তে আমরা উক্ত ভার গ্রহণ করিলাম।' ঐ বৎসরের পৌষ মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'ইন্দ্রিয়ের সাহায্য বিনা মনের কথা জানা' রচনাটি লেখক-নামবিহীন হলেও বোঝা যায় এটি স্বর্ণকুমারীর। ১২৯২ সালের অগ্রহায়ণে মুদ্রিত 'মেসমেরিজম বা শক্তিচালনা'র প্রথমে বলা হয়, 'গত বৎসর ভারতীতে "মনের কথা জানা" নামক প্রবন্ধে ইংলণ্ডের মানসিক-শক্তি-অনুসন্ধান সভার বিবরণ··· (সম্বন্ধে) সংক্ষেপে একরূপ বলা হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা সে প্রবন্ধটি পড়েন নাই তাঁহাদের জন্য এখানে আর একবার উক্ত সভা সম্বন্ধে কিছু বলিয়া আলোচ্য বিষয়টির অবতারণ করিব।' ১২৯২ সালের অগ্রহায়ণের প্রবন্ধটিতে লেখকরূপে

স্বর্ণকুমারীর নাম দেওয়া হয়েছে বলে ১২৯১ সালের ধারাবাহিক প্রবন্ধটিও যে তাঁরই রচনা তা প্রমাণিত হয়।

১২৯২ সালের বৈশাখের 'আমরা'ও লেখক-পরিচিতিবিহীন। কিন্তু এটিও সম্পাদকীয় রচনা, এক বৎসর ভারতী-সম্পাদনার পর নববর্ষারম্ভে বিগত বৎসরের সাফল্যের পরিমাণ নির্ণয় ও ভবিষ্যতের কর্মপন্থনির্ধারণ প্রসঙ্গে ঐ প্রবন্ধে লেখক-পাঠকের নিকট কৃতজ্ঞতা নিবেদনের সম্পাদকীয় শিষ্টাচার প্রদর্শন করা হয়েছে। সম্পাদিকা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, 'সংসারের কঠোর কার্যক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শারীরিক বিশ্রামের সহিত যাহাতে পাঠকগণ মনের তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন এইজন্য উৎকৃষ্ট উপন্যাস ও সরস কবিতার সহিত রহস্যজনক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতে যত্নশীল হইব।... যাহা কিছুতে সাধারণের জ্ঞানবিকাশ ও আনন্দলাভ হয়, যাহাতে সাধারণের মনের উন্নতিসাধন, রুচি মার্জিত হইতে পারে, অন্যান্য বারের ন্যায় তাহার প্রতিই আমাদের লক্ষ্য থাকিবে।' বৈশাখের 'একটি প্রস্তাবে'র সম্ভাব্য লেখক স্বর্ণকুমারী, কারণ রচনাশেষে 'শ্রী—দেবী' এই নির্দেশ বর্তমান এবং এটি যে লেখিকার নামসংকেত তারও প্রমাণ রয়েছে। ১২৯২ সালের জ্যৈষ্ঠে মুদ্রিত 'সিদ্ধি'র শেষে ঐরূপ 'শ্রী—দেবী' আছে, রচনাটি গ্রন্থাবলীর পঞ্চম ভাগে 'বিবিধ কথা'র অন্তর্গত। আবার ১২৯৪ সালের ভারতী ও বালকের পৌষে প্রকাশিত 'বিরহ' কবিতার শেষে এই একই নামসংকেত আছে এবং কবিতাটি গ্রন্থাবলীর চতুর্থ ভাগের সন্ধ্যা-সংগীতের নবম রচনা। কিন্তু ১২৯৮ সালের ভারতী ও বালকের পৌষ সংখ্যার ৩৫২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত একটি কবিতার শেষে আছে 'শ্রী—দেবী', সূচীপত্র থেকে জানা যায় ইনি 'শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী'। তথাপি যেসকল প্রমাণের বলে 'একটি প্রস্তাব'কে (বৈশাখ ১২৯২) আমরা স্বর্ণকুমারীর রচনা বলে চিহ্নিত করতে চাই তা উল্লেখসাপেক্ষ। 'একটি প্রস্তাবে'র মূল বক্তব্য ছিল 'অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকদিগের সহিত শিক্ষিত মহিলাদের সম্মিলন'। এই মহিলাসভা বা সখিসমিতির (১২৯৩) উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা ঘটে প্রধানত স্বর্ণকুমারীর ঐকান্তিক অভিপ্রায় এবং প্রচেষ্টা-উদ্যমের ফলে, তাই 'প্রস্তাবে'র প্রচারকের ভূমিকা গ্রহণও তাঁর পক্ষে কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। ১২৯৮ সাল পর্যন্ত 'সখিসমিতি ও শিল্পমেলার কর্ত্রীসভার সভ্যগণে'র যে তালিকা পাওয়া যায় তার মধ্যে সরোজকুমারীর নাম নেই। আরও বলা যায় যে ১২৯৩ সালের বৈশাখের ভারতী ও বালকে মুদ্রিত হয় 'আর একটি প্রস্তাব'; এর মধ্যে পূর্ববৎসরের 'একটি প্রস্তাবে'র প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় এবং সেক্ষেত্রে যে একটি পাদটীকা সংযোজিত হয় তার লেখক ভারতী-সম্পাদক স্বর্ণকুমারী। পাদটীকায় বলা হয়, 'ভারতীর উক্ত প্রবন্ধটির সহিত (একটি প্রস্তাব) সমিতির উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী একত্রে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইতেছে। যাহারা দেখিতে চাহেন ভারতী-কার্যাধ্যক্ষের নিকট চাহিয়া পাঠাইলেই

পাইবেন।' সমস্ত কিছু বিচার করে মনে হয় 'একটি প্রস্তাবে'র লেখিকা এবং টীকাকার-সম্পাদিকা এক এবং অভিন্ন।

১২৯৩ সালের ভারতী ও বালকের বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবণে মুদ্রিত হয় যথাক্রমে 'প্রয়াগ যাত্রা', 'প্রয়াগে', 'প্রয়াগ দর্শন' (দুই কিস্তিতে) এই মোট চারটি রচনা। সম্ভবত এই প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে ১৩১৯ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় মুদ্রিত 'প্রয়াগের দুয়েকটি দৃশ্যে'র ভূমিকায় বলা হয়েছিল, 'বহুদিন পূর্বে একবার ভারতীতেই আমার প্রয়াগ দর্শনের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলাম।' উভয় পর্বের প্রকাশিত প্রবন্ধের মধ্যে বিষয়গত সাদৃশ্য লক্ষিত হয় বলে ১২৯৩ সালের নামহীন লেখকের প্রয়াগসম্বন্ধীয় রচনাগুলিকে স্বর্ণকুমারীর রচনারূপে গ্রহণ করা যেতে পারে কারণ শেষোক্ত পর্বের রচনা 'প্রয়াগের দুয়েকটি দৃশ্য' তাঁরই।

পরিশিষ্ট : চার

অনুবাদ

স্বর্ণকুমারীর 'ফুলের মালা' উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ করেন ক্রিস্টিনা অ্যালবার্স, ১৯০৯ সালের মডার্ন রিভিয়্যু পত্রিকায় 'দি ফ্যাটাল গার্ল্যাণ্ড' নামে ঐ অনুবাদ প্রথম প্রকাশিত হয়। তাঁর 'দিব্যকমল' নাটকটি জর্মন ভাষায় অনূদিত হয়েছে 'প্রিন্সেস কল্যাণী' নামে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'অন্যান্য ভাষাতেও তাঁহার কোন কোন রচনা অনূদিত হইয়াছে।'[১]

লেখিকা নিজেও এই অনুবাদকর্মে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। 'কাহাকে' উপন্যাসটির ইংরেজি অনুবাদ (১৯১৩) লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয় 'অ্যান আনফিনিসড সং' নামে।[২] গ্রন্থের ভূমিকায় (Preface) বলা হয়েছে, This is a story of life among the Reformed Party of Bengal, the members of which have to some extent adopted western customs. It shows the change that touch with Europe has brought upon the people of India, but in their inner nature the Hindus are still quite different from western races. The ideals and traits of character that it has taken thousands of years to form are not affected by a mere external change. This story, it is true, touches on one side of Indian life only, for in a small book it is difficult to depict many of the numerous phases of our Society; still I trust it will give the western reader some insight into the Hindu nature. বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের অপর ভূমিকাটি (Introduction) লিখিত হয় ই. এম. ল্যাং কর্তৃক। তিনি প্রথমে লেখিকার পরিচয় প্রদান করে তাঁর জীবনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে বর্তমান গ্রন্থের 'উপন্যাস' অধ্যায়ে (পৃ ২৫২-৫৩)। ১৯১৪ সালে এই অনুবাদগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড, ওয়েস্টমিনস্টার গেজেট, ক্যারিয়ন

১ দ্র সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, ২৮শ, পৃ ১৭।

২ An Unfinished Song/By/Mrs. Ghosal/(Srimati Svarna/Kumari Devi) / Author of / 'The Fatal Garland', /etc./Published at Essex Street, London, W. C. / By T. Werner Laurie Ltd. এই হল দ্বিতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্র। এই সংস্করণ 'দি লণ্ডন অ্যাণ্ড নরউইক প্রেস, লিমিটেড,লণ্ডন অ্যাণ্ড নরউইক' থেকে মুদ্রিত হয়।

প্রভৃতি পত্রিকায় গ্রন্থটির যে প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা বেরিয়েছিল তার অংশবিশেষ দ্বিতীয় সংস্করণের শেষে দেওয়া হয়েছে। উপন্যাসটির আর একটি অনুবাদকর্মের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।*

স্বরচিত চোদ্দটি গল্পের ইংরেজি অনুবাদের একটি সংকলনগ্রন্থ স্বর্ণকুমারী প্রকাশ করেন 'সর্ট স্টোরিজ' নাম দিয়ে।৪ 'To the Brave' এইভাবে গ্রন্থটি উৎসর্গীকৃত, উৎসর্গপত্রে একটি ইংরেজি কবিতাও আছে। গ্রন্থকর্ত্রী-লিখিত ভূমিকা (Preface) থেকে জানা যায় যে গ্রন্থের সমূহ গল্পই মূলত একদা ভারতীতে প্রকাশিত হয়; এবং অনুবাদগুলির অধিকাংশই ভারতবর্ষীয় কয়েকটি ইংরেজি সাময়িকপত্রে এবং একটিমাত্র গল্প পাশ্চাত্ত্যের Verden Og Vi পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। ভূমিকার শেষ অনুচ্ছেদ থেকে জানা যায় যে শ্রীমতী ক্রিষ্টিনা আলবার্স (ফুলের মালার অনুবাদিকা) এবং শীলচর নামক জনৈক ইংরেজ ভিক্ষু গল্পগুলি আগাগোড়া দেখে দিয়েছিলেন। পূর্ববর্তী 'দি ফ্যাটাল গার্ল্যাণ্ড' এবং 'অ্যান আনফিনিসড সং' যে ইংরেজ পাঠকের সপ্রশংস অনুমোদন লাভ করেছিল একই প্রসঙ্গে তা বলা হয়েছে। ভূমিকায় গ্রন্থকার বলেছেন, সকল দেশের স্ত্রীলোকের প্রকৃতিই সমান, তবে সংস্কৃতি-অভ্যাস, আচার-ব্যবহার এবং সামাজিক রীতিনীতির তারতম্যের জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয় রমণী-জীবনের অন্তর্মুখিতা তাকে বিদেশীয়গণের নিকট অপরিচিত ও রহস্যময় করে তুলেছে। লেখিকা ভারতীয় রমণীর এই বিস্ময়কর রহস্যময়তা-মাধুর্য-মহত্ত্বসমৃদ্ধ বিচিত্র অধ্যায়গুলি গল্পাকারে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। সেকালের Abordeen Press এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বলেছেন,...both east and west will agree that it is a charming revelation of the workings of woman's heart. In its sweet simplicity and delicacy of tongue, faded readers will experience of a new sensation.

১২৯৫ সালের ভারতী ও বালকের ভাদ্র সংখ্যায় 'দার্জিলিং' প্রবন্ধটির পঞ্চম কিস্তি প্রকাশিত হয়। ঐ প্রবন্ধে লেখিকা শরৎচন্দ্র দাসের একটি ভুটিয়া গানের ইংরেজি তর্জমার কথা উত্থাপন করে বলেছেন, 'আমি সেই অনুবাদের আবার একটা বাংলা অনুবাদ

* To whom? Or An Indian Love-Story; tr. by Sovana Devi, Calcutta; S. K. Lahiri & Co., 1907.—ন্যাশনাল লাইব্রেরির Monthly List of Additions, Sept.-Dec., 1964. p 715.

৪ এর আখ্যাপত্র : Short Stories/By/Mrs. Ghosal/(Srimati Swarna Kumari Devi) / Author of / 'The Fatal Garland', / 'An Unfinished Song,' etc. / Price Rs.2 / Ganesh & Co. Madras. মাদ্রাজের 'দি কেম্ব্রিজ প্রেস' থেকে মুদ্রিত।

করিয়াছি—দুইটাই এইখানে তুলিয়া দিই।' এর পর শরৎচন্দ্র দাসের ইংরেজি অনুবাদ এবং লেখিকাকৃত তস্য বঙ্গানুবাদ পরিবেশিত হয়েছে। ১২৯৯ সালের ভারতী ও বালকের আষাঢ় সংখ্যায় মুদ্রিত 'পত্র' প্রবন্ধে একটি ইংরেজি কবিতার অনুবাদ পাওয়া যায়, এর প্রারম্ভিক চরণ— 'একটু লেখো গো তুমি এইটুকু খাতা'। গ্রন্থাবলীর সন্ধ্যা-সংগীত কাব্যের 'আমিও আমায়' কবিতাটি 'মূর হইতে অনুবাদ'। ১২৯৫ সালের ফাল্গুনে প্রকাশিত 'একটি ভয়ঙ্কর ঘটনা' নামক গল্পটি যে 'অনুবাদ' তা স্বীকার করা হয়েছে।

পাঠ্যপুস্তক

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বর্ণকুমারী-প্রণীত একাধিক পাঠ্য-পুস্তকের উল্লেখ করেছেন ; যেমন—গল্পস্বল্প (মার্চ ১৮৮৯), সচিত্র বর্ণবোধ ১ম ও ২য় ভাগ (১৯০২), বাল্যবিনোদ (১৯০২), আদর্শনীতি (১৯০৪), প্রথম পাঠ্য ব্যাকরণ (১৯১০), বালবোধ ব্যাকরণ (১৯৩২) প্রভৃতি। অনুরূপা দেবী তাঁর 'সাহিত্যে নারী : স্রষ্ট্রী ও সৃষ্টি' (১৯৪৯) গ্রন্থে স্বর্ণকুমারীর কোরকে কীট (১৮৭৭), কীর্তিকলাপ (১৯০৫), সাহিত্য-স্রোত (১৯৩১) প্রভৃতি পাঠ্যপুস্তকের কথা বলেছেন (পৃ ১৩৪-৫৩) তাঁর মতে বাল্যবিনোদ ১৯০৯ সালে পুনরায় প্রকাশিত হয়। উপরোক্ত বইগুলির কথা অনিলচন্দ্র ঘোষও তাঁর 'বাংলার বিদুষী'তে (১৩৬৪ সং, পৃ ৩৪) স্বীকার করেছেন। তাছাড়া 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'তে (পৃ ১২০, পাদটীকা) এবং 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে (বঙ্গবাসী সং, ১৩১১, পৃ ৭৯৮) এইসকল পুস্তকের কথা বলা হয়েছে।

স্বর্ণকুমারীর 'কবিতা ও গান' গ্রন্থের (কার্তিক ১৩০২) শেষে যে বিজ্ঞাপন আছে তন্মধ্যে গল্পস্বল্পের পরিচয়ে বলা হয়েছিল যে 'বালকবালিকার মনোরঞ্জক গল্পকবিতাদি' এর মধ্যে স্থানলাভ করেছে। অমৃতলাল বসুর (১৮৫৩-১৯২৯) 'কৃপণের ধন' নামক প্রহসনের (১৩০৭) দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে নায়িকা কুন্তলার গল্পস্বল্প অধ্যয়নের প্রসঙ্গ বর্তমান। নায়িকা বলেছে, 'আমার এই বইখানি বেশ ভাল লাগে ; নামটিও যেমন—বইটিও তেমনি ; গল্পস্বল্প—কি মিষ্টি নাম! ··· মেয়েমানুষ যদি লেখাপড়া শেখে, যেন স্বর্ণকুমারীর মত শেখে। দেখ দেখি, কেমন লিখেছেন, যেখানটা পড়ি, সেখানটাই মিষ্টি, আরও মিষ্টি!'

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে স্বর্ণকুমারীর সাহিত্য-স্রোত গ্রন্থের প্রথম ভাগটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৩৮ সালে (১৯৩২), ভ্রমবশত অনুরূপা দেবী বলেছেন ১৯৩১ খৃস্টাব্দের কথা। গ্রন্থটি স্বর্ণকুমারী কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, ঢাকার বিপন লাইব্রেরির অম্বিকাচরণ নাথ এর প্রকাশক। উৎসর্গপত্রে 'হে নবীন প্রিয় বৎসগণে'র উদ্দেশ্যে কবিতায় 'আশিস-মঙ্গল' রচিত। 'উপক্রমণিকা'য় এইজাতীয় গ্রন্থের সংকলনের প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'নবযুগে বঙ্গসাহিত্যের ক্রমবিকাশ ও পরিণতি কিরূপে হইয়াছে এই পুস্তকে তাহারই আভাস দিবার চেষ্টা করিয়াছি। ··· আশা করি এই পুস্তক পাঠ করিয়া তরুণ ছাত্রবৃন্দের সাহিত্য-জ্ঞানানুরাগ বর্ধিত হইবে এবং মহদন্তঃকরণ ব্যক্তিগণের উচ্চ ভাবের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের প্রাণে আদর্শ জীবন লাভের একটা ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিবে।'

অতঃপর ঐ উপক্রমণিকার মধ্যেই আধুনিক বাংলা গদ্যসাহিত্যের উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করা হয়েছে, সেদিক থেকে এটি একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধেরও মর্যাদা পেতে পারে। সূচীপত্র থেকে জানা যায় যে গ্রন্থের রচনা-সংখ্যা সর্বমোট উনত্রিশ, তন্মধ্যে স্বর্ণকুমারীর প্রবন্ধ ছয়টি এবং কবিতা একটি। এই প্রবন্ধগুলির নাম যথাক্রমে উপক্রমণিকা, ভারতসাহিত্যে রমণী-প্রতিভা, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ—পিতৃচরণে পুষ্পাঞ্জলি, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, শোকাশ্রু, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এছাড়া 'শোক-নৈবেদ্য' কবিতাটি সত্যেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা অবলম্বনে রচিত। 'শোকাশ্রু' প্রবন্ধটি দ্বিজেন্দ্রনাথের স্মৃতিতর্পণ-বিষয়ক, ভারতী পত্রিকার ১৩৩২ সালের মাঘ সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হয়। শান্তিনিকেতন থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথের লিখিত একটি চিঠি (২৬ কার্তিক ১৩৩১) রচনায় ব্যবহৃত হয়েছে। ঐ পত্রে দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'স্নেহের বোনটি আমার, আমার হাতে এখনও কতকগুলি করণীয় কার্য অবশিষ্ট আছে। সেইগুলি শীঘ্র শীঘ্র চুকাইয়া ফেলিতে আমি নিতান্তই আগ্রহান্বিত। যমের দুয়ারে কাঁটা দিবার এক্ষণে তুমি বই আর আমার কেহই নাই; সুতরাং তোমার এবারকার ভাইফোঁটা আমার সময়োপযোগী, আর সেইজন্য তাহা আমি অতিশয় যত্ন-সমাদরের সহিত ললাটে বরণ করিলাম। ঈশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবী করিয়া সুখস্বচ্ছন্দে রাখুন, ইহাই আমার আন্তরিক আশীর্বাদ। দিব্যধামস্থিত আমাদের প্রাণের ভাই সতুর বিরচিত একটি ব্রহ্মসংগীত ("কেহ নাহি আর আমার") এক্ষণে আমার জপমালা হইয়াছে।' এই প্রবন্ধে লেখিকা কথাচ্ছলে 'পরম শ্রদ্ধেয়' অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ও 'পরম আদরণীয়' অনুজ রবীন্দ্রনাথের বিবিধ প্রসঙ্গ অবতারণা করেছেন। এসকল বিবেচনা করে বলা যায় যে সাহিত্য-স্রোত একান্তভাবে পাঠ্যপুস্তক বা ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ নয়, এর মধ্যে লেখিকার ব্যক্তিগত কথাও স্থান পেয়েছিল। প্রসঙ্গত বলা আবশ্যক যে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও চিরঞ্জীব শর্মার গ্রন্থ থেকে যথাক্রমে রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও কেশবচন্দ্রের জীবনী সংগৃহীত হয়েছিল।

বিশিষ্ট ব্যক্তি

॥১॥ জা ন কী না থ ঘো ষা ল (১৮৪০-১৯১৩)। স্বামীর স্মৃতিচারণাকালে স্বর্ণকুমারী দেবী বলেছেন যে পিতার সস্নেহ আনুকূল্য ও প্রশ্রয় তিনি বাল্যকালে যথেষ্ট পেয়েছেন সত্য, কিন্তু but for the help and encouragement given to me by my beloved husband, I do not think that it would have been possible for me to venture so far. It was he who moulded and shaped me in the fashion that the outside world knows to-day, and under his loving guidance I passed through stormy waves of literary life as easily and pleasantly as a good swimmer through a rough sea. And though he is not present with me in the body to-day, yet his benign spirit still works in me and through me, and I feel his helping hand in every struggle and hear his prompting voice in each good resolution. The deep love of literature that he fostered in me urged me to accept the responsibility of editing one of the most intellectual magazines of the day ; and the joy of the mental freedom that he enabled me to taste gave an impetus to my desire to share with and spread among my countrymen and countrywomen the ever-growing development and enlightenment of our progressive age.[১] কেবল সাহিত্যসাধনায় নয়, তাঁর স্বদেশভক্তি এবং স্বদেশসেবার ক্ষেত্রেও সর্বদা প্রেরণা সঞ্চার করেছেন জানকীনাথ।[২] স্বামীর সম্বন্ধে লেখিকা 'সেকেলে কথা'র (গ্রন্থাবলী, চতুর্থ ভাগ) মধ্যে বলেছেন, 'যদি স্বামী মেজদাদার সহায়তা না করিতেন তাহা হইলে এত শীঘ্র বাঙ্গালায় স্ত্রীজাতির এতদূর উন্নতি হইত কিনা সন্দেহ। অন্ততঃ তিনি অনেক পরিমাণে এ উন্নতি অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

জানকীনাথের শ্রাদ্ধ-বাসরে তাঁর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন তাঁদের প্রথম কন্যা হিরণ্ময়ী দেবী। জীবনের ঝরাপাতায় (১৮৭৯ শক) ২০৮ থেকে ২১০ পৃষ্ঠার মধ্যে উক্ত জীবন-

১ Introduction, The Fatal Garland.

২ Introduction, An Unfinished Song.

বৃত্তান্তের যে অংশ মুদ্রিত হয়েছে তা থেকে জানকীনাথের জীবনের নানা কথা জানতে পারা যায় : 'বিবাহের পরেই পিতার বিলাত যাইবার প্রস্তাব হওয়ায় তিনি ডেপুটি কালেকটরের পদ ত্যাগ করেন। কিন্তু নানা অভাবিত কারণে সেই সময় বিলাত যাওয়ায় বাধা পড়ায় তিনি স্বাধীন জীবিকার জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করেন। সেই সূত্রে বেরিনী কোম্পানির হোমিওপ্যাথিক দোকান তিনি ক্রয় করেন। তাহা খুব লাভজনক ছিল। বিক্রয় করিবার অল্পদিন পরে তাহার পূর্ব মালিক তাহা পুনর্লাভে ইচ্ছুক হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরণাপন্ন হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় পিতৃদেবের একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন। বিদ্যাসাগরের অনুরোধে পিতা গভীর স্বার্থত্যাগ করিয়া দোকান ফিরাইয়া দিলেন।...গরীব দুঃখীর সেবার জন্য তিনি ঘরে বসিয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষা করিয়া বিনা পয়সায় ডাক্তারি করিতেন।... কলিকাতায় প্রায় সব সাধারণ হিতকর কার্যেই তাঁহার যোগ ছিল। অনেক বৎসর মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ছিলেন। মেকেঞ্জি বিলের প্রতিবাদে যে ২৮ জন কমিশনার পদত্যাগ করেন তন্মধ্যে তিনি একজন। শিয়ালদহ ও লালবাজার দুই কোর্টেই তিনি অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।' জানকীনাথের ব্যবসাবাণিজ্য-প্রীতি ছিল অসাধারণ, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কিছুদিন তাঁহার ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বামী কংগ্রেসের বিখ্যাত কর্মী জানকীনাথ ঘোষাল মহাশয়ের সহযোগে পাটের ব্যবসায় করিয়াছিলেন।'[৩] জানকীনাথ মহর্ষির বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন, 'তাঁর উপদেশ-অনুসারে তাঁর পুত্রেরা ভ্রাতুষ্পুত্রেরা এবং জামাতাদের এক-একজন জমিদারির কার্যে নিযুক্ত থাকতেন। এজন্য তাঁদের মাসিক একশ টাকা অতিরিক্ত মাসোয়ারা হিসাবে বরাদ্দ থাকত।'[৪] সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠিপত্র থেকে জানা যায় যে জানকীনাথ একসময় অনুরূপ জমিদারি দেখাশুনা ও বিষয় পরিচালনার কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

জানকীনাথ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার বিশেষ ভক্ত ছিলেন ; এঁদের নিকট হোমিওপ্যাথি 'হৈমবতী'তে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এ সম্বন্ধে সরলা দেবী বলেছেন, 'বাবামশায় হোমিও-প্যাথির ঘোরতর বিশ্বাসী ও ভক্ত। আমাদের অল্পস্বল্প অসুখ হোক বা বেশী হোক, ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার বা ডাক্তার সলজার ছাড়া কাউকে ডাকা হয় না।' পত্নী জ্ঞানদা-নন্দিনীকে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের কতগুলি প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উদ্ধৃত হল : 'তোমার যখন যাহা প্রয়োজন হয় তাহা জানকীকে বলিলে আনিয়া দিবে।' (১১নং) 'জানকী যে আমার হৈমবতী চিকিৎসায় ১০০ টাকা দিয়াছে তাহা শোধ করিবার জন্য

৩ মন্মথনাথ ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, ১৩৩৪, পৃ ১২৪।

৪ জগদীশ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথের সংখ্যা—শারদীয়া বসুমতী, ১৩৬৫, পৃ ১৪৩।

বড়দাদাকে লিখিতেছি, জানকীকে বলিবে।' (১৯ নং) 'জানকীকে বলিবে তিনি যদি লক্ষ টাকার সংস্থান করিতে পারেন তবে বোম্বায়ে আসিয়া যেন কর্ম আরম্ভ করেন।' (২৩ নং) 'বাবামহাশয় যদি ১০০ টাকা এখনো দিবার অনুমতি করেন তাহা তোমার হস্তে দিবার জন্য জানকীকে লিখিয়াছি।' (৩২ নং) 'তোমার জন্য বাড়ীতে থাকার বিষয় কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না…জানকী যদি তোমার জন্য একটা বাগান দেখিয়া স্থির করিতে পারে তবে আমাকে লিখিলেই যাহা কর্তব্য হয় তোমাকে বলিব।' (৫২ নং)[৫] এই চিঠিগুলি থেকে উভয় পরিবারের প্রীতিমধুর যোগাযোগ সম্পর্কে প্রভূত তথ্য সংগৃহীত হতে পারে।

১৮৯১ সালের প্রথম দিকে সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' প্রচারের জন্য একটি যৌথ কারবার গঠিত হয় এবং জানকীনাথ তন্নিমিত্ত ২৫০ টাকা দেন।[৬] আপনার সাহিত্যচর্চায় স্বামীর পৃষ্ঠপোষকতার কথা স্বর্ণকুমারী কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। পত্নীর সাহিত্যসাধনায় যাতে কোনো প্রকার অসুবিধা না হয় তজ্জন্য তাঁর দৃষ্টি সর্বদা সজাগ ছিল, স্বামীর নামে উৎসর্গীকৃত লেখিকার 'নবকাহিনী' গ্রন্থের উৎসর্গপত্র থেকে এটুকু বোঝা যায়। 'নবকাহিনী' ব্যতীত 'হুগলীর ইমামবাড়ী' এবং 'কাহাকে'ও জানকীনাথকে উপহার দেওয়া হয়।

কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার প্রথম থেকে জানকীনাথ এর সম্পাদক ছিলেন; 'কংগ্রেসের অক্লান্তকর্মী জেনারেল সেক্রেটারি' জানকীনাথ সম্বন্ধে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। (জীবনের ঝরাপাতা, পৃ ১৬৮) কংগ্রেসের সঙ্গে আজীবন জড়িত ছিলেন জানকীনাথ, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যেসকল ব্যক্তি প্রথমাবধি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন জানকীনাথ তাঁদের অন্যতম, 'যতদিন কংগ্রেস থাকিবে ততদিন তাঁহার নাম স্মরণীয় থাকিবে। মাদ্রাজের পরলোকগত সাহিত্যিক পরমেশ্বরম্ পিলে বলিয়াছিলেন, হিউম জানকীনাথকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন, কি জানকীনাথ হিউমকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন জানা যায় না—তবে দুইজনের যোগে কংগ্রেসের কল্পনা কার্যে পরিণত হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনি না হইলে কংগ্রেস কনফারেন্স হইত না—কংগ্রেসের সব নিয়ম তাঁহার নখদর্পণে ছিল।' (গ্রন্থাবলী, ৩য় ভাগ, 'শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রথম দশকে তিনি ছিলেন উক্ত সংস্থার সহকারী সম্পাদক। ১৮৯৩ সালের লাহোর অধিবেশনে কংগ্রেসের সম্পাদকরূপে অ্যালান অকটাভিয়ান হিউমের পুনর্নির্বাচনের সপক্ষে তিনি একটি প্রস্তাব আনয়ন করেন, Whether Mr. Hume can work or not, as long as he lives we can not think of severing his

৫ দ্র ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, পুরাতনী।

৬ রবীন্দ্রজীবনী, ১ম, ১৩৬৭, পৃ ২৮০।

connection with us or with the Congress. প্রকৃতপ্রস্তাবে হিউম ১৯০৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন যদিও তিনি ১৮৯৪ এর পর আর ভারতবর্ষে ফিরে আসেননি। কংগ্রেসের সৃষ্টিপর্বে তার উপর জানকীনাথের অসাধারণ প্রভাব এ প্রসঙ্গ থেকে সমর্থিত হয়। বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার ১৯১৭ খৃস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত জানকীনাথ ব্যতীত অপর কোনো বাঙালি কংগ্রেসের সম্পাদক বা যুগ্ম-সম্পাদকরূপে সরাসরি নির্বাচিত হননি, তাছাড়া জানকীনাথ প্রথমাবধি সম্পাদকের অনেক কার্য সম্পাদন করতেন। পূর্বোক্ত লাহোর কংগ্রেসে দাদাভাই নৌরজী তাঁকে the indefatigable Secretary-রূপে অভিহিত করেছেন। (Bimanbehari Majumdar and Bhakat Prasad Majumdar, Congress and Congressmen in the Pre-Gandhian Era: 1885-1917, 1967, p 24) ১৮৯০ সালে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে তিনি ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক। ১৮৯১ সালের নাগপুর অধিবেশনে তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল কাউন্সিল ফর বৃটিশ কমিটি। ১৮৯৩ সালের লাহোর অধিবেশনে পূর্বোক্ত কংগ্রেসের সম্পাদক নির্বাচন সম্পর্কে তিনি বক্তৃতা করেন, ধন্যবাদ জ্ঞাপনও তিনিই করেছিলেন ঐ অধিবেশনে। পুণায় অনুষ্ঠিত একাদশ অধিবেশনে (১৮৯৫) উত্থিত প্রস্তাবসমূহের 'প্রথম প্রস্তাবে তিন মাসের মধ্যে কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করে সাধারণ সম্পাদক ও স্ট্যাণ্ডিং কাউনসেলকে প্রেরণ করতে জানকীনাথ ঘোষাল পুণা-সমিতিকে অনুরোধ জানান।'[৭] কংগ্রেসের ষোড়শ অধিবেশনে (লাহোর, ১৯০০) জানকীনাথ ইণ্ডিয়ান মাইন্স বিল সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যার উপর আলোকপাত করেন। (Congress and Congressmen etc., p 300)

সর্বশেষে বলা যায় অক্লান্তকর্মী জানকীনাথ জীবনের বিচিত্র দিকে তাঁর সাফল্য ও পারদর্শিতার প্রমাণ দিয়েছেন। জমিদারি কিংবা ব্যবসা পরিচালনায় তাঁর কৃতিত্ব অসাধারণ। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন জমিদার এবং বিভিন্ন কলকারখানার মালিক। অনেক বৎসরের জন্য তিনি মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারও ছিলেন। আদি-ব্রাহ্মসমাজের ট্রাস্টি ও বেথুন কলেজের সম্পাদক মনোনীত হওয়ায় (১৮৯৭) তাঁর প্রতিষ্ঠা বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করে। আইন-সংক্রান্ত 'সেলিব্রেটেড ট্রায়ালস ইন ইণ্ডিয়া' গ্রন্থের তিনি ছিলেন সংকলক।

॥২॥ স ত্যে ন্দ্র না থ ঠা কু র (১৮৪২-১৯২৩)। স্বর্ণকুমারীর জীবনগঠনের প্রারম্ভিক পর্বে যে কয়েকজন তাঁকে স্নেহ-মমতা-প্রশ্রয়ের রক্ষাকবচ দান করেন তার মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বর্ণকুমারী দেবীর গ্রন্থাবলীর চতুর্থ ভাগে মুদ্রিত 'সেকেলে কথা'য় সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'বিলাত হইতে ফিরিবার পর হইতে স্ত্রীজাতির

৭ যোগেশচন্দ্র বাগল, মুক্তির সন্ধানে ভারত, ১৩৬৭, পৃ ১৮৩।

উন্নতি-সংকল্পে প্রকৃতপ্রস্তাবে কার্য আরম্ভ করিলেন আমার পূজনীয় মেজদাদা— শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।...আশৈশব ইনি মহিলা-বন্ধু, স্ত্রীশিক্ষা-স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী। বিলাত যাইবার পূর্বেই উক্ত বিষয়ের ঔচিত্য সম্বন্ধে সারগর্ভ সতেজ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া ইনি একখানি পুস্তিকা প্রচার করেন। পিতৃদেব অন্তঃপুরের মঙ্গলের জন্য যেসকল আচারবিরুদ্ধ কার্য করিয়াছেন, অধিকাংশই ইহার পরামর্শে, ইহার প্রয়োচনায় সম্পাদিত। ইনি এসকল কার্যে পিতার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন।' এ প্রসঙ্গে অনেক বিদেশীর মন্তব্য উল্লেখ করা যায়,··· her third brother, Satyendranath, after visiting England, set himself to tear down the purdah, to remove from Indian Women the many and tremendous disabilities under which they labour ; he has been warmly supported by Mrs. Ghosal (Swarna Kumari) who was one of the first Bengali ladies to mix freely in society. (Introduction, An Unfinished Song)

স্ত্রীজাতির বন্ধু মেরী কার্পেন্টারের সঙ্গে ব্রিস্টল নগরে সত্যেন্দ্রনাথের দেখা হয়।[৮] অন্যত্র কার্পেন্টারের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতার কথা সমর্থিত হয়েছে। 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস' গ্রন্থে (১৯১৫) সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ দেখিয়া আমরা প্রীত হইলাম ও আমাদের দেশের তখনকার সামাজিক অবস্থা তাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিলাম। এইসকল বিষয় লইয়া তাঁহার সহিত আমাদের অনেক কথাবার্তা হইত।' (পৃ ১৬৯) এই পরিচিতির ফলে সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার উৎসাহ দৃঢ় এবং বলিষ্ঠ আকার ধারণ করে। উক্ত সাক্ষাৎকারের পূর্বেই যে তিনি এ বিষয়ে উদ্যোগী হয়ে উঠেছিলেন তার কথা পূর্বে বলা হয়েছে। বিলাতযাত্রার আগে জন স্টুয়ার্ট মিলের 'সাবজেকসন অব ওম্যান' পাঠ করে স্ত্রীস্বাধীনতা নামে এক পুস্তিকা প্রণয়ন করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। (আমার বাল্যকথা, পৃ ৪) এ সম্বন্ধে সৌদামিনী দেবী বলেন, 'স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধেও তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। স্ত্রীস্বাধীনতা বলিয়া একখানি চটি বই তাঁহার অল্প বয়সেই তিনি লিখিয়াছিলেন।'[৯]

সাহিত্য-স্রোত গ্রন্থের একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে স্বর্ণকুমারী মধ্যম অগ্রজের প্রতি শ্রদ্ধার কুসুমাঞ্জলি অর্পণ করেছেন। অন্যত্র তিনি তাঁর কৃতিত্ব ও মানসিক দৃঢ়তা-অটলতা এবং আত্ম-নির্ভরতা সম্বন্ধে বলেছেন যে, একদা 'তাঁহাকে শত বাধা একাকী এক হস্তে উৎপাটন করিতে

৮ পুরাতনী, পৃ ১৩৩, পাদটীকা। অপিচ দ্র— Mary Carpenter, Addresses to the Hindoos delivered in India, 1867, p 48.

৯ প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩১৮, পৃ ৪৭৫।

করিতে অগ্রগামী হইতে হইয়াছে। নিজের বাড়ীর লোকে পর্যন্ত তাঁহার সহিত যোগ দিতে ভয় পাইয়াছে। কিন্তু স্ত্রীজাতির উন্নতিতে ইনি এমনই অটলসংকল্প ছিলেন, মহিলাদের মঙ্গল কল্পনায় ইনি এমনি আনন্দ লাভ করিতেন যে, এ সাধনার জন্য তিনি কোন বাধাকেই বাধা জ্ঞান করেন নাই, কোন অপমানই তাঁহাকে নত করিতে পারে নাই।...বাড়ীর মেয়েরা মিউজিয়াম বা পশুশালা বা কোন বক্তৃতা শুনিতে যাইতে চাহে—সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার পুরুষ মিলিতেছে না; মেজদাদা জানিতে পারিলেই অমনি শত অনিচ্ছা—শত অসুবিধা সত্ত্বেও তাহাকে সঙ্গে করিয়া যথাস্থানে লইয়া যাইবেন। কর্তার নিকট মেয়েদের যদি কোন আবেদন থাকিত ত মেজদাদাই তাহাদের মুরুব্বী; বাড়ীর মেয়েরা সকলেই জানিত, মেজদাদার মত সহায় বন্ধু তাহাদের আর কেহ নাই; তাঁহার উপর সকলেরই বিশ্বাস ছিল অসীম।' সাহিত্য-স্রোতের প্রবন্ধটি পাঠকালে জানা যায় যে সত্যেন্দ্রনাথের বিলাত থেকে প্রত্যাবর্তনের দিন লেখিকা নিদ্রিত ছিলেন এবং স্বপ্নে অনুভব করেছিলেন যে তিনি যেন পিঞ্জরমুক্ত পক্ষিণীর ন্যায় আকাশে বিচরণ করছেন, এমন সময় তাঁকে জাগিয়ে তুলে বলা হল যে 'সতু বাবু এসেছেন'। পরম রমণীয় এই ঘটনাটিকে লেখিকা রূপকমূল্য দিতে চেয়েছেন।

সহোদরা স্বর্ণকুমারীকে সত্যেন্দ্রনাথ বড়ই ভালবাসতেন; ভগিনীগণের মধ্যে তিনিই সর্বাধিক পরিমাণে কুসংস্কারমুক্ত ও স্বাধীনচেতা এবং শিক্ষিতা ছিলেন বলে নারীজাতির হিতাকাঙ্ক্ষী সত্যেন্দ্রনাথের প্রশ্রয়ও তিনিই বেশি পেয়েছেন। ইন্দিরা দেবী 'রবীন্দ্রস্মৃতি'তে বলেছেন, 'বাবা চিরদিনই স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। সেইজন্যেই বোধ হয় বোনেদের মধ্যে স্বর্ণপিসিমাকে বেশি ভালোবাসতেন। আমাদেরও তাঁদের পরিবারের সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠতা' ছিল।'[১০] বোম্বাই থেকে জ্ঞানদানন্দিনীকে লিখিত পত্রাবলীর প্রায় প্রত্যেকটিতে জানকীনাথ-স্বর্ণকুমারীদের সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করে পাঠাতেন সত্যেন্দ্রনাথ। বিবাহের পর 'শিক্ষার সৌকর্যার্থে' স্বর্ণকুমারী অগ্রজের কর্মস্থলে গিয়েছিলেন; এবং জ্ঞানদানন্দিনীর স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় যে সত্যেন্দ্রনাথের বোম্বাইপ্রবাসের প্রথম পর্বে সহোদরাগণের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে বেশি যাতায়াত করতেন। শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ স্বর্ণকুমারীর প্রথম উপন্যাস ও মুদ্রিত গ্রন্থ দীপনির্বাণ 'শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীচরণেষু / মেজদাদা'কে উৎসর্গ করা হয়। ১৯১৫ খৃস্টাব্দের ৫ আগস্ট তারিখে রাঁচি থেকে 'শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী / স্নেহের ভগিনী'কে 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস' উৎসর্গ করেন 'তোমার মেজদাদা' সত্যেন্দ্রনাথ। উৎসর্গপত্রে বলা হয়, 'তোমাকে খুশী করবার জন্যে আমার এই বাল্যকথা স্মৃতির মায়াপুরী থেকে উদ্ধার করে তোমার মানিক

১০ বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, পৃ ১৯২।

পত্রিকায় প্রকাশ করেছি—তুমি নাছোড়বন্দা হয়ে না ধরলে এ কথাগুলি স্মৃতিতেই থেকে যেত। তাছাড়া, আমার বোম্বাই-কাহিনীর সঙ্গে তুমি কত রকমে জড়িত ; তার বর্ণিত অনেক ঘটনা তোমার চোখের সামনে ঘটেছে, তাতে যেসকল লোকের কথা পাড়া হয়েছে তারা অনেকে তোমার সুপরিচিত কেননা কত সময় তুমি আমার বোম্বাইপ্রবাস-সঙ্গিনী হয়ে কত আদর যত্নে প্রবাস-যন্ত্রণা যে কি তা আমাকে জানতেই দাওনি ;—এইসকল কারণে এই কথামালা যেমন তোমার কাছে আদরণীয় হবে এমন আর কোথায় ? তাই ভাই, এই গ্রন্থখানি তোমার করকমলে অর্পণ করছি, তুমি আমার স্নেহের উপহার গ্রহণ কর ।'

কেবল স্বর্ণকুমারী বা জানকীনাথ নয়, তাঁদের সন্তানগণের প্রতিও সত্যেন্দ্রনাথ বিশেষ স্নেহপরায়ণ ছিলেন এবং শেষজীবন পর্যন্ত তাঁদের সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তায় আবদ্ধ ছিলেন। ইন্দিরা দেবী বলেছেন, 'তিনি আম ভালবাসতেন বলে তাঁর বোম্বাই সিবিলিয়ানী পদের উত্তরাধিকারী ভাগ্নে জ্যোৎস্নানাথ ঘোষাল জন্মদিনে নিয়মিত তাঁকে একবাক্স "আফুস" (Alphanso) পাঠিয়ে দিতেন' ইত্যাদি। (সত্যেন্দ্রস্মৃতি—বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫২)

॥৩॥ জ্যো তি রি ন্দ্র না থ ঠা কু র (১৮৪৯-১৯২৫)। স্বর্ণকুমারীর বিবাহের পূর্বে ঠাকুরপরিবারের যে কয়েকজন তাঁর সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য চেষ্টা করেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁদের অন্যতম। তিনি 'জীবন-স্মৃতি'র মধ্যে বলেছেন, 'আমি সন্ধ্যাকালে সকলকে একত্র করিয়া ইংরাজী হইতে ভাল ভাল গল্প তর্জমা করিয়া শুনাইতাম—তাঁহারা সেগুলি বেশ উপভোগ করিতেন। ইহার অল্পদিন পরেই দেখা গেল যে, আমার একটি কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী কতকগুলি ছোট ছোট গল্প রচনা করিয়াছেন। তিনি আমায় সেইগুলি শুনাইতেন। আমি তাঁহাকে খুব উৎসাহ দিতাম।' লেখিকার বিবাহ-পরবর্তী কালের কথাও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছেন, 'জানকী বিলাত যাইবার সময় আমার কনিষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী আমাদের বাড়ীতে বাস করিতে আসায়, সাহিত্যচর্চায় আমরা তাঁহাকেও আমাদের আর একজন যোগ্য সঙ্গীরূপে পাইলাম।...এই সময়ে আমি পিয়ানো বাজাইয়া নানাবিধ সুর-রচনা করিতাম।...সুরের অনুরূপ গান তৈরি হইত। স্বর্ণকুমারীও অনেক সময় আমার রচিত সুরে গান প্রস্তুত করিতেন।' স্বর্ণকুমারীর সাহিত্যচর্চায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎসাহ বিশেষ কার্যকর হয়েছিল ; এমনকি তাঁর প্রথম পর্বের রচনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাব বড় বেশি পরিমাণে পড়েছে, স্বর্ণকুমারীর লেখক-নামবিহীন প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ দীপনির্বাণকে অনেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনা বলে ভ্রম করেছিলেন।

পরবর্তী কালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঘোষালপরিবারের কয়েকজনের প্রতিকৃতি অঙ্কন করেন। জানকীনাথ ঘোষালের একটি (১৮৭৪), স্বর্ণকুমারীর একটি (১৮৮৩), সরলা দেবীর

একটি (১৮৮৩), জ্যোৎস্নানাথের দুটি (১৮৮৯) ও হিরণ্ময়ী দেবীর চারটি (১৯১৪, ১৯১৯, ১৯২৩)—এই কয়েকটি ছবির সংবাদ পাওয়া যায়।[১১] মূল চিত্রগুলি রবীন্দ্রভারতীর চিত্রশালায় সংরক্ষিত। তাছাড়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যে ডায়েরি শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসদনে পাওয়া যায় তার মধ্যেও এমন কয়েকটি স্কেচের কথা আছে যা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে। মন্মথনাথ ঘোষের 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ' নামক জীবনী গ্রন্থে স্বর্ণকুমারীকে লিখিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যে চিঠির নিদর্শন রয়েছে (পৃ ১৭৯-৮০) তার মধ্যে ভ্রাতা-ভগিনীর প্রীতি-মধুর সম্পর্কটি সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়েছে; উক্ত গ্রন্থের ১৮৭ পৃষ্ঠায় পাওয়া যায় যে ১৯২০ খৃস্টাব্দে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে লেখিকা অগ্রজের নিকট 'তত্ত্ব' পাঠিয়েছিলেন। স্বর্ণকুমারীর সহায়তায় যে মন্মথনাথ ঘোষ এবং বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-সম্বন্ধীয় মূল্যবান গ্রন্থগুলি রচনা করেন সেকথা যথাস্থানে স্বীকৃত হয়েছে।

প্রীতি ও শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ লেখিকার 'ছিন্নমুকুল' উপন্যাসটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গ করা হয়। স্বর্ণকুমারী বলেছেন, 'পূজনীয়েষু জ্যোতিদাদা! / হৃদয়-উচ্ছ্বাসভরে আজিকে তোমার করে/দলিত কুসুমগুলি সঁপিনু যতনে। / কি আর চাহিতে পারি? একবিন্দু অশ্রুবারি/মিশাইও কনকের অশ্রুবারি সনে।' জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বর্গারোহণের পর একটি স্মৃতিসভা আশুতোষ কলেজের ছাত্রবর্গের দ্বারা ভবানীপুর সম্মিলন ব্রাহ্মসমাজগৃহে আহূত হয় (২১ শে চৈত্র ১৩৩১)। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সভায় শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী ও শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দুইটি প্রবন্ধ পঠিত হয়' ইত্যাদি।[১২]

॥৪॥ **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** (১৮৬১-১৯৪১)। নানা ব্যাপারে স্বর্ণকুমারী বালক রবীন্দ্রনাথের সহায়তা করেছেন। খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 'রবীন্দ্র কথার' মধ্যে বলেছেন, 'প্রতিভাও উদ্বোধনের অপেক্ষা রাখে। বাটিতে পূর্বোল্লিখিত তাঁহার নতুন-বৌঠান, স্বপ্নপ্রয়াণের কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ও নতুন দাদা, তাঁহার দিদি স্বর্ণকুমারী ব্যতীত রবীন্দ্রনাথকে প্রথম বয়সে উদ্বোধিত করেন অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী।' (পৃ ১৯৬) খগেন্দ্রনাথ আরও বলেছেন, 'বালকদের অভিনয়-সাহায্যার্থ "মুকুট" এবং বিবিধ "হেঁয়ালীনাট্য" তাঁহার ভগ্নী স্বর্ণকুমারীর ও ভ্রাতৃজায়া জ্ঞানদানন্দিনীর উৎসাহে রচিত।' (পৃ ২৪৮) এই ভ্রাতাভগিনীর মধ্যে প্রীতি ও সৌহার্দ্যের একটি সুন্দর সম্পর্ক ছিল। লেখিকা প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ 'গাথা' কাব্যটি 'দুরন্ত ভাই' রবীন্দ্রনাথকে উপহার দিয়েছিলেন।

১১ সুশীল রায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, ১৩৬৩, পৃ ১৯৪।

১২ মন্মথনাথ ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, পৃ ১৮৩।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে স্বর্ণকুমারী বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণের জন্য গিয়েছিলেন ; রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিঠিপত্রে এবং স্বর্ণকুমারী তাঁর পত্র-প্রবন্ধে এইসকল ভ্রমণ সম্পর্কে কৌতুকপূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন। ছিন্নপত্রাবলীর (১৯৬৩) প্রথম পত্রে যে 'মেয়েমানুষ পাচটা'র উল্লেখ আছে তাঁরা হলেন মৃণালিনী, সৌদামিনী, স্বর্ণকুমারী, হিরণ্ময়ী ও সরলা ; অবশ্য এইসঙ্গে এক বৎসর বয়স্ক শিশুকন্যা বেলাও ছিল। ১২৯৪ সালের শরৎকালের এই যাত্রার বর্ণনাকালে রবীন্দ্রনাথ নদিদি স্বর্ণকুমারী সম্পর্কে পরিহাসপূর্ণ নানা মন্তব্য করেছেন। ১২৯৫ সালের ভারতী ও বালকের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও কার্তিক সংখ্যায় (যথাক্রমে ২২, ৯৫, ১২৯, ১৯৪, ২৪৬ ও ৩৭৩ পৃষ্ঠায়) স্বর্ণকুমারীর দার্জিলিং-বিষয়ক যে ধারাবাহিক পত্র-প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় তা এই ভ্রমণেরই ফল। প্রবন্ধগুলি থেকে ঐ ভ্রাম্যমাণ পরিবারের অনেক কথা জানা যায়। দার্জিলিঙে বিশাল কাসলটন হাউসের বড় হলের মধ্যে 'সন্ধ্যাবেলা সমস্ত চৌকি একখানা কৌচের কাছে জড় হয়, আর মধ্যে একটি ছোট টিপয়ে আলো জ্বলে, তার চারদিকে কেহ চৌকিতে কেহ কৌচে সুবিধামত বসে শুয়ে নিলে আমাদের সঙ্গী অভিভাবকটি টেনিসন থেকে ব্রাউনিং থেকে খাবার আসা পর্যন্ত আমাদের কবিতা পড়ে শোনান।' (ভারতী ও বালক, বৈশাখ ১২৯৫, পৃ ২৪) এই দার্জিলিঙে বাসকালে প্রসন্নকুমার রায়ের পত্নী সরলার অনুরোধে 'মেয়েদের অভিনয়োপযোগী' মায়ার খেলার গান রচনা আরম্ভ হয়। পরবর্তী কালে স্বর্ণকুমারীর সখিসমিতির উদ্‌যোগে বেথুন স্কুলে অনুষ্ঠিত 'মহিলা-শিল্পমেলা'র শেষে ঐ মায়ার খেলা অভিনীত হয় (পৌষ ১২৯৫) ; ইন্দিরা দেবীর মতে ঠাকুরবাড়ির 'মেয়েরাই অভিনয় করেন'। (রবীন্দ্রস্মৃতি—বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, পৃ ১৯৬)

১২৯৪ সালের শেষ দিকে রবীন্দ্রনাথ 'সপরিবারে গাজিপুরে গিয়া বাস করিতে মনস্থ করিলেন' (রবীন্দ্রজীবনী, ১ম, পৃ ২৩৫) ; পরবৎসর শ্রাবণ মাসে (জুলাই ১৮৮৮) স্বর্ণকুমারী কনিষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে গাজিপুর গিয়েছিলেন। স্বর্ণকুমারীর এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ১২৯৬ সালের ভারতী ও বালকের জ্যৈষ্ঠ শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এ সম্পর্কে বলেছেন, 'তাহাতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক কথা স্নেহের সহিত, কৌতুকের সঙ্গে লেখা।...উক্ত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ-রচিত গাজিপুরের এক উদ্ভট ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। বলাবাহুল্য ইতিহাসটি রবীন্দ্রনাথের স্বকপোলকল্পিত, হাস্যরসসৃষ্টি তাহার উদ্দেশ্য।' (রবীন্দ্রজীবনী, ১ম, পৃ ২৪১) মূল রচনাটি স্বর্ণকুমারীর ভ্রমণবিষয়ক পত্র ও প্রবন্ধ আলোচনাকালে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য তাঁরা অতঃপর অল্পদিনের জন্য কাশী ভ্রমণ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের 'প্রতিশোধ' নামক গাথাকবিতাটি ১২৮৫ সালের ভারতী পত্রিকায় শ্রাবণ

সংখ্যায় (পৃ ১৬৫) প্রথম মুদ্রিত হয়। এই একই শিরোনামে স্বর্ণকুমারী যে ছোটগল্পটি রচনা করেন তার প্রথম প্রকাশের স্থান ও কাল—ভারতী ও বালক, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮। গল্পটি নবকাহিনী নামক গল্পসংকলন গ্রন্থের অন্তর্গত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে একই নামের এই গাথাকবিতা ও ছোটগল্পের ঘটনাগত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

অন্যান্য অনেক গানের মত স্বর্ণকুমারীর 'সাজাব তোমারে আজি মোরা যতনে' (রাজকন্যা, প্রথম অঙ্ক, প্রথম ও চতুর্থ দৃশ্য)-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'তোমায় সাজাব যতনে'র সাদৃশ্য আছে। স্বর্ণকুমারীর গাথা কাব্যের মধ্যে 'খড়্গ-পরিণয়' নামক যে কবিতাটি আছে তা প্রথম ১২৮৬ সালের ভারতীর চৈত্র সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশকালে কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'তারে দেহ গো আনি' গানটি প্রযুক্ত হয়; গানটি সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'স্বর্ণকুমারী দেবীর উক্ত কবিতা তাঁহার "গাথা" কাব্যে সংকলনকালে মূল কবিতার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন-পূর্বক গানটি বর্জিত হইয়াছে।' (গীতবিতান, পৃ ৯১৬) অনুরূপ ব্যাপারের উৎকৃষ্ট নিদর্শন 'বিবাহ-উৎসব' গীতিনাট্যটি। স্বর্ণকুমারী-রচিত এই গীতিনাট্যটির মধ্যে একাধিক রবীন্দ্রসংগীত স্থানলাভ করেছিল। রবীন্দ্রনাথের বিবাহের (২৪ অগ্রহায়ণ ১২৯০) তিন মাস পরে হিরণ্ময়ীর বিবাহ হয়; সেই বিবাহ-উপলক্ষে বিবাহ-উৎসব রচিত হয়েছিল। এই গীতিনাট্যটির একটি অভিনয়ের কথা উল্লিখিত হয়েছে ইন্দিরা দেবীর 'রবীন্দ্রস্মৃতি' নামক প্রবন্ধে। (বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, পৃ ১৯৪-৯৫) বিবাহ-উৎসবের মোট সাতটি দৃশ্য, পঁয়তাল্লিশটি গান; তন্মধ্যে রবীন্দ্র-গীতিসংখ্যা হল আঠাশ। এই গানগুলির আরম্ভ এইরূপ :—ওই জানালার কাছে বসে আছে, সাধ করে কেন সখা, ধীরি ধীরি প্রাণে আমার এসো হে, তুমি আছ কোন্ পাড়া, দেখ ঐ কে এসেছে, ভাল যদি বাস সখী, ও কেন ভালবাসা জানাতে আসে, হা কে বলে দেবে, কেন রে চাস ফিরে ফিরে, প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন, সখা সাধিতে সাধাতে কত সুখ, এত ফুল কে ফোটালে কাননে, আমাদের সখীরে কে নিয়ে যাবে, কোথা ছিলি সজনি লো, ওকি কথা বল সখী, মধুর মিলন, মা একবার দাঁড়া গো, মা আমার কেন তোরে, নাচ শ্যামা তালে তালে, রিম্ ঝিম্ ঘন ঘন রে, বুঝি বেলা বহে যায়, মনে রয়ে গেল মনের কথা, তারে দেখাতে পারিনে কেন প্রভৃতি। এই গীতিনাট্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর গানও ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে পূর্বকথিত রবীন্দ্রস্মৃতি প্রবন্ধে ইন্দিরা দেবী 'মানময়ী নাটক' (প্রথম প্রকাশ : ১৮৮০) সম্বন্ধে বলেছেন, 'এটি কার রচনা সেকালে আমাদের অনুসন্ধান করবার কোনো প্রবৃত্তি হয়নি, তবে এখন মনে পড়ে রবিকাকা, জ্যোতিকাকা, স্বর্ণপিসিমা অনেক সময় মিলেমিশে গীতিনাট্য রচনা করতেন।'

অন্যান্য অনেক বিষয়ের মত স্বর্ণকুমারী রবীন্দ্রসংগীতের পৃষ্ঠপোষকতা করে গিয়েছেন

চিরকাল। শরৎকুমারী চৌধুরানী 'ভারতীর ভিটা'য় (বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, পৃ ১১২) বলেছেন যে তিনি যখনই স্বর্ণকুমারীর রামবাগানস্থ বাড়িতে যেতেন 'অধিকাংশ সময়ই দেখিতাম সেক্‌সপিয়ার পড়িতেছেন, আবার কখন দেখিতাম সেতার শিক্ষা করিতেছেন,…সকলে মিলিত হইলে ভারতীর জন্ম রচিত নূতন প্রবন্ধাদি পাঠ, আলোচনা, রবীন্দ্রনাথের গান হইত,…।' তাছাড়া খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ও উল্লেখ করেছেন, 'জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারে কতকগুলি প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির একত্র সমাবেশে রবীন্দ্র-সংগীতের নব অভিব্যক্তির অঙ্কুর যেন উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইয়াছিল। তাঁহার অগ্রজ ৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, তাঁহার ভগ্নী ৺স্বর্ণকুমারী দেবী ও তাঁহার বিদুষী কন্যা সুপরিচিতা শ্রীমতী সরলা দেবী এবং ৺প্রতিভা দেবী ও শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রমুখ কবির ভ্রাতুষ্পুত্রীগণ ও ৺হিতেন্দ্রনাথ প্রমুখ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রমণ্ডলী তাঁহার কণ্ঠনিঃসৃত এই নবাগত বাণীর উপযুক্ত প্রতিচ্ছবি গ্রহণ পূর্বক নিজ নিজ কণ্ঠের অনবদ্য মাধুর্য মণ্ডিত করিয়া বৎসরের পর বৎসর ব্রাহ্মসমাজের জন্মদিবস উৎসবোপলক্ষে বাঙলার রসপিপাসু নরনারীকে উপঢৌকন দিয়া আসিয়াছেন।' (রবীন্দ্র কথা, পৃ ২৩৯-৪০)

১২৯৬ সালের ভারতী ও বালক পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'নবাবঙ্গের আন্দোলন' (পৃ ৩৪৫-৫১) শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়; ৩৪৯ পৃষ্ঠার পাদটীকায় ভারতী-সম্পাদিকার একটি মন্তব্য আছে উক্ত প্রবন্ধের কোনো একটি অংশ সম্বন্ধে। স্বর্ণকুমারী লিখেছেন, 'লেখক আমাদের এখনকার পলিটিক্যাল আন্দোলন যেরূপ অসার মনে করেন একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখিবেন তাহা নহে। এই আন্দোলনের মধ্যেই কাজ করিবার একটি ইচ্ছা, জাতীয় মহত্ত্বলাভের দিকে অগ্রসর হইবার একটি উদ্যম প্রকাশ পাইতেছে; তবে লেখক একদিনেই যদি আমাদের শতশত বৎসরের অবনতির বিনাশ দেখিতে চান তাহা কি করিয়া পাইবেন? লেখক বলিয়াছেন, "আমাদের মধ্যে অতি অল্প লোকই আছেন যাঁহারা আমাদের রাজ্যশাসনতন্ত্র এবং Representative Government-এর মূল নিয়ম এবং আমাদের দেশে বর্তমান কালে তাহার উপযোগিতা ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু অবগত আছেন অথবা প্রকৃত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া তদ্বিষয়ে কিছু জানিতে অভিলাষী আছেন।" অবশ্য দেশের অধিকাংশ লোক যদি যোগ্য হইত তাহা হইলে ত সমস্ত গোল চুকিয়া যাইত, এরূপ পলিটিক্যাল আন্দোলনেরই বা তাহা হইলে আবশ্যক কোথা? কিন্তু আমাদের দেশ কোন ছার কথা, ইয়ুরোপের কোন দেশেই কি অধিকাংশ লোকে রাজ্যশাসন-তন্ত্রের মর্মগত নিয়ম বিচার করিয়া কাজ করে? এরূপ স্থলে সর্বত্রই নেতাগণ প্রধান, তাঁহাদের প্রাণগত চেষ্টা, মহত্ত্বই জাতীয় উন্নতির কারণ। আমাদিগের পলিটিক্যাল নেতাগণের সকলে না হউন, যখন অনেকেই তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধনে প্রাণগত চেষ্টা

করিতেছেন, তখন কি এই আন্দোলনকে আমরা সারশূন্য বলিতে পারি? চরিত্র-মাহাত্ম্য নহিলে কোন উন্নতি হয় না সত্য, কিন্তু ইহার দিকে আমাদের যে লক্ষ্য পড়িয়াছে—তাহার উজ্জ্বল অনেক প্রমাণ দেখা যাইতেছে, তাহা ছাড়া লেখকের বর্তমান প্রবন্ধই তাহার একটি প্রমাণ। ভাং সং।' অনুজের প্রবন্ধ বা মন্তব্য বিচারকালে লেখিকার সস্নেহ অনুযোগটি এক্ষেত্রে লক্ষণীয়।

সর্বশেষে বলা যায়, এই ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে চিঠিপত্রের আদানপ্রদান চলত। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক স্বর্ণকুমারীকে লিখিত মাত্র তিনটি পত্র বিশ্বভারতী পত্রিকার ত্রয়োদশ বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে; দ্বিতীয় পত্রটি থেকে জানা যায় যে (২৮ জানুয়ারি ১৯১৩) স্বর্ণকুমারী ঐসময় তাঁর কোনো কোনো বই অনুবাদ করে আমেরিকা থেকে প্রকাশের ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন।

স্বর্ণকুমারীর কবিতার তালিকা[১]

অতি ক্ষীণ ক্ষীণতর পাপিয়ার স্বর। সন্ধ্যা-সংগীত

অধরে অধরে। নিশীথ-সংগীত।[২] ভারতী ও বালক, কার্তিক ১২৯৬, পৃ ৩৬৩

অধরে মোহন হাসি। সন্ধ্যা-সংগীত। ভারতী ও বালক, পৌষ ১২৯৪, পৃ ৫৬১

অনাদি মন্ত্র। কবিতা পারিজাতহার

অপরাহ্নে। মধ্যাহ্ন-সংগীত

অবিশ্বাস যায় টুটে। নিশীথ-সংগীত

অভাগিনী। গাথা

অভিনয়।[৩] ভারতী ও বালক, শ্রাবণ ১২৯৪, পৃ ১৮৭

অভিলাষ। জয়যাত্রা, মহালয়া ১৩৬৩—দেব সাহিত্য-কুটীর, পৃ ১

অরুণ মুকুট শিরে।[৪] প্রভাত-সংগীত

অলি ও ফুল। মধ্যাহ্ন-সংগীত

অশ্রুজল। নিশীথ-সংগীত। ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯, পৃ ৮৯

অস্তমিত চন্দ্র-তনু কম্পিত তমস-অণু।[৫] ঐ

আকাশে কি উঠে গীতি। কবিতা পারিজাতহার

আজি এ জোছনা রাতে। নিশীথ-সংগীত। ভারতী ও বালক, চৈত্র ১২৯৩, পৃ ৭১২

আজি এ মাধবী রাতে। জয়যাত্রা, ১৩৬৩, পৃ ১

আদিহীন অন্তহীন কাল। ভারতী, বৈশাখ ১৩১৭, পৃ ১

আপনা হতে তুমি আপনা।[৬] ভারতী ও বালক, বৈশাখ ১২৯৯, পৃ ৪৩

১ তালিকাটির বিন্যাসক্রম : প্রথম ছত্র বা কবিতার শিরোনাম, গ্রন্থনাম, প্রাপ্ত প্রকাশকাল।

২ স্নেহলতা উপন্যাসের প্রথম ভাগের অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে (গ্রন্থাবলী, ৩য়, পৃ ৫২) অংশত ব্যবহৃত।

৩ নিশীথ-সংগীত কাব্যে শিরোনাম 'জীবন-অভিনয়'।

৪ স্বর্ণকুমারীর গল্পস্বল্প (১২৯৫) নামক পাঠ্যপুস্তকের (পৃ ৯) অন্তর্গত। লেখিকার বাল্যবিনোদ (১৯০২) নামক গ্রন্থের মধ্যেও (পৃ ৫৬) ব্যবহৃত। অমৃতলাল বসুর কৃপণের ধন (১৯০৭) নামক প্রহসনের দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে এর প্রসঙ্গ বর্তমান।

৫ দ্র গল্পস্বল্প, পৃ ১০০। অপিচ দ্র বাল্যবিনোদ, পৃ ৫৯।

৬ বর্তমান তালিকার ৩২ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

আমার খুকুরানি সোনামনি।[৭] প্রভাত-সংগীত

আমার ঘুম ভেঙেছে। ঐ। ভারতী ও বালক, অগ্রহায়ণ ১২৯৩, পৃ ৪১৬

আমার সে ফুল দুটি। মধ্যাহ্ন-সংগীত। ভারতী, বৈশাখ ১২৯২, পৃ ৫১

আমি কি চাহি। প্রভাত-সংগীত

আমি নীরব বীণা। মধ্যাহ্ন-সংগীত। ভারতী ও বালক, ১২৯৮, পৃ ৩২২

আরতি। ভারতী, বৈশাখ ১৩১৫, পৃ ১

আর্য-অবনতি-কথা পড়িয়ে পাইবে ব্যথা। দীপনির্বাণ

আশা।[৫] নিশীথ-সংগীত

আশিস্-মঙ্গল। সাহিত্য-স্রোত

আশীর্বাদ।[৮] প্রভাত-সংগীত। ভারতী ও বালক, বৈশাখ ১২৯৫, পৃ ১-২

আহা কি সুন্দর হাসি। প্রেম-পারিজাত। ভারতী, আষাঢ় ১৩০২, পৃ ১২১

উত্তর। ভারতী ও বালক, পৌষ ১২৯৫, পৃ ৫১৬

উত্তাল তরঙ্গময় দুর্জয় প্রতাপ। নিশীথ-সংগীত

উপহার। ঐ

এ অশ্রু তোমার প্রতি। ঐ

এই ত জীবন-অভিনয়।[৯] ঐ। ভারতী ও বালক, শ্রাবণ ১২৯৪, পৃ ১৮৭

এই ত দেখিনু একটি বোঁটায়। মধ্যাহ্ন-সংগীত

এই ত সুরম্য নন্দন কাননে।[১০] সন্ধ্যা-সংগীত। ভারতী, ফাল্গুন ১২৮৪, পৃ ৩৮৩

একা আমি যাত্রী। নিশীথ-সংগীত

একাকিনী।[১০] ভারতী ও বালক, শ্রাবণ ১২৯৭, পৃ ২০৪

৭ অমৃতলাল বসুর কৃপণের ধন নামক প্রহসনে এর প্রসঙ্গ বর্তমান। বর্তমান তালিকার ৩ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য। স্বর্ণকুমারীর গল্পস্বল্প গ্রন্থেও (পৃ ৬৫) ব্যবহৃত। প্রভাত-সংগীতে এর শিরোনাম 'খুকুরানী', গল্পস্বল্পে 'বোনের ভালবাসা'।

৮ প্রভাত-সংগীতে একই শিরোনামে দুটি কবিতা আছে।—দ্র গ্রন্থাবলী, ৪র্থ, পৃ ১৫৫-৫৬। ১২৯৫ সালের ভারতী ও বালকের বৈশাখ সংখ্যায় 'নববর্ষের আশীর্বাদ' এই শিরোনামে চারটি কবিতা মুদ্রিত হয়। ভারতী ও বালকের তৃতীয় ও চতুর্থ কবিতা এবং প্রভাত-সংগীতের এই দুটি কবিতা একই। পত্রিকার প্রথম কবিতাটি নিশীথ-সংগীতের অন্তর্গত। ১৪ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

৯ 'জীবন-অভিনয়' গল্পটিতে অংশত ব্যবহৃত।—দ্র গ্রন্থাবলী, ৫ম, পৃ ৫৬; অপিচ দ্র ভারতী, আশ্বিন ১৩১২, পৃ ৫৩৭। এই কবিতার শিরোনাম যথাক্রমে 'অভিনয়' এবং 'জীবন-অভিনয়'। বর্তমান তালিকার ৩ এবং ১৭ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

১০ বর্তমান তালিকার ২৫ এবং ৩৯ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

১১ 'ইংরাজি কবিতায় প্রেমালাপ করলে চলবে না ত, বাঙ্গালায় বলতে হবে। তা সেজন্য ভাবনা কি, আজকাল ত বাঙ্গালায় এরকম কবিতার কিছু অভাব নেই। দেবকৌতুকের এ লাইনগুলো বেশ খাটতে পারে— একি কারে দেখি' ইত্যাদি।—ঐ গ্রন্থাবলী, ৫ম, পৃ ৯২। মূলত স্বর্ণকুমারীর দেবকৌতুকে ব্যবহৃত।

১২ পত্রিকায় নামান্তর 'ধরার ধারা'।

কে ও উন্মাদিনী কে ওই বালিকা। গাথা। ভারতী, পৌষ ১২৮৬, পৃ ৪১১

কে ছোট কে বড়। নিশীথ-সংগীত

কে তুমি ধরায় সতি।[১৩] মধ্যাহ্ন-সংগীত

কেন অশ্রুজল। নিশীথ-সংগীত। ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯, পৃ ৮৯

কেন এ সংশয়।[১৪] ঐ। ভারতী ও বালক, বৈশাখ ১২৯৫

কেন গো শুধাও। নব কবিতাবলী

কেমনে ভুলি। মধ্যাহ্ন-সংগীত

কোথায় কোথায়। প্রভাত-সংগীত। ভারতী ও বালক, ১২৯৮, পৃ ৩২৩

ক্ষণিক ভুলে। কবিতা পারিজাতহার

খড়্গ-পরিণয়। গাথা। ভারতী, চৈত্র ১২৮৬, পৃ ৫৪৯

খুকুরানী।[১৫] প্রভাত-সংগীত

খেয়াযাত্রীর শেষ কথা। কবিতা পারিজাতহার

গিয়াছে তৃষা। প্রেম-পারিজাত। ভারতী, কার্তিক ১৩২৬, পৃ ৬৯৮

গিয়েছে বেলা বয়ে।[১৬] সন্ধ্যা-সংগীত

গুরু গুরু গর্জনে। কবিতা পারিজাতহার

ঘুম ঘোরে ঢোলে তারকার কোলে। গাথা। ভারতী, চৈত্র ১২৮৬, পৃ ৫৪৯

চুপ চুপ। মধ্যাহ্ন-সংগীত

ছিল না ত কাজ কোন কিছু। ঐ

ছিলাম যখন শিশু। বাল্যবিনোদ

ছোট ভাইটি আমার। গাথা

জননি গো একি হেরি। সাহিত্য-স্রোত

জননী। বাল্যবিনোদ

জানি না ত ভালবাসি কি না। প্রভাত-সংগীত

১৩ স্নেহলতার ২য় ভাগ ৩য় পরিচ্ছেদে ব্যবহৃত।—দ্র গ্রন্থাবলী, ৪র্থ, পৃ ৯; ভারতী ও বালক, শ্রাবণ ১২৯৭, পৃ ২১০। গান হিসাবেও নিবেদিতা নাটকের শেষ দৃশ্যে ব্যবহৃত।—দ্র গ্রন্থাবলী, ৩য়, পৃ ১৩৩।

১৪ পত্রিকায় কবিতারম্ভে 'বাছা' সম্বোধন লক্ষণীয়। 'নববর্ষের আশীর্বাদ' শিরোনামের এই পর্যায়ে পত্রিকায় মুদ্রিত কবিতাচতুষ্টয়ের মধ্যে এটি প্রথম। বর্তমান তালিকায় ৮ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

১৫ প্রথম ছত্র: আমার খুকুরানি সোনামনি। ৭ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য। অমৃতলাল বসুর কৃপণের ধন নামক প্রহসনে এর পাঠান্তর পাওয়া যায়।

১৬ স্বর্ণকুমারীর বাল্যবিনোদ (পৃ ৪২) এবং গল্পস্বল্প (পৃ ৫৬-৫৭) গ্রন্থেও কবিতাটি বর্তমান।

জাপানী বীর। ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩১০, পৃ ৭২৫

জার্মান-রুসিয়া-বল-ইংরাজ-ফরাসী। ঐ

জীবন-অভিনয়।[১৭] নিশীথ-সংগীত। ভারতী ও বালক, শ্রাবণ ১২৯৪, পৃ ১৮৭

জোছনা-হসিত নিশা।[১৮] ঐ। ভারতী ও বালক, মাঘ ১২৯৫, পৃ ৫৪৭

জ্যোৎস্নায় নদীকূলে।[১৯] ঐ

জ্যোৎস্নারাতে।[১৯] ভারতী ও বালক, চৈত্র ১২৯৩, পৃ ৭১২

ঝটিকা।[২০] ঐ। ভারতী, পৌষ ১২৮৬

তরু ও লতার বিলাপ।[২১] মধ্যাহ্ন-সংগীত

তরুণ অরুণ তব মধুর আলোকে। যুগান্ত কাব্যনাট্য

তরুর বিলাপ।[২১] ভারতী ও বালক, আষাঢ় ১২৯৯, পৃ ১৫৬

তুই স্নেহময়ি যেন বরষার ফুল। মিবাররাজ

তুমি গো সুন্দরী। মধ্যাহ্ন-সংগীত

তুমি জ্যোতির্ময় রবি। প্রভাত-সংগীত

তুমি রূপসী বালা লয়ে। মধ্যাহ্ন-সংগীত

তেমনি রয়েছে সব। নিশীথ-সংগীত

তেমনি রয়েছে সাধ। ঐ

তোমারেই দিতে হবে। বিচিত্রা

তোরা কাঁদিস সখি। প্রেম-পারিজাত। ভারতী, কার্তিক ১৩২৬, পৃ ৬৯৮

থাক ভোর। মধ্যাহ্ন-সংগীত

থামাও বাঁশরী তান। নিশীথ-সংগীত

দুটি তারা। সন্ধ্যা-সংগীত

দেহ নহে কারাগার। ভারতী ও বালক, পৌষ ১২৯৫, পৃ ৫১৬

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতা পারিজাতহার

১৭ পত্রিকায় শিরোনাম 'অভিনয়'। ৩ এবং ৯ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

১৮ বর্তমান তালিকায় ২৬ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

১৯ একই কবিতার পত্রিকায় শিরোনাম 'জ্যোৎস্নারাতে' এবং কাব্যে শিরোনাম 'জ্যোৎস্নায় নদীকূলে'।

২০ কবিতাটি বাল্যবিনোদ (পৃ ৫২) এবং গল্পগাথা (পৃ ৩৯-৪২) গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। গল্পগাথা গ্রন্থের এক স্থানে পাদটীকায় বলা হয়েছে, 'গাথা হইতে ঝটিকার বর্ণনা অংশ গৃহীত'। স্বর্ণকুমারীর গাথা কাব্যের সাধের ভাসান (ভারতী, পৌষ ১২৮৬) কবিতা থেকে বর্তমান অংশটি গৃহীত।—দ্র গ্রন্থাবলী, ৫ম, পৃ ১৩০-৩৪।

২১ পত্রিকায় শিরোনাম 'তরুর বিলাপ'।

দ্বিপ্রহরে।[২২] গল্পস্বল্প
ধর স্নেহ-উপহার। কৌতুকনাট্য
ধরার ধারা।[১৫] ভারতী ও বালক, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯, পৃ ১১০
নববর্ষে। কবিতা পারিজাতহার
নববর্ষে। নব কবিতাবলী
নববর্ষের আশীর্বাদ।[২৩] ভারতী ও বালক, বৈশাখ ১২৯৫, পৃ ১-২
নমামি ত্বাং। কবিতা পারিজাতহার
নহে অবিশ্বাস। মধ্যাহ্ন-সংগীত
নহে তিরস্কার। নিশীথ-সংগীত
নাহি দিবা নাহি নিশু যায়। মধ্যাহ্ন-সংগীত। ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৯২, পৃ ১০৪
নিতান্ত তরল ছোট। প্রভাত-সংগীত
নিয়তি। ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫, পৃ ৭৪
নিশীথ ঘুমায় যবে। নিশীথ-সংগীত। ভারতী ও বালক, আষাঢ় ১২৯৪, পৃ ১৫৭
নিস্তব্ধ নিঝুম দিক।[২২] মধ্যাহ্ন-সংগীত
নীরব নিশীথ স্থির। নিশীথ-সংগীত
নীরব বীণা। মধ্যাহ্ন-সংগীত। ভারতী ও বালক, ১২৯৮, পৃ ৩২২
পথে যেতে দেখাশোনা। প্রেম-পারিজাত
পবিত্র মাঘের মেলা। সন্ধ্যা-সংগীত
পরিপূর্ণ জোছনায় মগ্ন দশ দিশি। নিশীথ-সংগীত। ভারতী, ১২৯২, পৃ ৩২৯
পিতৃস্নেহ। বাল্যবিনোদ
প্রজাপতির মৃত্যুগান। সন্ধ্যা-সংগীত
প্রতিদান প্রতিদান কি দিব গো। নব কবিতাবলী
প্রতিদিন ঊষাকালে। প্রভাত-সংগীত
প্রতিদিন দূর হতে। সন্ধ্যা-সংগীত। ভারতী ও বালক, অগ্রহায়ণ ১২৯৪, পৃ ৪৩৫

২২ গল্পস্বল্পের অন্তর্গত (পৃ ২৬-২৭) এই কবিতাটির প্রথম ছত্র : নিস্তব্ধ নিঝুম দিক। কবিতাটি মধ্যাহ্ন-সংগীত (গ্রন্থাবলী, ৪র্থ, পৃ ১৫৭) কাব্যের প্রথম কবিতা, সেখানে শিরোনাম 'মধ্যাহ্ন'।

২৩ পত্রিকায় এই শিরোনামে যে কবিতাচতুষ্টয় মুদ্রিত হয় তাদের প্রথম চরণ যথাক্রমে—যাহা সারাদিন কেন এ সংশয়, যাহা শুধু এই হাসিখুশী, যাহা যতনে সোহাগে ফুটিয়াছে ; যাহা ও ঠোঁটের পূণ্য হাসি। ৮ ও ১৪ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

প্রতিদিন শত আঁখি পরে।[২৪] বিদ্রোহ

প্রভাত পরশে হাসিছে হরষে। গাথা। ভারতী, বৈশাখ ১২৮৭, পৃ ৮

প্রভাত।[৫] প্রভাত-সংগীত

প্রেম যদি জীবনের হোত শুধু খেলা। ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫, পৃ ৭৪

ফুরায় ফাগুন মাস। বাল্যবিনোদ

বঙ্গের বিধবা।[১৩] মধ্যাহ্ন-সংগীত

বজ্র হতে রুদ্রস্বরে। ঐ

বন্দনা। ভারতী, বৈশাখ ১৩১৯, পৃ ১

বরষার দিন নব। বাল্যবিনোদ

বর্ষবরণ। ভারতী, বৈশাখ ১৩১৭, পৃ ১

বর্ষা। বাল্যবিনোদ

বর্ষায়।[২৫] নিশীথ-সংগীত

বল বারবার। ঐ

বলি শোন খুলে। মধ্যাহ্ন-সংগীত

বসন্ত। বাল্যবিনোদ

বসন্ত-জ্যোৎস্নায়।[২৬] নিশীথ-সংগীত

বসন্ত-নিশীথে।[২৬] ভারতী ও বালক, মাঘ ১২৯৫, পৃ ৫৪৭

বহু কামনার ফলে। প্রভাত-সংগীত

বাউলের গান। নব কবিতাবলী

বাগানেতে খেলা। বাল্যবিনোদ

বাগানে ফুটেছে ফুল কত বরণের। ঐ

বাছা ও ঠোঁটের পুণ্য হাসি।[২৭] প্রভাত-সংগীত। ভারতী ও বালক, বৈশাখ ১২৯৫

২৪ বিদ্রোহ উপন্যাসের ২২শ পরিচ্ছেদে ব্যবহৃত। উপন্যাস পাঠকালে কবিতাটির রচয়িতা সম্বন্ধে সংশয় জাগে।—দ্র গ্রন্থাবলী, ৪র্থ, পৃ ১০০-০১।

২৫ পত্রিকায় শিরোনাম 'একাকিনী'।—দ্র ভারতী ও বালক, শ্রাবণ ১২৯৭, পৃ ২০৪। বর্তমান তালিকার ১০ এবং ৩৯ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

২৬ এর প্রথম ছত্র: জোছনা-হসিত নিশা। নিশীথ-সংগীতে শিরোনাম 'বসন্ত-জ্যোৎস্নায়', পত্রিকায় শিরোনাম 'বসন্ত-নিশীথে'।

২৭ প্রভাত-সংগীত কাব্যে এ দুটি রচনা একটি কবিতারই অন্তর্গত এবং তার শিরোনাম 'আশীর্বাদ'। পত্রিকায় 'নববর্ষের আশীর্বাদ' পর্যায়ের কবিতাচতুষ্টয়ের মধ্যে এ দুটি শেষের কবিতা। ৮, ১৪ ও ২৩ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য। 'বাছা ও ঠোঁটের পুণ্য হাসি' কবিতাটি বাল্যবিনোদ (পৃ ৩১) এবং গল্পস্বল্প (পৃ ৪) গ্রন্থেও বর্তমান, দুটি গ্রন্থেই কবিতার শিরোনাম 'মাতার আশীর্বাদ'।

বাছা যতনে সোহাগে হৃদিমাঝে।[২৭] প্রভাত-সংগীত। ভারতী ও বালক, বৈশাখ ১২৯৫
বাছা শুধু এই হাসিখুশী।[২৮] ভারতী ও বালক, বৈশাখ ১২৯৫
বাছা সারাদিন কেন এ সংশয়।[২৯] ঐ
বাল্যসখী।[৩০] সন্ধ্যা-সংগীত। ভারতী, ফাল্গুন ১২৮৪, পৃ ৩৮৩
বিভুগুণ-গান।[৩১] বাল্যবিনোদ
বিরহ কারে কয়।[৩২] প্রভাত-সংগীত। ভারতী ও বালক, বৈশাখ ১২৯৯, পৃ ৪৩
বিরহ। সন্ধ্যা-সংগীত। ভারতী ও বালক, পৌষ ১২৯৪, পৃ ৫৪১
বিলাপ-কাকলীহীন অশ্রুহীন হোক। কবিতা পারিজাতহার
বেদনা-আকুল প্রাণ। নিশীথ-সংগীত
বোনের ভালবাসা। গল্পস্বল্প[১]
ভাইবোন। ঐ। ভারতী, ১২৯২, পৃ ৩২৯
ভালবাস কত মোরে। বাল্যবিনোদ
ভুলে যেতে গিয়াছি ভুলিয়া। ঐ। ভারতী ও বালক, ১২৯৮, পৃ ৩২৩
মধুর আকাশে মধুর রবি।[৩১] বাল্যবিনোদ
মধ্যাহ্ন।[২২] মধ্যাহ্ন-সংগীত
মনে যেন পড়িছে এখন। নিশীথ-সংগীত। ভারতী ও বালক, ১২৯৮, পৃ ৩২৩
মনের সাধে।[৩৩] প্রেম-পারিজাত। ভারতী, আষাঢ় ১৩০২, পৃ ১২৭
মরণ-সোহাগ। সন্ধ্যা-সংগীত
মরি আজ দখিনা হাওয়ায়। গল্পপ্রবন্ধমঞ্জুষা
মহাযাদু। প্রেম-পারিজাত

২৮ এই তালিকায় ২৩ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

২৯ পত্রিকায় 'নববর্ষের আশীর্বাদ' পর্যায়ের প্রথম কবিতা। নিশীথ-সংগীত কাব্যে অনুরূপ যে কবিতাটি রয়েছে তার শিরোনাম 'কেন এ সংশয়' এবং আরম্ভে 'বাছা' শব্দটি নেই। ৮, ১৪, ২৩ ও ২১ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

৩০ ভারতীতে প্রকাশিত স্বর্ণকুমারীর প্রথম কবিতা।—দ্র বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য়, পৃ ৪১৬। এর প্রথম ছত্র : এই ত সুরম্য নন্দন কাননে।

৩১, প্রথম ছত্র : মধুর আকাশে মধুর রবি। সাধারণত গান হিসাবে পরিগণিত হলেও বাল্যবিনোদে (পৃ ৪১) কবিতারূপে পরিবেশিত। বর্তমান গ্রন্থের 'স্বর্ণকুমারীর গানের তালিকা' শীর্ষক পরিশিষ্টের প্রাসঙ্গিক অংশ দ্রষ্টব্য।

৩২ কাব্যে শিরোনাম ও প্রথম ছত্র একই; পত্রিকায় শিরোনাম 'আপনা হতে তুমি আপনা'

৩৩ পত্রিকায় শিরোনাম 'হেসে নে'।

মাঘমেলা। সন্ধ্যা-সংগীত
মাতার আশীর্বাদ।[৩৪] বাল্যবিনোদ, গল্পস্বল্প
মায়াবিনী। প্রভাত-সংগীত
মেঘে মেঘে মেঘে ছেয়েছে আকাশ।[২০] নিশীথ-সংগীত
যাও তবে প্রিয়তম।[৩৫] সন্ধ্যা-সংগীত
যাত্রা অবসান। ভারতী, মাঘ ১২৮৯, পৃ ৪৮২
যা বলিছ আজ সখা। নিশীথ-সংগীত
যেন আমার দুখে। সন্ধ্যা-সংগীত
রূপের মদিরা পিয়ে। নিশীথ-সংগীত। ভারতী ও বালক, ফাল্গুন ১২৯৭, পৃ ৬১৬
লজ্জাবতী। ঐ। ভারতী ও বালক, আষাঢ় ১২৯৪, পৃ ১৫৭
লতা বলে তুমি তরু।[২১] মধ্যাহ্ন-সংগীত। ভারতী ও বালক, আষাঢ় ১২৯৯, পৃ ১৫৬
লিখিতেছি দিনরাত। প্রেম-পারিজাত
শরতের হিম জোছনায়।[৩৬] নিশীথ-সংগীত। ভারতী ও বালক, ফাল্গুন ১২৯৬, পৃ ৫৯৬
শারদ জ্যোৎস্নায়।[৩৬] ঐ। ঐ
শিশু হরি।[১৩] সন্ধ্যা-সংগীত
শুধু দুদিনের তরে। গাথা
সংসারের অন্ধকার ঝটিকা-পীড়নে। নবকাহিনী
সংসারের সুখদুঃখ সংসারের হাসি। হুগলীর ইমামবাড়ী
সখা গো এ নহে অবিশ্বাস। মধ্যাহ্ন-সংগীত
সখি ওলো চুপি চুপি। প্রভাত-সংগীত
সখি লো জনম ধরে। বসন্ত-উৎসব
সখি সকালে ফুটেছিলে। মধ্যাহ্ন-সংগীত
সত্য কহি সখি। গল্পপ্রবন্ধমঞ্জুষা
সত্যেন্দ্রকবির অমরা-প্রয়াণ। কবিতা পারিজাতহার
সত্যেন্দ্রস্মৃতি। ঐ

৩৪ এই শিরোনামে 'বাছা ও ঠোঁটের পুণ্য হাসি' কবিতাটি বাল্যবিনোদ (পৃ ৫১) এবং গল্পস্বল্প (পৃ ৪) গ্রন্থে বর্তমান। এই তালিকায় ৮, ১৪, ২৩, ২৭ ও ২৯ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৫ কবিতার শিরোনাম 'মরিও আমার', এবং এটি 'মূর হইতে অনুবাদ'।—দ্র গ্রন্থাবলী, ৪র্থ, পৃ ১৬৩।

৩৬ স্নেহলতা প্রথম ভাগের পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে ব্যবহৃত।—দ্র গ্রন্থাবলী, ৩য়, পৃ ৭০।

সন্ধ্যা। সন্ধ্যা-সংগীত[৩৭]

সন্ধ্যার স্মৃতি। ঐ। ভারতী ও বালক, অগ্রহায়ণ ১২৯৪, পৃ ৪৩৫

সাধের ভাসান। গাথা। ভারতী, পৌষ ১২৮৬, পৃ ৪১১

সারাদিন কেন এ সংশয়।[৩৮] নিশীথ-সংগীত। ভারতী ও বালক, বৈশাখ ১২৯৫

সারাদিন পথ চেয়ে থাকি। মধ্যাহ্ন-সংগীত। ভারতী, বৈশাখ ১২৯২, পৃ ৫১

সাশ্রু সম্প্রদান। গাথা। ভারতী, বৈশাখ ১২৮৭, পৃ ৮

সিদ্ধি নহে মানুষের আজ্ঞার অধীন। বিবিধ কথা

সিন্ধুর বিলাপ। মধ্যাহ্ন-সংগীত। ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৯২, পৃ ১০৪

সুকোমল চরণ-কমল দুটি। কৌতুকনাট্য

সুখের অবসাদ। নিশীথ-সংগীত। ভারতী ও বালক, ফাল্গুন ১২৯৪, পৃ ৬১৬

সুখেরে লভিবারে দুখের হা-হুতাশ। স্নেহলতা ১ম

সুনিবিড় ঘন গরজে সঘন।[৩৯] নিশীথ-সংগীত। ভারতী ও বালক, শ্রাবণ ১২৯৭, পৃ ২০৪

সুনীরব সন্ধ্যাকালে। সন্ধ্যা-সংগীত[৩৭]

সুন্দরী। মধ্যাহ্ন-সংগীত

সেই তিরস্কার। সন্ধ্যা-সংগীত। ভারতী ও বালক, বৈশাখ ১২৯৮, পৃ ৫৪

সে ভুলেছে আমি কেমনে ভুলি। মধ্যাহ্ন-সংগীত

স্বপন-রতনে গাঁথা অপূর্ব যৌতুক। দেবকৌতুক

স্মরিও আমায়।[৩৫] সন্ধ্যা-সংগীত

স্রোত হেসে খেলে। মধ্যাহ্ন-সংগীত। ভারতী ও বালক, কার্তিক ১২৯৪, পৃ ৪২০

হা ধিক মানব। নিশীথ-সংগীত

হাসি-অশ্রু দিয়ে গাঁথা। নিবেদিতা

হাসিতে রচি দিলাম গছি। পাকচক্র

হায় রে অভিমানী। কবিতা পারিজাতহার

হৃদয়-উচ্ছ্বাস ভরে। ছিন্নমুকুল

হে গুরু হে স্বামি। নব কবিতাবলী

৩৭ কবিতাটি বাল্যবিনোদ (পৃ ৫৭) এবং গল্পস্বল্প (পৃ ৭২) গ্রন্থেও বর্তমান।

৩৮ পত্রিকার শিরোনাম 'নববর্ষের আশীর্বাদ', কাব্যে 'কেন এ সংশয়'। এই তালিকার ৮, ১৪, ২৩, ২৭ ও ২৯ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৯ পত্রিকায় বর্তমান কবিতার শিরোনাম 'একাকিনী', কাব্যে 'বর্ষায়'। বর্তমান তালিকায় ১০ এবং ২৫ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

হেদে বিন্দে বলি শোন। মধ্যাহ্ন-সংগীত
হে নবীন প্রিয় বৎসগণ। সাহিত্য-স্রোত
হে ভারতি হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী। কবিতা পারিজাতহার
হে মনোমোহিনি দেবি। ভারতী, বৈশাখ ১৩১৫, পৃ ১
হেসে নে।** ভারতী, আষাঢ় ১৩০২, পৃ ১২৭
হোক কালের মরণ। প্রভাত-সংগীত

স্বর্ণকুমারীর গানের তালিকা[১]

অকূল ভব-সাগরে তার হে। স্নেহলতা ১মণ ভারতী ও বালক, আষাঢ় ১২৯৬, পৃ ১৭২

অনাথ-নাথ হে ভয়দুঃখহারি। ধর্ম-সংগীত। কানাড়ি-খাম্বাজ, একতালা

অশুভ এ কথা আজি কেন। বসন্ত-উৎসব। পিলু, যৎ

আকাশের ঐ মেঘ। সংগীতশতক।[২] দেশ-মল্লার, আড়া

আকাশের পটে মধুর মূরতি। ঐ। গৌড়-সারং, যৎ

আয় ওরে বজ্র তোরে। ঐ।[২] কেদারা, আড়া

আজি আমার প্রাণের গানের। গীতিগুচ্ছ ১ম। মিশ্র ভীমপলশ্রী, আদ্ধা

আজি মঙ্গল পঞ্চমী। ঐ। কর্ণাটী-খাম্বাজ, কাওয়ালি

আজি মঙ্গল শঙ্খ। ঐ। মিশ্র আসোয়ারি, ঢিমে তেতালা

আজু কোয়েলে কুহু বলে। সংগীতশতক। মিশ্র মল্লার,[৩] কাওয়ালি

আঁধার নিশীথে একা আমি। ছিন্নমুকুল[৪]

আমরা আয় বরণ করি। নিবেদিতা

আমরা মোদের বাজারেই জানি। বিচিত্রা

আমরা সাজি বসন্ত। নিবেদিতা

আ মরি লাবণ্যময়ী। সংগীতশতক। সিন্ধু-ভৈরবী, আড়া

আমার কেন গো আজি হেন। পাকচক্র। মল্লার, রূপক

আমার গীতি-কুসুম। গীতিগুচ্ছ ১ম। মিশ্র বাহার, কাশ্মীরী খেমটা

আমার ডাক পড়েছে। ঐ। মিশ্র ভীমপলশ্রী, দাদরা

১ তালিকাটির বিন্যাসক্রম : গানের প্রথম ছত্র বা শিরোনাম, গ্রন্থনাম, রাগ-তাল, প্রাপ্ত প্রকাশকাল। বিশ্বভারতী পত্রিকার ১৩৭৫ সালের বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যায় মুদ্রিত বর্তমান গ্রন্থকারের 'স্বর্ণকুমারী দেবীর গান' শীর্ষক প্রবন্ধটি (পৃ ৩১২-২৫) প্রসঙ্গক্রমে দ্রষ্টব্য। বর্তমান তালিকায় তারকা-চিহ্নিত (*) গানগুলি সম্ভবত স্বর্ণকুমারীর, এ সম্বন্ধে সংশয়মুক্ত হওয়া গেল না।

২ ছিন্নমুকুলের ৩৭শ পরিচ্ছেদে সামান্য পাঠান্তর লক্ষণীয়।—দ্র ভারতী, কার্তিক ১২৮৬, পৃ ৩১৬ ; গ্রন্থাবলী, ১ম, পৃ ১৬৯।

৩ বসন্ত-উৎসবে শুধু মিশ্র'। ঐ গীতিনাট্যে গানের পাঠান্তরও লক্ষণীয়।—দ্র গ্রন্থাবলী, ২য়, পৃ ১৩৮।

৪ ছিন্নমুকুলের ৩৮শ পরিচ্ছেদে ব্যবহৃত।—দ্র গ্রন্থাবলী, ১ম, পৃ ১৭০ ; ভারতী, অগ্রহায়ণ ১২৮৬, পৃ ৩৩৮। উভয় ক্ষেত্রে কেবলমাত্র গানের প্রথমাংশটুকুই আছে, সম্পূর্ণাংশ পাওয়া যায় না।

আমার বীণা তোমার হাতে। স্বপ্নবাণী

আমার মনের সাথে। গীতিগুচ্ছ ১ম। বাউলের সুর, খেমটা

আমার সাধের পূর্ণিমার চাঁদ। সংগীতশতক। দেশ, কাওয়ালি

আমারো আঁখি কেন ভাসে গো জলে। 'কনেবদল। ভারতী, চৈত্র ১৩১২, পৃ ১০৯৯

আমারো আঁখি ভাসে নয়নজলে। ভারতী, ভাদ্র ১৩০৫, পৃ ৪৩২

আমি কি করি বল সহচরি। সংগীতশতক।[৫] কীর্তনী সুর

আমি কি চাহি। গীতিগুচ্ছ ১ম।[৬] মিশ্র কুকুভ, দাদরা

আমি কি যেমন তেমন ঘটকী। পাকচক্র

আমি গো জাতবেদিনী কামরূপিণী। নিবেদিতা

আমি বাঁধিলাম গান। গীতিগুচ্ছ ১ম।[৭] মিশ্র ভৈরবী, জলদ একতালা

আমোদে কি আছে সখি। বসন্ত-উৎসব। পিলু, কাওয়ালি

আয় আয় আয় কে আছিস তোরা। প্রেম-পারিজাত।[৮] বাহার, কাওয়ালি

আয় তোরা মনের সাধে। নিবেদিতা

আয় বিজয়-মালা তোমায়। ঐ

আয় রে ভাই। গীতিগুচ্ছ ১ম। মিশ্র শংকরা, একতালা।[৯] ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬, পৃ ১৬৯

আয় লো আয় লো আয় লো আয় লো মিলে। সংগীতশতক। মাঝ, দাদরা

আয় লো আয় সরলে প্রাণের প্রতিমা। প্রেম-পারিজাত।[১০] খাম্বাজ, একতালা

আয় লো বালা গাঁথব মালা। সংগীতশতক। ঝিঁঝিট-খাম্বাজ, যৎ

আয় কুয়েলা না ডাহিও। স্নেহলতা ১ম[১১]

আয় না আয় না সখি। সংগীতশতক। ভূপালি, কাওয়ালি

৫ পাঠান্তর দ্রষ্টব্য : ফুলের মালা, ১ম পরিচ্ছেদ।—দ্র ভারতী ও বালক, ভাদ্র ১২৯৯, পৃ ২৫৯ ; গ্রন্থাবলী, ২য়, পৃ ১১৩-১৪।

৬ ফুলের মালার ১২শ পরিচ্ছেদে অংশত ব্যবহৃত, ৩৪শ পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণত।

৭ মিলনরাত্রির ১৬শ পরিচ্ছেদে ব্যবহৃত।—দ্র গ্রন্থাবলী, ৬ষ্ঠ, পৃ ৩৯।

৮ ছিন্নমুকুলের ৪র্থ পরিচ্ছেদে সামান্য পাঠান্তরসহ ব্যবহৃত।—দ্র গ্রন্থাবলী, ১ম, পৃ ১০৯; ভারতী, মাঘ ১২৮৫, পৃ ৪৪৪।

৯ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বরলিপি গীতিমালা (৩য় সং ১৩৪৮) দ্রষ্টব্য।

১০ ছিন্নমুকুলের ২৩শ পরিচ্ছেদে গানটির বৃহত্তর রূপ প্রাপ্তব্য।—দ্র গ্রন্থাবলী, ১ম, পৃ ১৫১-৫২, ভারতী, শ্রাবণ ১২৮৬, পৃ ১৫৬।

১১ পাঠান্তর দ্রষ্টব্য : ভারতী ও বালক, আষাঢ় ১২৯৬, পৃ ১৭০, গ্রন্থাবলী, ৩য়, পৃ ২৪।

আর না থাম গো বালা। বসন্ত-উৎসব। ভৈরবী, যৎ

আহা কেন ঐ মুখখানি আজি। সংগীতশতক। আসোয়ারি, কাওয়ালি

আহা মরি মরি আজি জোয়ারে। স্বপ্নবাণী

আহা মরি মরি। গীতিগুচ্ছ ১ম। ভাটিয়ালি সুর, কাহারবা

আহা রাধা রাধা রাধা বলে। কৌতুকনাট্য

উথলিত অশ্রুবারি এ পোড়া নয়নে। সংগীতশতক। ভীমপলশ্রী, আড়া

উদয় মধুর মধু। ঐ। মিশ্র মল্লার, আড়া

উদাসিনী রাখ গো এ জনে। বসন্ত-উৎসব। খাম্বাজ, কাওয়ালি

এই নলিনীটি অসময়ে। ঐ। বাহার, একতালা

এই নিবেদন প্রভু। গীতিগুচ্ছ ১ম। মিশ্র হাম্বীর, একতালা

এই পাত্রে রাখি ফুল। বসন্ত-উৎসব। খট, ঝাঁপতাল

এই মল্লিকাটি পরাইব চুলে। ঐ। কাফি, যৎ[১২]

এই যে অরুন শতদল-দলে। ঐ। পরজ, ঝাঁপতাল

এই যে কিরণ কেন একেলা। ঐ। লুম-ঝিঁঝিট, কাওয়ালি

একটি দলিত হৃদয় আজিকে। ঐ। সিন্ধু-ভৈরবী, একতালা

এক সূত্রে গাঁথিলাম সহস্র জীবন। স্নেহলতা ১ম।[১৩] ভারতী ও বালক, কার্তিক ১২৯৬, পৃ ৩৬৫

একি এ সুখে তরঙ্গ বহিছে। সংগীতশতক। বসন্ত-বাহার, কাওয়ালি

একি সখা দেখেও কি। বসন্ত-উৎসব। খাম্বাজ, মধ্যমান

একি হল হল রে। ঐ। বারোয়াঁ, ঠুংরি

১২ হওয়া উচিত 'একতালা'। বসন্ত-উৎসবের মত (গ্রন্থাবলী, ২য়, পৃ ১৬৯) বিবাহ-উৎসব গীতিনাট্যেও 'যৎ'-এর উল্লেখ রয়েছে।—দ্র ভারতী ও বালক, ভাদ্র ১২৯৯, পৃ ২৪৪-৪৬। অপিচ দ্র—বিবাহ-উৎসব, ১ম দৃশ্য, পৃ ৩। এই গানটির এবং 'কেমন সখি আমার সাথে' গানটির স্বরলিপি ভারতী ও বালকের ১২৯৯ সালের ভাদ্র-আশ্বিন (পৃ ২৪৭-৫২) এবং কার্তিক (পৃ ৩২৩-২৭) সংখ্যায় প্রাসঙ্গিক রাগ-তালের নির্দেশসহ মুদ্রিত হয়। কিন্তু ঐ বৎসরের পৌষ সংখ্যায় ৫২৬ পৃষ্ঠায় গান দুটির রাগ-তাল সম্বন্ধে যে টীকা মুদ্রিত হয় তন্মধ্যে উপেন্দ্রনাথ সেনের প্রস্তাব ও নির্দেশ অনুসারে তাল সংশোধন করা হয়েছে, 'অনবধানতাবশতঃ তালের নামান্তর করা হয় নাই। সেজন্ত আমাদের ত্রুটি স্বীকার করিতেছি। / "যৎ"-এর পরিবর্তে "একতালা" হইবে', ইত্যাদি। কিন্তু পরবর্তী কালের গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত বসন্ত-উৎসবে এই সংশোধন করা হয়নি, সেটুকু লক্ষণীয়। বর্তমান গ্রন্থের 'গান' অধ্যায়ের ২৩ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

১৩ গ্রন্থাবলী (৩য়, পৃ ৩৫৩) ও সাময়িক পত্রের পাঠ ভিন্ন। তুলনীয় রবীন্দ্রসংগীত: 'এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন'।—দ্র গীতবিতান, পৃ ৯৮৫। বর্তমান গ্রন্থের 'গান' অধ্যায় (পৃ ৩৮৩-৮৫) দ্রষ্টব্য।

একি হোল জ্বালা। ঐ। মিশ্র বিভাস, একতালা

এখনো এখনো প্রাণ। সংগীতশতক। ভৈরবী, আড়া[১৪]

এ জনম প্রভু। গীতিগুচ্ছ ১ম। মিশ্র ঝিঁঝিট, কাশ্মীরী খেমটা

এ জনমের মত সুখ। প্রেম-পারিজাত।[১৫] ভৈরবী, আড়া

এতদিনে পড়িল কি। গীতিগুচ্ছ ১ম। মিশ্র ভৈরবী, কাশ্মীরী খেমটা

এতদিনে পেলেম দেখা। কনেবদল। ভারতী, ফাল্গুন ১৩১২, পৃ ৯৯৩

এত বুঝাইনু কেন বোঝে না। সংগীতশতক। মল্লার, ঝাঁপতাল

*এত হাসি কেন আজ। বিবাহ-উৎসব। সিন্ধু-ভৈরবী, খেমটা

এনেছি মনোহরা রসকরা সন্দেশ। পাকচক্র

এ মধু প্রভাতে মধুর রবি। গীতিগুচ্ছ ১ম। মিশ্র ললিত। ভারতী, পৌষ ১৩০২, পৃ ৫১৯

*এ মধু যামিনী এ মধু চাঁদিনী। বিবাহ-উৎসব। কীর্তন সুর, আড়াখেমটা

এমন বারি ঝরে। সংগীতশতক। দেশ-মল্লার, একতালা

এমন যামিনী মধুর চাঁদিনী। ঐ।[১৬] মেঘ-মল্লার, একতালা

এমনি করে তারো কি কাঁদে প্রাণ। ঐ। মিশ্র, একতালা।[১৭]

এমনে কেমনে রব। ঐ।[১৮] গৌড়, ঠুংরি

এ শুষ্ক জীবন কে ফুটাবে আর। দেবকৌতুক। জয়জয়ন্তী, ঝাঁপতাল। ভারতী, বৈশাখ ১৩১১, পৃ ৬৬

এস সবে মম সাথে। বসন্ত-উৎসব। খাম্বাজ, আড়া

এস হে এস সুন্দর। গীতিগুচ্ছ ১ম। মিশ্র আড়ানা, একতালা

*এ সুখ বসন্তে সই কেন লো এমন। বিবাহ-উৎসব। বেহাগ, মধ্যমান

এ হৃদয়-ফুল সখি। সংগীতশতক। ললিত, আড়া

১৪ সরলা দেবীর শতগানে (৩য় সং ১৩৩০, পৃ ৯৬) 'ভৈরবী, মধ্যমান'। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অশ্রুমতী নাটকে (৪র্থ অঙ্ক, ১৫শ গর্ভাঙ্ক) ব্যবহৃত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বরলিপি গীতিমালা দ্রষ্টব্য।

১৫ ছিন্নমুকুলের ৩৩শ পরিচ্ছেদে ব্যবহৃত।—দ্র ভারতী, আশ্বিন ১২৮৬, পৃ ২৭২। ঐ উপন্যাসের ৩০শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য : গ্রন্থাবলী, ১ম, পৃ ১৫৩।

১৬ ফুলের মালার ২২শ পরিচ্ছেদে ব্যবহৃত।—দ্র গ্রন্থাবলী, ২য়, পৃ ১৪৬-৪৭।

১৭ শতগানে (পৃ ১৯) 'কীর্তন, কাওয়ালি'। ফুলের মালার ২২শ পরিচ্ছেদে ব্যবহৃত।

১৮ স্নেহলতার ২য় ভাগের ২৯শ পরিচ্ছেদে ব্যবহৃত।—দ্র ভারতী ও বালক, বৈশাখ ১২৯৮, পৃ ৪৬। কনে-বদলের ২য় অঙ্কের ১ম দৃশ্যেও ব্যবহৃত।—দ্র ভারতী, চৈত্র ১৩১২, পৃ ১০৯০। উভয় পাঠের ভিন্নতা লক্ষিতব্য।

এ হৃদয় বুঝিল না কেহ। । সংগীতশতক।[১৯] পিলু-বারোয়াঁ, কাওয়ালি
এ হৃদি নিভাতে চাহে। ঐ। বেহাগড়া, আড়া।[২০] ভারতী, বৈশাখ ১৩০২, পৃ ৪৫
এ হেন পাষাণ যদি। ঐ। তান, আড়া
ঐ আসিয়াছেন হেথা। বসন্ত-উৎসব। ভূপালি, কাওয়ালি
ঐ আহ্বান-গীতি। গীতিগুচ্ছ ১ম। মিশ্র, কাওয়ালি
ঐ বিশ্বলোকে আনন্দ-রাগিণী। ঐ। মিশ্র, তেওরা। ভারতী, বৈশাখ ১৩২৬, পৃ ২৯
ঐ বুঝি দেবী সে আমার। সংগীতশতক। মিশ্র কানাড়া, একতালা
ওগো একবার চেয়ে শুধু। ঐ। সিন্ধু-ভৈরবী, একতালা
ওগো কমল-আসনা। গীতিগুচ্ছ ১ম। ইমন-ভূপালি, একতালা। ভারতী, বৈশাখ ১৩১৭, পৃ ৩
ওগো তারা দয়াময়ি। ধর্ম-সংগীত।[২১] টোড়ি, আড়া
ওগো মনের মত সেই ত হবে। মিলনরাত্রি
ওগো মানসপুর-প্রবাসী। স্বপ্ন না কি
ও প্রাণ মোর গঙ্গাজল। সংগীতশতক।[২২] কীর্তনী সুর
ও মুখে বিষাদ-রেখা। বসন্ত-উৎসব। পরজ-কালাংড়া, কাওয়ালি
ওহে কাল ত্রিলোক। গীতিগুচ্ছ ১ম। ভৈরবী, তেওরা
ওহে জগজনপাতা। ধর্ম-সংগীত। কেদারা, চৌতালা
ওহে পরাণপ্রিয়। সংগীতশতক। মিশ্র কানাড়া, কাওয়ালি[২৩]
ওহে পুণ্য শক্তিমান। গীতিগুচ্ছ ১ম। মধুমৎ-সারং, চৌতাল
ওহে প্রভু নিঠুর রাজন। মিলনরাত্রি
ওহে সুন্দর তব। গীতিগুচ্ছ ১ম। খাম্বাজ, একতালা

১৯ স্নেহলতা, ২য় ভাগ ৮ম পরিচ্ছেদ—ভারতী ও বালক, কার্তিক ১২৯৭, পৃ ৩৭২।

২০ অন্যত্র 'বেহাগড়া, ঝাঁপতাল'।—দ্র শতগান, পৃ ৩৩। ভারতীর ১৩০২ সালের বৈশাখ সংখ্যায় (পৃ ৪৫) এতৎসহ অতিরিক্ত নির্দেশ রয়েছে: 'ধীরি ধীরি প্রাণে আমার এস হে' এই গানের অনুরূপ। এখানে বলা যেতে পারে, 'ধীরি ধীরি প্রাণে আমার' গানটি রবীন্দ্রসংগীত; বিবাহ-উৎসবের ২য় দৃশ্যে (পৃ ৬) ব্যবহৃত। লক্ষণীয় যে বিবাহ-উৎসবে ব্যবহৃত উক্ত রবীন্দ্রসংগীতের রাগ ও তাল যথাক্রমে বেহাগড়া ও কাওয়ালি। অন্যত্র এর পাঠান্তর পাওয়া যাবে।—দ্র গীতবিতান, পৃ ৭৭৬, ২৩ সংখ্যক গান।

২১ দ্র হুগলীর ইমামবাড়ী, ৪০শ পরিচ্ছেদ—গ্রন্থাবলী, ২য়, পৃ ৭৭।

২২ ফুলের মালার ১২শ পরিচ্ছেদের পাঠ ভিন্ন।—দ্র ভারতী ও বালক, ফাল্গুন ১২৯৯, পৃ ৬৩৪।

২৩ অন্যত্র 'মিশ্র কানাড়া, একতালা'।—দ্র শতগান, পৃ ৯৩।

ওহে সুন্দর প্রেমময় প্রিয়তম। ধর্ম-সংগীত। কানাড়ি-ঝিঁঝিট, কাওয়ালি
কত দূরে থেকে অধীর হয়ে। সংগীতশতক।[২৪] ভৈরবী, একতালা
কবির অধরে আসিনু ঘুমায়ে। বসন্ত-উৎসব। ঝিঁঝিট, একতালা
কবে রে কবে রে হইবে সেদিন। গাথা।[২৫] ভারতী, বৈশাখ ১২৮৭, পৃ ১৩
কর নূতন বর্ষে। গীতিগুচ্ছ ১ম। টোড়ি, একতালা
কাঁদিতে পারিনে। ঐ। মিশ্র খাম্বাজ, খেমটা
কাহে লো যমুনা নাচত। প্রেম-পারিজাত। ছায়ানট, কাওয়ালি
কি আলোক-জ্যোতি আঁধার মাঝারে। জাতীয় সংগীত। প্রভাতী, একতালা
কি কথা বলিলে বালা। বসন্ত-উৎসব। ঝিঁঝিট-খাম্বাজ, আড়াঠেকা
কি করিয়ে প্রিয়তমে মার্জনা চাহিব। ঐ। ছায়ানট, আড়া
কি গভীর বেদনায় হৃদয় জ্বলিয়া যায়।[২৬] সংগীতশতক। আলাইয়া, আড়া
কি গভীর যাতনায় হৃদয় জ্বলিয়া যায়।[২৬] বসন্ত-উৎসব। আলাইয়া, আড়া
কি দারুণ বজ্র হানিলে। ঐ। খোরিয়া, আড়া
কি দেখিনু একটি লো সুখের স্বপন। ঐ। ভৈরোঁ, ঝাঁপতাল
কি সুন্দর নিকেতন।[২৭] ধর্ম-সংগীত। খাম্বাজ, ঝাঁপতাল
কুমার সহসা তুমি হলে কি। বসন্ত-উৎসব। সারং, কাওয়ালি
কে আছে রে অভাগিনী। প্রেম-পারিজাত।[২৮] রামকেলি, আড়া
কে আমারে বারে। গীতিগুচ্ছ ১ম। কীর্তনের সুর
কে আমারে বারে বারে করুণ সুরে। স্বপ্নবাণী
কে উহারা নবীন। গীতিগুচ্ছ ১ম। মিশ্র, কাশ্মীরী খেমটা
কে গো রমণী কালবরণী। কনেবদল। ভারতী, ফাল্গুন ১৩১২, পৃ ১০০৫
কে জানে সখি। গীতিগুচ্ছ ১ম। কীর্তনের সুর, একতালা

২৪ হুগলীর ইমামবাড়ী, ৮ম পরিচ্ছেদ—দ্র ভারতী, আষাঢ় ১২৯২, পৃ ১৪৩। হুগলীর ইমামবাড়ী, ৯ম পরিচ্ছেদ—গ্রন্থাবলী, ২য়, পৃ ২৩। এতদুভয়ের সঙ্গে সংগীতশতকের পাঠের পার্থক্য লক্ষণীয়।

২৫ পাঠান্তর দ্রষ্টব্য : গ্রন্থাবলী, ৫ম, পৃ ১২৯। গাথা কাব্যের সাজ সজ্জাদান কবিতাটি যখন ১২৮৭ সালের বৈশাখের ভারতীতে মুদ্রিত হয় তখন এই গানটি ছিল। গ্রন্থপ্রকাশকালে এই গানটি ঈষৎ পরিমার্জিত হয়, এবং গৃহীত পাঠের প্রথম ছত্র 'চেয়ে আছি কবে হইবে সেদিন'। বর্তমান রচনার ৪২ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

২৬ দুটি গানের রাগ এবং তাল এক হলেও কথা ভিন্ন।

২৭ স্বর্ণকুমারীর গল্পস্বল্পে (পৃ ১৭-১৮) এটি 'সংগীত' রূপে উল্লিখিত; সেখানে 'শান্তিনিকেতন' শিরোনামও আছে। বর্তমান তালিকার ৭৮ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

২৮ দ্র ছিন্নমুকুল, ২২শ পরিচ্ছেদ—ভারতী, শ্রাবণ ১২৮৬, পৃ ১৫৪।

কে তুমি ওগো ।[২৯] মিশ্র আসোয়ারি, একতালা। ভারতবর্ষ, আশ্বিন ১৩৩৯, পৃ ৫৯৩

কে তুমি ধরায় সতি। নিবেদিতা[৩০]

কে তুমি প্রেমিক বাদক। গীতিগুচ্ছ ১ম। বাউলের সুর, খেমটা

কে তুমি স্বপনময়ী কল্পনা-কুমারী। সংগীতশতক।[৩১] ছায়ানট, আড়া

কে তোরা জামাই নিবি। পাকচক্র[৩২]

কেন গো ফেলিছ সখি। সংগীতশতক।[৩৩] দেশ-মল্লার, আড়া

কেন মোরে এত লাজ। বসন্ত-উৎসব। বেহাগ, আড়া

কেন সখি আসিতে না চায়। সংগীতশতক।[৩৪] সিন্ধু-খাম্বাজ, একতালা

*কেমন করে বলব তোরে।[৩৫] মিলনরাত্রি

কেমন কোরে বলব। গীতিগুচ্ছ ১ম। মিশ্র বিভাস, ঝাঁপতাল

কেমন সখি আমার সাথে। বসন্ত-উৎসব। দেশ, খেমটা[৩৬]

কেমনে বিদায় দেব। সংগীতশতক। ভৈরবী, আড়া

কেহ শুনিল না হায়। ঐ। সিন্ধু-কাফি, আড়া

কোথা গো যোগিনী তুমি। বসন্ত-উৎসব। জয়জয়ন্তী, ঝাঁপতাল

কোথা ছিলি স্বজনি লো এ সুখ দিনে।[৩৭] ঐ। কালাংড়া, কাওয়ালি

কোথা তুমি প্রাণেশ্বরি। পাকচক্র।

কোথা মা করুণাময়ী জুড়াও তাপিত প্রাণ। নিবেদিতা

২৯ কথা স্বর্ণকুমারীর, স্বরলিপি অপরের।

৩০ কবিতা রূপেও স্নেহলতা ২য় ভাগের ৩য় পরিচ্ছেদে ব্যবহৃত।—দ্র ভারতী ও বালক, শ্রাবণ ১২৯৭, পৃ ২১০। অপিচ মধ্যাহ্ন-সংগীত কাব্যের অন্তর্গত।—দ্র গ্রন্থাবলী, ৪র্থ, পৃ ১৫৭।

৩১ ফুলের মালায় ব্যবহৃত।—দ্র ভারতী, পৌষ ১২৮৯, পৃ ৪৫৩।

৩২ কনেবদল প্রহসনেও ব্যবহৃত।—দ্র ভারতী, ফাল্গুন ১৩১২, পৃ ১০১০।

৩৩ বসন্ত-উৎসবে এর পাঠান্তর লক্ষণীয়।

৩৪ বিদ্রোহের ২৯শ পরিচ্ছেদে ব্যবহৃত।—দ্র ভারতী ও বালক, শ্রাবণ ১২৯৫, পৃ ১৮৩।

৩৫ গানটি স্বর্ণকুমারীর নাও হতে পারে। মিলনরাত্রি উপন্যাসে বলা হয়েছে, 'এ গানটি জ্যোতির্ময়ীরই রচনা'। এবং নায়িকা জ্যোতির্ময়ী লেখিকার কন্যা সরলার আদর্শে নির্মিত।

৩৬ বিবাহ-উৎসবের প্রথম দৃশ্যে (পৃ ৩) ব্যবহৃত এবং সেখানেও রাগ-তাল একই। ভারতী ও বালকের ১২৯৯ সালের পৌষ সংখ্যায় ৫২৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত টীকা অনুসারে হওয়া উচিত—'দেশ, কাওয়ালি'। বর্তমান তালিকার ১২ সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য। বর্তমান গ্রন্থের 'গান' অধ্যায়ের ২৩ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৭ তুলনীয় রবীন্দ্রসংগীত : 'কোথা ছিলি সজনী লো'।—দ্র গীতবিতান, পৃ ৭৭৯।

কোথায় গেল কালরূপ। সংগীতশতক।[৩৮] ভৈরবী, একতালা

কোথা হে তুমি ধর্মরাজ। গীতিগুচ্ছ ১ম

কোন চুরায়লো তু মুঝ পরাণ বঁধুয়া। প্রেম-পারিজাত। কাফি, যৎ

গাও জয় জয়। গীতিগুচ্ছ ১ম

ঘোষে বজ্র কড়মড়। সংগীতশতক। মেঘ-মল্লার,[৩৯] আড়া

চন্দ্রশূন্য তারাশূন্য মেঘান্ধ নিশীথ। ঐ।[৪০] বাগেশ্রী, আড়াঠেকা

চল রে চল সবে। যুগান্তকাব্যনাট্য

চল লো কাননে যাইব দুজনে। সংগীতশতক।[৪১] কালাংড়া, আড়খেমটা

চলিনু আজ্ঞায় তব। বসন্ত-উৎসব। পিলু, যৎ

চলিনু জন্মের মত। সংগীতশতক। কেদারা, যৎ

চলিলে প্রবাসে তবে। ঐ। বেহাগ, আড়া

চিরদিন তোরি তরে পাতিয়াছি। অতৃপ্তি। ভারতী ও বালক, বৈশাখ ১২৯৫, পৃ ২১০

চেয়ে আছি কবে হইবে সেদিন।[৪২] সংগীতশতক। ভৈরবী, রূপক

চোখের আড়াল হলে।[৪৩] ঐ

ছক্র গাড়ী চক্র নাড়ি বক্র পাড়ি মারিছে। কৌতুকনাট্য

ছি ও কি কথা বল।[৪৪] বসন্ত-উৎসব। কালাংড়া-পরজ, কাওয়ালি

৩৮ বিদ্রোহের ৩য় পরিচ্ছেদে ব্যবহৃত।—দ্র ভারতী ও বালক, ভাদ্র ১২৯৪, পৃ ২৮২।

৩৯ গাথা কাব্যের 'সাধের ভাসানে' ব্যবহৃত।—দ্র ভারতী, পৌষ ১২৮৬, পৃ ৪১৬। ঐ কবিতায় আছে শুধু 'মল্লার'।

৪০ বসন্ত-উৎসবে ব্যবহৃত গানটিতে 'বাগশ্রী—আড়াঠেকা' উল্লিখিত।—দ্র গ্রন্থাবলী, ২য়, পৃ ১৭০। ইন্দিরা দেবী রবীন্দ্র-স্মৃতিচারণাকালে গানটির একটি মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন।—দ্র বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩, পৃ ১৯০। নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলীর দ্বিতীয় ভাগে গানটি আছে।—দ্র ভারতী ও বালক, ফাল্গুন ১২৯৩, পৃ ৬৯০।

৪১ ছিন্নমুকুলের ১৬শ পরিচ্ছেদে ব্যবহৃত।—দ্র ভারতী, চৈত্র ১২৮৫, পৃ ৫৫০।

৪২ বর্তমান তালিকার ২৫ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য। ১২৮৭ সালের বৈশাখ সংখ্যার ভারতীতে মুদ্রিত 'সাশ্রু সম্প্রদান' কবিতায় (গাথা গ্রন্থে সংকলিত) ব্যবহৃত 'কবে রে কবে রে হইবে সেদিন' গানটির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করে গ্রন্থপ্রকাশকালে তৎস্থলে বর্তমান গানটি পরিবেশিত হয়।

৪৩ সংগীতশতক গ্রন্থে এই গানটি দুবার মুদ্রিত হয়েছে। উভয়ের মধ্যে কোনো পাঠান্তর না থাকলেও রাগের পার্থক্য বর্তমান। গ্রন্থের ৫৪ সংখ্যক গানটির রাগিণী 'বেহাগ' এবং ৬৩ সংখ্যক গানের সুর 'ভজন', উভয়েরই তাল 'আড়া'।—দ্র গ্রন্থাবলী, ৪র্থ, পৃ ১৯৩-৯৪।

৪৪ তুলনীয়: 'ছি ছি আ ছি ও কি কথা'। রাগ-তাল: কাফি, যৎ।—দ্র বিবাহ-উৎসব, ৬র্থ দৃশ্য, পৃ ১২।

ছি ছি কেমন জামাই। সংগীতশতক। মিশ্র ঝিঁঝিট, একতালা
ছি ছি সখা অমন কথা। বসন্ত-উৎসব। বেহাগ, কাওয়ালি
জগৎজননী ভবানী। যুগান্তকাব্যনাট্য
জননী আমার। গীতিগুচ্ছ ১ম
জনম আমার শুধু। সংগীতশতক।[৪৫] বেলোয়ার, আড়া
জনমের মত সখা। ঐ। ভৈরবী, আড়া[৪৬]
জয় জয় জয় জয় গাও আমাদের। রাজকন্যা। ভারতী, আষাঢ় ১৩১৮, পৃ ২৯৪
জয় জয় জয় জয় গাও কমলার। দেবকৌতুক। ঝিঁঝিট। ভারতী, কার্তিক ১৩১১, পৃ ৬৪১
জয় জয় বল জয়। যুগান্তকাব্যনাট্য
জয় জয় শম্ভো মহাদেব। ঐ
জয় জয় সত্যের জয়। রাজকন্যা। ভারতী, আশ্বিন ১৩১৮, পৃ ৫৪৮
জয় হর শংকর প্রভু। যুগান্তকাব্যনাট্য
জানি হে বঁধু জানি। গীতিগুচ্ছ ১ম। মিশ্র ভৈরবী, তেওরা
জলিল কেন এ হৃদে। সংগীতশতক। সরফর্দা, আড়া
তবু তারা হাসে। জাতীয় সংগীত
তবে বলব কি লো কি বেদনা। বসন্ত-উৎসব। ভৈরবী, আড়া
ত্বং হি একমেবাদ্বিতীয়ং সত্যসুন্দরশিব। মিলনরাত্রি
তারকা হারাতে পারে। সংগীতশতক। গৌড়-মল্লার, একতালা
তারা চললো ভেসে। গীতিগুচ্ছ ১ম। মিশ্র, দাদরা
তুমি আমার কমলালেবু প্রাণ। কনেবদল। ভারতী, ফাল্গুন ১৩১২, পৃ ৯৯২
*তুমি কি বুঝিবে সখা। বিবাহ-উৎসব। গৌড়-মল্লার, একতালা
তুমি স্বয়ম্ভু সুন্দর। ধর্ম-সংগীত। মিশ্র বিভাস, যৎ
তোম তোম তা না না না আহা মরি। কনেবদল। ভারতী, চৈত্র ১৩১২, পৃ ১১০৭
তোম তোম তা না না না তা ধিন ধিন। স্বপ্ন না কি

৪৫ অংশত ব্যবহৃত : ছিন্নমুকুল ২১শ পরিচ্ছেদ (ভারতী, বৈশাখ ১২৮৬, পৃ ৮); ২৪শ পরিচ্ছেদ (ভারতী, আষাঢ় ১২৮৬, পৃ ৯৭)। কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে গানটি বর্জিত এবং তৎস্থলে প্রযুক্ত 'বুঝি গো সে এল না'। বর্তমান তালিকার ৩৪ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

৪৬ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বরলিপি গীতিমালায় 'ভৈরবী, ঝাঁপতাল'। গানটি ফুলের মালায় ব্যবহৃত।—দ্র ভারতী, ফাল্গুন ১২৮৯, পৃ ৫৪৬

তোমাতেই মজিয়াছি হে মনোহরণ। কনেবদল। ভারতী, ফাল্গুন ১৩১২, পৃ ৯৯৩

তোমার আপনার জনা। গীতিগুচ্ছ ১ম। বাউলের স্থর, কাহারবা

তোমার ছড়িয়ে পড়া। ঐ। মিশ্র খাম্বাজ, দাদরা

তোমার মহিমা অনন্ত অসীমা। মিলনরাত্রি

তোমার সেতারাটি। গীতিগুচ্ছ ১ম। মিশ্র, কাশ্মীরী খেমটা

তোরা কাঁদিস সখি। ঐ।[৪৭] মিশ্র যোগিয়া, ঝাঁপতাল

তোরা কে জামাই নিবি। নিবেদিতা[৪৮]

তোরে হায় কব না ও সজনি। বসন্ত-উৎসব। মিশ্র, ফেরতা

ত্রিদিবের মোরা ললনা।[৪৯] দেবকৌতুক। ললিত। ভারতী, বৈশাখ ১৩০৯, পৃ ১৯

থাম থাম থাম হে। বসন্ত-উৎসব। মল্লার, যৎ

দয়াময়ী নামে তোর। ধর্ম-সংগীত।[৫০] খট, যৎ

দাঁড়াও গো রানি। গীতিগুচ্ছ ১ম। কালাংড়া, কাওয়ালি। ভারতী, আশ্বিন ১৩২৬, পৃ ৪৫৮

দারুণ আঘাত লাগিল মরমে। বসন্ত-উৎসব। জয়জয়ন্তী, একতালা

দিও না দিও না লাজ। ঐ। ছায়ানট, খেমটা

দিনের আলো নিভে এলো।[৫১] সংগীতশতক। ঝিঁঝিট, কাওয়ালি

দিবস-উত্তাপে যেসব কুসুম। বসন্ত-উৎসব। সোহিনী-বাহার, একতালা

দীন দয়াময় দীন জনে। ধর্ম-সংগীত। পরজ, আড়া

৪৭ প্রেম-পারিজাত কাব্যে এটি কবিতা হিসাবে সংগৃহীত, সেখানে কবিতার শিরোনাম 'গিয়াছে তৃষা'। —দ্র গ্রন্থাবলী, ৩য়, পৃ ১০৪। ভারতী পত্রিকায় গান হিসাবে প্রকাশিত।—দ্র ভারতী, কার্তিক ১৩২৬, পৃ ৬৯৮।

৪৮ ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে পাকচক্র, কনেবদল প্রভৃতি প্রহসনেও ব্যবহৃত।—দ্র ভারতী, ফাল্গুন ১৩১২, পৃ ১০১০।

৪৯ রবীন্দ্রনাথের মায়ার খেলার প্রথম দৃশ্যের 'মোরা জলে স্থলে কত ছলে'র সঙ্গে তুলনীয়। ভগ্নহৃদয়ের (১৮৮১) কাহিনী অবলম্বনে রচিত নলিনীর (১৮৮৪) গীতিনাট্যরূপ হল মায়ার খেলা (১৮৮৮)।—দ্র সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য়, পৃ ২৩৩-৩৪। মায়ার খেলার বেশির ভাগ দার্জিলিঙে রচিত হয় ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে এবং প্রথম অভিনয় হয় ১৮৮৯ সালের জানুয়ারিতে। পক্ষান্তরে স্বর্ণকুমারীর গানটি ১৩০৯ সালের ভারতীর বৈশাখে প্রথম মুদ্রিত হয়েছে। এই বিচারে যদি স্বর্ণকুমারীর গানটি পরবর্তী কালে রচিত হয়েছিল ধরা যায় তাহলে অনুমিত হয় যে লেখিকা এক্ষেত্রে অনুজের অনুসরণকারী।

৫০ হুগলীর ইমামবাড়ীর ২৫শ পরিচ্ছেদে ব্যবহৃত।—দ্র ভারতী, মাঘ ১২৯২, পৃ ৪৭৮, গ্রন্থাবলী, ২য় (২৫শ পরিচ্ছেদ) পৃ ৫৬।

৫১ স্নেহলতা ১ম ভাগের ২০শ পরিচ্ছেদে ব্যবহৃত।—দ্র ভারতী ও বালক, অগ্রহায়ণ ১২৯৬, পৃ ৪৪২।

দূর বিজন বনে একাকী। প্রেম-পারিজাত।[৫২] জয়জয়ন্তী, কাওয়ালি

দেখ চেয়ে কে এসেছে। গীতিগুচ্ছ ১ম। কীর্তনের সুর

দেখ লো শোভা কত শত। বসন্ত-উৎসব। খাম্বাজ, দাদরা

দেখ সখি মেলি আঁখি। ঐ। ঝিঁঝিট-খাম্বাজ, কাওয়ালি

দেখিব এখন কেন এমন। ঐ। ললিত, ঠুংরি

দেবতা গো এ দেখি স্বপন। অতৃপ্তি। ভারতী ও বালক, বৈশাখ ১২৯৫, পৃ ৯

দেবি এসেছি যোগিনী হব। বসন্ত-উৎসব। কাফি, আড়া

দেবি নমি চরণে। ঐ। খাম্বাজ, দাদরা

দোষ করেছিনু সখা। ধর্ম-সংগীত। বেহাগড়া, কাওয়ালি

দোঁহার পানে চাও গো মোহে। নিবেদিতা

ধন্য তোমার কৃপামাহাত্ম্য। নিবেদিতা। ভৈরবী

ধন্য ধন্য মকরকেতন। দেবকৌতুক। শংকরা। ভারতী, কার্তিক ১৩১১, পৃ ৬৫৭

ধর গো কুসুম এই। বসন্ত-উৎসব। বসন্ত-ললিত, কাওয়ালি

ধরণি গো মানবজনম। জাতীয় সংগীত। দেশ-সিন্ধু, আড়া

ধর লো ধর লো ডালা। বসন্ত-উৎসব।[৫৩] বেহাগ, কাওয়ালি

ধরি সুর-তানে মরমের গানে। ছিন্নমুকুল[৫৪]

নন্দন-আনন্দ আভা। গীতিগুচ্ছ ১ম। মিশ্র, একতালা

নমস্তে সতে তে। ঐ। ভৈরোঁ, সুরফাঁকতাল

নমামি ত্বাং ভারতি। ঐ। মিশ্র বেহাগ, খেমটা[৫৫]

নাগর মনের মত। স্নেহলতা ১ম। ভারতী ও বালক, শ্রাবণ ১২৯৬, পৃ ২১৬

নাচে আমার গোপালমণি। বিচিত্রা

৫২ মালতীর ৪র্থ পরিচ্ছেদে ব্যবহৃত।—দ্র গ্রন্থাবলী, ৫ম, পৃ ৫৪।

৫৩ বিবাহ-উৎসবেও ব্যবহৃত; সেখানেও রাগ-তাল একই।—দ্র বিবাহ-উৎসব, ১ম দৃশ্য, পৃ ১।

৫৪ ছিন্নমুকুলের ৩৮শ পরিচ্ছেদে অংশত ব্যবহৃত।—দ্র ভারতী, অগ্রহায়ণ ১২৮৬, পৃ ৩৩৮।

৫৫ অন্যত্র 'কাওয়ালী খেমটা'।—দ্র কবিতা পারিজাতহার, গ্রন্থাবলী, ৬ষ্ঠ, পৃ ২৫৩। জানা যায় যে, ভবানীপুরের গোখলে মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত উনবিংশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম দিবসে (১৯ মাঘ ১৩৩৬ বা ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০, রবিবার) অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি বিপিনচন্দ্র পালের অনুরোধক্রমে স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পুরাতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় একটি প্রদর্শনীর দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন এবং 'প্রদর্শনীর দ্বার উন্মুক্ত হইলে পর শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবীর রচিত "নমামি ত্বাং ভারতি" শীর্ষক গানটি শ্রীযুক্ত হরিপদ চক্রবর্তী ও শ্রীযুক্ত হিমাংশু দত্ত প্রভৃতির দ্বারা গীত হয়।'—দ্র উনবিংশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, ১ম খণ্ড, পৃ ৭।

না না লুকাব না আর। গীতিগুচ্ছ ১ম। ভৈরবী, আড়া
নিঃঝুম নিঃঝুম গম্ভীর রাতে। প্রেম-পারিজাত।[৫৬] মল্লার, কাওয়ালি
নিঠুর নয়নে কেন। সংগীতশতক। জয়জয়ন্তী, কাওয়ালি
নিভে গগন-সীমান্ত হায় রে। ঐ। মিশ্র ভৈরোঁ, কাওয়ালি
নির্ভয় হও গো বালা। বসন্ত-উৎসব। জয়জয়ন্তী, ঝাঁপতাল
পোহাইল বিভাবরী। সংগীতশতক।[৫৭] বিভাস, যৎ
পোহায় যামিনী মলিন চন্দ্রমা। বসন্ত-উৎসব। ভৈরোঁ, একতালা
প্রণাম করি তোমায়। বিচিত্রা
প্রমোদ উৎসব রে। দেবকৌতুক। সিন্ধু-খাম্বাজ, খেমটা। ভারতী, কার্তিক ১৩১১, পৃ ৬৩৪
প্রাণ-প্রতিমা দেবীপ্রতিমা। ঐ। মুলতান। ভারতী, কার্তিক ১৩১১, পৃ ৬৩৬
প্রাণ সই লো সই। ফুলের মালা। ভারতী ও বালক, ফাল্গুন ১২৯১, পৃ ৬৩৬
প্রাণ সঁপিলাম তোমায়। সংগীতশতক। সাহানা, যৎ
প্রাণের উচ্ছ্বাস বাঁধতে নারি। পাকচক্র
প্রিয়ে আজি এ কেমন। প্রেম-পারিজাত। মিশ্র ভূপালি, একতালা
প্রিয়ে হৃদয়ের ধন। বসন্ত-উৎসব। ইমন-কল্যাণ, আড়া
প্রেমের অমৃত বিষে। সংগীতশতক।[৫৮] মারু, আড়া
ফুটলো ফুল এতদিনে। দেবকৌতুক। সোহিনী, খেমটা। ভারতী, বৈশাখ ১৩১১, পৃ ৭৩
ফুরায় ফুরায় রাতি। বসন্ত-উৎসব। রামকেলি, আড়া
ফুরায়েছে হাসি সব। জাতীয় সংগীত। টোড়ি, একতালা
ফোটা ফুলগুলি আনিয়াছি। সংগীতশতক। পিলু, যৎ
বড় একেলা গো বড় একেলা। স্বপ্নবাণী
বড় সাধ বড় আশা বড় আকিঞ্চন। জাতীয় সংগীত।[৫৯] জয়জয়ন্তী, যৎ
বন্দেমাতরম্ বলে। গীতিগুচ্ছ, ১ম [৬০]
বম্ বম্ ববম্ ববম্। বিজয়ার আশীর্বাদ

৫৬ ছিন্নমুকুলের ৪র্থ পরিচ্ছেদে ব্যবহৃত। পাঠান্তর দ্রষ্টব্য—ভারতী, মাঘ ১২৮৫, পৃ ৪৪৩।
৫৭ বসন্ত-উৎসবের ১ম অঙ্কের ৩য় গর্ভাঙ্কে ব্যবহৃত।
৫৮ ফুলের মালায় ব্যবহৃত।—দ্র ভারতী, মাঘ ১২৮৯, পৃ ৪৯১।
৫৯ দ্র স্বপ্নবাণী, ১৭শ পরিচ্ছেদ—গ্রন্থাবলী, ৬ষ্ঠ, পৃ ২০৬।
৬০ দ্র মিলনরাত্রি, ২য় পরিচ্ছেদ—ঐ ৬ষ্ঠ, পৃ ৫।

বল বল বল সখি একি মনোভাব। বসন্ত-উৎসব। ঝিঁঝিট-খাম্বাজ, খেমটা
বল ভাই বল কেন। জাতীয় সংগীত।[৬১] বাউলের সুর
বসন্ত জেগেছে। গীতিগুচ্ছ ১ম। বেহাগ, ঢিমে তেতালা
বসন্ত সমীরে খুলিয়ে পরাণ। বসন্ত-উৎসব। পঞ্চম-বাহার, খং
বহক ঝটিকা ঝড়। ধর্ম-সংগীত।[৬২] ইমন-কল্যাণ, আড়া
বাজা রে বাঁশরী বাজা। কনেবদল। মিশ্র সাহানা। ভারতী, চৈত্র ১৩১২, পৃ ১১০৮
বাণীর বীণাটি লইয়ে। বসন্ত-উৎসব। ভৈরবী, দাদরা
বিদায় দেব কেমনে। গীতিগুচ্ছ ১ম। মিশ্র সাহানা, ঝাঁপতাল
বিদায় প্রাণেশ। সংগীতশতক। ভৈরবী, ঝাঁপতাল
বিভুগুণ-গান। বাল্যবিনোদ[৬৩]
বিভু হে তোমারি আদেশে। ধর্ম-সংগীত। বাহার, কাওয়ালি
বিরাগ ভরে অমন করে। সংগীতশতক। আলাইয়া, আড়া
বুঝি গো সে এল না।[৬৪] প্রেম-পারিজাত। হাম্বীর, আড়া
বেশ বেশ ভাই যাই চল। বসন্ত-উৎসব। পরজ-কালাংড়া, কাওয়ালি
ব্রাদার হে তোমার। কনেবদল। ভারতী, চৈত্র ১৩১২, পৃ ১১০৫
ভাই রে চিরদিন কি। গীতিগুচ্ছ ১ম।[৬৫] মিশ্র, দাদরা
ভিক্ষাং দেহি। ঐ।[৬৬] ভূপালি, ঝাঁপতাল
ভুলে যাও দুখিনীরে। সংগীতশতক।[৬৭] সিন্ধু-ভৈরবী, আড়া
ভেসেছি স্রোতের টানে। মিলনরাত্রি

৬১ দ্র বিচিত্রা, ৯ম পরিচ্ছেদ—ঐ, পৃ ১২৯।

৬২ দ্র মিলনরাত্রি, ৩১শ পরিচ্ছেদ—ঐ, পৃ ৮১।

৬৩ স্বর্ণকুমারীর বাল্যবিনোদ (পৃ ৪১) গ্রন্থে এই শিরোনামে যে গানটি রয়েছে তার প্রথম ছত্র: 'মধুর আকাশে মধুর রবি'। বর্তমান তালিকার ৭০ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

৬৪ গানটির অংশবিশেষ ছিন্নমুকুলের ২১শ পরিচ্ছেদে এবং সামান্য পাঠভেদসহ ২৪শ পরিচ্ছেদে ব্যবহৃত। —দ্র গ্রন্থাবলী, ১ম, পৃ ১৩৯ এবং ১৪২। ভারতীর ১২৮৬ সালের বৈশাখ ও আষাঢ় সংখ্যায় মুদ্রিত ঐ পরিচ্ছেদদ্বয়ে এ গানের পরিবর্তে 'জনম আমার শুধু' গানটি ব্যবহৃত হয়; অর্থাৎ গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে 'জনম আমার শুধু' বর্জিত এবং তৎস্থলে 'বুঝি গো সে এল না' প্রযুক্ত। বর্তমান তালিকার ৪৫ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

৬৫ দ্র মিলনরাত্রি, ৩য় পরিচ্ছেদ—গ্রন্থাবলী, ৬ষ্ঠ, পৃ ৯।

৬৬ দ্র বিচিত্রা, ১৩শ পরিচ্ছেদ—ঐ, পৃ ১৪০।

৬৭ পাঠান্তর দ্রষ্টব্য: সাধের ভাসান—ভারতী, পৌষ ১২৮৬, পৃ ৪১১। গাথা কাব্যে শুধু 'ভৈরবী'। —দ্র গ্রন্থাবলী, ৫ম, পৃ ১৩১।

মঙ্গল পঞ্চমী আজি। ভারতী, মাঘ ১৩১৭, পৃ ৮২৮।[৬৮] খাম্বাজ, কাওয়ালি

মঙ্গল শঙ্খ বাজে। স্বপ্নবাণী

মধু বসন্ত সখি রে। সংগীতশতক।[৬৯] বারোঁয়া-খাম্বাজ, একতালা

মধুর আকাশে মধুর রবি। গীতিগুচ্ছ ১ম।[৭০] মিশ্র ললিতা, একতালা

মধুর প্রভাতে। ধর্ম-সংগীত। প্রভাতী, একতালা

মনটি ওরে ভাল করে। গীতিগুচ্ছ ১ম।[৭১] মিশ্র ঝিঁঝিট, তেওরা

*মন-মাঝি সামাল সামাল।[৭২] স্নেহলতা ১ম। ভারতী ও বালক, আষাঢ় ১২৯৬, পৃ ১৭০

মনের উচ্ছ্বাসে হরষ উল্লাসে। সংগীতশতক। আশাবরী, আড়া

মম চিত্ত-কুঞ্জকাননে। গীতিগুচ্ছ ১ম। সিন্ধু-খাম্বাজ, ঢিমে তেতালা

মরণের সাধ সখি। সংগীতশতক। সিন্ধু-ভৈরবী, কাওয়ালি

মরি কি বাহাদুরি বলিহারি। পাকচক্র

মরি মরি উহু উহু। স্বপ্ন না কি

মাতঃ প্রণমি তোমায়। বসন্ত-উৎসব। খাম্বাজ, দাদরা

মান যাও ভুলে চাও। রাজকন্যা। ভারতী, শ্রাবণ ১৩১৮, পৃ ৩৩০

মানিনু মানিনু হার। বসন্ত-উৎসব। পিলু, কাওয়ালি[৭৩]

মা বলে আর ডাকব না। ধর্ম-সংগীত।[৭৪] মিশ্র রামপ্রসাদী সুর

মালতী মালা খুলে নে। বসন্ত-উৎসব। জংলা-পিলু, কাওয়ালি

মিনতি, নিদয়া আর ও কথা। ঐ। গৌড়-সারং, আড়া

৬৮ দ্র রাজকন্যা—ভারতী, ভাদ্র ১৩১৮, পৃ ৪৮৪।—অপিচ দ্র গ্রন্থাবলী, ৫ম, পৃ ১৮৪।

৬৯ দ্র বিদ্রোহ, ২০শ পরিচ্ছেদ—ভারতী ও বালক, চৈত্র ১২৯৪, পৃ ৬৬৭; গ্রন্থাবলী, ৪র্থ, পৃ ৯৮-৯৯।

৭০ রাজকন্যা নাটকে ব্যবহৃত। পাঠান্তর দ্রষ্টব্য—ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮, পৃ ১৪৩।—দ্র পাঠান্তর: নীলগিরি, ভারতী, পৌষ ১৩০২, পৃ ৫১৯। পত্রিকায় এই গীত-রচনার একটি ইতিহাস আছে। বর্তমান তালিকায় 'এ মধু প্রভাতে' গানটি দ্রষ্টব্য। বর্তমান 'মধুর আকাশে মধুর রবি' গানটি বাল্যবিনোদ (পৃ ৪১) গ্রন্থেও রয়েছে। এই তালিকায় ৬৩ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

৭১ স্বপ্নবাণী, ১ম পরিচ্ছেদ—গ্রন্থাবলী, ৬ষ্ঠ, পৃ ১৫৮।

৭২ স্বরলিপি দ্রষ্টব্য: শতগান, পৃ ১৪১। শতগানের সূচীপত্রে 'বাউল-সংগীত' পর্যায়ে বিন্যস্ত। ঐ গ্রন্থে কথা-রচয়িতার কোনো নাম নেই, তাই গানটি স্বর্ণকুমারীর কিনা সে সম্পর্কে সংশয় বর্তমান।

৭৩ বিবাহ-উৎসবের প্রথম দৃশ্যে (পৃ ৩) একই রাগ-তালসহ ব্যবহৃত।

৭৪ পাঠান্তর দ্রষ্টব্য: হুগলীর ইমামবাড়ী, ১৩শ পরিচ্ছেদ—ভারতী, কার্তিক ১২৯২, পৃ ৩১৬। হুগলীর ইমামবাড়ী, ১৪শ পরিচ্ছেদ—গ্রন্থাবলী, ২য়, পৃ ৩৭।

মুরলী কি বীণা আহা মরি। মিলনরাত্রি
মূঢ় একি তোর। বসন্ত-উৎসব। সারং
যাই সখি আমি যাই। ঐ। লচ্ছাসার, যৎ
যাও যাও কিছু ভাল নাহি লাগে। ঐ। সোহিনী-বাহার, কাওয়ালি
যাও যাও যাও হে। সংগীতশতক। মিশ্র বিভাস, কাওয়ালি
যাতনার এই দুখময় সুখ। ঐ। বেলোয়ার, আড়া
যাতনা-সমুদ্র মাঝে। ঐ। সিন্ধুড়া, আড়া
যা যা তুলগে লো তোর। বসন্ত-উৎসব। খাম্বাজ, একতালা[৭৫]
যে আগুনে আজ জলিছে পরাণ। ঐ। সিন্ধু-ভৈরবী, মধ্যমান
যে তোমারে চায় ওগো। কনেবদল। ভারতী, চৈত্র ১৩১২, পৃ ১১০৮
রজনী রজত-মধুরা। রাজকন্যা। খাম্বাজ, কাওয়ালি। ভারতী, বৈশাখ ১৩১৮, পৃ ৮৯
রণ-সংগীত। ভারতী, শ্রাবণ ১৩২৬, পৃ ২৮১
রাজা ছিলেন এক শেয়াল। নিবেদিতা। 'কীর্তনীর অনুকরণে গান'
রিম ঝিম ঘন বরিষে।[৭৬] ছিন্নমুকুল
লও এই লও লও প্রতিফল। বসন্ত-উৎসব। অহং, খেমটা
লক্ষ ভায়ের দাঁড়ের টানে। গীতিগুচ্ছ ১ম
ললিত রাগে ঐ বাঁশরী বাজে। বিজয়ার আশীর্বাদ। ললিত
লীলায় রাখিনু মন্দির-মাঝে। বসন্ত-উৎসব। পরজ, কাওয়ালি
লুকাইবি যদি পুনঃ। সংগীতশতক। মিশ্র পিলু, যৎ
শত কণ্ঠে করি গান জননীর। ভারতী, আশ্বিন ১৩১২, পৃ ৫৮০।[৭৭] বড় হংস-সারং,
ঝাঁপতাল
শান্তিনিকেতন।[৭৮] গল্পস্বল্প

৭৫ বিবাহ-উৎসবের প্রথম দৃশ্যে (পৃ ২) একই রাগ-তালসহ ব্যবহৃত।

৭৬ সরলা দেবীর শতগানে এর স্বরলিপি বর্তমান। তুলনীয় রবীন্দ্রসংগীত: 'রিম ঝিম ঘন ঘন রে'।—দ্র গীতবিতান, পৃ ৬৪৪। স্বর্ণকুমারীর গানটি বাল্মীকিপ্রতিভার (ফাল্গুন ১২৮৭) এই গানটির বেশ কিছুকাল পূর্বে ছিন্নমুকুলের ২১শ পরিচ্ছেদে (ভারতী, বৈশাখ ১২৮৬, পৃ ৮) ব্যবহৃত। তাই মনে হয়, রবীন্দ্রসংগীতটির পথপ্রদর্শক হল স্বর্ণকুমারীর এই গান।

৭৭ পাঠান্তর দ্রষ্টব্য: সতীশচন্দ্র সামন্ত কর্তৃক সম্পাদিত মুক্তির গানের (ওরিয়েন্ট বুক কোং) ৪৯ সংখ্যক গান, পৃ ৫৭।

৭৮ গল্পস্বল্প (পৃ ১৭-১৮) গ্রন্থে এই শিরোনামে 'কি সুন্দর নিকেতন' গানটি বর্তমান, এবং এটি 'সংগীত' হিসাবেও উল্লিখিত। বর্তমান তালিকার ২৭ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

শারদ সমীরে। গীতিগুচ্ছ ১ম। মিশ্র আসোয়ারি, কাহারবা

শারদে শুভংকরী। ঐ। ভৈরবী, ঝাঁপতাল

শিখাও হে শিখাও। ঐ। মিশ্র ভৈরবী, একতালা

শীত শান্ত বেলা। ঐ।[৭৯] মিশ্র সারং, দাদরা

শুকাইতে রেখে একা। সংগীতশতক। আলাইয়া, আড়া

শুভ রাতে স্বপন তোমার। বসন্ত-উৎসব। টোড়ি, কাওয়ালি

শ্রাবণ ওহে গায়ন। ভারতী, ১৩২৬, পৃ ৬৭৫। মিশ্র খাম্বাজ, দাদরা

সই লো মোর গঙ্গাজল। সংগীতশতক।[৮০] কীর্তনী সুর

*সখি কাননে কুসুম ফুটিবে। বিবাহ-উৎসব। পিলু-বারোয়াঁ, কাওয়ালি

সখি চল চল যাই। বসন্ত-উৎসব। গারা, খেমটা

সখি তোরা আয় আয়। ঐ। কালাংড়া, কাওয়ালি

সখি তোরা হেসে হেসে। ঐ। বসন্ত-বাহার, খেমটা

সখি নব শ্রাবণ মাস। সংগীতশতক।[৮১] শ্রাবণ-মল্লার, কাওয়ালি

সখি ভুলো না ভুলো না। দেবকৌতুক। বেহাগ,[৮২] কাওয়ালি

সখি মোর বিরহ ভালো। সংগীতশতক। ঝিঁঝিট-খাম্বাজ, কাওয়ালি

সখি রে ক্যায়সে বাজাওয়ে। ঐ।[৮৩] বেহাগ, আড়খেমটা

সখি রে বোলো। পিলু-বারোয়াঁ, ঠুংরি

সখি লো রিম ঝিম ঘন বরিষে।[৮৪] সংগীতশতক। মল্লার, কাওয়ালি

সখি সে কেমনে চলে যায়।[৮৫] ঐ। শ্রাবণ-বেলাওল, আড়া

৭৯ পাঠান্তর দ্রষ্টব্য: যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বঙ্গের মহিলা কবি।

৮০ পাঠান্তর দ্রষ্টব্য: ফুলের মালা, ১২শ পরিচ্ছেদ—ভারতী ও বালক, ফাল্গুন ১২৯৯, পৃ ৬৩৩, গ্রন্থাবলী পৃ ১০১-৩২।

৮১ পাঠান্তর দ্রষ্টব্য: ফুলের মালা, ২১শ পরিচ্ছেদ—গ্রন্থাবলী, ২য়, পৃ ১৪৪। অন্যত্র শ্রাবণ-মল্লারের স্থলে শুধু মল্লার।—দ্র ভারতী, শ্রাবণ ১৩০২, পৃ ২০৬।

৮২ অন্যত্র 'সারং'।—দ্র ভারতী, ভাদ্র ১৩১১, পৃ ৪৯৮।

৮৩ দ্র বিদ্রোহ, ২২শ পরিচ্ছেদ—গ্রন্থাবলী, ৪র্থ, পৃ ১০২।—দ্র বিদ্রোহ, ২০শ পরিচ্ছেদ—ভারতী ও বালক, বৈশাখ ১২৯৫, পৃ ২১৫। পাঠভেদ লক্ষণীয়।

৮৪ তুলনীয়: রিম ঝিম ঘন বরিষে। উভয় গানের পাঠান্তর লক্ষণীয়। বর্তমান তালিকায় ৭৬ সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৮৫ তুলনীয়: বর্তমান তালিকায় 'সে কেমনে চলে যায়'। উভয় গানের রাগ-তালের ঈষৎ তারতম্য লক্ষণীয়। এই তালিকায় ৯১ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

সখি হেরিতেছি আঁধারে। বসন্ত-উৎসব। দেশ-খাম্বাজ, ঝাঁপতাল

সজনি নেহারো বসন্ত। সংগীতশতক। সোহিনী-বাহার, কাওয়ালি

সজনি লো যমুনা-পুলিনে। প্রেম-পারিজাত। যোগিয়া-বিভাস, একতালা

সফল কর জীবন মম। গীতিগুচ্ছ ১ম। মিশ্র খাম্বাজ, একতালা

সব দুঃখ দূর হইল। দেবকৌতুক। সাহানা। ভারতী, কার্তিক ১৩১১, পৃ ৬৫১

সময়ে এসেছ তুমি। বসন্ত-উৎসব। ককুভা, ঠুংরি

সরমে মরে যাই। ঐ। ঝিঁঝিট, একতালা

সহসা একি এ হইল আমার। ঐ। শংকরা, আড়খেমটা

সহসা কুমার কেন হইল এমন। ঐ। দেশ-মল্লার, আড়া

সহসা হাসিল কেন। সংগীতশতক। সাহানা, আড়া

সাগর-ছেঁচা মাণিক আমার। ঐ।[৮৬] বারোয়াঁ-ঝিঁঝিট, ঠুংরি

সাজাব তোমারে আজি।[৮৭] রাজকন্যা

সাবধান এ আস্পর্ধা। বসন্ত-উৎসব। অহং, খেমটা

সারাদিন পড়ে মনে। সংগীতশতক।[৮৮] বেহাগ, যৎ

সুখে তুমি থাক বালা। বসন্ত-উৎসব। সোহিনী-বাহার, আড়খেমটা

সুখে থাক ভাল থাক। ঐ। সাহানা, আড়া

সুখের বসন্তে আজ। সংগীতশতক। বেহাগ, কাওয়ালি

সুখের সেই যে বিয়ে। বসন্ত-উৎসব। সিন্ধু-ভৈরবী, রূপক

সুখের স্বপনে ছিনু। সংগীতশতক।[৮৯] টোড়ি, আড়া

সুগভীর নিশি স্তব্ধ দশ দিশি। বসন্ত-উৎসব। বেহাগ, ঝাঁপতাল

সুচারু চাঁদিমা মাখি। সংগীতশতক। সোহিনী-বাহার, আড়া

৮৬ প্রথম পর্যায়ের ফুলের মালায় ব্যবহৃত।—দ্র ভারতী, পৌষ ১২৮৯, পৃ ৪৫২।

৮৭ তুলনীয় রবীন্দ্রসংগীত: 'এদেশীয়, পূর্বপ্রচলিত, অন্যের কোনো বিশেষ গান অথবা গতের আদর্শে বা প্রভাবে রচিত' 'সাজাব তোমারে হে ফুল দিয়ে দিয়ে'।—দ্র গীতবিতান, পৃ ৪২১। অপিচ তুলনীয় রবীন্দ্রগীতি: 'তোমায় সাজাব যতনে'। এর রচনাকাল ১৯৩৩ সাল।—দ্র গীতিবিতান, পৃ ৯৮২। পক্ষান্তরে স্বর্ণকুমারীর রাজকন্যা অংশত প্রকাশিত—ভারতী, বৈশাখ ১৩১৮, পৃ ৯১; সম্পূর্ণ প্রকাশ—ভারতী, আষাঢ় ১৩১৮, পৃ ২৯২। সম্ভবত লেখিকার গানটি প্রথমে রচিত।

৮৮ কনেবদল, ১ম অঙ্ক ৪র্থ দৃশ্য—ভারতী, ফাল্গুন ১৩১২, পৃ ১০০৯। পত্রিকায় বা গ্রন্থাবলীতে (৫ম, পৃ ৯০) তালের উল্লেখ নেই।

৮৯ প্রথম পর্যায়ের ফুলের মালায় ব্যবহৃত।—দ্র ভারতী, ফাল্গুন ১২৮৯, পৃ ৫৪৩।

সুনিবিড় ঘন। ভারতী, ভাদ্র ১৩২৬, পৃ ৩৭২। মেঘ-মল্লার, একতালা

সুশীতল মহীরুহ। প্রেম-পারিজাত।[৯০] সাহানা, কাওয়ালি

সেই ত কুসুম ফোটে। সংগীতশতক। ঝিঁঝিট-খাম্বাজ, কাওয়ালি

সে কেমনে চলে যায়।[৯১] শতগান। মিশ্র বেলাওল, একতালা

সে প্রেম সে ভালবাসা। সংগীতশতক। দেশ-সিন্ধু, কাওয়ালি

হউক তাহাই মাতঃ। বসন্ত-উৎসব। বিভাস, আড়া

হায় এমনো দিনে কোথায়। কৌতুকনাট্য

হায় দেখিতে দেখিতে। গীতিগুচ্ছ ১ম। মিশ্র ভীমপলশ্রী, একতালা। ভারতী, কার্তিক ১৩২৬, পৃ ৫৩১

হায় মিলন হোলো। কাহাকে

হায় রে হোল না ত মালা গাঁথা। সংগীতশতক।[৯২] মিশ্র মূলতান, আড়া

হাস একবার সখি। ঐ। পরজ, আড়া

হা হা হাঃ হু হু হুঃ হো হোঃ হিঃ দুঃখের কথা। নিবেদিতা

হৃদয়ের অনন্ত পিপাসা। ধর্ম-সংগীত।[৯৩] সিন্ধু, একতালা

হের ঐ নবযুগ উদীয়মান। যুগান্তকাব্যনাট্য

হের গো উদয় ঐ। সংগীতশতক। ভূপালি, কাওয়ালি

হের গো হের। গীতিগুচ্ছ ১ম। মিশ্র, কাশ্মীরী খেমটা

হেরি তব মলিন আননে। ঐ। পঞ্চরাগ, খেমটা

হোথায় একটি গাছের আড়ালে। বসন্ত-উৎসব।[৯৪] ঝিঁঝিট, একতালা

---

৯০ ছিন্নমুকুল, ২য় পরিচ্ছেদ—ভারতী, পৌষ ১২৮৫, পৃ ৪১৯। উভয় পাঠের প্রভেদ লক্ষণীয়। উপন্যাসের পাদটীকায় উল্লেখ করা হয়েছে 'রাগিণী বাহার'।—দ্র গ্রন্থাবলী, ১ম, পৃ ১০৩।

৯১ তুলনীয় . এই তালিকায় 'সখি সে কেমনে চলে যায়'।—দ্র সংগীতশতক, ৩১ সংখ্যক গান: গ্রন্থাবলী, ৪র্থ, পৃ ১৮৮। বর্তমান তালিকার ৮৫ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

৯২ স্নেহলতা, ২য় ভাগ, ২য় পরিচ্ছেদ—দ্র গ্রন্থাবলী, ৪র্থ, পৃ ৮; ভারতী ও বালক, শ্রাবণ ১২৯৭, পৃ ২০৮।

৯৩ ঐ, ২১শ পরিচ্ছেদ—দ্র ভারতী ও বালক, ফাল্গুন ১২৯৭, পৃ ৬০৫; গ্রন্থাবলী, ৪র্থ, পৃ ৩৭।

৯৪ বিবাহ-উৎসবের প্রথম দৃশ্যে (পৃ ২) একই রাগ-তালসহ ব্যবহৃত।

পরিভাষার তালিকা[১]

absolute অনন্ত-সাপেক্ষ

admiration আশ্চর্য

age of fishes মৎস্য যুগ

age of mammals স্তন্যপায়ী যুগ

age of reptiles সরীসৃপ যুগ

alternate deposit of sedimentary rocks বহুদূরব্যাপী স্তর-সংস্থিতি

amber হলদে ধুনা

anomalistic year সৌরব্যবধান বৎসর

arc বৃত্তাংশ

argillaceous schists সমুদ্রকর্দম

articulated স্ফুটাঙ্গ

as a whole সমানভাবে

asteroid গ্রহখণ্ড

aura আভা

azoic জীবশূন্য সময়

block চাপড়া

bosjesmen or bushmen জংলা

brachiopoda ব্র্যাকিওপোডা, বাহুপদী

brain wave মস্তিষ্করেণু-তরঙ্গাঘাত, মস্তিষ্করেণু-তরঙ্গ

cainozoic নব্য জীব

cambrian ক্যাম্ব্রিয়ান

carboniferous কার্বনিফেরাস, অঙ্গারজনক

cell প্রকোষ্ঠ

centrifugal কেন্দ্রাতিগ

১ স্বর্ণকুমারীর বিভিন্ন রচনায় প্রযুক্ত পরিভাষার একটি তালিকা এখানে দেওয়া হল। বর্তমান গ্রন্থের 'প্রবন্ধ' অধ্যায় (পৃ ৪১৫-২১) দ্রষ্টব্য।

centripetal কেন্দ্রানুগ
chromosphere বর্ণমণ্ডল
circumpolar ধ্রুবতারা-পরিবেষ্টক
coast তীর
conduction উত্তাপের সঞ্চালন
conservation of energy শক্তিসংরক্ষণ
cretaceous ক্রটেসস, চা-খড়ি
cryptogam পুষ্পহীন
crystalline দানাদার
deduction অবরোহ
density ঘনত্ব
devonian ডিবোনিয়ান
differential attraction আকর্ষণের বৈষম্য
efferent fibre অভিবাহী সূত্র
elk এল্ক
energy শক্তি
eocene ইয়োসীন
equinox সমান রাত্রিদিন
eruptive rocks উৎপাতজনিত মৃত্তিকা
ether ঈথর
femur পার্শ্বাস্থি
fern পর্ণীতরু
focus অধিশ্রয়
formanifera ফরমানিফেরা
fundamental gneiss মৌলিক মৃত্তিকা
ganoid গ্যানয়েড
glacial action হিমশৈলের কার্য
glyptodon খোদিত দন্ত
granite গ্র্যানিট, গ্র্যানিট প্রস্তর
gulf stream ঔপসাগরিক স্রোত

hercules পুস্তা
horizon দিগ্বলয়, দৃষ্টিব্যাপিকা
hypnotism স্বাপ্নিকতা
induction আরোহ
infra-silurian ইনফ্রা-সাইলুরিয়ন
insure বন্ধক
interrogation জিজ্ঞাসা
jurassic জুরাসিক
laurentian লরেনসিয়ান
lava উত্তপ্ত ধাতুদ্রব, ধাতুস্রোত
law of adaptation সঙ্গতি-নিয়ম
law of development বিকাশপদ্ধতি
law of exchange আয়ব্যয়ের নিয়ম
law of heredity কৌলিক নিয়ম
lepedodendrons শল্কদেহী বৃক্ষ
limestone চুন পাথর
local cause স্থানীয় কারণ
magnetic aura আকর্ষণ-আভা
matter পদার্থ
medium উপায়
megalony লম্বনখর
mental physiology মানসিক শরীরবিধান
mesmerism শক্তিচালনা
mesozoic মধ্য জীব
metamorphosed রূপান্তরিত
middle age মধ্য যুগ
miocene মায়োসীন
monocotyledon এক পত্র
motor nerve গতিউৎপাদক স্নায়ু
muscular movements মাংসপেশীর অবস্থান্তর

mylodon জাগদন্ত
nearly perpendicular to the ecliptic কক্ষের উপর প্রায় সোজাভাবে স্থিত
nebula জলন্ত বাষ্পময় নীহারিকারাশি
nerve স্নায়ু
nerve-cell স্নায়ু-প্রকোষ্ঠ
new red period নূতন লোহিত-প্রস্তর যুগ
nutation মেরুলক্ষ্য পরিবর্তন গতি
optical দৃষ্টিভ্রম
orthoceratites অর্থসেরাটাইটিস, ঋজুশৃঙ্গ
pachyderm স্থূলচর্মা জন্তু
paleozoic আদি জীব
passing accident দৈব ঘটনা
pendulum দোলক যন্ত্র
penumbra উপচ্ছায়া
permian পারমিয়ান
phenomenon অবভাস জগৎ
philosopher তত্ত্বজ্ঞানী
photosphere আলোকমণ্ডল
pleiocene প্লায়োসীন
pore ছিদ্র
practical hypothesis আনুমানিক সিদ্ধান্ত
precession of the equinoxes ক্রান্তিপাতের বক্রগতি
pygmy বালখিল্য
radiant matter কিরন্ত পদার্থ
radiation উত্তাপের বিকিরণ
reflex action প্রত্যাবর্তিত ক্রিয়া
refraction তির্যগ্ গতি
sedimentary rocks স্থিতান মৃত্তিকা
senoory nerve ঐন্দ্রিয়িক ক্রিয়া
sensitive মোহিষ্ণু

sentiment মনোভাব
sidereal year নাক্ষত্র বৎসর
silurian সাইলুরিয়ন
solar spots সূর্যবিম্ব
spectroscope রশ্মিনির্বাচক
spectrum বিশ্লিষ্ট বর্ণসমূহ
spirit of nature প্রকৃতির আত্মা
substance পদার্থ
summer solstice উত্তরায়ণ দিন
temperature উষ্ণতা
tertiary epoch তৃতীয় যুগ
theory বৈজ্ঞানিক মত
triassic ট্রায়াসিক, ত্রিস্তর
trilobites ত্রিকুণ্ডলী
tropical সৌর বৎসর
umbra ছায়া
uniformity of natural laws প্রাকৃতিক নিয়মের নিত্যতা
universe বিশ্বাকাশ
unstratified deposits লণ্ডভণ্ড মৃত্তিকাস্তর
vertebra অস্থিগ্রন্থি
vertebrata সমেরু জীব
vertically লম্বভাবে
volcanic অগ্নিসম্ভূত
volcano আগ্নেয়গিরি, অগ্ন্যুদ্গারী পর্বত, জ্বালামুখী
winter solstice দক্ষিণায়ণ দিন
xiphodon স্থলচর্মী জন্তু
ziphius জিফিউস

পরিশিষ্ট : দশ

ঘটনাপঞ্জী (১৮৫৬-১৯৩২)

২৮ আগস্ট ১৮৫৬ (১৪ ভাদ্র ১২৬৩) বৃহস্পতিবার—স্বর্ণকুমারীর জন্ম

৭ ডিসেম্বর ১৮৫৬ (২৩ অগ্রহায়ণ ১৭৭৮ শক)—কলিকাতায় প্রথম বিধবাবিবাহ

১৫ নভেম্বর ১৮৫৮ (১ অগ্রহায়ণ ১৭৮০ শক) সোমবার—হিমালয় ভ্রমণের পরে মহর্ষির কলিকাতা প্রত্যাবর্তন

২৬ জুলাই ১৮৬১ (১২ শ্রাবণ ১৭৮৩ শক) শুক্রবার—ব্রাহ্মমতে সুকুমারী দেবীর বিবাহ

১২ এপ্রিল ১৮৬৭ (চৈত্র সংক্রান্তি ১২৭৩)—হিন্দু মেলার প্রথম অধিবেশন

১৭ নভেম্বর ১৮৬৭ (২ অগ্রহায়ণ ১৭৮৯ শক) রবিবার—স্বর্ণকুমারীর বিবাহ

১১ এপ্রিল ১৮৬৮—হিন্দু মেলার দ্বিতীয় অধিবেশন

১৮৬৯—স্বর্ণকুমারীর প্রথম সন্তান হিরণ্ময়ীর জন্ম

৩১ অক্টোবর ১৮৬৯ (১৬ কার্তিক ১৭৯১ শক)—হিরণ্ময়ীর নামকরণ ও অন্নপ্রাশন

ডিসেম্বর ১৮৬৯ (অগ্রহায়ণ ১৭৯১ শক)—তাৎপর্য সহিত সমগ্র 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ প্রকাশিত

১৮৭০—স্বর্ণকুমারীর বোম্বাই গমন

১৮৭১—স্বর্ণকুমারীর পুত্র জ্যোৎস্নানাথের জন্ম

৯ সেপ্টেম্বর ১৮৭২—স্বর্ণকুমারীর দ্বিতীয় কন্যা সরলার জন্ম

*১৮৭৪—স্বর্ণকুমারীর তৃতীয় কন্যা ও শেষ সন্তান উর্মিলার জন্ম

১৮৭৫—সারদা দেবীর মৃত্যু

১৮৭৭ (শ্রাবণ ১২৮৪)—ভারতী প্রকাশারম্ভ

১৮৭৮—ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের বিলাত গমন

জানুয়ারি ১৮৮০—বেথুন স্কুলের নিম্ন শ্রেণীতে সরলার প্রবেশ

*১৮৮০—বিলাত থেকে জানকীনাথের প্রত্যাবর্তন

১৮৮১—লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফণিভূষণের বি. এস-সি. পাস

১৮৮২—বেথুন থেকে হিরণ্ময়ীর মাইনর পরীক্ষা পাস

১৮৮২-৮৩—স্বর্ণকুমারীর কারোয়ারে অবস্থান

১৮৮৩—ফণিভূষণের সঙ্গে হিরণ্ময়ীর বিবাহ

১৮৮২-৮৬—স্বর্ণকুমারী লেডিজ থিয়সফিক্যাল সোসাইটির সভানেত্রী

১৮৮৪-৯৪ (বৈশাখ ১২৯১-চৈত্র ১৩০১)—স্বর্ণকুমারী কর্তৃক ভারতী-সম্পাদনার প্রথম পর্যায়

১৮৮৬—বেথুন থেকে সরলার এণ্ট্রান্স পাস ; সখিসমিতি স্থাপন

১৮৮৭—স্বর্ণকুমারীর দার্জিলিং গমন

আগস্ট ১৮৮৮ (শ্রাবণ ১২৯৫)—রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে স্বর্ণকুমারীর গাজিপুর গমন এবং পরে কাশী ভ্রমণ

১৮৮৮ (শেষাশেষি)—স্বর্ণকুমারীর রাজসাহী গমন

১৮৮৯—বোম্বাই সহরে কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে স্বর্ণকুমারীর যোগদান

১৮৯০ (বর্ষাকাল)—স্বর্ণকুমারীর বোলপুর ভ্রমণ

ডিসেম্বর ১৮৯০—কলিকাতায় কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশনে স্বর্ণকুমারীর যোগদান

১৮৯০—সরলার বি. এ. পাস

১৮৯২ (বর্ষাকাল)—সোলাপুর গমন

১৮৯৪—সরলাকে নিয়ে মহীশূরের উদ্দেশ্যে স্বর্ণকুমারীর সাতারা গমন

মে ১৮৯৫—স্বর্ণকুমারীর নীলগিরি ভ্রমণ

ভাদ্র ১৩০২—স্বর্ণকুমারীর মহীশূরে অবস্থান

১৯০৫ –বৈদ্যনাথ ভ্রমণ ; পাঞ্জাবের রামভজ দত্তচৌধুরীর সঙ্গে সরলার বিবাহ

১৯০৬—বিধবা-শিল্পাশ্রম প্রতিষ্ঠা

১৯০৮-১৪ (বৈশাখ ১৩১৫—চৈত্র ১৩২১)—স্বর্ণকুমারীর ভারতী-সম্পাদনার দ্বিতীয় পর্যায়

২ মে ১৯১৩—জানকীনাথের মৃত্যু

১৯২০—সৌদামিনী দেবীর মৃত্যু

৬ আগস্ট ১৯২৩—রামভজ দত্তচৌধুরীর মৃত্যু

১৩ জুলাই ১৯২৫ (২৯ আষাঢ় ১৩৩২)—হিরণ্ময়ীর মৃত্যু

১৪ ডিসেম্বর ১৯২৭—ফণিভূষণের মৃত্যু

১৯২৭—স্বর্ণকুমারীর জগত্তারিণী স্বর্ণপদক প্রাপ্তি

২-৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০ (১৯-২১ মাঘ ১৩৩৬)—ভবানীপুর সাহিত্যসম্মিলনে স্বর্ণকুমারীর সভাপতিত্ব

১৯৩১—বিধবা-শিল্পাশ্রমকে স্বর্ণকুমারী কর্তৃক আপনার রচনাবলীর স্বত্বপ্রদান

৩ জুলাই ১৯৩২ (১৯ আষাঢ় ১৩৩৯) রবিবার—স্বর্ণকুমারীর মৃত্যু

নির্দেশিকা